একের ভিতর আট

[প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র]

লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের

সাধারণ সম্পাদক :

অধ্যাপক ডি. সেনগুপ্ত এম. এ.



ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
সি. ভট্টাচার্য
৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬৪
দ্বিতীয় সংস্করণ—আগস্ট, ১৯৬৫
তৃতীয় সংস্করণ—আগস্ট, ১৯৬৬
চতুর্থ সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৬৬
পঞ্চম সংস্করণ—আগস্ট, ১৯৬৭
ষষ্ঠ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮
সপ্তম সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬৮

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রদীপ হাজরা
দ্রুণ
৩৮, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া "ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা" রচিত হইয়াছে। এই সহায়িকায় সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি বিষয় সংযুক্ত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত গ্রন্থাদির প্রশ্নোত্তর ও ব্যাখ্যা এই সহায়িকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রবন্ধ, ভাব-সম্প্রসারণ ও ভাবার্থ—অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা-পরীক্ষা প্রস্তুতির যাবতীয় বিষয় এই সহায়িকায় থাকায় ইহার স্বাতন্ত্র্য সহজেই বুঝা যাইবে। এই সহায়িকার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে অপ্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করিয়া পুস্তকের কলেবর অহেতুক বৃদ্ধি করা হয় নাই।

বাংলা পঠন-পাঠনে যাঁহারা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে সহায়িকাখানি রচিত হইয়াছে। আশা করা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা এই সহায়িকা দ্বারা উপকৃত হইবে।

কলিকাতা } প্রকাশক

সুচীপত্র

প্রথম পত্র

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাগর-সংগমে

Floating straight obedient to the stream.

—*Comedy of Errors.*

প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, এই দুইজনমাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারবি?" মাঝি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সংবৎসর খাবে কি?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আসব না? তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয় বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল,—"ও ভাই—এত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বারদরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোন বিপদ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন; বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দিক্ অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোন্ দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহিরসমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকা-মধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়টি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্তনাদ করিয়া উঠিল, প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়।"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নবীন যাত্রী কোন মতে তাঁহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিককে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে। চার পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্, পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগত-প্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা স্বর তুলিয়া বিবিধ শব্দ বিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমন সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচপীরের নাম কীর্তন করিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি? কি? মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখ ডাঙা"! যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্য-সহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া, কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য প্রকাশ হইয়াছে, কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্তী বটে, এমন কি পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত হইয়া গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দম নদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন; তবে সৌভাগ্য এই যে উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর

মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সকমহলের দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিতে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপকূলে

"Ingratitude! Thou marble-herted fiend!

—*King Lear*

আরোহীদিগের স্ফূর্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে ;—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা তরী তীরলগ্ন করিলে, আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব, কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বনমাত্র। কিন্তু

সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে;—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূরে গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্মে অভ্যাস ছিল না; সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না। এজন্য তিনি কোন মতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্যকাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপ কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে,—জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্তী থাকিলে, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী মধ্যবর্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতেই সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে; নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। একজন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে?" একজন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন

করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এই জন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা রসুলপুর নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্ধমাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন করা যাইবে কিনা, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকাচালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুদিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবেক। বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত; তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজনে

"——Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And grimly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes."

—*Don Juan.*

যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুদ্ঘাতিনী, এ প্রদেশ সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নসূর্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে, ঝাটি, বনঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক।

এইরূপ অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠভার লইয়া নদীতীরে আসিয়া নৌকা দেখিলেন না; তখন তাঁহার অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সঙ্গিগণ যে তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমত বোধ হইল না। বিবেচনা করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে সৈকতভূমি প্লাবিত হওয়ায় তাঁহারা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে নৌকা রক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবেন। এই প্রত্যাশায় কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নৌকা আইল না;

নৌকারোহীও কেহ দেখা দিল না। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, নৌকার সন্ধানে নদীর তীরে তীরে ফিরিতে লাগিলেন। কোথাও নৌকার সন্ধান পাইলেন না, প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বস্থানে আসিলেন। তখন পর্যন্ত নৌকা না দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, জোয়ারের বেগে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; এখন প্রতিকূল স্রোতে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্গীদিগের কাজে কাজেই বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু জোয়ারও শেষ হইল। তখন ভাবিলেন, প্রতিকূল স্রোতের বেগাধিক্যবশতঃ জোয়ারে নৌকা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; এক্ষণে ভাঁটায় অবশ্য ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাঁটাও ক্রমে অধিক হইল—ক্রমে ক্রমে বেলাবসান হইয়া আসিল; সূর্যাস্ত হইল। যদি নৌকা ফিরিয়া অসিবার হইত, তবে এতক্ষণ ফিরিয়া আসিত।

তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল যে. হয় জলোচ্ছ্বাসসম্ভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নবকুমার দেখিলেন যে, গ্রাম নাই. আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য নাই, পেয় নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাত্মক; অথচ ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীতনিবারণজন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল-বায়ুসঞ্চারিত নদী-তীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে, নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবেক। রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা। প্রাণনাশই নিশ্চিত।

মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার একস্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন; ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্র-গর্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, হিমবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও উপত্যকায়, কখনও অধিত্যকায়, কখনও স্তূপতলে, কখনও স্তূপশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতি পদে হিংস্র পশু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক স্থানে বসিয়া থাকিলেও সেই আশঙ্কা।

ভ্রমণ করিতে করিতে নবকুমারের শ্রম জন্মিল। সমস্ত দিন অনাহার; এজন্য অধিক অবসন্ন হইলেন। এক স্থানে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া

বসিলেন। গৃহের সুখতপ্ত শয্যা মনে পড়িল। যখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কখনও কখনও নিদ্রা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। নবকুমার চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। বোধ হয়, যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে সাংসারিক ক্লেশের অপ্রতিহত বেগ সকলে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্তূপ-শিখরে

"—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্তি।"

—মেঘনাদবধ

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য বোধ হইল। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কি না। অকস্মাৎ সম্মুখে, বহু দূরে, একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এজন্য নবকুমার মনোভিনিবেশপূর্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোকপরিধি ক্রমে বর্ধিতায়তন এবং উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইল। প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না, কেন না এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন। যথায় আলোক, সেইদিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, "এ আলোক ভৌতিক?—হইতেও পারে; কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবনরক্ষা হয়?" এই ভাবিয়া নির্ভীকচিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বৃক্ষ, লতা, বালুকাস্তূপ পদে পদে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। বৃক্ষ লতা দলিত করিয়া, বালুকাস্তূপ লঙ্ঘিত করিয়া নবকুমার চলিলেন। আলোকের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন যে, এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে; তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্তি আকাশপটস্থ

চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। নবকুমার শিখরাসীন মনুষ্যের সমীপবর্তী হইবেন স্থির সঙ্কল্প করিয়া অশিথিলীকৃত বেগে চলিলেন। পরিশেষে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। তখন কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইতে লাগিল—তথাপি অকম্পিতপদে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। আসীন ব্যক্তির সম্মুখবর্তী হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিষ্ঠিবেন কি প্রত্যাবর্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

শিখরাসীন-মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কিনা, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দূলচর্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন। ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে; তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থানত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদিগের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।

যখন নবকুমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাপালিক মন্ত্রসাধনে বা জপে বা ধ্যানে মগ্ন ছিল, নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কস্ত্বং?" নবকুমার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

কাপালিক কহিল, "তিষ্ঠ।" এই কহিয়া পূর্বকার্যে নিযুক্ত হইল। নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রহরার্ধ গত হইল। পরিশেষে কাপালিক গাত্রোত্থান করিয়া নবকুমারকে পূর্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, "মামনুসর।"

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্যসময়ে নবকুমার কদাপি ইহার সঙ্গী হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত, অতএব কহিলেন, "প্রভুর যেমত আজ্ঞা। কিন্তু আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর, কোথায় গেলে আহার্য সামগ্রী পাইব, অনুমতি করুন।"

কাপালিক কহিল, "ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি, মামনুসর; পরিতোষঃ তে ভবিষ্যতি।"

নবকুমার কাপালিকের অনুগামী হইলেন। উভয়ে অনেক পথ বাহিত করিলেন—পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। পরিশেষে এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইল—কাপালিক প্রথমে প্রবেশ করিয়া নবকুমারকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিল; এবং নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে এক খণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিত করিল। নবকুমার তদালোকে দেখিলেন যে, ঐ কুটির সর্বাংশে কিয়াপাতায় রচিত। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম আছে—এক কলস জল ও কিছু ফলমূল আছে।

কাপালিক অগ্নি জ্বালিত করিয়া কহিল, "ফলমূল যাহা আছে, আত্মসাৎ করিতে পার। পর্ণপাত্র রচনা করিয়া, কলসজল পান করিও। ব্যাঘ্রচর্ম আছে, অভিরুচি হইলে শয়ন করিও। নির্বিঘ্নে তিষ্ঠ—ব্যাঘ্রের ভয় করিও না। সময়ান্তরে, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে পর্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া কাপালিক প্রস্থান করিল। নবকুমার সেই সামান্য ফলমূল আহার করিয়া এবং সেই ঈষত্তিক্ত জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে ব্যাঘ্রচর্মে শয়ন করিলেন, সমস্ত দিবসজনিত ক্লেশহেতু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমুদ্রতটে

"—যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্‌॥"

—রঘুবংশ

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটী গমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন; বিশেষ, এ কাপালিকের সান্নিধ্য কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ এ পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটী যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে; জিজ্ঞাসিলে কি পথ বলিয়া দিবে না? বিশেষ যতদূর দেখা গিয়াছে, ততদূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক আচরণ করে নাই—কেনই বা তবে তিনি ভীত হন? এদিকে কাপালিক তাঁহাকে পুনঃসাক্ষাৎ পর্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা। নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধনে সক্ষম। এ কারণে তাহার অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীর মধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্বদিনের উপবাস, অদ্য এ পর্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীর মধ্যে যে অল্পপরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল—এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপসকলের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু। তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিলেন।

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প, অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে

পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষুঃ যায়, ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা, হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডল মধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না—তখন তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বলিবে? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব মূর্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণী-মূর্তি! কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে! অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে

পারা যায় না। অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমমধ্যে দেবী-মূর্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল,—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

অনন্ত সমুদ্রের জনহীন-তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যতযত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়; সকলই লয়বিশিষ্ট হয়, সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সংগীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।

রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস।" এই বলিয়া তরুণী চলিল; পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে অলক্ষ্যপাদবিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে; বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাপালিকসঙ্গে

"কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ—

—রত্নাবলী

নবকুমার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারসংযোজনপূর্ব্বক করতলে মস্তক দিয়া বসিলেন। শীঘ্র আর মস্তকোত্তলন করিলেন না।

"এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র! নবকুমার নিস্পন্দ হইয়া হৃদয় মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া, নবকুমার আর একটি ব্যাপার দেখিতে পান নাই। কুটীরমধ্যে তাঁহার আগমনপূর্ব্বাবধি একখানি কাষ্ঠ জ্বলিতেছিল। পরে যখন অনেক রাত্রে স্মরণ হইল যে, সায়াহ্নকৃত্য অসমাপ্ত রহিয়াছে—তখন জলান্বেষণ অনুরোধে চিন্তা হইতে ক্ষান্ত হইয়া এ বিষয়ের অসম্ভাবিতা হৃদয়ংগম করিতে পারিলেন। শুধু আলো নহে, তণ্ডুলাদি পাকোপযোগী কিছু কিছু সামগ্রীও আছে। নবকুমার বিস্মিত হইলেন না—মনে করিলেন যে, এও কাপালিকের কর্ম—এ স্থানে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে।

নবকুমার সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে তণ্ডুলগুলি কুটীরমধ্যে প্রাপ্ত এক মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে চর্ম্মশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই সমুদ্রতীরাভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্বদিনের যাতায়াতের গুণে অদ্য অল্প কষ্টে পথ অনুভূত করিতে পারিলেন। তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন? পূর্ব্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্ব্বার সে স্থলে যে আসিবেন—এমত আশা নবকুমারের হৃদয়ে কতদূর প্রবল হইয়াছিল বলিতে পারি না—কিন্তু সে স্থান তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনেক বেলাতেও তথায় কেহ আসিল না। তখন নবকুমার সে স্থানের চারিদিকে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃথা অন্বেষণ মাত্র। মনুষ্য-সমাগমের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইল; অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল; নবকুমার হতাশ হইয়া কুটীরে ফিরিয়

আসিলেন। সায়াহ্নকালে সমুদ্রতীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, কাপালিক কুটীর মধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে। নবকুমার প্রথমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে কাপালিক কোন উত্তর করিলেন না।

নবকুমার কহিলেন, "এ পর্যন্ত প্রভুর দর্শনে কি জন্য বঞ্চিত ছিলাম?" কাপালিক কহিল, "নিজ ব্রতে নিযুক্ত ছিলাম।"

নবকুমার গৃহগমনাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "পথ অবগত নহি—পাথেয় নাই। যদ্বিহিতবিধান প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেই হইতে পারিবে, এই ভরসায় আছি।"

কাপালিক কেবলমাত্র কহিল, "আমার সঙ্গে আগমন কর।" এই বলিয়া উদাসীন গাত্রোত্থান করিলেন। বাটী যাইবার কোন সদুপায় হইতে পারিবে প্রত্যাশায় নবকুমারও তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই—কাপালিক অগ্রে অগ্রে, নবকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল করস্পর্শ হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্পন্দহীন হইলেন। সেই আগুল্‌ফলম্বিত নিবিড়-কেশরাশিধারিণী বন্যদেবীমূর্তি। পূর্ববৎ নিঃশব্দ নিস্পন্দ। কোথা হইতে এ মূর্তি অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাতে আসিল! নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আছে। নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাক্যস্ফূর্তি নিষেধ করিতেছে, নিষেধের বড় প্রয়োজনও ছিল না। নবকুমার কি কথা কহিবেন, তিনি তথায় চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাপালিক এ সকল কিছুই দেখিতে পাইল না, অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। তাহারা উদাসীনের শ্রবণাতিক্রান্ত হইলে রমণী মৃদুস্বরে কি কথা কহিল। নবকুমারের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করিল।

"কোথা যাইতেছ? যাইও না; ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।"

এই কথা সমাপ্ত করিয়াই উক্তিকারিণী সরিয়া গেলেন, প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য তিষ্ঠিলেন না। নবকুমার কিয়ৎকাল অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইলেন, পশ্চাদ্বর্তী হইতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু রমণী কোন্ দিকে গেল, তাহার কিছুই স্থিরতা পাইলেন না। মনে করিতে লাগিলেন—"এ কাহার মায়া? না আমারই ভ্রম হইতেছে? যে কথা শুনিলাম—সে ত আশঙ্কাসূচক, কিন্তু কিসের আশঙ্কা? তান্ত্রিকেরা সকলই করিতে পারে। তবে কি পলাইব? পলাইব বা কেন? সে দিন যদি বাঁচিয়াছি, আজিও বাঁচিব। কাপালিকও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য।"

নবকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময় দেখিলেন, কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে না দেখিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে। কাপালিক কহিল, "বিলম্ব করিতেছ কেন ?"

কাপালিক পুনরাহ্বান করাতে বিনা বাক্যব্যয়ে নবকুমার তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট কুটীর দেখিতে পাইলেন। তাহাকে কুটীরও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র গৃহও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার পশ্চাতেই সিকতাময় সমুদ্রতীর। গৃহপার্শ্ব দিয়া কাপালিক নবকুমারকে সেই সৈকতে লইয়া চলিলেন ; এমন সময় তীরের তুল্য বেগে পূর্বদৃষ্টা রমণী তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল ; গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, "এখন পালাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না ?"

নবকুমারের কপালে স্বেদনির্গম হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবতীর এই কথা কাপালিকের কর্ণে গেল। সে কহিল, "কপালকুণ্ডলে !"

স্বর নবকুমারের কর্ণে মেঘগর্জনবৎ ধ্বনিত হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না।

কাপালিক নবকুমারের হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মানুষঘাতী করস্পর্শে নবকুমারের শোণিত ধমনীমধ্যে শতগুণ বেগে প্রধাবিত হইল—লুপ্ত সাহস পুনর্বার আসিল। কহিলেন, "হস্ত ত্যাগ করুন।"

কাপালিক উত্তর করিল না। নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন ?"

কাপালিক কহিল, "পূজার স্থানে।"

নবকুমার কহিলেন, "কেন ?"

কাপালিক কহিল, "বধার্থ।"

অতিতীব্রবেগে নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন। যে বলে তিনি হস্ত-আকর্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য লোক তাঁহার হাত ধরিয়া থাকিলে, হস্তরক্ষা করা দূরে থাকুক,—বেগে ভূপতিত হইত। কিন্তু কাপালিকের অঙ্গমাত্রও হেলিল না, নবকুমারের প্রকোষ্ঠ তাহার হস্তমধ্যেই রহিল। নবকুমারের অস্থিগ্রন্থিসকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। নবকুমার দেখিলেন, বলে হইবে না। কৌশলের প্রয়োজন। "ভাল দেখা যাউক"—এইরূপ স্থির করিয়া নবকুমার কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সৈকতের মধ্যস্থানে নীত হইয়া নবকুমার দেখিলেন, পূর্বদিনের ন্যায় তথায় বৃহৎ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছে। চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিকপূজার আয়োজন রহিয়াছে। তন্মধ্যে নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে—কিন্তু শব নাই। অনুমান করিলেন, তাঁহাকেই শব হইতে হইবে।

কতকগুলি শুষ্ক, কঠিন লতাগুল্ম তথায় পূর্ব হইতেই আহরিত ছিল। কাপালিক তদ্দ্বারা নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমার সাধ্যমত বল প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু বলপ্রকাশ কিছুমাত্র ফলদায়ক হইল না। তাঁহার প্রতীতি হইল যে, এ বয়সেও কাপালিক মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে। নবকুমারের বলপ্রকাশ দেখিয়া কাপালিক কহিল,

"মূর্খ! কি জন্য বলপ্রকাশ কর ? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে ?"

কাপালিক নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া সৈকতোপরি ফেলিয়া রাখিলেন। এবং বধের প্রাক্কালিক পূজাদি ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলেন। ততক্ষণ নবকুমার বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু শুষ্ক লতা অতি কঠিন—বন্ধন অতি দৃঢ়। মৃত্যু আসন্ন! নবকুমার ইষ্টদেবচরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। একবার জন্মভূমি মনে পড়িল, নিজ সুখের আলয় মনে পড়িল, একবার বহুদিন অন্তর্হিত জনক এবং জননীর মুখ মনে পড়িল, দুই এক বিন্দু অশ্রুজল সৈকত-বালুকায় শুষিয়া গেল। কাপালিক বলির প্রাক্কালিক ক্রিয়া সমাপনান্তে বধার্থ খড়্গ লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। কিন্তু যথায় খড়্গ রাখিয়াছিল, তথায় খড়্গ পাইল না। আশ্চর্য! কাপালিক কিছু বিস্মিত হইল। তাহার নিশ্চিত মনে হইতেছিল যে, অপরাহ্নে খড়্গ আনিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছিল এবং স্থানান্তরও করে নাই, তবে খড়্গ কোথায় গেল ? কাপালিক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কোথাও পাইল না। তখন পূর্বকথিত কুটীরাভিমুখ হইয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ডাকাতেও কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিলনা। তখন কাপালিকের চক্ষু লোহিত, ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইল। দ্রুত-পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিল ; এই অবকাশে বন্ধনলতা ছিন্ন করিতে নবকুমার আর একবার যত্ন পাইলেন—কিন্তু সে যত্নও নিষ্ফল হইল।

এমত সময়ে নিকটে বালুকার উপর অতি কোমল পদধ্বনি হইল—এ পদধ্বনি কাপালিকের নহে। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই মোহিনী—কপালকুণ্ডলা। তাহার করে খড়্গ দুলিতেছে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "চুপ! কথা কহিও না—খড়্গ আমারই কাছে—চুরি করিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা অতি শীঘ্রহস্তে নবকুমারের লতাবন্ধন খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। নিমিষমধ্যে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া কপাকুণ্ডলা তীরের ন্যায় বেগে পথ দেখাইয়া চলিলেন। নবকুমার লাফ দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অন্বেষণে

"And the great lord of Luna,
Fell àt that deadly stroke ;
As falls on mount Alvernus
A thunder-smitten oak."

—*Lays of Ancient Rome.*

এদিকে কাপালিক গৃহমধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, না খড়্গ, না কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইয়া, সন্দিগ্ধচিত্তে সৈকতে প্রত্যাবর্তন করিল। আসিয়া দেখিল যে, নবকুমার তথায় নাই। ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই ছিন্ন লতাবন্ধনের উপর দৃষ্টি পড়িল। তখন স্বরূপ অনুভূতি করিতে পারিয়া কাপালিক নবকুমারের অন্বেষণে ধাবিত হইল। কিন্তু বিজন-মধ্যে পলাতকেরা কোন্ দিকে কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। অন্ধকারবশতঃ কাহাকেও দৃষ্টিপথবর্তী করিতে পারিল না। এজন্য বাক্যশব্দ লক্ষ্য করিয়া ক্ষণেক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সকল সময়ে কণ্ঠ-ধ্বনিও শুনিতে পাওয়া গেল না। অতএব বিশেষ করিয়া চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিল। কাপালিক এক পার্শ্ব দিয়া উঠিল; তাহার অন্যতর পার্শ্বে বর্ষার জলপ্রবাহে স্তূপমূল ক্ষয়িত হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না; শিখরে আরোহণ করিবামাত্র কাপালিকের শরীরভরে সেই পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া অতি ঘোর রবে স্থানচ্যুত হইল। পতনকালে পর্বতশিখরচ্যুত মহিষের ন্যায় কাপালিকও তৎসঙ্গে পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আশ্রমে

"And that very night—
Shall Romeo bear thee to Mantua.

—*Romeo and Juliet.*

সেই অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে দুইজনে উর্ধ্বশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্য পথ নবকুমারের অপরিজ্ঞাত; কেবল সহচারিণী ষোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া তদ্বর্ত্মসংবর্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। মনে মনে ভাবিলেন, "এও কপালে ছিল।" নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না। ক্রমে তাঁহারা পাদক্ষেপ মন্দ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না; কেবল কখন কোথাও নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায়, কোথাও খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয়।

কপালকুণ্ডলা পথিককে সমভিব্যাহারে লইয়া নিভৃত কাননাভ্যন্তরে উপনীত হইলেন; তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সম্মুখে অন্ধকারে বনমধ্যে এক অত্যুচ্চ দেবালয়চূড়া লক্ষিত হইল; তন্নিকটে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটি গৃহও দেখা গেল। কপালকুণ্ডলা প্রাচীরদ্বারের নিকটস্থ হইয়া তাহাতে করাঘাত করিতে লাগিলেন; পুনঃপুনঃ করাঘাত করাতে ভিতর হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "কে ও, কপালকুণ্ডলা বুঝি?" কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দ্বার খোল।"

উত্তরকারী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দিল, সে ঐ দেবালয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবক বা অধিকারী; বয়সে পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাঁহার বিরলকেশ মস্তক কর দ্বারা আকর্ষিত করিয়াআপন অধরের নিকট তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় আনিলেন এবং দুই চারি কথায় নিজ সঙ্গীর অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। অধিকারী বহুক্ষণ পর্যন্ত করতলন্যস্তশীর্ষ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কহিলেন, "এ বড় বিষম ব্যাপার। মহাপুরুষ মনে করিলে সকল করিতে পারেন। যাহা হউক, মায়ের প্রসাদে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে না। সে ব্যক্তি কোথায়?"

কপালকুণ্ডলা, "আইস" বলিয়া নবকুমারকে আহ্বান করিলেন। নবকুমার অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আহূত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অধিকারী

তাঁহাকে কহিলেন, "আজি এইখানে লুকাইয়া থাক, কালি প্রত্যূষে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

ক্রমে কথায় কথায় অধিকারী জানিতে পারিলেন যে, এ পর্য্যন্ত নবকুমারের আহারাদি হয় নাই। ইহাতে অধিকারী তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নবকুমার আহারে নিতান্ত অস্বীকৃত হইয়া কেবলমাত্র বিশ্রামস্থানের প্রার্থনা জানাইলেন। অধিকারী নিজ রন্ধনশালায় নবকুমারের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নবকুমার শয়ন করিলে, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধিকারী তাঁহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,

"যাইও না। ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।"

কপালকুণ্ডলা। কি ?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না ?"

কপা। করিব না।

অধি। আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।

কপা। কেন ?

অধি। গেলে তোমার রক্ষা নাই।

কপা। তাহা ত জানি।

অধি। তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন ?

কপা। না গিয়া কোথায় যাইব ?

অধি। এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।

কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহিলেন, "মা, কি ভাবিতেছ ?"

কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত ; এখন যাইতে বল কেন ?

অধি। তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করি নাই, বিশেষ যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিল না, এখন সে সদুপায় হইতে পারিবে। আইস, মায়ের অনুমতি লইয়া আসি।

এই বলিয়া অধিকারী দীপহস্তে দেবালয়ের দ্বারে গিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। কপালকুণ্ডলাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মন্দির মধ্যে মানবাকারপরিমিতা

করালকালীমূর্তি সংস্থাপিতা ছিল। উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন,

"মা দেখ, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন, বিল্বপত্র পড়ে নাই, যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিলাম তাহাতে অবশ্য মঙ্গল। তুমি এই পথিকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গমন কর; কিন্তু আমি বিষয়ী লোকের রীতি-চরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ হইয়া ইহার সঙ্গে যাও, তবে এ ব্যক্তি অপরিচিত যুবতী সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে লজ্জা পাইবে। তোমাকেও লোকে ঘৃণা করিবে। তুমি বলিতেছ, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সন্তান; গলাতেও যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি। এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।"

"বি—বা—হ।" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?"

অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।"

অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন, বলিলেন,

"তাহাই হউক! কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।"

অধি। কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।

এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না, কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। বলিল, "তবে বিবাহই হউক।"

এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। এক কক্ষমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে বসাইয়া, অধিকারী নবকুমারের শয্যা-সন্নিধানে গিয়া তাঁহার শিওরে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! নিদ্রিত কি?"

নবকুমারের নিদ্রা যাইবার অবস্থা নহে, নিজদশা ভাবিতেছিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞে না।"

অধিকারী কহিলেন, "মহাশয়! পরিচয়টা লইতে একবার আসিলাম। আপনি ব্রাহ্মণ?"

নব। আজ্ঞা হাঁ।

অধি। কোন্ শ্রেণী?

নব। রাঢ়ীয় শ্রেণী।

অধি। আমরাও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ—উৎকল ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিবেন না। বংশে কুলাচার্য, তবে এক্ষণে মায়ের পদাশ্রয়ে আছি। মহাশয়ের নাম?

নব। নবকুমার শর্মা।

অধি। নিবাস?

নব। সপ্তগ্রাম।

অধি। আপনারা কোন্ গাঁই?

নব। বন্দ্যঘটী।

অধি। কয় সংসার করিয়াছেন?

নব। এক সংসার মাত্র।

নবকুমার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এক সংসারও ছিল না। তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতী কিছুদিন পিত্রালয়ে রহিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন। এই সময়ে পাঠানেরা আকবর শাহ কর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল। তাহাদিগের দমনের জন্য আকবর শাহ বিধিমতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। যখন রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন মোগল পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আগমনকালে তিনি পথিমধ্যে পাঠান সেনার হস্তে পতিত হয়েন। পাঠানেরা তৎকালে ভদ্রাভদ্র বিচারশূন্য। তাহারা নিরপরাধী পথিকের প্রতি অর্থের জন্য বলপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামগোবিন্দ কিছু উগ্রস্বভাব, পাঠানদিগকে কটু কহিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন; পরিশেষে জাতীয় ধর্ম বিসর্জন পূর্বক সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে প্রাণ লইয়া বাটী আসিলেন বটে, কিন্তু মুসলমান বলিয়া আত্মীয় জনসমাজে এককালীন পরিত্যক্ত হইলেন। এ সময়ে নবকুমারের পিতা বর্তমান ছিলেন, তাঁহাকে সুতরাং জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের

সহিত জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকে ত্যাগ করিতে হইল। আর নবকুমারের সহিত তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল না।

স্বজনত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অধিক দিন স্বদেশে বাস করিতে পারিলেন না। এই কারণেও বটে, এবং রাজপ্রসাদে উচ্চপদস্থ হইবার আকাঙ্ক্ষায়ও বটে, তিনি সপরিবারে রাজধানী রাজমহলে গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করিয়াছিলেন। রাজমহলে যাওয়ার পরে শশুরের বা বনিতার কি অবস্থা হইল, তাহা নবকুমারের জানিতে পারিবার কোন উপায় রহিল না এবং এ পর্যন্ত কখন কিছু জানিতেও পারিলেন না। নবকুমার বিরাগবশতঃ আবার দারপরিগ্রহ করিলেন না। এই জন্ত বলিতেছি, নবকুমারের "এক সংসারও নহে।"

অধিকারী এ সকল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, "কুলীনের সন্তানের দুই সংসারে আপত্তি কি?" প্রকাশ্যে কহিলেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। এই যে কন্তা আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে—এ পরহিতার্থ আত্মপ্রাণ নষ্ট করিয়াছে। যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে ইহার বাস, তিনি অতি ভয়ঙ্করস্বভাব। তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে, আপনার যে দশা ঘটিতেছিল, ইহার সেই দশা ঘটিবে। ইহার কোন উপায় বিবেচনা করিতে পারেন কি না?"

নবকুমার উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "আমিও সেই আশঙ্কা করিতেছিলাম। আপনি সকল অবগত আছেন—ইহার উপায় করুন। আমার প্রাণদান করিলে যদি কোন প্রত্যুপকার হয়,—তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।" অধিকারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বাতুল। ইহাতে কি ফল দর্শিবে? তোমারও প্রাণ সংহার হইবে—অথচ ইহার প্রতি মহাপুরুষের ক্রোধোপশম হইবে না। ইহার একমাত্র উপায় আছে।"

নব। সে কি উপায়?

অধি। আপনার সহিত ইহার পলায়ন। কিন্তু সে অতি দুর্ঘট। আমার এখানে থাকিলে দুই এক দিনের মধ্যে ধৃত হইবে। এ দেবালয়ে মহাপুরুষের সর্বদা যাতায়াত। সুতরাং কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে অশুভ দেখিতেছি।

নবকুমার আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত পলায়ন দুর্ঘট কেন?"

অধি। এ কাহার কন্যা,—কোন্ কুলে জন্ম, তাহা আপনি কিছু জানেন না। কাহার পত্নী,—কি চরিত্রা, তাহা কিছুই জানেন না। আপনি ইহাকে কি সঙ্গিনী করিবেন? সঙ্গিনী করিয়া লইয়া গেলেও কি আপনি ইহাকে নিজগৃহে স্থান দিবেন? আর যদি স্থান না দেন, তবে এ অনাথা কোথায় যাইবে?

নবকুমার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্য কোন কার্য আমার অসাধ্য নহে। ইনি আমার আত্মপরিবারস্থা হইয়া থাকিবেন।"

অধি। ভাল। কিন্তু যখন আপনার আত্মীয় স্বজন জিজ্ঞাসা করিবে যে, এ কাহার স্ত্রী, কি উত্তর দিবেন?

নবকুমার পুনর্বার চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনিই ইহার পরিচয় আমাকে দিন। আমি সেই পরিচয় সকলকে দিব।"

অধি। ভাল। কিন্তু এই পক্ষান্তরের পথ যুবক-যুবতী অনন্যসহায় হইয়া কি প্রকারে যাইবে? লোকে দেখিয়া শুনিয়া কি বলিবে? আত্মীয় স্বজনের নিকট কি বুঝাইবে? আর আমিও এই কন্যাকে মা বলিয়াছি, আমিই বা কি প্রকারে ইহাকে অজ্ঞাতচরিত্র যুবার সহিত একাকী দূরদেশে পাঠাইয়া দিই?

নবকুমার কহিলেন, "আপনি সঙ্গে আসুন।"

অধি। আমি সঙ্গে যাইব? ভবানীর পূজা কে করিবে?

নবকুমার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "তবে কি কোন উপায় করিতে পারেন না?"

অধি। একমাত্র উপায় হইতে পারে,—সে আপনার ঔদার্যগুণের অপেক্ষা করে।

নব। সে কি? আমি কিসে অস্বীকৃত? কি উপায় বলুন?

অধি। শুনুন। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইহার নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্যন্ত অনূঢ়া, ইহার চরিত্র পরম পবিত্র। আপনি ইহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

নবকুমার শয্যা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। অধিকারী

কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "আপনি এক্ষণে নিদ্রা যান। কল্য প্রত্যূষে আপনাকে আমি জাগরিত করিব। ইচ্ছা হয়, একাকী যাইবেন। আপনাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

এই বলিয়া অধিকারী বিদায় হইলেন। গমনকালে মনে মনে কহিলেন, "রাঢ়দেশের ঘটকালি কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি?"

নবম পরিচ্ছেদ

দেবনিকেতনে

"কণ্ব। অলং রুদিতেন; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমবলোকয়।'

—শকুন্তলা

প্রাতে অধিকারী নবকুমারের নিকট আসিলেন। দেখিলেন, এখনও নবকুমার শয়ন করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি কর্তব্য?"

নবকুমার কহিলেন, "আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী; ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। কে কন্যা সম্প্রদান করিবে?"

ঘটকচূড়ামণির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এতদিনে জগদম্বার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হইল।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি সম্প্রদান করিব।" অধিকারী নিজ শয়নকক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। একটি খুঙ্গীর মধ্যে কয়েকখণ্ড অতি জীর্ণ তালপত্র ছিল; তাহাতে তাঁহার তিথি নক্ষত্রাদি নির্দিষ্ট থাকিত। তৎসমুদায় সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আসিয়া কহিলেন, "আজি যদিও বৈবাহিক দিন নহে—তত্রাচ বিবাহে কোন বিঘ্ন নাই। গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব। তুমি অদ্য উপবাস করিয়া থাকিবে মাত্র। কৌলিক আচরণ সকল বাটী গিয়া করাইও। এক-দিনের জন্য তোমাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আজি যদি তিনি আসেন, তবে তোমাদিগের সন্ধান পাইবেন না। পরে বিবাহান্তে কালি প্রাতে সপত্নীক বাটী যাইও।"

নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন। এ অবস্থায় যত দূর সম্ভবে তত দূর যথাশাস্ত্র

কার্য হইল। গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিকপালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।

কাপালিকের কোন সংবাদ নাই। পরদিন প্রত্যূষে তিনজনে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অধিকারী মেদিনীপুরের পথ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালীপ্রণামার্থ গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেম। পত্রটি পড়িয়া গেল।

কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমাচরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন;—এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন; কহিলেন,

"এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।"

সকলে নিঃশব্দে চলিলেন। অনেক বেলা হইলে মেদিনীপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃদ, সে বিদায় হইতেছে।

অধিকারীও কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষের জল মুছাইয়া কপালকুণ্ডলার কানে কানে কহিলেন, "মা! তুই জানিস, পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়। তোর কাপড়ে যাহা বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহা তোর স্বামীর নিকট দিয়া তোকে পাল্কী করিয়া দিতে বলিস্।—সন্তান বলিয়া মনে করিস্।"

অধিকারী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন। কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন।

———

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজপথে

"—There—now lean on me,
Place your foot here—"

—*Manfred*.

নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারীর প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইলেন। অর্থের অপ্রাচুর্য হেতু স্বয়ং পদব্রজে চলিলেন। নবকুমার পূর্বদিন পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, মধ্যাহ্নভোজনের পর বাহকেরা তাঁহাকে অনেক পশ্চাৎ করিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাও অতীত হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। নবকুমার কপাল-কুণ্ডলার সহিত একত্র হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মনে মনে স্থির-জ্ঞান ছিল যে, প্রথম সরাইতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন, কিন্তু সরাইও আপাততঃ দেখা যায় না। প্রায় রাত্রি চারি ছয় দণ্ড হইল। নবকুমার দ্রুতপাদবিক্ষেপ করিতে করিতে চলিলেন। অকস্মাৎ কোন কঠিন দ্রব্যে তাঁহার চরণস্পর্শ হইল। পদভরে সে বস্তু খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। নবকুমার দাঁড়াইলেন, পুনর্বার পদচালনা করিলেন, পুনর্বার ঐরূপ হইল। পদস্পৃষ্ট বস্তু হস্তে করিয়া তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, ঐ বস্তু তক্তাভাঙ্গার মত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও সচরাচর এমত অন্ধকার হয় না যে, অনাবৃত স্থানে স্থূল বস্তুর অবয়ব লক্ষ্য হয় না। সম্মুখে একটা বৃহৎ বস্তু পড়িয়া ছিল, নবকুমার অনুভব করিয়া দেখিলেন যে, সে ভগ্ন শিবিকা ; অমনি তাঁহার হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার বিপদ আশঙ্কা হইল। শিবিকার দিকে যাইতে আবার ভিন্ন-প্রকার পদার্থে তাঁহার পাদস্পর্শ হইল। এ স্পর্শ কোমল মনুষ্যশরীরস্পর্শের ন্যায় বোধ হইল। বসিয়া হাত বুলাইয়া দেখিলেন, মনুষ্যশরীর বটে। স্পর্শ অত্যন্ত শীতল, তৎসঙ্গে দ্রব পদার্থের স্পর্শ অনুভূত হইল। নাড়ীতে হাত দিয়া

দেখিলেন, স্পন্দ নাই, প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন, যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। নিশ্বাস আছে, তবে নাড়ী নাই কেন? এ কি রোগী? নাসিকার নিকট হাত দিয়া দেখিলেন নিশ্বাস বহিতেছে না। তবে শব্দ কেন? হয়ত কোন জীবিত ব্যক্তিও এখানে আছে, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছে?

মৃদুস্বরে এক উত্তর হইল, "আছি।"

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "তুমি কে?" নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রীকণ্ঠজাত বোধ হইল ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কপালকুণ্ডলা না কি?"

স্ত্রীলোক কহিল, "কপালকুণ্ডলা কে, তা জানি না—আমি পথিক আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।"

ব্যঙ্গ শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন "কি হইয়াছে?

উত্তরকারিণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমার ক বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে, আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

নবকুমার অন্ধকারে অনুধাবন করিয়া দেখিলেন, যথার্থই একটি স্ত্রীলো শিবিকাতে বস্ত্রদ্বারা দৃঢ় বন্ধনযুক্ত আছে। নবকুমার শীঘ্রহস্তে তাহার বন্ধ মোচন করিয়া কহিলেন, "তুমি উঠিতে পারিবে কি?" স্ত্রীলোক কহি "আমাকেও এক ঘা লাঠি লাগিয়াছিল, এজন্য পায়ে বেদনা আছে, কিন্তু বো হয়, অল্প সাহায্য করিলে উঠিতে পারিব।"

নবকুমার হাত বাড়াইয়া দিলেন। রমণী তৎসাহায্যে গাত্রোত্থান করিলেন নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চলিতে পারিবে কি?"

স্ত্রীলোক উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পশ্চাতে যে পথিক আসিতেছে দেখিয়াছেন?"

নবকুমার কহিলেন, "না।"

স্ত্রীলোক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চটি কত দূর?"

নবকুমার কহিলেন, "কত দূর বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয় নিকট।"

স্ত্রীলোক কহিল, "অন্ধকারে একাকিনী মাঠে বসিয়া কি করিব, আপনা সঙ্গে চটি পর্যন্ত যাওয়াই উচিত। বোধ হয় কোন কিছুর উপর ভর করি পারিলে, চলিতে পারিব।"

নবকুমার কহিলেন, "বিপৎকালে সঙ্কোচ মূঢ়ের কাজ। আমার কাঁধে ভর করিয়া চল।"

স্ত্রীলোকটি মূঢ়ের কার্য করিল না। নবকুমারের স্কন্ধেই ভর করিয়া চলিল।

যথার্থই চটি নিকটে ছিল। এ সকল কালে চটির নিকটেও দুষ্ক্রিয়া করিতে দস্যুরা সঙ্কোচ করিত না। অনধিক বিলম্বে নবকুমার সমভিব্যাহারিণীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

নবকুমার দেখিলেন যে, ঐ চটিতেই কপালকুণ্ডলা অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার দাসদাসী তজ্জন্য একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়াছিল। নবকুমার স্বীয় সঙ্গিনীর জন্য তৎপার্শ্ববর্তী একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাঁহার আজ্ঞামত গৃহস্বামীর বনিতা প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। যখন দীপরশ্মিস্রোতঃ তাঁহার সঙ্গিনীর শরীরে পড়িল, তখন নবকুমার দেখিলেন যে, ইনি অসামান্যা সুন্দরী। রূপরাশিতরঙ্গে, তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পান্থনিবাসে

"কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা

—উদ্ধবদূত

যদি এই রমণী নির্দোষ সৌন্দর্যবিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, "পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী।" তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত! দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্বাঙ্গসুন্দরী নহেন; সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল।

ইনি যে নির্দোষসুন্দরী নহেন, তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইঁহার শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরোষ্ঠ কিছু চাপা; তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন।

শরীর মধ্যমাকার [illegible] হস্তপদ হৃদয়াদি সর্বাঙ্গ সুগোল, সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপীলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্র কৌমুদীর ন্যায়, কাহারও ঈষদারক্তবদনা উষার ন্যায়। ইহার বর্ণ এতদুভয়বর্জিত, সুতরাং ইহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা। "শ্যামা মা" বা "শ্যামসুন্দর" যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে। তপ্ত কাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী উষা যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসন্ত প্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচূতপল্লব বিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য সেই উজ্জ্বল শ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন। সেই সপ্তমীচন্দ্রাকৃতললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ মনে করুন; সেই পক্বচূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন; তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভব কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তিপ্রকাশ মাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখন বা লালসাবিস্ফারিত মদনরসে টলমলায়মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম মুখকান্তি-মধ্যে দুইটি অনির্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন তখন সহজেই বোধ হইত, ইনি রমণীকুলরাজ্ঞী।

সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্র মাসে নদী-জলের ন্যায়, ইহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল—উছলিয়া পড়িতেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবন

ভরে সর্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল ; বিনা বায়ুতে নব শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল ; সে চাঞ্চল্য মুহুর্মুহু নূতন নূতন শোভাবিকাশের কারণ। নবকুমার নিমেষশূন্যচক্ষে সেই নূতন নূতন শোভা দেখিতেছিলেন।

সুন্দরী, নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন, "আপনি কি দেখিতেছেন ? আমার রূপ ?"

নবকুমার ভদ্রলোক ; অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন,

"আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন ?"

সহজে এ কথা কহিলে তিরস্কারস্বরূপ বোধ হইত, কিন্তু রমণী যে হাসির সহিত বলিলেন, তাহাতে ব্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। নবকুমার দেখিলেন, এ অতি মুখরা ; মুখরার কথায় কেন না উত্তর করিবেন ? কহিলেন,

"আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।"

রমণী সগর্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটিও না ?"

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল ; তিনিও সগর্বে উত্তর করিলেন, "একটিও না, এমত বলিতে পারি না।"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিণী ?"

নব। কেন ? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ ?

স্ত্রী। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

নব। আমি বাঙ্গালী ; আপনিও ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন, আপনি তবে কোন্ দেশীয় ?

যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "অভাগিনী বাঙ্গালী নহে ; পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানী।" নবকুমার পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরিচ্ছদ পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে। কিন্তু বাঙ্গালা ত ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন,

"মহাশয় ! বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন—আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায় ?"

নবকুমার কহিলেন, "আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া, প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?"

নবকুমার বলিলেন, "নবকুমার শর্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুন্দরী সন্দর্শনে

"———ধর দেবি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ।"

—মেঘনাদবধ

নবকুমার গৃহস্বামিনীকে ডাকিয়া অন্য প্রদীপ আনিতে বলিলেন। অন্য প্রদীপ আনিবার পূর্বে একটি দীর্ঘনিশ্বাসশব্দ শুনিতে পাইলেন। প্রদীপ আনিবার ক্ষণেক পরে ভৃত্যবেশী একজন মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদেশিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,

"সে কি, তোমাদিগের এত বিলম্ব হইল কেন? আর সকলে কোথায়?"

ভৃত্য কহিল, "বাহকেরা সকলে মাতোয়ারা হইয়াছিল, তাহাদের গুছাইয়া আনিতে আমরা পাল্কীর পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। পরে ভগ্ন শিবিকা দেখিয়া এবং আপনাকে না দেখিয়া আমরা একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলাম। কেহ কেহ সেই স্থানে আছে; কেহ কেহ অন্যান্য দিকে আপনার সন্ধানে গিয়াছে। আমি এদিকে সন্ধানে আসিয়াছি।"

মতি কহিলেন, "তাহাদিগকে লইয়া আইস।"

নফর সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, বিদেশিনী কিয়ৎকাল করলগ্নকপোলা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নবকুমার বিদায় চাহিলেন। তখন মতি স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ববৎভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় অবস্থিতি করিবেন?"

নব। ইহারই পরের ঘরে।

মতি। আপনার সে ঘরের কাছে একখানি পাল্কী দেখিলাম, আপনার কি কেহ সঙ্গী আছেন?

"আমার স্ত্রী সঙ্গে।"

মতিবিবি আবার ব্যঙ্গের অবকাশ পাইলেন। কহিলেন, "তিনিই কি অদ্বিতীয়া রূপসী?"

নব। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

মতি। দেখা কি পাওয়া যায়?

নব। (চিন্তা করিয়া) ক্ষতি কি?

"তবে একটু অনুগ্রহ করুন। অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখিতে বড় কৌতুহল হইতেছে। আগরা গিয়া বলিতে চাহি, কিন্তু এখনই নহে—আপনি এখন যান। ক্ষণেক পরে আমি আপনাকে সংবাদ দিব।"

নবকুমার চলিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে অনেক লোকজন, দাসদাসী ও বাহক সিন্দুক ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। একখানি শিবিকাও আসিল। তাহাতে একজন দাসী। পরে নবকুমারের নিকট সংবাদ আসিল, "বিবি স্মরণ করিয়াছেন।"

নবকুমার মতিবিবির নিকট পুনরাগমন করিলেন। দেখিলেন, এবার আবার রূপান্তর। মতিবিবি পূর্বপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া স্বর্ণমুক্তাদিশোভিত কারুকার্য-যুক্ত বেশভূষা ধারণ করিয়াছেন। নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারে খচিত করিয়াছেন; যেখানে যাহা ধরে—কুন্তলে, কবরীতে, কপালে, নয়নপার্শ্বে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুযুগে সর্বত্র স্বর্ণমধ্য হইতে হীরকাদি রত্ন ঝলসিতেছে। নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল। প্রভূতনক্ষত্রমালাভূষিত আকাশের ন্যায়—মধুরায়ত শরীর সহিত অলঙ্কারবাহুল্য সুসঙ্গত বোধ হইল, এবং তাহাতে আরও সৌন্দর্যপ্রভা বর্ধিত হইল। মতিবিবি নবকুমারকে কহিলেন,

"মহাশয়, চলুন, আপনার পত্নীর নিকট পরিচিত হইয়া আসি।" নবকুমার বলিলেন "সেজন্য অলঙ্কার পরিবার প্রয়োজন ছিল না। আমার পরিবারের কোন গহনাই নাই।"

মতিবিবি। গহনাগুলি না হয়, দেখাইবার জন্য পরিয়াছি। স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে, সে না দেখাইলে বাঁচে না। এখন, চলুন।

নবকুমার মতিবিবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। যে দাসী শিবিকারোহণে আসিয়াছিল, সেও সঙ্গে চলিল। ইহার নাম পেষমন্।

কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়া ছিলেন। একটি ক্ষীণালোকে প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল ; মতিবিবি প্রথম যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন অধরপার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন সে হাসি-হাসি ভাব দূর হইল ; মতির মুখ গম্ভীর হইল ;—অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন না ;—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।

ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন। মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন, "ও কি হইতেছে ?" মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।

অলঙ্কার সমাবেশ সমাপ্ত হইলে, মতি নবকুমারকে কহিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন। এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না। পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাইতে পারিলাম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এইজন্য পরাইলাম। আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন।"

নবকুমার চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি! এ যে বহুমূল্য অলঙ্কার। আমি এ সব লইব কেন ?"

মতি কহিলেন, "ঈশ্বরপ্রসাদাৎ আমার আর আছে। আমি নিরাভরণ হইব না। ইহাকে পরাইয়া আমার যদি সুখবোধ হয়, আপনি কেন ব্যাঘাত করেন ?"

মতিবিবি ইহা কহিয়া দাসীসঙ্গে চলিয়া গেলেন। বিরলে আসিলে পেষমন্ মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল,

"বিবিজান! এ ব্যক্তি কে ?"

যবনবালা উত্তর করিলেন, "মেরা শৌহর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিবিকারোহণে

"——খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা
কুণ্ডল, নূপুর কাঞ্চী।"

—মেঘনাদবধ

গহনার দশা কি হইল, বলি শুন। মতিবিবি গহনা রাখিবার জন্য একটি রৌপ্যজড়িত হস্তিদন্তের কৌটা পাঠাইয়া দিলেন। দস্যুরা তাঁহার অল্প সামগ্রীই লইয়াছিল—নিকটে যাহা ছিল, তদ্ব্যতীত কিছুই পায় নাই।

নবকুমার দুই একখানি গহনা কপালকুণ্ডলার অঙ্গে রাখিয়া অধিকাংশ কৌটায় তুলিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে মতিবিবি বর্ধমানাভিমুখে, নবকুমার সপত্নীক সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে শিবিকাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে গহনার কৌটা দিলেন। বাহকেরা সহজেই নবকুমারকে পশ্চাৎ করিয়া চলিল। কপালকুণ্ডলা শিবিকাদ্বার খুলিয়া চারি দিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। একজন ভিক্ষুক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, ভিক্ষা চাইতে চাইতে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার ত কিছুই নাই, তোমাকে কি দিব?"

ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে দুই একখানা অলঙ্কার ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিল, "সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা মুক্তা—তোমার কিছুই নাই?"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?"

ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত। ক্ষণমাত্র পরে কহিল, "হই বই কি।"

কপালকুণ্ডলা অকপটহৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন।

ভিক্ষুক ক্ষণেক বিহ্বল হইয়া রহিল। দাসদাসী কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। ভিক্ষুকের বিহ্বলভাব ক্ষণিকমাত্র। তখনই এদিক ওদিক চাহিয়া গহনা লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বদেশে

"শব্দখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ॥"

—মেঘদূত

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া স্বদেশে উপনীত হইলেন। নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা, তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা; কেন না তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।

অবস্থান্তরে নবকুমার অজ্ঞাতকুলশীলা তপস্বিনীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনায়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন কতদূর সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই। সকলেই তাঁহার প্রত্যাগমনপক্ষে নিরাশ্বাস হইয়াছিল। সহযাত্রীরা প্রত্যাগমন করিয়া রটনা করিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন যে, এই সত্যবাদীরা আত্মপ্রতীতি মতই কহিয়াছিলেন;—কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে তাহাদিগের কল্পনাশক্তির অবমাননা করা হয়। প্রত্যাগত যাত্রীর মধ্যে অনেকে নিশ্চিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রমুখে পড়িতে তাঁহারা প্রত্যক্ষই দৃষ্টি করিয়াছিলেন।—কখনও কখনও ব্যাঘ্রটার পরিমাণ লইয়া তর্ক বিতর্ক হইল; কেহ বলিলেন. "ব্যাঘ্রটা আট হাত হইবেক—," কেহ কহিলেন, "না, প্রায় চৌদ্দ হাত।" পূর্বপরিচিত প্রাচীন যাত্রী কহিলেন, "যাহা হউক, আমি বড় রক্ষা পাইয়াছিলাম। ব্যাঘ্রটা আমাকে অগ্রে তাড়া করিয়াছিল, আমি পলাইলাম; নবকুমার তত সাহসী পুরুষ নহে; পলাইতে পারিল না।"

যখন এই সকল রটনা নবকুমারের মাতা প্রভৃতির কর্ণগোচর হইল, তখন পুরমধ্যে এমত ক্রন্দনধ্বনি উঠিল যে, কয়দিন তাহার ক্ষান্তি হইল না। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নবকুমারের মাতা একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। এমত সময়ে

যখন নবকুমার সস্ত্রীক হইয়া বাটী আগমন করিলেন, তখন তাঁহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন্ জাতীয়া বা কাহার কন্যা? সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল। নবকুমারের মাতা মহাসমাদরে বধূবরণ করিয়া গৃহে লইলেন।

যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল। অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই;—অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্যন্তও বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই; পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেরূপ দুর্দম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

এই প্রেমাবির্ভাব সর্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপাল-কুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনা-প্রসঙ্গে কপালকুণ্ডার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনা-প্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; সর্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত। তাঁহার প্রকৃতি পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাপল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য জন্মিল; যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল। নবকুমারের মুখ সর্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল; মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্মের জন্য মাত্র সৃষ্টা বোধ হইতে লাগিল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে!

আর কপালকুণ্ডলা? তাহার কি ভাব? চল পাঠক, তাহাকে দর্শন করি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অবরোধে

"কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে॥"

—কুমারসম্ভব

সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত; কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন-সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলি নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু নগরের অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের এক নির্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না; রাজপথ সকল লতা-গুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহটি ইষ্টকরচিত; দেশকাল বিবেচনা করিলে তাহাকে নিতান্ত সামান্য গৃহ বলা যাইতে পারিত না। দোতালা বটে, কিন্তু ভয়ানক উচ্চ নহে, এখন একতালায় সেরূপ উচ্চতা অনেক দেখা যায়।

এই গৃহের ছাদের উপরে দুইটি নবীনবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জন বটে। নিকটে, একদিকে নিবিড় বন, তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরের অসংখ্য সৌধমালা, নববসন্তপবনস্পর্শ-লোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা করিতেছে। অন্যদিকে, অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।

যে নবীনাদ্বয় প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে একজন চন্দ্ররশ্মিবর্ণাভা, অবিন্যস্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্ধলুক্কায়িতা। অপরা কৃষ্ণাঙ্গী; তিনি সুমুখী ষোড়শী, তাঁহার ক্ষুদ্র দেহ, মুখখানি ক্ষুদ্র, তাঁহার উপরার্ধে চারি দিক্ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুন্তলদাম বেড়িয়া পড়িয়াছে; যেন নীলোৎপলদলরাজি উৎপলমধ্যকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। নয়নযুগল বিস্ফারিত, কোমল-শ্বেতবর্ণ, সফরীসদৃশ; অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সঙ্গিনীর কেশতরঙ্গমধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে। পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন যে, চন্দ্ররশ্মিবর্ণ-শোভিনী কপালকুণ্ডলা; তাঁহাকে বলিয়া দিই, কৃষ্ণাঙ্গী তাঁহার ননন্দা শ্যামাসুন্দরী।

শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে কখন "বউ," কখন আদর করিয়া "বন" কখনও, "মৃণো"—সম্বোধন করিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলা নামটি বিকট বলিয়া, গৃহস্থেরা তাঁহার নাম মৃন্ময়ী রাখিয়াছিলেন, এইজন্যই "মৃণো" সম্বোধন। আমরাও এখন কখন কখন ইঁহাকে মৃন্ময়ী বলিব।

শ্যামাসুন্দরী একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

"বলে—পদ্মরাণি, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায়॥
ছি ছি—সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি—এ কি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পরপরশে সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥"

"তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি?"

মৃন্ময়ী উত্তর করিল, "কেন, কি তপস্যা করিতেছি?"

শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃন্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, "তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না?"

মৃন্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, "ভাল, আমার সাধটি পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?"

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না?

শ্যা। কেন? দেখিবি? যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

মৃন্ময়ী কহিলেন, "না।"

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

মৃ। তাতে কি।

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি,—

'বাঁধাব চুলের রাশ পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব জোড়া দুল॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভ'রে পান গুয়া,
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোনার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে।"

মৃন্ময়ী কহিলেন, 'ভাল, বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হলেম। চুল বাঁধিলাম, ভাল কাপড় পরিলাম, খোঁপায় ফুল দিলাম, কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম, কানে দুল দুলিল; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোনার পুত্তলি পর্যন্ত হইল। মনে কর, সকলই। তাহা হইলেই বা কি সুখ?"

শ্যা। বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ ?

মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি ?

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল; প্রভাতবাতাহত নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল; বলিলেন, "ফুলের কি ? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।"

শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "আচ্ছা,—তাই যদি না হইল ;—তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি ?"

মৃন্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্র-তীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে যে মৃন্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন; কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন, "এখন ফিরিয়া যাইবার উপায় ?"

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি ?

মৃ। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য মহাশয়! কি হইল ?"

মৃন্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে।"

শ্যামা। কেন কপালে আর কি আছে ? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন ?

মৃন্ময়ী কহিলেন, "শুন। যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মা'র পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম করিতাম না। যদি কর্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল; ভাল মন্দ জানিতে মা'র কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে, জানি না।"

মৃন্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূতপূর্বে

"কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ।"

—:

যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চটি হইতে যাত্রা করেন, তখন মতিবিবি পথান্তরে বর্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ মতিবিবি পথবাহন করেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত কিছু বলি। মতির চরিত্র মহাদোষ-কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত। এরূপ চরিত্রের বিস্তারিত বৃত্তান্তে পাঠক মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন না।

যখন ইঁহার পিতা মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বন করিলেন, তখন ইঁহার হিন্দুনাম পরিবর্তিত হইয়া লুৎফ-উন্নিসা নাম হইল। মতিবিবি কোন কালেও ইঁহার নাম নহে। তবে কখনও কখনও ছদ্মবেশে ভ্রমণকালে ঐ নাম গ্রহণ করিতেন। ইঁহার পিতা ঢাকায় আসিয়া রাজকার্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তথায় অনেক নিজদেশীয় লোকের সমাগম। দেশীয় সমাজে সমাজচ্যুত হইয়া সকলের থাকিতে ভাল লাগে না। অতএব তিনি কিছু দিনে সুবাদারের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তাঁহার সুহৃদ্‌ অনেকানেক ওমরাহের নিকট পত্রসংগ্রহপূর্বক সপরিবারে আগ্রায় আসিলেন। আকবরশাহের নিকট কাহারও গুণ অবিদিত থাকিত না; শীঘ্রই তিনি ইঁহার গুণগ্রহণ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসার পিতা শীঘ্রই উচ্চপদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরাহ মধ্যে গণ্য হইলেন। এদিকে লুৎফ-উন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্মসম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। লুৎফ-উন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দমবেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য সৎ,

এ কার্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন। যখন সৎকর্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম করিতেন; যখন অসৎকর্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম করিতেন; যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফ-উন্নিসাসম্বন্ধে জন্মিল। তাঁহার পূর্বস্বামী বর্তমান, ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না; তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কাণাকাণি, শেষে কালিমাময় কলঙ্ক রটিল। তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাহাদিগকে কৃপা বিতরণ করিতেন, তন্মধ্যে যুবরাজ সেলিম একজন। একজন ওমরাহের কুলকলঙ্ক জন্মাইলে, পাছে আপনার অপক্ষপাতী পিতার কোপানলে পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় সেলিম এ পর্যন্ত লুৎফ-উন্নিসাকে আপন অবরোধবাসিনী করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সুযোগ পাইলেন। রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী যুবরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যুবরাজ লুৎফ-উন্নিসাকে তাঁহার প্রধানা সহচরী করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।

লুৎফ-উন্নিসার ন্যায় বুদ্ধিমতী মহিলা যে অল্পদিনেই রাজকুমারের হৃদয়াধিকার করিবেন, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগিশূন্য হইয়া উঠিল যে, লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরানী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থির-প্রতিজ্ঞা হইল। কেবল লুৎফ-উন্নিসার স্থির-প্রতিজ্ঞা হইল, এমত নহে, রাজপুরবাসী সকলেরই উহা সম্ভব বোধ হইল। এইরূপ আশার স্বপ্নে লুৎফ-উন্নিসা জীবন বাহিত করিতেছিলেন, এমত সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আকবরশাহের কোষাধ্যক্ষ (আক্‌তিমাদ-উদ্দৌলা) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকুলে প্রধানা সুন্দরী। একদিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেইদিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেইদিন সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শের আফগান নামক একজন মহা বিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট যাচমান

হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তি সকল লুৎফ-উন্নিসার নখদর্পণে ছিল।—তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, শের আফগানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাঁহার নিস্তার নাই, আকবরশাহের মৃত্যু হইলেই তাঁহার প্রাণান্ত হইবে—মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হইবেন। লুৎফ-উন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেন।

মহম্মদীয় সম্রাট-কুলগৌরব আকবরের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। যে প্রচণ্ড সূর্যের প্রভায় তুরকী হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে সূর্য অস্তগামী হইল। এ সময়ে লুৎফ-উন্নিসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সংকল্প করিলেন।

রাজপুতপতি রাজা মানসিংহের ভগিনী সেলিমের প্রধানা মহিষী। খসরু তাঁহার পুত্র। একদিন তাঁহার সহিত আকবরশাহের পীড়িত শরীর সম্বন্ধে লুৎফ-উন্নিসার কথোপকথন হইতেছিল; রাজপুতকন্যা এক্ষণে বাদশাহপত্নী হইবেন, এই কথার প্রসঙ্গ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছিলেন, প্রত্যুত্তরে খসরুর জননী কহিলেন, "বাদশাহের মহিষী হইলে মনুষ্যজন্ম সার্থক বটে, কিন্তু যে বাদশাহ-জননী, সেই সর্বোপরি।" উত্তর শুনিবামাত্র এক অপূর্বচিন্তিত অভিসন্ধি লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে উদয় হইল। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাহাই হউক না কেন? সেও ত আপনার ইচ্ছাধীন।" বেগম কহিলেন, "সে কি?" চতুরা উত্তর করিলেন, "যুবরাজপুত্র খসরুকে সিংহাসন দান করুন।"

বেগম কোন উত্তর করিলেন না। সেদিন এ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হইল না, কিন্তু কেহই এ কথা ভুলিলেন না। স্বামীর পরিবর্তে পুত্র যে সিংহাসনারোহণ করেন, ইহা বেগমের অনভিমত নহে; মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ-উন্নিসার যেরূপ হৃদয়শেল, বেগমেরও সেইরূপ। মানসিংহের ভগিনী আধুনিক তুর্কমান-কন্যার যে আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া থাকিবেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? লুৎফ-উন্নিসারও এ সংকল্পে উদ্যোগিনী হইবার গাঢ় তাৎপর্য ছিল। অন্যদিন পুনর্বার এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। উভয়ের মত স্থির হইল।

সেলিমকে ত্যাগ করিয়া খসরুকে আকবরের সিংহাসনে স্থাপিত করা অসম্ভাবনীয় বোধ হইবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা লুৎফ-উন্নিসা বেগমকে

বিলক্ষণ হৃদয়ংগম করাইলেন। তিনি কহিলেন, "মোগলের সাম্রাজ্য রাজপুতের বাহুবলে স্থাপিত রহিয়াছে। সেই রাজপুত-জাতির চূড়া রাজা মানসিংহ, তিনি খসরুর মাতুল ; আর মুসলমানদিগের প্রধান খাঁ আজিম, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী, তিনি খসরুর শ্বশুর ; ইঁহারা দুই জনে উদ্যোগী হইলে কে ইঁহাদিগের অনুবর্তী না হইবে ? আর কাহার বলেই বা যুবরাজ সিংহাসন গ্রহণ করিবেন ? রাজা মানসিংহকে এ কার্যে ব্রতী করা আপনার ভার। খাঁ আজিম ও অন্যান্য মহম্মদীয় ওমরাহগণকে লিপ্ত করা আমার ভার। আপনার আশীর্বাদে কৃতকার্য হইব, কিন্তু এক আশঙ্কা, পাছে সিংহাসন আরোহণ করিয়া খসরু এ দুশ্চারিণীকে পুরবহিষ্কৃত করিয়া দেন।"

বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আগ্রার যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমার স্বামী পঞ্চ হাজারি মন্সবদার হইবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যদি রাজপুরীমধ্যে সামান্যা পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে হইল, তবে প্রতিপুষ্পবিহারিণী মধুকরীর পক্ষচ্ছেদন করিয়া কি সুখ হইল ? যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ ? তাহার অপেক্ষা কোন রাজপুরুষের সর্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়।

শুধু এই লোভে লুৎফ-উন্নিসা এ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।

খাঁ আজিম-প্রভৃতি আগ্রা-দিল্লীর ওমরাহেরা লুৎফ-উন্নিসার বিলক্ষণ বাধ্য ছিলেন। খাঁ আজিম যে জামাতার ইষ্টসাধনে উদ্যুক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তিনি এবং আর আর ওমরাহগণ সম্মত হইলেন। খাঁ আজিম লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন, "মনে কর, যদি কোন অনুযোগে আমরা কৃতকার্য না হই, তবে তোমার আমার রক্ষা নাই। এতএব প্রাণ বাঁচাইবার একটা পথ রাখা ভাল।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপনার কি পরামর্শ ?" খাঁ আজিম কহিলেন, "উড়িষ্যা ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই। কেবল সেই স্থানে মোগলের শাসন তত প্রখর নহে। উড়িষ্যার সৈন্য আমাদিগের হস্তগত থাকা আবশ্যক। তোমার ভ্রাতা উড়িষ্যায় মন্সবদার আছেন। আমি কল্য প্রচার করিব, তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিবার ছলে কল্যই উড়িষ্যায় যাত্রা কর। তথায় যৎকর্তব্য, তাহা সাধন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।"

লুৎফ-উন্নিসা এ পরামর্শে সম্মত হইলেন, তিনি উড়িষ্যায় আসিয়া যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিত পাঠকমহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পথান্তরে

"যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধ'রে।
বারেক নিরাশ হ'য়ে কে কোথায় মরে ;
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফল হলো, হতে পারে কাল॥"

—নবীন তপস্বিনী

যে দিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা বর্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সে দিন তিনি বর্ধমান পর্যন্ত যাইতে পারিলেন না। অন্য চটিতে রহিলেন। সন্ধ্যার সময়ে পেষমনের সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতেছিল, এমত কালে মতি সহসা পেষমন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেষমন্! আমার স্বামীকে কেমন দেখলে?"

পেষমন্ কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেমন আর দেখিব?" মতি কহিলেন, "সুন্দর পুরুষ বটে কি না?"

নবকুমারের প্রতি পেষমনের বিশেষ বিরাগ জন্মিয়াছিল! যে অলংকারগুলি মতি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলেন তৎপ্রতি পেষমনের বিশেষ লোভ ছিল; মনে মনে ভরসা ছিল, একদিন চাহিয়া লইবেন। সেই আশা নির্মূল হইয়াছিল, সুতরাং কপালকুণ্ডলা এবং তাঁহার স্বামী, উভয়ের প্রতি তাঁহার দারুণ বিরক্তি! অতএব স্বামিনীর প্রশ্নে উত্তর করিলেন, "দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিত কি?"

সহচরীর মনের ভাব বুঝিয়া মতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদি ওমরাহ হয়, তবে সুন্দর পুরুষ হইবে কিনা?"

পে। সে আবার কি?

মতি। কেন, তুমি জান না যে, বেগম স্বীকার করিয়াছেন যে, খসরু বাদশাহ হইলে আমার স্বামী ওমরাও হইবে?

পে। তা ত জানি, কিন্তু তোমার পূর্বস্বামী ওমরাহ হইবেন কেন ?

মতি। তবে আমার কোন্ স্বামী আছে ?

পে। যিনি নূতন হইবেন।

মতি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার ন্যায় সতীর দুই স্বামী, বড় অন্যায় কথা—ও কে যাইতেছে ?"

যাহাকে দেখিয়া মতি কহিলেন, "ও কে যাইতেছে ?" পেষমন্ তাহাকে চিনিল ; সে আগ্রানিবাসী, খাঁ আজিমের আশ্রিত ব্যক্তি। উভয়ে ব্যস্ত হইলেন। পেষমন্ তাহাকে ডাকিলেন। সে ব্যক্তি আসিয়া লুৎফ-উন্নিসাকে অভিবাদন-পূর্বক একখানি পত্র দান করিল ; কহিল, "পত্র লইয়া উড়িষ্যায় যাইতেছিলাম। পত্র জরুরী।"

পত্র পড়িয়া মতিবিবির আশা-ভরসা সকল অন্তর্হিত হইল। পত্রের মর্ম এই—

"আমাদিগের যত্ন বিফল হইয়াছে। মৃত্যুকালেও আকবরশাহ আপন বুদ্ধিবলে আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকে গতি হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাবলে কুমার সেলিম এক্ষণে জাহাঁগীর শাহ হইয়াছেন। তুমি খসরুর জন্য ব্যস্ত হইবে না। এই উপলক্ষে কেহ তোমার শত্রুতা সাধিতে না পারে, এমত চেষ্টার জন্য তুমি শীঘ্র আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে।"

আকবরশাহ যে প্রকারে এ ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে , এ স্থলে সে বিবরণের আবশ্যকতা নাই।

পুরস্কারপূর্বক দূতকে বিদায় করিয়া মতি পেষমন্‌কে পত্র শুনাইলেন। পেষমন্ কহিল, "এক্ষণে উপায় ?"

মতি। এখন আর উপায় নাই।

পে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল, ক্ষতিই কি ? যেমন ছিলে তেমনই থাকিবে, মোগল-বাদশাহের পুরস্ত্রীমাত্রেই অন্য রাজ্যের পাটরানী অপেক্ষাও বড়।

মতি। (ঈষৎ হাসিয়া) তাহা আর হয় না। আর সে রাজপুরে থাকিতে পারিব না। শীঘ্রই মেহের-উন্নিসার সহিত জাহাঁগীরের বিবাহ হইবে। মেহের-উন্নিসাকে আমি কিশোর বয়োবধি ভাল জানি ; একবার সে পুরবাসিনী হইলে সেই বাদশাহ হইবে। জাহাঁগীর বাদশাহ নামমাত্র থাকিবে। আমি যে তাহার সিংহাসনারোহণের পথরোধের চেষ্টা পাইয়াছিলাম, ইহা তাহার অবিদিত থাকিবে না। তখন আমার দশা কি হইবে ?

পেষমন্ প্রায় রোদনোন্মুখী হইয়া কহিল, "তবে কি হইবে ?"

মতি কহিলেন, "এক ভরসা আছে। মেহের-উন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্রতি কিরূপ? তাহার যে দার্ঢ্য তাহাতে যদি সে জাহাঁগীরের প্রতি অনুরাগিণী না হইয়া স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, তবে জাহাঁগীর শত শের আফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে কোন ভরসা নাই।"

পে। মেহের-উন্নিসার মন কি প্রকারে জানিবে?

মতি হাসিয়া কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসার অসাধ্য কি? মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী,—কালি বর্ধমান গিয়া তাহার নিকট দুইদিন অবস্থিতি করিব।"

পে। যদি মেহের-উন্নিসা বাদশাহের অনুরাগিণী হন, তাহা হইলে কি করিবে?

ম। পিতা কহিয়া থাকেন, "ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।"

উভয়ে ক্ষণেক নীরব্ হইয়া রহিলেন। ঈষৎ হাসিতে মতির ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। পেষমন্ জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিতেছ কেন?"

মতি কহিলেন, "কোন নূতন ভাব উদয় হইতেছে।"

পে। কি নূতন ভাব?

মতি তাহা পেষমন্‌কে বলিলেন না। আমরাও তাহা পাঠককে বলিব না। পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিনী-গৃহে

"শ্যামাদন্যো নহি নহি নহি প্রাণনাথো মমাস্তি।"

—উদ্ধবদূত

এ সময়ে শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্ধমানের কর্মাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

মতিবিবি বর্ধমানে আসিয়া শের আফগানের আলয়ে উপনীত হইলেন। শর আফগান সপরিবারে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে তথায় অবস্থিতি করাইলেন। খন শের আফগান এবং তাঁহার স্ত্রী মেহের-উন্নিসা আগ্রায় অবস্থিতি করিতেন,

তখন মতি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। মেহের-উন্নিসার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল, পরে উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্য প্রতিযোগিনী হইয়াছিলেন। এক্ষণে একত্র হওয়ায় মেহের-উন্নিসা মনে ভাবিতেছেন, 'ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব কাহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছেন? বিধাতাই জানেন, আর সেলিম জানেন, আর কেহ যদি জানে ত সে এই লুৎফ-উন্নিসা। দেখি, লুৎফ-উন্নিসা কি কিছু প্রকাশ করিবে না?' মতিবিবিরও মেহের-উন্নিসার মন জানিবার চেষ্টা।

মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধানা রূপবতী এবং গুণবতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৌন্দর্যে ইতিহাসকীর্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তাৎকালিক পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্যগীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া; কবিতা-রচনায় বা চিত্রলিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সরস কথা, তাঁহার সৌন্দর্য অপেক্ষা মোহময়ী ছিল। মতিও এ সকল গুণে হীনা ছিলেন না। অদ্য এই দুইটি চমৎকারিণী পরস্পরের মন জানিতে উৎসুক হইলেন।

মেহের-উন্নিসা খাসকামরায় বসিয়া তস্‌বীর লিখিতেছিলেন। মতি মেহের-উন্নিসার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্রলিখন দেখিতেছিলেন এবং তাম্বুল চর্বণ করিতেছিলেন। মেহের-উন্নিসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্র কেমন হইতেছে?" মতি-বিবি উত্তর করিলেন, "তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, ইহাই দুঃখের বিষয়।"

মেহে। তাই যদি সত্য হয় ত দুঃখের বিষয় কেন?

ম। অন্যের তোমার মত চিত্র-নৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত।

মেহে। কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।

মেহের-উন্নিসা এই কথা কিছু গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন।

ম। ভগিনি! আজ মনের স্ফূর্তির এত অল্পতা কেন?

মেহে। স্ফূর্তির অল্পতা কই? তবে যে তুমি আমাকে কাল প্রাতে ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাই বা কি প্রকারে ভুলিব? আর দুই দিন থাকিয়া তুমি কেনই বা চরিতার্থ না করিবে?

ম। সুখে কার অসাধ? সাধ্য হইলে আমি কেন যাইব? কিন্তু আমি পরের অধীন; কি প্রকারে থাকিব?

মেহে। আমার প্রতি তোমার ভালবাসা ত আর নাই, থাকিলে তুমি কোন মতে রহিয়া যাইতে। আসিয়াছ ত রহিতে পার না কেন?

ম। আমি ত সকল কথাই বলিয়াছি। আমার সহোদর মোগলসৈন্যে মন্সবদার—তিনি উড়িষ্যার পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া সংকটাপন্ন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহারই বিপৎসংবাদ পাইয়া বেগমের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। উড়িষ্যায় অনেক বিলম্ব করিয়াছি, এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তোমার সহিত অনেক দিন দেখা হয় নাই, এইজন্য দুই দিন রহিয়া গেলাম।

মেহে। বেগমের নিকট কোন্ দিন পৌঁছিবার কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছ?

মতি বুঝিলেন, মেহের-উন্নিসা ব্যঙ্গ করিতেছেন। মার্জিত অথচ মর্মভেদী ব্যঙ্গে মেহের-উন্নিসা যেরূপ নিপুণ, মতি সেরূপ নহেন। কিন্তু অপ্রতিভ হইবার লোকও নহেন। তিনি উত্তর করিলেন, "দিন নিশ্চিত করিয়া তিন মাসের পথ যাতায়াত করা কি সম্ভবে? কিন্তু অনেক কাল বিলম্ব করিয়াছি; আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ জন্মিতে পারে।"

মেহের-উন্নিসা নিজ ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ? যুবরাজের, না তাঁহার মহিষীর?"

মতি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "এ লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও? উভয়েরই অসন্তোষ হইতে পারে।"

মে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধরিতেছ না কেন? শুনিয়াছিলাম, কুমার সেলিম তোমাকে বিবাহ করিয়া খাসবেগম করিবেন; তাহার কত দূর?

ম। আমি ত সহজেই পরাধীনা। যে কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহা কেন নষ্ট করিব? বেগমের সহচারিণী বলিয়া অনায়াসে উড়িষ্যায় আসিতে পারিলাম, সেলিমের বেগম হইলে কি উড়িষ্যায় আসিতে পারিতাম?

মে। যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবে, তাহার উড়িষ্যায় আসিবার প্রয়োজন?

ম। সেলিমের প্রধানা মহিষী হইব, এমন স্পর্ধা কখনও করি না। এ হিন্দুস্থান দেশে কেবল মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত।

মেহের-উন্নিসা মুখ নত করিলেন। ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন, "ভগিনি! আমি এমত মনে করি না যে, তুমি আমাকে পীড়া দিবার জন্য এ কথা বলিলে, কি আমার মন জানিবার জন্য বলিলে। কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে শের আফগানের বনিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে শের আফগানের দাসী, তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না।"

লজ্জাহীনা মতি এ তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন না; বরং আরও সুযোগ পাইলেন। কহিলেন, "তুমি যে পতিগতপ্রাণা, তা আমি বিলক্ষণ জানি। সেই জন্যই ছলক্রমে একথা তোমার সম্মুখে পাড়িতে সাহস করিয়াছি। সেলিম যে এ পর্যন্ত তোমার সৌন্দর্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। সাবধান থাকিও।"

মে। এখন বুঝিলাম। কিন্তু কিসেব আশঙ্কা?

মতি কিঞ্চিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "বৈধব্যেব আশঙ্কা।"

এই কথা বলিয়া মতি মেহের-উন্নিসার মুখপানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভয় বা আহ্লাদের কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাইলেন না। মেহের-উন্নিসা সদর্পে কহিলেন, "বৈধব্যের আশঙ্কা! শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহে। বিশেষ আকবর বাদশাহের রাজ্যমধ্যে তাঁহার পুত্রও বিনাদোষে পরপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিস্তার পাইবেন না।"

ম। সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে,—আকবরশাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে?

মেহের-উন্নিসা আর কিছু শুনিলেন না। তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার মুখ নত করিলেন, লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ কেন?"

মেহের-উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?"

মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল, তিনি কহিলেন, "তুমি আজিও যুবরাজকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পার নাই?"

মেহের-উন্নিসা গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু শুন, ভগিনি! অকস্মাৎ মনের কপাট খুলিল; তুমি এ কথা শুনিলে; কিন্তু আমার শপথ, এ কথা যেন কর্ণান্তরে না যায়।"

মতি কহিল, "ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু যখন সেলিম শুনিবেন যে, আমি বর্ধমানে আসিয়াছিলাম, তখন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবেন যে, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল? তখন আমি কি উত্তর করিব?"

মেহের-উন্নিসা কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "এই কহিও যে, মেহের-উন্নিসা হৃদয়মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করিবে। কিন্তু কখন আপন কুলমান সমর্পণ করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখন দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামিহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।"

ইহা কহিয়া মেহের-উন্নিসা সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। মতিবিবি চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। কিন্তু মতিবিবিরই জয় হইল। মেহের-উন্নিসার চিত্তের ভাব মতিবিবি জানিলেন, মতিবিবির আশা-ভরসা মেহের-উন্নিসা কিছুই জানিতে পারিলেন না। যিনি পরে আত্মবুদ্ধিপ্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিতা হইলেন। ইহার কারণ, মেহের-উন্নিসা প্রণয়শালিনী, মতিবিবি এস্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা।

মনুষ্য-হৃদয়ের বিচিত্র গতি মতিবিবি বিলক্ষণ বুঝিতেন। মেহের-উন্নিসার কথা আলোচনা করিয়া তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, কালে তাহাই যথার্থীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অনুরাগিণী, অতএব নারীদর্পে এখন যাহাই বলুন, পথ মুক্ত হইলে মনের গতিরোধ করিতে পারিবেন না! বাদশাহের মনস্কামনা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন।

এ সিদ্ধান্তে মতির আশা-ভরসা সকলই নির্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে কি মতি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রসাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন, পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজনিকেতনে

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।"

—বীরাঙ্গনা কাব্য

মতি আগ্রায় উপনীতা হইলেন। আর তাঁহাকে মতি বলিবার আবশ্যক করে না। কয়দিনে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সকল একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছিল।

জাহাঁগীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জাহাঁগীর তাঁহাকে পূর্ববৎ সমাদর করিয়া, তাঁহার সহোদরের সংবাদ ও পথের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা যাহা মেহের-উন্নিসাকে বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইল। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর বর্ধমানের কথা শুনিয়া জাহাঁগীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেহের-উন্নিসার নিকট দুই দিন ছিলে বলিতেছ, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল ?" লুৎফ-উন্নিসা অকপটহৃদয়ে মেহের-উন্নিসার অনুরাগের পরিচয় দিলেন। বাদশাহ শুনিয়া নীরবে রহিলেন ; তাঁহার বিস্ফারিত লোচনে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহিল। •

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "জাহাঁপনা! দাসী শুভ সংবাদ দিয়াছে। দাসীর এখনও কোন পুরস্কারের আদেশ হয় নাই।"

বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন, "বিবি! তোমার আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত।"

লু। জাহাঁপনা! দাসীর কি দোষ ?

বাদ। দিল্লীর বাদশাহকে তোমার গোলাম করিয়া দিয়াছি ; আরও পুরস্কার চাহিতেছ ?

লুৎফ-উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের অনেক সাধ।"

বাদ। আবার কি সাধ হইয়াছে ?

লু। আগে রাজাজ্ঞা হউক যে, দাসীর আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

বাদ। যদি রাজকার্যে বিঘ্ন না হয়।

লু। (হাসিয়া) একের জন্য দিল্লীশ্বরের কার্যের বিঘ্ন হয় না।

বাদ। তবে স্বীকৃত হলাম ;—সাধটি কি শুনি ?

লু। সাধ হইয়াছে, একটি বিবাহ করিব।

জাহাঁগীর উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ নূতনতর সাধ বটে। কোথাও সম্বন্ধের স্থিরতা হইয়াছে ?

লু। তা হইয়াছে। কেবল রাজাজ্ঞার অপেক্ষা। রাজার সম্মতি প্রকাশ না হইলে কোন সম্বন্ধ স্থির নহে।

বাদ। আমার সম্মতির প্রয়োজন কি? কাহাকে এই সুখের সাগরে ভাসাইবে অভিপ্রায় করিয়াছ?

লু। দাসী দিল্লীশ্বরের সেবা করিয়াছে বলিয়া দ্বিচারিণী নহে। দাসী আপন স্বামীকেই বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিতেছে।

• বাদ। বটে! এ পুরাতন নফরের দশা কি করিবে?

লু। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসাকে দিয়া যাইব।

বাদ। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসা কে?

লু। যিনি হইবেন।

জাহাঁগীর মনে ভাবিলেন যে, মেহের-উন্নিসা যে দিল্লীশ্বরী হইবেন, তাহা লুৎফ-উন্নিসা ধ্রুব জানিয়াছেন। তৎকারণে নিজ মনোভিলাষ বিফল হইল বলিয়া রাজাবরোধ হইতে বিরাগে অবসর লইতে চাহিতেছেন।

এইরূপ বুঝিয়া জাহাঁগীর দুঃখিত হইয়া নীরবে রহিলেন। লুৎফা-উন্নিসা কহিলেন, "মহারাজের কি এ সম্বন্ধে সম্মতি নাই?"

বাদ। আমার অসম্মতি নাই। কিন্তু স্বামীর সহিত আবার বিবাহের আবশ্যকতা কী?

লু। কালক্রমে প্রথম বিবাহে স্বামী পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এক্ষণে জাহাঁপনার দাসীকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

বাদশাহ রহস্যে হাস্য করিয়া পরে গম্ভীর হইলেন। কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার যদি সেই প্রবৃত্তি হয়, তবে তদ্রূপই কর। কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য উভয়েই বিরাজ করে না? এক বৃন্তে দুটি ফুল ফোটে না?"

লুৎফ-উন্নিসা বিস্ফারিতচক্ষে বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে; কিন্তু এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না। আপনার রত্ন-সিংহাসনতলে কেন কণ্টক হইয়া থাকিব?"

লুৎফ-উন্নিসা আত্মমন্দিরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এরূপ মনোবাঞ্ছা যে কেন জন্মিল, তাহা তিনি জাহাঁগীরের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। অনুভবে যেরূপ বুঝা যাইতে পারে, জাহাঁগীর সেইরূপ বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলেন। নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিলেন না। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখনও তাঁহার মন মুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আত্মমন্দিরে

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ॥
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক॥"

—বিদ্যাপতি

লুৎফ-উন্নিসা আলয়ে আসিয়া প্রফুল্লবদনে পেষমন্‌কে ডাকিয়া বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণ-মুক্তাদি-খচিত বসন পরিত্যাগ করিয়া পেষমন্‌কে কহিলেন যে, "এই পোশাকটি তুমি লও।"

শুনিয়া পেষমন্ কিছু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পোশাকটি বহুমূল্যে সম্প্রতিমাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কহিলেন, "পোশাক আমায় কেন? আজিকার কি সংবাদ?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "শুভ সংবাদ বটে।"

পে। তা ত বুঝিতে পারিতেছি। মেহের-উন্নিসার ভয় কি ঘুচিয়াছে?

লু। ঘুচিয়াছে। এক্ষণে সে বিষয়ের কোন চিন্তা নাই।

পেষমন্ অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তবে এক্ষণে বেগমের দাসী হইলাম।"

লু। যদি তুমি বেগমের দাসী হইতে চাও তবে আমি মেহের-উন্নিসাকে বলিয়া দিব।

পে। সে কি? আপনি কহিতেছেন যে, মেহের-উন্নিসার বাদশাহের বেগম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

লু। আমি এমত কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই।

পে। চিন্তা নাই কেন? আপনি আগ্রায় একমাত্র অধীশ্বরী না হইলে যে সকলই বৃথা হইল।

লু। আগ্রার সহিত সম্পর্ক রাখিব না।

পে। সে কি? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার শুভ সংবাদটা তবে কি বুঝাইয়া বলুন।

লু। শুভ সংবাদ এই যে, আমি এ জীবনের মত আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম।

পে। কোথায় যাইবেন?

লু। বাঙ্গালায় গিয়া বাস করিব। পার যদি কোন ভদ্রলোকের গৃহিণী হইব

পে। এরূপ ব্যঙ্গ নূতন বটে, কিন্তু শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

লু। ব্যঙ্গ করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম। বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি।

পে। এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার জন্মিল?

লু। কুপ্রবৃত্তি নহে। অনেকদিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তি জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশ্যে এত দূর করিলাম, তাহার কোন্‌টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই ত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আমি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত জন্যও কখন সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ, আরও ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কিজন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন এক দিনের তরেও সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায়—প্রথমে নির্মল ক্ষীণ ধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে কেহ জানে না, আপনি আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায় তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়, কখনও আবার বায়ু বহে তরঙ্গ হয়, মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকত চর—মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায় কে বলিবে?

পে। আমি ইহার তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন?

লু। কেন হয় না, তা এত দিনে বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি।

পে। কি বুঝিয়াছ?

লু। আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ-রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি যদি, পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।

পে। এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকে ভালবাসিয়াছি?

পে। (চুপি চুপি) কাহাকেও না।

লু। তবে পাষাণী নই ত কি?

পে। তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন?

লু। মানস ত বটে। সেইজন্য আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পে। তারই বা প্রয়োজন কি? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে? এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহাকেই কেন ভাল বাস না? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্যে বল, যাহাতে বল, দিল্লীর বাদশাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে?

লু। আকাশে চন্দ্রসূর্য থাকিতে জল অধোগামী কেন?

পে। কেন?

লু। ললাটলিখন।

লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চরণতলে

"কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে।
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।"

—বীরাঙ্গনা কাব্য

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না—কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণকারী যথায় থাকুক না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তকোন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলিপরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অর্ধ হস্ত, এক হস্ত, দুই হস্ত পরিমিত হইল; তথাপি, যদি তাহাতে কাহারও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায় ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই,—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে,—চাহি কি, ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।

লুৎফ-উন্নিসার প্রণয় এইরূপ বাড়িয়াছিল। প্রথম একদিন অকস্মাৎ প্রণয় ভাজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয়সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন না কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তাহার পর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল। মূর্তিপ্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্তের ধর্ম এই যে, যে মানসিক কর্ম যত অধিকবার করা যায়, সে কর্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কর্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়; লুৎফ-উন্নিসা সেই মূর্তি অহরহঃ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজস্পৃহা-প্রবাহও দুর্নিবার্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহাসন-লালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথশর-সম্ভূত অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন সকল বিসর্জন দিয়া প্রিয়জন-সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন, সে প্রিয়জন নবকুমার।

এই জন্যই লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসার আশানাশিনী কথা শুনিয়াও অসুখী হয়েন নাই; এই জন্যই আগ্রায় আসিয়া সম্পদরক্ষায় কোন যত্ন পাইলেন না; এই জন্যই জন্মের মত বাদশাহের নিকট বিদায় লইলেন।

লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রামে আসিলেন। রাজপথের অনতিদূরে নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় আপন বাসস্থান করিলেন। রাজপথের পথিকেরা দেখিলেন, অকস্মাৎ এই অট্টালিকা সুবর্ণখচিতবসনভূষিত দাসদাসীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে হর্ম্যশয্যা অতি মনোহর। গন্ধদ্রব্য, গন্ধবারি, কুসুমদাম সর্বত্র আমোদ করিতেছে স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্তাদিখচিত গৃহশোভার্থ নানা দ্রব্য সকল স্থানেই আলো করিতেছে। এইরূপ সজ্জীভূত এক কক্ষে লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে বসিয়া

আছেন। পৃথগাসনে নবকুমার বসিয়া আছেন। সপ্তগ্রামে নবকুমারের সহিত লুৎফ-উন্নিসার আর দুই-একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাতে লুৎফ-উন্নিসার মনোরথ কতদূর সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অন্যকার কথায় প্রকাশ হইবে।

নবকুমার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তবে আমি এক্ষণে চলিলাম। তুমি আর আমাকে ডাকিও না।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "যাইও না। আর একটু থাক। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা সমাপ্ত করি নাই।"

নবকুমার আরও ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা কিছু বলিলেন না। ক্ষণেক পরে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি বলিবে?" লুৎফ-উন্নিসা কোন উত্তর করিলেন না—তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

নবকুমার ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধৃত করিলেন। নবকুমার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি, বল না?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব; কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী!"

নবকুমার কহিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধনসম্পদ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।"

যবনীজার! নবকুমার এ পর্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে, এই রমণী তাঁহার পত্নী। লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে রহিলেন। নবকুমার তাঁহার হস্ত হইতে বস্ত্রাগ্রভাগ মুক্ত করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা আবার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন,

"ভাল, সে যাউক! বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তিসকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাই না, একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃ পরিতৃপ্তি করিব।"

নব। তুমি যবনী—পরস্ত্রী—তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।

ক্ষণেক নীরব। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল। প্রস্তরময়ী মূর্তিবৎ নিস্পন্দ রহিলেন। নবকুমারের বস্ত্রাগ্রভাগ ত্যাগ করিলেন। কহিলেন, "যাও।"

নবকুমার চলিলেন। দুই চারি পদ চলিয়াছিলেন মাত্র, সহসা লুৎফ-উন্নিস

বাত্যোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাহু-লতায় চরণযুগল বদ্ধ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "নির্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।"

"এ জন্মে নহে।" লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন, "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।" মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া, নবকুমারের মুখপ্রতি অনিমিষ আয়ত চক্ষুঃ স্থাপিত করিয়া, রাজরাজ-মোহিনী দাঁড়াইলেন। যে অনবনমনীয় গর্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল; যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্য-শাসনকল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়দুর্বলদেহে সঞ্চারিত হইল। ললাটদেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দেখা দিল; জ্যোতির্ময় চক্ষুঃ রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল। স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।"

সেই কুপিতফণিনীমূর্তি প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবকুমার ভীত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসার অনির্বচনীয় দেহমহিমা এখন যেরূপ দেখিতে পাইলেন, সেরূপ আর কখনও দেখেন নাই। কিন্তু সে শ্রী বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী, দেখিয়া ভয় হইল। নবকুমার চলিয়া যান, তখন সহসা তাঁহার আর এক তেজোময়ী মূর্তি মনে পড়িল। একদিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমনই তাহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল; এমন ললাটে রেখাবিকাশ হইয়াছিল, এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল; এমনই মস্তক হেলিয়াছিল। বহুকাল সে মূর্তি মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িল। অমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল।

সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সংকুচিত স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি কে?"

যবনীর নয়নতারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন, "আমি পদ্মাবতী।"

উত্তর-প্রতীক্ষা না করিয়া লুৎফ-উন্নিসা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকুমারও অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া আপন আলয়ে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপনগর-প্রান্তে

"—I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat."

—*Macbeth*

কক্ষান্তরে গিয়া লুৎফ-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দুইদিন পর্যন্ত সেই কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন না। এই দুই দিনে তিনি নিজ কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিলেন। স্থির করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সূর্য অস্তাচলগামী। তখন লুৎফ-উন্নিসা পেষমনের সাহায্যে বেশভূষা করিতেছিলেন। আশ্চর্য বেশভূষা! রমণী-বেশের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। যে বেশভূষা করিলেন, তাহা মুকুরে দেখিয়া পেষমন্‌কে কহিলেন, "কেমন পেষমন্, আর আমাকে চেনা যায়?"

পেষমন্ কহিল, "কার সাধ্য?"

লু। তবে আমি চলিলাম। আমার সঙ্গে যেন কোন দাস-দাসী না যায়।

পেষমন্ কিছু সংকুচিতচিত্তে কহিল, "যদি দাসীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "কি?"

পেষমন্ কহিল, "আপনার উদ্দেশ্য কি?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ। পরে তিনি আমার হইবেন।"

পে। বিবি! ভাল করিয়া বিবেচনা করুন; সে নিবিড় বন, রাত্রি আগত; আপনি একাকিনী।

লুৎফ-উন্নিসা এ কথার উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। সপ্তগ্রামের যে জনহীন বনময় উপনগরপ্রান্তে নবকুমারের বসতি, সেইদিকে চলিলেন। তৎপ্রদেশে উপনীত হইতে রাত্রি হইয়া আসিল। নবকুমারের বাটীর অনতিদূরে এক নিবিড় বন আছে, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারে। তাহারই প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিছুকাল বসিয়া যে দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার অননুভূতপূর্ব সহায় উপস্থিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা যথায় বসিয়াছিলেন, তথা হইতে এক অনবরত সমানোচ্চারিত মনুষ্যকণ্ঠনির্গত শব্দ শুনিতে পাইলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন যে, বনমধ্যে একটি আলো দেখা যাইতেছে। লুৎফ-উন্নিসা সাহসে পুরুষের অধিক; যথায় আলো জ্বলিতেছে, সেই স্থানে গেলেন। প্রথমে বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন যে, যে আলো জ্বলিতেছিল, সে হোমের আলো; যে শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, সে মন্ত্রপাঠের শব্দ। মন্ত্রমধ্যে একটি শব্দ বুঝিতে পারিলেন, সে একটি নাম। নাম শুনিবামাত্র লুৎফ-উন্নিসা হোমকারীর নিকট গিয়া বসিলেন।

এক্ষণে তিনি তথায় বসিয়া থাকুন; পাঠক মহাশয় বহুকাল কপালকুণ্ডলার কোন সংবাদ পান নাই, সুতরাং কপালকুণ্ডলার সংবাদ আবশ্যক হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শয়নাগারে

"রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।"

—ব্রজাঙ্গনা কাব্য

লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী। যে দিন প্রদোষকালে লুৎফ-উন্নিসা কাননে, সে দিন কপালকুণ্ডলা অন্যমনে শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। পাঠক মহাশয় সমুদ্রতীরে আলুলায়িতকুন্তলা ভূষণহীনা যে কপালকুণ্ডলা দেখিয়াছেন, এ সে কপালকুণ্ডলা নহে। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে; স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে. এই ক্ষণে এই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল ভুজঙ্গের ব্যূহতুল্য আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে। বেণীরচনায়ও

শিল্পপারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। কুসুমদামও পরিত্যক্ত হয় নাই, চতুষ্পার্শ্বে কিরীটমণ্ডলস্বরূপ বেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেশের যে ভাগ বেণীমধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে মাথার উপরে সর্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণতরঙ্গরেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্ধলুক্কায়িত নহে; জ্যোতির্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে; কেবলমাত্র স্থানে স্থানে বন্ধনবিস্রংসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকগুচ্ছ, তদুপরি স্বেদবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বর্ণ সেই অর্ধপূর্ণশশাঙ্করশ্মিরুচির। এখন দুই কর্ণে হেমকর্ণভূষা দুলিতেছে; কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে। বর্ণের নিকট সে সকল ম্লান হয় নাই, অর্ধচন্দ্র-কৌমুদীবসনা ধরণীর অঙ্কে নৈশ কুসুমবৎ শোভা পাইতেছে। তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর; সে শুক্লাম্বর অর্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশ-মণ্ডলে আনবিড় শুক্ল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বর্ণ সেইরূপ চন্দ্রার্ধকৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশপ্রান্তে কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বসিয়া ছিলেন না; সখী শ্যামাসুন্দরী নিকটে বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পরস্পরের কথোপকথন হইতেছিল। তাহার কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "ঠাকুরজামাই আর কতদিন এখানে থাকিবেন?"

শ্যামা কহিলেন, "কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজ রাত্রে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া নাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে?"

ক। দিনে তুলিলে কেন হয় না?

শ্যা। দিনে তুলিলে ফল্‌বে কেন? ঠিক্ দুই প্রহর রাত্রে এলো চুলে তুলিতে হয়। তা ভাই, মনের সাধ মনেই রহিল।

ক। আচ্ছা, আমি ত আজ দিনে সে গাছ চিনে এসেছি, আর যে বনে হয়, তাও দেখে এসেছি। তোমাকে আজি আর যেতে হবে না, আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া আনিব।

শ্যা। এক দিন যা হইয়াছে, তা হইয়াছে। রাত্রে তুমি আর বাহির হইও না।

ক। সে জন্য কেন তুমি চিন্তা কর? শুনেছ ত, রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস। মনে ভেবে দেখ, যদি আমার সে অভ্যাস না থাকিত, তবে তোমার সঙ্গে আমার কখনও চাক্ষুষ হইত না।

শ্যা। সে ভয়ে বলি না, কিন্তু একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ-ঝির ভাল! দুই জনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা থাকিবে?

ক। ক্ষতিই কি? তুমিও কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?

শ্যা। আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বল্‌বে।

ক। বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।

শ্যা। তা ত হবে না—কিন্তু তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।

ক। এমন অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।

শ্যা। তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?

কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

ইহার পর আর কথা শ্যামাসুন্দরী ভাল বুঝিলেন না। আত্মকর্মে উঠিয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলা প্রয়োজনীয় গৃহকার্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহকার্য সমাধা করিয়া ওষধির অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। নিশা সজ্যোৎস্না। নবকুমার বহিঃপ্রকোষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, কপালকুণ্ডলা যে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাহা গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃন্ময়ীর হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি?"

নবকুমার কহিলেন, "কোথা যাইতেছ?" নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনামাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।"

নবকুমার পূর্ববৎ কোমল স্বরে কহিলেন, "ভাল, কালি ত একবার গিয়াছিলে। আজি আবার কেন?"

ক। কালি খুঁজিয়া পাই নাই, আজি আবার খুঁজিব।

নবকুমার অতি মৃদুভাবে কহিলেন, "ভাল, দিনে খুঁজিলেও ত হয়?" বকুমারের স্বর স্নেহপরিপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দিবসে ও ঔষধ ফলে না।"

নব। কাজই কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া াও। আমি ওষধি তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি ুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকে এলো চুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারে বঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন। নবকুমার আর াপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্বিতবচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, াচক্ষে দেখিয়া যাও।"

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশ্বাসসহকারে কপালকুণ্ডলার াত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাননতলে

" Tender is the night.
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no Light."

—*Keats.*

সপ্তগ্রামের এই ভাগ যে বনময়, তাহা পূর্বেই কতক কতক উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রামের কিছু দূরে নিবিড় বন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী এক সঙ্কীর্ণ বন্য পথে

ওষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ড-সকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ, লতা-সকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষ-পত্র সকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে। নীরবে লতা-গুল্মমধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। পশু পক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎ মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ, কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাতশব্দ; কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্র-মধ্যে উরগজাতীয় জীবের ক্বচিৎ গতিজনিত শব্দ, ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুররব। এমত নহে যে, একেবারে বায়ু বহিতেছিল না, মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ; একান্ত নিঃশব্দ বায়ু মাত্র; তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্বাগ্রভাগারূঢ় পত্রগুলি হেলিতেছিল; কেবলমাত্র আভূমিপ্রণত শ্যামা লতা দুলিতেছিল; কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কেলমাত্র তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।

কপালকুণ্ডলার সেইরূপ পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল; বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগরবারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালকমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল, অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন; সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল। কপালকুণ্ডলা পূর্বস্মৃতি সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন।

অন্যমনে যাইতে যাইতে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহা ভাবিলেন না। যে পথে যাইতেছিলেন, তাহা ক্রমে অগম্য হইয়া আসিল; বন নিবিড়তর হইল; মাথার উপর বৃক্ষশাখাবিন্যাসে চন্দ্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল; ক্রমে আর পথ দেখা যায় না। পথের অলক্ষ্যতায় প্রথমে কপালকুণ্ডলা চিন্তামগ্নতা হইতে উত্থিত হইলেন; ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এই নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে। লুৎফ-উন্নিসাও পূর্বে এই আলো দেখিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভয়হীনা, অথচ কৌতূহলময়ী। ধীরে ধীরে সেই দীপজ্যোতির অভিমুখে গেলেন। দেখিলেন, যথায় আলো জ্বলিতেছে, তথায় কেহ নাই। কিন্তু তাহার অনতিদূরে বননিবিড়তা হেতু দূর হইতে অদৃশ্য একটি ভগ্ন গৃহ আছে। গৃহটি ইষ্টকনির্মিত, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য, তাহাতে একটিমাত্র ঘর। সেই ঘর হইতে মনুষ্যকথোপকথনশব্দ নির্গত হইতেছিল। কপালকুণ্ডলা নিঃশব্দ-

পদক্ষেপে গৃহসন্নিধানে গেলেন। গৃহের নিকটবর্তী হইবামাত্র বোধ হইল, দুই জন মনুষ্য সাবধানে কথোপকথন করিতেছে। প্রথমে কথোপথন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে ক্রমে চেষ্টাজনিত কর্ণের তীক্ষ্ণতা জন্মিলে নিম্নলিখিত মত কথা শুনিতে পাইলেন।

একজন কহিতেছে, "আমার অভীষ্ট মৃত্যু, ইহাতে তোমার অভিমত না হয়, আমি তোমার সাহায্য করিব না; তুমিও আমার সহায়তা করিও না।"

অপর ব্যক্তি কহিল, "আমিও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি; কিন্তু যাবজ্জীবন জন্য ইহার নির্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু হত্যার কোন উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না; বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিব।"

প্রথমালাপকারী কহিল, "তুমি অতি অবোধ, অজ্ঞান। তোমায় কিছু জ্ঞানদান করিতেছি। মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। অতি গূঢ় বৃত্তান্ত বলিব; চতুর্দিক্ একবার দেখিয়া আইস, যেন মনুষ্যশ্বাস শুনিতে পাইতেছি।"

বাস্তবিক কপালকুণ্ডলা কথোপকথন উত্তমরূপে শুনিবার জন্য কক্ষপ্রাচীরের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরু শ্বাস বহিতেছিল।

সমভিব্যাহারীর কথায় গৃহমধ্যস্থ এক ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন, এবং আসিয়াই কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। কপালকুণ্ডলাও পরিষ্কার চন্দ্রালোকে আগন্তুক পুরুষের অবয়ব সুস্পষ্ট করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া ভীতা হইবেন, কি প্রফুল্লিতা হইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণবেশী; সামান্য ধুতি পরা; গাত্র উত্তরীয়ে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত। ব্রাহ্মণকুমার অতি কোমলবয়স্ক; মুখ-মণ্ডলে বয়শ্চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। মুখখানি পরম সুন্দর, সুন্দরী রমণীর মুখের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু রমণীদুর্লভ—তেজোগর্ববিশিষ্ট। তাঁহার কেশগুলি সচরাচর পুরুষদিগের কেশের ন্যায় ক্ষৌরকার্যাবশেষাত্মক মাত্র নহে, স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অচ্ছিন্নাবস্থায় উত্তরীয়প্রচ্ছন্ন করিয়া পৃষ্ঠদেশে, অংসে, বাহুদেশে, কদাচিৎ বক্ষে সংসর্পিত হইয়া পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, ঈষৎ স্ফীত, মধ্যস্থলে একমাত্র শিরাপ্রকাশশোভিত। চক্ষু দুটি বিদ্যুত্তেজঃপরিপূর্ণ। কোষশূন্য এক দীর্ঘ তরবারি হস্তে ছিল। কিন্তু এ রূপরাশিমধ্যে এক ভীষণ ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। হেমকান্ত বর্ণে যেন কোন করাল কামনার ছায়া পড়িয়াছিল। অন্তস্তল পর্যন্ত অন্বেষণক্ষম কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুণ্ডলার ভীতি সঞ্চার হইল।

উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। প্রথমে কপালকুণ্ডলা

নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন। কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করাতে আগন্তুক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

যদি এক বৎসর পূর্বে হিজলীর কিয়াবনে কপালকুণ্ডলার প্রতি এ প্রশ্ন হইত, তবে তিনি তৎক্ষণেই সঙ্গত উত্তর দিতেন। কিন্তু এখন কপালকুণ্ডলা কতক দূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন, সুতরাং সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে নিরুত্তর দেখিয়া গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন, "কপালকুণ্ডলা! তুমি রাত্রে এ নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য আসিয়াছ ?"

অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কপালকুণ্ডলা অবাক হইলেন, কিছু ভীতাও হইলেন। সুতরাং সহসা কোন উত্তর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

ব্রাহ্মণবেশী পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদিগের কথাবার্তা শুনিয়াছ ?"

সহসা কপালকুণ্ডলা বাক্‌শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ কাননমধ্যে তোমরা দুই জন এ নিশীথে কি কুপরামর্শ করিতেছিলে ?"

ব্রাহ্মণবেশী কিছু কাল নিরুত্তরে চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। যেন কোন নূতন ইষ্টসিদ্ধির উপায় তাঁহার চিত্তমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কপাল-কুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিলেন এবং হস্ত ধরিয়া ভগ্নগৃহ হইতে কিছুদূরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা অতি ক্রোধে হস্ত মুক্ত করিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণবেশী অতি মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলার কানের কাছে কহিলেন,

"চিন্তা কি ? আমি পুরুষ নহি।"

কপালকুণ্ডলা আরও চমৎকৃতা হইলেন। এ কথায় তাঁহার কতক বিশ্বাস হইল, সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হইল না। তিনি ব্রাহ্মণবেশধারিণীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ভগ্ন গৃহ হইতে অদৃশ্য স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কর্ণে কর্ণে কহিলেন, "আমরা যে কুপরামর্শ করিতেছিলাম, তাহা শুনিবে ? সে তোমারই সম্বন্ধে।"

কপালকুণ্ডলার আগ্রহ অতিশয় বাড়িল। কহিলেন, "শুনিব।

ছদ্মবেশিনী বলিলেন, "তবে যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করি, ততক্ষণ এইখানে প্রতীক্ষা কর।"

এই বলিয়া ছদ্মবেশিনী ভগ্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কপালকুণ্ডলা

কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছু ভয় জন্মিয়াছিল। এক্ষণে একাকিনী অন্ধকার বনমধ্যে বসিয়া থাকাতে উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। বিশেষ এই ছদ্মবেশী তাঁহাকে কি অভিপ্রায়ে তথায় বসাইয়া গেল, তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত সুযোগ পাইয়া আপনার মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। এদিকে ব্রাহ্মণবেশীর প্রত্যাগমনে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর বসিতে পারিলেন না। উঠিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল, কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর তিলার্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। শীঘ্রপদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময় যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। বনত্যাগ করিয়া পূর্ববর্ণিত ক্ষুদ্র বনপথে আসিয়া বাহির হইলেন। তথায় তাদৃশ অন্ধকার নহে; দৃষ্টিপথে মনুষ্য থাকিলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। অতএব দ্রুতপদে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্দ শুনিতে পাইলেন। আকাশ নীল কাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত চলিলেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণরবে প্রঘোষিত হইল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল, সেও যেন দৌড়িল, এমত শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্তী হইবার পূর্বেই প্রচণ্ড ঝটিকা-বৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গণভূমি পার হইয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল যেন প্রাঙ্গণভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতীর প্রবাসী সেই কাপালিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্নে

"I had a dream, which was not at all a dream",.

—*Byron.*

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন, ধীরে ধীরে পালঙ্কে শয়ন করিলেন। মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে? কপালকুণ্ডলার হৃদয়সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, কে তাহা গণিবে?

সে রাত্রে নবকুমার হৃদয়বেদনায় অন্তঃপুরে আইসেন নাই। শয়নাগারে একাকিনী কপালকুণ্ডলা শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। প্রলয়বায়ুতাড়িত বারিধারাপরিসিক্তি জটাজুটবেষ্টিত সেই মুখমণ্ডল অন্ধকার মধ্যেও চতুর্দিকে দেখিতে লাগিলেন; কপালকুণ্ডলা পূর্ববৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাপালিকের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; কাপালিক নিবিড় বনমধ্যে যে সকল পৈশাচিক কার্য করিতেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; তৎকৃত ভৈরবীপূজা, নবকুমারের বন্ধন এ সকল মনে পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিলেন। অদ্যকার রাত্রের সকল ঘটনা, মনোমধ্যে আসিতে লাগিল। শ্যামার ওষধিকামনা, নবকুমারের নিষেধ, তাঁহার প্রতি কপালকুণ্ডলার তিরস্কার, তৎপরে অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা, কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্যমধ্যে যে সহচর পাইয়াছিলেন, তাহার ভীমকান্তগুণময় রূপ; সকলই মনে পড়িতে লাগিল।

পূর্বদিকে উষার মুকুটজ্যোতিঃ প্রকটিত হইল, তখন কপালকুণ্ডলার অ[illegible] তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন তিনি যেন সেই পূর্বদৃষ্ট সাগরহৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত; তাহাতে বসন্ত রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে, নাবিকেরা ফুলের মাল গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধা-শ্যামের অনন্ত প্রণয়গীত করিতেছে। পশ্চিমগগন হইতে সূর্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণবৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মা রাত্রি হইল, সূর্য কোথায় গেল। স্বর্ণমেঘসকল কোথায় গেল। নিবিড়নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক্ নিরূপণ হ[illegible]

া। নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন দিকে বাহিবে, স্থিরতা পায় না। তাহারা গীত বন্ধ করিল, গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল। বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল; বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। তরঙ্গমধ্য হইতে একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বাম হস্তে তুলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরি ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?" অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী হইল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

ঘর্মাক্তকলেবরা হইয়া কপালকুণ্ডলা স্বপ্নোত্থিতা হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে—গবাক্ষ মুক্ত রহিয়াছে, তন্মধ্য দিয়া বসন্তবায়ুস্রোতঃ প্রবেশ করিতেছে; মন্দান্দোলিত বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণ কূজন করিতেছে। সেই গবাক্ষের উপর কতকগুলি মনোহর বন্য লতা সুবাসিত কুসুমসহিত দুলিতেছে। কপালকুণ্ডলা নারীস্বভাব বশতঃ লতাগুলি গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। তাহা সুশৃঙ্খল করিয়া বাঁধিতে তাহার মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির লইল। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর ছাত্র, পড়িতে পারিতেন। নিম্নোক্ত মত পাঠ করিলেন।

"অদ্য সন্ধ্যার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবা। তোমার নিজ সম্পর্কীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে, তাহা শুনিবে।

অহং ব্রাহ্মণবেশী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃতসংকেতে

-I will have grounds
More relative than this."

—*Hamlet.*

কপালকুণ্ডলা সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অনন্যচিন্তা হইয়া কেবল ইহাই বিবেচনা করিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ বিধেয় কি না। পতিব্রতা যুবতীর

পক্ষে রাত্রিকালে নির্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে সঙ্কোচ জন্মে নাই ; তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দুষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই—পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল ; বিশেষ ব্রাহ্মণবেশী, পুরুষ কি না, তাহাতে সন্দেহ। সুতরাং সে সঙ্কোচ অনাবশ্যক, কিন্তু এ সাক্ষাতে মঙ্গল, কি অমঙ্গল জন্মিবে, তাহাই অনিশ্চিত বলিয়া কপালকুণ্ডলা এতদূর সঙ্কোচ করিতেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণবেশীর কথোপকথন, পরে কাপালিকের দর্শন, তৎপরে স্বপ্ন, এই সকল হেতুতে কপালকুণ্ডলার নিজ অমঙ্গল যে অদূরবর্তী, এমত সন্দেহ প্রবল হইয়াছিল। সেই অমঙ্গল যে কাপালিকের আগমনসহিত সম্বন্ধমিলিত, এমত সন্দেহও অমূলক বোধ হইল না। এই ব্রাহ্মণবেশীকে তাহারই সহচর বোধ হইতেছে—অতএব তাহার সহিত সাক্ষাতে সেই আশঙ্কার বিষয়ীভূত অমঙ্গলে পতিত হইতে পারেন। সে ত স্পষ্টই বলিয়াছে যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই পরামর্শ হইতেছিল। কিন্তু এমতও হইতে পারে যে, ইহা হইতে তন্নিরাকরণ-সূচনা হইবে। ব্রাহ্মণকুমার এক ব্যক্তির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিল, সে ব্যক্তিকে এই কাপালিক বলিয়া বোধ হয়। সেই কথোপকথনে কাহারও মৃত্যুর সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছিল, নিতান্ত পক্ষে চিরনির্বাসন। সে কাহার? ব্রাহ্মণবেশী ত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই কুপরামর্শ হইতেছিল। তবে তাহারই মৃত্যু বা তাহারই চিরনির্বাসন কল্পনা হইতেছিল। হইলই বা; তারপর স্বপ্ন—সে স্বপ্নের তাৎপর্য কি? স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী মহাবিপত্তিকালে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্যেও তাহাই ফলিতেছে। ব্রাহ্মণবেশী সকল কথা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন, "নিমগ্ন কর।" কার্যেও কি সেইরূপ বলিবেন? না—না—ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাহার রক্ষাহেতু উপদেশ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন; তাঁহার সাহায্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইবেন। অতএব কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না, তাহাতে সন্দেহ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংস্রব নাই। কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তরূপরাশিদর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশ-

বনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানীভক্তিভাব-বিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন?

সন্ধ্যার পরে গৃহকর্ম কতক কতক সমাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা পূর্বমত বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কপালকুণ্ডলা যাত্রাকালে শয়নাগারে প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া গেলেন। তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল।

যাত্রকালে কপালকুণ্ডলা এক কথা বিস্মৃত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলেন? এই জন্য পুনর্বার লিপিপাঠের আবশ্যক হইল। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া যে স্থানে প্রাতে লিপি রাখিয়াছিলেন, সে স্থান অন্বেষণ করিলেন, সে স্থানে লিপি পাইলেন না। স্মরণ হইল যে, কেশবন্ধন সময়ে ঐ লিপি সঙ্গে রাখিবার জন্য কবরীমধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। অতএব কবরীমধ্যে অঙ্গুলি দিয়া সন্ধান করিলেন। অঙ্গুলিতে লিপি স্পর্শ না হওয়াতে কবরী আলুলায়িত করিলেন, তথাপি সে লিপি পাইলেন না। তখন গৃহের আন্যান্য স্থানে তত্ত্ব করিলেন। কোথাও না পাইয়া, পরিশেষে পূর্বসাক্ষাৎ স্থানেই সাক্ষাৎ সম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়া পুনর্যাত্রা করিলেন। অনবকাশপ্রযুক্ত সে বিশাল কেশরাশি পুনর্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, অতএব আজি কপালকুণ্ডলা অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্তিনী হইয়া চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহদ্বারে

"Stand you awhile apart.
Confine yourself but in a patient list."

—*Othello.*

যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলা গৃহকার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, তখন লিপি কবরীবন্ধনচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারেন নাই। নবকুমার তাহা দেখিয়াছিলেন। কবরী হইতে পত্র খসিয়া পড়িল দেখিয়া নবকুমার বিস্মিত হইলেন। কপালকুণ্ডলা কার্যান্তরে চলিয়া গেলে লিপি তুলিয়া বাহিরে গিয়া পাঠ করিলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া

একই সিদ্ধান্ত সম্ভবে। "যে কথা কাল শুনিতে চাহিয়াছিলে, সে কথা শুনিবে।" সে কি? প্রণয়-কথা? ব্রাহ্মণবেশী মৃন্ময়ীর উপপতি? যে ব্যক্তি পূর্বরাত্রের বৃত্তান্ত অনবগত, তাহার পক্ষে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্ভবে না।

পতিব্রতা স্বামীর সহগমনকালে, অথবা অন্য কারণে, যখন কেহ জীবিতে চিতারোহণ করিয়া চিতায় অগ্নি সংলগ্ন করে, তখন প্রথমে ধূমরাশি আসিয়া চতুর্দিক্ বেষ্টন করে, দৃষ্টিলোপ করে, অন্ধকার করে, পরে ক্রমে কাষ্ঠরাশি জ্বলিতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে নিম্ন হইতে সর্পজিহ্বার ন্যায় দুই একটি শিখা আসিয়া অঙ্গের স্থানে স্থানে দংশন করে; পরে সশব্দে অগ্নিজ্বালা চতুর্দিক্ হইতে আসিয়া বেষ্টন করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যাপিতে থাকে; শেষে প্রচণ্ডরবে অগ্নিরাশি গগনমণ্ডল জ্বালাময় করিয়া মস্তক অতিক্রমপূর্বক ভস্মরাশি করিয়া ফেলে।

নবকুমারের লিপি পাঠ করিয়া সেইরূপ হইল। প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা। মনুষ্যহৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একেবারে গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে। নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল; পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল; শেষে বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইতিপূর্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন, যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বন-ভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরানিবার্য বৃশ্চিকদংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি এক দিনের তরে সন্দেহকে স্থান দান করেন নাই। অদ্যও সন্দেহকে স্থান দিতেন না, কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যন্ত্রণার প্রথম বেগের শমতা হইলে, নবকুমার নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রোদন করিয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তখন তিনি কিংকর্তব্য সম্বন্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। আজি তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলা যখন সন্ধ্যার সময় বনাভিমুখে যাত্রা করিবেন, তখন গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিবেন, কপালকুণ্ডলার মহাপাপ প্রত্যক্ষীভূত করিবেন, তাহার পর এ জীবন বিসর্জন করিবেন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না;

আপনার প্রাণসংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন?—এ জীবনের দুর্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।

এই স্থির করিয়া কপালকুণ্ডলার বহির্গমন-প্রতীক্ষায় তিনি খড়কীদ্বারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। কপালকুণ্ডলা বহির্গতা হইয়া কিছু দূর গেলে নবকুমারও বহির্গত হইতেছিলেন; এমন সময়ে কপালকুণ্ডলা লিপির জন্য প্রত্যাবর্তন করিলেন, দেখিয়া নবকুমারও সরিয়া গেলেন। শেষে কপালকুণ্ডলা পুনর্বার বাহির হইয়া কিছু দূর গমন করিলে নবকুমার আবার তদনুগমনে বাহির হইতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, দ্বারদেশ আবৃত করিয়া এক দীর্ঘাকার মানুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কে সে ব্যক্তি, কেন দাঁড়াইয়া, জানিতে নবকুমারের কিছুমাত্র ইচ্ছা হইল না। তাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। কেবল কপালকুণ্ডলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য ব্যস্ত। অতএব পথমুক্তির জন্য আগন্তুকের বক্ষে হস্ত দিয়া তাড়িত করিলেন। কিন্তু তাহাকে সরাইতে পারিলেন না।

নবকুমার কহিলেন,—"কে তুমি? দূর হও—আমার পথ ছাড়।"

আগন্তুক কহিল, "কে আমি, তুমি কি চেন না?"

শব্দ সমুদ্রনাদবৎ কর্ণে লাগিল। নবকুমার চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, সে পূর্ব-পরিচিত জটাজুটধারী কাপালিক।

নবকুমার চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু ভীত হইলেন না। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল - কহিলেন,

"কপালকুণ্ডলা কি তোমার সহিত সাক্ষাতে যাইতেছে?"

কাপালিক কহিল, "না।"

জ্বালিতমাত্র আশার প্রদীপ তখনই নির্বাণ হওয়াতে নবকুমারের মুখ পূর্ববৎ মসীময় অন্ধকারাবিষ্ট হইল। কহিলেন, "তবে তুমি পথ মুক্ত কর।"

কাপালিক কহিল, "পথ মুক্ত করিতেছি, কিন্তু তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে—অগ্রে শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "তোমার সহিত আমার কি কথা? তুমি আবার আমার প্রাণনাশের জন্য আসিয়াছ। প্রাণ গ্রহণ কর, আমি এবার কোন ব্যাঘাত করিব না। তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। কেন আমি দেবতুষ্টির জন্য শরীর না দিলাম? এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিলাম। যে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল সেই আমাকে নষ্ট করিল। কাপালিক! আমাকে

এবার অবিশ্বাস করিও না। আমি এখনই আসিয়া তোমাকে আত্মসমর্পণ করিব।"

কাপালিক কহিল, "আমি তোমার প্রাণবধার্থ আসি নাই। ভবানীর তাহা ইচ্ছা নহে। আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা তোমার অনুমোদিত হইবে। বাটীর ভিতরে চল, আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "এক্ষণে নহে। সময়ান্তরে তাহা শ্রবণ করিব, তুমি এখন অপেক্ষা কর, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—সাধন করিয়া আসিতেছি।"

কাপালিক কহিল, "বৎস! আমি সকলই অবগত আছি, তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুসরণ করিবে, সে যথায় যাইবে, আমি তাহা অবগত আছি। আমি তোমাকে সে স্থানে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইব। যাহা দেখিতে চাহ, দেখাইব, এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ কর। কোন ভয় করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "আর তোমাকে আমার কোন ভয় নাই। আইস।"

এই বলিয়া নবকুমার কাপালিককে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসন দিলেন এবং স্বয়ংও উপবেশন করিয়া বলিলেন, "বল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুনরালাপে

"তদগচ্ছ সিদ্ধ্যৈ দেবকার্য্যম্।"

—কুমারসম্ভব

কাপালিক আসন গ্রহণ করিয়া দুই বাহু নবকুমারকে দেখাইলেন। নবকুমার দেখিলেন, উভয় বাহু ভগ্ন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে কাপালিক বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া পড়িয়া যান। পতনকালে দুই হস্তে ভূমি ধারণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে শরীর রক্ষা হইল বটে, কিন্তু দুইটি হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কাপালিক এ সকল বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট বিবরিত করিয়া কহিলেন, "বাহুদ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল

নির্বাহের কোন বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ইহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।"

পরে কহিতে লাগিলেন, "ভূপতিত হইয়াই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার করদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, আর আর অঙ্গ অভগ্ন আছে, এমত নহে, আমি পতনমাত্র মূর্ছিত হইয়াছিলাম। প্রথমে অবিচ্ছেদে অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম। পরে ক্ষণে সজ্ঞান, ক্ষণে অজ্ঞান রহিলাম। কয়দিন যে আমি এ অবস্থায় রহিলাম, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, দুই রাত্রি এক দিন হইবে। প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পুনরাবির্ভূত হইল। তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন ভবানী"—বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। "যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রুকুটি করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন; কহিতেছেন, 'রে দুরাচার! তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্বকৃত্য ফল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখন পূজা গ্রহণ করিব না।" তখন আমি রোদন করিয়া জননীর চরণে অবলুণ্ঠিত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার আমার পূজা করিও না।'

"কত দিনে বা কি প্রকারে আমি আরোগ্য প্রাপ্ত হইলাম, তাহা আমার বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। কালে আরোগ্য পাইয়া দেবীর আজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে, এই বাহুদ্বয়ে শিশুর বলও নাই। বাহুবল ব্যতীত যত্ন সফল হইবার নহে। অতএব ইহাতে একজন সহকারী আবশ্যক হইল। কিন্তু মনুষ্যবর্গ ধর্মে অল্পমতি—বিশেষ কলির প্রাবল্যে যবন রাজা, পাপাত্মক রাজশাসনের ভয়ে কেহই এমত কার্যে সহচর হয় না। বহু সন্ধানে আমি পাপীয়সীর আবাসস্থান জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু বাহুবলের অভাব হেতু ভবানীর আজ্ঞা পালন করিতে পারি নাই। কেবল মানসসিদ্ধির জন্য তন্ত্রের বিধানানুসারে ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকি মাত্র। কল্য রাত্রে নিকটস্থ বনে হোম করিতেছিলাম, স্বচক্ষে দেখিলাম, কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হইল। অদ্যও সে তাহার সাক্ষাতে যাইতেছে। দেখিতে চাও আমার সহিত আইস, দেখাইব।'

"বৎস! কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা—আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব। সেও তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী—তোমারও বধযোগ্যা, অতএব তুমি আমাকে সে সাহায্য প্রদান কর। এই অবিশ্বাসিনীকে ধৃত করিয়া আমার সহিত যজ্ঞস্থানে লইয়া চল। তথায় স্বহস্তে ইহাকে বলিদান কর। ইহাতে ঈশ্বরীর সমীপে যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার মার্জনা হইবে; পবিত্র কর্মে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হইলে, বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে; প্রতিশোধের চরম হইবে।"

কাপালিক বাক্য সমাপ্ত করিলেন। নবকুমার কিছুই উত্তর করিলেন না। কাপালিক তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা দেখিবে চল।"

নবকুমার ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সপত্নীসম্ভাষে

"Be at peace; it is your sister that addresses you.
Requite Lucretia's love.

—*Lucretia*

কপালকুণ্ডলা গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে ভগ্নগৃহমধ্যে গেলেন। তথায় ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। যদি দিনমান হইত, তবে দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার মুখকান্তি অত্যন্ত মলিন হইয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন যে, "এখানে কাপালিক আসিতে পারে, এখানে কোন কথা অবিধি। স্থানান্তরে আইস।" বনমধ্যে একটি অল্পায়ত স্থান ছিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরাজি; মধ্যে পরিষ্কার; তথা হইতে একটি পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে তথায় লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণবেশী কহিলেন,

"প্রথমতঃ আত্মপরিচয় দিই। কতদূর আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবে। যখন তুমি স্বামীর সঙ্গে হিজলী প্রদেশ হইতে আসিতেছিলে, তখন পথিমধ্যে রজনীযোগে এক যবনকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তোমার কি তাহা মনে পড়ে?"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যিনি আমাকে অলঙ্কার দিয়াছিলেন?"

ব্রাহ্মণবেশধারিণী কহিলেন, "আমিই সেই।"

কপালকুণ্ডলা অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বিস্ময় দেখিয় কহিলেন, "আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে—আমি তোমার সপত্নী।"

কপালকুণ্ডলা চমৎকৃত হইয়া কহিলেন,—"সে কি?"

লুৎফ-উন্নিসা তখন আনুপূর্বিক আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন। বিবাহ, জাতিভ্রংশ, স্বামী কর্তৃক ত্যাগ, ঢাকা, আগ্রা, জাহাঁগীর, মেহের-উন্নিসা, আগ্রা-ত্যাগ, সপ্তগ্রামে বাস, নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ, নবকুমারের ব্যবহার, গত দিবস প্রদোষে ছদ্মবেশে কাননে আগমন, হোমকারীর সহিত সাক্ষাৎ, সকলই বলিলেন। এই সময় কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাদের বাটীতে ছদ্মবেশে আসিতে বাসনা করিয়াছিলে?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে।"

কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ করিতে?"

লুৎফ-উন্নিসা। আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া দিতাম। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি, সে পথ ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যদি আমার পরামর্শমতে কাজ কর, তবে তোমা হইতেই আমার কামনা সিদ্ধ হইবে—অথচ তোমার মঙ্গল সাধন হইবে।

কপা। হোমকারীর মুখে তুমি কাহার নাম শুনিয়াছিলে?

লু। তোমারই নাম। তিনি তোমার মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনায় হোম করেন, ইহা জানিবার জন্য প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। যতক্ষণ না তাঁহার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ততক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলাম। হোমান্তে তোমার নামসংযুক্ত হোমের অভিপ্রায় ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তোমার অমঙ্গল সাধনেই হোমের প্রয়োজন। আমারও সেই প্রয়োজন। ইহাও তাঁহাকে জানাইলাম। তৎক্ষণাৎ পরস্পরের সহায়তা করতে বাধ্য হইলাম। বিশেষ পরামর্শ জন্য তিনি আমাকে ভগ্ন গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় আপন মনোগত ব্যক্ত করিলেন। তোমার মৃত্যুই তাঁহার অভীষ্ট। তাহাতে আমার কোন ইষ্ট নাই। আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি কিন্তু পাপের পথে আমার এতদূর অধঃপাত হয় নাই যে, আমি

নিরপরাধে বালিকার মৃত্যুসাধন করি। আমি তাহাতে সম্মতি দিলাম না। এই সময়ে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলে। বোধ করি কিছু শুনিয়া থাকিবে।

কপা। আমি ঐরূপ বিতর্কই শুনিয়াছিলাম।

লু। সে ব্যক্তি আমাকে অবোধ অজ্ঞান বিবেচনা করিয়া কিছু উপদেশ দিতে চাহিল। শেষটা কি দাঁড়ায়, ইহা জানিয়া তোমায় উচিত সংবাদ দিব বলিয়া তোমাকে বনমধ্যে অন্তরালে রাখিয়া গেলাম।

কপা। তারপর আর ফিরিয়া আসিলে না কেন?

লু। তিনি অনেক কথা বলিলেন, বাহুল্যবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিলম্ব হইল। তুমি সে ব্যক্তিকে বিশেষ জান। কে সে অনুভব করিতে পারিতেছ?

কপা। আমার পূর্বপালক কাপালিক।

লু। সেই বটে, কাপালিক প্রথমে তোমাকে সমুদ্রতীরে প্রাপ্তি, তথায় প্রতিপালন, নবকুমারের আগমন, তৎসহিত তোমার পলায়ন, এ সমুদয় পরিচয় দিলেন। তোমাদের পলায়নের পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহাও বিবৃত করিলেন। সে সকল বৃত্তান্ত তুমি জান না। তাহা তোমার গোচরার্থ বিস্তারিত বলিতেছি।

এই বলিয়া লুৎফ-উন্নিসা কাপালিকের শিখরচ্যুতি, হস্তভঙ্গ, স্বপ্ন, সকল বলিলেন। স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা বলিতে লাগিলেন,

"কাপালিকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভবানীর আজ্ঞা প্রতিপালন। বাহু বলহীন, এই জন্য পরের সাহায্য তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। আমাকে ব্রাহ্মণতনয় বিবেচনা করিয়া সহায় করিবার প্রত্যাশায় সকল বৃত্তান্ত বলিল। আমি এ পর্যন্ত এ দুষ্কর্মে স্বীকৃত হই নাই। এ দুর্বৃত্ত চিত্তের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ভরসা করি যে, কখনই স্বীকৃত হইব না। বরং এ সঙ্কল্পের প্রতিকূলতাচরণ করিব, এই অভিপ্রায়; সেই অভিপ্রায়েই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু এ কার্য নিতান্ত অস্বার্থপর হইয়া করি নাই। তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কর।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি করিব?"

লু। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।

কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?"

লু। বিদেশে—বহুদূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না; তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন,

"তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন-সম্পত্তি, দাস দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

লুৎফ-উন্নিসা চমৎকৃতা হইলেন, এরূপ আশু স্বীকারের কোন প্রত্যাশা করেন নাই। মোহিত হইয়া কহিলেন,"ভগিনি—চিরায়ুষ্মতী হও, আমার জীবনদান করিলে। কিন্তু আমি তোমাকে অনাথা হইয়া যাইতে দিব না। কল্য প্রাতে তোমার নিকট আমার একজন বিশ্বাসযোগ্যা চতুরা দাসী পাঠাইব। তাহার সঙ্গে যাইও। বর্ধমানে কোন অতি প্রধানা স্ত্রীলোক আমার সুহৃৎ।—তিনি তোমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা এবং কপালকুণ্ডলা এরূপ মনঃসংযোগ করিয়া কথাবার্তা কহিতে ছিলেন, যে সম্মুখবিঘ্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। যে বন্য পথ তাঁহাদিগের আশ্রয়স্থান হইতে বাহির হইয়াছিল, সে পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কাপালিক ও নবকুমার তাঁহাদিগের প্রতি যে করাল দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহা কিছুই দেখিতে পান নাই।

নবকুমার ও কাপালিক ইহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ততদূর হইতে তাহাদিগের কথোপকথনের মধ্যে কিছুই তদুভয়ের শ্রুতিগোচর হইল না। মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যদি সমদূরগামী হইত, তবে মনুষ্যের দুঃখস্রোত শমিত কি বর্ধিত হইত, তাহা কে বলিবে? সংসাররচনা অপূর্ব কৌশলময়।

নবকুমার দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা। যখন কপালকুণ্ডলা তাঁহার হয় নাই, তখনই সে কুন্তল বাঁধিত না। আবার দেখিলেন যে, সেই কুন্তলরাশি আসিয়া ব্রাহ্মণকুমারের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া তাঁহার অংসসংবিলম্বী-কেশ-

দামের সহিত মিশিয়াছে। কপালকুণ্ডলার কেশরাশি ঈদৃশ আয়তনশালী, এবং লঘু স্বরে কথোপকথনের প্রয়োজনে উভয়ে এরূপ সন্নিকটবর্তী হইয়া বসিয়া ছিলেন যে, লুৎফ-উন্নিসার পৃষ্ঠ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল। তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। দেখিয়া নবকুমার ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

কাপালিক ইহা দেখিয়া নিজ কটিবিলম্বী এক নারিকেলপাত্র বিমুক্ত করিয়া কহিল, "বৎস! বল হারাইতেছ, এই মহৌষধ পান কর, ইহা ভবানীর প্রসাদ। পান করিয়া বল পাইবে।"

কাপালিক নবকুমারের মুখের নিকট পাত্র ধরিল। তিনি অন্যমনে পান করিয়া দারুণ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। নবকুমার জানিতেন না যে, এই সুস্বাদু পেয় কাপালিকের স্বহস্তপ্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা। পান করিবামাত্র সবল হইলেন।

এ দিকে লুৎফ-উন্নিসা পূর্ববৎ মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলাকে কহিতে লাগিলেন,

"ভগিনি! তুমি যে কার্য করিলে, তাহার প্রতিশোধ করিবার আমার ক্ষমতা নাই, তবু যদি আমি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সে আমার সুখ। যে অলঙ্কারগুলি দিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াছি, তুমি দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছ। এক্ষণে নিকটে কিছুই নাই। কল্যকার অন্য প্রয়োজন ভাবিয়া কেশমধ্যে একটি অঙ্গুরীয় আনিয়াছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় সে পাপ প্রয়োজনসিদ্ধির আবশ্যক হইল না। এই অঙ্গুরীয়টি তুমি রাখ। ইহার পরে অঙ্গুরীয় দেখিয়া যবনী ভগিনীকে মনে করিও। আজি যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে, কহিও, লুৎফ-উন্নিসা দিয়াছে।" ইহা কহিয়া লুৎফ-উন্নিসা আপন অঙ্গুলি হইতে বহুধনে ক্রীত এক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলার হস্তে দিলেন। নবকুমার তাহাও দেখিতে পাইলেন; কাপালিক তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে কম্পমান দেখিয়া পুনরপি মদিরা সেবন করাইলেন। মদিরা নবকুমারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃতি সংহার করিতে লাগিল, স্নেহের অঙ্কুর পর্যন্ত উন্মূলিত করিতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন নবকুমার ও কাপালিক লুৎফ-উন্নিসার অদৃশ্য পথে কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহাভিমুখে

"No spectre greets me—no vain shadow this."

—*Wordsworth*

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন। লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্তিত হইল, তিনি আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জন কি জন্য? লুৎফ-উন্নিসার জন্য? তাহা নহে।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা-প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সংকোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্যে ভক্তি-প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন?

তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া তাহা বলি। এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল, ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?

যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতিরোধ করে? একবার বায়ুতাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চার নিবারণ করে? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতিস্থাপন করিবে? নবীন করিকরভ মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?

কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব? পঞ্চভূত লইয়া কি হইবে?" প্রশ্ন করিতেছিলেন, অথচ কোন নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। সংসারের অন্য কোন বন্ধন না থাকিলেও পঞ্চভূতের এক বন্ধন আছে!

কপালকুণ্ডলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন। যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।

যেন ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, "বৎসে! আমি পথ দেখাইতেছি।" কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিতমূর্তি! গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতস্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি ঝুলিতেছে—বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বলজ্বালাবিভাসিতলোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত। যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

কপালকুণ্ডলা উর্ধ্বমুখী হইয়া চলিলেন। সেই নবকাদম্বিনীসন্নিভ রূপ আকাশমার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখনও কপালমালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখনও নয়নপথে স্পষ্ট বিকশিত হয়। কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।

নবকুমার বা কাপালিক এ সব কিছুই দেখেন নাই। নবকুমার সুরাগরলপ্রজ্বলিতহৃদয়—কপালকুণ্ডলার ধীরপদক্ষেপে অসহিষ্ণু হইয়া সঙ্গীকে কহিলেন, "কাপালিক!"

কাপালিক কহিল, "কি?"

"পানীয়ং দেহি মে।"

কাপালিক পুনরপি তাঁহাকে সুরা পান করাইল।

নবকুমার কহিলেন, "আর বিলম্ব কি?"

কাপালিক উত্তর করিল, "আর বিলম্ব কি?"

নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, "কপালকুণ্ডলে!"

কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিতা হইলেন। ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপালকুণ্ডলা বলিয়া ডাকিত না। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। নবকুমার ও

কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রথমে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না—কহিলেন, "তোমরা কে? যমদূত?"

নবকুমার দৃঢ়মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন। কাপালিক করুণার্দ্র মধুময় স্বরে কহিলেন,

"বৎসে! আমাদিগের সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া কাপালিক শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; যথায় গগনবিহারিণী ভয়ংকরী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সংকেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ববৎ দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রেতভূমে

"বপুষা করণোজ্‌ঝিতনে সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
নন্থ তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চিরুপৈতি মেদিনীম্ ॥" — রঘুবংশ

চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। কাপালিক যথায় আপন পূজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলেন। সে গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকতভূমি। তাহারই সম্মুখে আরও বৃহত্তর দ্বিতীয় একখণ্ড সিকতাময় স্থান। সেই সৈকতে শ্মশানভূমি। উভয় সৈকতমধ্যে জলোচ্ছ্বাসকালে অল্প জল থাকে, ভাঁটার সময়ে জল থাকে না। এক্ষণে জল ছিল না। শ্মশানভূমির যে মুখ গঙ্গাসম্মুখীন, সেই মুখ অত্যুচ্চ; জলে অবতরণ করিতে গেলে একবারে উচ্চ হইতে অগাধ জলে পড়িতে হয়। তাহাতে আবার অবিরত বায়ুতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল; কখনও কখনও মৃত্তিকাখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত। পূজাস্থানে দীপ নাই—কাষ্ঠখণ্ড মাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল। বিশাল তরঙ্গিণীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্র মাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল; তাহার কারণে তরঙ্গাভিঘাত-

জনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল। শ্মশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে ক্বচিৎ ধ্বনি করিতেছিল।

কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত স্থানে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তন্ত্রাদির বিধানানুসারে পূজারম্ভ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন যে, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একটা জলপূর্ণ শ্মশানকলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়া ছিল—হতভাগার কেহ সৎকারও করে নাই। দুইজনেরই তাহাতে পদস্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন, নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন; চতুর্দিক্ বেড়িয়া শবমাংসভুক্ পশু-সকল ফিরিতেছিল; মনুষ্য দুইজনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল, কেহ আক্রমণ করিতে আসিল, কেহ বা পদশব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিষ্কম্প।

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় পাইতেছ?"

নবকুমারের মদিরার মোহ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। অতি গম্ভীর স্বরে নবকুমার উত্তর করিলেন,

"ভয়ে, মৃন্ময়ি? তাহা নহে।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কাঁপিতেছ কেন?"

এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে। কে জানিত যে, আসন্ন কালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?

নবকুমার কহিলেন, "ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, "কাঁদিবে কেন?" আবার সেই কণ্ঠ!

নবকুমার কহিলেন, "কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই—" বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। "তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

"মৃন্ময়ি!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদুস্বরে কহিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই।"

যখন এই কথা হইল, তখন উভয়ে একেবার জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কপালকুণ্ডলা অগ্রে, নদীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে এক পদ পরেই জল। এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল, কপালকুণ্ডলা একটা আড়রির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!"

নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, "চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃন্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ।—গৃহে চল।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব; আজি যাহাকে দেখিয়াছ,—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

"না—মৃন্ময়ি!—না—" এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না। চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোর রবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?

সমাপ্ত

কপালকুণ্ডলা

॥ আদি পর্ব ॥

• [ক] ॥ বঙ্কিম আবির্ভাবের পটভূমি ঃ সমাজ ও সাহিত্য ॥

বঙ্কিমচন্দ্র যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন বাংলাদেশে নবজাগৃতির কাল। প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণে তখন ঘোর সামাজিক বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। ইংরেজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করিবার প্রায় একশত বৎসর পর ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বাংলা দেশে নূতন গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ও প্রভাব দেখা গেল। আর তাহাকেই নবজাগরণ বলিয়া সকলে অভিহিত করিল। এই নবজাগরণের উৎসমুখ বাংলা দেশে হইলেও সেখানেই তাহা সীমাবদ্ধ রহিল না। দুই-দশ বছরের ব্যবধানে তাহা প্রায় সমগ্র ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই নবজাগরণের সঙ্গে প্রতীচ্যের রেনেসাঁর মূলগত প্রভেদ আছে। "প্রতীচ্যে এই রেনেসাঁর সঙ্গে আসিয়াছিল নব জাতীয়তা-বোধ, নব মানবতা-বাদ (humanism), জীবনের অপরিসীম বিস্তারের প্রতিফলন হিসাবেই কল্পনার অপরিমেয় বিস্তার।"* কিন্তু জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে এই দেশে ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিকাশের সমস্ত পথই ছিল রুদ্ধ। প্রথমত বাংলাদেশ তখন পরাধীন। "দ্বিতীয়ত ইংলণ্ডে এই রেনেসাঁর অর্থনৈতিক বনিয়াদ হইল তাহার ক্রম-বিস্তারশীল বহির্বাণিজ্য ও সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ এবং তাহার আনুষঙ্গিক হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (বণিক বা ব্যবসাদার) উদ্ভব। বাংলাদেশে এবং সারা ভারতের ব্রিটিশ প্রভুরা সামন্ততন্ত্রকেই মূলত বজায় রাখিয়াছিলেন এবং ভারতে বহির্বাণিজ্য ইংরেজের আমলে কখনই বিস্তারলাভ করে নাই। ইংরেজের তখন একমাত্র নীতি ছিল নির্মমভাবে শোষণ। "ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা যখন এই দেশে প্রথম আসেন তখন বাংলা ছিল 'inexhaustible riches'-এর দেশ। কিন্তু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি এবং লুণ্ঠনবৃত্তির ফলে সেই সম্পদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া দেশে দেখা দিল ব্রিটিশ সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ এবং নিদারুণ দারিদ্র্য। লর্ড কর্নওয়ালিশ বলিয়াছেন, "I am sorry to be obliged to say that agriculture and commerce have for many years been

gradually declining; and that at present, excepting the class of shroffs and Banyans, who reside almost entirely in great towns, the inhabitants of these provinces were advancing hastily to a general state of poverty and wretchedness." এই লুণ্ঠন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিন্তু কোন নিবিড় জাতীয়তাবোধ তখনো দেখা দেয় নাই। ইংরেজ তাহার এই এক তরফা লুণ্ঠনকেই সুসম্পন্ন করিবার জন্য এমন কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন যাহার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে বাংলাদেশের নবজাগরণের উৎস। বাস্তব জীবনে পদে পদে বঞ্চিত হইয়াও ভাব জীবনে বাঙালী সেদিন সোনার ফসল ফলাইয়াছিল।

ইংরেজরা গ্রাম-বাংলার স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিল এবং বাংলার ও পরে ভারতবর্ষের গ্রামগুলিকে ইংরেজের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির লেজুড়ে পরিণত করিয়া তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের কেন্দ্রে পরিণত করিল। "ইংরাজের চড়া দরে পণ্য বেচিবার ও কাঁচা মাল সস্তা দরে কিনিবার কেন্দ্র হইল এই গ্রামগুলি। অবশ্য এই গ্রামগুলি যে কোনো মহৎ জীবনযাত্রার আদর্শ ছিল তাহা নহে। জাতিভেদে খণ্ডিত, কূপমণ্ডুক, অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল, অত্যাচারী রাজা বাদশাদের সহজ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র এই গ্রামগুলি যে প্রাণচঞ্চল, প্রসারশীল, সৃষ্টিশীল, কর্মমুখর ছিল এ কথা কোনক্রমেই বলা চলে না।"

ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় গ্রাম-বাংলার পারিবারিক শিল্পগুলি ধ্বংস হইল। ফলে ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিচিত গ্রামগুলি মরিল। গ্রাম এবং কৃষিজীবনকে অবলম্বন করিয়া গ্রাম-বাংলার কৃষ্টি বিনষ্ট হইল। এমনকি যে সামন্ত ভূস্বামী গ্রাম-জীবনের কৃষ্টির পরিপোষক ছিল তাহারাও গ্রাম ছাড়িয়া শহরমুখী হইল। কৃষি-নির্ভর মানুষ চাকুরী-নির্ভর হইল। গ্রাম-জীবনের মানুষ শহর-জীবনে আসিয়া দু-পাতা ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজের অধীনে চাকুরী লইল। এই নূতন চাকুরীজীবী মানুষই মধ্যবিত্ত। ইংরেজ নিজের প্রয়োজনে এই শিক্ষিত মানুষের শ্রম সস্তায় ক্রয় করিয়া তাহাদের জন্য একটি নূতন শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি করিল। পরবর্তীকালে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ইংরেজদের উচ্চতর সভ্যতা ও সৃষ্টিশীল মননের সান্নিধ্যে আসিয়া অপেক্ষাকৃত আর্থিক সচ্ছলতার সুযোগে তাহাদের মানস-লোককে নূতনভাবে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল।

মিশনারীদের উদ্যোগে এ দেশে শিক্ষা-দীক্ষারও ক্রমশ অনুশীলন এবং

প্রসার হইতেছিল। অবশ্য প্রথম প্রথম তাহারা প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়াছিল। সাহেব চাকুরিয়াদের এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এদেশে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ব্যাপকতা লাভ করিল।

এই ইংরেজী শিক্ষিত এবং প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত মানুষ ইংরেজ-ঘেঁষা হইলেও তাঁহারাই হইলেন দেশপ্রেমিক। তাঁহারাই বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে নূতন আলোড়নের সৃষ্টি করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বাংলা ভাষার দৈন্য দেখিয়া ইংরেজীতেই সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করিলেন। "অর্থাৎ ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত বা দাশুরায়ের ভাষায় কবিতা লেখা যায় না বলিয়াই ইংরেজীতে লিখিতে হইতেছে; তাহা না হইলে আর সবই ত দেশেরই খাঁটি জিনিস।" তাহারা হয়ত ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে বাংলা ভুলিয়া যাইবার অপ-গৌরব বোধ করিয়াছিল তথাপি তাহারা সর্বাঙ্গীণ অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না; বরং প্রতীচ্য ভাবধারার মধ্যেই স্বদেশের দুরবস্থার প্রতিকার সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিল। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। যেমন রামমোহন, হেয়ার, মতিলাল শীল, কৃষ্ণমোহন, এমনকি পরে বিদ্যাসাগরও সমন্বয়ের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীরাও পরে এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এই সময়ে বাংলা সাহিত্যেও নূতন চেতনা এবং আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। "বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন।" ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়া প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে বাংলা গদ্যের বিকাশ এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা গেল। অবশ্য তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার মূলে ছিল প্রধানতঃ অনুবাদ। বাংলা গদ্য গঠনের এই প্রথম সূত্রপাতের মধ্যে ছিলেন একদিকে উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড, অন্যদিকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, রামরাম বসু এবং চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রভৃতি বিদেশী ও দেশী ভাষার পণ্ডিতগণ।

বাংলা গদ্যের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামমোহন ছিলেন সংস্কারপন্থী। সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা গদ্যেরও যথেষ্ট সংস্কার সাধন করিলেন। "বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম

লেখক যিনি আধুনিক অনুশীলিত মন লইয়া গদ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার গদ্য ললিত মধুর না হইলেও মননদীপ্ত ও ভাবের সমুন্নতিতে মর্যাদাময়।" "রামমোহন বাংলা গদ্যকে পরিণতির যে স্তরে লইয়া গিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা, পরিমিতিবোধ ও অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি প্রবাহ সঞ্চার করিয়া উহাকে পরিণতির এক উচ্চতর পর্যায়ে স্থাপিত করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার হাতেই গদ্যভাষা কৈশোরের অনিশ্চয়তা ও অস্থির গতি ছাড়াইয়া পূর্ণ সাহিত্যিক রূপের স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হইল। গদ্যের কাঠামো ও বাক্যের ভারসাম্য ও অন্তশ্চন্দস্থিরীকরণে তাঁহারই প্রভাব যে সর্বাধিক তাহা নিঃসন্দেহ।" প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ রামমোহন বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ পৃথক এক পথ গ্রহণ করিলেন। প্রথমতঃ ইঁহাদের ভাষা গুরুগম্ভীর সাহিত্যিক ভাষা হইতে শব্দে ও চালে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা চলিত ভাষার অনুগামী। মানবজীবনের কথ্য ভাষা যে সাহিত্যিক ভাষা হইতে পারে ইঁহাদের রীতি তাহাই প্রমাণ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর ও প্যারীচাঁদ মিত্রের এই গদ্যরচনাভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সৃষ্টিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। অবশ্য তাঁহার পূর্বেও বাঙলা সাহিত্যে এই উপন্যাস সৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা উপন্যাসের মূল খুঁজিতে গেলে তিনটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারার সন্ধান পাই। প্রথম ধারা হইতেছে লোকরঞ্জন নক্শা, যাহাতে টাইপ বিশেষের অল্পবিস্তর স্বরূপ-চিত্রণ আছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ায়ি, চণ্ডীমঙ্গলের ভারতচন্দ্রের ভাঁড়ু দত্ত, হীরা, প্যারীচাঁদের ঠকচাচা। এই ধারা যাহা বঙ্কিমের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' এবং 'ইন্দিরা'কে স্পর্শ করিয়াছে তাহার পরিণতি নাটক-প্রহসনে। কোন কোন আখ্যায়িকায় বা গল্পেও এই ধারার অনুসরণ পাই। যেমন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৫৫) "চরিত্রদর্শীর কথিত উপাখ্যান।"

দ্বিতীয় ধারা হইতেছে অদ্ভুতরসাত্মক উপকথা, আদি রসাত্মক পুরানো রোমান্টিক আখ্যায়িকা এবং নীতিমূলক কাহিনী। উইলিয়ম কেরীর সঙ্কলন 'ইতিহাস মালা'-র (১৮১২) কয়েকটি গল্পে এই ধারার সূত্রপাত। পরিণতি পাই এই বইগুলিতে—রামগতি ন্যায়রত্নের 'রোমাবতী' (? ১৮৬২), রামসদয় ভট্টাচার্যের 'অদ্ভুত উপন্যাস' (১৮৬১), হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয় বসন্ত' (১৭৮১ শকাব্দ), কেদারনাথ দত্তের 'নলিনীকান্ত' (১৮৫৮) ও 'প্রিয়ম্বদা' (১৮৫৫), জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পারিজাত বিকাশ' (১৮৬৩),

দ্বারকানাথ রায়ের 'সুশীল মন্ত্রী' (১৮৫৬), জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'বাসন্তিকা' (১৮৬০), কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলাঞ্জন' (১৮৬০), অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পুরঞ্জন' (১৮৬১), ইত্যাদি।

তৃতীয় ধারা হইতেছে ঐতিহাসিক কাহিনী। এগুলিতে কল্পনার খেলা কম। ইহার সূত্রপাত রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপি মালা'র (১৮০২) কয়েকটি আখ্যায়িকায়, এবং পরিণতি প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এ (১৮৬৯)।"

প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙলা গল্প-উপন্যাসের পথিকৃৎ। "বেতাল পঞ্চবিংশতি, তুতিনামা, আরব্য-উপন্যাস, গোলে-বকাওলি ইত্যাদির বাহিরেও যে গল্পরস থাকিতে পারে তাহা প্যারীচাঁদ দেখাইয়া দিলেন আলালের ঘরের দুলাল লিখিয়া।" "যদিচ কাহিনীর ধারাবাহিকতা উপন্যাসের মতই তবু বইটিকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলা চলে না কয়েকটি কারণে। প্রথমত, প্লট খাপছাড়া রকমের। দ্বিতীয়ত, মূল কাহিনী প্রায়ই অবান্তর ঘটনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়ত, অধিকাংশ ভূমিকা অপরিণত অস্ফুট অথবা ক্ষণিক। চতুর্থত, নারী ভূমিকাগুলি অত্যন্ত অবহেলিত। পঞ্চমত, সাধারণ উপন্যাসে অপেক্ষিত প্রণয়রস একেবারেই নাই। আলালের ঘরের দুলালকে কতকটা ডিকেন্সের 'পিক উইক্ পেপার্স'-এর মত চিত্রোপন্যাস বলা যাইতে পারে। এই ধরনের রচনার বৈশিষ্ট্য হইতেছে "এপিসোড" বা অবান্তর আখ্যান-গুলির মনোজ্ঞতা এবং ভূমিকা চিত্রগুলির বর্ণোজ্জ্বলতা।"

ইহা ছাড়া ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) এবং গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ' উপন্যাসখানিও উল্লেখযোগ্য। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এ দুইটি কাহিনী আছে—'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়'। "বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীতে যে অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের প্রভাব পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। শিবাজীর সঙ্গে জগৎ সিংহের বা ওসমানের কোনই মিল নাই বটে, তবে আয়েসা যে রোশেনারার আদর্শে গঠিত তাহা নিঃসন্দেহ। রামদাস স্বামীও অভিরাম স্বামীর আদর্শ। উভয়ত্রই নায়িকার অঙ্গুরীয় কাহিনীকে ঘুরাইয়াছে। আকারে অঙ্গুরীয়-বিনিময় বড় গল্পের মত, প্রকারে ইহাতে নভেলের সর্বাঙ্গীণতা আছে। ঐতিহাসিক পরিবেশও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। শুধু ভাষার কাঠিন্যে ও দ্রুত-বর্ণনার রসহীনতায় অঙ্গুরীয়-বিনিময় সাধারণ পাঠকের ভোজে লাগে নাই।" "বিজয়বল্লভের রচনারীতি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাসাগরী। উপন্যাসে এ রীতি একেবারেই অচল। তাই

বইটি ব্যর্থ হইয়াছে। বঙ্কিমের রচনায় বিজয়বল্লভের পরোক্ষ প্রভাব একটু যে নাই তাহা নয়। কপালকুণ্ডলার কাপালিকের উপর বিজয়বল্লভের বিন্ধ্যাচলগামী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের ছায়া পড়িয়াছে। বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন আর বিজয়বল্লভের স্বপ্ন একেবারে সম্পর্কবিরহিত নাও হইতে পারে। বিজয়বল্লভের পাঠক সেকালে অল্প ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণ তাহার প্রমাণ।”

ইংরেজী উপাখ্যান প্রভৃতির বহু অনুবাদ অনেককাল পূর্বেই শুরু হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েও কোন কমতি হয় নাই। তাহা ছাড়া হুতোম-প্যাঁচার নকশার অনুকরণে বটতলা হইতে অজস্র ইতর ধরনের ছোট ছোট পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়া অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠককে বেশ উত্তেজিত করিয়াছিল।

উনিশ শতকের এই সামাজিক এবং সাহিত্যিক পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনিই এ যুগের সাহিত্যগুরু। তাঁহার প্রতিভার অমরস্পর্শে বাঙালীর সবদিক আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কি ভাষা-সৃষ্টি, কি রোমান্টিক-উপন্যাস, কি সমালোচনা, কি হাস্যরস—বঙ্কিমচন্দ্র যে দিকেই হাত দিয়াছেন সেদিকেই তিনি নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে স্মরণীয় :

“বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্পভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়তপ্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন। তখন যে আরো কত কঠিন ছিল তাহা অবশ্য অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন

শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না, তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।"

[খ] ॥ বঙ্কিম আবির্ভাব ঃ জীবনী ॥

বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন চব্বিশ পরগনার কাঁটালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র ফার্সী ও ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম সময়ে তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। একবার তাঁহার জীবন বিপন্ন হইলে এক সন্ন্যাসীর কৃপায় তিনি বিপন্মুক্ত হন। পরে ঐ সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। "সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ পিতার বিপন্মুক্তির কাহিনী হইতেই আসিয়াছিল। শুধু আকর্ষণ বলিলেও ভুল হইবে। পিতার সন্ন্যাসী-প্রীতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র এত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসধর্মের অলৌকিকত্বে তাঁহার গভীর প্রত্যয় জন্মে। তাঁহার উপন্যাসাবলীতে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ" (দ্রঃ বঙ্কিম রচনাবলী—প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ)।

বঙ্কিমচন্দ্র যাদবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার মাতামহ বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ। বঙ্কিমচন্দ্রের আরো তিন ভ্রাতা ছিলেন—জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ, মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য।

জন্মের পর প্রথম ছয় বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় ছিলেন। শৈশবেই তিনি মেধাবী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন, "শুনিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।" কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের পাঁচ বৎসর বয়সেই 'হাতে খড়ি' হয়। তিনি কখনো গ্রাম্য-পাঠশালায় যান নাই। সেখানকার গুরুমহাশয় রামপ্রাণ সরকার বাড়ীতে তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

মেদিনীপুরেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। সেখানকার ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক এফ টীড এবং পরে সিনক্লেয়ারের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় ফিরিয়া আসেন। এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে একটি পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

কাঁটালপাড়ায় আসিয়া তিনি শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ নামক একজন খ্যাত-

মামা পণ্ডিতের নিকট অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতা শিখিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভাল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন-এর বহু কবিতা তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্রের বহির্বিভাগীয় খেলাধুলায় কোন আগ্রহ ছিল না। ইতিহাস অধ্যয়নে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঝোঁক ছিল।

মাত্র সাড়ে এগার বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের জুনিয়র বিভাগে প্রথম শ্রেণীর 'এ' সেকশানে ভর্তি হইলেন। তখন কলেজসমূহে কলেজ ও স্কুল দুইটি বিভাগ থাকিত। আবার স্কুল বিভাগ সিনিয়র এবং জুনিয়রে বিভক্ত ছিল। সিনিয়র অংশে তিনটি শ্রেণী এবং জুনিয়র অংশে চারিটি শ্রেণী। বঙ্কিমচন্দ্র এই কলেজে মোট প্রায় সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। "বঙ্কিমচন্দ্র পাঠে এতই অগ্রসর ছিলেন যে, ক্লাসের পড়া তাঁহার মোটেই পছন্দসই ছিল না। তিনি এই সময় পাঠ্যাতিরিক্ত পুস্তকাদি পড়িয়া জ্ঞান পিপাসা মিটাইতেন।" তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কলেজে তিনি একাধিক বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। ১৮৫৩ সনে 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ কবিতা-প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়া তিনি কুড়ি টাকা পুরস্কার লাভ করেন। হুগলী কলেজে পড়িবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের রচনার আদর্শে 'সংবাদ প্রভাকর' এবং 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'-এ গদ্য-পদ্য রচনা আরম্ভ করেন।

১৮৫৬, ১২ই জুলাই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আইন পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলেন। এই বৎসরই তাঁহার "ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বৎসর এপ্রিল মাসেই এনট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছিলেন কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশির কুমার ঘোষ ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ।

বিশ্ববিদ্যালয় পর বৎসরই (১৮৫৮) বি. এ. পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখনো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয় নাই। ১৮৬১ সন হইতে হইয়াছিল। বি. এ. পরীক্ষার্থী মোট তের জনের মধ্যে মাত্র দুইজন সেইবার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু।

১৮৫৮, ৬ই আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল তিনি সরকারী চাকুরি করিয়া ১৮৯১, ১৪ই সেপ্টেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তাঁহাকে নানাস্থানে ঘুরিতে হইয়াছিল। তখন তিনি সাধারণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধেও সত্যকার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি তখনকার দিনের প্রধান প্রগতিশীল মতবাদ কোঁৎ-প্রবর্তিত 'পজিটিভিজম্' বা হিতবাদ-এ অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়নিষ্ঠ দুঁদে ডেপুটি ছিলেন। প্রতিটি জায়গায় তিনি সুবিচারক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। "তখনকার দিনে পুলিশের অত্যাচার অনাচার ছিল সর্বজনবিদিত। এহেতু বঙ্কিমচন্দ্র পুলিশ সম্পর্কে সর্বদা সজাগ ছিলেন। তাঁহাদের আচরণে ব্যত্যয় দেখিলে তিনি কঠোর ভাষায় তাহার সমালোচনা করিতেন, অপরাধী পুলিশ কর্মচারীকে শাস্তি দিতেও তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না।" খুলনা মহকুমায় কর্মকালের সম্বন্ধে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'নববার্ষিকী'তে (১৮৬৭) উল্লেখ করিয়াছেন :

"এক বৎসরকাল নেগুঁয়ায় কার্য করিয়া ইনি খুলনায় বদলি হইলেন। এইস্থলে যে ইনি কিরূপ দক্ষতার স হত কার্য করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মরেলগঞ্জের মরেল সাহেবের দৌরাত্ম্য যে ইনি কি প্রকারে নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং কি প্রকারে যে ইঁহার প্রতাপের ভয়ে পলায়িত হিলি সাহেব ও অন্যান্য দুরাত্মা প্রজাপীড়ক কর্মচারীকে আসাম. বৃন্দাবন ও অন্যান্য স্থান হইতে ধৃত করিয়া আনিয়া দণ্ড দিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। এই মাত্র বলিলেই হইবে যে ইঁহার সময় হইতে খুলনায় পাঁচ থানার প্রজাগণ নির্ভীক হইয়াছিল—নীলকরগণ যে দেশের রাজা নহে তাহা জানিয়াছিল। সেই অবধি সুন্দরবনের অসংখ্য নদী দিয়া নির্ভয়ে নৌকা যাতায়াত করিতে লাগিল, দস্যুদল নির্মূল হইল, একে একে সকলকে ইনি কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন। দেশ-দেশান্তর—শ্রীহট্ট, সুধারাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা জিলার মাঝি মাল্লারা, তাহাদিগের এ উপকার কে করিল তাহার নাম জানিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মদক্ষতার জন্য তাঁহার উর্ধ্বতন সাহেব কর্মচারীরাও তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন। কর্মজীবনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব-শীল কাজ করিয়াছেন কিন্তু সাহেব না হওয়ায় তাহার যোগ্য পুরস্কার বা পদোন্নতি হয় নাই। এই কর্মজীবনেই তাঁহার সহিত দীনবন্ধু মিত্রের সাক্ষাৎ

পরিচয় হইয়াছিল। পরে তাঁহারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইয়া উঠিলেন। যশোরে থাকাকালীন ১৮৫৯ সনের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। ১৮৬০, জুন মাসে হালিসহরের বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়। তাঁহার এই জীবন সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মী দেবী সম্বন্ধে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :

"আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও কথা লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না।" (বঙ্কিম প্রসঙ্গ)

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১, ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহার দীর্ঘ কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৭, ৮ই এপ্রিল পরলোকগমন করেন। তাঁহার এই কর্ম-জীবন সম্বন্ধে ভূদেববাবু বলিতেন, "বঙ্কিমচন্দ্র এই চাকুরীর প্রধান অলঙ্কার। তথাপি এই স্বর্ণশৃঙ্খল ভূষিত দাসত্বের প্রতি তাঁহার বরাবর একটা ধিক্কার ছিল। নবীনচন্দ্র সেন, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহিত কথাবার্তায় তাঁহার মনোভাব বহুবার ব্যক্ত হইয়াছে।" [বঙ্কিমচন্দ্র : সাহিত্য সাধক চরিতমালা] দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার একদিকে সরকারী কর্ম আর অন্য-দিকে দেশহিত সমানে চলিয়াছে। সাহিত্য-সেবা তথা দেশহিত এবং সরকারী কার্যকে এ কারণ আলাদা করিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে বড়ই কঠিন ছিল।"

[গ] ॥ উপন্যাস-শিল্প প্রসঙ্গ ॥

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাধিক পরিচিতি ঔপন্যাসিক হিসাবে। তাঁহার পূর্বে এদেশীয় শিক্ষিত মানুষ ইংরেজী ভাষায়ই উপন্যাসের রস আস্বাদন করিতেন। বাংলা সাহিত্যে তখন যে গল্প-সাহিত্য ছিল তাহাকে তাঁহারা স্ত্রীলোক এবং অশিক্ষিত মানুষের উপযোগী বলিয়াই অবজ্ঞা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা উপন্যাসকে সেই অবজ্ঞার হাত হইতে রক্ষা করিলেন এবং তাহাকে অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যে শিক্ষিত মানুষের রুচিবেদ্য করিয়া তুলিলেন। শিক্ষিত সমাজ ইংরেজী ছাড়িয়া বাংলা উপন্যাস পড়িতে আগ্রহী হইলেন। সেইজন্য বঙ্কিমের উপন্যাস বিচারের পূর্বে এই উপন্যাস-শিল্পকে জানা প্রয়োজন।

সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস অপেক্ষাকৃত নূতন। অথচ অন্যান্য শাখা হইতে বর্তমানে তাহার প্রভাব অনেকগুণ বেশী। সেজন্য সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ অনেক সময় অতীতের গল্প-সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে ইহাকে যুক্ত করিয়া একটা প্রাচীন বংশ-মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অবশ্য তখন

তাঁহারা কথা-সাহিত্য এবং উপন্যাসকে একই শ্রেণীভুক্ত করিয়া ফেলেন। কথা সাহিত্য বলিতে আমরা বুঝি fiction এবং উপন্যাস বলিতে novel। মানুষের গল্প বলার ইতিহাস বহু প্রাচীনকালের। গদ্যে হউক পদ্যে হউক মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা গল্প রচনা করিয়াছে। ইহাকে সামগ্রিকভাবে কথা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উপন্যাস কথা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সেই হিসাবে আমরা অবশ্য উপন্যাসের পূর্বে সৃষ্ট সমগ্র গল্প-সাহিত্যকে তাহার পূর্বসূরী বলিতে পারি। নতুবা ইংরেজী সাহিত্যেও ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উপন্যাসের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাংলা সাহিত্যেও উপন্যাস বেশী দিনের নহে। অথচ এই দেশেও মানুষের সহজাত বৃত্তি হিসাবেই গল্প-প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপকথা, উপকথা, আখ্যায়িকা, মঙ্গলকাব্য, কাহিনী—নানাপ্রকারে এই প্রবাহ সমৃদ্ধ। 'আলাপিনী সম্প্রদায়ের' মুখে মুখেও কত কাহিনী রচিত হইয়াছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, চাহার দরবেশ, হাতেম-তাই, গোলেবকাওলি, কামিনীকুমার প্রভৃতি গল্পসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তথাপি এইগুলি উপন্যাস নহে। এই সমস্ত গল্পসাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসের একটি প্রধান লক্ষণ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। "শুধু গল্প বলা উপন্যাসের কাজ নয়, গল্পচ্ছলে আসলে ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলাই উপন্যাসের কাজ।"

ইংরেজী সাহিত্যে যাহাকে novel বলে বাংলা সাহিত্যে তাহাকেই আমরা উপন্যাস বলি। কিন্তু উপন্যাসের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। 'উপন্যাস' এবং 'গল্প,' এই দুইটি শব্দেরই গোড়াকার অর্থ হইল, 'লাগানো', 'নিন্দা করা', 'বানাইয়া বলা'—এক কথায় 'যাহা নয়, তাহা বলা'। উপন্যাসের আভিধানিক অর্থ হইল, 'অত্যাশ্চর্য কাল্পনিক কাহিনী'। সেজন্য উনিশ শতকে বাংলায় উপন্যাস বলিতে বুঝাইত 'গালগল্প বা কাল্পনিক গল্প।'

Ralph Fox উপন্যাস আলোচনার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression. Mr. E. M. Forster has pointed out that the great feature which distinguishes the novel from the other arts is that it has the power to make the secret life visible. It gives

therefore, a different view of reality from that given by poetry or the drama, or the cinema, or painting or music." মানবজীবন পরিবর্তনশীল। সেজন্য উপন্যাস হইল পরিবর্তনশীল মানবজীবনের গল্পোপাখ্যান। সমগ্র মানুষটিকে রূপায়িত করা এবং তাহার গোপন অনুভূতিকে প্রতিফলিত করাই উপন্যাসের আসল উদ্দেশ্য। স্যার ওয়াল্টার স্কট নভেলের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা হইল, "A novel is a ficititious narrative, differing from the romance, because the events are accomodated to the ordinary train of human events and the modern state of society.' উপন্যাসের সংজ্ঞা বহু সাহিত্যিক দিয়াছেন। বর্তমান সমাজের সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন প্রতিফলিত করাই হইল ইহার মোদ্দা কথা। এই সম্বন্ধে Water Allen তাঁহার 'The English Novel' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "We find here a close imitation of man and manners ; we see the very web and texture of society as it really exists, and as we meet it when we come into the world. If poetry has 'something more divine' in it this savours more of humanity, we are brought acquainted, with the motives and characters of mankind, imbibe our notions of virtue and vice from practical examples, and are taught a knowledge of the world through the airy medium of romance."

উপন্যাসের নানা উপকরণ ও প্রক্রিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে events and actions—যাহাকে আমরা সাধারণতঃ প্লট বলি তাহাই প্রধান। সাধারণত কাহিনীর জন্যই উপন্যাসের আকর্ষণ। এই কাহিনী বা গল্প এবং প্লট এক বস্তু নহে। Story বা গল্প হইল "a narative events arranged in their time sequence" অর্থাৎ কাল-মাত্রায় সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবৃতি আর Plot হইল 'a narrative of events, the emphasis falling on casuality" বা কার্যকারণের উপর জোর দিয়া ঘটনাবলীর বিবৃতি। গল্প চলে নিরবিচ্ছিন্ন ধারায়। তাহার সর্বদা প্রশ্ন হইল 'তারপর'? কিন্তু Plot তাহা নহে। তাহার মধ্যে গল্পের গতিবেগ যেমন থাকে তেমনি থাকে তাহার কার্যকারণ সম্বন্ধ। সেজন্য তাহার সর্বদা প্রশ্ন হইল 'কেন'?

উপন্যাসের কাহিনী মূলত কতকগুলি incident-এর সুসংহত সমাপ্তি। এই কাহিনীর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে উপকাহিনী বা sub-plot দেখা যায়। নাটকের মতই তখন লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন উপকাহিনী যেন মূল কাহিনীকে প্রভাবিত না করে এবং তাহার গতিবেগ ব্যাহত না করে। সুসামঞ্জস্য না থাকিলে উপন্যাসের গঠন শিথিল হইতে বাধ্য। আজকাল অবশ্য উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও চেতন-প্রবাহ বা stream of consciousness-কে কাহিনী অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায়। উপন্যাসের দ্বিতীয় প্রধান উপাদান হইল তাহার চরিত্র। অনেক সময় এই চরিত্রের বিকাশই উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য রূপে দেখা যায়। এই চরিত্র জীবন্ত এবং বাস্তবানুগ হওয়ার মধ্যে ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। এই চরিত্রের রূপায়ণ সম্বন্ধে Thackaray একবার বলিয়াছেন, "I don't control my characters, I am in their hands, and they take me where they please". উপন্যাসের প্রধান চরিত্রকেই আমরা সাধারণতঃ নায়ক বলিয়া থাকি। অবশ্য উপন্যাসের নায়ক-এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) যাহার মধ্য দিয়া ঔপন্যাসিক আপন বক্তব্য পেশ করেন। (২) অন্য চরিত্রগুলি ও কাহিনী যে চরিত্রের অভিমুখী ও সর্বাপেক্ষা সংলগ্ন। (৩) যে চরিত্রের আঁচরণ ও চিন্তা উপন্যাসের পরিণামকে সম্ভব করিয়া তোলে এবং যে পরিণামের দ্বারা উক্ত চরিত্র সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত (affected) হয় তাহাকেই আমরা উপন্যাসের নায়ক বলিতে পারি। স্বভাবতই এই চরিত্র পুরুষ না হইয়া স্ত্রীও হইতে পারে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী। নায়কের স্ত্রী মানেই নায়িকা নহে। উপন্যাসের চরিত্র সাধারণত দুই প্রকারের হয়—Flat ও Round। প্রথম শ্রেণীর চরিত্র সহজবোধ্য কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র দুর্বোধ্য ও বিচিত্র রঙা। তাহাকে সহজে চেনা যায় না। A. H. Upham বলেন, "The greatest novels are essentially character studies." (Typical gems of English Literature)। উপন্যাসের অন্যান্য উপাদান এবং প্রক্রিয়া হইল পটভূমি বা Background of time and space বা setting; সংলাপ ও বিবৃতি বা Dialogue and narration; জীবন সমালোচনা; লেখকের জীবন বা জীবনদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী; বাস্তবতা; ভাব-বৃত্ত; উপন্যাসের গঠনসৌষ্ঠব প্রভৃতি।

উপন্যাসকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

এক : বিষয়বস্তুর দিক হইতে : ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, দার্শনিক ইত্যাদি।

দুই : উপকরণের দিক হইতে : চরিত্র-প্রধান, কাহিনী-প্রধান, পটভূমি-প্রধান, মনস্তত্ত্ব প্রধান ইত্যাদি।

তিন : দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে : রোমান্টিক ; বাস্তববাদী ইত্যাদি।

[ঘ] ॥ বঙ্কিম উপন্যাসের ধারা ॥

বাংলা দেশের প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বপ্রথম ইংরেজীতেই উপন্যাস রচনা করেন। তাহার নাম Rajmohan's wife। কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে' ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইংরেজী উপন্যাস লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক-মানস পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই। তিনি পরে এই উপন্যাসের প্রথম সাতটি অধ্যায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ইংরেজী ভাষা যত সহজ ভাবে প্রকাশ পাইত বাংলা তত সহজ ছিল না। 'রাজমোহনের স্ত্রী' অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের অনেক প্রভাব আছে। "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তীকালে বলিয়াছেন :

"আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ…উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল, যে বাঙ্গালা সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়…। এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলাল"-এর পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

"প্রাচীন ও নবীন রীতির এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের আদি পর্বের সমাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ বঙ্কিম-প্রতিভার স্ফুরণ।" খুলনায় অবস্থান

কালেই ১৮৬৩-৬৪ সালে তিনি দুর্গেশনন্দিনী রচনায় হাত দেন। ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃত ভাষা-ও সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য দখল, তার উপর বিদ্যাসাগর ওআলালীভাষার আদর্শ—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বিকাশের সমস্ত আয়োজন ওউপকরণ প্রস্তুতই ছিল। সেজন্য ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়া যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা এবং ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'কে "ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ইতিবৃত্ত নহে, খাঁটি উপন্যাসও নহে—ইহা রোমান্স। "এখন 'novel ও romance' এর মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদটুকু আছে. তাঁহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রধানতঃ উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা বাস্তব গুণের আপেক্ষিক প্রাধান্য লইয়া। 'Novel অবিমিশ্রভাবেই বাস্তব; ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগ সমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন চিত্রণ; সত্য পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই ইহার প্রধান গুণ। যতদূর সম্ভব সমস্ত অসাধারণত্বই ইহার বর্জনীয়; কেবল আমাদের জীবন প্রবাহের মধ্যে যে সমস্ত দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি উচ্ছ্বসিত, যে সমস্ত সংঘাত বিক্ষুব্ধ ও মুখরিত হইয়া উঠে, সেই রহস্যমণ্ডিত সত্যগুলির দ্বারাই ইহা অসাধারণত্বের সাময়িক স্পর্শ লাভ করিতে পারে। 'Romance'-এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরনের; ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে। অন্তরের বীরোচিত বিকাশগুলি, মনের উঁচুসুরে বাঁধা ঝংকারগুলি, জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা সমারোহ—ইহাই মুখ্যতঃ রোমান্সের বিষয়বস্তু। সেইজন্য সূর্যালোক দীপ্ত, অতিপরিচিত বর্তমান অপেক্ষা কুহেলিকাচ্ছন্ন, অপরিচিত অতীতের দিকেই ইহার স্বাভাবিক প্রবণতা।

অতীতের বিচিত্র বেশভূষা ও আচার ব্যবহার, অতীতের আকাশ বাতাসে লঘু মেঘখণ্ডের মত যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময় কল্পনা ভাসিয়া বেড়ায়, রোমান্সলেখক সেইগুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করেন। অবশ্য এই সমস্ত অসাধারণত্বের মধ্যেও রোমান্স বাস্তব জীবনের সহিত একটি নিগূঢ় ঐক্য হারায় না ; জীবনের সহিত যোগসূত্র হারাইলেই ইহা একটি সম্পূর্ণ অসম্ভব পরীর গল্পের মত হইয়া পড়িবে। মধ্যযুগের রোমান্স এইরূপ সম্পূর্ণ বাস্তব সম্পর্কশূন্য ছিল বলিয়া তাহার উপন্যাসশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবার স্পর্ধা ছিল না ; তাহার অন্তহীন, ছায়াঘন অরণ্যানীর মধ্যে আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতিধ্বনি বড় একটা শুনা যাইত না। কিন্তু আধুনিক যুগের যে প্রবর্ধমান বাস্তব প্রবণতার মধ্যে সামাজিক উপন্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা রোমান্সের উপরেও নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই। আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাস্যের কোন স্থান নাই। রোমান্স লেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণ করিতে হয়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দ্বারা কার্যকারণ সম্বন্ধ স্পষ্ট কারতে হয়, ইহার বাতাসে যে বিচিত্রবর্ণের ফুল ফুটে, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার একমাত্র প্রভেদ যে, বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে। সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে।" (বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পর বঙ্কিমচন্দ্র চার বছরের মধ্যেই আরো দুইটি উপন্যাস রচনা করেন—কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) এবং মৃণালিনী (১৮৬৯)। প্রথম উপন্যাস বলিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে ত্রুটি এবং জড়তা ছিল 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্র তাহা হইতে সম্পূর্ণমুক্ত হইলেন। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। "কপালকুণ্ডলা'য় শিল্পী অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা অর্জন করেন। ইহাতে 'দুর্গেশনন্দিনী'র শ্লথ জড়িমার বিন্দুমাত্র চিহ্নও অবশিষ্ট নাই। শিল্পীর ভাষা ইহাতে এমন একটা সাবলীল গতি ও কৌমার্য অর্জন করিয়াছে যে, অতি সহজ ও সূক্ষ্ম স্পর্শে তিনি গভীর আবেদন ও ভাবতরঙ্গসৃষ্টি

করিতে পারিয়াছেন। বিনা আয়াসেই তিনি মুক্তির চরম স্তরে উপনীত হইয়াছেন। তাহার এই মুক্তির সহিত শিল্পী অপরদিকে তাঁহার কাহিনীর স্থির লক্ষ্যের প্রতি সমস্ত ঘটনা-প্রবাহকে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহাতে একের সার্থকতার প্রয়োজনে উপধারাগুলিকে মূলপ্রবাহের অন্তর্গত করার এবং বিশেষ উদ্দেশ্যের খাতিরে নির্বিশেষকে সংগ্রথিত করার কৌশলের পরিচয় রহিয়াছে। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ এক একটি খণ্ড খণ্ড ঝর্ণাধারার মত অনিবার্য গতিতে সাগর-সঙ্গমের পথে যাত্রা করিয়াছে। এখানে অকারণ পথ-চাওয়া নাই, যাত্রাপথের কোন এক গ্রন্থিতে অকারণ বিশ্রাম নাই। সব কিছুই এখানে নিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য কোন পর্দায় বাঁধিয়া কি ভাবে ঝঙ্কার তুলিতে হইবে, শিল্পী রসে শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। নির্দিষ্ট ফললাভের জন্য তিনি নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে শিখিয়াছেন। স্থির লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শিল্পীর মানস বিবর্তনের ইতিহাসে ইহাই 'কপালকুণ্ডলা'র উল্লেখযোগ্য অবদান।" (বঙ্কিম মানস—ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার)।

'মৃণালিনী'তে বঙ্কিম মানসের আরও একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি এক ঐতিহাসিক সত্যকে নূতনভাবে রূপায়িত করার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার অতীত চেতনা 'হিন্দুরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং 'বক্তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে সতেরজন মুসলমান সৈনিক কর্তৃক বাংলা বিজয়ের যে কাহিনী বাংলার হিন্দু রাজাদের উপর কলঙ্ক লেপিয়া দিয়াছিল, সেই কলঙ্ক স্খালনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।' এই উপন্যাসের পশুপতি চরিত্রের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার সেই আশাকে মূর্ত করিয়া তোলেন। কিন্তু তাহাকে ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করিতে গিয়াই বিপর্যয় ঘটাইয়াছেন। মৃণালিনীর সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তির প্রথম পর্বের সমাপ্তি হইল।

দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আবির্ভাবে। সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী এবং তাহাদের ভাবপ্রকাশের মাধ্যমরূপেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন (এপ্রিল, ১৮৭২) প্রকাশিত করেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একটি উচ্চ শিক্ষিত লেখকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম সংখ্যা হইতে এই পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্র ধারাবাহিকভাবে তাঁহার উপন্যাসগুলি প্রকাশ করেন। ইহাতে পরপর বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তিনখানি উপন্যাস লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্থ উপন্যাস বিষবৃক্ষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। এই উপন্যাসেই আমরা প্রথম সামাজিক সমস্যার আলোচনা লাভ করিলাম। বাংলাদেশে তখন প্রধান সমস্যা ছিল—বিধবা-বিবাহ এবং বহু-বিবাহ। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে আমরা এই উভয় সমস্যারই অবতারণা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়াছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ।.........

"বিষবৃক্ষে' কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।"—(প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৮)

'বিষবৃক্ষ' দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বিষবৃক্ষের পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের দুইটি বড়ো গল্প—ইন্দিরা এবং যুগলাঙ্গুরীয়। পরে ইন্দিরার কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু যুগলাঙ্গুরীয় তেমন বৃদ্ধি পায় নাই।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসও প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে পুস্তকাকারে ইহার অনেক পরিবর্জন, পরিবর্ধন হইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি পারিবারিক কাহিনীই ইহার বিষয়বস্তু। 'বিষবৃক্ষ' এবং 'ইন্দিরা' লিখিয়া তাঁহার রোমান্সপ্রবণ মন যেন একটু হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল।" ইতিহাসের পাতায় প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনী লইয়া তিনি আবার রোমান্স-রচনার অবকাশ পাইলেন। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি নূতন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়—এক, যোগবলের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস এবং দুই, বাঙালীর বীরত্ব এবং মহত্ত্ব প্রদর্শনে আদর্শ চরিত্র হিসাবে প্রতাপের অবতারণা।

রাধারাণী একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। এই উপন্যাস সম্বন্ধে বঙ্কিম-প্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন :

"গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভজীর রথযাত্রা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। পূজনীয় যাদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটি লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সে ভিড়ে টিকএ মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধানার্থ

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে 'রাধারাণী' লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'রাধারাণী' রচনা করিয়াছিলেন।"

রজনীও ক্ষুদ্র উপন্যাস। লর্ড লিটন প্রণীত 'Last days of Pompei' নামক উপন্যাসে নিদিয়া নামে যে কানা ফুলওয়ালী আছে রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। "উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্স কৃত 'Woman in White' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়।" এই উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। 'সে যুগের বর্ণনাবহুল রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব সন্দেহ নাই।"

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বেশী আলোচিত উপন্যাস। অনেকে ইহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস বলিয়া অভিহিত করেন। একটি পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া ইহা সার্থক সামাজিক উপন্যাস। ইহাও প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র ইহার অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। পরিষৎ সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি, বর্ণনা-বাহুল্যের অভাব এবং আড়ম্বরহীনতা। "এমন অপরূপ লিপিচাতুর্য, এমন সংযত ভাবপ্রকাশ, বৈজ্ঞানিক ঘটনাবিন্যাস এবং সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবোধ বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন উপন্যাসে দৃষ্ট হয় না। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিচাতুর্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' চরমে পৌছিয়াছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত জীবনধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়।"

অষ্টম দশকের প্রথম হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের 'পজিটিভিজম' বা হিতবাদে উদ্বুদ্ধ হইলেন। এই মতবাদে অধিক সংখ্যক লোকের হিত-সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় পর্বের রচনায় এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। "ইহা হইতেই তাঁহার মন স্বদেশপ্রেম বা দেশভক্তিতে পরিপ্লুত হয়।" স্বদেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেম বা দেশভক্তি উদ্রেক করাইবার জন্য রাজসিংহ (১৮৮২ সনে এবং বড় আকারে ১৮৯৩ সনে), আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) প্রকাশিত করিলেন।' স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে পরবর্তী

তিনটি উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্মের কথাও আলোচিত হইয়াছে। এই তিনটি উপন্যাসে "স্বদেশপ্রেম ও দেশভক্তির প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিলেও, সমাজকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সংগঠন কল্পে হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনায় তিনি অত্যধিক অভিনিবিষ্ট হইলেন।"

'রাজসিংহ' উপন্যাসকে বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপে অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁহার আরও কয়েকখানি উপন্যাসকে ঐতিহাসিক বলিয়াছেন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"ভারত কলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি কি। হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব সে সকল কারণের মধ্যে নহে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্বাঙ্গ দুর্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে, হিন্দুদের বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বলবান্ ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে রাজকীয় অন্যান্য গুণে তাঁহারা নিকৃষ্ট ছিলেন।"

"যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।"

আনন্দমঠ ছিয়াত্তরের (১১৭৬) মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলা দেশে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ অবলম্বনে লেখা উপন্যাস। বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই উপন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান লইয়াছিল। তখন স্বদেশকর্মীদের এক হাতে থাকিত গীতা অন্য হাতে আনন্দমঠ। সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' এই উপন্যাসেরই অন্তর্গত। আনন্দমঠের ভাব-ব্যঞ্জনায় এবং এই সঙ্গীতে তখন বাঙালী মাত্রেই উদ্বুদ্ধ হইত। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল আনন্দমঠের স্বদেশ-প্রীতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির আদর্শে কোনও প্রকারের সঙ্কীর্ণতা ছিল না; থাকিলে এই স্বদেশপ্রীতির উপর তিনি লোকশ্রেয়ের এবং লোকশ্রেয়ের উপরে তাঁহার নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। আনন্দমঠে তিনি দেশ-মাতৃকাকে মহাবিষ্ণুর বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্বমানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। মহাবিষ্ণুকে বা নারায়ণকে বা বিশ্বমানবকে ছাড়িয়া দেশমাতৃকার পূজা হয় না। এ কথাটা আনন্দমঠের একটা অতি প্রধান কথা। একদিকে আনন্দমঠ

একটা অতি প্রবল স্বদেশ-প্রীতি এবং স্বাজাত্যাভিমান জাগাইয়া দেয়। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে এই স্বদেশ-প্রীতি এবং স্বাজাত্যাভিমান বিশ্ব-প্রীতি এবং বিশ্ব-কল্যাণ কামনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে আপনার সফলতা কিছুতেই আহরণ করিতে পারে না, আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য কুশলতা সহকারে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিণাম দেখাইয়া এই কথাটাও প্রচার করিয়া গিয়াছেন।" (নবযুগের বাংলা : বঙ্কিম সাহিত্য)

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন-তত্ত্ব' প্রচারের একটি ফল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' প্রবন্ধে দেবীচৌধুরাণী বা প্রফুল্ল চরিত্রের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার culture বা অনুশীলন-তত্ত্বের সাহায্যে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবার ground বা চিত্রের ক্ষেত্র রচিবার প্রয়াসটা বেশ পরিস্ফুট। দেবী চৌধুরাণীর ক্ষেত্র অতি সুন্দর না হইলেও মনোহর বটে। দেবী চৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তি-মূর্তি—কমলা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে ; অথচ তিনের সমন্বয়ে তা অপূর্ব বৈষ্ণব ঠাকুরাণী।......কিন্তু প্রফুল্ল চরিত্র অপূর্ব, উহা বাংলার নহে অথচ বেশ বাঙালীয়ানা মাখান। উহা বাঙালীর ঘরে কখনও ছিল না, বাঙালীর ঘরে কখনও হইবে না। যে উদ্ভটতা শান্তিতে আছে, সে উদ্ভটতা প্রফুল্লেও ফুটিয়াছে। কোনটা বাংলার নহে, ভারতবর্ষেরও নহে, অথচ কোনটাকেই বাঙালীত্বের গণ্ডী হইতে বাহিরে রাখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এইটুকুই কারিগরি—এইটুকুই শিল্পনৈপুণ্য।

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণী এবং আনন্দমঠের মত অনুশীলন-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। আসলে তিনি সীতারামকে দিয়া হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার এই স্বপ্ন ভাঙিয়া চুরিয়া সীতারাম এক ভয়াবহ ট্রাজেডিতে পরিণত হইয়াছে।

'বঙ্কিমচন্দ্র যে মূলত স্কটের আদর্শ অবলম্বন করিয়া রোমান্স লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ডঃ সুকুমার সেন বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসকেই রোমান্সশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়াছেন। তাই নরনারীর প্রণয়-লীলাঘটিত দ্বন্দ্বই তাঁহার উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। "বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং রোমান্স-রসের পরিমাণ অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে তিন

ভাগে ফেলা যায়। এক, একান্ত রসপ্রধান এবং বিশুদ্ধ রোমান্টিক। যেমন দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী ও রাজসিংহ। এগুলিতে পাত্রপাত্রীর প্রেমের দ্বন্দ্ব নাই। রস জমিয়া উঠিয়াছে শুধু মিলনের বাহ্যিক বাধায়, ঘটনার ফেরে ও অদৃষ্টের চক্রান্তে। দুই, নীতি-প্রধান ও গার্হস্থ্য রোমান্টিক। যেমন—বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর এবং রজনী। নায়ক-নায়িকার প্রণয়দ্বৈধঘটিত অন্তর্দ্বন্দ্ব এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য। তিন, নীতিপ্রধান ও "গীতোক্ত" আধ্যাত্ম-রোমান্টিক। যেমন—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম। দেশানুরাগ ও লোকহিত এই তিনটি উপন্যাসের মূলমন্ত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের নীতি-আদর্শ হইতেছে রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক।"

"বস্তুত বঙ্কিমের রোমান্টিক উপন্যাসে বাস্তবতার স্থান কখনই বেশী ছিল না। তাঁহার মেয়ে-পুরুষ নিজেদের প্রণয়-স্বপ্নে মশগুল, হৃদয়ারণ্যে তাহাদের বাস, প্রতিদিনকার ঘরকন্নার কাজে তাহাদের দেখা পাই না। তাই হৃদয়দ্বন্দ্বের বা প্রণয়রসের বাহিরে যে বৃহত্তর কর্ম ও ভাব জীবন রহিয়াছে তাহার স্পর্শ তাহারা সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে যে গৃহস্থালির বর্ণনা পাই তাহা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মত অচল ছবি মাত্র, নায়ক-নায়িকার প্রাণের স্পর্শ সেগুলিকে সঞ্জীবিত করে নাই। সুতরাং সংসারযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন ও আত্মসর্বস্ব নারীরা ঘরের পরিচিত লোক না হইয়া দূরের মানুষ, বইয়ের মানুষ হইয়াছে। অবান্তর চরিত্রের অপ্রাচুর্যও কাহিনীকে প্রেমসর্বস্ব করিয়াছে।

কিন্তু সেজন্য বঙ্কিমকে দায়ী করা উচিত নয়। বঙ্কিম সমসাময়িক বাঙালীর বাস্তবজীবনের ছবি আঁকিতে বসেন নাই। তিনি এমন কোন ঘটনা দেন নাই যাহা সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতায় সচরাচর ঘটিয়া থাকে। তিনি চাহিয়াছিলেন গল্পরস সৃষ্টি করিতে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া নূতন পিপাসা জাগাইতে। তাই তিনি রোমান্সের ফ্রেমটিই বাছিয়া লইয়াছিলেন, এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে তিনি তাঁহার শিল্প-আদর্শকে রূপ দিতে পারিয়াছিলেন। সে আদর্শ পুরাপুরি বিলাতি নয়, অনেকটাই তাঁহার নিজস্ব। সাহিত্যের এই নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পুরা ফসল ফলাইকার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের।"

(ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস)

"বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠনগত বৈশিষ্ট্য পাঁচটি। (১) বিবাহের পূর্বে প্রণয়-সঞ্চার অর্থাৎ পূর্বরাগ। বঙ্কিম-পূর্ব আখ্যায়িকায় পূর্বরাগের স্থান ছিল না।...

দুর্গেশনন্দিনীতে পূর্বরাগই উপন্যাসের আদ্যন্ত জুড়িয়া আছে। কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর প্রভৃতিতে নায়ক-নায়িকার বিবাহ উপোদ্‌ঘাতে ঘটিয়া গেলেও তাহাদের পরবর্তী প্রণয়লীলাকে "অনুরাগ" না বলিয়া পূর্বরাগই বলিতে হয়।...

(২) চন্দ্রশেখর এবং রজনী ছাড়া সর্বত্র নায়িকার প্রেম নির্দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব কেবল নায়কেরই—দুই প্রণয় পাত্রী লইয়া। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, ইন্দিরা, রাজসিংহ প্রভৃতিতে নায়কের প্রেমও দ্বন্দ্ববিহীন। ইংরেজী উপন্যাসের "ত্রিভুজবিরোধ" শুধু চন্দ্রশেখরেই আছে।

(৩) ভবিষ্যদ্‌গণনা, যোগবল, সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি অতি প্রাকৃত ব্যাপারের উপস্থাপন বঙ্কিমের প্রায় সব উপন্যাসেই আছে। সাধু-সন্ন্যাসীর দ্বারা ঘটনাসূত্রের নিয়ন্ত্রণ হইতেছে বঙ্কিমের রোমান্টিক উপন্যাস শিল্পের একটা বিশিষ্ট টেকনিক।

(৪) অধিকাংশ উপন্যাসে দুইটি করিয়া সমান্তরাল প্রেম-কাহিনীর বর্ণন আছে—একটি প্রধান, অপরটি অপ্রধান। মৃণালিনীতে ও চন্দ্রশেখরে কাহিনী দুইটি ভাল করিয়া মিশ খায় নাই। এখানে যেন একটি বইয়ের মলাটে দুইটি উপন্যাস ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে-উপন্যাসে দুইটি প্রণয় কাহিনী পাই সেখানে নায়কের একাধিক পত্নী বা প্রণয়প্রার্থিনী কল্পিত হইয়াছে। যেমন কপালকুণ্ডলায়, বিষবৃক্ষে, কৃষ্ণকান্তের উইলে এবং দেবী চৌধুরাণীতে।

(৫) নায়িকাদের স্বভাব পুরাপুরি রোমান্টিক। তাহাদের বাস হৃদয় রাজ্যেই, সংসারের সঙ্গে তাহাদের যোগটুকু নিতান্ত বহিরঙ্গ ও অবান্তর বঙ্কিমের নায়িকারা বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, তাহারা রোমান্টিক কল্পনার সৃষ্টি নায়কেরা খুব অবাস্তব নয়, কিন্তু নারী-চরিত্রের তুলনায় পুরুষ-চরিত্র এতটা অপরিণত যে সেগুলিও ঐতিহাসিক বাস্তবতার বাহিরে।"

(ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক ঔপন্যাসিকদের ন্যায় মানবজীবনের অজস্র জটিলতা ব জটিলতর মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন নাই। অবশ্য তাহা প্রতি তাঁহার কোন আগ্রহও ছিল না। যদিও শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন, 'Th earlier Bankim was only a poet and stylist—the latte Bankin was a seer and naticn builder." তথাপি বঙ্কিমের সামগ্রি রচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা যায় একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ এবং মতব স্মরণে রাখিয়াই তিনি সাহিত্য সৃজনে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই আদর্শ

মতবাদ তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলা যায়ঃ "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।...

সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।"*

(বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ)

সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'মনুষ্যজাতির এই মঙ্গল কামনা—সত্য সুন্দর ও মঙ্গল'—এই 'Ideal'-এর সঙ্গে 'real'-এর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত 'real' পরাজিত হইয়াছে। সৌন্দর্য-শিল্পী বঙ্কিম তাঁহার আদর্শ এবং সংস্কার-বিরোধী নীতিবাদী বঙ্কিমের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের বাস্তব প্রতীতিবোধে অপূর্ব সুন্দর কাহিনীর সংযোজনা করিয়াছেন কিন্তু তাহার শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার শ্রেয়োবোধ প্রেয়োবোধকে অনুতাপের কশাঘাতে জর্জরিত অথবা অনুশোচনার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে। প্রতীচী যুক্তি-নির্ভর জীবন-সাধনার দুর্বার প্রবাহকে তিনি এইভাবে নীতি এবং সংস্কারের লাগাম টানিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার অপূর্ব শিল্প-নির্মাণ কৌশলে, ভাব বিন্যাসে, সুডৌল কাহিনীর পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণে তিনি অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার উপন্যাস রচনার শতবর্ষ পরেও বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় পাঠক-সমাজকে ভাবনা চিন্তায় ভাবাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী প্রতিভার অমরত্ব।

॥ মধ্য পর্ব ॥

[ক] ॥ কপালকুণ্ডলা উপন্যাস ঃ রচনাকাল ॥

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পর বৎসরে ১৮৬৬ সনের শেষভাগে এখানি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মধ্যমাগ্রজ 'পালামৌ' খ্যাত সঞ্জীবচন্দ্রকে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। অন্যূন ছয় বৎসর পূর্বেই 'কপালকুণ্ডলা' আখ্যায়িকার সূচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-স্মৃতিকার কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। "বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কর্মস্থল যশোহর হইতে বদলি হইয়া ১৮৬০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে নেগুঁয়ায় যান এবং এই বৎসরের নভেম্বরের প্রারম্ভ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এই মহকুমা এখন আর

নাই, কাঁথি হইয়াছে। নেগুঁয়া কাঁথির সন্নিকটে দরিয়াপুর ও চাঁদপুরের অনতিদূরে।" পূর্ণচন্দ্র বলেন, এই স্থলেই 'কপালকুণ্ডলা' কাহিনীর উৎপত্তি। তাঁহারই ভাষায় :

"যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে (এখন উহাকে কাঁথি বলে) ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গলোয় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছুদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে, ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত; কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন।" (বঙ্কিম প্রসঙ্গ)

এই সন্ন্যাসী কাপালিক বঙ্কিমচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি খুলনায় যাইবার পূর্বে কয়েকদিন কাঁটালপাড়ায় অবস্থান করেন। এ সময় একদিন দীনবন্ধু মিত্র কাঁটালপাড়ায় গেলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে প্রশ্ন করেন :

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ দেখিতে না পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" (বঙ্কিম প্রসঙ্গ)

পূর্ণচন্দ্র বলেন, 'যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন, তখন সেই স্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম।' সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে ব্যঙ্গ করিয়া কিছু বলেন। পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাঁহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।"

পূর্ণচন্দ্র অতঃপর লিখিয়াছেন :

যাঁহার আবির্ভাব, তিনি আর যাহাই হোন, Rajmohan's wife রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র নন। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হওয়ার ফলে নূতন ভাব-জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই ভাব-জগতের সহিত অন্তর জগতের সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছে। নূতন পরিবেশে নূতন সম্পর্কের জন্ম, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মানস সত্তারও নব-রূপায়ণ। ইহার পর হইতে ডেপুটি জীবনের ধরাবাঁধা গতানুগতিক তালে তাঁহার জীবন আর প্রবাহিত হইবে না; শিল্পী তাঁহার সৃষ্টির মাধ্যমে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন, পাঠক সমাজের অণু-পরমাণুতে সঞ্চার করিয়াছেন এক অভিনব ভাব-তরঙ্গ আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সেই সমাজের সহিত নূতন সম্পর্কে আবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং সমাজ তাঁহার সৃষ্টির স্পর্শে আন্দোলিত হইয়াছে। শিল্পীকেও তেমনি এই সম্পর্কের আঘাতে সঞ্চালিত হইতে হইবে, এবং নূতন ধারায় বাঁক লইতে হইবে"। (বঙ্কিম-মানস—ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার)

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আমরা বঙ্কিম-মানসের সেই 'বাঁক' দেখিতে পাই। দুর্গেশনন্দিনীর অভাবিত সাফল্যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে একটি নূতন experiment করিলেন।

[গ] ॥ বঙ্কিম-উপন্যাসের ধারায় কপালকুণ্ডলা ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা'র স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ইহার স্থান চতুর্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সৃষ্টি একটি কাব্যগ্রন্থ। 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।' 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক ও কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব ইহার মধ্যে বিদ্যমান। তারপর Rajmohan's wife বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরেজী উপন্যাস। তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মাত্রই ইংরেজী চর্চাকে গৌরবের বলিয়া মনে করিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও সেই মনোভাব এই উপন্যাস সৃষ্টির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার তৃতীয় সৃষ্টি 'দুর্গেশনন্দিনী'। বঙ্গ-উপন্যাস জগতে এই উপন্যাস সত্যই এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার পূর্বে উপন্যাস-নামীয় গ্রন্থগুলির সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনীর বিস্তর ব্যবধান। তাহাদের মধ্যে উপাদান আছে কিন্তু মনস্তত্ত্বমূলক যোগসূত্রের দ্বারা তাহাদের সার্থক রস নিষ্পত্তি নাই। "বিশেষতঃ ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র উপন্যাসের নিকট রুদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র একমুহূর্তে ইতিহাসের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিয়া উপন্যাসের সীমা, বিস্তার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আশ্চর্য ভাবে বাড়াইয়া দিলেন। ইতিহাসের ঘটনাবহুল, উদ্দীপনাময় ক্ষেত্র হইতে বিচিত্র রস

ও বর্ণ সংগ্রহ করিয়া জীবনকে রঞ্জিত করিলেন, তাহার সাধারণ গতিবেগ বর্ধিত করিলেন ও আমাদের হৃদয়-স্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া দিলেন। ইতিহাসের সংকটপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে জীবনে যে অসাধারণ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঞ্চার হয়, আমাদের সাধারণ জীবনের শীর্ণ নদীতে যে প্রবল স্রোতোবেগ প্রবাহিত হয়, তাহার পরিচয় দিলেন। অতএব 'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ-উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।" (বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অবশ্য 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে ত্রুটিও কম নাই। ঐতিহাসিক প্রতিবেশ এবং ঐতিহাসিক পুরুষগুলির চরিত্র-চিত্রণে গভীরতার বিশেষ অভাব আছে। সেজন্য চরিত্রগুলি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে তেমন উজ্জ্বল নহে। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের যথেষ্ট অভাব আছে। বিশেষ করিয়া আয়েষার মনে প্রথম প্রণয় সঞ্চার ও উহার ক্রমবৃদ্ধির কোন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তিনি করেন নাই। চরিত্র-সৃজনের দিকে তাঁহার যথেষ্ট শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়। এই উপন্যাসে 'ঘটনা-বৈচিত্র্য ও গল্পাংশের আকর্ষণই প্রধান; বিশ্লেষণ ও কথোপকথনের দ্বারা চরিত্র-চিত্রণের তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই।' এগুলি ছাড়াও দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে নানা খুঁটিনাটি ত্রুটি দেখা যায়।

কপালকুণ্ডলায় দুর্গেশনন্দিনীর সমস্ত ত্রুটি মুক্ত। "দুর্গেশনন্দিনীর সমস্ত অনিশ্চয়, সমস্ত সঙ্কোচ, পুরাতন প্রথার সশঙ্ক অনুবর্তন বঙ্কিম সবলে কাটাইয়া উঠিয়াছেন।" কপালকুণ্ডলার প্রধান আকর্ষণ 'উহার অন্তর্নিহিত ভাবটির অসামান্য মৌলিকতা।' কল্পনার মুক্তপক্ষে উড়িয়া তিনি রোমান্সের সুদূর নীল দিগন্তে পৌঁছিয়াছেন। সেখানে অনেক সময় বাস্তব বুদ্ধি তাহার তাল রাখিতে পারে নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে রোমান্স ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাহিত্য-সুলভ প্রেমের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল তাহা 'কপালকুণ্ডলা'তে একেবারে সমস্ত বাহ্য অবলম্বন ত্যাগ করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত রসের দ্বারাই পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে গতানুগতিকতার যে একটা জড়তা ছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'তে কল্পনা-শক্তির অশ্রান্ত সাহসিকতায় সতেজ ও লীলাচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সাগরতীরবাসিনী, কাপালিক-প্রতিপালিতা চির-সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার মূর্তি-কল্পনায় বঙ্কিম যে অসামান্য

প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একজন বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকের পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়কর।"

শিল্পী হিসাবে বঙ্কিম-প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ঔপন্যাসিক এবং কবির এক অপূর্ব সমন্বয়। কপালকুণ্ডলায় প্রথম তাঁহার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। অরণ্যচারী তান্ত্রিক প্রভাবিত বন্ধনহীন মুক্ত জীবনে অত্যন্ত এক কল্পলোকের নারী-চরিত্র অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এক অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে তিনি কবির দৃষ্টি লইয়া জীবনকে দেখিয়াছেন এবং ঔপন্যাসিক রূপে তাহাকে নানা স্তর পরম্পরা গ্রথিত করিয়াছেন। আধুনিক ঔপন্যাসিকের ন্যায় মানব-জীবনের কোন বিশেষ অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখিয়া মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি করেন নাই। জীবনের সমগ্র রূপের উপর কবিসুলভ দৃষ্টি দ্বারা নানা ঘটনা বিন্যাসে তাহার নিবিড় উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার কহিনীর মধ্যে নর-নারীর প্রবল হৃদয়াবেগের যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ততটা পাওয়া যায় না।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব জীবন প্রবুদ্ধ চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের উপন্যাস সৃজনের দিকে দৃষ্টি দেন নাই। জীবনের কতকগুলি উদ্দীপনাময় এবং বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্ত নির্বাচন করিয়া তাহার মধ্যে কল্পনার আলোকসম্পাত করিয়াছেন। "আমাদের রুদ্ধ-দ্বার, সঙ্কীর্ণ পরিসর বাস্তব জীবনে রোমান্সের যে উদার আলোক ও মুক্তবায়ুর নিতান্তই বিরল-প্রবেশ বঙ্কিমচন্দ্র সেখানেই স্বচ্ছন্দ-বিহার করিয়াছেন।

"কপালকুণ্ডলার রোমান্টিক আবেষ্টন রচনায় বঙ্কিম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ইতিহাস ও প্রেমকে যতদূর সম্ভব পশ্চাতে রাখিয়া রোমান্সের এমন একটি উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমাদের বাস্তব-জীবনের কঠিন-মৃত্তিকা হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইতে পারে। আমাদের শান্ত, ধর্মাভিভূত জীবনের উপর যদি কখনও কল্পলোকের আলোকপাত সম্ভব হয়, তবে তাহা প্রবল ধর্মোন্মাদনার দিক্ হইতেই আসিতে পারে, যুদ্ধের উদ্দীপনা বা প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে নহে। এই জন্যই কপালকুণ্ডলার জীবনের উপর যে একটা অসাধারণত্ব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তান্ত্রিক-প্রথার ভীষণতা ও সহজ ধর্ম-প্রবণতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমাদের বাস্তবজীবনের সহিত একটা সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। আবার এই উপন্যাসের রোমান্টিক উপাদানগুলি—বিজন

সমুদ্রতীরের অতুলনীয় মহিমা, কাপালিকের নির্মম ধর্ম-সাধনা—কেবলমাত্র একটা বাহ্যবৈচিত্র্যের উপায়মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই, ইহারা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর একটি গভীর, অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া অসাধারণ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কেননা ইহার সমস্ত রোমান্সের সার, এই সৌন্দর্য-জগতের মধ্যমণি হইতেছে কপালকুণ্ডলার চরিত্র। সুকোমল মাধুর্যের চারিদিকে একটা অনমনীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বেড়া, গার্হস্থ্য সুখভোগের মধ্যে একটা অক্ষুণ্ণ উদাসীনতার সংযম, সামাজিক বিধি-নিষেধের মাঝখানে একটা শান্ত অথচ অদম্য স্বাধীনতা, অথচ কোথাও পুরুষোচিত কঠোরতা বা পরুষতার লেশমাত্র নাই, সর্বত্রই রমণীয় কোমলতা ; শিক্ষা-দীক্ষায় বিভিন্ন, কিন্তু অন্তরে একটি চিরন্তনী স্ত্রীমূর্তি (eternal feminine)—এরূপ অতুলনীয় চরিত্র-কল্পনা শুধু বঙ্গ-সাহিত্যে কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যেও বিরল।"

(বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

[ঘ] ॥ কপালকুণ্ডলা : কাহিনী বিশ্লেষণ ॥

তখন আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষ সময় ; পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালীন প্রথা ছিল। সপ্তগ্রাম নিবাসী নবকুমার শর্মা একবার গঙ্গাসাগরে তীর্থদর্শনে গিয়াছিল। প্রত্যাবর্তনের সময় ঘোরতর কুজ্ঝটিকায় তাহাদের নৌকা সঙ্গীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। রোদ উঠিলে তাহারা দেখিতে পাইল, তাহারা রসুলপুরের নদীর মোহানায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে সমুদ্রের ন্যায়ই নদীর বিস্তার। তাহারা সমুদ্রের পশ্চিমতটের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে তাহাদের নৌকা বাঁধা হইল। জোয়ারের কিছু বিলম্ব দেখিয়া আরোহিগণ সম্মুখস্থ সমুদ্রসৈকতে পাকাদি সমাধা করিবার জন্য অবতরণ করিল। কিন্তু নৌকায় পাকের কাষ্ঠের অভাব। ব্যাঘ্রভয়ে কেহ বনমধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। সাহসী যুবক নবকুমার তখন একাকী কাষ্ঠাহরণে গেলেন। কাষ্ঠ সংগ্রহ এবং বহন করিয়া আনিতে নবকুমারের কিছু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে জোয়ার আসায় নাবিকেরা নৌকা ছাড়িয়া দিল এবং জোয়ারের তীব্র বেগে নৌকা অনেক দূর চলিয়া গেল। প্রতিবেশী এবং সহযাত্রী সকলের নবকুমারের কথা স্মরণে থাকিলেও নৌকা নবকুমারকে ছাড়াই সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিল। প্রচারিত হইল নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে।

নবকুমার অনেক কষ্টে কাষ্ঠ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল নৌকা নাই। নৌকা ফিরিয়া আসিবে এই আশায় সে সারাদিন সেখানে অপেক্ষা করিল। নবকুমার দেখিল, "গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য নাই, পেয় নাই, নদীর জল অসহ্য লবণাত্মক ; অথচ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।" নবকুমার মনে মনে বুঝিল তাহার প্রাণনাশই নিশ্চিত। নানা চিন্তায় অস্থির নবকুমার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে অন্ধকার হইল। ভ্রমণ করিতে করিতে নবকুমারের দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। একস্থানে সে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া বসিল। সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙিল তখন অনেক রাত। ব্যাঘ্রের ভয়ে সেও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে-লাগিল। অকস্মাৎ বহুদূরে আলোক দেখিয়া নবকুমার দ্রুত সেখানে উপস্থিত হইল। দেখিল এক কাপালিক যোগাসীন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর কাপালিক তাহাকে তাহার পর্ণকুটীরে লইয়া গেল। নবকুমার সামান্য ফলমূল আহার করিয়া সেখানে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন ক্ষুধায় কাতর নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইল। একটি গাছের অতি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া নিবিড় বনমধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিল। একটু পরে সমুদ্র সৈকতে উপস্থিত হইল। বসিয়া বসিয়া সে সমুদ্রের অনন্ত শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। হঠাৎ নবকুমার সেখানে এক অপূর্ব রমণীমূর্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। অনেকক্ষণ পরে সেই তরুণী জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?" কোন উত্তর না পাইয়া সে আবার বলিল, "আইস"। নবকুমার তরুণীর পিছনে পিছনে চলিল কিন্তু কাপালিকের কুটিরের কাছে আসিয়াই সুন্দরী বনান্তরালে চলিয়া গেল।

কুটিরে কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ হইল। কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া চলিল। নবকুমার ভাবিল তাহার বাটী যাইবার কোন সদুপায় হইবে। কিছুদুর যাওয়ার পর হঠাৎ রমণী নবকুমারের পিঠে স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কোথা যাইতেছ। যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।" নবকুমার কিছুই বুঝিতে পারিল না। কাপালিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল তাহাকে যথার্থ পূজার স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তান্ত্রিকের পূজায় নরমাংসের প্রয়োজন। পূজার স্থানে গিয়া কাপালিক নবকুমারকে কতকগুলি শুষ্ক, কঠিন লতাগুল্ম দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া সমুদ্র-সৈকতে ফেলিয়া রাখিল। নবকুমার বল প্রকাশের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইল। কাপালিক বলির প্রাথমিক ক্রিয়া

সমাপনান্তে যথার্থ খড়্গ লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া দেখিল সেখানে খড়্গ নাই। কপালকুণ্ডলাকে বারবার ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইল না। তখন কাপালিক গৃহাভিমুখে গেল। ইতিমধ্যে কপালকুণ্ডলা খড়্গ দ্বারা নবকুমারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে লইয়া নিভৃত কাননাভ্যন্তরে এক দেবালয়ের অধিকারীর আশ্রয় লইল। অধিকারী কপালকুণ্ডলাকেও আর কাপালিকের নিকট ফিরিতে দিল না। কারণ সেখানে গেলে তাহার আর রক্ষা থাকিবে না। নবকুমারের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া অধিকারী পরদিন তাহাদের মেদিনীপুরের পথ পর্যন্ত রাখিয়া আসিল।

"কপালকুণ্ডলাও ছিল এক ব্রাহ্মণ কন্যা। বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন......কাপালিক ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজনসিদ্ধি করিতেন।"

নবকুমারের পূর্বে এক বিবাহ হইয়াছিল। রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে সে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের পর পদ্মাবতী প্রায়ই পিত্রালয়ে থাকিত। তাহার তের বছর বয়সে তাহার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তন কালে মোগল পাঠানের যুদ্ধে তিনি পাঠানদিগের হস্তে সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন; পরিশেষে জাতীয় ধর্ম বিসর্জন পূর্বক সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। জাতিভ্রষ্টা বলিয়া নবকুমারের পিতা পুত্রবধূকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেইজন্য নবকুমারের সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। স্বজনত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অল্পদিন পরে, মহম্মদীয় নাম ধারণ করিয়া সপরিবারে রাজধানী রাজমহলে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দার পরিগ্রহ করে নাই।

কপালকুণ্ডলা কাপালিক প্রতিপালিতা সন্ন্যাসিনী। বিবাহ কাহাকে বলে সে তাহাও সবিশেষ জানিত না। কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। যাত্রাকালে সে ভক্তিভাবে কালীকে প্রণাম করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিল। পত্রটি পড়িয়া গেল। সে এবং অধিকারীও ইহাতে বিষণ্ণ হইল। তাহার এই যাত্রা যে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনক হইবে না বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে এখানে তাহার আভাস দিলেন। কিন্তু নবকুমারের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে অধিকারীও এক বিল্বপত্র

দিয়াছিল। সেই বিল্বপত্র পড়ে নাই। দেবী সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলাও তখন অধিকারীর সঙ্গে ছিল। কিন্তু একই উদ্দেশ্যে পরে কপালকুণ্ডলার হাত হইতে দেবী কেন বিল্বপত্র গ্রহণ করিলেন না তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না।

নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারী প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইল। অর্থের অপ্রাচুর্যহেতু নিজে পদব্রজে চলিল। শিবিকা তাহাকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গেল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত একত্র হইবার জন্য দ্রুত চলিল। পথে তাহার সহিত এক অসামান্যা সুন্দরীর সাক্ষাৎ হইল। দস্যুরা তাহার পালকি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে পালকিতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহার একজন বাহককে তাহারা মারিয়া ফেলিয়াছে, অলঙ্কারগুলি লইয়া গিয়াছে এবং তাহার পায়েও দস্যুরা এক লাঠির ঘা মারিয়াছে। নবকুমার তাহাকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্তী চটিতে গেল। সেখানে কপালকুণ্ডলাও তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সুন্দরী নবকুমারের নিকট আত্মপরিচয়ে বলিল, তাহার নাম মতিবিবি—পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানী। নবকুমারের পরিচয় পাইয়া হঠাৎ প্রদীপ নিভিয়া গেল। নবকুমারের জীবনে আরেকটি ঝড়ের সূচনা হইল। মতিবিবি আগ্রার রঙমহলের একজন প্রধান নায়িকা; রাজকার্যে উড়িষ্যা হইতে আগ্রা ফিরিতেছিল। মতিবিবি নবকুমারকে চিনিতে পারিয়াছিল। নবকুমার কিন্তু জানিতে পারে নাই এই মতিবিবি নামধারিণী মুসলমানীই তাহার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী।

পরের শিবিকায় মতিবিবির সিন্দুক লইয়া অনেক লোকজন দাসদাসী আসিয়াছিল। কপালকুণ্ডলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মতিবিবি তাহাকে তাহার বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দিল। বনচারিণী কপালকুণ্ডলার নিকট তাহার মূল্য সামান্যই। পথিমধ্যে এক ভিক্ষুক চাহিতেই তাহাকে সে সমস্ত অলঙ্কার দিয়া দিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া স্বদেশে উপনীত হইল। নবকুমার পিতৃহীন, গৃহে তাহার বিধবা মাতা আর দুই ভগিনী ছিল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা বিধবা এবং কনিষ্ঠা শ্যামাসুন্দরী কুলীনপত্নী, সেইজন্য পিতৃগৃহেই বেশী থাকে। নবকুমারের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাগমনে তখন সকলেই এত খুশী হইল যে কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধে কেহ বেশী

মাথা ঘামাইল না। কপালকুণ্ডলা নামটি বিকট বলিয়া গৃহস্থেরা তাহার নাম রাখিয়াছিল মৃন্ময়ী। শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মৃন্ময়ীর বেশ ভাব হইল।

নবকুমারের সহিত সাক্ষাতের পর মতিবিবি বর্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিল। মতি-বিবি আসলে তাহার ছদ্মনাম। তাহার আসল মহম্মদীয় নাম হইল লুৎফ-উন্নিসা। তাহার পিতা আকবর শাহের আগ্রার প্রধান ওমরাহগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন। লুৎফা-উন্নিসাও আগ্রায় আসিয়া "পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য-গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন"। রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী যুবরাজ সেলিমের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যুবরাজ লুৎফ-উন্নিসাকে তাঁহার প্রধানা সহচরী করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইল। এবং উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কিন্তু তাহার স্বপ্ন টিকিল না। সেলিমের হৃদয় শের আফগানের পত্নী মেহের-উন্নিসার দিকে ধাবিত হইল। লুৎফ-উন্নিসা, মানসিংহ, খাঁ আজিম প্রভৃতি কিছু লোক সেলিম-পুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসাইবার এক ষড়যন্ত্র করে। সেই কার্যোপলক্ষ্যেই মতিবিবি উড়িষ্যায় তাহার ভ্রাতার নিকট আসিয়াছিল। প্রত্যাগমনের পথে নবকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

বর্ধমানে যাইবার পথেই মতিবিবি দূতমুখে খবর পাইল তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। কুমার সেলিম জাহাঙ্গীর শাহ হইয়াছেন। এদিকে মতিবিবি বর্ধমানে গিয়া বুঝিল, মেহের-উন্নিসাও জাহাঙ্গীরের যথা অনুরাগিণী। তারপর মতিবিবি আগ্রায় ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেখানে তাহার মন টিকিল না। তাহার মনে হইল এতদিনের তাহার ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, গৌরব সকলই বৃথা। সে ঠিক করিল বাঙলা দেশে ফিরিয়া যাইবে। এই জন্মের মত বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া সে সপ্তগ্রামে আসিল। রাজপথের অনতিদূরে নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিল। সেখানে নবকুমারের নিকট আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিল। সে নবকুমারের পত্নীত্বের গৌরব চাহে না, কেবল দাসী হইয়া থাকিতে চাহে। নবকুমার স্বীকৃত হইল না। সে 'পদ্মাবতী' বলিয়া নিজের পরিচয় দিল এবং এ জীবনে তাহার আশা ছাড়িবে না বলিল। নবকুমারও মতিবিবি পদ্মাবতী জানিয়া অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া আপন আলয়ে গেল।

লুৎফ-উন্নিসার আগ্রায় গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায়

এক বৎসর গত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী। তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। নবকুমারের বাটীর পশ্চাতেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন ছিল। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে সেই বন হইতে এক ঔষধ তুলিবার প্রয়োজন হইল। কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর উপকারার্থে সেই কাজ করিতে তৎপর হইল। নবকুমার বাধা দিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা এই কার্যে কোন দোষ দেখিতে পাইল না। সে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কপালকুণ্ডলার সমুদ্র-সৈকতের পূর্বস্মৃতি মনে পড়িল। সে অন্যমনে যাইতে যাইতে নিবিড় বনমধ্যে আলো দেখিতে পাইল। কপালকুণ্ডলা পূর্বাভ্যাস-ফলে ভয়হীনা অথচ কৌতূহলময়ী। সে আলোর দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু যেখানে আলো জ্বলিতেছে সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিন্তু অদূরে এক ভগ্নগৃহের মধ্যে দুটি মনুষ্যের কথোপকথন শুনিতে পাইল। এক ব্রাহ্মণবেশী বাহিরে আসিয়া কপালকুণ্ডলাকে চিনিতে পারিল। তাহাদের আলোচনা যে তাহারই সম্বন্ধে সে তাহা কপালকুণ্ডলাকে বলিল এবং জানাইল যে সে পুরুষ নহে। তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ব্রাহ্মণবেশী আবার ভগ্নগৃহে প্রত্যাগমন করিল। ব্রাহ্মণবেশীর অধিক বিলম্ব দেখিয়া কপালকুণ্ডলা দ্রুত পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিল। আকাশে ঝড় উঠিল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িল। সে বুঝিতে পারিল তাহার পশ্চাতে আরও একব্যক্তি আসিতেছে। ঘন বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে কপালকুণ্ডলা চিনিতে পারিল তাহার অনুসরণকারী ব্যক্তিটি সাগরতীর-প্রবাসী সেই কাপালিক।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বনে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল। এক্ষণে সব কথা চিন্তা করিতে করিতে কপালকুণ্ডলা ঘুমাইয়া পড়িল। কপালকুণ্ডলা রাত্রে এক দুঃস্বপ্ন দেখিল। তাহার আনন্দমুখর তরণী সমুদ্র দিয়া যাইতে যাইতে ঝড়ের মধ্যে পড়িল। সে জলমগ্ন হইল। সকালে উঠিয়া ব্রাহ্মণবেশীর এক পত্র পাইল। সে তাহাকে সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা বিধেয় কিনা তাহা লইয়া কপালকুণ্ডলা সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা চিন্তা করিল। শেষ পর্যন্ত যাওয়াই সিদ্ধান্ত করিল। সন্ধ্যার পর বনাভিমুখে যাত্রা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৃহের প্রদীপ নিভিয়া গেল।

ব্রাহ্মণবেশীর পত্র নবকুমারের হাতে পড়িল। কপালকুণ্ডলা চলিয়া যাইবার

পর সেই লিপি পাঠ করিয়া নবকুমারের মনে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিল। স্থির করিল, সে গোপনে কপালকুণ্ডলার মহাপাপ প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মহত্যা করিবে। নবকুমার কপালকুণ্ডলার অনুগমনে বাহির হইবামাত্র কাপালিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কাপালিক বলিল, সে এবার নবকুমারের প্রাণ বধার্থে আসে নাই। কপালকুণ্ডলার প্রাণ-বলিই তাহার ইচ্ছা। কিন্তু কাপালিকের এখন আর সেই ক্ষমতা নাই। নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলা যে রাত্রে সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করে সেই রাত্রেই তাহাদের অন্বেষণ করিতে করিতে কাপালিক এক বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়। ফলে তাহার দুইটি হস্তই ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। তখন কাপালিক এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কপালকুণ্ডলার বলিই ভবানীর একান্ত ইচ্ছা। বিশ্বাস-ঘাতিনী কপালকুণ্ডলার বধার্থে কাপালিক নবকুমারের সাহায্য চাহিল। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় নবকুমার কাপালিকের সঙ্গে চলিল।

ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে আত্মপরিচয় দিল। এমন কি সে যে কপাল-কুণ্ডলার সপত্নী তাহাও বলিল। লুৎফ-উন্নিসা তাহার নিজ অভিপ্রায়ও তাহার নিকট গোপন রাখিল না। কাপালিক যে কপালকুণ্ডলাকে বধার্থে তাহার সাহায্য চাহিয়াছিল তাহাও জানাইল। লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলাকে স্বামী ত্যাগ করিলে অশেষ ধনরত্নের লোভ দেখাইল। কপালকুণ্ডলার সংসারে কোন বন্ধন ছিল না। সেজন্য সে তাহার সুখের পথ রোধ করিতে চায় না। সে আবার বনচর হইবে।

নবকুমার এবং কাপালিক বনপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কপালকুণ্ডলা এবং লুৎফ-উন্নিসার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছিল। নবকুমার কিন্তু পুরুষ-বেশী লুৎফ-উন্নিসাকে একজন ব্রাহ্মণ কুমার বলিয়াই বিশ্বাস করিল। নবকুমারের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কাপালিক তাহাকে স্বহস্তে প্রস্তুত তেজস্বিনী সুরা পান করাইল। লুৎফ-উন্নিসা কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ কপালকুণ্ডলাকে একটি অঙ্গুরী দিয়াছিল, নবকুমার তাহাও লক্ষ্য করিল। পরে কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। নবকুমার এবং কাপালিকও তাহার অনুসরণ করিল।

কপালকুণ্ডলা নানা চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছিল। আত্মজীবন বিসর্জনে সে সঙ্কোচশূন্য। তাহার মনে হইল ভৈরবী যেন তাহাকে ডাকিতেছেন। নবকুমারের তখন অস্থিরচিত্ত, বিশেষতঃ সুরাগরল প্রজ্বলিত হৃদয়। কাপালিক তাহাকে

বারবার সুরা পান করাইতেছে। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে ডাকিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হাত ধরিয়া কাপালিকের সঙ্গে শ্মশানাভিমুখে চলিল।

কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত স্থানে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তন্ত্রাদির বিধানানুসারে পূজা আরম্ভ করিল। পরে উপযুক্ত সময়ে কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আনিতে নবকুমারকে আদেশ করিল। শ্মশানের শবমাংসভুক পশু সকলের মধ্য দিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। নবকুমারের হাত কাঁপিতেছে দেখিয়া কপালকুণ্ডলাই প্রথম কথা বলিল। নবকুমার ভয় পাইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। নবকুমার উন্মত্তের ন্যায় বলিল, "মৃন্ময়ি! কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয় তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।" কপালকুণ্ডলা বলিল—"আজি যাহাকে দেখিয়াছ—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি।…কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।" তাহাদের কথোপকথন শেষ হইতে না হইতেই যে তটভূমিতে তাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহা গঙ্গাগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারাও পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। সেই অনন্ত জলস্রোতে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল।

[ঙ] ॥ উপন্যাস পাঠ : সংক্ষিপ্ত টীকা ॥

বঙ্কিমচন্দ্র একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেজন্য কাহিনীর সহিত সুস্পষ্ট সম্বন্ধ আছে এমন ঘটনা এবং চরিত্রকেই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন। এই কাহিনীর প্লট সুবিন্যস্ত। ঘটনার চক্রজালে একটি অরণ্যচারী নারীর জীবনে যে বিপর্যয় সাধিত হয় তাহার এক অনবদ্য কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। একটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ হয়। ভীষণদর্শন তান্ত্রিক কাপালিকের হাত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া কপালকুণ্ডলার ভাগ্য নবকুমারের সহিত বিচিত্র জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। বনচারীর প্রকৃতি সমাজ-জীবনে একান্ত বেমানান। সমাজ-মানুষের সন্দেহ-প্রবণতায় মুক্তপ্রাণ, সরলপ্রকৃতি, আত্মবিসর্জনে সঙ্কোচহীন নারীর সলিল সমাধি হইল। কপালকুণ্ডলা কাহিনীর ইহাই মূল বক্তব্য।

উপন্যাসটি চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সমুদ্র সৈকতে একাকী নিঃসঙ্গ

অবস্থায় নবকুমারের পরিত্যক্ত হওয়া হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারকে অধিকারীর বিদায় দান পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। একটা আকস্মিকতার মধ্যে এই কাহিনীর আরম্ভ। অবশ্য শেষও হইয়াছে আকস্মিকতার মধ্যে। অভাবিতভাবে নবকুমারের প্রতিবেশী নৌকারোহিগণ তাহাকে সমুদ্রতীরে ব্যাঘ্রসঙ্কুল বনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। অভাবিতভাবেই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া নবকুমার জীবনরক্ষার তাগিদে জীবননাশী কাপালিকের কঠিন কবলে পড়িল। সেই অবস্থায় অপ্রত্যাশিত ভাবে অরণ্যচারী কাপালিক প্রতিপালিতা এক সুন্দরী বালিকার অযাচিত সাহায্যলাভে অভাবিতভাবে প্রাণরক্ষা এবং পলায়ন, অসুর-শক্তিমান কাপালিকের হঠাৎ বালিয়াড়ির শিখরচ্যুতি এবং হিজলীর কালী-মন্দিরের অধিকারীর আনুকূল্যলাভে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত বিবাহ এবং গৃহাভিমুখে যাত্রা সবই আকস্মিক। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইতেই রোমান্টিকতার উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। অপ্রত্যাশিত কতকগুলি ঘটনার অতি দ্রুত সংঘটনে পাঠকও বিস্ময়াভিভূত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে কপালকুণ্ডলার মেদিনীপুর আগমন হইতে নবকুমারের গৃহে শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথন কালে ভবিষ্যতের প্রতি এক অজানা আশঙ্কা বোধের প্রকাশ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই খণ্ডে কাহিনী জটিলতর হইয়াছে। পথে দস্যুহস্তে নিগৃহীতা মতিবিবির সঙ্গে নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ হয়। এই মতিবিবি আসলে নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। কাপালিকের নিষ্ঠুর হাত হইতে পলায়ন করিয়াও নবকুমার-কপালকুণ্ডলার জীবন নির্দ্বন্দ্ব হইল না। তাহা ছাড়া যাত্রার প্রাক্কালে দেবীর নিকট নিবেদিত বিল্বপত্র পড়িয়া যাওয়ায় নবকুমারের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলার মনে সংশয়বোধ কাহিনীর নাটকীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে মতিবিবির কাহিনী। পিতার বাধ্যতামূলক মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বন করার পর পদ্মাবতীর নাম হইল লুৎফ-উন্নিসা। সপ্তগ্রাম-নিবাসী নবকুমার শর্মার কুলবধূ ঘটনাচক্রে আকবর বাদশাহের পুত্র যুবরাজ সেলিমের অনুগ্রহভাগিনী পর্যন্ত হইয়াছিল। দিল্লীর মসনদে কে আরোহণ করিবে তাহার কলকাঠি পর্যন্ত যাহারা নাড়াচাড়া করে তাহাদের অন্যতম লুৎফ-উন্নিসা উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনপথে নবকুমারকে দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিল। আগ্রার নবাবী হালচালে তাহার

অরুচি ধরিয়াছিল। আবার নবকুমার-সাধনার দুর্বার প্রচেষ্টায় তাহার সপ্তগ্রামে আবির্ভাব হইল।

তৃতীয় খণ্ডের কাহিনী বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র একবৎসর কাটাইয়া দিলেন। কপালকুণ্ডলা ততদিনে নবকুমারের সংসারে অনেকটা ধাতস্থ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে সমাজে স্থায়ী করিয়া তাঁহার রোমান্টিক কল্পনাকে খাটো করিতে চাহেন নাই। প্রকৃতির কোলেই যে আপন নিয়মে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে প্রকৃতির কোলেই ফিরাইয়া দিলেন। নবকুমারের কাতরতায় কপালকুণ্ডলার মধ্যে রমণীসুলভ কোমলতার উন্মেষ দেখা গেলেও ভবানীর চরণে আত্মবিসর্জনের সংকল্প তাহার দুর্জয় হইয়া উঠিল। এ হেন নারীর সতীত্বের প্রতি সন্দেহের অনুশোচনায় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নবকুমারও গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিল। আর উঠিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের খণ্ড এবং খণ্ডান্তর্গত পরিচ্ছেদ সমূহের নামকরণ করিয়াছেন। যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম এই কয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য গল্প উপন্যাসে তিনি এই নামকরণ রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে খণ্ডগুলির কোন নামকরণ করেন নাই কিন্তু ইহাদের অন্তর্গত পরিচ্ছেদ সমূহের পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়াছেন। এই নামকরণ রীতি কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রে নহে এই সময়কার প্রতীচ্যের বিভিন্ন উপন্যাসেও তাহা দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্যরীতিতে উপন্যাস রচনা করিতে বসিয়া পাশ্চাত্ত্যরীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। আধুনিক উপন্যাসে অনুরূপ নামকরণ দেখা যায় না। আধুনিক রুচিতে ইহাকে শিল্পসম্মত মনে হয় না। উপন্যাসে বিভিন্ন খণ্ড এবং পরিচ্ছেদে বর্ণিত নানা ঘটনা একটি সমগ্ররূপ। যেখানে তাহার সামগ্রিক বিচারই আলোচ্য, সেখানে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের পৃথক গুরুত্বের কোন স্থান নাই। অতএব তাহাদের বিভিন্ন নামকরণের দ্বারা উপন্যাস-শিল্পের কোন সাহায্য হয় বলিয়া মনে হয় না। বরং পাঠক যেখানে জীবনের নানা ঘটনা-সংঘাতের নিবিড় পরিচয় লাভের জন্য উন্মুখ, সেখানে পূর্বাহ্ণেই নামকরণের দ্বারা তাহা আভাসিত করায় পাঠকের আগ্রহ লঘু হইয়া যায়। সেজন্য বর্তমানে ইহাকে বাহুল্য মনে করিয়া পরিবর্জন করা হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের প্রতি পরিচ্ছেদে নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারই দ্যোতক

বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে বহু উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা বহু গ্রন্থের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানের 'পরিধির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবলমাত্র একজন গল্পকারই ছিলেন না বরং একজন উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ইহা তাহারই পরিচয়। এই সব উদ্ধৃতির ব্যঞ্জনা পরিচ্ছেদের নামকরণকে অধিক আকর্ষণীয় করিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে এই উদ্ধৃতি প্রয়োগ করেন নাই। উপন্যাসে পাঠক লেখকের জীবনানুভূতিই নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতে চায়, তাঁহার পাণ্ডিত্যকে নয়। উপন্যাসে পাণ্ডিত্য প্রকাশের স্থান নাই; সেখানে রসবোধেরই সম্যক প্রকাশ। তাহা ছাড়া এই উদ্ধৃতি প্রকাশের দ্বারা কাহিনীর গতি শিথিল হইয়া পড়ে। সেইজন্য পরবর্তীকালে তিনি উপন্যাসকে উদ্ধৃতি-কণ্টকিত না করিয়া উপন্যাস-শিল্পের প্রতি সুবিচার করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উদ্ধৃতিগুলির সঙ্গে এই উপন্যাসে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সংগতি সর্বত্র দেখা যায় না। আমরা উদ্ধৃতিগুলি ব্যাখ্যা করার সময় তাহা দেখাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে বড়জোর একটা মৃদু ভাবসাম্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম খণ্ড ॥

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

"সপ্তগ্রাম নিবাসী নবকুমার শর্মা প্রতিবেশীদের সঙ্গে গঙ্গাসাগর তীর্থ দর্শন সমাপন করিয়া নৌকাযোগে দেশে ফিরিতেছিল। রাত্রিশেষের ঘন কুয়াশায় মাঝিকেরা দিক ঠিক করিতে পারিল না। তখন পর্তুগীস ও অন্যান্য জলদস্যুদের ভয়ে অনেক লোক একসঙ্গে যাতায়াত করিত। কুয়াশায় নবকুমারদের নৌকা অন্যান্য নৌকা হইতে দূরে পড়িয়াছিল। স্রোতে যে নৌকা কোন্ দিকে যাইতেছিল তাহাও কেহ ঠিক করিতে পারে নাই। এদিকে যাত্রীদের অনেকে সত্বর দেশে ফিরিবার জন্য আগ্রহী। মাঝিদের কথাবার্তার মধ্যে আরোহীদের প্রত্যয় হইল তাহারা অনিশ্চয়ের দিকে চলিয়াছে। এই অবস্থায় সমুদ্রে গিয়া পড়িলে সকলেই অকূলে মারা যাইবে—এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িল। নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। নবকুমার তখন সকলকে অভয় দিতে লাগিল

এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত নাবিকগণকে বাহন বন্ধ করিতে বলিল। কিছুক্ষণ পরেই সূর্যোদয় হইল। কুয়াশা কাটিয়া গেল। সকলে দেখিল তাহারা রসুলপুরের মোহানায় আসিয়া পড়িয়াছে। একদিকে তাহাদের কূল অতি নিকটে, অপরদিকের কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। নিকটবর্তী কূল সমুদ্রের পশ্চিমতট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল।

এই পরিচ্ছেদের নাম 'সাগরসঙ্গমে'। এই নামকরণের মধ্যে ঘটনাস্থলের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এখানেই নবকুমারের জীবন নূতন মোড় গ্রহণ করিল। অকূলে মারা যাইবার ভয়ে যাহারা কাতর হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা আশ্বস্ত হইল আর যে আরোহীদের সাহস দিতেছিল তাহারই জীবন-সংশয়ের পূর্বাভাস এখানে আভাসিত হইল। ইহাই গল্পের প্রারম্ভিক ঘটনার প্রথমাংশ। এখানে আমরা প্রারম্ভিক ঘটনা বলিতে কি বুঝায় তাহার পরিচয় লইতে পারি :

"প্রারম্ভিক ঘটনা"—ইহাই গল্পের প্রথমাংশ। এই অংশের উদ্দেশ্য হইল লেখক যে গল্প বলিতে যাইতেছেন তাহার সম্বন্ধে পাঠকদের পরিচিত করিয়া তোলা। অপরিচিত ঘটনা বা অপরিচিত লোকদের কথাবার্তায় কোন পাঠকই আনন্দ পাইতে পারে না। সেজন্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে গল্পের সূচনা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। গল্পের এই অংশকে ব্যাখ্যামূলক অংশও বলা যায়। কারণ এই অংশের মধ্যে লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা সাধন করেন। ইহার দ্বারা কি ধরনের চরিত্র এবং সে কে, কোন্ অবস্থায় তাহার ঘটনা বিবৃত হইতেছে সবকিছু পাঠক জানিতে পারে। সেজন্য প্রারম্ভিক ঘটনার মধ্যেই লেখকের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রথমাংশকে উপাদানগত ভাবে চারিভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, স্থান এবং কাল অর্থাৎ কোথায় এবং কখন কাহিনীর আরম্ভ ; দ্বিতীয়ত, চরিত্রগুলি এবং তাহাদের সম্পর্ক, এইখানেই প্রধান চরিত্রগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বা তাহাদের সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়া তাহাদের পরিচয় জানা যায় ; বিভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যে অন্ততঃ প্রধান কয়েকটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায়। তারপর গল্পের পূর্বেও যে গল্প ছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, গল্পের অন্তর্নিহিত সুরের আভাসও এখানে পাওয়া যায় অর্থাৎ গল্প কোন্ সুরে বাঁধা—করুণ, হাস্যরসাত্মক না মিলনাত্মক তাহা প্রথমেই পাঠকের জানা হয়। চতুর্থত, প্রাথমিক ঘটনা (Initial incident) অর্থাৎ

এখানেই গল্পের আরম্ভ। গল্পের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব নিহিত আছে তাহার প্রথম আভাস এই প্রাথমিক ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায়।"

(ছোট গল্পের বিচিত্র কথা—ডঃ সরোজমোহন মিত্র)

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যে আমরা এই প্রারম্ভিক ঘটনার প্রথমাংশের পরিচয় পাই। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বাকী অংশগুলিও বঙ্কিমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

Floating straight obedient to the Stream : সেক্সপীয়রের Comedy of Errors নাটকের এই উদ্ধৃতিটি প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অন্তর্গত। Syracuse-এর বণিক Aegeon প্রকৃতি তাড়িত হইয়া Ephesus-এ আসিয়াছিল। Ephesus-এর নিয়ম ছিল, যদি কোন Syracuse-এর মানুষ Ephesus-এ আসে তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে এবং ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত হইবে। Epidamnum হইতে Corinth-এর দিকে যাইবার সময় তাহার জাহাজ ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়ে। বণিক নিজেকে এক ভাঙ্গা মাস্তলের সঙ্গে বাঁধিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। ভীষণ কুয়াশায় সে বুঝিতে পারে নাই স্রোতোবেগ তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে।

"At length the sun, gazing upon the earth.
Dispers'd those vapours that offended us ;"

সূর্য উঠিলে বণিক দেখিল তাহারা বিপরীত দিকে আসিয়াছে। নবকুমারদের নৌকাও ঘন কুয়াশায় বিপথগামী হইয়াছিল। নবকুমারের আদেশে মাঝিরা বাহন বন্ধ করিয়া স্রোতের অনুকূলে নৌকা যাইতে দিল। কুয়াশায় স্রোতের টানে বিপথগমনের সঙ্গে উভয় কাহিনীর সাদৃশ্য আছে।

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে : সম্রাট আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার যে উল্লেখ আছে তাহা আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষ সময়ের এবং জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের প্রারম্ভের। একাধিক চরিত্রের ভাগ্যও আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। অতীত

ইতিহাসের ধূসর আলোয় বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের পটভূমিকা নির্ণয় করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা বাংলা সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট রোমান্স। অতীতচারণা রোমান্সের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেখানে বাস্তব জীবনের চিত্রণ অপেক্ষা অধিক কল্পনা শক্তি বিকাশের সুযোগ পাওয়া যায়।

গঙ্গাসাগর : বঙ্গোপসাগরের যে স্থানে গঙ্গা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বর্তমানে এই স্থানের নাম কাকদ্বীপ। ইহা হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এইখানে কপিল মুনির আশ্রম আছে। কপিল মুনির অভিশাপে সগর-পুত্রগণ ভস্মীভূত হয়। তারপর সগর বংশের উত্তর পুরুষ ভগীরথ দুশ্চর তপস্যা দ্বারা গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেন। গঙ্গার পুণ্যস্পর্শে সগর-পুত্রগণ মুক্তিলাভ করেন। পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে বিরাট মেলা হয়। ভারতবর্ষের বহুস্থান হইতে নানা যাত্রী এই সাগরসঙ্গমে স্নান করিবার জন্য ঐ সময়ে আসিয়া মিলিত হয়। **পর্তুগীস ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে :** পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইয়োরোপ হইতে পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজ বণিকগণ ব্যবসায়ে মুনাফার লোভে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। সুসংহত-পদ্ধতিতে এদেশে ইয়োরোপীয় বণিকদের অণুপ্রবেশকে পরাজিত করা সম্ভব না হওয়ায় তাহাদের অনাচারও বাড়িয়া চলে। "পশ্চিমে দিউ ও দমন থেকে পূর্বে হুগলী পর্যন্ত ভারতের সমগ্র উপকূলেই পর্তুগীজ আস্তানা ছড়িয়েছিল। আকবরের যুগে ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহের এক 'ফরমান' অনুযায়ী বাংলা দেশে সপ্তগ্রামে তারা কুঠি বানায় এবং সেখান থেকে ক্রমে হুগলীর দিকে এগিয়ে যায়। শাহজাহানের আমলে এদের অনাচার সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুরা স্থানীয় পর্তুগীজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশের ভিতর বহুদূর চলে যেত, আর অনেক গ্রাম উজাড় করে লোক ধরে নিয়ে এসে তাদের ক্রীতদাস করত, জোর করে খ্রীষ্টান বানাত, হাত ফুটো করে তার মধ্যে সরু বেত ঢুকিয়ে যন্ত্রণা দিত। এই দুর্বৃত্তেরা জাঁক করে বলত যে, বারোমাসে তারা যত লোককে খ্রীষ্টান করেছে, দশ বৎসরে সারা দেশে তত লোক খ্রীষ্টান হয় নি ; এ খবর লিখেছেন ফরাসী পর্যটক বের্নিয়ের স্বয়ং। মুঘল সরকারকে ফাঁকি দিয়ে এই পর্তুগীজেরা তামাক এবং অন্যান্য বাণিজ্যবস্তুর উপর জোর করে শুল্ক আদায় করত, হিন্দু ও মুসলমান ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি

করে দিত। শোনা যায় এভাবে মহিষী মমতাজমহলের দুজন বাঁদীকে তারা ধরে নিয়ে যায়।" (ভারতবর্ষের ইতিহাস—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।

ঘোরতর কুজ্ঝটিকা ঃ ভীষণ কুয়াশা। 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ'কার পূর্ণচন্দ্র 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথায় এক দিবসের কুয়াশার কথা বলিয়াছেন। সে দিবসের কুয়াশা এমন হইয়াছিল যে, কোলের মানুষ দেখা যায় নাই। এত গভীর কুয়াশা যে, কলেজ যাইবার কালে বেলা ১০টা ১১টার সময় নৌকায় উঠিয়াও পাড়ে যাইতে না পারিয়া মূলাযোড়ে বরাবর পৌছিল। পূর্ণচন্দ্র বলেন, 'কপালকুণ্ডলা গল্পটি যে কুজ্ঝটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় এই দিনকার ঘটনাবলম্বনে।' **বহর ঃ** নৌশ্রেণী। জলদস্যুদিগের ভয়ে তখন নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করিত। **ব্যাটারা বিশ পঁচিশ…লইয়া গেল ঃ** চোরে বৃদ্ধ যাত্রীর ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল। পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে তিনি গঙ্গাসাগরেই এই খবর পাইয়াছিলেন। দেশে তখন আইনশৃঙ্খলার শৈথিল্য হেতু চুরি এবং দস্যুবৃত্তি দেখা দিয়াছিল। **পরকালের কর্ম ঃ** মৃত্যুর পর সদ্‌গতির ব্যবস্থা। হিন্দুরা আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী। মৃত্যুর পর আত্মা সদগতি না পাইলে আবার নবজন্ম লাভ করিবে। ত্রিতাপজর্জর এই পৃথিবীতে যেন আর পুনর্জন্ম না হয় তাহার জন্য মানবজন্মেই পরকালের সদ্‌গতির চেষ্টা করিতে হয়। **সমুদ্র দেখিব ঃ** নবকুমার সাহসী যুবক। সে পুণ্যার্জনের জন্য গঙ্গাসাগরে আসে নাই। সমুদ্রের অনন্ত সৌন্দর্য দর্শনই তাহার অভিলাষ ছিল। নবকুমারের যে ধর্মীয় গোঁড়ামী নাই এখানে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় **দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী……কলঙ্ক রেখা ঃ** ইহা মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের পঞ্চদশ শ্লোক। ইহার অর্থ—লৌহ-চিক্রসম (অয়শ্চক্রনিভস্য) সমুদ্রের (লবণাম্বুরাশেঃ) তমাল ও তালবন সমূহের বর্ণে নীল (তমালতালী বনরাজি নীলা), ক্ষীণ তটভূমি (তন্বী বেলা) দূর হইতে (দূরাৎ) অবিচ্ছিন্নভাবে অঙ্কিত (ধারানিবদ্ধা) কজ্জলরেখার মত (ইব কলঙ্করেখা) শোভা পাইতেছে (আভাতি)। রাবণ বধের পর রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দে পুষ্পক রথে শান্ত আকাশপথে ফিরিতেছেন। তাঁহারা আকাশপথে নিম্নস্থ পৃথিবীর শোভা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। সীতাকে তিনি দূরে সিন্ধু সৌন্দর্য দেখাইয়া বলিতেছেন, "ইন্দুমুখি! ঐ দূরে—অতিদূরে,—অধোদেশে নিতান্ত ক্ষীণ রেখার ন্যায় প্রতীয়মান লবণাম্বুরাশির বলয়াকার তীরভূমি দেখ

যাইতেছে ;—একবার দৃষ্টিপাত কর। দেখ দেখ, তমাল ও তালবনমালায় বেলাভূমি একেবারে নীল—অতি গাঢ় নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ বেলার কি অপূর্ব শোভাই না হইয়াছে! ঐ দেখ, লৌহ চক্রাকার নীলাম্বুরাশির ধারাভাগে যেন কত-না মালিন্যের রেখা পড়িয়াছে! কি সুন্দর চিত্র!"

শ্রুতিঃ কর্ণ। **বারদরিয়ায়ঃ** বহিঃসমুদ্রে। নদীর মোহানা যেখানে সাগরে মিলিত হইয়াছে। **দণ্ডের ঃ** ষষ্টি (৬০) পল (২৪ মিনিট) পরিমিত সময়ের। **একটি স্ত্রীলোক………কাঁদিল নাঃ** হিন্দুদিগের সংস্কার আছে, সন্তানহীনা নারী সন্তানলাভের মানসে প্রথম সন্তান গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিবার মানত করিতেন। পরে সন্তান জন্মিলে তাহাকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করা হইত। গঙ্গাদেবী সাধারণতঃ যাহার সন্তান তাহাকে ফিরাইয়া দিতেন। স্ত্রীলোকটিও সংস্কারবশে তাহার সন্তানকে সমুদ্রে বিসর্জন দিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে আর সে তুলিতে পারে নাই। গঙ্গাদেবী তাহাকে ফিরাইয়া দেন নাই। পুত্রশোকে কাতর রমণীর নিকট তাহার জীবনই দুর্বহ বোধ হইল। জীবনের উপর বিতৃষ্ণ মানুষের নিকট জীবন-মরণ সমার্থক, সেজন্য নৌকাযাত্রীরা যখন আসন্ন মৃত্যুর জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিল তখন সে নির্বিকার রহিল। মৃত্যু আর তাহার নিকট ভয়ঙ্কর নহে। লর্ড হেস্টিংস এই মধ্যযুগীয় প্রথার অবসান ঘটান।

দরিয়ার পাঁচ পীরঃ দরিয়া—সাগর। পীর—মুসলমানদিগের মধ্যে ঈশ্বর-জানিত পুরুষ। বদর, আলি, কালু, গাজী, একদলি—এই পাঁচজন পীর মুসলমান নাবিকদিগের উপাস্য। এই পাঁচজন ফকির পৃথিবীর সমস্ত জলভাগ রক্ষা করেন। **কলধৌত প্রবাহবৎঃ** গলিত স্বর্ণ প্রবাহের ন্যায়।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

জোয়ারের বিলম্ব দেখিয়া নৌকারোহীরা তীরে অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিল। তারপর রান্নার উদ্যোগ করিল। কিন্তু নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। অনতিদূরের ঘন বনে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা সম্ভব কিন্তু ব্যাঘ্রভয়ে সেখানে কেহ যাইতে স্বীকৃত হইল না। তখন সাহসী যুবক নবকুমার একাকীই বনে কাষ্ঠসংগ্রহে গেল। অনভ্যাসহেতু কাষ্ঠ লইয়া ফিরিতে নবকুমারের বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে জোয়ার আসিল। জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে

বহুদূরে চলিয়া গেল। নবকুমারের কথা সকলের মনে পড়িল। কেহ বলিল, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে খাইয়াছে। অতএব তাহার জন্য আর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহা ছাড়া আরও কারণ ছিল। সেজন্য নবকুমারকে ছাড়াই নৌকা সপ্তগ্রামে ফিরিয়া গেল। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইল। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নাম রাখিয়াছেন 'উপকূলে'।

"Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!—" উক্তিটি সেক্সপীয়রের King Lear নাটকের প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য হইতে উদ্ধৃত।

এই উক্তি Britain-এর বৃদ্ধ রাজা Lear তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা Duke of Albany-র নিকট করিয়াছেন। অতিবৃদ্ধ Lear তাঁহার রাজত্ব তাঁহার তিনকন্যার মধ্যে ভাগ করিবার পূর্বে কোন্ কন্যা তাঁহাকে কতটা ভালবাসে জানিতে চাহিলেন। প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যা Goneril ও Regan জানাইলেন যে, তাঁহাদের পিতৃপ্রেম বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু তৃতীয়া কন্যা Cordelia কন্যার পিতার প্রতি যতটুকু কর্তব্য তাহার অধিক ভালবাসিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। ক্রুদ্ধ Lear Cordelia-কে রাজ্য হইতে নির্বাসনের দণ্ড দিলেন এবং দুই কন্যার মধ্যে রাজ্য ভাগ করিয়া দিলেন। ঠিক হইল পালা করিয়া তিনি প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার নিকট থাকিবেন। নির্বোধ রাজা কন্যাদের চিনিতে পারেন নাই। হৃতসর্বস্ব Lear-কে Goneril বা Regan মর্যাদা সহকারে রাখিল না। Goneril-এর নিকট থাকা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক বোধ হইল। তিনি জামাতা Albany-র নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া স্থানত্যাগ করিবার প্রাক্কালে বলিলেন—

> Prepare my horses.
> Ingratitude, thou marble-hearted fiend,
> More hideous when thou show'st thee in a child
> Than the sea-monster!

এখানে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে পাষাণ-হৃদয় নারকীয় জীবরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। নবকুমার কাষ্ঠ সংগ্রহার্থে বনে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে নৌকার আরোহিগণের মধ্যে একজনকে তাহার সাহায্যের জন্য আসিতে বলিয়াছিল। ব্যাঘ্রভয়ে ভীত

যাত্রিগণ রাজী হয় নাই। নবকুমারের ফিরিতে দেরী হইল। ইতিমধ্যে ভৈরব গর্জনে জোয়ার আসিল। নৌকার আরোহিগণ নবকুমারকে বাঘে খাইয়াছে এই কথা বলিতে বলিতে নৌকা ছাড়িয়া দিল। যে মানুষ তাহাদের জন্য কাষ্ঠসংগ্রহ করিতে গিয়াছিল তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল না।

সৈকতে : বালুভূমিতে। **জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই :** জোয়ারের শুরুতেই। **প্রাগুক্ত :** পূর্বোক্ত—যাহার সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। **সমাহরণ :** সম্যকরূপে সংগ্রহ। **নবকুমার…স্বভাব ছিল না :** নবকুমার ধনী ছিল সেজন্য মেহনত করিবার তাহার কোন প্রয়োজন হইত না। ভাবাবেগের আতিশয্যেই নবকুমার কাঠ আনিবার জন্য গিয়াছিল। **স্বেদপ্রস্রুতি :** প্রচুর ঘর্ম নির্গমন। **তুমি অধম…না হইব কেন ?**—ব্যাখ্যা দেখ।

॥ **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** ॥

নবকুমার কাঠ লইয়া আসিয়া দেখিল নদীতীরে নৌকা নাই। তাহার অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয় সঞ্চার হইল বটে কিন্তু সঙ্গীরা যে একেবারে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহা সে ভাবিতে পারিল না। তাহার মনে হইল জোয়ারের স্রোতোবেগ কিছুটা মন্দীভূত হইলে তাহারা নৌকা লইয়া তাহাকে লইতে আসিবে। এদিকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইল; নৌকার সন্ধানে চারিদিকে ছুটাছুটি করিত লাগিল। কিন্তু কোথাও নৌকা দেখিতে পাইল না। তখন তাহার ধারণা হইল, হয় নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নয় সঙ্গীরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। নবকুমার যেন সমস্ত অন্ধকার দেখিল। গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য নাই, পেয় নাই, নদীর জলও এত নোনা যে মুখে দেওয়া যায় না। দুরন্ত শীত নিবারণের জন্য একটা গায়ের কাপড় পর্যন্ত নাই। অথচ তাহাকে এই বরফতুল্য ঠাণ্ডা নদীতীরে মুক্ত আকাশের নীচে কাটাইতে হইবে। তার উপর বাঘ-ভালুকের ভয়ও আছে। অতএব সে বুঝিতে পারিল, প্রাণনাশ নিশ্চিত।

অস্থিরচিত্ত নবকুমারের পক্ষে একস্থানে বসিয়া থাকাও কষ্টকর হইল। সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং পথশ্রমে নবকুমার অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পিঠ দিয়া ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

জনহীন বিপদসঙ্কুল সমুদ্র সৈকতে পরিত্যক্ত নবকুমারের অসহায় অবস্থা এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন 'বিজনে'।

• —"Like a veil,…And hopeless eyes."

উদ্ধৃতিটি Byron-এর Don Juan কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

Don Juan জাহাজে যাইবার সময় গোধূলি লগ্নে সূর্যহীন অন্ধকার নামিয়া আসিল। অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছে রাত্রির ভ্রূকুটি ও বিদ্বেষ। তাহাদের বিবর্ণ আশাহীন মুখের উপর এই ভয়াল অন্ধকার মূর্তি প্রকট হইল।

গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমনকালে এক যাত্রিবাহী নৌকা—যাহাতে নবকুমার ছিল—গাঢ় কুয়াশায় মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। প্রত্যুষে রৌদ্র উঠিলে নৌকা এক ডাঙ্গায় পৌছায়। সেখানে নবকুমার জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিতে গেলে নৌকা তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ফিরিয়া নবকুমার দেখে জনমানবহীন প্রান্তরে সে পরিত্যক্ত হইয়াছে। "ক্রমে অন্ধকার হইল।… অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন; —আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র নীরব; কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।" নবকুমারের অসহায় বিপন্ন অবস্থা Don Juan-এর অসহায়ত্বের সহিত তুলনীয়।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

অনেক রাত্রে নবকুমারের ঘুম ভাঙ্গিল। তাহাকে এতক্ষণ বাঘে খায় নাই দেখিয়া সে আশ্চর্যবোধ করিল। হঠাৎ সে বহুদূরে একটি আলো দেখিতে পাইল। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল তাহা দাবানল নহে, আগ্নেয় আলোক। আলো যখন আছে তখন সেখানে নিশ্চয়ই মানুষও আছে। তাহার জীবনের আশা পুনরায় দেখা দিল। নবকুমার দ্রুত গাছপালা মাড়াইয়া বালুকাস্তূপ পার হইয়া আলোর কাছে গেল। দেখিল এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের মাথায় আগুন জ্বলিতেছে। তাহার কাছেই একজন মানুষ চোখ বুঁজিয়া ধ্যান করিতেছিল। স্তূপের শিখরে উঠিয়া নবকুমার দেখিল ধ্যানরত মানুষ এক কাপালিক। নর-কপাল সম্মুখে রাখিয়া সে এক ছিন্নশির গলিত শবের উপর বসিয়া যোগ সাধনা করিতেছিল।

ধ্যানে মগ্ন থাকায় কাপালিক প্রথমে নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। পরে তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিল। ধ্যান শেষ করিয়া কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া তাহার পর্ণকুটিরে লইয়া গেল ; কেয়াপাতার তৈয়ারী সেই কুটিরের মধ্যে ছিল কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম, এক কলস জল ও কিছু ফলমূল। কাপালিক নবকুমারকে সেগুলি ব্যবহার এবং আত্মসাৎ করিতে বলিয়া চলিয়া গেল। নবকুমার সেই সমান্য ফলমূল আহার করিয়া এবং সেই ঈষত্তিক্ত জল পান করিয়া ব্যাঘ্রচর্মে শয়ন করিল এবং অল্পক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়িল।

স্তূপশিখরে কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম 'স্তূপশিখরে'।

"সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে ভীষণ দর্শন মূর্তি" ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গ হইতে এই উদ্ধৃতি গৃহীত হইয়াছে। জননী সুমিত্রার ছদ্মবেশে মায়াদেবীর আদেশে লক্ষ্মণ লঙ্কার উত্তর দ্বারে গহন বনে চণ্ডীর স্বর্ণ-দেউলে পূজা করিতে গিয়াছিলেন। রাবণ স্বয়ং সেই দেবীর পূজা করিত। মহাদেব ত্রিশূল হস্তে তাহার দ্বার রক্ষা করিতেন। লক্ষ্মণ সেই উদ্যান দুয়ারে সেই জটাজূটধারী ভীষণ দর্শন মহাদেবকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শালবৃক্ষসম ত্রিশূলধারী মহাদেবের মতই সমুদ্র-তীরে বনবাসী কাপালিকের বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণের মত নবকুমারও প্রথম দর্শনে এই অতিকায় মহাদেবকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

কাপালিক—বামাচারী তান্ত্রিক ; ইহারা হস্তে নরকপালের অর্ধাংশ ধারণ করে (উহাই তাহাদের পান ও ভোজনপাত্র) এবং গলায় অস্থিমালা, কপালে চিতাভস্ম ও অঙ্গারের তিলক রচনা করে। "কাপালিক শৈব বা শাক্ত সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা ছয়টি মুদ্রার তত্ত্বজ্ঞ ও ধারক। মুদ্রা ছয়টি হইতেছে—কণ্ঠিকা, বা ঘণ্টিকা, রুচক, কুণ্ডল ও শিলামণি এই চারিটি অলংকার এবং ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত। ইহা ছাড়া দুইটি উপমুদ্রা হইতেছে—কপাল ও খট্বাঙ্গ। এই মুদ্রা দ্বারা দেহ মুদ্রিত করিলে পুনর্জন্ম হয় না। কাপালিক যোনিরূপ আসনে অবস্থিত হইয়া ধ্যান করিয়া নির্বাণলাভ করেন। ইহারা বামাচারী, ইহারা সোমসিদ্ধান্তী নামেও পরিচিত ছিলেন মনে হয়। প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের বর্ণনানুসারে নরাস্থিমালা ভূষিত শ্মশানবাসী, নরকপালে ভোজন বিলাসী

কাপালিক অগ্নিতে নরমাংস অহুতি দেন, ব্রাহ্মণ নরকপালে সুরা পান করেন এবং নরবলির দ্বারা মহাভৈরবের পূজা করেন। • —ভারতকোষ।

কস্ত্বম্ঃ কে তুমি? **মামনুসর**—আমাকে অনুসরণ কর। **ভৈরবী প্রেরিতোঽসি; মামনুসর পরিতোষ তে ভবিষ্যতিঃ** তুমি ভৈরবী প্রেরিত। আমাকে অনুসরণ কর। ভবিষ্যতে তোমার মনস্তুষ্টি সাধিত হইবে। কাপালিক ব্রাহ্মণ যুবক নবকুমারের উপস্থিতিতে খুশীই হইয়াছিল। ইহা যেন ভৈরবীর একান্ত ইচ্ছানুসারে হইয়াছে। নবকুমারকে ভৈরবীর পূজায় বলি দিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। **অবোধগম্য কোন উপায়েঃ** কাপালিক যেন অতিমানুষ। পর্ণকুটিরে প্রবেশ করিয়া কাপালিক কি করিয়া একখণ্ড কাষ্ঠে আগুন জ্বালিল তাহা নবকুমারের সাধারণ মনুষ্য-বুদ্ধি ধরিতে পরিল না।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই নবকুমার বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইল। বিশেষত কাপালিকের সঙ্গ তাহার ভাল বোধ হইল না। কিন্তু এই নিগূঢ় বন হইতে বাহির হইবার কোন পথ সে জানে না। কাপালিক নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু সে কি বলিয়া দিবে? তাহা ছাড়া কাপালিক তাহার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহাকে পর্ণকুটির ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে। সেজন্য তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে নবকুমার ইচ্ছা করিল না। কিন্তু অপরাহ্ণ পর্যন্ত কাপালিক আসিল না। এদিকে নবকুমার ক্ষুধায় কাতর। সে ফলান্বেষণে বাহির হইয়া পড়িল। একটি গাছের ফল সুস্বাদু বোধ করিয়া তাহার দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করিল। কিন্তু পথহীন বনের নির্দিষ্ট পথ সে হারাইয়া ফেলিল। আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছে তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। এক সময় গভীর জলকল্লোল শুনিয়া সে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইল। অনন্যমনে জলধি শোভা দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসায় আশ্রম-সন্ধানে আবার সে ফিরিয়া চলিল। ফিরিতেই সে এক অপূর্ব রমণীমূর্তি দেখিতে পাইল। নিরাভরণা অযত্নরক্ষিত কেশভার, বিশাল-লোচনা জ্যোতির্ময়ী সেই নারীর মধ্যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল। অপ্রত্যাশিত সেই মূর্তি দেখিয়া নবকুমার স্তব্ধ বিস্ময়ে নিস্পন্দ অবস্থায় চাহিয়া রহিল। রমণীও স্পন্দনহীন, নবকুমারের দিকে বিশালচক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাকাইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর তরুণী বলিল, 'পথিক, তুমি

পথ হারাইয়াছ ?" নবকুমার কেবল বিস্মিত হইয়া রমণীকে দেখিতেছিল। পরে "আইস" বলিয়া তরুণী চলিতে লাগিল। নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে চলিল। একস্থানে মোড় ঘুরিতে গিয়া নবকুমার সুন্দরীকে আর দেখিতে পাইল না। দেখিল সম্মুখেই কুটির।

এই অপূর্ব মূর্তি রমণীই কপালকুণ্ডলা। সমুদ্রতটের রোমান্টিক পরিবেশে রোমান্টিক নারী কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কপালকুণ্ডলার চরিত্র রহস্যময়। নিবিড় রহস্যের মধ্যগতা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র এই রহস্যময়ী নারীর প্রথম পরিচয় দিয়াছেন। "নিবিড় রহস্যময় মহারণ্য, অনন্ত রহস্যের আধার মহাসমুদ্র, সমুদ্র ও অরণ্যে লঘুপদ সঞ্চারে ধূসর সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে—চারিদিকে এই রহস্যময় প্রতিবেশে, আলোআঁধারের সন্ধিক্ষণে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেন।" সমুদ্রতটের এই রহস্যময় পরিবেশে চারিচক্ষুর প্রথম মিলন হইল বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নাম রাখিয়াছেন—'সমুদ্রতটে'।

নবকুমারের কবিত্ববোধ উপন্যাসের প্রথম হইতেই দেখা গিয়াছে। অন্য যাত্রীরা গঙ্গাসাগরে আসিয়াছিল পুণ্যলোভার্থে আর নবকুমার আসিয়াছিল সমুদ্রের অনন্ত সৌন্দর্য দর্শন করিতে। সমুদ্রসৈকতের বর্ণনায় রঘুবংশ হইতে উদ্ধৃতি তাহার কাব্য-প্রীতিরই পরিচয় দান করে। এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্ব এবং সাংকেতিকতা অপূর্ব। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে (নবকুমারের) হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সমুদ্র-শোভা এবং কপাল-কুণ্ডলার রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই কবিত্ব-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

"—যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে····হৈমমিবোপরাগম্॥"— ইহা মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য রঘুবংশের ষোড়শ সর্গের অন্তর্গত সপ্তম শ্লোকের অংশ বিশেষ। সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইল :

লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্॥

রাম কুশাবতী নগরে স্বীয় পুত্র কুশকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। কুশ তথায় পরম উৎসাহে রাজত্ব করিতেছেন। অন্যান্য কুমারগণও স্ব স্ব রাজ্য শাসন পালনে ব্যাপৃত। এদিকে কিন্তু অযোধ্যানগরী গাঢ়

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। রামের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার সকল সম্পদও বিলুপ্ত হইয়াছে। তাই মহাকবি অযোধ্যার বিষাদিনী পরমদুঃখিনী অধিদেবতাকে গভীর রজনীতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কুশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহারই মুখ দিয়া, তাঁহার সেই অতীত সুখের অবস্থা এবং বর্তমান দুঃখের অবস্থা—উভয়ই কীর্তিত করাইয়াছেন। রুদ্ধ কক্ষে রমণীর আকস্মিক আবির্ভাবে শয়ান নরপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কৈ তোমার ত এমন কোন যোগপ্রভাব লক্ষিত হইতেছে না, যদ্দ্বারা তোমার এরূপ স্থানে প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে? শিশিরমথিতা মৃণালিনীর ন্যায় তোমার আকৃতি বিষাদময়ী কেন?

অযোধ্যার পরমদুঃখিনী অধিদেবতাকে আকস্মাৎ দেখিয়া নরপতি কুশ যেমন বিস্মিত হইয়াছিলেন তেমনি সমুদ্রতটের আলো-আঁধারের আলোকে বিজনস্থানে কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া নবকুমারও তেমনি বিস্মিত হইয়াছিল।

চিকুরজাল ঃ কেশরাশি। **সেই গম্ভীরনাদী....অনুভূত হয় না** ঃ বঙ্কিমচন্দ্র নিখিল রহস্যের কেন্দ্রমণি রূপে রহস্যময়ী কপালকুণ্ডলাকে উপস্থিত করিয়াছেন। নিরাভরণ আরণ্যক সেই রমণীমূর্তির মধ্যে একটা মোহিনী-শক্তি ছিল। সেই শক্তি সেই রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে না দেখিলে অনুভব করা কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে আমাদের নিকট অতি রহস্যময়ী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সমাজের বাহিরে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে তাহার স্বাভাবিক বিকাশ। অতএব সামাজিক বুদ্ধির দ্বারা তাহার বিচার হইবে না। যে পরিবেশের সঙ্গে তাহার নিবিড় সম্পর্ক সেই পরিবেশ ব্যতীত তাহাকে সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার ঃ আলুলালিত, কুঞ্চিত, পুঞ্জীকৃত, গোড়ালী পর্যন্ত বিস্তৃত তাহার কুন্তলরাজি। পূর্বে নারীদের কেশ-সৌন্দর্য বর্ণনা করা কবিদের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। লম্বিত কেশরাশি নারীর অন্যতম প্রধান সৌন্দর্য বলিয়া গণ্য হইত। **মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায়** ঃ আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছের প্রাচুর্যে কপালকুণ্ডলার সমস্ত মুখ দেখা যায় নাই, চুলের আড়ালে অনেকটা ঢাকা পড়িয়াছিল। মেঘের আড়াল হইতে চন্দ্ররশ্মি যেমন বাহির হয়, তেমনি আলুলায়িত, রাশীকৃত কেশপাশের অন্তরাল হইতে তাহার মুখমণ্ডলের কিয়দংশ প্রতীত হইতেছিল।

উভয় মধ্যে প্রভেদ.....প্রকাশ হইতেছিল ঃ বিজন সমুদ্রতট

অকস্মাৎ রমণীমূর্তি দেখিয়া নবকুমার গভীর বিস্ময়ে প্রস্তর মূর্তির ন্যায় স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই দৃষ্টি ছিল চমকিত। অন্যদিকে কপালকুণ্ডলাও কাপালিকের নিষ্ঠুর প্রাণঘাতী হাত হইতে এই অসহায় পথহারা মানুষটিকে কিরূপে রক্ষা করিবে তাহার জন্য উদ্বেগকাতর বিস্মিত দৃষ্টিতে নবকুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। কাপালিকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নবকুমারের কোন ধারণা ছিল না বলিয়া সে তাহার নিজের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন ছিল না।

(এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল : মানবজীবনে গভীর দুঃখ-বেদনার মধ্যে, হতাশা নিরাশার দোলায় রমণীর মধুর-কণ্ঠ, এতটুকু স্নেহ তাহার ছন্দোহীন জীবনে অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করে। নূতন আশার রাগিণীর মূর্ছনা দেখা দেয়। পদ্মাবতীর মুসলমান ধর্মগ্রহণে নবকুমারের দাম্পত্যজীবনে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল। তারপর সমুদ্রতীরের বিজন বনে সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিতক্ত্য হওয়ায় নবকুমারের জীবনের আশাও দূর হইয়াছিল। গভীর এক বিপদময়তার মধ্যে নবকুমার কাল কাটাইতেছিল। এমন সময় কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ এবং 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' রমণীর এই মৃদু সহানুভূতির স্পর্শে নবকুমারে মধ্যে যেন জীবনের প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং আশা দেখা দিল। সমস্ত কিছুই সুন্দর মনে হইল। তাহার হৃদয় বীণায় নূতন সুর বাজিয়া উঠিল। সেই সুর আশার, আনন্দের, সৌন্দর্যের।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

নবকুমার কুটীরে প্রবেশ করিয়া কপালকুণ্ডলার সহিত অপূর্ব সাক্ষাতের কথাই চিন্তা করিতেছিল। সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাথায় হাত দিয়া কপালকুণ্ডলার রহস্যময়তা বিচার করিয়া দেখিতেছিল। কিন্তু "এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়া মাত্র" সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া কুটির মধ্যেই প্রাপ্ত তণ্ডুলগুলি এক মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিল।

পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই সমুদ্রতীরের দিকে গেল। ইচ্ছা, যদি কপালকুণ্ডলার সহিত আবার দেখা হয়। মায়াবিনী সেই রমণীর সহিত সাক্ষাতের আশা তাহার এতদূর প্রবল হইল যে সারাদিন সেই স্থান হইতে নড়িল না। কিছুক্ষণ চারিদিকে খুঁজিয়াও দেখিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরে

রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করিয়া নবকুমার কাপালিকের কুটিরে ফিরিয়া আসিল।

কাপালিক নবকুমারের অপেক্ষায় কুটিরেই অবস্থান করিতেছিল। নবকুমার তাহার নিকট বাড়ী ফিরিবার পথ এবং পাথেয় সাহায্য চাহিল। কাপালিক তাহার কোন উত্তর না করিয়া নবকুমারকে তাহার সহিত যাইতে বলিল। নবকুমার কাপালিকের পিছনে পিছনে চলিল। হঠাৎ সেই রমণী নবকুমারের পিঠে হাত দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।" সঙ্গে সঙ্গেই রমণী অন্তর্হিত হইল। নবকুমার কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিসের আশঙ্কায় রমণী তাহাকে পলাইতে বলিল তাহাও সে ধরিতে পারিল না। সে ভীষণ সংশয়ের মধ্যে পড়িল। কিন্তু কাপালিক আবার তাড়া দেওয়ায় নবকুমার বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার পিছনে পিছনে চলিল। কিছুক্ষণ পর আবার সেই রমণী নবকুমারকে সাবধান করিয়া গেল। তান্ত্রিকের পূজায় নরমাংসের প্রয়োজন। পলায়ন ব্যতীত নবকুমারের উদ্ধার নাই। কাপালিক যুবতীর সেই কণ্ঠস্বব শুনিতে পাইল। কাপালিক যুবতীর নাম ধরিয়া মেঘগর্জন স্বরে ডাকিল। নবকুমার সেই প্রথম জানিতে পারিল যুবতীর নাম কপালকুণ্ডলা। নবকুমার কাপালিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, তাহাকে বধার্থে পূজার স্থলে লইয়া যাওয়া হইতেছে। নবকুমার কাপালিকের হস্ত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। মত্ত হস্তীর মত কাপালিকের শক্তি।

নবকুমারেব জীবন-সঙ্কট দেখা দিল। কাপালিক তাহাকে লতাগুল্মের দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিল। নবকুমারকে সৈকতে ফেলিয়া রাখিয়া কাপালিক বলির প্রাক্কালিক ক্রিয়া সমাপন করিল। বধার্থ সে খড়্গ লইতে উঠিল। কিন্তু খড়্গ পাইল না। কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে বারবার ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইল না। অবশেষে ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রুত কুটিরের দিকে গেল।

একটি নাটকীয় চরম মুহূর্তে কপালকুণ্ডলা খড়্গ লইয়া নবকুমারের কাছে আসিল। সে খড়্গ দ্বারা নবকুমারের সমস্ত বন্ধন কাটিয়া ফেলিল। অবশেষে নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা তীরবেগে পথ দেখাইয়া চলিল এবং নবকুমার তাহার অনুসরণ করিল। কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমারের মিলনের প্রথম সূত্র স্থাপিত হইল।

নবকুমার সহযাত্রীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া যখন নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

হইয়াছিল তখন দূরে এক আগ্নের আলোক দেখিয়া দ্রুত তাহার দিকে গমন করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল আলো যখন আছে তখন মনুষ্যও থাকিবে। তাহার সেই ধারণা সত্য হইয়াছিল। আলোর কাছেই সে এক ভীষণমূর্তি কাপালিককে দেখিতে পাইল। কিন্তু নবকুমার ভাবিতে পারে নাই এই আলো তাহার প্রাণ-রক্ষার আলো নহে। এই আলো যে তাহাকে আরও নিশ্চিত-মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। কাপালিক তাহাকে দুই রাত্রি কুটিরে থাকিতে দিয়াছিল। তৃতীয় রাত্রির পূর্বে কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তৃতীয় রাত্রে সে যখন এক রহস্যময়ী নারীর চিন্তায় ব্যাকুল তখন আবার কাপালিকের দেখা পাইল। এবং প্রথমেই সে তাহার নিকট হইতে বাড়ী ফিরিবার সাহায্য চাহিল। কাপালিক কোন উত্তর না করিয়া তাহাকে একেবারে পরকালের বাড়ীর দিকে লইয়া চলিল। মনুষ্যঘাতী নিষ্ঠুর কাপালিকের পরিচয় সে ইতিপূর্বে আর পায় নাই। একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি সে তাহার পরিচয় পাইল। তখন দৈব ছাড়া আর তাহার প্রাণরক্ষার কোন উপায় রহিল না। কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের এই নির্মম অভিজ্ঞতার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নামকরণ করিয়াছেন—'কাপালিক সঙ্গে'।

"কথং নিগড়সংযতাসি……ভবতীমিতঃ—": উদ্ধৃতাংশটি শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকের চতুর্থ অঙ্কের অন্তর্গত। রাজা উদয়নের সম্মুখে যখন যাদুকর খেলা দেখাইতেছিল তখন রাজ-অন্তঃপুরে ভীষণ আগুন লাগে। রাণী বাসবদত্তা সাগরিকাকে ক্রীড়োদ্যানে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। রাজা আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাগরিকাকে বাঁচাইতে যান। সাগরিকাও আত্মরক্ষার নিমিত্ত রাজার নিকট ব্যাকুলভাবে মিনতি জানাইয়াছিল। তখন রাজা সাগরিকাকে বলিয়াছিলেন, "একি! তুমি যে শৃঙ্খলাবদ্ধ! আচ্ছা যাক্ আমি শীঘ্রই তোমাকে এখান হইতে লইয়া যাইতেছি।" আসলে ইহা প্রকৃত আগুন ছিল না। কৌশলে সাগরিকাকে মুক্ত করিয়া তাহার সহিত রাজার মিলন সাধন করিবার জন্য যাদুকর তাহার ইন্দ্রজালের সাহায্যে এই আগুন সৃষ্টি করিয়াছিল।

নবকুমারকেও কাপালিক যথার্থ লতাগুল্মের দ্বারা শক্ত করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। রাজা তাঁহার প্রিয়তমা সাগরিকার শৃঙ্খল-মোচন করিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলাও সেইরূপ খড়্গদ্বারা নবকুমারের বন্ধন ছেদন করিয়াছিল। রাজা সাগরিকাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে অন্যত্র লইয়া গিয়াছিল। কপালকুণ্ডলাও

নবকুমারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু রাজা ও সাগরিকার যে সম্বন্ধ নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার তাহা ছিল না। তাহাছাড়া বন্ধনমুক্তি করণের যে সচেতন কারণ রত্নাবলী নাটকে ছিল এখানে তাহা ছিল না।

নবকুমার কুটির মধ্যে……মস্তকোত্তোলন করিলেন না: সমুদ্রতটে রহস্যময়ীর অপ্রত্যাশিত দর্শন এবং তাহার কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে আরো বেশী করিয়া জানিবার ইচ্ছা নবকুমারকে পাইয়া বসিল। যদি সেই নারী আবার আসে এই আশায় নবকুমার সারাদিন সমুদ্রতটে বিচবণ এবং অপেক্ষা করিয়া কাটাইল। কিন্তু ঈপ্সিত বস্তুর দর্শন মিলিল না। রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন সে ব্যর্থ হইল তখন সে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেই অপূর্ব নারীর চিন্তা তাহার দূর হইল না। কুটিরে ফিবিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নবকুমার অনন্যচিত্ত হইয়া আবার তাহার কথা ভাবিতে বসিল। ইহাই পূর্বরাগের লক্ষণ। **এ কি দেবী—মানুষী না কাপালিকের মায়া মাত্র:** কুটিরের পথ হারাইয়াছে বলিয়া যে রহস্যময়ী নারী নবকুমারকে কুটিরের পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল তাহার কোন বহস্য ভেদ করিতে পারিল না। আজ সারাদিন সমুদ্রতটে অপেক্ষা করিয়াও তাহার দেখা সে পাইল না। অজানা অচেনা এই বন্য পরিবেশের সমস্ত কিছুই নবকুমারের নিকট রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। কপালকুণ্ডলার মোহিনী মূর্তিতে সে মুগ্ধ। কিন্তু সে কে, তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারিল না। এই নারী কি রক্তমাংসের কোন মানবী—না পথহারা পথিককে পথ দেখাইয়া দিবার জন্য বনদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন—না অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কাপালিকের কোন অভিনব ছলনায় রূপ ধরিয়া কোন রহস্যময়ী নারী?

এ কাহার মায়া?………পলাইব কেন: কিংকর্তব্যবিমূঢ় নবকুমারের মানসিক অবস্থার সুন্দর প্রকাশ। মনুষ্যঘাতী কাপালিকের সম্বন্ধে নবকুমারের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সেজন্য কপালকুণ্ডলা তাহাকে পলাইতে বলিলেও সে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না।

নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না: "অনেকেই মনে করেন মিশর, ব্যবিলন প্রভৃতি দেশে মেডেটারিনিয়ান জাতিদের মধ্যে নরবলি সহকারে এক ধরনের মাতৃউপাসনা প্রচলিত ছিল। ঐ সকল মাতৃতান্ত্রিক জাতির কোনো কোন শাখা কর্তৃক হয়ত কোন্ সুদূর যুগে ভারতভূমিতে তা আনীত হয়েছে।"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "আমার মনে হয় একটি অতি পুরাতন তন্ত্রধর্ম এদেশে খুব প্রচলিত ছিল।" প্রকৃতপক্ষে আদিম সমাজের কৃষিকেন্দ্রিক যাদু অনুষ্ঠানের মধ্যেই তন্ত্রের বীজ রয়েছে, যার মূল বিশ্বাস হল মানবীয় প্রজননের সাহায্যে প্রকৃতির ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি। সুতরাং এদিক থেকে তন্ত্র কোনো শতাব্দীর হঠাৎ সৃষ্টি মাত্র নয়। এই সমস্ত 'religious undercurrent' এবং 'esoteric yogic practices' সুপ্রাচীন কাল থেকে কোনো প্রকার গুহ্য আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা নিরপেক্ষভাবেই চলে এসেছে, কালক্রমে বৌদ্ধ শৈব বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেগুলির একটি স্বতন্ত্র তান্ত্রিক চরিত্র গঠন করেছে। আদিম মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার, শস্যোৎপাদন, প্রজনন ও জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে সেগুলি ছিল অপরিহার্য। আজ সেগুলি তাৎপর্য হারিয়ে প্রাণহীন আচারে, কখনও বীভৎস বিশ্বাসে পরিণত। জীবনসংগ্রাম ও উপাদান কৌশলের অঙ্গ এখন কেবল ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত।"

তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল : কাপালিকের ইহা স্থির বিশ্বাস। সে নিষ্ঠুর এবং নির্মম। কিন্তু তাহার দৃঢ় ধারণা এই মানব জন্ম অলীক। ভৈরবীর পূজায় নবকুমার জীবনদান করিলে পরলোকে তাহার মুক্তিই হইবে। কাপালিকের নিকট ইহা দুর্লভ সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে। **নবকুমার ইষ্টদেবচরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন :** নবকুমার বাহুবলের দ্বারা কাপালিকের হাত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল। এখন সে নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়া নিজেকে সেজন্য প্রস্তুত করিতেছিল। কাপালিক তাহাকে বলি দিবার পূর্বে সে উপাস্য দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিতে লাগিল।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

কাপালিক কুটিরের মধ্যেও খড়্গ পাইল না। এমন কি সেখানে কপালকুণ্ডলাকেও না দেখিতে পাইয়া সন্দেহ হইল। পূজার স্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সেখানে নবকুমার নাই। কেবল ছিন্ন লতাবন্ধন পড়িয়া আছে। কাপালিক স্থির বুঝিতে পারিল কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমার পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সেজন্য চারিদিক ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে সে এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিল। কিন্তু সে জানিত না ঐ বালিয়াড়ির অন্য পার্শে বর্ষার জলপ্রবাহে তূপমূল

কন্নিত হইয়াছিল। সেজন্য কাপালিকের উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে কাপালিকও মহিষের ন্যায় নীচে পড়িয়া গেল।

পলাতক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার অনুসন্ধান করিতে গিয়া কাপালিকের বালিয়াড়ির উচ্চ স্তূপশিখর হইতে পতন এই পরিচ্ছেদের বক্তব্য বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নাম দিয়াছেন—'অন্বেষণে'।

"And the great lord.... ..... .oak" : Luna (পাঠান্তরে Luni) প্রাচীনকালে সুসভ্য Etruria-র প্রখ্যাত নগর। ১৭৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে লুনা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে Luna-র শাসকের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের যুদ্ধের বর্ণনা করা হইয়াছে। বজ্রাহত ওক গাছ যেমন সমূলে ভূপাতিত হয় তেমনি রোমান সম্রাটের তীব্র আঘাতে লুনার অধিপতি ভূতলে শায়িত হইলেন। কাপালিক নবকুমারকে ভৈরবীর সম্মুখে বধার্থে লইয়া গিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে মুক্ত করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাঁহাদের অন্বেষণে এক বালিয়াড়ির শিখরে উঠিয়া কাপালিকও তাহার শরীর-ভারে পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া ভূপতিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিকের পতন তুলনা করিবার জন্য মেকলের "Lays of Ancient Rome" কাব্যগ্রন্থ হইতে লুনাধিপতির পতনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা Horatius শীর্ষক কবিতার উদ্ধৃতি।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

একদিকে কাপালিক কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমারের সন্ধানে উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিয়া নীচে পড়িয়া গেল, অন্যদিকে কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমার অমাবস্যার ঘোরান্ধকার রাত্রে প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনপথে চলিতে লাগিল। নবকুমারের নিকট এই পথ অজানা। সেজন্য সে সঙ্গী ষোড়শী যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া পিছনে পিছনে চলিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। উপরে কেবল নক্ষত্রালোক। সেই অতি ক্ষীণ আলোকে কোথাও কোথাও কেবলমাত্র বালুকাস্তূপের শুভ্র-শিখর এবং জোনাকি-পরিবৃত কিছু গাছ দেখা যায়।

বহু পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া গহন বনের অভ্যন্তরে এক অত্যুচ্চ দেবালয়ে উপস্থিত হইল। দেবালয়ের কাছেই প্রাচীর বেষ্টিত একটি গৃহও ছিল। কপালকুণ্ডলা প্রাচীর দ্বারে বারবার আঘাত করায় ঐ দেবালয়ের অধিকারী দ্বার খুলিয়া দিলেন। কাপালিকের

মতই অধিকারীর বয়স পঞ্চাশ-উধ্বর্ব। কপালকুণ্ডলা তার কানে কানে সংক্ষেপে নবকুমারের অসহায় অবস্থার কথা বলিয়া দিল। অধিকারী সব শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। কারণ, কাপালিকের অসাধ্য কিছুই নাই। পরে তিনি তাহাদের অভয় দিলেন এবং বলিলেন, "আজি এখানে লুকাইয়া থাক, কালি প্রত্যুষে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।" নবকুমার আহারাদি করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় অধিকারী নিজ রন্ধনশালায় নবকুমারের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

নবকুমার শয়ন করিলে কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিল। কিন্তু অধিকারী তাহাকে যাইতে দিলেন না; কারণ কাপালিক তাহাকে আর রক্ষণাবেক্ষণ করিবে না। কপালকুণ্ডলার কিন্তু অন্য কোন আশ্রয় নাই। সেজন্য অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের সঙ্গে তাহাদের দেশে যাইতে বলিলেন। এই বলিয়া অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে লইয়া দেবালয়ে করাল কালীমূর্তির নিকট গেলেন। তিনি পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র মন্ত্রপূত করিয়া প্রতিমার পাদোপরি রাখিলেন। সে বিল্বপত্র পড়ে নাই। তখন অধিকারী বলিলেন, "যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিলাম তাহাতে অবশ্য মঙ্গল।" তিনি নবকুমারকে বিবাহ করিয়া তাহার সঙ্গে স্বদেশে যাইতে কপালকুণ্ডলাকে আদেশ করিলেন। বিবাহ না করিয়া গেলে লোকালয়ে নবকুমারকে লজ্জা পাইতে হইবে। কপালকুণ্ডলাকেও লোকে ঘৃণা করিবে। কপালকুণ্ডলা ইহাতে বিস্মিত হইল। কারণ বিবাহের কথা শুনিলেও তাহার তাৎপর্য সে কিছুই জানিত না। অধিকারী আভাসে অস্পষ্টভাবে তাহাকে বুঝাইলেন। তাহাতেই কপালকুণ্ডলা স্বীকৃত হইল। তবে প্রতিপালক কাপালিককে ছাড়িয়া যাইতে সে ইতস্ততঃ করিল। তখন তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ তাহা অধিকারী অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহাতে বড় ভীত হইল।

তারপর অধিকারী বিষয়ী লোকের মতই নবকুমারের সব পরিচয় জানিয়া লইলেন। নবকুমার সবই বলিল কেবল স্ত্রীর পরিচয়ে প্রকৃত কথা বলিল না। নবকুমার অধিকারীকে বলিয়াছিল, সে 'এক সংসার' করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহার এক সংসার ছিল না। রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে সে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের পর পদ্মাবতী কিছুদিন পিত্রালয়ে ছিল। তাহার তের বছর বয়সে তাহার পিতা সপরিবারে পুরী গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময়

পথে পাঠান সেনার হাতে পড়েন এবং তাঁহাকে সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে হয়। তারপর জাতিভ্রষ্ট পদ্মাবতীর সহিত নবকুমারেরও আর সাক্ষাৎ হয় নাই। রামগোবিন্দ ঘোষাল রাজমহলে গিয়া সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

অধিকারী এই কথা জানিতে পারেন নাই। কুলীনের দুই সংসারে আপত্তি কি? ইহা ভাবিয়া তিনি নবকুমারের নিকট কপালকুণ্ডলার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। নবকুমার তাহার প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্য যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত ছিল। এমন কি কাপালিকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিবার ইচ্ছাও সে প্রকাশ করিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে নিজের পরিবারে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। অধিকারী বলিলেন, বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান্ দস্যু-কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদের দ্বারা কপালকুণ্ডলা এই সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত হয়। কাপালিক আপন যোগসিদ্ধি মানসে তখন হইতে তাহাকে প্রতিপালন করিতেছিল। শীঘ্রই সে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিত। কপালকুণ্ডলা অনূঢ়া এবং পরম পবিত্র চরিত্রা। অধিকারী নবকুমারের নিকট তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নবকুমার কোন উত্তর করিল না।

প্রতিবেশীদের দ্বারা বিজন বনে পরিত্যক্ত, কাপালিকের হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে পলাতক নবকুমার রহস্যময়ী নারী কপালকুণ্ডলার সমবেদনা এবং সক্রিয় সাহায্যে নিভৃত বনাভ্যন্তরে এক দেবালয়ে অধিকারীর অভয় আশ্রয় লাভ করিল। সেজন্য এই পরিচ্ছেদের নাম—'আশ্রয়ে'।

অদ্ভুত আকস্মিকতার মধ্যে কাপালিককে পতনোন্মুখ বালিয়াড়ির শিখর হইতে পতিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কৌশলে নবকুমারের অযাচিত আশ্রয়লাভ ঘটাইলেন এবং অধিকারীর বিষয়ীসুলভ কার্যের মধ্য দিয়া কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমারের বিবাহ-পর্ব সমাধা করিতে চলিয়াছেন। প্রাণরক্ষার পূর্বেও কপাল-কুণ্ডলার মোহিনী মূর্তি নবকুমারের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এক্ষণে অবশ্য মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করায় কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। কিন্তু তথাপি কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের কোন আলাপ পর্যন্ত হইল না। বিবাহ-পূর্ব পূর্বরাগের বিশেষ পরিচয় বঙ্কিম উপন্যাসে বিরল।

And that very······ Mantua: এই উক্তিটি **Shakespeare**-এর

Romeo and Juliet নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হইতে গৃহীত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে Juliet-এর সহিত Paris-এর বিবাহ স্থির হয়। এই দুঃসহ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ও প্রেমাস্পদ Romeo-এর সহিত মিলিত হইবার উপায় Friar Lawrence তাহার কাছে ব্যক্ত করেন। Friar বলেন যে, বিবাহের পূর্বদিন রাত্রে তিনি জুলিয়েটকে একটি পানীয় দিবেন। তাহা পান করিলে তাঁহার শরীরে দুইশত চল্লিশ ঘণ্টা মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। সকালে তাঁহাকে দেখিয়া সকলে মৃত বলিয়া মনে করিবে এবং তাহাদের কুলপ্রথা অনুসারে তাঁহাদের নিজস্ব কবরখানায় লইয়া যাইবে। Romeo-কে পূর্বেই সংবাদ দেওয়া থাকিবে। তিনি সমাধিস্থলে উপস্থিত থাকিবেন ও ঔষধের প্রভাব কাটিয়া গেলে সেই রাত্রেই Juliet-কে লইয়া Mantua-তে চলিয়া যাইবেন।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারের প্রণয়িনী না হইলেও তাহার প্রাণরক্ষয়িত্রী। নবকুমারের মতই কপালকুণ্ডলা এখন অসহায়। Firar Lawrence-এর মত অধিকারীও নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার মিলনের পথ বাহির করিয়াছেন। Romeo Juliet-কে নির্দিষ্ট সময়ের পরে Mantua-তে লইয়া যাইবে। নবকুমারও পরদিন কপালকুণ্ডলাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। এই ইঙ্গিতই বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্ধৃতির মধ্যে করিতে চাহিয়াছেন। ইহা ছাড়া Romeo-Juliet-এর সঙ্গে নবকুমার-কপালকুণ্ডলার আর কোন সাদৃশ্য নাই।

এও কপালে ছিল : অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত্রে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের করাল হাত হইতে উদ্ধার করিয়া পলায়নের পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতেছিল। আর পিছনে নবকুমার অন্ধের মত সেই ষোড়শী যুবতীকে অনুসরণ করিয়া চলিল। নবকুমার সাহসী যুবাপুরুষ। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহাকে একটি নারীর সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। উক্তিটি ভাগ্যতাড়িত অসহায় নবকুমারের। **বাঙালী অবস্থার……বশীভূত হয় না**—বাঙালী সমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কটাক্ষ। বাঙালী তাহার বাহুবল হারাইয়াছে। মনোবল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাঙালী এখন কর্মবিমুখ ; বাক্যে মুখর। সেজন্য অবস্থাকে সে আর জয় করিতে পারে না। অবস্থার বশীভূত হইয়া তাহাকে হীনমন্য হইয়া থাকিতে হয়। নবকুমার সেই রকম বাঙালী ছিল না। সেজন্য ঘটনার বিপাকে সে নারীর সাহসনির্ভর হইয়া দুঃখবোধ করিতেছিল। তাহার আত্মবিশ্বাস ছিল, যে কোন অবস্থায় ভাঙ্গিয়া পড়া নবকুমারের চরিত্রে

ছিল না। সেজন্যই তাহার মনে আত্মগ্লানি দেখা দিয়াছিল। **খদ্যোতমালা সংবৃত**—অন্ধকার রাত্রে বৃক্ষগুলি জোনাকির দলে পরিবৃত ছিল। **করতল লগ্নশীর্ষ হইয়া**—হাতের উপর মাথা রাখিয়া। কাপালিকের নিষ্ঠুর হাতে পলাতক নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন অধিকারীর ব্যাকুলতার দ্যোতক। **মহাপুরুষ**—কাপালিক। কাপালিকের নিষ্ঠুরতাকে সমর্থন না করিলেও অধিকারী কাপালিককে একজন অলৌকিক শক্তিমান পুরুষ বলিয়া মনে করেন। **মানবাকার-পরিমিতা করাল কালীমূর্তি**—ছয় ফুটের উপর দীর্ঘ ভয়ঙ্করী কালীমূর্তি। কালী ভয়ঙ্করী বলিয়া তাঁহার অধিষ্ঠান গহন অরণ্যে, শ্মশানে-মশানে। **বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে……সবিশেষ জানি না:** কপালকুণ্ডলা অবাল্য আরণ্যক, কাপালিক প্রতিপালিতা। সামাজিক নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সে মোটেই ওয়াকিবহাল নহে। বিবাহ ত একটা সামাজিক রীতি-নীতি। সেজন্যই ইহার নাম শুনিলেও কপালকুণ্ডলা ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিত না। **অধিকারী মনে করিলেন……প্রতিপালন করিয়াছেন:** একটি ষোড়শী বাঙালী যুবতীকে বিবাহ সম্বন্ধে বুঝাইতে গিয়া অধিকারী বড়ই গোলে পড়িলেন। যাহার কোন সামাজিক অভিজ্ঞতাই নাই, যাহার হৃদয়ের যৌবনোচিত ভাবের পরিবর্তে ধর্মভাবই প্রবল ছিল, তাহার নিকট বিবাহের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অধিকারী জগন্মাতা কালীর কথাই বলিলেন। স্বয়ং মা ভবানী যখন শিবের বিবাহিতা তখন অধিকারী ভাবিলেন এই উক্তি দ্বারাই কপালকুণ্ডলাকে তিনি সম্যক বুঝাইতে পারিবেন। এবং ইহার দ্বারা কপলেকুণ্ডলার কাছে বিবাহের অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে মনে করিয়া তিনি খুশীই হইলেন। কপলকুণ্ডলা কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারে নাই। জগন্মাতা ও শিবের উল্লেখে ইহাকেও বোধ হয় কোন ধর্মময় অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিল। সেজন্য সে স্বীকৃত হইল। কিন্তু পিতৃসম প্রতিপালক কাপালিককে ছাড়িয়া যাইতে তাহার মধ্যেও নারীসুলভ কাতরতা দেখা দিল। **তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ:** তন্ত্রে নারী-শক্তিই প্রধান উপাস্যরূপে প্রচারিত হইয়াছে। এই উপাসনায় বহু গুহ্য-সাধনপদ্ধতি ও কার্যাদর্শ প্রবেশ করিয়াছে। সেজন্য কুলার্ণব তন্ত্রমতে এই বিদ্যাকে কুলবধূর মত অসূর্যম্পশ্যা বলা হইয়াছে। 'উড়িষ্যায় আধুনিক বৌদ্ধ' নামক গবেষণা-গ্রন্থের ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, 'নরনারী-শক্তির মিলন সাধনই তন্ত্রের মূল কথা। তন্ত্রের নৈতিক পদ্ধতি বোঝার জন্য গুরুর দরকার, সিদ্ধির জন্য পঞ্চ ম-কার। তন্ত্রের এই পঞ্চ-

মকারের মধ্যে মত্ত ও মৈথুন বলে প্রধানতম দুইটি ম-কারকে উর্বরতার কামনা-মূলক জাদু বিশ্বাসের দিক থেকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।' কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে কাপালিকের মনোভাব সম্বন্ধে এই উপন্যাসেরই শেষদিকে কাপালিকের জবানীতে ভবানীর ভ্রূকুটিতে প্রকাশ পাইয়াছে—"তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই।" **গাঁই :** ব্রাহ্মণের শ্রেণী। আদিম বাসস্থান অনুযায়ী। "শ্রোত্রিয় কেশরি গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।" —ভারত। নবকুমার বন্দ্যঘাটির রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল। **প্রকৃতপক্ষে তাহার এক সংসারও ছিল না :** নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী বিবাহের পরেই ঘটনাচক্রে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাহার পক্ষে আর নবকুমারের সংসারে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। সেজন্য নবকুমার পদ্মাবতীর সঙ্গে আর সংসার করিতে পারে নাই। আধিকারীর সঙ্গে নবকুমারের যখন কথা হইতেছিল তখন প্রকৃতপক্ষে নবকুমারের কোন স্ত্রী ছিল না। সে অবিবাহিত যুবকের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছিল। **সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন :** নবকুমারের শ্বশুর রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে উড়িষ্যায় জগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন। পুরীর জগন্নাথের মন্দির হিন্দুদিগের নিকট অতি পবিত্র তীর্থস্থান। **এই সময় পাঠানেরা আকবর শাহ্ কর্তৃক…বসতি করিতেছিল—** "বহুদিন ধরে বাংলাদেশের খ্যাতি ছিল এই যে, তা হোল 'বিদ্রোহের জন্মস্থান।' শূর বংশের পতনের সময় বাংলার অধিপতি ছিলেন সুলেমান কররানী নামে এক আফগান সর্দার। ১৫৭২-৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আকবরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিলেও তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন রাজা। গৌড় থেকে রাজধানী তিনি সরিয়ে নিয়ে যান। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হল উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য অধিকার। কথিত আছে যে সুলেমানেরই সেনাপতি "কালাপাহাড়" পুরীর জগন্নাথ মন্দির আক্রমণ করে বহু বিগ্রহ ধ্বংস করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। সুলেমানের মৃত্যুর পর কিছুদিন গণ্ডগোল চলে, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ পিতৃসিংহাসনে বসেই নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিকূলতা আরম্ভ করেন। যখন দাউদ পাটনা এবং গাজীপুরের কাছে আক্রমণ চালান এবং স্থানীয় মুঘল শাসক যখন যথেষ্ট উদ্যম না দেখিয়ে আফগান রাজার সঙ্গে আপস বন্দোবস্তের চেষ্টা করেন, তখন আকবর বিদ্রোহীকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য স্বয়ং বাংলার দিকে রওয়ানা হয়ে যান (জুন, ১৫৭৪)। পাটনা আর হাজিপুর দখল করতে তাঁর দেরী হয়নি। সবচেয়ে বড় লড়াই হয় সুবর্ণরেখা

নদী তীরে (৩রা মার্চ, ১৫।৫)। এক মাসের মধ্যে দাউদ আত্মসমর্পণে বাধ্য হন, আর অন্তত কিছুকালের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়। উড়িষ্যা তখনও আফগানদের হাতে। আবার দাউদ বাংলাদেশ অধিকারের চেষ্টা করায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৫৭৬ সালের জুলাই মাসে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। দাউদ ক্রমাগত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, শাসন ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা নৈপুণ্য ছিল না, ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকেও তিনি অশ্রদ্ধার পাত্র। উড়িষ্যা জয় করতে মুঘলদের আরও সময় লেগেছিল ; ১৫৯২ সালে মানসিংহের আঘাতে উড়িষ্যা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।"

রাজধানী রাজমহল : ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজমহল অল্প সময়ের জন্য বাংলার রাজধানী ছিল। ইহা সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত। রাজমহল হইতে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।

কুলীনের সন্তানের দুই সংসারে আপত্তি কি : তখন কুলীনের বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পর্যন্ত তাহার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্য অধিকারী নবকুমারের এক সংসার আছে জানিয়াও তাহার সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ দিবার কোন বাধা উপলব্ধি করিলেন না। **তুমি বাতুল—** অধিকারী কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নবকুমারের নিকট আশংকা প্রকাশ করিলে নবকুমার বলে, প্রয়োজন হইলে সে নিজের প্রাণদান করিয়াও তাহার প্রাণরক্ষয়িত্রীর উপকাব করিতে প্রস্তুত আছে। সে ভয়ঙ্কর-স্বভাব কাপালিকের নিকট প্রত্যাগমন ও আত্মসমর্পণের কথা বলিলে অধিকারী ইহাকে পাগলের মত চিন্তা বলিয়া অভিহিত করিলেন। কারণ তাহাতে কাপালিক নবকুমারের প্রাণ সংহার করিবে অথচ কপালকুণ্ডলার উপরেও খুশী হইবে না।

রাঢ়দেশের ঘটকালী কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি : অধিকারী নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহ দিয়া তাহাকে নবকুমারের গৃহে পাঠাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেজন্য তিনি পূর্বে কপালকুণ্ডলার সম্মতি এবং দেবী প্রতিমার আশীর্বাদ লইয়া নবকুমারের নিকট আসিলেন। কিন্তু তিনি প্রথমেই বিবাহের কথা পাড়িলেন না। তিনি কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশংকার কথা উত্থাপন করিয়া প্রথমে নবকুমারকে চিন্তাকুল করিয়া তুলিলেন। অতি কৌশলে নবকুমারের বর্ণ, শ্রেণী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব পরিচয় জানিয়া লইলেন, এবং সর্বশেষে তিনি নবকুমারের নিকট কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব

দেবীর নিকট অনুরূপ এক বিল্বপত্র অর্ঘ্যরূপে দিয়াছিলেন। দেবী সেই পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।• তাহাতে তিনি ভবিষ্যৎ মঙ্গল জানিয়াই নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহা হইলে পরে কেন দেবী অনুরূপ বিল্বপত্র কপালকুণ্ডলার হাত হইতে গ্রহণ করেন নাই? আসলে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার মনে একটি সংশয় সৃষ্টি করিবার জন্যই এই বিপরীত কার্য করাইয়াছেন। যাহাতে কপালকুণ্ডলা সহজভাবে নবকুমারের সংসারে আত্মনিয়োগ করিতে না পারে তাহার জন্যই তিনি এই ঘটনা ঘটাইলেন। কপালকুণ্ডলার অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে ইহা সহায়ক হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে ঠিক শিল্পকৌশল বলা যায় না। আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ এই বহির্ঘটনার সাহায্যে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন না। চরিত্রের মধ্যেই তাহার বীজ লুক্কায়িত থাকে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সাহায্যে তাহাকে বিকশিত করেন।

পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে যাইতে হইবে: ইহাকে Irony of Fate বা ভাগ্যের পরিহাস বলা যায়। কপালকুণ্ডলাকে শেষ পর্যন্ত পতির সঙ্গে শ্মশানেই যাইতে হইয়াছিল। অধিকারী কিন্তু তাহা ভাবিয়া বলেন নাই। পতিকে স্ত্রীর কিরূপ অনুসরণ করা কর্তব্য সেই প্রসঙ্গে আপন অজ্ঞাতে এই কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদের সঙ্গে প্রথম খণ্ডের কাহিনীর প্রস্তাবনার অংশ সমাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে আমরা স্থান, কাল, নায়ক-নায়িকা, কাহিনী, দ্বন্দ্ব সব পরিচয় লাভ করিয়াছি। এমন কি প্রতিনায়িকা মতিবিবির পরিচয়ও সংক্ষেপে এই খণ্ডেই দেওয়া হইয়াছে। নির্দ্বন্দ্ব কপালকুণ্ডলার জীবনে প্রথম সংকটময় জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল নবকুমারের উদ্ধার সাধনে। অধিকারী দেবীনিকেতনে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার শাস্ত্রসম্মত বিবাহ দিয়া সেই সঙ্কটের সমাধান করিলেন। কিন্তু সেই সমাধান কপালকুণ্ডলার জীবনে আরও গভীরতর সঙ্কটের আশংকা লইয়া আসিল। পাঠকচিত্তে ভবিষ্যতের জন্য কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের প্রথম খণ্ড শেষ করিলেন।

৬ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

এই খণ্ডে মেদিনীপুর হইতে সপ্তগ্রামে নবকুমারের দৈনন্দিন সংসারে কপালকুণ্ডলার অবস্থিতি পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। মেদিনীপুরের পথ পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া অধিকারী ফিরিয়া গিয়াছে। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে সঙ্গে লইয়া সপ্তগ্রামে নিজ গৃহাভিমুখে যাইতেছিল। পথেই আকস্মিকভাবে তাহার সহিত মতিবিবির দেখা হইল। মতিবিবি এই কাহিনীর প্রতিনায়িকা। প্রথম খণ্ডেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই খণ্ডে তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় মিলিল। এই মতিবিবি আসলে নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। উড়িষ্যা হইতে আগ্রায় প্রত্যাগমনকালে তাহার সহিত নবকুমারের হঠাৎ দেখা হইল। নবকুমার তাহাকে না চিনিতে পারিলেও পদ্মাবতী তাহাকে বিলক্ষণ জানিল। মতিবিবি এই উপন্যাসের ঘটনাবিবর্তনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মতিবিবির চরিত্র কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। রোমান্সের আবর্ত কৌতূহলোদ্রেক করিয়াছে। মতিবিবির চরিত্র সর্বদিক দিয়াই কপালকুণ্ডলার বিপরীত। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার অনাসক্তি আর মতিবিবির চরিত্রে আছে সম্পূর্ণ আসক্তি। মতিবিবি আগ্রার রাজনৈতিক নানা ষড়যন্ত্রে হাত পাকাইয়াছে। ঈপ্সিতবস্তু লাভে তাহার অসাধ্য কোন কাজ নাই। অতএব কাহিনীর মধ্যে একদিকে কপালকুণ্ডলার বিল্বপত্র পড়িয়া যাওয়ায় তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্যদিকে মতিবিবির আগমনে কাহিনীর বহির্ভাগে এক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। এই দুই দ্বন্দ্বে দোলায়িত হইয়া কাহিনী দ্রুত অগ্রগতি লাভ করিয়াছে।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

কপালকুণ্ডলাকে পালকি করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অধিকারী তাহার আঁচলে কিছু অর্থ বাঁধিয়া দিয়াছিল। সেই অর্থে নবকুমার কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইল। অধিক অর্থ না থাকায় নিজে পদব্রজে চলিল। পূর্বদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত নবকুমারকে কপালকুণ্ডলার শিবিকাবাহকেরা অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া গেল। এদিকে চলিতে চলিতে ক্রমে রাত্রি হইল। কপালকুণ্ডলার সহিত মিলিত হইবার জন্য নবকুমার ব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় চারি ছয় দণ্ডের সময় সে প্রথম



সরাইতে উপস্থিত হইল। সেখানে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ না পাইয়া আবার পথে চলিল। হঠাৎ সে একটি ভগ্ন শিবিকা দেখিতে পাইল। সেখানে সে একটি আহত স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাইল। দস্যুরা তাহার পালকি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাহার একজন বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে, আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। তাহার অঙ্গের সকল অলঙ্কার লইয়া তাহাকে পালকিতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

নবকুমার তাহাকে ধরিয়া চটিতে লইয়া গেল। ঐ চটিতেই কপালকুণ্ডলাও **অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার পাশেই একটি ঘর ঠিক করিয়া নবকুমার সেখানে সেই স্ত্রীলোকটিকে রাখিল। তাহার আদেশে সেখানে একটি প্রদীপ আনা হইল। সেই আলোতে নবকুমার দেখিল এই স্ত্রীলোকটি অসামান্যা সুন্দরী।**

There now lean on me·········foot here: উদ্ধৃতিটি Lord Byron-এর Manfred নামক নাট্য-কাব্য হইতে গৃহীত। উক্তিটি chamois-শিকারীর। Jungfrau পর্বতে হতাশপ্রেমিক সুন্দরের পূজারী Manfred-কে পতনোন্মুখ পর্বতপ্রান্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য শিকারী অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিল: 'আপনি আমার দেহের উপর ভর করুন, এখানে পা রাখুন, আর আপনার হাতটা আমার হাতে স্থাপন করুন; এই যে কোমরবন্ধ তা শক্ত করে ধরুন, এগিয়ে আসুন—শীঘ্রই আমরা দাঁড়াবার একটা ভাল জায়গা পাব।' এই উপন্যাসে দস্যু হস্তে নিগৃহীতা মতিবিবি যখন একাকী চলিতে পারিতেছিল না তখন নবকুমারও তাহার সাহায্যে আগাইয়া গিয়াছিল। মতিবিবি নবকুমারের ঘাড়ে ভর করিয়া চটি পর্যন্ত গিয়াছিল। Chamois Hunter Manfred-কে বিপজ্জনক অবস্থা হইতে হাত ধরিয়া বাঁচাইয়াছিল। তাহার সঙ্গে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের এই ঘটনাসাদৃশ্য কিছুটা আছে বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন।

ক্রমে সন্ধ্যাও অতীত হইল······ব্যস্ত হইলেন: অতিক্রান্ত সন্ধ্যা। শীতকালের হালকা মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। চারিদিকে আঁধার ঘনাইয়া আসিল। এই অবস্থায় কপালকুণ্ডলার জন্য নবকুমারের চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতির এই রহস্যময় পটভূমিকায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল কপালকুণ্ডলার পরিবর্তে দস্যুহস্তে নিগৃহীতা আরেক রহস্যময়ী নারীর। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ নরনারীর মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ নয়, আকস্মিক ঘটনার চাকচিক্য। ঘটনার পর ঘটনার অপূর্ব সংযোজনে তিনি কাহিনীর বিন্যাস করেন। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র অনন্য। **প্রথম সরাই:** যাতায়াতের

সুবিধার জন্য সারাদেশ জুড়িয়া পথঘাট তৈরি করা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পথিকদের জন্য সরাইখানার বন্দোবস্ত করা, ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা করা শেরশাহের রাজত্বের অন্যতম অবদান। তাঁহার রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ বৎসর (১৫৪০-১৫৪৫)। ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতকের যে কয়েকজন রাজা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও প্রজাদের কল্যাণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন ও প্রভূত পরিশ্রম করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে শেরশাহের তুলনা চলে। **দস্যুহস্তে নিকুণ্ডলা হইয়াছি:** নবকুমার দূরগামী কপালকুণ্ডলার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষ ভগ্ন-শিবিকা দেখিয়া তাহার দুশ্চিন্তা আরো বাড়িল। স্ত্রী-কণ্ঠ শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া তাহাকে সে কপালকুণ্ডলা কিনা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার উত্তরে স্ত্রীলোকটি এই উত্তর করিয়াছিল। দস্যুহস্তে নিগৃহীতা হইয়াও মুখরা স্ত্রীলোকটির এই উত্তরের মধ্যে স্বভাবচপল ভাব, রঙ্গ-রসিকতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে। **চটি কত দূর:** মুঘলযুগে যাতায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক লেখেন, "ইংরেজ সার টমাস রো কিংবা ফরাসী বের্নিয়ের-এর মতো রাজদূত তাভের্নিয়ের-এর মত ব্যবসাদার, বহু খ্রীষ্টান পাদরী, কিংবা ইতালিয়ান মচনুর মতো দুঃসাহসী পর্যটকের বিবরণ থেকে তখনকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। দিল্লী, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি শহরের সঙ্গে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলের যোগাযোগের জন্য প্রায় চব্বিশটি দীর্ঘ সড়ক ছিল। তা ছাড়া অবশ্য নদী ও খাল দিয়ে যাতায়াত চলত। রাস্তাগুলিতে দূরত্ব মাপ করে নিয়ে ভাগ করা থাকত; অনেক জায়গায় দুই ধারে গাছ পোঁতা হতো, সারাপথ জুড়ে সরাই আর চটি ছিল, মাঝে মাঝে "ডাক-চৌকি"থাকায় খবর পাঠানো আর শান্তিরক্ষার কাজ একযোগে চলত।" **বিপৎকালে সঙ্কোচ মূঢ়ের কাজ:** দস্যুহস্তে আহত মতিবিবির পায়ে চোট লাগায় বিনা অবলম্বনে চলিবার তাহার শক্তি ছিল না। সেজন্য নারী বলিয়া সঙ্কোচ থাকিলেও নিজের কাঁধের উপর তাহার ভর রাখিয়া নবকুমার স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে লইয়া চটিতে গিয়াছিল। বিপদে সামাজিক রীতি-নীতির উপর ভর করিয়া থাকিলে তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা। সেজন্য প্রাচীনকাল হইতেই শাস্ত্রে উক্ত আছে বিপৎকালে কোন নিয়ম নাই। **রূপ রাশিতরঙ্গে তাঁহার.........উছলিয়া পড়িতেছিল:** অসামান্যা সুন্দরী রমণীর রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনার কাব্যিক উচ্ছ্বাস। একদিকে অপরূপ রূপ, অন্যদিকে পরিপূর্ণ যৌবন। উভয়ে মিলিয়া তাহার সৌন্দর্য শ্রাবণের ভরা নদীর মত।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

সুন্দরীর বয়স সাতাশ। তাহার অপূর্ব সুন্দর রূপ দেখিয়া নবকুমার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। স্বভাবচপল মুখরা এই নারী নবকুমারের সৌন্দর্য পিপাসা দেখিয়া কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?" নবকুমার স্বীকার করিল তাহার ন্যায় সুন্দরী সে আর দেখে নাই। অবশ্য কপালকুণ্ডলাও কম সুন্দরী ছিল না। সুন্দরী নিজেকে পশ্চিম প্রদেশিয়া মুসলমানী বলিয়া পরিচয় দিল এবং নিজের নাম বলিল মতি। পরে নবকুমারের পরিচয় জানিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের প্রদীপ নিভিয়া গেল। আসলে সপ্তগ্রামনিবাসী নবকুমার শর্মার নিকট প্রদীপ নিবাইয়া সুন্দরী নিজের মুখের ভাব গোপন করিল। এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র নিপুণ নাট্য কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন।

এই সুন্দরী রমণী ছিল নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। তাহারই মহম্মদীয় নাম মতিবিবি। পান্থনিবাসে উভয়ের অনেকদিন পর আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎ হইল। সেজন্য এই পরিচ্ছেদের বঙ্কিমচন্দ্র নাম দিয়াছেন—পান্থনিবাসে।

হেমাম্বুদকিরিটিণী উষা : উষাকালে আকাশের চঞ্চল মেঘের উপর সূর্যের সোনালী রশ্মিমালা বিকীর্ণ হইলে মনে হয় উষাদেবী স্বর্ণমুকুট পরিয়াছেন। মতিবিবির শ্যামবর্ণের উপর সেইরূপ একটি দীপ্ত আভা বিদ্যমান।

বসন্তপ্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা : বসন্তের আগমনে নূতন গজানো আমের পাতার মধ্যে যে এক চমৎকার সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যায় মতিবিবির দেহলাবণ্য অনেকটা সেইরূপ। **পক্বচূতোজ্জ্বল কপোলদেশ :** পাকা আমের উপরিভাগের রঙ যেমন মনোমদ, মতিবিবির গণ্ডদেশও সেইরূপ। **সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা :** মতিবিবির চোখে যেন মদনদেবতা তাহার শয্যারচনা করিয়া স্বপ্নাবেশ উপভোগ করিতেছে। অর্থাৎ, মতিবিবির চোখে যেন প্রেমের এক স্বপ্নালুতা অনুভব করা যায়। তাহার কটাক্ষে আছে এক প্রণয়পিপাসা ও উগ্র ভোগবাসনার বিচ্ছুরণ। **লোলাপাঙ্গে :** লালসাচঞ্চল দৃষ্টিভঙ্গিমায়।

'কৈষা যোষিৎ প্রকৃতি চপলা : বর্ধমানের তালিত গ্রামের মাধব কবীন্দ্র ভট্টাচার্য-এর উদ্ধবদূত হইতে এই উক্তিটি (৫নং থেকে) গৃহীত। প্রভাস হইতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমভক্ত উদ্ধবকে দূতরূপে বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকার সংবাদ লইতে

পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধবকে ব্রজমণ্ডলে দেখিয়া কৃষ্ণপ্রেমে চঞ্চলা এক গোপীনারী এই উক্তি করিয়াছেন। কোথায় আমার মত প্রকৃতি চপলা কাতরা অধম নারী আর কোথায় যদুপতি বল্লভ হেতু পূজনীয় আপনি! এই পংক্তিটির শুদ্ধরূপ হইবে "ক্বৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা।"

• চটির মধ্যে নবকুমারের সঙ্গে কথোপকথন-রতা চপলা নারী কে? এই প্রশ্ন তুলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবির সম্বন্ধে নবকুমারের মনে কৌতূহল উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের অধিকাংশ জুড়িয়া মতিবিবির সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের অনেক প্রভাব আছে। মতিবিবি কিন্তু নির্দোষ সুন্দরী নহে। তাহার গড়ন লম্বা, অধরৌষ্ঠ কিছু চাপা এবং সে শ্যামবর্ণা। তবে সেই শ্যামবর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। নবচূত-পল্লবের উপর ভ্রমরের মত তাহার অলকগুচ্ছ এবং তাহার সঙ্গে সপ্তমীর চাঁদের মত ভ্রূযুগল; তাঁহার পক্কচূতোজ্জ্বল কপোলদেশের মধ্যে আরক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর; অনতিবিশাল দুইটি বাঁকা চোখের স্থির অথচ মর্মভেদী কটাক্ষ দেখিয়া মনে হইবে সেই চোখ দুটি যেন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। সেই দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ হইতে মুনিঋষির পর্যন্ত চিত্তবিভ্রম ঘটে। সে প্রখরবুদ্ধিশালিনী এবং আত্মগরিমায় গরীয়সী। তাহার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আছে। ভাদ্রমাসের ভরা নদীর মত সাতাশ বৎসরের এই সুন্দরীর কানায় কানায় ভরা সৌন্দর্য। বিনা বায়ুতে শরতের নদীর মতই পূর্ণ যৌবনভারে তাহার সর্বশরীর সতত ঈষৎ চঞ্চল।

নারীর রূপ-বর্ণনার প্রতি একটা স্বভাব আকর্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় উপন্যাসেই দেখা যায়। তাঁহার রোমান্স-শ্রেষ্ঠ এই কপালকুণ্ডলায় তাহা চরম। তবে এই সৌন্দর্য যতই মধুর হউক না কেন উপন্যাসের শিল্প প্রয়োজনে তাহা বিরক্তিকর এবং অপ্রয়োজনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই সৌন্দর্য বর্ণনায় রোমান্টিকতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন।

নবকুমার ভদ্রলোক: নবকুমারের বুদ্ধি মার্জিত, রুচি পরিশীলিত এবং সে লজ্জাবিহীন নহে। সেজন্য মতিবিবির অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া আপনমনে যখন বিস্ময়বোধ করিতেছিল তখন নবকুমার তাহার রূপ দেখিতেছে কিনা হঠাৎ মতিবিবির এই প্রশ্নে সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। **এ অতি মুখরা:** মতিবিবির মুখে কিছুই আটকায় না। রসিকতা, প্রগল্‌ভতা এবং সাহসে এই নারীর চরিত্র

অপূর্ব। নিজের রূপ সম্বন্ধে সে সচেতন। তাহার রূপ দেখিয়া অপরিচিত যুবক নবকুমারকে বিস্মিত এবং অপ্রতিভ দেখিয়া তাহাকে লইয়া যেন সে খেলায় মাতিয়া উঠিল। আসলে মুসলমান সমাজের উচ্চতম পর্যায়ে আমীর-ওমরাহদের চরাইতে যে অভ্যস্ত সে একটি গ্রাম্যযুবককে লইয়া এরূপ তামাসা করিবেই। **বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকেই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে:** মতিবিবির বাঙালীর প্রতি কটাক্ষ। বাঙালীর দৃষ্টি অনুদার। তাহাদের জীবনে পূর্বরাগের সুযোগ ছিল না। যাহা ছিল তাহা বিবাহের পরে। পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাহাদের শাস্ত্রনিষিদ্ধ। সেজন্য নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর সংস্রবে আসা তাহাদের অনুদার সমাজে সম্ভব নয়। **প্রদীপ নিবিয়া গেল:** মতিবিবি নবকুমারকে অপরিচিত যুবক জানিয়া তাহার সহিত প্রগলভতাজনিত পরিহাস করিয়াছে। তাহাকে সপ্তগ্রামনিবাসী জানিয়া প্রদীপের শিখা উজ্জ্বলতর করিয়া তাহাকে দেখিয়াছে। কিন্তু যে-মুহূর্তে নবকুমার নিজের নাম বলিল অমনি প্রদীপ নিভিয়া গেল। সে ভাবিতে পারে নাই এতক্ষণ যাহার সহিত সে সরস আলোচনা করিতেছিল, যাহার কাঁধে ভর দিয়া পান্থনিবাস পর্যন্ত আসিয়াছিল সে আর কেহই নহে, তাহার স্বামী। চৌদ্দ বছর পরে আকস্মিকভাবে স্বামীর সঙ্গে পথে হঠাৎ তাহার দেখা হইল। তাহার মনোভাব পরিবর্তন হইয়া গেল। তাহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। তাহার মুখরতা ব্যঙ্গ সবই মিলাইয়া গেল। এতক্ষণ তাহার মনোভাব যেন উজ্জ্বল প্রদীপশিখার মতই ছিল, এখন নবকুমারের পরিচয় পাইয়া তাহার মুখে কালিমার ছায়া পড়িল। প্রদীপ নিভিয়া যাওয়া তাহারই দ্যোতক।

হাস্যপরিহাসমুখর যে নারী দস্যু নিগৃহীতা হইয়াও স্বভাবচাপল্য হারায় নাই, যে নারীর উজ্জ্বল সৌন্দর্য নবকুমারের মনে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল সেই নারীই পরবর্তী কালে নবকুমারের জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিল, যাহার ফলে নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলা উভয়েরই বিনাশ হইয়াছিল। হঠাৎ প্রদীপ নিভিয়া যাওয়ার মধ্যে যেন তাহারই অশুভ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে নবকুমারের জীবনে গভীর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবে, এ প্রদীপ নিভিয়া যাওয়ার মধ্যে যেন তাহারই সূচনা রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিল্প-কৌশল অনবদ্য।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

মতিবিবির সঙ্গে কথোপকথনকালে প্রদীপ নিভিয়া যাওয়ায় নবকুমারের

আদেশে অন্য প্রদীপ আনীত হইল। কিন্তু তাহার পূর্বে নবকুমার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনিতে পাইল। কিছুক্ষণ পরে মতিবিবির এক মুসলমান ভৃত্য আসিয়া তাহার খবর লইল।

মতিবিবির লোকজন তাহার পালকির পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিল। ভৃত্যটি ঐক্ষণে সেই লোকজনদের আনিবার জন্য চলিয়া গেল। মতিবিবি নবকুমারের নিকট হইতে শুনিল পাশের ঘরেই অদ্বিতীয়া রূপসী তাহার স্ত্রী কপালকুণ্ডলা অবস্থান করিতেছিল। কপালকুণ্ডলাকে পরে দেখিতে যাইবে বলিয়া মতিবিবি নবকুমারকে বিদায় দিল।

অনেক পরে মতিবিবির লোকজন, দাসদাসী ও বাহক সিন্দুক ইত্যাদি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মতিবিবি সর্বাঙ্গে অতিমূল্যবান অলঙ্কার পরিয়া কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে আসিল। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে ঈষৎ হাসি দেখা দিলেও পরে মতিবিবি কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল। কপালকুণ্ডলাও মতিবিবিকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে নিজের অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি খুলিয়া ফেলিয়া কপালকুণ্ডলাকে পরাইয়া দিল। নবকুমার আপত্তি করিল কিন্তু মতিবিবি শুনিল না। বলিল, এসকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত। তাই কপালকুণ্ডলাকে পরাইয়াই তাহার সুখ। তাহার আরও অনেক আছে। নবকুমার কেন তাহার এই সাধে বাধা দিবে। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মতিবিবির দাসী পেষমন নবকুমার কে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। মতিবিবি বলিল, তাহার স্বামী।

এই পরিচ্ছেদের মূল বক্তব্য কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য দেখিয়া মতিবিবির বিস্ময় এবং তাহার নিরাভরণ অঙ্গ মতিবিবির নানা আভরণে সজ্জিত-করণ। মতিবিবির সৌন্দর্য চিত্ত চাঞ্চল্যকারী। আর কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য মুগ্ধ বিস্ময়ের। নারী স্বভাবত যাহা করে না মতিবিবি তাহাই করিল। এক সুন্দরী অন্য নারীর সৌন্দর্য দেখিয়া অভিভূত হইল। সেজন্য এই পরিচ্ছেদের নাম 'সুন্দরী সন্দর্শনে।

ধর, দেবী,……নানা আভরণ : ত্রিকাল বিজয়ী মেঘনাদের নিধন চিন্তায় দেবরাজ ইন্দ্র কাতর। দুশ্চর তপস্যারত মহাদেব ছাড়া তাহার বধের উপায় কেহ বলিতে পারে না। সেজন্য ইন্দ্র এবং ইন্দ্রপত্নীর একান্ত অনুরোধে হরপ্রিয়া স্বামী-সাক্ষাতে যাইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহাকে উপযুক্ত ভাবে সজ্জিত করিয়া পাঠাইবার জন্য মদন-পত্নী রতিদেবী স্মরণমাত্র আসিয়া উপস্থিত। উদ্ধৃত উক্তিটি রতিদেবীর। দুর্গার অনুমতি লইয়া সে তাঁহাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া দিতে চাহে।

মতিবিবিও কপালকুণ্ডলাকে নানা আভরণে এই পরিচ্ছেদে সজ্জিত করিয়াছে। এই সাজানো ছাড়া উক্তিতিটির সহিত তাহার আর কোন মিল নাই। পার্বতী স্বেচ্ছায় বিশেষ উদ্দেশ্যে সজ্জিত হইতে চাহিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা কিন্তু আভরণ সম্বন্ধে উদাসীন। আভরণের দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাহার কোন্ জ্ঞানই ছিল না। মতিবিবি নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাকে নিজ অঙ্গের আভরণ দ্বারা সজ্জিত করিয়াছে।

দীর্ঘনিশ্বাস শব্দ শুনিতে পাইলেন : বঙ্কিমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে এবং সুন্দরভাবে মতিবিবির মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। পৃথিবীতে যে তাহার প্রিয়তম সে আজ কত দূরে। একই ঘরে মুখোমুখি বসিয়াও নবকুমার আর মতিবিবি দুজনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। চৌদ্দ বৎসরের পুরানো স্মৃতি মতিবিবির মনে জাগ্রত হওয়ায় তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। মতিবিবি নবকুমারকে চিনিতে পারিয়াছিল কিন্তু মতিবিবি তাহার প্রকৃত পরিচয় না দেওয়ায় নবকুমার তাহাকে চিনিতে পারে নাই। **নফর :** ভৃত্য। **করলগ্ন কপোলা হইয়া বসিয়া রহিলেন :** মতিবিবি কিছুক্ষণ হাতের উপর মাথা রাখিয়া আপনার ভাগ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিল। তাহার মনে পূর্বস্মৃতি জাগরূক হইল। জীবনে সে বহু মানুষের ভালবাসার অংশীদার হইয়াছে। কিন্তু কেহই তাহার একান্ত আপন হয় নাই। কাহারও সহিত সে ঘর বাঁধিতে পারে নাই। অথচ যাহার সহিত সে একসময়ে ঘর বাঁধিয়াছিল, যে তাহার একান্ত আপন ছিল—সে আজ কত দূরে! সম্মুখে বসিয়াও সে তাহার একান্ত আপনার জনকে চিনিতে পারিতেছে না। **স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া :** মুখরা মতিবিবি তাহার পূর্ব স্বামী সপ্তগ্রামনিবাসী নবকুমারের পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। তাহার মনে সকল পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে যেন স্বপ্নের মত তাহার অতীতকে দেখিতেছিল। তারপর নবকুমার বিদায় চাহিতেই তাহার সেই স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল। মতিবিবি আবার কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হইল। **প্রভূত নক্ষত্রমাল-ভূষিত……বর্দ্ধিত হইল :** অগণিত নক্ষত্রমালার দ্বারা অনন্ত নীলাকাশের সৌন্দর্য বর্ধিত হয় তেমনি মতিবিবির সুন্দর অঙ্গে অলঙ্কাররাশি তাহার সৌন্দর্যকে বর্ধিত করিল। **মতি মুগ্ধা ; কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা :** নবকুমারের নিকট হইতে কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্যের সম্বন্ধে শুনিলেও মতিবিবি তাহা বিশ্বাস করে নাই। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে আর্দ্র মৃত্তিকায় আসীন কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া তাহার হাসি পাইয়াছিল কিন্তু পরে কপালকুণ্ডলার অপূর্ব

মুখসৌন্দর্য ভালভাবে দেখিয়া তাহার সেই ভাব দূর হইল। মতিবিবি মুগ্ধ হইল। মতিবিবির মত অত অলঙ্কারসজ্জিতা নারী কপালকুণ্ডলা পূর্বে দেখে নাই। সেজন্য সে মতিবিবিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। **শৌহর** : স্বামী, পতি।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে তাহার অলঙ্কারই কেবল দিল না, অলঙ্কার রাখিবার জন্য রূপায় বাঁধানো একটি হাতীর দাঁতের কৌটাও পাঠাইয়া দিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার অঙ্গে দু-একখানি অলঙ্কার রাখিয়া বাকীগুলি কৌটায় তুলিয়া রাখিল। পরদিন সকালবেলা মতিবিবি বর্ধমানের দিকে এবং নবকুমার সপত্নীক সপ্তগ্রামের দিকে রওনা হইয়া গেল। নবকুমার শিবিকার মধ্যেই গহনার কৌটা দিয়া দিল। তারপর বাহকরা সহজেই নবকুমারকে পিছনে ফেলিয়া অনেক আগে চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা শিবিকার দুয়ার খুলিয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে যাইতেছিল। হঠাৎ একজন ভিক্ষুক তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিল। কপালকুণ্ডলার নিকট অলঙ্কার ছাড়া দেওয়ার মত কিছুই ছিল না। সেজন্য সে অঙ্গের অলঙ্কারগুলিসহ গহনার কৌটাটা ভিক্ষুককে দিয়া দিল। ভিক্ষুক দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা অবশ্য তাহার কারণ বুঝিতে পারিল না।

শিবিকারোহণে সপ্তগ্রাম যাইবার পথে কপালকুণ্ডলা তাহার অলঙ্কারগুলি ভিক্ষুককে দিয়াছিল। সেজন্য এই পরিচ্ছেদের নাম—'শিবিকারোহণে'।

খুলিনু সত্বরে…নূপুর কাঞ্চী : এই উক্তিটি সীতার। মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা সরমার নিকট পঞ্চবটিবনের স্মৃতি বিবৃত করিতেছিলেন। বনবাসেও স্বামীর সঙ্গে সীতা প্রেমালাপে কাল কাটাইতে-ছিলেন। কিন্তু সীতার এই সুখের ঘরে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। একদিন যোগিবেশে ভিক্ষার্থী হইয়া রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া রথারোহণে লঙ্কার দিকে উড়িয়া চলিল। অনন্যোপায় হইয়া সীতা তাড়াতাড়ি নিজের অলঙ্কারসমূহ খুলিয়া পথে ছড়াইয়া দিলেন। পথে পথে অলঙ্কার দেখিয়া রামচন্দ্র সীতাকে কোন্‌দিকে লইয়া গিয়াছিল বুঝিতে পারিলেন।

এই পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলাও ভিক্ষুককে দান করিবার জন্য তাহার অঙ্গাভরণ খুলিয়া ফেলিয়াছিল। ইহা ছাড়া উদ্ধৃতিটির সহিত কাহিনীর আর কোন সাদৃশ্য নাই। সেজন্য উদ্ধৃতিটি যথোপযোগী হয় নাই।

ভিক্ষুক দৌড়িল কেন : কপালকুণ্ডলা বাল্যাবধি অরণ্যে প্রতিপালিতা। নানা হীরা জহরতের অলঙ্কারের যে সামাজিক মূল্য তাহার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। সেজন্য তাহার নিকট মতিবিবির মহামূল্যের অলঙ্কারগুলি একেবারেই মূল্যহীন। ভিক্ষুক দরিদ্র হইলেও সে অলঙ্কারের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন। সেজন্য কপালকুণ্ডলা যখন বলিল তাহাকে দিবার মত আর তাহার কিছুই নাই, তখন ভিক্ষুক বলিল, "তোমার গায়ে হীর,-মুক্তা, তোমার কিছুই নাই?" কপালকুণ্ডলা বুঝিল তাহার নিকট যাহা মূল্যহীন সেই অলঙ্কার পাইলে ভিক্ষুক খুশী হইবে। সেজন্য সে ভিক্ষুককে সব অলঙ্কার খুলিয়া দান করিল। ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। সেজন্য গহনার কৌটা শুদ্ধ অলঙ্কার পাইয়া সে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু লোভী ভিক্ষুক সেই লোভ সামলাইতে পারিল না। সে চারিদিকে একটু চাহিয়া দেখিল তারপরেই উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, পাছে কেহ ভাগ বসায় অথবা পাছে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয় সেজন্যই সে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করিল না।

কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিদুহিতা। সরলতা এবং অনভিজ্ঞতার সে জীবন্তচিত্র। এই পরিচ্ছেদের বর্ণিত ঘটনাটা তাহার সেই সরলতারই দ্যোতক। এই সরলতা এবং অনভিজ্ঞতার জন্যই সে সমাজজীবনে সম্পূর্ণরূপে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে নাই। সামাজিক জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতাই তাহার শোচনীয় পরিণতির কারণ। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইতেই কপালকুণ্ডলার চরিত্রকে কেবলমাত্র রহস্যময়ী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহার অনভিজ্ঞতার বহু ঘটনাও আমাদিগকে নানাভাবে জানাইয়া দিয়াছেন।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

কপালকুণ্ডলাকে লইয়া নবকুমার নিজ গৃহে উঠিল। নবকুমার পিতৃহীন, গৃহে মাতা আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা, কনিষ্ঠা সধবা হইয়াও বিধবা। কুলীন-পত্নী বলিয়াই পিতৃগৃহেই থাকে। তাহারা সকলেই সহযাত্রীদের মুখে সংবাদ পাইয়া নবকুমারের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে অপ্রত্যাশিত ভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করায় সকলেই এত আনন্দিত হইল যে কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে কেহ বিশেষ মন দিল না। কপালকুণ্ডলা তাহার গৃহে সাদরে গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া নবকুমারও আনন্দিত হইল। ইহার জন্য সে খুবই চিন্তিত ছিল। সেজন্য কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিতে প্রথমে সম্মতি দেয় নাই। বিবাহের পরেও কপালকুণ্ডলার সহিত তাহার কোন

প্রেমালাপ হয় নাই। এক্ষণে নবকুমারের বাঁধ-ভাঙা প্রেম প্রকাশ পাইল। তাহার সব সময় খুশি খুশি ভাব। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কপালকুণ্ডলার নিকটে আসে। বিনা প্রসঙ্গেও কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করে। এককথায় নবকুমারের মধ্যে প্রেমের চাঞ্চল্য দেখা দিল।

• এই পরিচ্ছেদে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলার কিরূপ সমাদর হইল এবং নবকুমারের কি অবস্থা হইল তাহাই বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করিয়াছেন; সেইজন্য এই পরিচ্ছেদের নামকরণ করিয়াছেন— 'স্বদেশে'।

শব্দাখ্যেয়ং যদপি......স্পর্শলোভাৎ: উদ্ধৃতিটি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অন্তর্গত উত্তরমেঘের ১০৬ নং শ্লোকের অংশবিশেষ। এখানে যক্ষ মেঘের মুখ দিয়া নিজের ক্লিষ্ট অবস্থার বর্ণনা করিতেছে। সর্বসমক্ষে উচ্চার্য কথাও যে চুম্বনের লোভে কানে কানে বলিত, সে আজ হৃদয়ের গোপন কথাও অন্যের মুখে বলিয়া পাঠায়, এমনি দুর্দম ভাব। বুদ্ধদেব বসু এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন:

"যে-কথা বলা যায় সহজে সোচ্চারে তোমার সখীদেরই সম্মুখে
•তাও যে-লোভাতুর বলতো কানে-কানে আনন পরশের লালসায়,
সে আজ দৃষ্টির বহির্ভূত, আর শ্রবণবিষয়ের অগোচর,
আমার মুখ দিয়ে তোমায় বলে বাণী, রচিত ঘোর উৎকণ্ঠায়।"

সংস্কৃত সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইল:

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্য
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিত পদঃ মন্মুখেনেদমাহ ॥

নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলা কিরূপ সমাদৃত হইবে সেই চিন্তায় ব্যাকুল থাকিবার জন্য তাহার মধ্যে কোন প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। অথচ তাহার হৃদয়াকাশের সমস্তটা জুড়িয়াই ছিল কপাকুণ্ডলার স্থান। গৃহে ফিরিয়া কপালকুণ্ডলার সমাদর দেখিয়া নবকুমারের মধ্যে সেই প্রণয়াবেগ দুর্বার হইয়া উঠিল। যক্ষ যেমন আননের স্পর্শলাভের আশায় তাহার পত্নীর কানে

কানে গিয়া কথা বলিত, সেইরূপ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এখন নবকুমার কপালকুণ্ডলার নিকটে আসিতে লাগিল।

যক্ষের মতই নবকুমারের প্রেম দুর্বার। এই প্রেম সর্বদাই প্রিয়জনকে কাছে পাইতে চায়। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার সকল ভাবনা চিন্তা ধাবিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারের প্রেমাবেগের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। শীর্ষ উদ্ধৃতির সঙ্গে এখানেই তাহার সার্থক সাদৃশ্য।

শ্যামসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবাঃ সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহু পত্নী গ্রহণ করিতেন। সামাজিক নিষ্পেষণের ভয়ে তখনকার অভিভাবক যে-কোন কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়া শাস্ত্রীয় দায়মুক্ত হইতেন। তাহার পর কন্যা পিতৃগৃহেই থাকিতেন। পতিদেব সময় পাইলে বৎসরান্তে এক-আধবার পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। কথিত আছে যে, তখনকার কুলীন ব্রাহ্মণেরা এত পত্নী গ্রহণ করিতেন যে, তাঁহারা খাতা না দেখিয়া তাহাদের নাম-ঠিকানা পর্যন্ত বলিতে পারিতেন না, এবং একদিন করিয়াও যদি তাঁহারা এক-এক পত্নীর পিতৃগৃহে যাইতেন তাহা হইলে বৎসর ঘুরিয়া যাইত।

সত্যবাদীরা আত্মপ্রতীতিমতই কহিয়াছিলেনঃ নবকুমারকে বিজন বনে বাঘে খাইয়াছে তাহার রটনা নবকুমারের সহযাত্রীরা দেশে ফিরিয়া যাহার যেমন চরিত্র সে তেমনিই বর্ণনা করিয়াছে। অতি সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরভাবে সেই সব মিথ্যারটনাকারী প্রতিবেশীদের চিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। বৃদ্ধ ব্যক্তিটির বর্ণনা সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য। তিনি অতি সাহসী; সেজন্য পলায়ন করিতে পারিয়াছেন। নবকুমার সাহসী ছিল না বলিয়াই পলায়ন করিতে পারে নাই।

সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিলঃ ইংরেজীতে একটি কথা আছে—Love at first sight; প্রথম দর্শনেই কপালকুণ্ডলার মোহিনী-রূপে নবকুমার মুগ্ধ হইয়াছিল। আকস্মিক ঘটনাবিপাকে সে কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিল। কিন্তু তাহার সহিত নবকুমারের কোন প্রণয়সম্ভাষণ পর্যন্ত হয় নাই। স্বগৃহে কপালকুণ্ডলা কিরূপে গৃহীত হইবে সেই চিন্তায় সে ব্যাকুল ছিল। এক্ষণে নিজগৃহে কপালকুণ্ডলা সমাদরে গৃহীত হওয়ায় বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত তাহার প্রেমসমুদ্র উছলিয়া উঠিল।

স্রোতের মুখে প্রস্তরস্তূপ থাকিলে সেই স্রোতধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই প্রস্তরের বাধা যদি অপসারিত হয় তখন নির্বাধ অবস্থায় তাহা চারিদিক প্লাবিত করিয়া যায়। নবকুমারের আশঙ্কাও যখন দূরীভূত হইল, তখন তাহার স্বাভাবিক প্রণয়াবেগ তাহার চিন্তা, কার্য এবং ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সে কপালকুণ্ডলার নিকটে আসিত। বিনা প্রসঙ্গেও সে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত। কপালকুণ্ডলার সুখ-সুবিধার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিত। নবকুমারেরও সব সময় হাসি-খুশি ভাব। তাহার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া এই পৃথিবীর সব কিছুকেই সে প্রেমের দৃষ্টিতে সুন্দর বলিয়া বোধ করিল। প্রেম ত সুন্দরেরই প্রকাশ। সবকিছুর মধ্যে তাহার প্রেমময় সত্তা সে উপলব্ধি করিল। সংসার তাহার কাছে অতি সুন্দর মনে হইল। তাহার দৃষ্টি সুন্দর, ভাব সুন্দর, অতএব দ্রষ্টব্য বিষয়ও সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

সপ্তগ্রাম প্রাচীনকালে বাংলা দেশের একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহা অনেকাংশে শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই সপ্তগ্রামের এক নির্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাড়ী ছিল। তাহার পশ্চাতেই এক বিস্তৃত বন। সেই গৃহের ছাদে নবকুমারের ভগিনী শ্যামাসুন্দরী এবং কপালকুণ্ডলা সন্ধ্যার পরে কথোপকথন করিতেছে। কপালকুণ্ডলা নামটি বিকট বলিয়া গৃহস্থেরা তাহার নাম রাখিয়াছিল মৃন্ময়ী। শ্যামাসুন্দরী তাহার যোগিনী বেশ ছাড়াইয়া তাহাকে গৃহস্থ মেয়ের মত সাজাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মৃন্ময়ীর তাহাতে বিশেষ আগ্রহ নাই। সে বলে, লোকের ফুল দেখিয়া সুখ কিন্তু তাহাতে ফুলের কি? এই সংসারে সে প্রকৃত সুখ উপলব্ধি করিতে পারে না। সে বলে, "বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" কিন্তু সেখানে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। অতএব ভাগ্যের হাতে সে এখন নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছে। কারণ আসিবার সময় দেবী যে তাহার হাত হইতে বিল্বপত্র গ্রহণ করেন নাই তাহাতে মনে একটি গভীর সংশয় দৃঢ়মূল হইয়া আছে। অতএব কপালে কি আছে সে তাহা বলিতে পারে না। শ্যামাসুন্দরীও ইহা জানিয়া শিহরিয়া উঠিল।

অবশেষে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গৃহে আসিল। সেখানে আত্মীয়পরিজন, সকলেই তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। নবকুমার উহা দেখিয়া খুবই খুশী হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মনে এতটুকুও সুখ নাই। প্রথমতঃ, একটা ভিন্ন পরিবেশে আসিয়া সে যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সমুদ্রতীরে বেড়াইতে পারিলেই যেন তাহার অধিক সুখ জন্মে। দ্বিতীয়তঃ, নবকুমারের সহিত যাত্রার প্রাক্কালে দেবী তাহার বিল্বপত্র গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে তাহার মনে একটি গভীর সংশয় দেখা দিয়াছিল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে সন্দিহান হইয়া পড়িল। শ্যামাসুন্দরীও বিল্বপত্রের কথা শুনিয়া আতঙ্কিত হইল। কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবন যে নিষ্কণ্টক হইবে না তাহার আভাস দিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি হইল। পাঠক কৌতূহল-চিত্তে পরবর্তী ঘটনার জন্য আগ্রহী হইয়া রহিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নামকরণ করিয়াছেন—'অবরোধে'। মুক্ত প্রকৃতির কোলে যে স্বাধীন ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে, আপন খুশিমত বনে বনে এবং সমুদ্রতীরে বিচরণ করিয়াছে সেই কপালকুণ্ডলা সমাজ-জীবনের নানা রীতি-নীতির মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। সমাজের নানা বাধানিষেধের মধ্যে তাহাকে বাঁধা হইয়াছে, বন্য বিহঙ্গিনীকে যেন সামাজিক খাঁচায় অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাহারই আভাস দিতেছেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও সামাজিক করিতে চাহেন নাই। সেজন্য কপালকুণ্ডলার সামাজিক জীবনে প্রথম প্রবেশকেই 'অবরোধে' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে···কল্পতে ঃ মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গে (৪৪নং শ্লোক) ইহা তপশ্চারিণী পার্বতীর প্রতি ব্রহ্মচারীবেশী মহাদেবের উক্তি। পার্বতী যখন মহাদেবকে লাভ করিবার জন্য দুশ্চর তপস্যায় রত তখন একদিন মহাদেব ঘুরিতে ঘুরিতে সেখানে আসিয়া পার্বতীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, যৌবনে সকল আভরণ পরিত্যাগ করিয়া বার্ধক্যের বল্কল ধারণ করিয়াছ, ইহা কিরূপ? সন্ধ্যায় চন্দ্র-নক্ষত্র খচিত রাত্রির সামনে যদি উষার অরুণালোক প্রকাশ পায় তাহা হইলে কেমন লাগে বল? পার্বতী যেমন যৌবনেই তপশ্চর্যার জন্য বল্কল ধারণ করিয়াছিলেন তেমনি

কপালকুণ্ডলাও সামাজিক জীবনের সহিত অপরিচয়ের জন্য যোগিনীর মত বেশ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু নবকুমারের সংসারে আসিয়া তাহার আর যোগিনী বেশ কেন? সে ত এখন ফুলশয্যার বধূ!

বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামাজিক পরিবেশে স্থাপন করেন নাই। তিনি সপ্তগ্রামে নবকুমারের বাটীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও সমাজের এক প্রান্তে। সপ্তগ্রামের এক নির্জন প্রান্তে নবকুমারের বাস। সেখানে মনুষ্য-সমাগম ছিল না বলিলেই চলে। রাজপথ পর্যন্ত লতাগুল্মাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। কেবল তাহাই নহে—নবকুমারের বাড়ীর পিছনেই ছিল এক বিস্তৃত নিবিড় বন। একটু দূরে একটি খাল সেই বনের মধ্যে আসিয়া মিশিয়াছে। আরো দূরে নৌকাভরণা বিশাল ভাগীরথী। কপালকুণ্ডলা যে পরিবেশ সমুদ্রতটে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল নবকুমারের গৃহে আসিয়া তাহারই যেন এক ক্ষুদ্র সংস্করণ পাইল। তাহা ছাড়া নবকুমারের ভগিনী শ্যামাসুন্দরী ছাড়া আমরা আর কোন সামাজিক নারীকে পর্যন্ত কপালকুণ্ডলার সহিত মিশিতে বা কথা বলিতে দেখি না। রহস্যময়ী কপাল-কুণ্ডলার কাহিনী বর্ণনা করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত কিছুকেই যেন রহস্যময় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সপ্তগ্রাম: হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা রেলস্টেশনের নিকটবর্তী সরস্বতী নদীতীরস্থ প্রসিদ্ধ গ্রাম। মধ্যযুগ পর্যন্ত ইহা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসামঙ্গলে চাঁদ-সদাগরের গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনা সঙ্গমে অবস্থিত সপ্তগ্রাম দর্শন প্রসঙ্গে তথাকার সমৃদ্ধির বর্ণনা রহিয়াছে:

অভিনব সুরপুরী দেখি সব সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের সারা
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাঁচ চাল
রাহমুক্ত প্রলম্বিত ধারা।

কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন:

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়
ঘরে বস্যে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় সেকালে সপ্তগ্রাম ছিল কেনা-বেচার আমদানি-

রপ্তানির কেন্দ্রস্থল। ১৫৯২ অব্দে এই বাণিজ্যবন্দর পাঠানগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। পরে নদীর গতি পরিবর্তনে ১৬৩২ অব্দে সপ্তগ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

মৃন্ময়ী : অরণ্যে প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গৃহে আসিয়া মৃন্ময়ী হইল। গৃহস্থেরা কপালকুণ্ডলা নামটি বিকট বলিয়া তাহাকে মৃন্ময়ী বলিয়া ডাকিল। তাহারা রোমান্সের নায়িকাকে মাটির পৃথিবীতে নামাইয়া আনিতে চাহিল। সেদিক হইতে এই নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কপালকুণ্ডলা নামটিও মানুষটির মতোই অসামাজিক। সমাজ-জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামটিকেও সকলে সামাজিক করিতে চাহিল ; কিন্তু যাহার চরিত্রের মধ্যেই সামাজিকতা নাই তাহাকে শুধু নাম পরিবর্তন করিয়াই সমাজস্থ করা যাইবে না।

একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা : আগেকার দিনে পল্লীবধূরাও কথায় কথায় ছড়া কাটিত, পুরাণ নীতি-কথা বলিত। নীলদর্পণের অশিক্ষিতা আহুরী পর্যন্ত ছড়া কাটে। শ্যামাসুন্দরীও মনের ভাব সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য তাহার শৈশবে শেখা একটি কবিতা বলিতেছিল। তাহার সারমর্ম হইল, এই পৃথিবীর স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় একে অন্যকে চায় এবং এই চাওয়ার মধ্যে আছে আনন্দ। ইহাই জীবনের ধর্ম। নরনারীর মিলনের মধ্যে যে স্বাভাবিকতা তাহা এই প্রকৃতির রাজ্যেও পরিলক্ষিত হয়। যে পদ্মফুল রাত্রিবেলা নিজেকে ঢাকিয়া রাখে সে-ই সকাল বেলা ভ্রমরের গুঞ্জনে যেন নিজেকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তোলে। বর্ষায় জলস্ফীত নদী প্রচণ্ড বেগে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলে। চাঁদের আলোয় কুমুদিনী যেমন নিজের সকল সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ বিকশিত হয়, ফুলশয্যায় বিয়ের কনে তেমনি আপন প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়। কপালকুণ্ডলার সুপ্ত যৌবনকে জাগ্রত করিবার জন্যই শ্যামাসুন্দরী এই কবিতার অবতারণা করিয়াছিল।

পরশপাতর : পরশপাথর—স্পর্শমণি, যাহার স্পর্শে অন্য ধাতু সোনা হয়, Philosophers' stone। এখানে শ্যামাসুন্দরী পরশপাতর বলিতে পুরুষকে বুঝাইয়াছে। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায় কিন্তু ভয়ঙ্কর স্বভাব কাপালিকের সংস্পর্শে যে নারী বড় হইয়াছে তাহার মধ্যে নারী প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রণয়পিপাসা দেখা দেয় নাই। শ্যামাসুন্দরী

অত কথা জানিত না। সে ভাবিয়াছিল, সম্পূর্ণ সামাজিক পরিবেশে অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে একদিন যোগিনী কপালকুণ্ডলার মধ্যে নারী সত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটিবে।

তুই সেই পরশপাথর ছুঁয়েছিস : পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া নারী-সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। নারী আপনাকে নানারূপে সজ্জিত করিয়া পুরুষের নিকট মোহময়ী করিয়া তোলে। নারীত্ব ক্রমে মাতৃত্বে পরিণতি লাভ করে। বিবাহিতা কপালকুণ্ডলাও এখন নিজেকে নানারূপে সজ্জিত করিয়া স্বামীর চিত্তাকর্ষণকারী করিয়া তুলিবে। একদিন এই যোগিনী কপালকুণ্ডলাও যখন ছেলে কোলে তুলিয়া লইবে তখন তাহার মাতৃত্বের বিকাশ ঘটিবে। সংসারে সাধারণ নারীর ইহাই কাম্য। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে বেশিদিন সামাজিক প্রতিবেশে রাখেন নাই। রাখিলে হয়ত একদিন তাহার মধ্যেও মাতৃত্বভাব দেখা দিত। কপালকুণ্ডলা সম্পূর্ণ সামাজিক হইয়া উঠিত।

বোধ করি সমুদ্রতীরে বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে : কপালকুণ্ডলার জীবনের একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব। সপ্তগ্রামে আসিবার পূর্বে সে প্রকৃতির কোলে সমুদ্রতীরে আপন খুশিমত অবাধে বিচরণ করিতে পারিত। এখন সে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। ইহার সহিত তাহার কোন পরিচয় ছিল না। সেজন্য তাহার বিষণ্ণভাব। সমুদ্রতীরের সেই সহজ স্বাভাবিকতা এখানে নাই। সেজন্য তাহার অতীত পরিবেশের জন্য তাহার একটি ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে।

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি : ইহা শ্রীমদ্ভাগবত-এর প্রসিদ্ধ একটি শ্লোকের অংশ বিশেষ। ইহার অর্থ হইল—আমাকে তুমি যে কার্যে নিযুক্ত করিবে, তাহাই করিব। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই উক্তি করিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর শিষ্যা। সে তাহার নিকট হইতে দুই একটি শ্লোক শিখিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিল। সে ভাবিতেছে যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই হইবে।

কপালে কি আছে, জানি না : কপালকুণ্ডলা তান্ত্রিকের প্রভাবে ভগবৎ বিশ্বাসে বড় হইয়াছে। সেজন্য তাহার মধ্যে সংস্কারবোধ প্রবল। নবকুমারের সঙ্গে সপ্তগ্রামের দিকে যাত্রার প্রাক্কালে সে দেবীর নিকট বিল্বপত্র

অর্ঘ্যরূপে দিয়াছিল। দেবী তাহা গ্রহণ করেন নাই। কপালকুণ্ডলা ইহাতে নিজের অজানিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত। ভিন্ন পরিবেশে আসিয়া তাহার সেই দুশ্চিন্তা আরও প্রবল হইল। সেজন্য সে শ্যামাসুন্দরীর নিকট সেই ঘটনা বিবৃত করিয়া তাহার আশঙ্কা প্রকাশ করিল। এই আশঙ্কার জন্যই সে সংসারে মন দিতে পারিতেছে না। অন্যদিকে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। দুর্জ্জেয় অদৃষ্ট সম্বন্ধে একটি প্রবল বিশ্বাস কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন ঃ শ্যামাসুন্দরী নারী। তাহার মধ্যে সহজাত সংস্কার প্রবল। কপালকুণ্ডলার কোন পূর্বকথা সে 'জানিত না। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিবার পূর্বে ভবানীর নিকট বিল্বপত্র দান সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলা তাহার নিকট যে ঘটনা বর্ণনা করিল তাহাতে শ্যামাসুন্দরীও অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। দৈব প্রতিকূল হইলে কোনও অশুভই অসম্ভব হয় না। ইহার দ্বারা কপালকুণ্ডলার জীবনে ভাবী অমঙ্গলের সূচনা সে যেন কল্পনায় দেখিতে পাইল। সেজন্য তাহার মন ভয়ে ও নিরাশায় ভরিয়া উঠিল।

এখানেই দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি। আরণ্যক কপালকুণ্ডলার সামাজিক নারী হিসাবে জীবন কাটাইবার আর যখন কোন বাধা রহিল না তখনই বঙ্কিমচন্দ্র সেই বাধার সৃষ্টি করিলেন কপালকুণ্ডলার মনে। একটি অলৌকিক ঘটনা তাহার সহজ এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কণ্টকস্বরূপ হইয়া রহিল। কপালকুণ্ডলা ভবানী কর্তৃক বিল্বপত্র প্রত্যাখ্যানের কথা ভুলিতে পারে নাই। কাহিনীর এখানেই প্রথম সংঘাত। এই দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করিয়াছে মতিবিবির নবকুমারকে পুনরায় পাইবার দুর্বার কামনা এবং তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে কাপালিকের প্রতিশোধ স্পৃহা। তৃতীয় খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবির কাহিনী বিবৃত করিবেন।

।। তৃতীয় খণ্ড ।।

তৃতীয় খণ্ড সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই সমগ্র খণ্ডটি মতিবিবির কাহিনী। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া সপ্তগ্রামে যাত্রা করিবার সময় দুইটি অমঙ্গলের সূচনা হইয়াছিল। এক, দেবী ভবানী কর্তৃক কপালকুণ্ডলার

বিল্বপত্র প্রত্যাখ্যান ; দুই, নবকুমারের সহিত তাহার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী ওরফে মতিবিবির সাক্ষাৎ। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিয়াছি দেবী কর্তৃক তাহার বিল্বপত্র গৃহীত না হওয়ায় কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গৃহে মন বসাইতে পারিতেছে না। এই খণ্ডে আমরা মতিবিবির ইতিবৃত্ত পাইব। এই মতিবিবির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে তৎকালীন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করাইয়াছেন। তখন সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ পর্যায়। সেই সময় মতিবিবি আগ্রায় একজন উল্লেখযোগ্যা নারী। তখন যুবরাজ সেলিমের প্রধানা মহিষী ছিলেন রাজা মানসিংহের ভগিনী। মতিবিবিও যুবরাজের একজন অনুগ্রহভাগিনী। যুবরাজ তাহাকে তাঁহার প্রধান মহিষীর প্রধান সহচরী করিয়াছিলেন। এইরূপে মতিবিবি আগ্রায় উচ্চতম রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছিল। কিন্তু পরে সে যখন দেখিল যুবরাজ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের উন্নিসার জন্য বেশী ব্যস্ত তখন মতিবিবি আগ্রার অন্যান্য হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া আকবরের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে সেলিমের পরিবর্তে সেলিম-পুত্র খস্রুকে বসাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহাদের সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। এই কারণে এবং বহুদিন পর আকস্মিকভাবে নবকুমারের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার সহিত সংসার করিবার মানসে মতিবিবি আবার বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিল। নবকুমার কিন্তু তাহাকে গৃহে দাসীর কাজেও লইতে রাজী হইল না। তখন আত্মম্ভরী, ক্রূরমতি মতিবিবি নবকুমারের নিকট আত্মপরিচয় দান করিল এবং এজন্মে তাহার আশা ছাড়িবে না বলিল। সে কপালকুণ্ডলার অনিষ্ট চিন্তা আরম্ভ করিল। এই সময় সপ্তগ্রামে কাপালিকের আবির্ভাবে তাহা আরও জটিলতর হইল।

মতিবিবির পিতা যখন সপরিবারে মহম্মদীয় ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাহার নাম হইল লুৎফ-উন্নিসা। দেশবিদেশে ভ্রমণকালে সে এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিত। তাহার পিতা প্রথমে ঢাকায় রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে আত্মীয়স্বজন পরিচিত লোক অনেক। সমাজচ্যুত হইয়া দেশীয় সমাজে থাকা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল। সেজন্য তিনি সপরিবারে আগ্রায় গমন করিলেন। নিজগুণে সেখানে শীঘ্রই তিনি সম্রাট আকবরের দৃষ্টিতে পড়িয়া উচ্চপদ লাভ করেন। এদিকে লুৎফ-উন্নিসাও আগ্রায় আসিয়া পারসীক,

সংস্কৃত, নৃত্য-গীত ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইল। রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী রমণীদের মধ্যে সে ক্রমে অগ্রগণ্যা হইয়া উঠিল। তাহার পূর্ণ যৌবনে সে সদসৎ মানিল না। তাহার মনোবৃত্তিসকল দুর্দম বেগবতী। তাহার পূর্বস্বামী বর্তমান থাকায় ওমরাহেরা কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইল না। সে নিজেও পুনর্বিবাহের কোন আগ্রহ দেখাইল না। কলঙ্কের কথা শুনিয়া তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

যুবরাজ সেলিম লুৎফ-উন্নিসার একজন প্রিয়পাত্র। সে লুৎফ-উন্নিসাকে তাহার প্রধান বেগমের প্রধান সহচরী করিল। লুৎফ-উন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী কিন্তু পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী। লুৎফ-উন্নিসার বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ। অল্পদিনেই সে সেলিমের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিল। তাহার স্থির ধারণা হইল যে, সে ভবিষ্যতে পাটরানী হইবে। সকলেই ইহার সম্ভাব্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু আকবর বাদশাহের কোষাধ্যক্ষের কন্যা এবং পরবর্তীকালে ইতিহাসখ্যাত শের আফগানের পত্নী মেহের-উন্নিসাকে দেখিয়া সেলিমের চিত্ত ব্যাকুল হইল। লুৎফ-উন্নিসা বুঝিতে পারিল, একদিন মেহের-উন্নিসাই সেলিমের মহিষী হইবে। সে সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিল।

লুৎফ-উন্নিসার প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়া উঠিল। সেলিম যাহাতে সিংহাসনের উত্তরাধিকার না পায় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে সেলিমের পুত্র খস্রুকে সিংহাসনে স্থাপিত করিবার চক্রান্ত করিতে লাগিল। তখন রাজা মানসিংহের দোর্দণ্ড প্রতাপ। খস্রু তাঁহার ভাগিনেয়। অন্যদিকে তখন প্রধান রাজমন্ত্রী মুসলমানদিগের মধ্যে প্রধান খাঁ আজিম খস্রুর শ্বশুর। খাঁ আজিমের সঙ্গে লুৎফ-উন্নিসার কথাবার্তা হইল। তিনি খস্রুর জন্য চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু যদি কৃতকার্য না হন তখন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য একটি আশ্রয়ের দরকার। সেই আশ্রয় একমাত্র উড়িষ্যা। সেখানে মোগল শাসন এত প্রবল নহে। সেখানকার সৈন্য-সাহায্য তাঁহাদের প্রয়োজন। লুৎফ-উন্নিসার ভ্রাতা তখন উড়িষ্যার মনসবদার। খাঁ আজিম বলিলেন, "আমি কল্য প্রচার করিব, তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিবার ছলে কল্য উড়িষ্যায় যাত্রা কর। তথায় যৎকর্তব্য উহা সাধন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।"

লুৎফ-উন্নিসা সেজন্য উড়িষ্যায় আসিয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিবার পথে নবকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

মতিবিবির পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন,—'ভূতপূর্বে'।

কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ এই উদ্ধৃতিটি শ্রীহর্ষ রচিত রত্নাবলী নাটকের ১ম অঙ্ক হইতে গৃহীত। এই উক্তিটি বৎস-দেশের রাজা উদয়নের সুদক্ষ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের। সিদ্ধপুরুষেরা ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিল যে, সিংহলের রাজকন্যা রত্নাবলীর যে পাণিগ্রহণ করিবে সে বিখ্যাত নরপতি হইবে। উদয়নের স্ত্রী বাসবদত্তার আগুনে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া সিংহলরাজ রত্নাবলীকে বৎসের দিকে পাঠাইয়াছিল কিন্তু সমুদ্রে যানভঙ্গে নিমগ্না হইয়াও রত্নাবলী কাষ্ঠখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সিংহল হইতে প্রত্যাগমনকারী কৌশাম্বীর বণিকের আশ্রয় লাভ করে। যৌগন্ধরায়ণ এই ঘটনাকে তাহার প্রভুর অনুকূল বলিয়া মনে করিল। কিন্তু সে ইহাও শুনিল যে, কঞ্চুকী-বাভ্রব্য সিংহল-রাজের মন্ত্রী বসুভূতির সহিত কোনপ্রকারে সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কোশলের ধ্বংসের জন্য রুমবণ্বেনের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেজন্য প্রভুর কার্য সম্পন্ন হইলেও যৌগন্ধরায়ণ ধৈর্য ধরিতে পারিল না। মনে মনে বলিল, ভৃত্যভাব কি কষ্টদায়ক।

লুৎফ-উন্নিসা সেলিমের উপর প্রভুত্ব প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেও শেষ পর্যন্ত বুঝিতে পারিল তাহার সম্রাজ্ঞী হইবার কোন আশা নাই। সেখানে মেহের-উন্নিসারই স্থান হইবে। লুৎফ-উন্নিসাকে মেহের-উন্নিসার অধীনে থাকিতে হইবে। এই চিন্তা লুৎফ-উন্নিসার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ভৃত্যভাব যে কষ্টদায়ক তাহা যৌগন্ধরায়ণের মতই লুৎফ-উন্নিসা বোধকরিল।

মতির চরিত্র মহাদোষ কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিতঃ মতিবিবি আগ্রায় গিয়া নানা সাহিত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইল। সে সাহসী, বুদ্ধিমতী এবং তেজস্বিনী। এইগুলি তাহার মহৎগুণ। কিন্তু তাহার চরিত্রের কোন সংযম ছিল না। ইন্দ্রিয়দমনের কোন ক্ষমতা বা ইচ্ছাও তাহার ছিল না। দুর্বার তাহার মনোবৃত্তি। সে তাহার কার্যে সদসৎ বিচার করিত না। সে তাহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করিল। ইহাই তাহার চরিত্রের মহাদোষ।

লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাহার পাটরাণী হইবেন : লুৎফ-উন্নিসা রূপে গুণে যুবরাজ সেলিমকে পর্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। সেলিম তাহাকে তাহার মহিষীর প্রধান সহচরী করিলেও পরোক্ষে লুৎফ-উন্নিসা তাহার অনুগ্রহ-ভাগিনী। সেলিমের চিত্তে তাহার মত স্থান আর কেহ করিতে পারে নাই। সেলিমের উপর এই প্রভুত্ব দেখিয়া লুৎফ-উন্নিসার স্থির বিশ্বাস হইল যে, সেলিম বাদশাহ হইলে সেও সম্রাজ্ঞী হইবে।

একদিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম.........মহিষী হইবেন : মেহের-উন্নিসা এবং সেলিমকে লইয়া বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মেহের-উন্নিসার বিবাহের পূর্বেই সে যে সেলিমের হৃদয় জয় করিয়াছিল তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করেন না। তবে সেলিমের জীবনে এই মেহের-উন্নিসা যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাঁহার দুঃসাহসী রোমান্টিক নায়িকা লুৎফ-উন্নিসার ভাগ্যের সহিত ইতিহাসখ্যাত মেহের-উন্নিসার কাহিনী অতি সুন্দরভাবে মিশাইয়া দিয়াছেন। মেহের-উন্নিসার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বলেন :

In May, 1611 Jahangir married Nur Jahan, originally known as Mihr-un-nisa, who considerably influenced his career and reign. Modern researches have discarded the many romantic legends about Mihr-un-nisa's birth and early life and have proved the reliability of the brief account of Mutamid Khan, the author of Iqbal-Nama-i-Jahangiri. According to it, Mihr-un-nisa was the daughter of a Persian immigrant, Mirza Ghiyas Beg, who came to India with his children and wife in the reign of Akbar. She was born on the way to India at Qandahar. Her father rose to high position during the reigns of Akbar and his son. She was married, at the age of seventeen, to Ali Quli Beg Istajhi, another Persian adventurer, who in the beginning of Jahangir's reign received the jagir of Burdwan in Bengal and the title of Sher-afghan. When Jahangir heard that

Sher-afghan had grown "insubordinate and disposed to rebellions", he sent in A. D. 1607 his foster-brother, Qutb-ud-din, the new governor of Bengal, who was to the Emperor "in the place of a dear son, a kind brother, and a congenial friend", to chastise him. An affray took place between Sher-afghan and Qutb-ud-din at Burdwan, in course of which the latter was killed. Sher-afghan was, in his turn, hacked to pieces by the followers of Qutb-ud-din, and Mihr-un-nisa was taken to the court with her young daughter. After four years Mihr-un-nisa's charming "appearnce caught the king's far-seeing eye and so captivated him" that he married her, and made her his chief queen. The Emperor, who styled himself Nur-ud-din, conferred on his new consort the title of Nur Mahal (Light of the Palace), which was soon changed to Nur-Jahan (Light of the World). It is sometimes said that Jahangir had been in love with Mihr-un-nisa "when she was still a maiden, during the life-time of Akbar" and that his infatuation for her cost Sher-afghan his life. The truth of this opinion has recently been questioned on the ground that the contemporay Indian historians, and some European travellers, are silent about it and it was invented by later writers. But the cause of Mihr-un-nisa being brought to the court, and not to her father who held an important post in the Empire, has not been explained. That Jahangir was not above the habit of having secret love affairs with the ladies of the court is proved by the case of Anarkali, for whom he raised in 1615 a beautiful marble tomb at Lahore, bearing the passionate inscription: "Ah! Could I behold the face of my beloved once more, I would thank God until the day of resurrection." (An Advanced History of India).

মেহের-উন্নিসার পিতার নাম পরে হইয়াছিল ইতিমাদ-উদ্দৌলা (I'timad-ud-daulah); বঙ্কিমচন্দ্র তাহার নাম দিয়াছেন, আকতিমাদ-উদ্দৌলা। তাহা ঠিক নহে। মেহের-উন্নিসার সৌন্দর্যের কথাও ইতিহাসে উল্লেখ আছে। "Nur-Jahan was indeed possessed of exquisite beauty, a fine taste for Persian literature, poetry and arts, "a piercing intellect, a versatile temper, and sound commom sense." (ঐ)।

এ সময়ে লুৎফ-উন্নিসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিলেনঃ ইহা ঐতিহাসিক নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত। যুবরাজ সেলিমের স্থানে সেলিম-পুত্র খস্রুকে সিংহাসনে বসাইবার কথা ইতিহাস-স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্র লুৎফ-উন্নিসার চরিত্রের গুরুত্ববৃদ্ধি করিবার জন্য সেই প্রচেষ্টাকে লুৎফ-উন্নিসার উদ্যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সেলিমকে ত্যাগ করিয়া খস্রুকে......কোন কারণ ছিল নাঃ আকবরের রাজত্বের শেষ সময়ে তাঁহার পুত্র সেলিমকে ত্যাগ করিয়া সেলিম-পুত্র খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে স্থাপিত করিবার এক প্রচেষ্টা দেখা যায়। সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যে অভিযানে যাইবার সময় সেলিমকে রাজা মানসিংহ এবং শাহকুলী খাঁর সঙ্গে যোগ দিয়া মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে আদেশ দিয়া যান। কিন্তু সেলিম পিতার আদেশ অমান্য করিয়া আগ্রা ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে গমন করে।

"In eagerness to seize the throne, Salim set himself up as an independent king at Allahabad and entered into intrigues with the Portugues to achive his end. In 1602 he further wounded his father's feelings by causing Abul Fazl, a close friend of the Emperor's to be put to death on his way back from the Deccan. In 1603 a temporary reconcilition was effected between father and son through the mediation of Sultana Salima Begam. But Salim again proceeded to Allahabad and began to act in a highly objectionable manner. Menawhile Khan-i-Azam, Raja Man singh and some other nobles of the court, plotted to secure the succession for Salim's son, Khusrau." (An Advanced History of India).

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলাকে বিদায় করিয়া মতিবিবি তাহার লোক-জনসহ বর্ধমানের পথে যাত্রা করিল। কিন্তু সেদিন তাহারা বর্ধমানে পৌঁছাইতে পারে নাই। এক চটিতে রাত কাটাইতে হইয়াছিল। সেখানে মতিবিবি তাহার দাসী পেষমনের সঙ্গে নবকুমার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। মতি প্রকাশ করিল, খস্রু যদি বাদশাহ হয় তবে সে নবকুমারকে ওমরাহ করিবে। এমন সময় আগ্রা হইতে মতিবিবি এক পত্র পাইল। তাহাতে জানিল,

বাদশাহ আকবরের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি খস্রুকে সিংহাসনে বসাইবার সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞায় সেলিমই এক্ষণে জাহাঙ্গীর শাহ নামে বাদ্‌শাহ হইয়াছেন। ঐ পত্রে মতিবিবিকে শীঘ্র আগ্রায় ফিরিয়া যাইতে বলা হইয়াছে।

মতিবিবি তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিল। কারণ জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিসাকে বিবাহ করিবে এবং কার্যত মেহের-উন্নিসাই বাদশাহ হইবে—জাহাঙ্গীর কেবল নামে থাকিবে। মেহের-উন্নিসার অধীনে পুরস্ত্রী হইয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। মেহের-উন্নিসা মতিবিবির বাল্য-বান্ধবী। তাহা ছাড়া মেহের-উন্নিসা যখন জানিতে পারিবে মতিবিবি তাহার সিংহাসনারোহণের পথরোধের চেষ্টা করিয়াছিল তখন মতিবিবির দশা নিশ্চয় ভাল হইবে না। মতিবিবি তখন মেহের-উন্নিসার মন জানিবার জন্য দুইদিন বর্ধমানে গিয়া তাহার নিকট থাকিবার সঙ্কল্প করিল।

এই পরিচ্ছদের নাম 'পথান্তরে' অর্থাৎ অন্য পথে। মতিবিবি রাজা মানসিংহ এবং খাঁ আজিমের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সেলিম-পুত্র খস্রুকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আকবর মৃত্যুর পূর্বে সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া সেলিমকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। নিজেদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় এক্ষণে মতিবিবিকে অন্য পথ গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হইতেই মতিবিবির জীবনপথের পরিবর্তন হইয়াছিল। মতিবিবি এতদিন যেভাবে জীবনযাপন করিয়াছিল এখন তাহা হইতে ভিন্নপথের চিন্তা করিতেছিল।

যে মাটিতেপড়ে লোক উঠে……হতেপারে কাল ঃ মতিবিবিদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। সেলিম বাদ্‌শাহ হইয়াছে। শের আফগানের পত্নী মেহের-উন্নিসাকে যে সেলিম বিবাহ করিবে সেই সম্বন্ধে মতিবিবি নিশ্চিত। এবং মেহের-উন্নিসা সম্রাজ্ঞী হইলে মতিবিবির পক্ষে বাদ্‌শাহের পুরস্ত্রী হইয়া থাকা সম্ভব নহে। বিশেষ মেহের-উন্নিসা যখন মতিবিবিদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিবে তখন তাহাদের আরও মুশকিল হইবে। মতিবিবি তথাপি আশা ছাড়িল না। সে জানে সেলিম মেহের-উন্নিসার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু মেহের-উন্নিসার মনের কথা সে জানে না। মেহের-উন্নিসা যদি সেলিমের প্রতি অনুরক্ত না হয় তাহা হইলে তাহার স্বামী শের আফগানকে নিহত

করিলেও সে সেলিমকে বিবাহ করিবে না, এই আশায় মাতাবাবি বর্ধমানে গিয়া তাহার বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার কাছে দুদিন থাকিবার মনস্থ করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নামক রোমান্টিক নাটক হইতে এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। এই উক্তিটি মন্ত্রী জলধরের। রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী মালতীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া জলধর তাহাকে তাহার কেলিগৃহে আসিতে বলিয়াছিল। মালতী এবং তাহার দূর সম্পর্কের ভগ্নী ও সখী মল্লিকা জলধরের স্ত্রী জগদম্বাকে কথাটা ফাঁস করিয়া দিয়া তাহাকে সেই কেলিগৃহের চাবি দিয়া দিয়াছিল। জগদম্বা মালতীর শাড়ী পরিয়া কেলিগৃহে অপেক্ষা করে এবং নির্দিষ্ট সময়ে জলধর উপস্থিত হইয়া তাহাকে মালতী ভ্রমে প্রেম নিবেদন করিতে গেলে জগদম্বা জলধরকে সম্মার্জনী দ্বারা যথেষ্ট প্রহার করিয়া চলিয়া যায়। তারপর জলধর গাত্রোত্থান করিয়া এই উক্তি করিয়াছিল। সে তাহার স্ত্রীর হাতে অপমানিত হইয়াও মালতীর আশা ত্যাগ করিল না।

আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে : মতিবিবি যখন বাদশাহ তৈয়ারীর ব্যাপারে ব্যস্ত তখন আকস্মিকভাবে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে নবকুমারের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার হৃদয় বিচলিত হইল। প্রেমচর্চায় মতিবিবির কলঙ্ক এতদূর উঠিয়াছিল যে তাহার পিতা তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। স্বয়ং যুবরাজ সেলিম যাহার অনুগ্রহপ্রার্থী তাহার ঐশ্বর্যেরও কোন অভাব নাই। কিন্তু বহু মানুষের প্রেমেও মতিবিবির পরিতৃপ্তি হয় নাই। স্বামীর একান্ত প্রেমলাভের জন্য সে অতঃপর উন্মুখ হইয়া উঠিল। নবকুমার যে তাহার চিন্তার অনেকখানি জুড়িয়া ছিল এই উক্তিতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

আমাদিগের যত্ন বিফল হইয়াছে......জাহাঙ্গীর শাহ হইয়াছেন : বর্ধমানের পথে মতিবিবি খস্রুর শ্বশুর খাঁ আজিমের নিকট হইতে সংবাদ পাইল যে, তাহারা খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে বসাইবার যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মৃত্যুকালে আকবর বাদশাহ সেলিমকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে An Advanced History of India গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

Khan-i-Azam, Raja Man Singh and some other nobles of the court, plotted to secure the succession for Salim's son Khusrau. But their scheme failed owing the opposition of other nobles. The other sons of Akbar, had already died. Salim, the only surviving son of Akbar, became reconciled

to his father after the removal of all the rival claimants. Akbar treated him like a petulant child, rebuked him severely, and confined him for some time before pardoning him in November, 1604. But Akbar's end was drawing near. He was attacked by severe diarrhoea or dysentry in the autumn of 1605 and died on the 17th October.

এই প্রসঙ্গে V. A. Smith তাঁহার India in Muhamedan Period গ্রন্থে আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—

In November, 1604, Salim was pursuaded to come to the court probably under threats that if he refused, Khusru would be declared heir-apparant. His father received him with seeming cordiality. He then drew him suddenly in an inner apartment slapped him soundly in the face and confined him in a bathroom under the charge of a physician and two servants, as if he were a lunatic requiring medical treatment. After a short time the length of which is variously stated, Akbar released his son, restored him to favour, made him viceroy of the provinces to which Daniyal had been appointed and allowed him to reside at Agra as the acknowledged heir-apparent. The prince was cowed by his father's rough handling and gave no further trouble.

"In September, 1605, Akbar became ill with severe diarrhoea or dysentry which the physicians failed to cure. While on his deathbed and unable to speak he received Salim and indicated by unmistakable gestures that he desired his succession."

ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে ঃ পরিস্থিতি বিচার করিয়া কাজ করিতে হয়। এই উক্তি দ্বারা মতিবিবির সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব নির্দিষ্ট কোন সংকল্প দ্বারা সব সময় কাজ করা যায় না। অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়।

কোন নূতন ভাব উদয় হইতেছে ঃ এই উক্তি দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকচিত্তে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়াছেন। নবকুমারের সহিত আকস্মিক সাক্ষাতের পর হইতেই মতিবিবির ভাবান্তর দেখা দিয়াছিল। এক্ষণে সেলিমের বাদশাহ হইবার সংবাদে আগ্রায় তাহার প্রভাব বিনাশেরও সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সেজন্য মতিবিবির মধ্যে আগ্রা সম্বন্ধে ক্রমশ

অনাসক্তি দেখা দিয়া নবকুমারকে লাভ করিবার আগ্রহই প্রবল হইবে। এই উক্তির মধ্যে তাহারই ইঙ্গিত আছে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

মতিবিবি বর্ধমানের কর্মাধ্যক্ষ শের আফগানের গৃহে সমাদরে গৃহীত হইল। বহুদিন পর সে তাহার বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। মেহের-উন্নিসাও দিল্লীর সাম্রাজ্য-লাভের জন্য প্রতিযোগিনী হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিত না। সেজন্য সেও লুৎফ-উন্নিসার (মতিবিবি) নিকট হইতে আগ্রার সংবাদ লইবার জন্য আগ্রহী হইয়াছিল। মেহের-উন্নিসার মত রূপবতী এবং গুণবতী মহিলা পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মতিবিবি তাহার নিকট নিজ মনোভাব গোপন করিয়া রাখিল। উড়িষ্যায় তাহার পীড়িত ভ্রাতাকে দেখিয়া সে ফিরিয়া যাইবার পথে বাল্য-সখীকে দেখিতে আসিয়াছে ইহাই জানাইল। উভয় সখীর আলোচনায় মেহের-উন্নিসার আসল মনোভাব প্রকাশ পাইল। মেহের-উন্নিসা যুবরাজ সেলিমের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী। ভারতের সম্রাজ্ঞী হওয়া তাহার একান্ত ইচ্ছা। অবশ্য পরে বলিল, সে সেলিমকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান করিলেও তাহার নিকট কুলমান সমর্পণ করিবে না এবং সেলিম যদি তাহার স্বামীর প্রাণ বিনাশ করে তাহা হইলেও স্বামীহন্তার সঙ্গে তাহার কখনো মিলন হইবে না। মতিবিবি বুঝিল ইহা ঠিক মেহের-উন্নিসার মনের কথা নহে। সেলিমের বেগম হওয়াই তাহার একান্ত কামনা। মেহের-উন্নিসা কিন্তু মতিবিবির মনের কথা কিছু বুঝিতে পারিল না।

মতিবিবি মেহের-উন্নিসার মনের কথা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইল না। সেলিমের উপর তাহার প্রভাব কমিয়া গিয়াছে তাহাতে সে মোটেই বিচলিত হইল না। বরং এতদিনে সে যেন নিশ্চিন্ত হইল। তাহার হৃদয় যে দোটানায় ছিল তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। এই মনোভাব লইয়াই মতিবিবি আগ্রার দিকে রওনা হইল।

যখন শের আফগান এবং তাহার স্ত্রী মেহের-উন্নিসা আগ্রায় থাকিতেন তখন মতিবিবির সঙ্গে তাহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। মেহের-উন্নিসা ছিল মতিবিবির বাল্যসখী। পরে উভয়ে দিল্লীর সাম্রাজ্য লাভের জন্য প্রতিযোগী

হইয়াছিল। অনেকদিন পরে বর্ধমানে মতিবিবি আবার তাহার প্রতিযোগিনীর গৃহে উপস্থিত হইল। সেইজন্য এই পরিচ্ছেদের নাম 'প্রতিযোগিনী-গৃহে'।

শ্যামাদন্যো নহি নহি নহি প্রাণনাথো মমাস্তিঃ উক্তিটি শ্রীরাধিকার। কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'উদ্ধবদূত' হইতে ইহা উদ্ধৃত। প্রভাস হইতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে তাঁহার দূতরূপে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাধিকা তখন উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, তিনি শ্যাম ছাড়া অন্য কাহাকেও তাঁহার প্রাণ-প্রিয়রূপে জানেন না। এখানে সেলিমের প্রতি মেহের-উন্নিসার মনোভাবও তদ্রূপ। মেহের-উন্নিসা সেলিমকে কখনো ভুলিতে পারে নাই। সে হৃদয় মধ্যে তাহার ধ্যান করে। সে নিজেই মতিবিবিকে বলিয়াছে, "আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না।" সে শের আফগানের স্ত্রী হইলেও মনে মনে সেলিমকেই প্রাণনাথ ভাবিয়া ধ্যান করে।

মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধানা রূপবতী ও গুণবতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন : ইতিহাসে উল্লেখ আছে :

"Nur Jahan was indeed possessed of exquisite beauty, a fine, taste for Persian literature, poetry and arts, a piercing intellect, a varsatile temper, and sound common sense. But the most dominating trait of her character was her inordinate ambition, which led her to establish an unlimited ascendancy over her husband" (An Advanced History of India).

মনুষ্যহৃদয়ের বিচিত্র গতি মতিবিবি বিলক্ষণ বুঝিতেন : মেহের-উন্নিসার ন্যায় মতিবিবিও রূপে-গুণে কম ছিল না। তাহার ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। বহু মানুষের সঙ্গে ছিল তাহার ভাব। সেজন্য মনুষ্যহৃদয়ের বিচিত্র গতি সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। সে মেহের-উন্নিসার মনের কথা জানিবার জন্য বর্ধমানে গিয়াছিল। মেহের-উন্নিসার বুদ্ধি সম্বন্ধে ইতিহাসে প্রশংসা আছে। কিন্তু মতিবিবির সঙ্গে সে পারিয়া উঠে নাই। মেহের-উন্নিসা মুখে নিজেকে পতিগতপ্রাণা প্রমাণ করিলেও অন্তরে যে সে সেলিমের প্রণয়ভাগিনী তাহা গোপন করিল না। মতিবিবি বুঝিতে পারিল, শের আফগান নিহত হইলে মেহের-উন্নিসা দিল্লীর সম্রাজ্ঞী হইবে। বাদশাহ সেলিমের মনস্কামনা পূর্ণ করাই তাহার একান্ত কামনা।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

মতিবিবি বর্ধমান হইতে আগ্রায় গিয়া পৌঁছিল। মেহের-উন্নিসার মনের ভাব জানিবার পর হইতেই তাহার চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন হইয়াছিল। আগ্রায় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট সে তাহা প্রকাশ করিল। সে তাঁহাকে মেহের-উন্নিসার অনুরাগের কথাও অকপটে বলিল। তারপর বাদশাহের অনুমতি লইয়া নিজ স্বামীকে বিবাহ করিতে চাহিল। মতিবিবি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় নবকুমার তাহাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করে নাই। কিন্তু এক্ষণে বাদশাহের হুকুম পাইলে নবকুমার আর তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার সাহস পাইবে না। মতিবিবির প্রতি জাহাঙ্গীরের অনুরাগও কম ছিল না। সেজন্য তিনি তাহাকে তাঁহার নিকটই থাকিতে বলিলেন। কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা ওরফে মতিবিবি জানাইল যে, মেহের-উন্নিসার সঙ্গে একত্রে থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। আসলে নবকুমারকে দেখিবার পর হইতে এবং দ্বিতীয়ত তাহার ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হওয়ায় মতিবিবি আবার স্বামীর সংসার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

আগ্রার রাজপ্রাসাদে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে লুৎফ-উন্নিসার কথোপকথনই এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন 'রাজনিকেতনে'।

পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্যের নবম সর্গ 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবীর পত্র' হইতে এই পঙক্তিটি গৃহীত হইয়াছে। জাহ্নবীদেবী বশিষ্ঠের অভিশাপে শাপভ্রষ্ট অষ্টবসুর অনুরোধে তাঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মর্ত্যে আগমন করেন এবং হস্তিনার রাজা শান্তনুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় জাহ্নবীদেবী একটি শর্তে রাজাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কথা ছিল যে, শান্তনু যদি কখনও জাহ্নবীর কোন কার্যের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবেন। বিবাহের পর শান্তনুর ঔরসে জাহ্নবীর গর্ভে একে একে আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যেমন একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় অমনি জাহ্নবীদেবী শিশুপুত্রকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন। এইভাবে শান্তনুর সাতটি পুত্র গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইল। মর্মপীড়িত শান্তনু এতদিন কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু অষ্টম পুত্রের বেলায় রাজা আর

থাকিতে পারিলেন না, জাহ্নবীদেবীকে বাধা দিলেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইল। জাহ্নবী আর থাকিলেন না। তাঁহার বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বসু ভীষ্মদেব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবীদেবী এই পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি আত্মপরিচয় দিয়া রাজাকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন আর জাহ্নবীদেবীকে পত্নী ভাবে মনে না করেন।

মতিবিবিও এতকাল আগ্রায় যুবরাজ সেলিমের অনুরাগ-ধন্য হইয়া বাস করিতেছিল। এক্ষণে মেহের-উন্নিসার আগমন-প্রাক্কালে সে সেলিমকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সেলিম তাহাকে থাকিতে বার বার অনুরোধ করিলেও সে তাহার রত্নসিংহাসন তলে কণ্টক হইয়া থাকিতে চাহে নাই। জাহ্নবী-দেবীর মত সেও যেন সেলিমকে তাহাকে ভুলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। উদ্ধৃতপংক্তির সঙ্গে কাহিনীর এখানেই ভাবসাদৃশ্য।

জাহাঁপনার দাসীকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না ঃ মহম্মদীয় ধর্ম গ্রহণ করায় নবকুমার তাহার পত্নী পদ্মাবতী ওরফে মতিবিবিকে আর পত্নী বলিয়া গ্রহণ করে নাই। উড়িষ্যা হইতে আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পথে হঠাৎ নবকুমারের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং খস্রুকে বাদশাহ করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় মতিবিবি আবার তাহার স্বামীর সংসার করিতে আগ্রহী হইয়াছে। নবকুমার যদি জানিতে পারে মতিবিবিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা বাদশাহেরও ইচ্ছা তাহা হইলে বাদশাহী সেই আদেশকে উপেক্ষা করিবার সাহস নবকুমারের হইবে না।

ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে কিন্তু এক মৃণালে দুটি কমল ফুটে না ঃ এই উক্তির মধ্যে মতিবিবির সৌজন্য এবং সাহসের পরিচয় আছে। বহুবল্লভ বাদশাহ মেহের-উন্নিসার সঙ্গে লুৎফ-উন্নিসাকেও থাকিতে বলিয়াছেন। তাহাদের কাহাকেও ত্যাগ করিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করিতেছে। সে মেহের-উন্নিসার প্রতিযোগিনী। তাহার সঙ্গে একবৃন্তে দুটি ফুলের মত সেলিমের অনুরাগ সে ভাগ করিয়া পাইতে চাহে না। ক্ষুদ্র ফুল অনেক একত্রে ফুটে। কিন্তু পদ্ম, যে নিজের শোভায় দীপ্যমান, তাহার এক ডাঁটায় দুইটি ফুল ফুটে না। আসলে মতি-

বিবির এতদিনের ভোগসর্বস্ব জীবনে হৃদয় বলিয়া কিছু ছিল না। সেলিমের রমণী-হৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন তাহার মন মুগ্ধ করে নাই। কিন্তু নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হইতে তাহার চিত্তও ব্যাকুল হইল। মতিবিবির হৃদয়ে প্রেমের এই অতর্কিত আবির্ভাবে এক বিপ্লব দেখা দিয়াছে। সেইজন্যই সেলিমের সঙ্গে আলোচনার সময়ও তাহার অপরাজেয় মনোভাব দেখা গিয়াছে।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

আগ্রায় থাকিবার জন্য জাহাঙ্গীর বাদশাহের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া লুৎফ-উন্নিসা নিজগৃহে আসিল। সেখানে বহুমূল্য পোশাক খুলিয়া দাসী পেষমনকে দিয়া দিল। এই নূতন বহুমূল্য পোশাক পাইয়া পেষমন বিস্মিত হইল, মনে করিল জাহাঙ্গীর বাদশাহের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ শুভ হইয়াছে। লুৎফ-উন্নিসা নিশ্চয় বেগম হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই লুৎফ-উন্নিসা তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিল যে সে আর আগ্রায় থাকিবে না। আগ্রার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বাংলায় গিয়া বাস করিবে এবং সম্ভব হইলে নবকুমারের গৃহিণী হইবে। পেষমন মনে করিল ইহা তাহার কুপ্রবৃত্তি। আসলে তাহা নহে, সুখের সন্ধানে এতকাল লুৎফ-উন্নিসা অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক দুষ্কর্ম করিয়াছে কিন্তু বাঞ্ছিত সুখ সে পায় নাই। ভোগসর্বস্ব জীবনে সে এতকাল ধরিয়া ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সবই লাভ করিয়াছে কিন্তু একদিনের জন্য, এক মুহূর্তের জন্যও সে সুখী হয় নাই। কেবল সুখের তৃষ্ণা বাড়িয়াছে। তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া সে যে সুখ কোনদিন পাই নাই উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে একরাত্রে সেই সুখ লাভ করিয়াছে। সে ভালবাসার কাঙাল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার অবস্থা হিন্দুদিগের দেবমূর্তির মত। বাহিরে নানা অলঙ্কার, চাকচিক্য, ভিতরে পাষাণ। লুৎফ-উন্নিসার বাহ্যিক রূপে অনেকেই ভুলিয়াছে কিন্তু সে কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার হৃদয় এতকাল পাষাণের মত ছিল। একরাত্রে নবকুমারের সাক্ষাতে সেই পাষাণের মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে, পাষাণ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লুৎফ-উন্নিসার অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেখানে অশেষ ধন সম্পদের মধ্যেও যে সে কত রিক্তা তাহারই পরিচয় পাই। সেজন্য এই পরিচ্ছেদের নাম,—'আত্মমন্দিরে'।

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু……লাখে না মিলিল একঃ শ্রীরাধিকা এখানে তাঁহার প্রেমের অতৃপ্তির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি আজন্ম তাঁহার প্রিয়পাত্রের রূপ দেখিয়াছেন, তাহার মধুর কথা শুনিয়াছেন তথাপি তাঁহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় নাই। প্রেমের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়াও তিনি প্রেমের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই, প্রেমাস্পদের সঙ্গে অসংখ্য মধুরাত্রি কাটাইয়াও তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহার অতৃপ্ত প্রেমের জ্বালা জুড়াইতে পারে এমন প্রেমিকও লক্ষের মধ্যে একজনও পাওয়া যায় না। শ্রীরাধিকার এই উক্তির মধ্যে যে প্রেমাকুতির গভীরতা আছে মতিবিবির মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। মতিবিবি আগ্রায় বহু আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে মিশিয়াছে, মন দেওয়া-নেওয়া করিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও সে ভালবাসিতে পারে নাই। ধন, সম্পদ, প্রতিপত্তি দ্বারা প্রকৃত ভালবাসা পাওয়া যায় না। সেজন্য লুৎফ-উন্নিসার সব থাকিয়াও কিছুই নাই। তাহার হৃদয় ভালবাসা পাইবার জন্য হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। উড়িষ্যা হইতে আগ্রায় ফিরিবার পথে নবকুমারের সাক্ষাতে সে যাহা পাইয়াছে তিন বৎসরের আগ্রার জীবনে সে তাহা পায় নাই।

তথাপি শ্রীরাধিকার প্রগাঢ় অনুভূতির সঙ্গে লুৎফ-উন্নিসার প্রেমাকুলতার সাদৃশ্য অল্পই। শ্রীরাধিকা প্রেমের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও অতৃপ্ত প্রেমের জ্বালা ভোগ করিয়াছেন। সব পাইয়াও তাঁহার মনে হইয়াছে যেন সব পান নাই। লুৎফ-উন্নিসার ব্যাকুলতা সেখানে নহে। সে প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও ভালবাসে নাই, কাহারও ভালবাসা পায় নাই। সেজন্য নবকুমারের এতটুকু আন্তরিকতার স্পর্শেই তাহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। উদ্ধৃত অংশটি 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' পদের অংশ বিশেষ। ইহা কবি বল্লভের রচনা (বিদ্যাপতির নহে)।

তবে এক্ষণে বেগমের দাসী হইলাম, ইত্যাদি : বঙ্কিমচন্দ্রের সংলাপ প্রয়োগের নৈপুণ্য লক্ষণীয়। সাধারণ সংলাপের মধ্য দিয়াও তিনি নাটকীয় উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেন।

এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার কেন জন্মিলঃ পেষমন লুৎফ-উন্নিসার দাসী। আগ্রার ধনাঢ্য পরিবেশে সে তাহার মনিবকে এতকাল দেখিয়াছে। সে জানে লুৎফ-উন্নিসাই দিল্লীর সম্রাজ্ঞী হইবে। কিন্তু এক্ষণে সে আগ্রার সহিত সকল

সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশে যাইতেছে। অভ্যস্ত রীতি হইতে তাহা স্বতন্ত্র। সেজন্য পেষমনের নিকট ইহাকে কুপ্রবৃত্তি বলিয়া মনে হইয়াছে।

কুপ্রবৃত্তি নহে ঃ পেষমন যাহাই ভাবুক মতিবিবি কিন্তু আগ্রা ত্যাগকে তাহার সুস্থ এবং স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়াই গ্রহণ করিল। কারণ বাল্যাবধি তাহার সুখের তৃষ্ণা অতি প্রবল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, সেই তৃষ্ণার যন্ত্রণায় কাতর হইয়াই সে আগ্রা পর্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। সেখানে সে বহু মানুষের প্রেম লাভ করিয়াছে, ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিয়াছে। তথাপি সে একদিনের তরেও, এক মুহূর্তের জন্যও সুখী হয় নাই। অতএব যেখানে সুখ নাই সেখানে সে আর থাকিতে চাহে না।

এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্বতীয় নির্ঝরিণীর ন্যায় ঃ লুৎফ-উন্নিসা নিজের সুখাকাঙ্ক্ষাকে একটি পার্বতীয় জলধারার সঙ্গে তুলনা করিতেছে। প্রথমে তাহা ক্ষুদ্র আকারে একান্তে বিকাশ লাভ করে কিন্তু ক্রমশঃ সেই আকাঙ্ক্ষার ব্যাপ্তি ঘটে। প্রচণ্ড রিপুর তাড়নায় উদ্দামতার মধ্যে তাহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। পার্বত্য নদীর স্রোতোধারায় প্রথমে কোন আবিলতা, পার্বত্য পঙ্কিলতা থাকে না। কিন্তু উহা যতই বিপুল কায়া লাভ করে ততই বেগবতী হইয়া উঠে। ততই তাহাতে নানারূপ ক্লেদক্লিন্নতা দেখা দেয়। অবশেষে ওই কর্দমযুক্ত এবং প্রাণঘাতী জীবসঙ্কুল নদীস্রোত দুর্বার বেগে ধাবিত হইয়া সমুদ্রবক্ষে নিজেকে হারাইয়া দেয়। মানুষের বাসনাও সেইরূপ। তাহার নিবৃত্তির জন্য লুৎফ-উন্নিসা অনেক চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে কেবল কলঙ্কই রটিয়াছে, সুখ জোটে নাই। বর্তমানে তাহা এত বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, তাহাকে আর লুকাইয়া রাখা সম্ভব নহে।

তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায়...একরাত্রে সে সুখ হইয়াছেঃ মহম্মদীয় ধর্ম গ্রহণের পর লুৎফ-উন্নিসার যখন স্বামীগৃহে স্থান হয় নাই তখন সে সুখের অন্বেষণে আগ্রায় গিয়াছিল ; সেখানে নিজের রূপ এবং গুণবলে যুবরাজ সেলিমকে পর্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। তিন বৎসর সে রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বাস করিয়া অতুল ধন সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। এতকাল সে তাহাতেই মগ্ন ছিল। কিন্তু উড়িষ্যা হইতে আগ্রায় প্রত্যাগমনের পথে একরাত্রে নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় সে তাহার এই ঐশ্বর্যময় জীবনের ফাঁকি বুঝিতে পারিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে বহুবল্লভার চটক আছে

কিন্তু এক স্বামীপ্রেমের যে মাধুর্য আছে সেখানে তাহা নাই। নবকুমারের আন্তরিকতায় তাহার মনপ্রাণ পূর্ণ হইয়াছিল।

আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্তির মত ছিলাম : নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর লুৎফ-উন্নিসার মনে আত্মবিচার দেখা দিয়াছে। সে তিনবৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় যুবরাজ সেলিমের অনুরাগিণী হইয়াই বাস করিয়াছে। তাহা ছাড়া সে কত মানুষের ভালবাসা পাইয়াছে। কিন্তু সে নিজে কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার এই নানা মানুষের সংস্পর্শেও হৃদয় প্যষাণ হইয়া ছিল। হিন্দুদিগের পাষাণ দেবমূর্তি বাহিরে যেমন নানা সুবর্ণ-রত্নাদিতে শোভিত থাকে তেমনি অশেষ ধন সম্পদের মধ্যে লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় প্রকৃত ভালবাসার অভাবে পাষাণ হইয়া ছিল।

আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকিতে জল অধোগামী কেন? এই পৃথিবীর অনেক কিছু রহস্যময়। সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিতে তাহার বিচার করা সব সময় সম্ভব হয় না। লুৎফ-উন্নিসা আগ্রা ছাড়িয়া বঙ্গদেশে চলিয়া যাইবার সংকল্পজ্ঞাপন করিলে তাহার দাসী পেষমন অবাক হইয়া গেল। এতকাল যে ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতার পিছনে ছুটিয়াছে, সে সর্বস্বত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় কষ্টভোগ করিতে যাইতেছে। পেষমন লুৎফ-উন্নিসার এ খেয়ালের কারণ বুঝিতে পারে নাই। নারীর হৃদয়াবেগ, তাহার প্রবৃত্তি কেন অকস্মাৎ দুর্বার হইয়া অন্ধবেগে নবকুমারের দিকে ধাবিত হইয়াছে—এই রহস্য কেবলমাত্র পেষমনের নিকট নহে, সকলের নিকটেই দুজ্ঞেয়। লুৎফ-উন্নিসা অবশ্য ইহাকে বলিয়াছে ললাটলিখন বা নিয়তি।

পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল : মতিবিবি এতদিন বহু মানুষের সান্নিধ্যে আসিয়া অনেক প্রেমের খেলা খেলিয়াছে কিন্তু কাহারও প্রতি তাহার যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয় নাই। সে কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই। পাষাণের মতই কঠিন হৃদয় লইয়া এতদিন সে এই প্রেমের খেলা খেলিয়াছে। সেজন্য তাহাতে অনুরাগের কোন রেখাপাত হয় নাই। যুবরাজ সেলিমের পিয়পাত্রী হইয়াও সে অন্তরে রিক্ত ছিল। উড়িষ্যা হইতে আগ্রার প্রত্যাবর্তনের পথে পান্থশালায় একরাত্রে নবকুমারের সাক্ষাতে সে যেন সত্যই তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল, তাহার জীবনে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইল। আগ্রায় খস্রুকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাহার আগ্রার প্রতি আসক্তি

কমিয়া আসিল, নবকুমারের প্রতি আকর্ষণ তীব্র হইল। নবকুমারের প্রতি অনুরাগের অগ্নি লুৎফ-উন্নিসার পাষাণ হৃদয়কে গলাইতে লাগিল।

বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কৌশলে লুৎফ-উন্নিসার এই অনুরাগের চিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা অবস্থা-বৈগুণ্যে অনেকের সঙ্গে গভীরভাবে মেলা-মেশা করিলেও সে কাহাকেও প্রকৃত ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার প্রথম স্বামী নবকুমারকে একবার দেখিয়াই সে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পদৃষ্টি হইতে হিন্দুয়ানি প্রবল হইয়াছে। সেজন্য লুৎফ-উন্নিসা বিবাহিতা এবং স্বামী বর্তমান থাকিতে অন্য পুরুষের প্রতি অনুরাগ দূষ্য বলিয়াই কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, অবস্থা বিপর্যয়ে ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন হিন্দু সংস্কারের প্রাধান্যের জন্য সে যে স্বামী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহার প্রতিই প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

নবকুমারের প্রতি লুৎফ-উন্নিসার প্রণয় বাড়িতেছিল। নবকুমারের প্রতি সে যত আকর্ষণ বোধ করিল তত আগ্রার সিংহাসনের প্রতি বিরাগ দেখা দিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, প্রণয়ের এই বেগ স্বতোৎসারিত। তাহা কোন বাধা বন্ধন মানে না। এইরূপে নবকুমারের প্রতি লুৎফ-উন্নিসার প্রণয়াবেগকে তীব্রতর করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লুৎফ-উন্নিসার সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তনকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিলেন।

লুৎফ-উন্নিসার নবকুমারের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে তীব্রতর হওয়ায় সে তাহার প্রতিযোগিনী মেহের-উন্নিসার প্রতিও আর বিরূপ নহে। এমনকি আগ্রায় তাহার সম্পদ রক্ষারও সে কোন চেষ্টা করিল না। বাদশাহের নিকট চিরবিদায় লইয়া সপ্তগ্রামে চলিয়া আসিল।

সপ্তগ্রামের রাজপথের কাছাকাছি নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় লুৎফ-উন্নিসা নিজের বাসস্থান ঠিক করিল। তাহার ঐশ্বর্যের অভাব নাই। সেজন্য দাসদাসী এবং নানা দামী দামী আসবাবে অট্টালিকা দর্শনযোগ্য করিয়া সাজাইয়া তুলিল। এই অট্টালিকায় নবকুমারের সহিত লুৎফ-উন্নিসার সাক্ষাৎ হইল। লুৎফ-উন্নিসা নবকুমারকে ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য—পৃথিবীতে যাহাকে সুখ বলে সকল কিছুর লোভ দেখাইল। সে তাহার কোন প্রতিদান চাহে না, এমন কি নবকুমারের পত্নীত্বের গৌরবও তাহার কাম্য নহে, সে কেবল তাহার দাসী হইতে চাহে। নবকুমার স্বীকৃত হইল

না। সে কোন যবনীর উপপতি হইতে চাহে না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াই থাকিতে চাহে। অবশ্য তখন নবকুমার জানিতে পারে নাই যে লুৎফ-উন্নিসা তাহারই বিবাহিতা প্রথমা স্ত্রী। সেজন্য তাহাকে যবনী এবং পরস্ত্রী জ্ঞান করিয়া তাহার সহিত একান্তে আলাপ করাও তাহার নিকট দূষ্য মনে হইল। সে বলিল, সে আর কখনো লুৎফ-উন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। এমন কি যখন সে শুনিল লুৎফ-উন্নিসা তাহার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তখনও তাহার মন নরম হইল না। সে তাহাকে আগ্রায় ফিরিয়া যাইতে বলিল। লুৎফ-উন্নিসার সমস্ত সংযমের বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সদর্পে সে বলিল, এ জন্মে সে নবকুমারের আশা ছাড়িবে না। দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায় তেমনি লুৎফ-উন্নিসা মাথা তুলিয়া বলিল, 'এ জন্মে না, তুমি আমারই হইবে।' নবকুমার সেই মূর্তি দেখিয়া ভীত হইল। তাহার আর এক তেজোময়ী মূর্তি মনে পড়িল। একদিন নবকুমার তাহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহার দ্বাদশ বর্ষীয়া স্ত্রী এরূপ সদর্পে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংশয়ে সঙ্কুচিত ভাবে নবকুমার তাহার পরিচয় জানিতে চাহিল। লুৎফ-উন্নিসা চক্ষু আরও বিস্ফারিত করিয়া বলিল, সে পদ্মাবতী। এই কথা বলিয়াই সে শান্তভাবে চলিয়া গেল। নবকুমারও কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া আপন মনে গৃহে ফিরিল।

আগ্রায় সিংহাসনের পার্শ্বে যাহার স্থান সেই লুৎফ-উন্নিসা নিছক প্রণয়াবেগের যাতনায় সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া নবকুমারের পা ধরিয়া তাহার গৃহে দাসী হইয়া থাকিতে চাহিল। এই পরিচ্ছেদে আছে তাহারই বিশদ বর্ণনা। সেজন্য এই পরিচ্ছেদের নাম—'চরণতলে';

কায় মনঃ প্রাণ দাসীর আলয়ে ঃ যৎকালে শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা লক্ষ্মণের মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লেখে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্যের পঞ্চম সর্গের অন্তর্গত 'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা' পত্রিকা হইতে এই উক্তিটি গৃহীত হইয়াছে। এখানে লক্ষ্মণের নিকট সূর্পণখা নিঃসঙ্কোচ প্রেম নিবেদন করিয়াছে। বনবাসের কঠোর জীবন-যাপনে লক্ষ্মণের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া সে তাঁহাকে নিজ আলয়ে আসিয়া রাজভোগ গ্রহণ করিতে বলিয়াছে।

লুৎফ-উন্নিসাও নবকুমারের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহাকে অকুণ্ঠ প্রেম নিবেদন করিয়াছে। তবে সে নবকুমারকে নিজ আলয়ে আহ্বান করে নাই।

নবকুমারের গৃহে দাসী হইয়া থাকিতে চাহিয়াছে। সূর্পণখা লক্ষ্মণকে 'প্রেম কুতূহলে' 'যৌবন ধন' দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু লুৎফ-উন্নিসার প্রেম নিবেদনের মধ্যে কোন প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা নাই।

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুরিত হয়ঃ লুৎফ-উন্নিসার সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হইল। তখনই নবকুমারের প্রতি তাহার প্রণয় তাহার অজানিতে অঙ্কুর হইয়া রহিল। ধীরে ধীরে অঙ্কুর যেমন করিয়া অনন্যপাদপে পরিণতি লাভ করে তেমনি নবকুমারের প্রতি লুৎফ-উন্নিসার প্রেমও দুর্নিবার হইয়া উঠিল। লুৎফ-উন্নিসা আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবকুমারের দাসী হইবার জন্য পা ধরিয়া সাধাসাধি করিল।

কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসীঃ রোমান্টিকতার চূড়ান্ত। স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশাহ যাহার প্রেমের জন্য ব্যাকুল সেই দিল্লীশ্বরী সপ্তগ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট সকাতর প্রেম নিবেদন করিতেছে। যিনি বাদশাহের অঙ্কশায়িনী তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র দাসী হইতে চাহেন।

যবনীজারঃ লুৎফ-উন্নিসা যে পদ্মাবতী নবকুমার তাহা জানিত না। সেজন্য সে বলিল, সে কোন মুসলমানীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।

বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায়ঃ প্রচণ্ড ঝড়ে যেমন বৃহৎ বৃক্ষও উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া যায় তেমনি প্রচণ্ড প্রেমাবেগে লুৎফ-উন্নিসাও নবকুমারের পদতলে পতিত হইল।

স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী......তুলিয়া দাঁড়াইলেনঃ লুৎফ-উন্নিসা চরিত্রগত আত্মগর্বিতা এবং তেজস্বিনী। কিন্তু প্রবল প্রেমাবেগে তাহার সেই তেজ দূরীভূত হইয়াছিল। নবকুমারের পা ধরিয়া সে তাহার গৃহে দাসীরূপে থাকিতে চাহিল। যে প্রেমের জন্য সে আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে সেই প্রেমের প্রত্যাখ্যানে দলিতফণা সর্পিণীর মতই লুৎফ-উন্নিসা আবার রুখিয়া দাঁড়াইল। তাহার সেই তেজ এবং গর্ব ফিরিয়া আসিল। অপমানের জ্বালায় সে দগ্ধ হইতেছিল। তাহার চোখে মুখে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িল। সেই আগুনে কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ হইবে। নবকুমারের পারিবারিক শান্তি নষ্ট হইবে। সুন্দরী নারীর একান্ত প্রেম নিবেদনে, তোষামোদে যাহার হৃদয় গলে নাই, তাহার প্রতিবাদী ভঙ্গীতে নবকুমারের চিত্তও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নবকুমার ভয় পাইল।

আমি পদ্মাবতী ঃ চমৎকার নাটকীয়তার মধ্যে এই পরিচ্ছেদের সমাপ্তি হইয়াছে। নবকুমার এতক্ষণ লুৎফ-উন্নিসাকে একজন মুসলমান রমণী জ্ঞান করিয়া তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু তাহার কুপিত ফণিনী, তেজোময়ী মূর্তি দেখিয়া তাহার ভয় হইল। তাহার প্রথমা স্ত্রীকে মনে পড়িল। একদিন তাহার এই মূর্তি সে দেখিয়াছিল। যখন সে এরূপ চিন্তা করিতেছিল তখনই লুৎফ-উন্নিসা তাহাকে পদ্মাবতী বলিয়া পরিচয় দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। নবকুমারও শঙ্কিত চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিল।

।। সপ্তম পরিচ্ছেদ ।।

নবকুমারের নিকট নিজের পরিচয় দিয়া লুৎফ-উন্নিসা এক ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। দুদিন সে সেই ঘর হইতে বাহির হইল না। তাহার মধ্যে নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। দুইদিন পরে নিজের বেশভূষা পরিবর্তন করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইল। সে পুরুষের ন্যায় পোশাক পরিল। পেষমনের নিকট তাহার উদ্দেশ্য বলিল, সে আপাতত: কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ ঘটাইতে চায়। তাহার বিশ্বাস, পরে নবকুমার তাহার হইবে। পেষমন তাহাকে এই দুঃসাহসিক কার্যে যাইবার পূর্বে ভয় দেখাইল। কিন্তু লুৎফ-উন্নিসার যেমন তেজ তেমনই সাহস। সে একাকী রাত্রে নিবিড় বনে বাহির হইয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে সে নবকুমারের বাড়ীর কাছে যে বনআছে তাহার প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া তাহার দুঃসাহসিক কার্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল। অভাবিতভাবে তাহার এক সাহায্যও জুটিয়া গেল। লুৎফ-উন্নিসা মনুষ্য কণ্ঠের শব্দ শুনিতে পাইল। বনমধ্যে হঠাৎ এক আলো দেখিতে পাইল। গিয়া দেখিল তাহা হোমের আলো। এক কাপালিক বসিয়া সেখানে মন্ত্রপাঠ করিতেছিল এবং সে মন্ত্রমধ্যে কেবলই কপালকুণ্ডলার নাম করিতেছিল। নাম শুনিয়া লুৎফ-উন্নিসা আশ্বস্ত হইল এবং হোমকারীর নিকটে গিয়া বসিল।

পরিচ্ছেদের শেষের দিকে হোমকারী এবং মন্ত্রের মধ্যে কি নাম সে উচ্চারণ করিতেছিল তাহা প্রকাশ না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকচিত্তে কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অন্যতম শিল্প-কৌশল।

[সেক্সপীয়রের বহু নাটকে—'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'টু-জেন্টলমেন অব ভেরোনা', 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'টুয়েলফথ্ নাইট', প্রভৃতি গ্রন্থে পুরুষবেশী

রানীর দেখা পাওয়া যায়। মতিবিবির এই ছদ্মবেশ ধারণের উপর সেক্সপীয়রের প্রভাব লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, কপালকুণ্ডলা গ্রন্থ রচনার সময় তিনি খুব বেশী সেক্সপীয়র পড়িতেন।

সপ্তগ্রামের উপনগর প্রান্তে নিবিড় বনে লুৎফ-উন্নিসা এবং কাপালিকের গূঢ় উদ্দেশ্যে আগমন সংবাদ ঘোষণা করিয়াই তিনি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিলেন। ঘটনার সংঘটন স্থানের নামানুসারেই তিনি এই পরিচ্ছেদের নাম রাখিলেন—'উপনগর প্রান্তে'।

—**"I am settled, and bend....terrible feat"** : এই উদ্ধৃতিটি Macbeth নাটকের প্রথম অঙ্ক সপ্তম দৃশ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। সেনাপতি Macbeth Scotland-এর রাজা হইবার স্বপ্ন দেখিতেছে, সুযোগও আসিয়াছে। রাজা Duncan একরাত্রে তাঁহার অতিথি। Lady Macbeth তাঁহার স্বামীকে উৎসাহিত করিতেছেন Duncan-কে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করিবার জন্য। Macbeth দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াকুল; কিন্তু Lady Macbeth-এর দৃঢ়তার সম্মুখে তাঁহার দ্বিধা দূর হইয়া গিয়াছে। হত্যার সংকল্পে তিনি দৃঢ়। বলিতেছেন, তাঁহার আর কোন সংশয়, কোনও দুর্বলতা নাই। শরীরের সমস্ত প্রত্যঙ্গ ও শক্তিকে এই সাংঘাতিক কার্যের জন্য তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ উক্তিটি হইল :

I am settled, and bend up
Each Corporal agent to this terrible feat.
Away and mock the time with fairest show :
False face must hide that the
false heart must know.

নবকুমারকে ফিরিয়া পাইবার জন্য পদ্মাবতী (বর্তমানে লুৎফ-উন্নিসা) সন্ধ্যাকালে সপ্তগ্রামের উপনগর প্রান্তে নবকুমারের বাটীর অনতিদূরে নিবিড বন অভিমুখে সম্পূর্ণ পুরুষ বেশে যাত্রা করিতেছে। উদ্দেশ্য "আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ।" লুৎফ-উন্নিসা দুইদিন কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার কর্তব্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। লুৎফ-উন্নিসার সঙ্কল্পের দৃঢ়তার সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে উক্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন।

দুইদিনে তিনি নিজ কর্তব্যাকর্তব্য স্থিরকরিলেন : দ্বাদশবর্ষীয়া পদ্মাবতীর স্বামীর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার কথা জানাইয়া পরে বঙ্কিমচন্দ্র

লুৎফ-উন্নিসার পরিচয় দিলেন—ইনিই সেই পদ্মাবতী। এই পরিচয় দিয়াই লুৎফ-উন্নিসা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। পাঠক বুঝিল এইবারও পদ্মাবতী রুখিয়া দাঁড়াইবে। সহজে সে নবকুমারের প্রত্যাখ্যান মানিয়া লইবে না। সেজন্য লুৎফ-উন্নিসা দুইদিন ধরিয়া নিজের ভবিষ্যৎ কর্তব্য এবং কার্যপন্থা স্থির করিয়া লইল। সে পুরুষের ছদ্মবেশে এক দুঃসাহসিক কার্যে লিপ্ত হইবে। তাহার উদ্দেশ্য হইল আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের চির-বিচ্ছেদ। তারপর নবকুমার তাহার হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কর্তব্য এবং দুঃসাহসিক কার্যের সম্বন্ধে এই আভাসের বেশী কিছু বলেন নাই। পাঠক বাকীটুকু অনুমান করিয়া লইবে। লুৎফ-উন্নিসার কর্তব্য এবং কার্য যাহাই হউক না কেন কপালকুণ্ডলার পক্ষে যে তাহা অমঙ্গলকর হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাকে ঘিরিয়া ভবিষ্যতে এক চক্রান্ত জালের সৃষ্টি হইবে। পরিচ্ছেদ-শেষে হোমকারীর উল্লেখ করিয়া তাহাকেই দৃঢ়মূল করিলেন। কাপালিক কপালকুণ্ডলার নাম উচ্চারণ করিয়া হোম করিতেছিল। কপালকুণ্ডলার অনিষ্টসাধনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প লুৎফ-উন্নিসা সেই নাম শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

এই পরিচ্ছেদের সঙ্গেই তৃতীয় খণ্ডের শেষ। কাহিনী এখানে চরম সন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়াছে। এই খণ্ডে আমরা মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসার স্পষ্ট চরিত্র পাইয়াছি। নিজ বুদ্ধি এবং কৌশলে তাহার পক্ষে অসম্ভব এমন কোন কার্য নাই। সে নিজ রূপ এবং গুণে স্বয়ং বাদশাহকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছে। এহেন একটি আগ্রাখ্যাত মহিলা কপালকুণ্ডলার প্রতিযোগিনী। সে নবকুমারের জীবন হইতে তাহাকে সরাইয়া ফেলিয়া নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। বিশেষতঃ নবকুমারের প্রত্যাখ্যান তাহাকে 'মরিয়া' করিয়া তুলিয়াছে। অপর দিকে কপালকুণ্ডলার আবাল্য প্রতিপালক কাপালিক প্রতিশোধ স্পৃহায় সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ধাওয়া করিয়াছে। সে তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া হোম করিতেছে। কাপালিকের শক্তিও দুর্জয়। দুই প্রধান শক্তি তাহারই অজানিতে তাহার সর্বনাশ সাধনের জন্য নিবিড় বনে আত্মগোপন করিয়া আছে। অতএব কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ যে অশুভজনক তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। তবে তাহা কিরূপে সাধিত হইবে তাহা এখনো অজানা। এই খণ্ডে কপালকুণ্ডলার উল্লেখ কোথাও নাই। অথচ তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া একটি ষড়যন্ত্রের জাল সৃষ্টি হইয়াছে। কপালকুণ্ডলার কাহিনীর এই নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই খণ্ডের যবনিকা টানিয়াছেন।

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ যে অমঙ্গলময় তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এই খণ্ডে নয়টি পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার জীবনের সেই অশুভ চক্রান্ত -বর্ণনা করিয়া তাহার অন্তিম পরিণতি দেখানো হইয়াছে। তাহার কাহিনীর পরিণতি কিরূপে হয় এখন কেবল তাহাই দেখিবার বিষয়। তৃতীয় খণ্ডে লুৎফ-উন্নিসার সঙ্গে কাপালিকের সাক্ষাতের যে আভাস দিয়া শেষ হইয়াছে এই খণ্ডে তাহাই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে এই দুই কুচক্রীর কূটবুদ্ধি অন্যদিকে কপালকুণ্ডলার সামাজিক জ্ঞানের অভাব এই দুইয়ে মিলিয়া কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবনে ফাটল ধরিল। কাপালিক কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া নবকুমারের মনে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিল। সমাজ-জীবনের জটিলতায় কপালকুণ্ডলার মনে বিতৃষ্ণা দেখা দিল। লুৎফ-উন্নিসার কাতর অনুরোধে কপালকুণ্ডলা নব-কুমারকে চিরতরে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল। কাহিনীর এই এক জটিল মুহূর্তে বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলাকে গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বিলীন করিয়া দিলেন। প্রকৃতির কোলে পালিতা কপালকুণ্ডলার প্রকৃতির কোলেই সলিল-সমাধি হইল।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী। সংসারে আসিয়া তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বেশভূষায় এখন সে গৃহিণী। নানা অঙ্গে তাহার নানা আভরণ। শ্যামাসুন্দরী এবং কপালকুণ্ডলা বসিয়া এক গুরুতর বিষয়আলোচনা করিতেছিল। উভয়েই চিন্তান্বিত। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করিবার জন্য এক বনজ ঔষধের দরকার। ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে কোন এয়ো স্ত্রীর তাহা তুলিতে হয়। পরদিনই তাহার স্বামী চলিয়া যাইবে। অতএব এই রাত্রেই সেই ঔষধ তুলিয়া আনিতে হইবে। গত রাত্রে তাহারা বাহির হইয়াছে বলিয়া বাড়ীতে অনেক গালমন্দ খাইয়াছে। অতএব আজ আর শ্যামাসুন্দরীর যাইবার সাহস নাই। পরোপকার করা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে বলিল, রাত্রে বেড়ান তাহার অভ্যাস আছে। আজ রাত্রে সে একাই বনে গিয়া সেই ঔষধ তুলিয়া আনিবে। শ্যামাসুন্দরী তাহাতে আপত্তি করিল। লোকে জানিতে পারিলে কপালকুণ্ডলাকে মন্দ বলিবে, নবকুমার মনে

কষ্ট পাইবে। কপালকুণ্ডলা বুঝিল স্ত্রীলোকের বিবাহের অর্থ দাসীত্ব। সে বুঝিতে পারে না রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কেন কুচরিত্রা হইবে। সে এমন জানিলে বিবাহ করিত না।

নবকুমার রাত্রে কপালকুণ্ডলাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া নিষেধ করিল। কপালকুণ্ডলা অপ্রসন্ন হইল। পরের উপকারে বিঘ্ন করিতে নবকুমারকে নিষেধ করিল। গর্বিতবচনে তাহাকে বলিল, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নবকুমার গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

যে নিবিড় বনে লুৎফ-উন্নিসা এবং কাপালিক কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ সাধন করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে গভীর রাত্রে একাকিনী কপালকুণ্ডলা সেই বনে প্রবেশ করিয়া সহজেই তাহাদের খপ্পরে পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুকৌশলে বাস্তবানুগ কারণ বিশ্লেষণ করিয়া কপালকুণ্ডলার এই গভীর রাতে বনপ্রবেশ সাধিত করিয়াছেন। ইহাতে রোমান্টিকতার পরাকাষ্ঠা থাকিলেও কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে অসংগত হয় নাই। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব।

রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি ঃ মাইকেল মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের 'সারিকা' নামক কবিতা হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরাধিকা ব্রজ কারাগারে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতই অস্থির চঞ্চল। রাধাবিনোদন শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। রাধিকা এখানে সখীকে অনুরোধ করিতেছেন, পাখীটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। সে যেন বনস্থলীতে গিয়া শুক পাখীর সঙ্গে মিলিত হইয়া নিজের হৃদয় জুড়াইতে পারে। তেমনি রাধিকার প্রেমদাহ নির্বাপিত করিবার জন্য তাহারও সমাজশৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলা হউক।

কপালকুণ্ডলা আরণ্যক। আবাল্য অরণ্যে প্রতিপালিতা। সমাজের কুটিল বন্ধনে সে এক বৎসরের উপর আবদ্ধ হইয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রকৃতি-পালিতা কপালকুণ্ডলাকে সামাজিক করিতে চাহেন নাই। প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনেই তাহার স্বাভাবিক বিকাশ। সেজন্য তাহারও রাধিকার মতই মিনতি, কপালকুণ্ডলাকে যেন সমাজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া না রাখা হয়।

প্রায় একবৎসর গত হইয়াছিল ঃ বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দরভাবে এখানে সময়ের হিসাব পেশ করিলেন। তখন দ্রুতগতি যানবাহন ছিল না। পায়ে হাঁটিয়া এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতে হইত। সেজন্য লুৎফ-উন্নিসার আগ্রায় গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রামে আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

লিখিয়াছেন, "সময়ের গতি এই উপন্যাসে অতি সুকৌশলে সূচিত হইয়াছে। সময়ের গতি দুই ভাবে দেখান যাইতে পারে। এক, বাহিরের কোন যন্ত্রের সাহায্যে—যেমন ঘড়ির কাঁটার আবর্তন অথবা অনুরূপ কোন ব্যাপারের দ্বারা। আর একটি উপায় হইতেছে চরিত্রের পরিবর্তনের সাহায্যে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে 'পক্ষ', 'একদিবস' 'দুইদিবস', 'অপরাহ্ণ', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি শব্দের ছড়াছড়ি তবু কালের গতি স্পষ্ট হয় নাই। 'কপালকুণ্ডলা'য় শব্দের বাহুল্য নাই। অথচ সময়ের পরিবর্তন সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই এবং যে দুইটি উপায়ের কথা উল্লিখিত হইল সেই দুইটিই অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে দেখি মতিবিবি উড়িষ্যা হইতে আগ্রা যাত্রা করিয়াছেন; গ্রন্থের শেষে দেখি মতিবিবি আগ্রার বাস উঠাইয়া বঙ্গদেশে সপ্তগ্রামে উপনীত হইয়া তাঁহার কার্যে ব্যাপৃত আছেন। সেই আমলে আগ্রা হইতে উড়িষ্যায় আসিতে তিন চার মাস লাগিত। তাঁহার যাতায়াতে ছয় আট মাস লাগিয়া থাকিবে। তাহার পর তাঁহার বাদশাহের নিকট বিদায় লইতে, আগ্রার বাস উঠাইতে, সপ্তগ্রামে আসিয়া বাসস্থান ঠিক করিয়া নবকুমারের সঙ্গে দুই একবার সাক্ষাৎ করিতে কয়েক মাস লাগিয়াছে। সর্বসমেত প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকিবে। আর একদিক হইতেও এই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থের যখন আরম্ভ তখন সেলিম সদ্য বাদ্শাহ হইয়াছেন; এমন কি যিনি পরে বাদশাহেরও বাদশাহ হইয়াছিলেন তিনিও এই সংবাদ পান নাই। মতি যখন আগ্রা ত্যাগ করেন তখনও জাহাঙ্গীর বাদ্শাহ মেহের-উন্নিসাকে সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হ'ন নাই, কিন্তু তাঁহার কৌতূহলে ভবিষ্যতের কার্যকলাপ সূচিত হইয়াছে। ইতিহাসের এই আভাস খুব স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নহে, কিন্তু ইহাও অন্যান্য প্রমাণকে সমর্থিত করে।"

যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না: মধ্যযুগে পুরুষ-প্রধান সমাজে নারীর স্থান বিশেষ উচ্চে ছিল না। তাহাকে পুরুষের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। সেজন্য সর্বদা তাহাকে সতর্ক থাকিতে হয়। যাহাতে তাহার চরিত্রে কোন কলঙ্ক না লাগে, যাহাতে কেহ মন্দ না বলিতে পারে, পুরুষের মন যাহাতে বিগড়াইয়া না যায় এমনভাবে চলিতে হয়। কপালকুণ্ডলা ভাগ্য তাড়িতা হইয়া ঘটনাবিপর্যয়ে কাপালিকের হাতে আরণ্যক পরিবেশে বড় হইয়াছিল। সেখানে কপালকুণ্ডলার কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু নবকুমারকে বাঁচাইতে গিয়া সে কাপালিকের কোপে পড়িল। অগত্যা অধিকারীর পরামর্শে নবকুমারকে বিবাহ করিয়া সপ্তগ্রামে আসিয়াছিল। বিবাহ সম্বন্ধে সে কিছুই জানিত না।

এখন দেখিতেছে প্রতি পদে পদে নানা সামাজিক নিষেধ। চতুর্দিকে এই নিষেধের শৃঙ্খল তাহাকে যেন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহা তাহার নিকট অসহ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

আমি অবিশ্বাসিনী কিনা, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও : কপালকুণ্ডলার সাংসারিক জীবন এক বছরের। ইহার মধ্যে সে 'কুচরিত্রা', 'অবিশ্বাসিনী' প্রভৃতি কথার অর্থ জানিয়া ফেলিয়াছে। পরের উপকার করা তাহার ধর্ম। এই ধর্ম পালন করিতে গিয়াই সে নবকুমারের গৃহে আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখন এই পরোপকারেও তাহার স্বাধীনতা নাই। পদে পদে বাধা পাইয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। নবকুমারের সঙ্গে তাহার আলাপ পাঠকের নিকট এই প্রথম প্রকাশ্যে হইল। নবকুমারের সন্দিগ্ধতায় কপালকুণ্ডলা মোটেই খুশী নহে। এই উক্তির মধ্যে তাহার যেন প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। এই প্রতিবাদ কেবলমাত্র নবকুমারের বিরুদ্ধে নহে, সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর স্বাধিকারের প্রশ্ন চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কপালকুণ্ডলার উক্তির মধ্যে তাহারই সূচনা আমরা দেখিতে পাই।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

কপালকুণ্ডলা একাকিনী সঙ্কীর্ণ বনপথে ঔষধির সন্ধানে চলিল। নিঃশব্দ রাত্রির প্রগাঢ় সৌন্দর্য দেখিয়া তাহার মনে পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইল। তাহার ভাবান্তর দেখা গেল। অন্যমনে যাইতে যাইতে সে নিবিড়তর বনে উপস্থিত হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সেই নিবিড় বনের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। কপালকুণ্ডলা নির্ভয়ে আলোর নিকটবর্তী হইয়া দেখিল সেখানে কেহ নাই। কিন্তু তাহার কাছেই একটি ভাঙ্গা ঘরে মানুষের কথা শুনা যাইতেছিল। কপালকুণ্ডলা নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘরের কাছে গেল। তাহার মনে হইল সেখানে দুইটি মনুষ্য কথাবার্তা বলিতেছে। প্রথমে সে তাহাদের কথাবার্তা কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরে চেষ্টা করিয়া শুনিল একজন কাহার মৃত্যু কামনা করিতেছে, অপরজন তাহার যাবজ্জীবন নির্বাসন চাহিতেছে। কপালকুণ্ডলার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল। সে ঘরটির আরো কাছাকাছি যাইয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিবার চেষ্টা করিল। আগ্রহে এবং আশঙ্কায় তাহার ঘনঘন গুরুশ্বাস পড়িতেছিল। সেজন্য মনুষ্য-শ্বাস শুনিতে

পাইয়া ঘর হইতে একজন বাহিরে আসিয়াই কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইল, উভয়ে উভয়ের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তারপর ব্রাহ্মণবেশী পুরুষটি কপালকুণ্ডলাকে এত রাত্রে নিবিড় বনে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কপালকুণ্ডলাও তাহাকে তাহাদের পরামর্শের বিবরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণবেশী কিছুক্ষণ চিন্তায় থাকিয়া কপালকুণ্ডলার হাত ধরিয়া কিছুদূরে লইয়া গিয়া কহিল, সে পুরুষ নহে, পুরুষবেশী। তাহারা কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধেই কু-পরামর্শ করিতেছিল। কপালকুণ্ডলার আগ্রহ অনেক বাড়িল। সে তাহাদের পরামর্শ সম্বন্ধে শুনিতে চাহিল। তখন ছদ্মবেশিনী তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সেই ভাঙা ঘরে চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা বসিয়া-বসিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। পরে ব্রাহ্মণবেশীর প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

আকাশে তখন কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিল। বনে যে সামান্য আলো ছিল তাহাও দূর হইল। শীঘ্রপদে সে বন হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল। হঠাৎ সে তাহার পিছনে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইল। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। আবার কিছুক্ষণ পরে কপালকুণ্ডলা স্পষ্ট মনুষ্য গতিশব্দ শুনিতে পাইল। ইতিমধ্যে আকাশে প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িয়া গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিয়া বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইল প্রাঙ্গণ-ভূমিতে সেই সাগরপ্রবাসী কাপালিক দাঁড়াইয়া আছে।

এই পরিচ্ছেদের ঘটনাস্থল বনস্থলে। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র ইহার নাম দিয়াছেন—'কাননতলে।'

"Tender is the night···here there is no light" : উল্লিখিত পংক্তি কয়টি John Keats-এর 'Ode to a Nightingale' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। জীবন যন্ত্রণায় জর্জরিত কবি কল্পনার সাহায্যে এই দুঃখময় জগৎ হইতে পলায়ন করিয়াছেন nightingale-এর কুঞ্জে, যেখানে যৌবন অকালে ঝরিয়া পড়ে না, প্রেম যেখানে ক্ষণস্থায়ী নয়। কবি কল্পনার নেত্রে দেখিতেছেন, আকাশে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। রোমান পুরাণের চিরকুমারী চন্দ্রমাদেবী তাঁহার সখী পরীদলের অর্থাৎ নক্ষত্রদের সহিত আকাশ পরিক্রমা করিতেছেন। কিন্তু কুঞ্জবনে আলো নাই। চাঁদের কিরণ সেখানে প্রবেশ করিতেছে না। সেখানে শুধু অন্ধকার।

ঔষধির সন্ধানে কপালকুণ্ডলা বনে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন আকাশে

চাঁদের শুভ্র আলো কিন্তু নিম্নে বনতলে অন্ধকার। মুহূর্ত পূর্বের কপালকুণ্ডলার সুখাবেশ মুহূর্ত পরে শঙ্কায় পরিণত হইয়াছে। এই সাদৃশ্যের মধ্যেই রহিয়াছে উদ্ধৃতির সার্থকতা।

শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি : সাদা মেঘখণ্ডগুলি। **কপালকুণ্ডলা পূর্বস্মৃতি সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন :** জ্যোৎস্নালোকিত সেই নিবিড় বনে একাকিনী যাইতে যাইতে কপালকুণ্ডলার পূর্বস্মৃতি মনে পড়িয়াছিল। সমুদ্রতীরের সেই বিগত স্মৃতি তাহাকে উদাস এবং আনমনা ক'রয়া তুলিল। অন্যমনে যাইতে যাইতে সে শ্যামাসুন্দরীর জন্য ঔষধ আনিবার কথা ভুলিয়া গেল। ভুল পথে গিয়া নিবিড়তর বনে সে উপস্থিত হইল। নিয়তি যেন তাহাকে তাহার উদ্দেশ্য ভুলাইয়া তাহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইতেছিল তাহার কুহকে নিয়া ফেলিল।

পথের অলক্ষ্যতায় প্রথমে কপালকুণ্ডলা চিন্তামগ্নতা হইতে উত্থিত হইলেন : আনমনে চলিতে চলিতে কপালকুণ্ডলা পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘন গাছের ছায়ার অন্ধকারে পথ আর দেখা যায় না। পথ হারাইয়া কপালকুণ্ডলার অন্যমনস্কতা দূর হইল। চারিদিক তাকাইয়া সে নিবিড় বনের মধ্যে একটি আলো দেখিতে পাইল। এই আলো তাহাকে পতঙ্গের মত আকর্ষণ করিল। এই আলো জীবন্মুক্তির নহে, রহস্যময়ী নারীর কাহিনী বর্ণনায় একটি রহস্যের ইঙ্গিত। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে এই আলো অনেকবার দেখা দিয়াছে। প্রতিবারেই ইহা নূতন নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল : জ্যোৎস্নালোকে কপালকুণ্ডলা বনে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিল। জ্যোৎস্না অন্তর্হিত হইল, কালোমেঘে আকাশ হঠাৎ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বজ্রবিদ্যুৎ ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় দেখা দিল। সেই ভীষণ ঝড়ে কপালকুণ্ডলা দৌড়াইয়া গৃহে ফিরিল। কপালকুণ্ডলার এক বৎসরের সাংসারিক জীবনে মতিবিবি এবং কাপালিকের চক্রান্তে হঠাৎ প্রবল ঝড় দেখা দিবে এবং সেই ঝড়ে কপালকুণ্ডলার জীবন বিপর্যস্ত হইবে। প্রাকৃতিক এই ঝড় যেন কপালকুণ্ডলার জীবনের ঝড়েরই দ্যোতক। বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর ভাবে এই ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া কাহিনীকে ব্যঞ্জনাময় করিয়া তুলিয়াছেন।

সে সাগরতীর প্রবাসী সেই কাপালিক : বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর নাটকীয় ভাবে কাপালিকের পরিচয় প্রকাশ করিলেন। ঝড়ের পূর্বে এবং

ঝড়ের মধ্যে এই কাপালিকই কপালকুণ্ডলাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার গৃহে পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাহার নাম বা পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। কপালকুণ্ডলা গৃহে পৌঁছাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে যাইয়া বিদ্যুতালোকে তাহার পূর্বপরিচিত কাপালিককে দেখিতে পাইল। কাপালিকের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার যখন সম্পর্ক ছিন্ন হইল তখন কপালকুণ্ডলা সংসারী। আবার যখন কাপালিক হাজির হইল তখনই বুঝি কপালকুণ্ডলার সংসার জীবনের ইতি ঘনাইয়া আসিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ঘটনা সংঘটন এবং প্রকাশ ভঙ্গী অতি চমৎকার।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু সহজে ঘুম আসিল না। তাহার হৃদয়ে তীব্র আলোড়ন হইতেছিল। নবকুমারও হৃদয়-বেদনায় অন্তঃপুরে আসে নাই। সেজন্য কপালকুণ্ডলাকে একাকী শয়ন করিতে হইল। শয়ন করিয়া সে পূর্ববৃত্তান্তসকল আলোচনা করিতে লাগিল। নিবিড় বনের মধ্যে কাপালিকের পৈশাচিক কার্য হইতে শুরু করিয়া শ্যামাসুন্দরীর ঔষধি আনিতে গিয়া ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত সকলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। একটু তন্দ্রা আসিতেই কপালকুণ্ডলা এক স্বপ্ন দেখিল। সে যেন ঐ সাগরের মধ্যে নৌকায় চড়িয়া যাইতেছিল। নৌকাখানি সুসজ্জিত। মাঝিরা ফুলের মালা গলায় দিয়া নৌকা বাহিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা-বেলায় হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিল। ক্রমে সমুদ্রে ঝড় উঠিল। এমন সময়ে সেই ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া নৌকা ধরিল। কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?" কপালকুণ্ডলা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও বলিয়া উঠিল, "আমি আর এ ভার সহিতে পারি না। আমি পাতালে প্রবেশ করি।" নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

প্রভাতে কপালকুণ্ডলা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল গবাক্ষের উপর কতকগুলি সুন্দর লতা দুলিতেছে। সে তাহার মধ্য হইতে একটি পত্র পাইল। তাহাতে ব্রাহ্মণবেশী তাহাকে সন্ধ্যার পর তাহার নিজ সম্পর্কীয় কথা শুনিবার জন্য সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার কাহিনীর জন্য কেবলমাত্র বহির্ঘটনাই সংগঠিত করেননাই, অলৌকিক প্রভাবের দ্বারা কপালকুণ্ডলার অন্তর্দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করিয়া-ছেন। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সহিত যাত্রার প্রাক্কালে তাহার বিল্বপত্র দেবীর

প্রত্যাখ্যানের দ্বারা এক অশুভ ইঙ্গিত পাইয়াছে। তাহা তাহার সংসার জীবনে কণ্টকস্বরূপ হইয়া রহিল। এক্ষণে স্বপ্নের দ্বারা সেই অশুভ ইঙ্গিতকে আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ যে পাতালে গমন তাহা কপালকুণ্ডলা বুঝিতে পারিল। কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শনই এই পরিচ্ছেদের প্রধান বর্ণনার বিষয়, সেজন্য ইহার নাম রাখা হইয়াছে 'স্বপ্নে'।

"I had a dream which was not all a dream" : এই উক্তি কবি বায়রণের। 'Darkness' নামক কবিতার প্রথম পংক্তি। স্বপ্ন সব সময়েই বহির্ঘটনা হিসাবে আসে না। নায়কের মানসিকতার মধ্যেই তাহার জন্ম ও পরিপুষ্টি। বায়রণের নায়ক—অনেকাংশে কবিরই আত্মপ্রক্ষেপ। স্বপ্নের মধ্যে নিজের চরিত্র ও মানসিকতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া স্বপ্ন অলীক নয় ইহাই তাহার বক্তব্য। এই কবিতায় প্রলয়কালের এক ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সেখানে Ships sailorless lay rotting on the sea, And their masts fell down piecemeal."

গভীর রাত্রে ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতী ও কাপালিকের নিভৃত আলোচনা শুনিবার পর কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিয়াছিল। এই স্বপ্ন অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করিয়াছে। এই স্বপ্নকাহিনী অলীক নয়, বহির্ঘটনা হিসাবেও তাহা আসে নাই। কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে তাহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। কপালকুণ্ডলার আনন্দগান মুখরিত তরী এখানে ধ্বংস হইয়াছে। তাহা কপালকুণ্ডলার অন্ত্যদশাই আভাসিত করিয়াছে।

নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন : বঙ্কিম উপন্যাসে কাহিনীর বর্ণনায় 'স্বপ্ন দর্শন' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। তাহার অনেক উপন্যাসেই এই স্বপ্ন-দর্শন দেখা যায়। কপালকুণ্ডলার জীবনে এই স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন মাত্র নহে। ইহা তাহার জীবনের পরিণতির অভ্রান্ত ইঙ্গিত। অদূর ভবিষ্যতে তাহার জীবনে যাহা ঘটিবে ইহা তাহারই পূর্বাভাস।

কপালকুণ্ডলার বনে গমনের জন্য নবকুমার ক্ষুব্ধ হইয়া সেই রাত্রে অন্তঃপুরে শয়ন করিতে আসে নাই। সেজন্য কপালকুণ্ডলা একাকিনীই শয়ন করিল। কিন্তু তাহার চোখে ঘুম নাই। তাহার পূর্ববৃত্তান্ত মনে পড়িতে লাগিল। সেই পূর্বস্মৃতি ভাবিতে ভাবিতে তাহার অল্প তন্দ্রা আসিল। তখন কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিল— সে যেন নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছে। সেই নৌকা নানা ফুলে সজ্জিত। মাঝিরা আনন্দে রাধাকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমের গান করিতেছে।

পশ্চিমাকাশ হইতে অস্তগামী সূর্যের রক্তাভ আলোয় যেন সমুদ্র উৎফুল্ল। হঠাৎ সূর্য ডুবিয়া চারিদিক অন্ধকার হইল। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। ফুল সব খসিয়া পড়িল, গান বন্ধ হইল। আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। সমুদ্র ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল। এমন সময় জটাজূটধারী এক প্রকাণ্ডকায় পুরুষ নৌকা ডুবাইবার জন্য উদ্যত হইল। হঠাৎ সেই সুন্দর পরমরূপময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া নৌকা ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?" কপালকুণ্ডলা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "নিমগ্ন কর"। এ সময় নৌকাও যেন কথা বলিয়া উঠিল। সেও আর কপালকুণ্ডলার ভার বহন করিতে পারিতেছে না বলিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। কপালকুণ্ডলা জলমগ্ন হইল।

এখানে জটাজূটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ হইল কাপালিক, ভীমকান্ত শ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী হইল মতিবিবি আর নৌকা নবকুমার। এই স্বপ্নের মধ্যে কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমার উভয়েরই সলিল সমাধি আভাসিত হইয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবা: এই ব্রাহ্মণকুমার আসলে মতিবিবি। গতরাত্রে সে কপালকুণ্ডলার নিকট নিজেকে পুরুষ নহে বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। তথাপি এই চিঠিতে নিজেকে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া লিখিবার মধ্যে কোন অভিসন্ধি আছে। তাহা হইল— বঙ্কিমচন্দ্র এই চিঠির সাহায্যে কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে নবকুমারের মনে অবিশ্বাস দৃঢ়মূল করিতে চাহেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীর চিঠি পাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত হইবে কিনা তাহা লইয়া সারাদিন চিন্তা করিল। অবশ্য তাহার চিন্তা সাধারণ গৃহস্থ নারীর মত নহে। সাধারণ গৃহস্থ নারী অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাতের যেরূপ ঔচিত্য বিচার করে কপালকুণ্ডলা সেরূপ করিল না। তাহার নিকট উদ্দেশ্য খারাপ না হইলে এরূপ সাক্ষাতের মধ্যে কোন দোষ নাই। সে কেবল ভাবিতেছিল এই সাক্ষাতের ফল ভাল হইবে, না মন্দ হইবে। গত রাত্রে ব্রাহ্মণবেশী তাহাকে স্পষ্টই বলিয়াছিল কাপালিকের সঙ্গে তাহার যে নিভৃত আলোচনা তাহা কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধেই। তারপর সে নিজে কাপালিককে দেখিয়াছে। তাহা ছাড়া রাত্রেও সে এক খারাপ স্বপ্ন দেখিয়াছে। সব মিলিয়া কপালকুণ্ডলার

মনে হইল তাহার অমঙ্গল ঘনাইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশীকেও তাহার কাপালিকের সহচর বলিয়া মনে হইল। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তাহার পরিণাম আরও খারাপ হইতে পারে। কপালকুণ্ডলা মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতেছিল। কিন্তু স্বপ্নে সে দেখিয়াছে তাহার মহাবিপদের সময় এক ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছে। তাহার মনে হইল এই চিঠি যেন তাহারই দ্যোতক। সেজন্য সে ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিল।

সন্ধ্যার পর সে কিছু গৃহকর্ম শেষ করিয়া বনপথে যাত্রা করিল। যাইবার সময় সে শয়ন-গৃহের প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া গেল কিন্তু তাহার ঘর হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটি নিবিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার রহস্যময়তার দ্বারা কপালকুণ্ডলার অন্ধকার ভবিষ্যতের আভাস দিলেন।

ব্রাহ্মণবেশী তাহাকে কোথায় দেখা করিতে লিখিয়াছে সেই কথা কপালকুণ্ডলা ভুলিয়া গিয়াছিল। সেজন্য পথে বাহির হইয়াই সেই কথা মনে পড়িতে সে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সকালে যেখানে সে চিঠিটি রাখিয়াছিল সেখানে তাহা পাইল না। হঠাৎ মনে হইল চুল বাঁধিবার সময় সেই চিঠি সে খোঁপায় রাখিয়াছে কিন্তু হাত দিয়া সেখানেও পাইল না। চুলগুলি কেবল আলুথালু হইল। কোথাও চিঠি না পাইয়া গত রাত্রে যেখানে ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেখানেই কুমারীকালের মত অবিন্যস্ত কেশরাশি লইয়া সে পুনরায় বাহির হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন—'কৃত সঙ্কেতে'। কপালকুণ্ডলা সারাদিন চিন্তা করিয়াও শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে তাহার পত্রানুযায়ী সাক্ষাৎ করিতে গেল। কিন্তু যাওয়ার পরে তাহার চিঠি খুঁজিতে গিয়া নিজের চুল পর্যন্ত বিস্রস্ত করিয়া তুলিল। সেই আলুথালু চুলেই কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। পরবর্তীকালে নবকুমার ইহাদের কথা শুনিতে না পাইলেও একজনের চুল অপরের দেহে প্রসারিত হইয়াছে দেখিয়া তাহার মনে ধারণা হইবে কপালকুণ্ডলা অসতী। কপালকুণ্ডলার কাছে লেখা চিঠিও পড়িবে নবকুমারের হাতে। অতএব কপালকুণ্ডলা নিজেই নিজের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের সঙ্কেত সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণবেশীর নির্দেশ মত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল।

"—I will have grounds············than this": এই উক্তিটি Shakespeare-এর Hamlet নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। পিতৃহন্তা পিতৃব্যের সম্মুখে হত্যার বাস্তব অভিনয় অভিনীত

াঁপা হইতে চিঠিখানি পড়িয়া গিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাহা লক্ষ্য করে নাই ন্তু নবকুমার তাহা দেখিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা কোন কাজে বাহিরে গেলে বকুমার সেই চিঠিখানি লইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল ব্রাহ্মণবেশী বোধ হয় পালকুণ্ডলার উপপতি। পূর্ব রাত্রের কথা সে কিছুই জানিত না। সেজন্য সে ন্দেহের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। বিশেষত কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে াহার অবাধ্য হইয়াছিল। এভাবে নানা চিন্তা করিতে করিতে নবকুমারের নে সন্দেহ ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হইল।

নিজের দুঃখে নবকুমার কিছুক্ষণ কাঁদিল। তারপর ঠিক করিল সে আজও পালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবে না। বরং কপালকুণ্ডলা যখন বনে যাইবে তখন াহাকে অনুসরণ করিয়া নিজ চোখে তাহার পাপ প্রত্যক্ষ করিবে এবং পরে নজের জীবন বিসর্জন দিবে। তাহার নিকট জীবন দুর্বহ বলিয়া বোধ হইল।

রাত্রে কপালকুণ্ডলা বনপথে বাহির হইয়া যাইবার পর নবকুমারও তাহার নুসরণ করিতে গেল কিন্তু দ্বারপথেই কাপালিক তাহার পথ আটকাইয়া াড়াইল। নবকুমার তাহাকে দেখিয়া ভীত হইল না বরং কপালকুণ্ডলা তাহার হিতই সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। কাপালিক তাহা স্বীকার করিল এবং নবকুমারের সঙ্গে তাহার কিছু কথা আছে বলিল। বকুমার কাপালিককে অপেক্ষা করিতে বলিল কিন্তু কাপালিক শুনিল না। সে বকুমারকে বলিল এবার সে তাহার প্রাণ বলি দিবার জন্য আসে নাই। নব-ুমার যে পাপিষ্ঠা কপালকুণ্ডলার অনুসরণে যাইতেছে তাহা সে জানে। পালকুণ্ডলা কোথায় গিয়াছে তাহাও সে অবগত আছে। নবকুমার যাহা খিতে চায় সে তাহা তাহাকে দেখাইবার প্রতিশ্রুতি দিল। তখন নবকুমার র্ভয়ে কাপালিককে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাহাকে আসন দিয়া বসিতে লিল। তারপর কাপালিককে তাহার কথা বলিতে বলিল।

কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ বশে নবকুমার যখন তাহার অনুসরণ করিতে ইবে তখন গৃহদ্বারেই কাপালিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কপালিকের থায় কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল। গৃহদ্বারে কাপালিকের হিত সাক্ষাৎ একটি প্রধান ঘটনা, সেজন্য এই পরিচ্ছেদের নাম রাখা ইয়াছে—'গৃহদ্বারে'।

"Stand you……in a patient list": সেক্সপীয়রের Othello টকে খল নায়ক ইয়াগো এই উক্তি করিয়াছে। ভেনিসের অপূর্ব সুন্দরী

Desdemona কৃষ্ণকায় Othello-র কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। ঈর্ষা-পরায়ণ ইয়াগো তাঁহাদের সুখের সংসারে আগুন জ্বালাইতে চাহে। সে অত্যন্ত চাতুরীর সহিত Othello-কে বলিল, Othello-র অধীনস্থ কর্মচারী Cassio Desdemona-র প্রেমাসক্ত। কৌশলে Desdemona ও Cassio-কে একত্র করিয়া দুর হইতে সেই দৃশ্য সে Othello-কে দেখাইল। উদ্দেশ্য Othello-র মনে সন্দেহবিষ জাগ্রত করা।

কপালকুণ্ডলার উদ্দেশ্যে লিখিত পদ্মাবতীর পত্র নবকুমারের হাতে পড়ে। ঐ পত্রে পদ্মাবতী নিজেকে ব্রাহ্মণবেশী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল এবং কপালকুণ্ডলাকে তাহার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিল। স্বভাবতই নবকুমারের মনে সন্দেহ জাগ্রত হইল। কাপালিক তাহাকে আরও দৃঢ়মূল করে। কাপালিকের সাহায্যে ব্রাহ্মণবেশীর সহিত 'পাপিষ্ঠা' কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ নবকুমার প্রত্যক্ষ করে। এখানে ওথেলো নবকুমার; ইয়াগো কাপালিক; ডেসডিমনা কপাল-কুণ্ডলা এবং কাসিয়ো ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতী।

নবকুমারের লিপি পাঠ করিয়া সেইরূপ হইল ঃ বঙ্কিমচন্দ্র কপাল-কুণ্ডলার নিকট ব্রাহ্মণবেশীর লিখিত পত্র পাইয়া নবকুমারের কিরূপ অবস্থা হইল তাহা বুঝাইবার জন্য একটি সুন্দর উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ জাগিল। ব্রাহ্মণবেশীকে কপালকুণ্ডলার উপপতি বলিয়া মনে হইল। সতীদাহের সময় পতিব্রতা নারী স্বামীর সহগমন করিত। জীবিতাবস্থায় যখন চিতায় আগুন দিত তখন প্রথমে ধোঁয়ায় তাহার দৃষ্টি লোপ হইয়া যায়, সেই কাঠ জ্বলিতে লাগিলে অগ্নিদহন-জনিত তাহার অঙ্গেও ক্রমে প্রচণ্ড জ্বালা অনুভূত হয়। নবকুমারেরও এই চিঠি পড়িয়া "পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা" বোধ হইল। সতীদাহের মতই অবশেষে সেই আগুনে তাহার হৃদয়ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল।

নবকুমার নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রোদন করিয়া কিছু সুস্থির হইলেন—প্রেমপরায়ণ, স্পর্শকাতর, ভাবাতুর নবকুমার কপালকুণ্ডলার ব্যবহারে যে নিদারুণ দুঃখ পাইল তাহাতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। গভীর শোকও ক্রন্দনের মধ্যে অনেকটা প্রশমিত হয়, হৃদয় হালকা অনুভূত হয়। নবকুমারও অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কিছুটা শান্ত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কদের মধ্যে এই রোদনপ্রবণতা অধিক দেখা যায়।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

কাপালিক নবকুমারের গৃহে বসিয়া তাহার দুই ভগ্নবাহু দেখাইল। যে রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করে সেই রাত্রে তাহাদের অন্বেষণ করিতে গিয়া কাপালিক এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়। প্রথমে কাপালিক মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল; পরে জ্ঞান হইলে জানিতে পারিল যে তাহার দুই বাহু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ঐ বাহুতে আর কছুমাত্র বল নাই। কেবল নিত্যক্রিয়া সকল নির্বাহ হয়।

কাপালিক যখন অজ্ঞানাবস্থায় ছিল তখন এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল। ভবানী এতদিন কপালকুণ্ডলাকে তাহার নিকট বলি না দেওয়ায় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই কুমারীর জন্যই কাপালিকের পূর্বকৃত ফল বিনষ্ট হইয়াছে। কাপালিক ভবানীর নিকট কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিল।

আরোগ্য লাভ করিয়া কাপালিক দেবীর আজ্ঞা পালন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানের পর সে কপালকুণ্ডলার সন্ধান লাভ করিয়াছে কিন্তু বাহুবলের অভাবে দেবীর আজ্ঞা পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই তারপর কাপালিক কপালকুণ্ডলা যে সচ্চরিত্রা নহে তাহা বলিল। গত রাত্রে নিকটস্থ বনে কাপালিক যখন হোম করিতেছিল তখন সে স্বচক্ষে দেখিল কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হইয়াছে। অদ্যও কপালকুণ্ডল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে।

কাপালিক মিথ্যাভাষণ করিয়া কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের অবিশ্বাসবে দৃঢ় করিয়া তুলিল। বলিল, কপালকুণ্ডলা কেবলমাত্র তাহার নিকটেই বধযোগ্য নহে, অবিশ্বাসিনী বলিয়া নবকুমারের নিকটও বধযোগ্যা। অতএব নবকুমারের উচিত কাপালিককে সাহায্য করা। নিজের হাতে তাহার বলিদান করা উচিত তাহার ঈশ্বরের নিকট সে যে অপরাধ করিয়াছে "তাহার মার্জনা হইবে; পবিত্র কর্মে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইবে, বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে; প্রতিশোধের চরম হইবে।"

নবকুমার কিন্তু কোন উত্তর করিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া কাপালিক বলিল, "বৎস! এক্ষণে যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা দেখিবে চল।"

নবকুমার এতক্ষণ ঘামিতেছিল। সে কোন উত্তর না করিয়া কাপালিকের সঙ্গে গেল।

কাপালিক যে কত নির্মম এবং মিথ্যাবাদী হইতে পারে এই পরিচ্ছেদে

তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া লেখক কাপালিকের কার্য সম্বন্ধে প্রত্যয় সৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছেন। নবকুমার ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পাইয়া কপালকুণ্ডলার চরিত্রে অবিশ্বাস করিতেছিল। কাপালিকের সহিত আলাপে কিংকর্তব্যবিমূঢ় নবকুমার অস্থির চিত্তে কেবল ঘামিতেছিল। নবকুমারের প্রতিক্রিয়া বর্ণনাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। এই পরিচ্ছেদের নাম 'পুনরালাপে'।

•তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্‌ঃ এই উদ্ধৃতিটি কুমারসম্ভব কাব্যের ৩য় সর্গের অন্তর্গত ১৮নং শ্লোক। দৈত্য সংহার এবং দেবতাদের ইষ্টসাধনের নিমিত্ত তপস্যায় রত মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া উমার সঙ্গে তাঁহার মিলন সাধন করাইবার জন্য ঠিক হইল, অকালবসন্ত সৃষ্টি করিয়া কাম-দেবতা মদনের সাহায্যে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে হইবে। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য গমনরত মদনদেবকে দেবরাজ ইন্দ্র এখানে বলিতেছেন: 'তাহা হইলে তুমি সিদ্ধিলাভের জন্য অগ্রসর হও, দেবকার্য সাধন কর।' কপালকুণ্ডলাকে বধ করিয়া দেবতার ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য কাপালিকও এই পরিচ্ছেদে নবকুমারকে উপদেশ দিতেছে।

আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলামঃ কাপালিক এই স্বপ্ন-বর্ণনার মধ্য দিয়া কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার ইন্দ্রিয় লালসার কথা স্বীকার করিল। দ্বিতীয়ত, কপালকুণ্ডলার বলিদান ভবানীর একান্ত ইচ্ছা। তাহাকে বলি দিয়া তিনি কাপালিককে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

কপালকুণ্ডলা বনে গিয়া ভগ্নগৃহমধ্যে ব্রাহ্মণবেশীর সাক্ষাৎ পাইল। ব্রাহ্মণবেশীকে বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। কাপালিক সেখানে আসিতে পারে মনে করিয়া তাহারা বনের মধ্যেই ভিন্ন স্থানে গেল। প্রথমেই ব্রাহ্মণবেশী তাহার নিকট আত্ম-পরিচয় দিল। যে মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে অলঙ্কার দিয়াছে ব্রাহ্মণবেশী সেই মতিবিবি শুনিয়া কপালকুণ্ডলা বিস্মিতা হইল। পরে যখন শুনিল সে কেবল মতিবিবি নহে তাহার সপত্নীও বটে তখন কপালকুণ্ডলা আরও চমৎকৃত হইল। লুৎফ-উন্নিসা তখন কপালকুণ্ডলাকে তাহার জীবনের সকল ঘটনা বলিল। কপালকুণ্ডলার সতীত্বের প্রতি নবকুমারের সংশয় জন্মাইয়া তাহার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ ঘটাইতে চাহিয়াছিল তাহাও স্বীকার করিল। কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা এখন সেই পথ ত্যাগ করিয়াছে। এখন কপালকুণ্ডলা যদি তাহার পরামর্শমত কাজ করে তাহা হইলে কপালকুণ্ডলার মঙ্গল হইবে, লুৎফ-উন্নিসারও কামনা সিদ্ধ হইবে।

কাপালিকের মুখে লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলার নাম শুনিয়াছিল। কপালকুণ্ডলার মৃত্যুই কাপালিকের অভীষ্ট। সেই উদ্দেশ্যেই সে হোম করিয়া থাকে। এই কার্যে কাপালিক লুৎফ-উন্নিসার সাহায্য চাহিয়াছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মৃত্যু তাহার কাম্য নহে বলিয়া সে কাপালিকের এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। সে ইহজন্মে অনেক পাপ করিয়াছে কিন্তু তাহারও পাপের পথে এতদূর অধঃপাত হয় নাই যে, সে নিরপরাধ একটি বালিকার মৃত্যু ঘটায়।

কপালকুণ্ডলা গতরাত্রে ভগ্নগৃহে কাপালিক আর ব্রাহ্মণবেশীর মধ্যে এই বিতর্কই শুনিতে পাইয়াছিল। কাপালিক কপালকুণ্ডলার সমস্ত বৃত্তান্তও ব্রাহ্মণবেশীর নিকট বলিয়াছিল। নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পলায়নের পর কাপালিকের যাহা হইয়াছিল তাহাও লুৎফ-উন্নিসা বলিতে লাগিল। বালিয়াড়ির উচ্চ শিখর হইতে পড়িয়া কাপালিকের দুই হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভবানী কাপালিককে স্বপ্নে কপালকুণ্ডলার প্রাণ বলি দিতে বলিয়াছেন—এই সবই লুৎফ-উন্নিসা তাহাকে বলিল। স্বপ্নের কথা শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকাইয়া উঠিল। বাহু বলহীন বলিয়াই কাপালিক কপালকুণ্ডলার প্রাণ বলি দেওয়ার জন্য লুৎফ-উন্নিসার সাহায্য চাহিয়াছিল। কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা সেই দুষ্কর্ম করিতে স্বীকৃত হয় নাই। কখনও হইবে না। বরং কাপালিকের সেই সংকল্পের প্রতিকূলতা করিবে বলিয়াই কপালকুণ্ডলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলাকে স্বামী ত্যাগ করিতে বলিল। তাহার পরিবর্তে লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলাকে অট্টালিকা, প্রচুর ধন এবং দাসদাসী দিবে, যাহাতে কপালকুণ্ডলা রানীর মত থাকিতে পারে।

কপালকুণ্ডলা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিল, কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। এমনকি নিজ অন্তঃকরণ মধ্যেও নবকুমারকে দেখিতে পাইল না। অতএব সে কাহার জন্য লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবে? লুৎফ-উন্নিসা তাহার কোন উপকার করিয়াছে কিনা তাহা সে বলিতে পারে না, তাহার অট্টালিকা, ধন-সম্পত্তি, দাস-দাসীরও কোন প্রয়োজন নাই। লুৎফ-উন্নিসার মানস সিদ্ধ করিবার জন্য আগামী কাল হইতেই সেনিরুদ্দেশ হইবে। সে বনচর ছিল আবার বনচর হইবে। কপালকুণ্ডলা যে এত তাড়াতাড়ি স্বীকৃত হইবে লুৎফ-উন্নিসা তাহা প্রত্যাশা করে নাই। সে কপালকুণ্ডলাকে বলিল, কাল সকালে সে কপালকুণ্ডলার নিকট একজন বিশ্বাসযোগ্যা চতুরা দাসীকে পাঠাইবে। সে কপালকুণ্ডলাকে বর্ধমানে অতি প্রধানা লুৎফ-উন্নিসার কোন বান্ধবীর নিকট লইয়া যাইবে। তিনি কপালকুণ্ডলার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন।

লুৎফ-উন্নিসা এবং কপালকুণ্ডলা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কথা বলিতেছিল। দূর হইতে নবকুমার এবং কাপালিক যে তাহাদের দিকে করালদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল তাহা তাহারা লক্ষ্য করে নাই। অবশ্য নবকুমার এবং কাপালিক তাহাদের কোন কথা শুনিতে পায় নাই। নবকুমার শুধু দেখিল, তাহার সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহের পূর্বে কপালকুণ্ডলা যেরূপ অলুলায়িত-কুন্তলা ছিল আজও সেইরূপ আছে। ব্রাহ্মণবেশী এবং কপালকুণ্ডলা পাশাপাশি বসিয়া আছে। কপালকুণ্ডলার লম্বা খোলা চুল ব্রাহ্মণবেশীর পিঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। নবকুমার তাহা দেখিতে পাইয়া একেবারে বসিয়া পড়িল। কপালকুণ্ডলার এতদূর অতঃপতন হইতে পারে তাহা সে ভাবিতে পারে না। কাপালিকও সুযোগ বুঝিয়া নবকুমারকে ভবানীর প্রসাদ বলিয়া কিছু সোমরস পান করাইয়া দিল। নবকুমার জানিত না যে এই সুস্বাদ পেয় কাপালিকের স্বহস্তপ্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা। "পান করিয়াই সে সবল হইল"।

এদিকে লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলার স্বীকৃতিতে এইরূপ কৃতজ্ঞতা বোধ করিল যে, সে কপালকুণ্ডলার হাতে একটি অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল। বলিল, এই অঙ্গুরীয় দেখিয়া সে যেন যবনী ভগিনীকে স্মরণ করে। নবকুমার তাহা দেখিতে পাইল। কাপালিক নবকুমারকে কম্পমান দেখিয়া তাহাকে আবার সুরা পান করাইল। সেই সুরার তেজে অন্তরস্থিত সব কোমল ভাব নষ্ট হইয়া গেল।

কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। তখন নবকুমার এবং কাপালিক তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। লুৎফ-উন্নিসা তাহাদের দেখিতে পায় নাই।

সপত্নী লুৎফ-উন্নিসার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার কথোপকথনই এই পরিচ্ছেদের প্রধান বর্ণনার বিষয়, সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন—'সপত্নী সম্ভাষে'।

Be at peace·········love :

Lord Lytton-এর Lucretia or The children of Night নামক উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে যুবক Mainwaring-এর প্রতি লুক্রেশিয়ার ভগিনী Susan-এর এই উক্তি। Lucretia Mainwaring-কে

ভালবাসিত। কিন্তু Mainwaring ভালবাসে Susan-কে। Susan ইহা বুঝিতে পারিয়া Mainwaring-কে লুক্রেশিয়াকেই ভালবাসিতে বলিল। তাহার সম্পূর্ণ উক্তিটি হইল: "Be at peace: it is your sister that addresses you. Requite Lucretia's love—it is deep and strong; give her as she gives to you—a whole heart; and in your happiness, I, your sister—sister to both—I shall be blest."

এখানে লুৎফ-উন্নিসা ভালবাসিত নবকুমারকে কিন্তু নবকুমার ভালবাসে কপালকুণ্ডলাকে। লুৎফ-উন্নিসা এখানে কপালকুণ্ডলাকে ভগ্নী সম্বোধন করিয়া তাহাকে স্বামী ত্যাগ করিতে বলিল। তাহা হইলে সে নবকুমারকে পাইতে পারে।

অবিধি: অবিধেয়; অনুচিত। **হিজলী প্রদেশ হইতে:** কপালকুণ্ডলা যে গহন বন হইতে নবকুমারকে লইয়া আসিয়াছিল তাহা হিজলীর অন্তর্গত।

স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন: কপালকুণ্ডলার মধ্যে ধর্মভাব প্রবল। ধর্মের আবেষ্টনীর মধ্যেই সে বড় হইয়াছে। অতএব তাহার প্রভাব কপালকুণ্ডলার জীবনে অত্যধিক। ভবানী কাপালিককে কপালকুণ্ডলার প্রাণবলি দিবার জন্য স্বপ্নাদেশ দিয়াছেন ইহা শুনিয়া কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিল। তবে তাহার জীবন বিসর্জনই ভবানীর অভিপ্রায়। কপালকুণ্ডলা এক বৎসর নবকুমারের সংসার করিলেও সংসারের প্রতি তাহার কোন মায়া নাই, জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধেও সে উদাসীন। তাহার জীবন ভবানীর পূজায় প্রয়োজন ইহা শুনিয়া তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অন্তঃকরণ-মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না: কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি সামাজিক নহে। সামাজিক নারীর নিকট স্বামীই পরম সম্পদ। স্বামীই স্ত্রীলোকের একান্ত আপনার জন। ধ্যানে জ্ঞানে স্বামীচিন্তাই তাহাদের বড় চিন্তা। কপালকুণ্ডলা একবৎসরের উপর স্বামীর সংসার করিয়াছে তথাপি স্বামীর প্রতি তাহার কোন আসক্তি জন্মে নাই। লুৎফ-উন্নিসা যখন বহু ধনরত্ন দাসদাসীর বিনিময়ে স্বামী ত্যাগ করিতে বলিল তখন কপালকুণ্ডলা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিল, নিজের অন্তরে পর্যন্ত তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিল কিন্তু কাহাকেও

সেখানে দেখিতে পাইল না। এমনকি নবকুমারকেও নয়। প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে সে মানুষ হইয়াছে। তাহার স্বভাবের মধ্যেই সেই অনাসক্তির প্রবণতা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কোন মায়া মোহ নাই; অতএব কোন বন্ধনও নাই। সেজন্য নবকুমারের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করিয়াও সে নবকুমারের প্রতি কোন বন্ধন অনুভব করে নাই।

শমিত: নিবারিত। **সংসাররচনা অপূর্ব কৌশলময়:** মানব সংসার অতি জটিল। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি তাহাকে আরো জটিল করিয়া তোলে। অনেক সময়ে প্রকৃত বৃত্তান্ত না জানিয়া মানুষ আপন মনে এমন ধারণা করিয়া বসে যাহাতে সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠে। এই উপন্যাসেও নবকুমার এবং কাপালিক দূর হইতে কপালকুণ্ডলা এবং ব্রাহ্মণবেশী লুৎফ-উন্নিসার কথোপকথন দেখিতেছিল। তাহাতে উভয়ে মনে করিল কপালকুণ্ডলা তাহার উপপতির সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছে। আসলে লুৎফ-উন্নিসা ছিল নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলাকে স্বামীত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার কামনা সিদ্ধ করিবার জন্য স্বামীত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মাহাত্ম্যই প্রকাশ পাইয়াছে। নবকুমার যদি তাহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইত তাহা হইলে সে কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারিত না। সংসারের এমনই বিচিত্র গতি। মানুষ প্রকৃত বৃত্তান্ত না জানিয়া অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া নিজের এবং অপরের চরম সর্বনাশ করিয়া থাকে।

বর্ধমানে কোন অতিপ্রধানা স্ত্রীলোক: শের আফগান-পত্নী মেহের-উন্নিসা।

স্নেহের অঙ্কুর পর্যন্ত উন্মূলিত করিতে লাগিল: নবকুমারের দুর্বল মুহূর্তে কাপালিক তাহাকে প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা পান করাইল। কাপালিক তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতে চাহিল, যাহাতে নবকুমারের মনে কপালকুণ্ডলার প্রতি বিন্দুমাত্র স্নেহও অবশিষ্ট না থাকে এবং নবকুমার স্বহস্তে কপালকুণ্ডলাকে বধ করিতে পারে।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

লুৎফ-উন্নিসার সঙ্গে আলোচনার পরে কপালকুণ্ডলার মনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হইল। সে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিল। সে

আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হইল। অবশ্য তাহা কেবল লুৎফ-উন্নিসার জন্য নহে। আবাল্য তান্ত্রিক কর্তৃক প্রতিপালিত। জীবন বিসর্জনে সে নিরঙ্কুশ। "ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবন সমর্পণ আদেশ করিয়াছেন।" তাহা ছাড়া সংসারের কোন বন্ধনই কপালকুণ্ডলা বোধ করে না। তখন কেন সে জীবন বিসর্জন করিবে না ?

এইরূপ নানা প্রশ্ন আলোচনা করিতে করিতে কপালকুণ্ডলা চলিতে লাগিল। হঠাৎ সে যেন উপর হইতে এক অপার্থিব শব্দ শুনিতে পাইল। সে চাহিয়া দেখিল যেন "ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।" কপালকুণ্ডলা তাহার প্রতি চাহিয়া চলিতে লাগিল।

নবকুমার বা কাপালিক এসব কিছুই দেখে নাই। নবকুমার ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। সে কাপালিকের নিকট হইতে সুরা চাহিয়া পান করিল। পরে আর বিলম্বে কাজ নাই মনে করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিল। 'কপালকুণ্ডলা' ডাক শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিত হইল। কারণ সেই নামে তাহাকে আর কেহ ডাকিত না। নবকুমার ও কাপালিক তাহাদের সম্মুখে আসিলে কপালকুণ্ডলা প্রথমে তাহাদের চিনিতে পারে নাই। পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া কাপালিককে জিজ্ঞাসা করিল, সে তাহাকে বলি দিতে আসিয়াছে কিনা। নবকুমার দৃঢ়মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হাত ধরিল। কাপালিক করুণার্দ্র চিত্তে মধুরস্বরে বলিল, "বৎসে, আমাদিগের সঙ্গে আইস"—এই বলিয়া শশ্মানের দিকে পথ দেখাইয়া চলিল।

কপালকুণ্ডলা আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল, ভৈরবী যেন প্রফুল্ল এবং "এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে।" কপালকুণ্ডলা ভাগ্যতাড়িত। বিনা বাক্যব্যয়ে সে কাপালিকের অনুসরণ করিল। নবকুমার আগের মত দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া রাখিল।

লুৎফ-উন্নিসার সঙ্গে কথা বলিয়া কপালকুণ্ডলা গৃহের দিকে যাইতেছিল। কিন্তু এ কোন্ গৃহ ? নবকুমারের গৃহে, না ভৈরবী-নির্দেশিত সেই অনন্ত গৃহে ? বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন, "গৃহাভিমুখে"।

No Spectre greets me·········no vain shadow this :

কবি Wordsworth এর 'Poems of the Imagination পর্যায়ের অন্তর্গত 'Laodamia' কবিতায় সতী Laodamia এই উক্তি করিয়াছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ উক্তিটি হইল : No spectre greets me—no vain

shadow this ; come, blooming Hero, place thee by my side."
Laodamiaর স্বামী ট্রয়যুদ্ধে নিহত হন। সতীর ব্যাকুল শোকাবেগ দেবতাদের বিচলিত করে। Jove তাহার প্রার্থনামত তিন ঘণ্টার জন্য স্বামীকে সশরীরে পত্নীর নিকট আবির্ভূত হইবার আদেশ দেন। সতী তাহাতেই খুশী নয়। সে তাঁহার স্বামীর সহিত মিলন প্রত্যাশা করিয়া এই উক্তি করিয়াছে। অনৈসর্গিক স্বামীর মূর্তিকে সে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করিতে চাহিয়াছে।

কপালকুণ্ডলাও উৎকট চিন্তার একাগ্রতায় উর্ধ্ব আকাশে অপার্থিব 'নব নীরদ নিন্দিত মূর্তি' দেখিলেন। কপালকুণ্ডলা তান্ত্রিকের সন্তান। সে যেন এই অলৌকিক মূর্তিকে আরো সত্য করিয়া তাহার জীবনের পথ নির্দেশক সঙ্গী রূপেই পাইতে চাহে। Laodamia-র নিকট তাহার স্বামীর মতই এই মূর্তি তাহার নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান : তান্ত্রিক শবসাধনা করে। পর-প্রাণ সংহারে তাহার কোন দ্বিধা নাই। কপালকুণ্ডলা অবশ্য তান্ত্রিক কাপালিকের আশ্রয়ে প্রতিপালিতা। পরিবেশ মানব স্বভাবের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার পরিবর্তন ঘটায়। অহর্নিশ এই তন্ত্র সাধনার পরিবেশে থাকিয়া কপালকুণ্ডলার মনেও তাহার অনুরাগ দেখা দিয়াছিল। সেজন্য প্রাণ বিসর্জনেও সে অকুণ্ঠ। অতএব সামাজিক মানুষের যে হৃদয় প্রবণতা তাহা তাহার ছিল না।

সুখের প্রত্যাশাতেই বর্তুলবৎ সংসার মধ্যে ঘুরিতেছি : সুখ দুঃখ লইয়াই মানুষের সংসার। প্রতি পদে পদে এখানে অজস্র প্রতিবন্ধকতা। তথাপি শত দুঃখের মধ্যেও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায় একটু সুখের আশায়। এই জন্যই মানুষ সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই সংসারের প্রধান বন্ধন হইল প্রেম, ভালবাসা। কপালকুণ্ডলার সেই বন্ধন ছিল না। সে কাহাকেও ভালবাসে নাই, কাহারও নিকট হইতে তাহার প্রত্যাশা করিবার কিছু নাই। সে স্বাধীন, মুক্ত। তাহার পিছুটান নাই, অতএব প্রাণ বিসর্জনে তাহার কোন বাধা নাই। নির্ঝরিণীর ন্যায় তাহার চিত্ত চঞ্চল হইল।

করিকরভ : হস্তীশাবক। **পঞ্চভূত :** ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, (অহংকার—বায়ু, বায়ু—অগ্নি, অগ্নি—জল, জল—পৃথিবী। ব্যোম বা আকাশের গুণ শব্দ ; মরুৎ বা বায়ুর গুণ শব্দ, স্পর্শ ; তেজঃ বা অগ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ; অপ্ বা জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ; ক্ষিতি বা পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)। Life Force.

যেন ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল।" কপালকুণ্ডলা গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভৈরবী তাহার প্রাণ বলি দিবার জন্য কপালিককে স্বপ্নাদেশ দিয়াছেন ; লুৎফ-উন্নিসা তাহার কামনা সিদ্ধ করিবার জন্য কপালকুণ্ডলাকে স্বামীত্যাগ করিতে কাতর অনুরোধ করিয়াছে। চিন্তার একাগ্রতায় তাহার বাহ্য দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য ছিল না। তখন সে যেন এক অপার্থিব শব্দ শুনিতে পাইল। সে ঊর্ধ্বে চাহিয়া এক অনৈসর্গিক মূর্তি দেখিতে পাইল। নিয়তি যেন তাহাকে ভৈরবী মূর্তিরূপে প্রাণ-বলি দিবার জন্য ডাকিতেছেন। সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথও এরকম অলীক কল্পনায় বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় ঃ নিয়তি বা অদৃষ্ট কপালকুণ্ডলার সমস্ত বুদ্ধি বা চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। সে একেবারে কর্তব্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য ভৈরবীর নির্দেশমত বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিয়া চলিল।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

তখন ঘোর অন্ধকার। কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকত ভূমিতে—তাহার পূজার স্থানে লইয়া গেল। তাহার সম্মুখেই বৃহত্তর এক সৈকত ভূমিতে শশ্মান। সেই শ্মশানের নীচেই গঙ্গার অগাধ জল। পূজাস্থানে কোন দীপ ছিল না। কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আগুন জলিতেছিল এই অস্পষ্ট আলোতে শ্মশানভূমিকে আরও ভীষণ দেখাইতেছিল।

নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলাকে কুশাসনে বসাইয়া কাপালিক তাহার পূজা আরম্ভ করিল। উপযুক্ত সময়ে কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আনিতে কাপালিক নবকুমারকে আদেশ করিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হাত ধরিয়া শ্মশানের উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিল। নবকুমার বেহুঁসের মত সব মাড়াইয়া জলের কলস ভাঙ্গিয়া চলিল। শ্মশানের চারিদিকে শবমাংসভুক পশুগুলি ফিরিতেছিল। কপালকুণ্ডলা দেখিল নবকুমারের হাত কাঁপিতেছে। সে স্বয়ং নির্ভীক নিষ্কম্প। কপালকুণ্ডলা তাহাকে ভয়ে কাঁপিতেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিল। নবকুমার বলিল, "ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।"

তাহার কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নবকুমারের সমস্ত বাঁধন যেন শিথিল হইয়া গেল। কপালকুণ্ডলার রূপে সত্যই সে মুগ্ধ। তাহাকে সে

খুবই ভালবাসে। অথচ সে আজ নিজের হৃৎপিণ্ড যেন নিজে ছিঁড়িয়া শ্মশানে ফেলিতে আসিয়াছে। এই বলিয়া সে সহসা রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পায়ে আছড়াইয়া পড়িল। সে কাতর ভাবে কপালকুণ্ডলাকে বলিল, "একবার বল যে তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইয়া বলিল, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই।" নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় স্বীকার করিল, সে চৈতন্য হারাইয়াছে বলিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। এখন সে সব জানিতে চাহিল। তখন কপালকুণ্ডলা বলিল, নবকুমার আজ যাহাকে দেখিয়াছে সে আসলে পদ্মাবতী। কপালকুণ্ডলা কখনো অবিশ্বাসিনী নহে। তবে সে আর গৃহে ফিরিতে স্বীকৃত হইল না। সে ভবানীর চরণে আত্মবিসর্জন দিতে আসিয়াছে। সে নবকুমারকে গৃহে ফিরিতে বলিল। নবকুমার তাহাতে স্বীকৃত হইল না। সে কপালকুণ্ডলাকে বাহু বাড়াইয়া ধরিতে গেল কিন্তু পারিল না। কপালকুণ্ডলা গঙ্গার ধারে যে মাটির উপর দাঁড়াইয়াছিল তাহা হঠাৎ নদীগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কপালকুণ্ডলা জলে পড়িয়া গেল দেখিয়া নবকুমারও ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল। কিন্তু কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়াও সে কপালকুণ্ডলার কোন সন্ধান পাইল না। তখন সেও উঠিল না। অনন্ত গঙ্গার প্রবাহমধ্যে উভয়ের সলিলসমাধি হইল।

শ্মশানভূমিতে দাঁড়াইয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলার সমস্যার সমাধান হইল। কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে তাহার সকল সন্দেহের অবসান হইল। এই পরিচ্ছেদের নাম—'প্রেতভূমে'।

বপুষা চরণোজঝিতেন সা নিপতন্তী……মেদিনীম্ঃ রঘুপুত্র সম্রাট অজের স্বয়ংবর-লব্ধা হৃদয়েশ্বরীর গতচেতন দেহের সঙ্গে সঙ্গেই নরনাথ অজও ভূতলে পতিত হইলেন। এরূপ হইবারই কথা। কেন না—প্রজ্বলিত দীপশিখা হইতে বিন্দু-পরিমিত তৈল ক্ষরিত হইয়া পড়িলে, সেই সঙ্গে জলন্ত শিখারও কিয়দংশ ভূতলে পতিত হইয়া থাকে। উদ্ধৃতিটি মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' নামক মহাকাব্যের অষ্টম সর্গের আটত্রিশ শ্লোক।

পদতলস্থিত গঙ্গাতীরের ভূমি গঙ্গাগর্ভে ধ্বসিয়া পড়িলে কপালকুণ্ডলা জলে পড়িয়া যায়। কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া নবকুমারও জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল ঃ চাঁদ ডুবিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর ভাবে পরিচ্ছেদটি আরম্ভ করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে নবকুমার কপালকুণ্ডলার জীবনের আলো নিবিয়া গেল। কাহিনীর উপর যবনিকা পতন হইল।

তুমি ত কখন আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই ঃ নবকুমারের স্বীকারোক্তি। কপালকুণ্ডলার অপরূপ-রূপ-সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ। কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের উপর নবকুমারের গৃহিণী তথাপি সে নবকুমারের প্রতি কোন আসক্তি বোধ করে নাই। কিন্তু নবকুমারের পক্ষে তাহা নহে। কপালকুণ্ডলা তাহার জীবনের অনেকখানি অধিকার করিয়া লইয়াছে। সেজন্যই কপালকুণ্ডলার চরিত্রের প্রতি সন্দেহে সে এত বেশী চিত্তচাঞ্চল্য বোধ করিয়াছে। নিজের হাতে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার জন্য শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নবকুমার যেন নিজের হৃৎপিণ্ড নিজে কাটিয়া লইয়া শ্মশানে ফেলিতে আসিয়াছে। তাহা কত নিদারুণ, কত নির্মম তাহা নবকুমারের এই অসহনীয় দুঃখপূর্ণ উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

আড়রি ঃ ভাঙ্গনধরা খাড়া তটভূমি ; নদীতটস্থ উচ্চস্থান। **চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব ঃ** কপালকুণ্ডলার চরিত্রে অবিশ্বাস করিয়া নবকুমারও আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা বলিল নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেই পারিত। সত্যই নবকুমার যদি কপালকুণ্ডলাকে পূর্বে জিজ্ঞাসা করিত তাহা হইলে সমস্যার সব জট খুলিয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এমন সুকৌশলে ঘটনা বিন্যাস করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পাইবার পর কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিবার বেশী সুযোগ নবকুমার পায় নাই। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পাইয়া নবকুমারের সরল বিশ্বাসে ঘা লাগিয়াছিল। কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। পরবর্তীকালে ত সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং কাপালিকের সহিত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে নবকুমারের মনে সেই অবিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। কাপালিকের প্রচণ্ড তেজস্বী সুরাপানে তাহার সমস্ত চৈতন্য প্রায় লোপ পাইয়াছে। তাহার বিচারবুদ্ধি হঠাৎ নষ্ট হওয়ায় নবকুমার তাহার এবং কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ দ্রুত ডাকিয়া আনিয়াছিল।

॥ অন্ত্যপর্ব ॥

[ক] ॥ কপালকুণ্ডলা : নামকরণের যুক্তিযুক্ততা ॥

কোন গল্পগ্রন্থ বা কবিতার নামের মধ্যেই তাঁহার মূল বক্তব্যের আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেজন্য নাম শুনিয়া বা দেখিয়া মূল বক্তব্যের অবতারণা সম্বন্ধে পাঠক সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারে। এই নামকরণের মধ্যেই লেখকের সজ্ঞান অভিপ্রায় নিহিত থাকে। সেজন্য সাহিত্য সমালোচনায় নামকরণের বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিচারে স্রষ্টার সৃজনশীল মনোলোক ও মানস ধর্মের সহিত সম্যক পরিচিত হইবার অবকাশ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিক সমগ্র উপন্যাসের বিচিত্র ঘটনার মধ্যে অনুসৃত মূল সূত্রটিকেও এইভাবে নামকরণের মধ্যে ইঙ্গিতময় ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই নামকরণের বিভিন্ন রীতি আছে। সাধারণত নায়ক বা নায়িকার নামেই নামকরণ হইয়া থাকে। সম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে এই রীতির প্রচলন বেশী দেখা যায় না। পাশ্চাত্যে অতি সাম্প্রতিক কালেও পাত্রপাত্রীর নামে অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন রুশ ঔপন্যাসিক পাস্তেরনাকের ডাঃ জিভাগো। নামকরণের এই রীতি অতি প্রাচীন। পৃথিবীর অধিকাংশ বিখ্যাত উপন্যাসের এই রীতিতে নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট', রোমা র‍্যাঁলার 'জাঁ ক্রিস্তফ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরাণী', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতিই বেশী অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য অন্য রীতিও আছে। ঘটনার মূল সমস্যা, জীবন ব্যাখ্যার একটু সংকেত, কাহিনীর মূল সুর, ঘটনার গ্রন্থিনির্দেশ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও কাহিনী বা উপন্যাসের নামকরণ করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বিষবৃক্ষ উপন্যাসে আদর্শবাদ, আনন্দমঠ-এ প্রতিষ্ঠান এবং কৃষ্ণকান্তের উইল-এ জটিল ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলা নামটি শ্রীভবভূতি রচিত সংস্কৃত নাটক 'মালতীমাধব'-এ প্রথম পাওয়া যায়। ঐ নাটকে বৃদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী কামন্দকীর শিষ্যা অবলোকিতা কামন্দকীর নিকটে বলিয়াছিল, 'পদ্মাবতী নগরের মহাশ্মশানে করালা নামে চামুণ্ডা আছেন। তিনি নানাবিধ প্রাণবলিদানের প্রিয়। রাত্রিতে বিচরণকারী এবং নরকপালের পানপাত্রধারী অঘোরঘণ্ট নামে কোন সাধক শ্রী পর্বত হইতে আসিয়া সেই মহাশ্মশানের অনতিদূরবর্তী বনমধ্যে

বাস করিতেন ; মহাপ্রভাবসম্পন্না কপালকুণ্ডলা নামে তাঁহার শিষ্যা সেই স্থানে সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া থাকেন। কাপালিকের কথাও আমরা ঐ নাটকে পাই। কামন্দকীর অন্য এক শিষ্যা সৌদামিনী আশ্চর্য মন্ত্রসিদ্ধির প্রভাব লাভ করিয়া শ্রী পর্বতে কাপালিকের ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত কপালকুণ্ডলা নামটি এবং তাহার পটভূমিকা এই মালতীমাধব নাটক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

তবে মালতীমাধব নাটকে কপালকুণ্ডলা তন্ত্রসাধক অঘোরঘণ্টের শিষ্যা, আলোচ্য উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা আবাল্য তান্ত্রিক প্রতিপালিতা। সে বনচারী, সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা নাই। "ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।·······কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধি মানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।" কপালকুণ্ডলা কাপালিকের অভিসন্ধি সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। সে কেবল বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ লক্ষ্য করিত। তান্ত্রিকের পরিবেশে মানুষ হওয়ায় তাহার মধ্যে ধর্মভাব প্রবল হইয়াছিল। অন্যথা বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে প্রাকৃত আরণ্যক করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলা কাহিনীর উৎপত্তি সম্বন্ধে 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ'-কার পূর্ণচন্দ্র বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন নেগুঁয়ায় অবস্থান করেন তখনই এই কাহিনীর সূচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম কর্মস্থল যশোহর হইতে বদলি হইয়া ১৮৬০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নেগুঁয়ায় যান এবং ঐ বৎসরের নভেম্বরের প্রারম্ভ পর্যন্ত সেখানে থাকেন। এই নেগুঁয়া কাঁথির সন্নিকট দরিয়াপুর ও চাঁদপুরের অনতিদূরে। তিনি লিখিয়াছেন, "যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে (এক্ষণে উহাকে কাঁথি বলে) ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল ; মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও সে মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গলোয় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বন-জঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে, ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন।" (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ)

এই সন্ন্যাসী কাপালিক বঙ্কিমচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি খুলনা যাইবার পূর্বে কয়েকদিন কাঁটালপাড়ায় অবস্থান করেন। সেই সময় একদিন দীনবন্ধু মিত্র কাঁটালপাড়ায় গেলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন:

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" (ঐ)।

"যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন, তখন সেখানে পূর্ণচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন, কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। সন্তানাদি হইলে স্বামী পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাঁহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।"

পূর্ণচন্দ্র অতঃপর লিখিয়াছেন: 'ভাবগতিকে বুঝিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না। ইহার পর দুই বৎসরের (?) মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী, সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী-মূর্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।" (ঐ)

এই উপন্যাসের নায়ক নবকুমার পথ হারাইয়া যখন অনন্যমনে অপূর্ব সমুদ্র সৌন্দর্য দেখিয়া সন্ধ্যাকালে গাত্রোত্থান করিল তখন সে অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মোহিনীরূপের সম্মুখীন হইল। আকাশে আধো-চাঁদ, পশ্চাতে অনন্ত জলধি, সম্মুখে আগুলফলম্বিত আবেণীসংবদ্ধ বিস্তৃত কেশরাশির প্রেক্ষাপটে কপালকুণ্ডলার অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তি দেখিয়া নবকুমার বিস্মিত হইল। কপালকুণ্ডলার অতিগভীর অথচ জ্যোতির্ময় বিশাল লোচনে কটাক্ষ "সাগরহৃদয়ে ক্রিয়াশীল চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। তাহার নিরাভরণ রমণীদেহের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। "তাহা সেই গম্ভীরনাদি "সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হ না।" নবকুমার সেই দেবীমূর্তি দেখিয়া নিস্পন্দ শরীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রমণীও বেশী কথা বলিল না। কেবল নবকুমারকে কাপালিকের কুটীরের পথ দেখাইয়া চলিল।

এই কপালকুণ্ডলাই পরে কাপালিকের নিষ্ঠুর হাত হইতে নবকুমারের ণ বাঁচাইল। এই ঘটনা বিপর্যয়ে কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের স্ত্রী হইয়া গ্রামে আসিতে হইল। এই সংসার জীবন সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই ল না। এমনকি বিবাহ কাহাকে বলে তাহাও সে সবিশেষ জানিত না। াপি কপালকুণ্ডলাকে বৎসরাধিক কাল নবকুমারের গৃহিণী হইয়া বাস রিতে হইল। এই এক বৎসরের বিস্তৃত বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেন ই। মনে হয় পরবর্তীকালে কতকগুলি ঘটনার সংঘাত দেখা না দিলে ালকুণ্ডলা শেষ পর্যন্ত সামাজিক জীবন যাপন করিতে পারিত। কিন্তু মচন্দ্রের তাহা মনঃপূত ছিল না; কপালকুণ্ডলার অগোচরেই তাহার বন লইয়া নানা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। সপ্তগ্রামে নবকুমারের সঙ্গে যাইবার থই তাহার সর্বনাশের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। চৌদ্দ বৎসর পরে বর্ধমানের থ ফিরিবার সময় চটিতে হঠাৎ নবকুমারের সঙ্গে মতিবিবির সাক্ষাৎ হইল। : মতিবিবি ছিল নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। দীর্ঘকাল পরে দেখিয়া তবিবি নবকুমারের প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ বোধ করিল। আত্মগর্বিতা : নারী এক বৎসর পর আগ্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কপালকুণ্ডলার হত নবকুমারের বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য প্রয়াসী হইল। ঠিক একই সময়ে তহিংসাপরায়ণ কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে ভবানীর পূজায় বলি দিবার জন্য কুমারের গৃহের অনতিদূরে নিবিড় বনে হোম করিতে লাগিল। মতিবিবি ং কাপালিকের সংযোগে ঘটানার জাল জটিলতর হইল। নবকুমার কপাল-ণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে লাগিল। পরে এই সন্দেহই বিশ্বাসে রণত হইল। দুষ্ট কাপালিক নবকুমারের এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া হাকে দিয়াই কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার সব আয়োজন প্রস্তুত করিল।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নরবলির মধ্যে উপন্যাসের যবনিকা পতন ঘটান নাই। ালকুণ্ডলাকে নদীতে স্নান করাইতে লইয়া যাইবার সময় নবকুমার জানিতে রিল কপালকুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী নহে। নবকুমার যাহাকে কপালকুণ্ডলার াপতি বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল আসলে সে নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মা-ী। দৃঢ়চেতা কপালকুণ্ডলা কিন্তু আর নবকুমারের গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হল না। ভবানীর দৈব-নির্দেশে সে প্রাণ বিসর্জনের দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে। হা হইতে কেহ তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। নবকুমারের সহিত রূপ কথোপকথন কালে হঠাৎ কপালকুণ্ডলা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেই মৃত্তিকাখণ্ড বিশাল তরঙ্গাঘাতে নদীপ্রবাহ মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কপাল-ণ্ডলার সলিল সমাধি হইল। নবকুমারও কপালকুণ্ডলাকে উদ্ধার করিবার

জন্য সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, আর উঠিল না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতির কোল হইতে যে নারীকে তুলিয়া আনিয়া সংসারে স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাকে আবার প্রকৃতির কোলেই ফিরাইয়া দিলেন।

আলোচ্য উপন্যাসের এই আখ্যানাংশ কপালকুণ্ডলারই কাহিনী। কাপালিক, নবকুমার মতিবিবি প্রভৃতি চরিত্র তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। নবকুমার এই উপন্যাসের নায়ক হইলেও কপালকুণ্ডলার চরিত্রই সেখানে প্রধান। নবকুমারকে লইয়া এই উপন্যাসের আরম্ভ হইলেও কপালকুণ্ডলার সহিত তাহার পরিচয়ের পর হইতে সে কপালকুণ্ডলার অনুবর্তন করিয়াছে। ভিন্ন ধর্ম হওয়ায় পতি নারীর প্রধান পূজ্য হইলেও কপালকুণ্ডলার স্বাধীন সত্তা কোথাও খণ্ডিত বা লুপ্ত হয় নাই। বরং অযৌক্তিক মনে করিয়া সে স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে। নবকুমারের নিষেধ সত্ত্বেও সে শ্যামাসুন্দরীর জন্য ঔষধ তুলিতে একা অধিক রাত্রে গভীর বনে গিয়াছিল। এমন কি, "পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেরূপ অধিকার" মনে করিয়া সে ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সন্ধ্যার পর বনে যাইবার সঙ্কল্প করিল। সেজন্য নবকুমার এই উপাখ্যানে নামকরণের অধিকার পায় নাই।

কপালকুণ্ডলাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রের মাধ্যমেই একটি নূতন experiment করিলেন। যে নারী সমাজ জীবনের বাহিরে আরণ্যক পরিবেশে এককভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে সে সমাজে আসিলে তাহার মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে ইহাই ছিল বঙ্কিমের জিজ্ঞাসা। কপালকুণ্ডলার কাহিনী সেই জিজ্ঞাসারই শিল্প প্রকাশ। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য উপন্যাসের নাম সঙ্গত ভাবেই 'কপালকুণ্ডলা' রাখিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলাকে বাদ দিলে মতিবিবি এই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু মতিবিবির নামে নামকরণ করা হয় নাই। কারণ মতিবিবি এই উপন্যাসের লক্ষ্য নয় উপলক্ষ্য। ঘটনাবর্তে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তাহার জীবন জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

[খ] ॥ কপালকুণ্ডলা : গঠন-কৌশল ॥

"উপন্যাস পূর্ণাবয়ব মানব-জীবনকে কাহিনীবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে স্বতঃ উদ্ভূত বিশেষ শিল্পরূপ।" উদ্ভবের কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া উপন্যাসের এই শিল্পরূপের রূপান্তর

য়াছে। আধুনিক কালে বিশেষ ভাবে এই শিল্পরূপের যে বিবর্তন ঘটিয়াছে হাতে কোন একটি বিশেষ কাঠামোর মধ্যে এই রূপকে নির্দিষ্ট করিয়া ওয়া চলে না। বিশেষতঃ আধুনিক কালের উপন্যাসের ঘটনাগত প্রাধান্য নকখানি কমিয়া গিয়াছে। সমস্যাসঙ্কুল বর্তমান জীবনের নানা জটিলতা ন্যাসের সুডৌল কাহিনী-গ্রন্থনকে অনেকখানি শিথিল করিয়া দিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে জীবনের এই জটিলতা পাওয়া সম্ভব নহে। তিনি লা উপন্যাস-শিল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী। যে কালে তিনি আবির্ভূত য়াছিলেন, আমরা সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁহাকে বিচার করিতে লে তাঁহার সিদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হই। উপন্যাস সৃষ্টি করিতে বসিয়া হাকে বাংলা ভাষা রীতিও সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই নি শুধুমাত্র দক্ষতা দেখান নাই, উপন্যাসের আঙ্গিক গঠনেও অসাধারণ ফল্য লাভ করিয়াছিলেন। এই কথা স্মরণে রাখিয়াই রমেশচন্দ্র মন্তব্য রিয়াছিলেন: "Bankim Chandra is in prose what Madhu ıdan was in verse—the founder of a new style, the exponent a new idea. In creative imagination, in gorgeous descrip- on, in power to conceive and in skill to describe, Madhu ıdan and Bankim Chandra stand apart from the other iters of the country." —এই গঠন-রীতিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের যে ীয়তা ছিল, সে স্বকীয়তা আপন মানস-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রোমান্স- ণতা বঙ্কিম মানসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ায় তাঁহার গঠন- তিতেও সেই প্রবণতা প্রতিফলিত।

উপন্যাসের প্রধান উপকরণ দুইটি—প্লট এবং চরিত্র। সাধারণত কাহিনীর ই উপন্যাসের আকর্ষণ। কাহিনী বলিতে যে Story বুঝায় তাহা ং প্লট এক বস্তু নহে। Story হইল a narrative of events arran- d in their time-sequence—কাল-মাত্রায় সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবৃতি র Plot হইল a narrative of events, the emphasis falling on suality বা কার্যকারণের উপর জোর দিয়া ঘটনাবলীর বিবৃতি। ইহার ধ্য নাটকের মতই প্রারম্ভ, চরম সঙ্কিক্ষণ এবং সমাপ্তি থাকিবে। অর্থাৎ রম্ভে বর্ণিত কোন ঘটনাপ্রবাহ নানা ঘটনাসংঘাতে চরম সন্ধিক্ষণে উপস্থিত য়া পরিণতির দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়া সমাপ্ত হইবে। সুগ্রথিত গঠন- তির উপর উপন্যাসের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। ই. এম. ফস্টার লন, "It springs mainly form the plot, accompanies it like a ght in the clouds and remains visible after it has departed."

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কোন ঘটনা বা কোন সমস্যার একটি মূল অঙ্কুর থাকে এবং ক্রমে ক্রমে এই অঙ্কুরটি পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। এক কথায় ইহাকে বৃত্তাকার উপন্যাস আখ্যা দেওয়া চলে, কেন না যে বিন্দুতে কাহিনীর সূত্রপাত—কাহিনীর পরিসমাপ্তিও সাধারণতঃ সেই বিন্দুতে। ঘটনার অনিবার্য গতি সেই সমস্যা সমাধানের পথে কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত সমাপ্তি-বিন্দুতে টানিয়া আনে।

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সুকৌশলে সমগ্র কাহিনীর ঐক্য বজায় রাখিয়াই তাঁহার উপন্যাসটিকে গড়িয়া তোলেন। ইহাই বঙ্কিমরীতির বৈশিষ্ট্য। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র এই সাফল্য অর্জন করিয়াছেন।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কপালকুণ্ডলার আর একটি গুণ সমালোচকের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাহা উপন্যাসটির অনবদ্য গঠনকৌশল। উপন্যাসখানি ঠিক একটি গ্রীক ট্র্যাজেডির মত সরল রেখায়, অবিসর্পিত গতিতে সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অনিবার্য বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায় এক নিগূঢ় কলাকৌশল-নিয়ন্ত্রিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হইয়াছে। এমন কি সুদূর মোগল রাজধানীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অন্তঃপুরিকাদের ঈর্ষাদ্বন্দ্ব পর্যন্ত বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার নিয়তির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যে অগ্নিতে সে আত্মবিসর্জন করিয়াছে তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে। চারিদিকের সমস্ত শক্তি যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপাল-কুণ্ডলার অদৃষ্ট-রথকে এক অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার সংসারে অনাসক্তি, স্বামীপ্রণয়বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি সমবেদনা, কাপালিকের অতন্দ্র প্রতিহিংসা, নবকুমারের আশঙ্কা-দুর্বল গভীর প্রেম, পদ্মাবতীর পাষাণ প্রাণে প্রেমমন্দাকিনী ধারার অতর্কিত আবির্ভাব, সর্বোপরি এক ক্রুদ্ধ দৈবশক্তির সুস্পষ্ট অঙ্গুলিসঙ্কেত—এই সমস্ত শক্তি, মানুষ এবং দৈব, সৎ ও অসৎ—একসঙ্গে ভিড় করিয়া যেন রথ-রজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে। একটি ক্ষুদ্রজীবনের বিরুদ্ধে এতগুলি প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ—আমাদের মনকে এক গভীর, সমাধানহীন রহস্যের বেদনায় ব্যথিত করে, নিয়তির দুর্জয় লীলার একটা বিস্ময়কর বিকাশের ন্যায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।"

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে দুইটি কাহিনী আছে—কপালকুণ্ডলা-নবকুমার এবং মতিবিবির কাহিনী। কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের কাহিনী অবিস্তৃত। ইহার ঘটনাস্থল দুইটি। সমুদ্রতীরবর্তী হিজলীর বনপ্রদেশ এবং সপ্তগ্রামের

নবকুমারের গৃহ। নবকুমারের সহযাত্রীরা তাহাকে যে স্থানে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল সেখানে মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না। নবকুমার দেখিল, সেখানে "গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য নাই, পেয় নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাত্মক;"......"অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন,—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্র-গর্জন, আর কদাচিৎ বন্যপশুর রব।" এমনি হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল পরিবেশ ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর যোগাসীন কাপালিকের নিকট নবকুমার আশ্রয়ের জন্য গিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এই কাপালিকের প্রতিপালিতা। অনন্ত সমুদ্রের জনহীন তীরে পথহারা পথিক নবকুমারকে সে পথ দেখাইয়া কাপালিকের কুটিরে লইয়া আসিয়াছিল। পরোপকারী এই কপালকুণ্ডলাই নবকুমারকে বধ্যভূমি হইতে উদ্ধার করিয়া পলায়নের পথ দেখাইয়াছিল। এই আখ্যানাংশে প্রকৃতির অবদানও কম নহে। বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর ভাবে এই প্রকৃতির শক্তি ও মায়াকে কাহিনী সংযোজনায় প্রয়োগ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা সমাজবিচ্ছিন্ন, আরণ্যক। তাহার চরিত্রের মধ্যে প্রকৃতির এই শক্তি এবং মায়া সঞ্চারিত হইয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলার ন্যায় কপালকুণ্ডলাও প্রকৃতিক সৌন্দর্যের সহিত একাত্ম।

ঘটনাচক্রে এই যোগিনীও গৃহিণী হইল। অধিকারী কালী মন্দিরে নবকুমারের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিল। এখন পতিমাত্র তাহার ধর্ম। পতি অনুসরণ করাই স্ত্রীর কর্তব্য। সেই কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গৃহে আসিল। সেখানে 'পরশপাথরের স্পর্শে' যোগিনী গৃহিণী হইল। কিন্তু তখনও কপালকুণ্ডলা মনে করে, "সমুদ্রতীরে সেই বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের জন্যেই এক বৎসর নবকুমারের সংসার করিয়াও তাহার প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। অন্তঃকরণ সম্বন্ধে সে তান্ত্রিকের সন্তান। জীবন বিসর্জনে সে নিঃসঙ্কোচ। জীবনের ভোগাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সে নিস্পৃহ। শ্যামাসুন্দরীর উপকার সাধনে গভীর রাতে বন হইতে ঔষধি তুলিবার মধ্যে সে কোন দোষ দেখিতে পায় নাই। প্রাকৃতিক এই সরলতার ফলে সমাজজীবনে তাহাকে ভীষণ জটিলতার সম্মুখীন হইতে হইল। ভবানীর নির্দেশে আত্মবিসর্জনের মধ্যে সে সকল জটিলতার সমাধান করিল। জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে কপালকুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী নহে জানিয়া নবকুমার তাহাকে আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিল কিন্তু কপালকুণ্ডলা বলিল, "আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ

বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চয় তাই করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব, আমার জন্ম রোদন করিও না।" কপালকুণ্ডলা ফিরিল না। কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমারের সলিল সমাধিতে উপন্যাসের সমাপ্তি হইয়াছে।

ইহা কাহিনীর প্রধান বৃত্ত। এই বৃত্তের স্বল্পতাকে জটিলতর করিয়াছে উপকাহিনীর দ্বিতীয় বৃত্ত। ইহার কেন্দ্রীয় চরিত্র নবকুমারেরই প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। ঘটনা বিপর্যয়ে সে এখন মুসলমানী। মতিবিবি নামেই সে নিজের পরিচয় দিয়া থাকে। সুদূর উড়িষ্যা হইতে আগ্রা পর্যন্ত তাহার কাহিনীর ব্যাপ্তি। ইতিহাসের স্পর্শে এই কাহিনী বেগবান। মূল কাহিনীর মধ্যেও ইহা যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে। মতিবিবির চরিত্র কপালকুণ্ডলার ঠিক বিপরীত। বিদ্যাবুদ্ধিতে সে নিপুণ। জীবনের ভোগাকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে প্রবল। তাহার কামনা-সিদ্ধিতে সে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে। সে আত্মগর্বী। তাহার রূপ-যৌবন এবং বুদ্ধির জন্য সে যুবরাজ সেলিমের পর্যন্ত অনুগ্রহভাজনীয়া। নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলার সঙ্গে এই মতিবিবির সাক্ষাৎ হয় সপ্তগ্রামের পথে চটিতে। চৌদ্দ বৎসর পর নবকুমারের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ। নবকুমারের পরিচয় পাইয়া তাহার মধ্যে ভাবান্তর দেখা গেল। দাসী পেষমণের প্রশ্নের উত্তরে মতিবিবি নবকুমারকে "মেরা শৌহর" বলিয়া পরিচয় দিল।

আসলে মতিবিবির "সুখের তৃষ্ণা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল।" "ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াও" তাহার সেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে নাই। ইন্দ্রিয় সুখান্বেষণে সে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছে, কখনও আগুন স্পর্শ করে নাই। তাহার "হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণী-হৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখনও তাঁহার মনোমুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণ-মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।" দিল্লীর সম্রাজ্ঞী হইবার আশা এবং খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবার পর সে একদিকে আগ্রার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল, অন্যদিকে নবকুমারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করিল। সে সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া নবকুমারের দাসী হইয়া থাকিতে চাহিল। অথচ প্রায় সেই সময়েই কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর নিকট বলিতেছিল, "যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" নবকুমার মতিবিবির প্রস্তাব গ্রহণ না করায় মতিবিবি অন্য পথ ধরিল। তাহাতে সে প্রথমেই নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পরে নবকুমারকে পাইবার মতলব করিল। মতিবিবির তখনকার অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্র অননুকরণীয়

ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন : "মস্তক উন্নত করিয়া, হঠাৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া নবকুমারের মুখপ্রতি অনিমেষ আয়ত চক্ষুঃ স্থাপিত করিয়া, রাজরাজমোহিনী দাঁড়াইলেন। যে অনমনীয় গর্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল ; যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্য শাসন কল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়দুর্বল দেহে সঞ্চারিত হইল। ললাটদেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দেখা দিল ; জ্যোতির্ময় চক্ষু রবিকর মুখরিত সমুদ্র-বারিবৎ ঝলসিতে লাগিল ; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল ; স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না, তুমি আমারই হইবে।"

তাহার এই কুপিত ফণিনী মূর্তি দেখিয়া নবকুমার ভীত হইল। তাহার প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতীকে মনে পড়িল। মতিবিবিই যে পদ্মাবতী ইহা জানিয়া নবকুমার শঙ্কান্বিত হইয়া বাড়ী ফিরিল। মতিবিবি-চরিত্রের এই দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা এই উপন্যাসে জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। কাপালিকের প্রতিহিংসাবৃত্তি তাহাকে সাহায্য করিয়া আরও জটিলতর করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটি কাহিনীকে অতি সুন্দরভাবে সুগঠিত করিয়াছেন। উপকাহিনীটি মূলকাহিনীর বিকাশ এবং বিবর্তনের জন্যই আসিয়াছে। ইহার গতিবেগ মূলকাহিনীর গতিময়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। মতিবিবি মূল কাহিনীটির প্রতি-নায়িকা হিসাবে চিত্রিত হইয়াছে। অতএব দুইটি কাহিনীর একত্র বিকশনে মূল কাহিনীর সুষ্ঠু বিকাশ হইয়াছে।

নানা দৈব ঘটনা এই উপন্যাসের গঠনশিল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। "বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়াছে। একটি বিরাট লোকাতীত শক্তি —তাহা নিয়তি নহে, কিন্তু নিয়তির মতই অপ্রমেয়। ইহা হইতেছে নির্জন প্রকৃতির শক্তি, বিশেষ করিয়া সমুদ্রের প্রভাব। কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রতিপালিতা, কাপালিকের ভীষণতা সমুদ্রের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। কপালকুণ্ডলা কখনও সমুদ্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হয়েন নাই—গার্হস্থ্য জীবনে সর্বদাই অনুভব করিয়াছেন যে, সমুদ্রতীরে বনে বনে ঘুরিতে পারিলে তাঁহার সুখ হয়। নবকুমার তাঁহার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলেও তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহেন নাই। যে সমুদ্রের আহ্বান তাঁহাকে গৃহধর্মের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল তিনি তাহারই কোলে বিলীন হইয়া গেলেন। এমনি করিয়া সমস্ত কাহিনীটিতে

সমুদ্রের প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহারা সম্বন্ধ হইয়াছে প্রকৃতির অঙ্গুলি সঙ্কেতে।" (বঙ্কিমচন্দ্র—ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)। ইহা ছাড়া ভবানীর পাদপদ্মে বিল্বপত্র প্রদান, কপালকুণ্ডলা এবং কাপালিকের স্বপ্ন, ভৈরবীর দৈব নির্দেশ প্রভৃতি এই কাহিনীটিকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। পথের মধ্যে নবকুমারের সঙ্গে চৌদ্দ বৎসর পরে পদ্মাবতীর হঠাৎ দেখা, কপালকুণ্ডলার ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির পত্র-হারানো এবং নবকুমারের তাহা প্রাপ্তি—এই সব ঘটনাকে দৈবনির্ভর মনে না হইলেও ইহাদের আকস্মিকতায় কাহিনী জটিল হইয়াছে। সেকস্পীয়রও তাঁহার নাটকে এই জাতীয় আকস্মিক ঘটনা সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটি চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। নাটকের মতই ইহাতে পঞ্চমাঙ্ক বা পঞ্চমসন্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের গঠন-কৌশলও নাটকের ন্যায়। সেজন্য ইহাকে পকেট-থিয়েটার বলা হয়। এই উপন্যাসের গল্পগুলি নাটকের অঙ্কের ন্যায় বিভিন্ন দৃশ্য বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডকে উপন্যাসের Exposition, প্রারম্ভ বা মুখবন্ধ বলা যায়। এই খণ্ডে নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ, কপালকুণ্ডলা কর্তৃক কাপালিকের বধ্যভূমি হইতে নবকুমারের মুক্তি, অধিকারীর পরামর্শে নবকুমার-কপালকুণ্ডলার বিবাহ, নবকুমারের গৃহাভিমুখে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার যাত্রা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলি এবং মূল ঘটনার এস্থলে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনীর Rising Action বা ঘটনার ক্রমোন্নতি বা প্রতি-মুখসন্ধি বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সপ্তগ্রামের পথে এক চটিতে মতিবিবি-নবকুমারের সাক্ষাৎ, নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলার আগমন, সমাজ-জীবনের পরিবেশে কপালকুণ্ডলার অস্বস্তি, ভবানী কর্তৃক কপালকুণ্ডলার বিল্বপত্র প্রত্যাখ্যানে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলার আশঙ্কা পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছে। আবাল্য বনে প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ সংসার জীবন যে নিষ্কণ্টক হইবে না তাহারই আভাস এখানে পাওয়া যায়। এখানে একদিকে রহিয়াছে কপালকুণ্ডলার সমুদ্রতীরের বনে বেড়াইবার অভিলাষ, ভবানীর নিকট অর্পিত বিল্বপত্র পড়িয়া যাওয়ায় অমঙ্গলের আশঙ্কা, অন্যদিকে মতিবিবির নবকুমারকে "মেরা শৌহর" বলিয়া পরিচয় দান।

ঘটনার এই ক্রমোন্নতি তৃতীয় খণ্ডেও বর্ণিত হইয়াছে। এই খণ্ডে মতিবিবির বিস্তৃত পরিচয় প্রদান, আবাল্য সুখভোগের অতৃপ্ত প্রবল তৃষ্ণা, ভারতবর্ষের

সম্রাজ্ঞীর আসন এবং দিল্লীর সিংহাসন লইয়া ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা, নবকুমারের প্রতি তাহার তীব্রতর আকর্ষণবোধ, সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া নবকুমারের সহিত তাহার পুনরায় সাক্ষাৎ ও নবকুমার কর্তৃক তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে মতিবিবির কুপিতাফণিনীর মূর্তি প্রকাশ, কপালকুণ্ডলার সহিত তাহার স্বামীর চিরবিচ্ছেদের সঙ্কল্পে মতিবিবির গৃহ হইতে বহির্গমন পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে কাপালিকের উপস্থিতিও আভাসিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডে কাহিনী চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অবশ্য একই খণ্ডে যুগপৎ অবরোহ ও পরিণতিও দেখান হইয়াছে। এই খণ্ডের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে পরোপকারী কপালকুণ্ডলার শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশে রাখিবার জন্য ঔষধ আনিবার জন্য গভীর রাত্রে বনে গমন এবং সেখানে আকস্মিকভাবে তাহারই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনারত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ-বেশীর সঙ্গে তাহার আলাপ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে মতিবিবির ক্রিয়াকলাপ, কাপালিকের সাক্ষাৎ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত স্বপ্নদর্শন-এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই তিনটি দৃশ্যেই কাহিনী climax-এ উঠিয়াছে। এখানে একদিকে আছে কপালকুণ্ডলার গতিবিধি সম্বন্ধে নবকুমারের দৃঢ় আপত্তি, অন্যদিকে সন্ধ্যার পর সাক্ষাতের আহ্বান জানাইয়া ব্রাহ্মণবেশীর পত্র। কপাল-কুণ্ডলা এখানে জীবন জটিলতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

এই খণ্ডের বাকী চতুর্থ হইতে নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে যুগপৎ অবরোহ (Denouncement) ও সমাপ্তি (Catastrophe)। একদিকে ব্রাহ্মণবেশীর সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ, কপালকুণ্ডলার নিকট পদ্মাবতীর আত্মপরিচয় দান, পদ্মাবতীর ইচ্ছার প্রকাশ ও তাহাতে কপালকুণ্ডলার সাহায্য কামনা, কাপালিকের অভিসন্ধির প্রকাশ, ভৈরবীর অলৌকিক নির্দেশ, অন্যদিকে কপালকুণ্ডলার চরিত্রে নবকুমারের অবিশ্বাস, কাপালিক কর্তৃক নবকুমারের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ, নবকুমারের কাপালিকের স্বহস্তপ্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরাপান, কাপালিক কর্তৃক পরপুরুষে আসক্ত কপালকুণ্ডলার বধার্থে নবকুমারকে প্ররোচনা দান এবং শেষ পর্যন্ত নবকুমার-কপালকুণ্ডলার কথোপকথন ও উভয়ের জীবনাবসান।

এই উপন্যাসে আছে কতকগুলি ঘটনার মালা গাঁথা। এই ঘটনাই চরিত্রগুলিকে ব্যক্ত করিয়াছে, বিকাশ ঘটাইয়াছে। এই ঘটনাগুলি আবার অধিকাংশই আকস্মিক। মানুষের বাস্তব জীবনেও আকস্মিক ঘটনা ঘটিতে

পারে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অতি নিপুণ কৌশলে এই আকস্মিক ঘটনাগুলিকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আর সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের গঠন-কৌশলের চমৎকারিত্ব। এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা এবং চরিত্রই সপ্তগ্রাম অভিমুখী হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে একটিমাত্র বক্তব্য। তাহা হইল, সমাজ বহির্ভূত আরণ্যক পরিবেশে আবাল্য প্রতিপালিত কোন বনচারী মানুষ সামাজিক জীবনে বেমানান। এই বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিবার জন্য একের পর এক নানা ঘটনা আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অহেতুক বিস্তৃতি নাই, বিরক্তিকর পুনরুক্তি নাই। অতি সংক্ষেপে, আভাসে, ব্যঞ্জনায় একটি কাব্যের মতই অতি নিখুঁতভাবে তিনি তাঁহার বক্তব্যকে প্রকাশ করিয়াছেন।

[গ] ॥ কপালকুণ্ডলা উপন্যাস : ঐতিহাসিক পটভূমিকা ॥

এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কপালকুণ্ডলা উপন্যাস বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসের স্থান এখানে গৌণ। প্রধানত দুই কারণে এখানে ইতিহাস স্থান পাইয়াছে। এক, পর্তুগীজ দস্যুদের উল্লেখে, দুই মতিবিবির চরিত্র প্রকাশে। এই উপন্যাসে মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতীর এক বিশেষ ভূমিকা আছে। তাহার মাধ্যমে ইতিহাস প্রবেশ মূল কাহিনীর গতিপ্রবাহেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে।

উপন্যাসের একেবারে প্রথমেই পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের উল্লেখ রহিয়াছে। তাহাদের ভয়ে তখন যাত্রীর নৌকা একা যাতায়াত করিতে সাহস করিত না। নবকুমার যে নৌকায় গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিতেছিল তাহাও দলবদ্ধ হইয়াই আসিতেছিল।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা যখন উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া কালিকটের বিখ্যাত বন্দরে উপস্থিত হইলেন তখন হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইয়োরোপের খ্রীষ্টান দেশগুলির সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ছাড়াও অন্যান্য ইয়োরোপীয় বণিকদের লুব্ধ দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর পড়িয়াছিল। পরে পর্তুগীজদের বাজারে খুব নাম খারাপ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের ব্যবসারও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তাহাদের অনেকেই তখন ডাকাতি বা বোম্বেটেগিরিতে লাগিয়া গেল। "মানুচির কথা থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে লবণ ব্যবসায়ে পর্তুগীজদের একচেটিয়া অধিকার সত্ত্বেও তারা জলদস্যুবৃত্তি আর জবরদস্তি করে খ্রীষ্টান বানানোয় মেতে ছিল।

বের্ণিয়ের লিখে গেছেন যে, মাঝে মাঝে নদীর মোহানা থেকে দেশের ভিতর অনেক দূর চলে গিয়ে তারা হাট-বাজার লুঠ করত। বিবাহ বা কোন উৎসবে সমবেত গ্রামবাসীদের পাকড়াও করে বান্দা-বাজারে বিক্রী করে দিত।"

"পশ্চিমে দিউ ও দমন থেকে পূর্বে হুগলী পর্যন্ত ভারতের সমগ্র উপকূলেই পর্তুগীজ আস্তানা ছড়িয়ে ছিল। আকবরের যুগে ১৫৭৯ সালে বাদশাহের এক "ফরমান" অনুযায়ী বাংলা দেশে সপ্তগ্রামে তারা কুঠি বানায় এবং সেখান থেকে ক্রমে হুগলীর দিকে এগিয়ে যায়। শাহজাহানের অমালে এদের অনাচার সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুরা স্থানীয় পর্তুগীজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশের ভিতর বহুদূর চলে যেত, আর অনেক গ্রাম উজাড় করে লোক ধরে নিয়ে এসে তাদের ক্রীতদাস করত, জোর করে খ্রীষ্টান বানাত, হাত ফুটো করে তার মধ্যে সরু বেত ঢুকিয়ে যন্ত্রণা দিত। এই দুর্বৃত্তেরা জাঁক করে বলত যে, বারো মাসে তারা যতলোককে খ্রীষ্টান করেছে, দশ বৎসরে সারা দেশে তত লোক খ্রীষ্টান হয় নি; এ খবর লিখেছেন ফরাসী পর্যটক বের্ণিয়ের স্বয়ং। মুঘল সরকারকে ফাঁকি দিয়ে এই পর্তুগীজেরা তামাক এবং অন্যান্য বাণিজ্যবস্তুর উপর জোর করে শুল্ক আদায় করত, হিন্দু ও মুসলমান ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দিত। শোনা যায় এ ভাবে মহিষী মমতাজ মহলের দুজন বাঁদীকে তারা ধরে নিয়ে যায়। ১৬৩২ সালে শাহ্‌জাহান ক্রুদ্ধ হয়ে এদের দমন করার জন্য কাসিম আলি খানকে বাংলার শাসক করে পাঠালেন। তিন মাস অবরোধের পর হুগলী মুঘলদের অধিকারে এল, চার হাজারেরও বেশী পর্তুগীজকে কয়েদে পাঠানো হল, আর তারা যে প্রায় দশহাজার স্থানীয় লোককে বন্দী করে রেখেছিল তারা মুক্তি পেল। বিদেশী বণিকদের স্পর্ধা অন্তত তখনকার মত স্তব্ধ ছিল। (ভারতবর্ষের ইতিহাস—অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।

[কপালকুণ্ডলার কাপালিকের আশ্রয়ে আসিবার পূর্বেকার কথা বঙ্কিমচন্দ্র কিছু বলেন নাই। কেবল উল্লেখ করিয়াছেন, "ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।" উপরে ফিরিঙ্গী দস্যুদের যে পরিচয় দেওয়া হইল তাহাতে সহজে অনুমান করা যায় কপালকুণ্ডলাও তাহাদের দ্বারা অপহৃত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস আসিয়াছে মতিবিবির চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী যখন পিতৃ-পরিবারের সহিত পুরুষোত্তম

দর্শনে গিয়াছিল তখন "পাঠানেরা আকবর শাহ্ কর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল।" মোগল-পাঠানের যুদ্ধের সময় পদ্মাবতীর পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসে পাওয়া যায়: "বহুদিন ধরে বাংলাদেশের খ্যাতি ছিল এই যে, তা হল "বিদ্রোহের জন্মস্থান।" শূর বংশের পতনের সময় বাংলার অধিপতি ছিলেন সুলেমান কররাণী নামে এক আফগান সর্দার। ১৫৭২-৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আকবরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিলেও তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন রাজা। গৌড় থেকে রাজধানী তিনি সরিয়ে নিয়ে যান। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হল উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য অধিকার। কথিত আছে যে সুলেমানেরই সেনাপতি "কালাপাহাড়" পুরীর জগন্নাথ মন্দির আক্রমণ করে বহু বিগ্রহ ধ্বংস করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। সুলেমানের মৃত্যুর পর কিছুদিন গণ্ডগোল চলে, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ পিতৃ-সিংহাসনে বসেই নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিকূলতা আরম্ভ করেন। যখন দাউদ পাটনা এবং গাজীপুরের কাছে আক্রমণ চালান এবং স্থানীয় মুঘল শাসক যখন যথেষ্ট উদ্যম না দেখিয়ে আফগান রাজার সঙ্গে আপস-বন্দোবস্তের চেষ্টা করেন, তখন আকবর বিদ্রোহীকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য স্বয়ং বাংলার দিকে রওনা হয়ে যান (জুন, ১৫৭৪)। পাটনা আর হাজীপুর দখল করতে তাঁর দেরী হয়নি। সবচেয়ে বড় লড়াই হয় সুবর্ণরেখা নদীতীরে (৩রা মার্চ, ১৫৭৫)—এক মাসের মধ্যে দাউদ আত্মসমর্পণে বাধ্য হন, আর অন্তত কিছু কালের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়। (বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ এই যুদ্ধের কথাই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে উল্লেখ করিয়াছেন।) * উড়িষ্যা তখনও আফগানদের হাতে। আবার দাউদ বাংলা দেশ অধিকারের চেষ্টা করায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ১৫৭৬ সালের জুলাই মাসে। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। দাউদ ক্রমাগত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, শাসনব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা নৈপুণ্য ছিল না, ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকেও তিনি অশ্রদ্ধার পাত্র। উড়িষ্যা জয় করতে মুঘলদের আরও সময় লেগেছিল; ১৫৯২ সালে মানসিংহের আঘাতে উড়িষ্যা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।"

ইহার পর আগ্রার কিছু ইতিহাস মতিবিবির চরিত্রপ্রকাশ প্রসঙ্গে আলোচিত

* মতিবিবির যে বয়স উপন্যাসে দেওয়া আছে তাহাতে মনে হয় এই ঘটনার সময় তাঁহার জন্ম হয় নাই। অবশ্য ইহার দ্বারা ঐতিহাসিক বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয় না।

হইয়াছে। তখন আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। মতিবিবির চরিত্রটি কাল্পনিক। বঙ্কিম প্রসঙ্গকার পূর্ণচন্দ্র অনুমান করেন, "কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের 'মতিবিবি' কোনও গৃহস্থের কুলত্যাগিনী বধুর গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়। ইহার চরিত্রের সঙ্গে মতিবিবির কোন সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু ঘটনার সাদৃশ্য আছে।" এই মতিবিবির সঙ্গে যুবরাজ সেলিমের প্রণয় ছিল। উপন্যাসে তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু ইহা ইতিহাস-সম্মত নয়। উপন্যাসে যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে মেহের-উন্নিসারও পূর্বপ্রণয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাও ঐতিহাসিক নহে। সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ্) এবং নূর-জাহানকে লইয়া অজস্র কাহিনী প্রচলিত আছে কিন্তু তাহার অধিকাংশেরই সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। "ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে মুতাঁমিদ খান লিখিত "ইকবাল-নামা-ই-জহাঙ্গরী" গ্রন্থের বিবরণ মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য। নূর-জাহানের নাম প্রথমে ছিল মেহর্-উন্নিসা ; পিতা মির্জা গিয়াস বেগ্ (পরে ইতিমদ্-উদ্-দৌলা) পারস্য থেকে এদেশে আসেন, পথে কান্দাহারে কন্যার জন্ম হয়। গিয়াস বেগ্ আকবর এবং জাহাঙ্গীরের আমলে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। আলিকুলি বেগ্ নামে যে পারসীক বর্ধমানের জায়গির এবং শের আফগান উপাধি পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে মেহর্-উন্নিসার বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীরের কাছে শের-আফগানের বিদ্রোহী মনোভাবের সংবাদ আসায় তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য বাংলার নূতন শাসক কুতব্ উদ্দীনকে পাঠানো হয়। কুতব-উদ্দীন খুন হয়ে যাওয়ায় অনুচরেরা শের-আফগানের দেহ খণ্ডিত করে দেয় এবং মেহর্-উন্নিসাকে বাদশাহের জিম্মায় পাঠিয়ে দেয়। এর নাকি প্রায় চার বৎসর পরে জাহাঙ্গীর মেহর্-উন্নিসাকে দেখে তার সৌন্দর্যে এমনিই অভিভূত হন যে, তাঁকে বিবাহ করে প্রধান মহিষীর স্থলে অভিষিক্ত করেন। বহু কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীর পূর্ব হতেই মেহর্-উন্নিসার অপরূপ রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সেজন্যই শের-আফগানকে পথের কণ্টক মনে করে অপসৃত করে দেওয়া হয়। কিন্তু অনেকে বলেন যে, এ ধরনের কাহিনী হল মনগড়া এবং পরবর্তী যুগে বানানো। অবশ্য এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ভাবে কোন সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। জাহাঙ্গীর ছিলেন বহুবল্লভ ; আনারকলির সঙ্গে তাঁর প্রেমের কাহিনী হল সুবিদিত। মেহর্-উন্নিসা সম্বন্ধে তাঁর আবেগ প্রচণ্ড হলেও আত্মজীবনীতে সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই দেখে সন্দেহ হয় যে সম্ভবত তাঁর মনে এ ব্যাপারে একটা অপরাধ ভাব ছিল।"

/ উপন্যাসে মতিবিবি খাঁ আজিম প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সাহায্যে আকবরের সিংহাসনে তাঁহার উত্তরাধিকারী রূপে সেলিমপুত্র খসরুকে বসাইবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করে। ইতিহাসে এই ষড়যন্ত্রের উল্লেখ আছে। এবং শেষ পর্যন্ত আকবর এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া সেলিমকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান।) ইতিহাসে আছে, আকবরের শেষ জীবনে সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পিতৃসিংহাসন দখল করিবার নানা চেষ্টা করে; এমনকি পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গেও ষড়যন্ত্র করে। আকবরের প্রিয় বন্ধু আবুল ফজলকেও সেলিম হত্যা করে। "যাই হোক, পিতৃস্নেহই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়; অপরাধী সেলিমকে তিনি মার্জনা করেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে পিতাপুত্রে মিলন হলেও আবার সেলিমের ব্যবহারে নীচাশয়তার পরিচয় পাওয়া গেল। আকবর তাকে যেন অশান্ত শিশু ভেবে আবার ক্ষমা করলেন। তিরস্কার করে এবং কিছুকাল নজরবন্দী রেখে কর্তব্য পালন করলেন। ইতিমধ্যে রাজা মানসিংহ এবং অন্যান্য কোন কোন সভাসদ সেলিমের পরিবর্তে তাঁর পুত্র খসরুকে উত্তরাধিকারী ঘোষণার চেষ্টা করলেন। অপর সভাসদদের বিরোধিতায় এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আকবরের পুত্রদের মধ্যে একমাত্র সেলিম তখন জীবিত। উদরাময় রোগে আকবরের যখন মৃত্যু হল (১৭ই অক্টোবর, ১৬০৫), তখন সেলিমই জাহাঙ্গীর উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।" (ভারতবর্ষের ইতিহাস —হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।

(এইভাবে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে নানা ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা নহে, ইতিহাস-রস পরিবেশন করা। রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর ভাবে এই ইতিহাস-রসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সরষে সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই। কারণ, স্বাদই এস্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ্য মাত্র।"

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও ইতিহাসের উপাদান সংগত উপলক্ষ্য মাত্র। অবশ্য

ঐতিহাসিক যে ঘটনাবর্ত বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা ইতিহাসসম্মত। ইতিহাস-সংগৃহীত উপাদানগুলির আহরণ ও পরিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তবে সর্বত্রই ইতিহাসের হুবহু অনুসরণ করিয়াছেন এমন বলা সঙ্গত নহে, কারণ উপন্যাস ইতিহাস নহে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক নহেন। তাই উপন্যাসের প্রয়োজনে কোথাও কোথাও কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তবে তাহা কখনই সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী অতীত ইতিহাসচারণা দ্বারা কাহিনীর জটিলতা এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে।



ঘ] ॥ কপালকুণ্ডলা : রোমান্সধর্মী উপন্যাস ॥

প্রথমেই দেখা যাক রোমান্স কাহাকে বলে। Encyclopaedia Britanica গ্রন্থে Romance কথাটার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে : Originally a composition written in 'Romance' language. This name given to the seven groups of languages, viz. Portuguese, Spanish, Provencal (including catalan), French, Italian, the Rhateo-Romanic idioms and Rumanian. They are called "romance" (from post-classical Latin romance, derived from Latin romances) because their basis is the Latin which was spoken in the Imperium Romanum.

The absence of central plot, and the prolongation rather than evolution of the story, the intermixture of the supernatural ; the presence and indeed prominence of love affairs ; the Juxtaposition of tragic and almost farcial incident , the variety of adventure arranged rather in the fashion of a panorama than otherwise—all these things are in the Odyssey, and they are all, in varrying degrees and measures characteristic of romance."

অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্লটের অভাব, গল্পের বিকশনের পরিবর্তে সম্প্রসারণ, অতিপ্রাকৃতের মিশ্রণ, প্রেম সম্বন্ধীয় ব্যাপারের প্রাধান্য, প্রাহসনিক ঘটনার সন্নিকর্ষ, দুঃসাহসিকতা প্রভৃতি হইল রোমান্সের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এই রোমান্সেরও

বিবর্তন হইয়াছে। ইহা আর বাস্তব বিচ্ছিন্ন নয়। বরং বাস্তবকে রোমান্সের রং-এ ও সৌন্দর্যে পরিমণ্ডিত করিতে চায়, শুষ্ক কঠিন বাস্তবে যাহার একান্ত অভাব।

তথাপি উপন্যাস বা নভেল ও রোমান্স সমার্থক নহে। উপন্যাস প্রবহমান বাস্তব জীবনের দর্পণ আর রোমান্স স্বপ্নসুন্দর কবিকল্পনার পক্ষবিস্তারের দিগন্ত। উপন্যাস অত্যন্ত পরিচিত সমাজ-সংসারের চিত্র, তাহারই বহুবিধ সমস্যার বাস্তব-নিষ্ঠ রূপায়ণ। বর্তমান কালই তাহার বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু রোমান্স অতীতচারী। সমস্যাদীর্ণ, সমস্যাবিক্ষুব্ধ বর্তমান সৌন্দর্যের স্পর্শ দিতে অক্ষম বলিয়াই রোমান্টিক মন বর্তমানের সামান্যতা সীমাবদ্ধতা হইতে পাঠক মনকে অতীতের রহস্যময় পরিবেশে মুক্তি দেয়। দূরগত অতীতের ঐতিহাসিক উপাদান এই রোমান্সসৃষ্টির সহায়ক। তাই রোমান্স-স্রষ্টা অতি যত্নে এই উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে যাহা বিবর্ণ, কল্পনার রাজ্যে তাহাই বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল। কিন্তু তাই বলিয়া রোমান্স বাস্তব সম্পর্ক শূন্য নহে। "আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতি প্রাকৃত বা অবিশ্বাসের কোন স্থান নাই। রোমান্স লেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণ করিতে হয়, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দ্বারা কার্যকারণ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিতে হয়, ইহার বাগানে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটে তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার একমাত্র প্রভেদ যে, বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মতো সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে।"

"বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ রোমান্স রচনা করিয়াছেন; তিনি বাস্তবের ভিত্তিভূমি পরিত্যাগ করেন নাই, আবার বিস্ময়কর ও অলৌকিকের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তিনি বহু উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার সেই সকল চরিত্রের ব্যক্তিত্ব উদ্ঘাটনের উপযোগী কাহিনী রচনা করিয়াছেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সাফল্য অন্যান্য সাহিত্যিককে এই পথে নিয়োজিত করিয়াছে এবং বাঙ্গলাসাহিত্য উপন্যাস-সম্ভারে বিশেষ ভাবে

সমৃদ্ধ, কিন্তু এই কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, পরবর্তী কোন ঔপন্যাসিকই তাঁহার মত কাহিনী রচনা করিতে পারেন নাই।"

(বঙ্কিমচন্দ্র—ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

"রোমান্স রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন প্রধানতঃ দুইটি আধার হইতে। প্রথমতঃ ইতিহাস, দ্বিতীয়তঃ দৈবশক্তি। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে রহস্যময়, দৃঢ়ব্যক্তিত্বশালী মনুষ্যচরিত্র। প্রথম যুগে তিনি ইতিহাস হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে ইতিহাসের মালমসলা খুব বেশি ছিল না। তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে সঙ্কোচবোধ করিয়াছিলেন, 'কপালকুণ্ডলা' ও "মৃণালিনী'র ঐতিহাসিক ভিত্তি আরও কম। ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রাচুর্যই তাঁহার কল্পনাকে সমধিক উদ্বোধিত করিয়াছে।....ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রাচুর্যের জন্যই তিনি মেহের-উন্নিসা ও মতিবিবির বিস্ময়কর সাক্ষাৎকারের পরিকল্পনা করিতে পারিয়াছেন।" (ঐ)

এই উপন্যাসে ইতিহাস গৌণ। নবকুমার কপালকুণ্ডলার কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস কোথাও নাই; আছে চমৎকার ঘটনা-বিন্যাসের অপূর্ব কৌশল। ঘটনার এই চমৎকারিত্বের জন্যই পাঠক মনে কৌতূহল, আবেগ, ভীতি প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাবের সৃষ্টি হয় আর তাহাই রোমান্সের বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস এই উপন্যাসে প্রবেশ করিয়াছে মতিবিবির মাধ্যমে। মতিবিবির চরিত্রে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্যই এই ইতিহাসের প্রয়োজন হইয়াছে। পদ্মাবতীর পিতার সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণের পর অঘটন-ঘটন-পটিয়সী পদ্মাবতীর বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ড দেখাইবার জন্যই ইতিহাসের আশ্রয় প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার দ্বারা রোমান্স-রসই বৃদ্ধি পাইয়াছে। "Irresponsible delight in vigorous events."—ইহাই হইল রোমান্সের রস। 'মানব-জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ যখন বাহিরের ঘটনায় বহু বিচিত্রিত করিয়া দেখান হয় তখন তাহাই হয় রোমান্স।' বঙ্কিমচন্দ্র এই রোমান্স সৃষ্টি করিতে বসিয়া তাহাকে যতদূর সম্ভব বাস্তবের স্পর্শে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এখানেই বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। নবকুমার-কপালকুণ্ডলা-মতিবিবির কাহিনীকে আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যে পটভূমিকায় তাহাদের ঘটনা সংঘটিত করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। (কপালকুণ্ডলাকে সমাজ-জীবন হইতে বাহিরে প্রকৃতির সহিত একাত্ম করিয়া বিস্ময় রস সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন কি কপালকুণ্ডলার পূর্ব পরিচয় পাঠকের নিকট অস্পষ্ট রাখিয়াছেন। সে যেন বৃন্তহীন পুষ্পসম

আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। নবকুমার সমাজে বাস করে। কিন্তু উপন্যাসে তাহার সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও বিশেষ উল্লেখ নাই। বরং তাহাকেও সপ্তগ্রামের একপ্রান্তে অরণ্যের নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "সপ্তগ্রামের এক নির্জন ঔপনাগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না; রাজপথ সকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাতেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।" অতএব কপালকুণ্ডলাকে নিবিড় বনের প্রান্তভাগে নবকুমারের সংসারে স্থাপিত করিয়াছেন। পরবর্তীকালে এই বনেই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হইল। কাপালিক কপালকুণ্ডলার বধার্থে সেই বনে আসিয়া হাজির হইল। মতিবিবি আগ্রার ঐশ্বর্য এবং বিলাসময় জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সপ্তগ্রামে নবকুমারকে লাভ করিবার আশায় আসিল। নবকুমার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সেও কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের চিরবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য বনে উপস্থিত হইল। অতএব নবকুমার-কপালকুণ্ডলা কাহিনীর প্রায় সমস্ত ঘটনাই ঘটিয়াছে অরণ্যপ্রদেশে—সমাজ-জীবন হইতে বহুদূরে, আবার অধিকাংশ ঘটনাই ঘটিয়াছে রাত্রিকালে আলো-আঁধারে—যেখানে বাস্তবের স্পষ্ট আলোক প্রবেশ করে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কবি-কল্পনার আলোকে বাস্তবের স্বল্প-সত্যকে অপরূপ রূপে রঞ্জিত করিয়া একটি সার্থক রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছেন।

"বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সধর্মী প্রতিভার অন্যতম উৎস—দৈবশক্তির লীলা। ইহার প্রথম সার্থক অভিব্যক্তি পাওয়া যায় 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি পালিতা; প্রকৃতিই অতিপ্রাকৃত শক্তির মত তাঁহার চরিত্র গঠন করিয়া তাঁহাকে সমাজবিমুখ করিয়াছে। এই কারণেই কপালকুণ্ডলার চরিত্রে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি ও অতিপ্রাকৃত প্রভাবের পরমাশ্চর্য সম্মিলন হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা স্বামীর সঙ্গে আসিবার সময় দেবীর পদপ্রান্তে বিল্বপত্র উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই বিল্বপত্র পড়িয়া গিয়াছিল; কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন যে, দেবী তাঁহার বিল্বপত্র গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার নবকুমারের সহিত বিবাহ ও নবকুমারের সঙ্গে পলায়ন জগন্মাতার অনুমোদিত নহে। দৈবের এই ইঙ্গিত কপালকুণ্ডলার সংসার বিমুখতাকে তীব্রতর করিয়াছিল। মতিবিবি মুসলমানী; তিনি কোন

প্রকার ধর্মে বিশ্বাস করিতেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই বিচিত্র-চরিত্রা রমণী যেভাবে দিল্লীর ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া নবকুমারের প্রতি আসক্ত হইলেন তাহা অসম্ভাব্য না হইলেও বিস্ময়কর। মতিবিবি নিজেই ইহার ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'ইহা ললাট লিখন।" (ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত) ইহাই ভারতীয় জীবনধর্মের বৈশিষ্ট্য।)

(তাহা ছাড়া কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন, কাপালিকের স্বপ্ন-কথা মতিবিবির নিকট শ্রবণ, অবশেষে দৈববাণী এবং ঊর্ধ্ব আকাশ হইতে ভবানীর স্পষ্ট পথনির্দেশ, এ সকলই দৈববাণীর সংঘটন। কপালকুণ্ডলা কাহিনীর পরিণতিতে কপালকুণ্ডলার আত্ম-বিসর্জনের দৃঢ় সংকল্পে এই দৈবশক্তি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছে।)

("বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের তৃতীয় উৎস খুঁজিয়াছেন মনুষ্য চরিত্রের অভ্যন্তরে, তাঁহার সৃষ্ট অধিকাংশ নরনারীই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, সকলের হৃদয়ই উচ্চসুরে বাঁধা।" কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সৃষ্টি। রমণীর রহস্য-ময়তার এইরূপ চিত্র যে-কোন সাহিত্যে বিরল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আর. ডব্লু. ফ্রেজার কপালকুণ্ডলা উপন্যাস সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "Outside in 'Marriage de Loti,' there is nothing comparable to the 'Kapalkundala' in the history of Western fiction." কপাল-কুণ্ডলার বিচিত্র চরিত্রই এই উপন্যাসকে অনন্যসাধারণত্ব দান করিয়াছে। প্রতি-নায়িকা মতিবিবিও প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী। নবকুমার এই দুই নায়িকার নিকট অনেকটা নিষ্প্রভ। জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোতে অনন্ত সমুদ্রের প্রেক্ষাপটে অপূর্ব সুন্দরী কপালকুণ্ডলার মোহিনী শক্তি দেখিয়া নবকুমার মুগ্ধ। তাহাকে আবার দেখিবার জন্য পরদিন একই সময়ে সে সমুদ্রতীরে অস্থির চিত্তে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করিয়া তাহার সাক্ষাৎ পায় নাই। পরে ঘটনাচক্রে সেই নারীই অভাবিতভাবে তাহার স্ত্রী হইয়া সপ্তগ্রামে আসিয়াছে। সেই নারীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া নবকুমার অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর। কপালকুণ্ডলা স্থির অচঞ্চল। সে তাহার সঙ্কল্পে অটল। মতিবিবিও আবাল্য প্রবল সুখতৃষ্ণায় চঞ্চল। আগ্রার ঐশ্বর্য বিলাসের মধ্যে থাকিয়া, যুবরাজ সেলিম হইতে শুরু করিয়া বহু মানুষের সান্নিধ্যেও তাহার সেই তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই। নবকুমারের প্রতি তীব্রতর আকর্ষণ বোধ করিয়া সে সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে আসিয়াছে। নবকুমারের গৃহিণী নহে, দাসী হইয়া থাকিবার প্রবল আগ্রহে অনেক কাকুতি মিনতি

করিয়াছে। প্রেমের এই জটিল আবর্তে, দুঃসাহসিকতার পরাকাষ্ঠায়, অতি-প্রাকৃতের অপূর্ব মিশ্রণে, বিস্ময়রসের চমৎকার উদ্বোধনে বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' নামে একটি সার্থক রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছেন।)

[৬] ॥ উপকাহিনী সংযোজন ঃ মূল্যায়ন ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই উপকাহিনী আছে। গ্রীক নাট্যাদর্শের বিচারে নাটকে উপকাহিনী নাটকীয় ঐক্যের পক্ষে হানিকর। অবশ্য রোমান্টিক যুগের নাটকে উপকাহিনীর অস্তিত্ব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক নাটক রাজা ও রানী-তেও উপকাহিনী আছে। উপন্যাসেও কাহিনীর ঐক্য আবশ্যক। এই ঐক্য ব্যাহত না হইলে উপন্যাসে উপকাহিনী থাকিতে কোন বাধা নাই। কাহিনী-বৈচিত্র্যের জন্য অনেক সময় এই উপকাহিনীর প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মূল কাহিনীর সার্থক বিকাশের জন্য নানা ভাবে এই উপকাহিনীর সংযোজন করিয়াছেন। "কোথাও উপকাহিনী মূলকাহিনীর ভাব ও রসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আস্বাদে বিচিত্রতা আনিয়াছে, কোথাও মূল কাহিনীর সহিত জীবনজিজ্ঞাসাগত একটা তুলনার প্রত্যয় জাগাইয়া তুলিয়াছে, কোথাও পরিবার-জীবনের উপরে ইতিহাসের ছায়া বিস্তার করিয়াছে, কোথাও ইতিহাসের ঘনঘটার প্রান্তদেশ হৃদয়শোণিতে রঞ্জিত করিয়াছে।"

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মতিবিবির কাহিনী মূল কাহিনীর একেবারে অঙ্গীভূত হইয়া না গেলেও, পৃথক কাহিনীর সম্পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃতি পায় নাই। এই উপন্যাসের চারিটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে মতিবিবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তাহার প্রথম সাক্ষাৎ পাই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে। এই খণ্ডের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে তাহার পরিচয় পাই। তাহার পর সমগ্র তৃতীয় খণ্ড তাহার ইতিবৃত্ত। এই খণ্ডের সাতটি পরিচ্ছেদ। চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় এবং সপ্তম পরিচ্ছেদে আবার মতিবিবির দেখা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি পরিচ্ছেদেও তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। অর্থাৎ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মোট একত্রিশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে মতিবিবির কাহিনী বারটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। পরিধির দিক হইতেও ইহা যে বিস্তৃত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই উপকাহিনীটিকে স্বতন্ত্র ভাবে বিকশিত হইতে দেন নাই। নবকুমার-কপালকুণ্ডলা কাহিনীর স্বল্পতাকে বৈচিত্র্যময় এবং জটিলতর করিবার প্রয়োজনেই মতিবিবির কাহিনীটিকে আনিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

সহযাত্রীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া নবকুমার আশ্রয়ের সন্ধানে কাপালিকের

সম্মুখে গিয়া পড়িল। এই কাপালিকের সঙ্গে বাস করিত একটি নারী, তাহার নাম কপালকুণ্ডলা। সেও "বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। কাপালিক ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধি মানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।" এই কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ হইল কাপালিকের কুটিরে নহে, সমুদ্রতীরে নিবিড় অরণ্য অঞ্চলে। তন্ত্রসাধক কাপালিক নরবলি দেয়। সেজন্ত প্রাণ সম্পর্কে তাহার কোন মায়া নাই। কপালকুণ্ডলা তান্ত্রিকের পালিত সন্তান। সেজন্য তাহারও জীবন সম্বন্ধে কোন মায়া ছিল না। তথাপি নারীর সহজাত করুণা বশে সে প্রথম পথহারা পথিককে পথ দেখাইয়া আনিল। পরে অপূর্ব বুদ্ধি কৌশলে কাপালিকের বধ্যভূমি হইতে নবকুমারকে মুক্ত করিয়া পলায়নের পথ দেখাইয়া চলিল। কপালকুণ্ডলার প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য অধিকারীর পরামর্শে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া সপ্তগ্রামে নিজ গৃহে লইয়া গেল। পথে দস্যু-হস্তে নিগৃহীতা শিবিকাতে বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ একটি স্ত্রীলোকের সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়। এই স্ত্রীলোকটিই মতিবিবি। এই উপন্যাসের উপকাহিনীর নায়িকা। পরে চটিতে কথোপকথন কালে নবকুমারের পরিচয় পাইয়া মতিবিবি বিস্মিত হইল, তাহার ভাবান্তর দেখা দিল। ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল। কারণ, এই নবকুমার মতিবিবির স্বামী। তখন তাহার নাম ছিল পদ্মাবতী। এইভাবে মতিবিবির কাহিনী মূল কাহিনীর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া গেল। তারপর পদ্মাবতী চটিতে কপালকুণ্ডলার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়া নিজের সকল অলঙ্কার পরাইয়া দিল।

নবকুমারের সঙ্গে পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হইল চৌদ্দ বৎসর পরে। এই দীর্ঘ অবসরে পদ্মাবতীর জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। পদ্মাবতী কিরূপে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, মুসলমানী হইবার পর আগ্রার আমীর-ওমরাহ মহলে পদ্মাবতী স্বীয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও রূপ-যৌবনের বলে যে আসন অধিকার করিয়াছিল তাহার পরিচয় দিয়া পাঠকের মনকে উৎসুক করিয়া তুলিলেন। বস্তুত পদ্মাবতীর জীবনের বিচিত্রতা ও জটিলতা কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কম আকর্ষণীয় নহে। মতিবিবি রোমান্সের সার্থক নায়িকা। ইতিহাসের আলো-আঁধারের মধ্যে সে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়াছে। যুবরাজ সেলিমকে নিজের প্রতি অনুরক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী হইবার স্বপ্নকে প্রায় সত্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু মেহের-উন্নিসার অপরূপ

সৌন্দর্যে সেলিমের প্রগাঢ় অনুরাগ তাহাতে বাদ সাধিল। সম্রাজ্ঞী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এইরূপে ব্যর্থ হওয়ায় পদ্মাবতী ওরফে মতিবিবি সেলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার পুত্র খসরুকে আকবরের সিংহাসনে উত্তরাধিকারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবার পূর্বে নবকুমারের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। তাহার অতৃপ্ত আবাল্য সুখতৃষ্ণা নবকুমারের প্রতি ধাবিত হয়। নবকুমারকে ফিরিয়া পাইবার জন্য সে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিল। তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় আগ্রার ঐশ্বর্য ও বিলাসময় জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া সে নবকুমারকে লাভ করিবার জন্য সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিল। ইহার পর হইতে মতিবিবি নবকুমার-কপালকুণ্ডলার কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইল। এইখানে দুইটি কাহিনী মিলিত হইয়া একটি বৃত্ত রচনা করিল।

সপ্তগ্রামে আসিয়া মতিবিবি নবকুমারের নিকট তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিল। এমনকি সে নবকুমারের গৃহিণী নহে, দাসী হইয়া থাকিতে চাহিল। কিন্তু নবকুমার রূঢ়ভাবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। ইহাতে মতিবিবি কুপিতফণিনীর মূর্তি ধারণ করিয়া নবকুমারকে বলিল, "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না…তুমি আমারই হইবে।" "যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্য শাসনকল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয় দুর্বল দেহে সঞ্চারিত হইল।" মতিবিবির এই দলিতফণা ফণিনীর মূর্তি দেখিয়া নবকুমারের পদ্মাবতীকে মনে পড়িল। মতিবিবিই যে পদ্মাবতী তাহা জানিতে পারিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

"ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। নবকুমারের প্রতি প্রেমের বীজ পদ্মাবতীর মনে বহু পূর্বেই রোপিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে পদ্মাবতীর হৃদয়ক্ষেত্র এখন অনন্যপাদপ।" নবকুমারকে লাভ করিবার তাহার দুর্জয় সংকল্প গিয়া পড়িল কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে। দাসী পেষমনের নিকট সে তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিল, "আপাততঃ কপাল-কুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ। পরে তিনি আমার হইবেন।" এই বলিয়া সে নবকুমারের বাটীর অনতিদূরে যে বন আছে তাহাতে প্রবেশ করিল। ঘটনাক্রমে সেখানে সে কাপালিকের সাহায্য পাইল। 'প্রকৃতপক্ষে এই স্থান হইতে উভয় কাহিনী সংযুক্ত হইয়া পরিণাম পর্বের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবির এই দীর্ঘ কাহিনী বলিবার সময় কপালকুণ্ডলাকে

পাঠকের নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছেন। ইতিমধ্যে এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কপালকুণ্ডলা এই এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের সংসারে গৃহিণী। 'স্পর্শ-মণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছিল।' কিন্তু বনচারী কপালকুণ্ডলা ত গৃহিণী হইবার জন্য নহে। সেজন্য সে যখন সংসার করিয়াছে তখন তাহার বিরুদ্ধে অজানিতে বিরাট ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। কপালকুণ্ডলা যখন নবকুমারের বিবাহিতা স্ত্রী রূপে সপ্তগ্রামের দিকে যাত্রা করিয়াছিল তখন কাপালিক এক স্বপ্ন দেখিল। ভবানী বলিতেছেন, "কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার, আমার পূজা করিও না" কাপালিক ভবানীর সেই আদেশ পালন করিবার জন্যই সপ্তগ্রামে আসিয়াছে। মতিবিবি ব্রাহ্মণকুমারের ছদ্মবেশে বনে প্রবেশ করিয়া কাপালিকের নিকট গিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণবেশীকে কপালকুণ্ডলার অহিতকারী জানিয়া ভগ্নবাহু কাপালিক ভবানীর নিকট কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার জন্য তাহার সাহায্য চাহিল। মতিবিবি কপালকুণ্ডলার স্বামীর সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটাইতে চাহিলেও তাহার মৃত্যু কামনা করে নাই। সেজন্য সে রাজী হইল না। কপালকুণ্ডলা ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করিবার জন্য রাত্রে ঔষধ তুলিতে আসিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইল। তাহাদের মুখে নিজের নাম শুনিয়া সে কৌতূহলী হইল। পরে ব্রাহ্মণবেশীও কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া ফেলিল। কিন্তু কাপালিকের সঙ্গে তাহার কথা শেষ হয় নাই বলিয়া সে কপালকুণ্ডলাকে দূরে অপেক্ষা করিতে বলিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কপালকুণ্ডলা গৃহে ফিরিয়া আসিল। সেই রাত্রেই তাহার গৃহ প্রাঙ্গণে সে কাপালিককে দেখিতে পাইল। পরদিন সকালে উঠিয়া সে ব্রাহ্মণবেশীর নিকট হইতে এক পত্র পাইল। কপালকুণ্ডলাকে সে সন্ধ্যার পরে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছে। কপালকুণ্ডলার রাত্রে বনগমন নবকুমারের মনঃপূত ছিল না। তাহার আচরণে নবকুমার ব্যথিত ছিল। ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণবেশীর পত্র তাহার হাতে পড়ায় কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে তাহার গভীর সন্দেহ হইল। কাপালিক নবকুমারের এই সন্দেহকে কাজে লাগাইল। ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার কথোপকথন দূর হইতে দেখিতে পাইয়া নবকুমার ব্রাহ্মণবেশীকে কপালকুণ্ডলার উপপতি মনে করিয়া প্রবল ঈর্ষা বোধ করিল। কাপালিকের প্রস্তাবে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে স্বীকৃত হইল। এদিকে পদ্মাবতীর পরিচয় ও কামনার কথা শুনিয়া কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে ত্যাগ করিবার জন্য স্বীকৃত হইল এবং দৈব নির্দেশে আত্ম-বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হইল। তারপর

কাপালিকের আদেশে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আনিতে গেলে সেখানে তটভঙ্গ হইয়া কপালকুণ্ডলা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল। নবকুমার তাহার জন্য নদীর জলে আত্ম-বিসর্জন দিল।

এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র 'উপন্যাসের দুইটি কাহিনীকে দৃঢ়পিনদ্ধ আখ্যায়িকায় বন্ধন করিয়াছেন'। মতিবিবির উপকাহিনী কাহিনীর মূল ধারার সঙ্গে মিশিয়া দ্রুতবেগে ইহাকে সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছে। মতিবিবির উপকাহিনী ব্যতীত মূল কাহিনীর জটিলতা, দ্রুত বেগ এবং রোমান্সের বিস্তার সম্ভব হইত না। সুতরাং উপকাহিনীটি উপন্যাসের ভাব-ঐক্যকে ব্যাহত করে নাই বরং অপূর্ব সৌন্দর্য দান করিয়াছে। অতএব এ-কথা বলা অসঙ্গত নহে—দুইটি কাহিনীই বঙ্কিম মানসের একই প্রযত্নে সৃষ্টি, উভয়েই আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং এইখানেই দুইটি কাহিনীর উপন্যাসগত তাৎপর্য।

[চ] ॥ অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনা সমাবেশ ॥

উপন্যাস বাস্তব জীবনেরই সুন্দর বিশ্লেষণ। সেখানে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনার কোন মূল্য নাই। তথাপি হ্যামলেটের কথায়, "There are many things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy, Horatio." কখনও কখনও মানব জীবনের উপর এমন এক শক্তির প্রভাব অনুমিত হয় যাহা দুর্জ্ঞেয়, লৌকিক বুদ্ধির দ্বারা যাহার বিচার সম্ভব নয়। অদ্ভুত যোগাযোগকারী সেই ঘটনাকেই মানুষ অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক বলিয়া মনে করে। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে এই ভৌতিক বা অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব বহু দেখা যায়। তিনি এই শক্তিকে মানবিক গুণসম্পন্ন করিয়া বিশ্বাস্য করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাকেই শিল্পীর ভাষায় বলা যায়, "willing suspension of disbelief." জীবনের গভীর সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে লেখককে অনেক সময় অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু যেখানে তিনি এই শক্তিকে চরিত্রের সহিত সুসঙ্গত করিয়া এবং পাঠকের বাস্তববোধকে আঘাত না করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন সেখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে অতিপ্রাকৃত শক্তিকেই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বাহিরের কোন শক্তি নহে, চরিত্রের মধ্যেই তাহা সম্পর্কযুক্ত। তাহাই চরিত্রের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 'সাধারণ জীবন যে এক অলৌকিক ও দুর্জ্ঞেয় শক্তির

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও ইহারই ইঙ্গিতে মানুষের জীবন সুখ-দুঃখের বিচিত্র পরিণামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, সেই গভীর জীবনরহস্যের পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে ব্যক্ত করিয়াছেন।'

নবকুমার-কপালকুণ্ডলার কাহিনীর প্রথম হইতেই এই অলৌকিক শক্তির প্রভাব দেখা যায়। আবাল্য অলৌকিক শক্তির অধিকারী কাপালিকের আশ্রয়ে কপালকুণ্ডলা প্রতিপালিতা। সমাজ-জীবনের রীতি-নীতি সম্বন্ধে সে কিছুই জানিত না। কাপালিকের বধ্যভূমি হইতে নবকুমারকে লইয়া সে যখন নিভৃত বনের ভিতরে অধিকারীর নিকট আসিল তখন অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত দেশান্তরে যাইতে বলিল। সেজন্য অধিকারী প্রথমেই মায়ের অনুমতি লইয়া আসিতে গেল। কপালকুণ্ডলাও তাঁহার সঙ্গে গেল। "অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।" বিল্বপত্র পড়ে নাই। দেবী তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহ কাহাকে বলে কপালকুণ্ডলা তাহাও জানিত না। তখন অধিকারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।" আবাল্য ধর্মীয় প্রভাবে মানুষ হইয়া কপালকুণ্ডলার মধ্যে ধর্মভাব ছিল প্রবল। জগন্মাতা ও শিবের উল্লেখে তাহার বিশ্বাস জন্মিল। 'নবকুমারের সহিত কাপালিক পালিতা সন্ন্যাসিনার বিবাহ হইল।'

কিন্তু নবকুমারের সহিত সপ্তগ্রাম অভিমুখে যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালী প্রণামার্থে গেল। "ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।" কপালকুণ্ডলা ভাত হইল। অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন। এই ঘটনা কপালকুণ্ডলার সংসার জীবনে কণ্টকস্বরূপ হইয়া রহিল। নবকুমারের গৃহে তাহার বিবাহিত জীবন যে সুখের হইবে না ইহা যেন সে ধরিয়া লইয়াছিল। এই ঘটনা তাহার জীবনে অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; নবকুমারের গৃহে শ্যামাসুন্দরীর নিকট সে এই ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিয়াছে, "কপালে কি আছে, জানি না।"…"যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে।' আরণ্যক জীবনের সরলতার সহিত ধর্মসংস্কারের সামঞ্জস্য ঘটায় কপালকুণ্ডলার চরিত্রে অলৌকিকতার প্রভাব স্বাভাবিকরূপে দেখা দিয়াছে। এই নিয়তি সে সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। সেজন্য নব-

কুমারের সংসারে এক বৎসরের অধিককাল "স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে।" তথাপি সংসারের প্রতি তাহার কোন আসক্তি দেখা দেয় নাই।

কপালকুণ্ডলা এবং কাপালিকের স্বপ্নদর্শন অলৌকিকতার আরও নিদর্শন। নিভৃত বনের মধ্যে কাপালিক এবং ব্রাহ্মণবেশীর গোপন আলোচনা শুনিবার পর প্রচণ্ড ঝড় দেখা দিল। এই ঝড় যেন কপালকুণ্ডলার জীবনে ঝড়েরই দ্যোতক। সেই ঝড়ের রাতে কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিল, সমুদ্রে এক ভীষণ ঝড় উঠিল। জটাজূটধারী প্রকাণ্ড এক কাপালিক তাহাকে এবং নবকুমারকে সমুদ্র মধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় ভীষণ সুন্দর ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া সেই তরী ধরিল। কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?" হঠাৎ কপালকুণ্ডলা বলিয়া ফেলিল, "নিমগ্ন কর"। ব্রাহ্মণবেণী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও কথা বলিয়া উঠিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। বলা প্রয়োজন, এই নৌকা হইল নবকুমার। স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী তাহার রক্ষার জন্য আসিয়াছিল। কার্যেও হয়ত সে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে এই ভাবিয়া কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। ব্রাহ্মণবেশীর নিকট কপালকুণ্ডলা কাপালিকের স্বপ্নের কথা শুনিল। সেই স্বপ্নে ভবানী কাপালিককে কপালকুণ্ডলার বলি দিতে আদেশ করিয়াছেন। "স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্ত-মধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন।"

পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া তাহাকে স্বামী-ত্যাগ করিতে বলিল। দৈব-নির্ভরতা হেতু তাহার অন্তরের বৈরাগ্য স্বভাবজ। জীবনের প্রতি ভোগাসক্তিবিহীন কপালকুণ্ডলা পদ্মাবতীর প্রস্তাব শুনিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। "পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন —তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না।" সে ঠিক করিল, "আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

"কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলাও সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জনে তদ্রূপ।···অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল।" নরবলিতে তাহার পরদুঃখ দুঃখিত হৃদয় বিগলিত হইত। ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু আর

কোন কার্যে তাহার ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। সেজন্য যখন ভৈরবী স্বপ্নে তাহাকে জীবন সমর্পণের আদেশ করিয়াছেন, কপালকুণ্ডলা সেই আদেশ পালন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। সাধারণ মানুষ সংসারে প্রণয়রজ্জুতে আবদ্ধ থাকে। সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে তাহারা ভয় পায়। কিন্তু কপালকুণ্ডলার কোন বন্ধনই ছিল না।

কপালকুণ্ডলা যখন আত্ম-বিসর্জনের কথা চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছিল তখন তাহার কোন বাহ্যিক জ্ঞান ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য-দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।" এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র অবাস্তবকেও বাস্তববৎ করিয়া তুলিয়াছেন। সেই সময় কপালকুণ্ডলা যেন ঊর্ধ্ব হইতে এক শব্দ শুনিতে পাইল। তাকাইয়া দেখিল, "যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।" রক্তাম্বরা মুণ্ডমালা গলায় পরিয়া ভৈরবী তাহাকে যেন পথ দেখাইয়া চলিল। কখনও তাহার মূর্তি মেঘে ঢাকা পড়িতেছে আবার কখনো বা চোখের সামনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কপালকুণ্ডলা তাহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।

কাপালিক যখন তাহাকে শ্মশানের দিকে যথার্থ লইয়া চলিল তখনও "কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; যথায় গগন বিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেইদিকে চাহিলেন; দেখিলেন, রণরঙ্গিনী খল খল হাসিতেছে; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন।" "এই অলৌকিক দৃশ্যের সহিত ম্যাকবেথের ছুরিকা-দর্শন বা শূন্য সিংহাসনে ব্যাঙ্কোর ছায়ামূর্তি প্রত্যক্ষ করিবার সাদৃশ্য রহিলেও উভয় চরিত্রের মধ্যে গভীর পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য উভয়ের মানস চরিত্রের ভিন্নতা হেতু সৃষ্ট হইয়াছে। ম্যাকবেথ বিবেক দংশনহেতু অলৌকিক দৃশ্যাদি দেখিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম-সংস্কার হেতু কপালকুণ্ডলা যাহা দেখিয়াছে তাহা তাহারই মনোজগতের প্রতিফলন। যাহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে ইহার সহিত তাহার চিত্তবৃত্তির সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে অতি-প্রাকৃত ঘটনাগুলি বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় নাই, ইহারা নায়িকার অন্তর প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া কাহিনীর মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছে ও এক অমোঘ নিয়ামক শক্তিরূপে তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।"

মানুষ অনেকসময় এই দুর্জ্ঞেয় শক্তিকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কিন্তু তাহার তীব্র আকর্ষণ বা প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারে। আসলে মানুষ যে অবস্থা বা পরিবেশের মধ্যে বাস করে তাহাকে মনের সঙ্গে সব সময় খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না ; ফলে দুইয়ের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সেই দ্বন্দ্বের প্রকাশ এবং প্রতিফলনকে অধিকাংশ সময়েই ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য। লুৎফউন্নিসা তাহাকেই বলে 'ললাট লিখন।' আর ইহাই হইল সেই অদৃশ্য শক্তি, যাহা কপালকুণ্ডলা, কাপালিক, মতিবিবি এবং নবকুমারকে এক রহস্যময় পথে পরিচালিত করিয়াছে এবং কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের প্রাণ বিসর্জনে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই অপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে নিসর্গ মিশিয়া উপন্যাসকে শোকাবহ করিয়া তুলিয়াছে।

[ছ] ॥ ট্রাজেডি পরিকল্পনা : কয়েকটি চরিত্র ॥

গ্রীক "Tragos" শব্দ হইতে ইংরেজী "Tragedy" শব্দটির উৎপত্তি। ট্রাজেডি এই ইংরেজী শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'বিয়োগান্ত' বা 'বিষাদান্ত' ; অর্থাৎ যাহার সমাপ্তি বিয়োগমূলক বা বিষাদমূলক। কিন্তু কোন কাহিনী বিয়োগান্তক বা বিষাদান্তক হইলেই তাহা ট্রাজেডি হয় না। কোন মহৎ জীবনের অপ্রত্যাশিত এবং অবাঞ্ছিত বিপর্যয় এবং দুঃখময় অবসানকে ট্রাজেডি বলা হয়। ইহা একটি কাহিনী কিংবা একটি চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে। বাংলা সাহিত্যে এই ট্রাজিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ইউরোপাগত। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে, আমরা ট্রাজেডি রচনা হইতে দেখি নাই, কেননা ভারতবর্ষীয় জীবন-দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইউরোপীয় ট্রাজেডি-ভাবনার সহিত কালিদাসের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করিয়া শকুন্তলার জীবন-পরিণামের ব্যাখ্যাসূত্রে প্রাচীন ভারতীয় জীবনবোধের পরিচয় দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়া কল্যাণ বিভাসিত আনন্দ-লোকে শকুন্তলা উপনীত হইয়াছে—ইহাই ভারতীয় কবিচিত্তের মূল বিশ্বাস। দুঃখের সাধনা মানুষকে সুন্দর ও মঙ্গলময় আনন্দলোকে পৌঁছাইয়া দেয়। ভারতীয় জীবন-দৃষ্টিতে সমগ্র জীবনকে অখণ্ডরূপে দেখা হয় বলিয়াই জীবনের দুঃখময় খণ্ডরূপকে শেষ পরিণতি বলিয়া কল্পনা করা হয় না। তাই ইউরোপীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ট্রাজেডি বলিয়া কিছুই ছিল না।

ট্রাজেডির জন্মস্থান ইউরোপ। গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটল এই ট্রাজেডির একটি সুন্দর সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন : Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude ; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found is separate parts of the play ; in the orm of action, not of narrative ; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions." অর্থাৎ এই সংজ্ঞার মূল বক্তব্য হইল, ট্রাজেডি এমন একটি সমগ্র ও বিশেষ আয়তনের ঘটনার অনুকরণ—যাহার উদ্দেশ্য হইল করুণ এবং গুরুতর, ভয়ানক রস উদ্রিক্ত করিয়া মানব মনের উক্ত ভাবগুলির মোক্ষণ করা। অ্যারিস্টটল এই সংজ্ঞাটি গ্রীক নাটক সম্পর্কেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার স্বরূপ লক্ষণ সাহিত্য রূপের অন্যান্য বিভাগেও সমভাবে দৃশ্যমান।

অ্যারিস্টটলের ট্রাজেডির সংজ্ঞা লক্ষণকে নিম্নরূপ সূত্রাকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

১। ট্রাজেডি মানবজীবনের কোন **গুরুগম্ভীর ঘটনার** (serious action) অনুকরণ। সেই ঘটনার গুরুত্ব, ব্যাপ্তি এবং বেদনাবোধ এমন হইবে যাহা মানুষের অনুভূতিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিতে পারে।

২। উক্ত গুরুগম্ভীর বিষয় বা ঘটনার শিল্পরূপ হইবে **স্বয়ং-সম্পূর্ণ** (complete in itself)। এই স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঘটনা হইবে স্বাভাবিক এবং সামাজিক। তাহার একটি নির্দিষ্ট আয়তন থাকা চাই।

৩। ট্রাজেডির কাহিনী হইবে **নাটকীয়** (in the form of action, not of narrative), **বর্ণনাত্মক রীতিতে নহে**। উক্তি-প্রত্যুক্তি বা সংলাপের মধ্যেই সেই নাটকীয় রূপ ফুটিয়া উঠিবে।

৪। এই সংলাপের ভাষা হইবে **অলঙ্কৃত বা বৈচিত্র্যময়** (in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play.)।

৫। ট্রাজেডি এমন **আবেগময়** ঘটনা এবং পরিস্থিতির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করিবে যাহা পাঠক চিত্তে যুগপৎ **করুণা ও ভীতির** (pity and fear) সঞ্চার করিবে।

৬। ট্রাজেডির উদ্দেশ্য উক্ত অনুভূতি বা আবেগের করুণা ও ভীতির মাধ্যমে বিমোক্ষণ (catharsis or purgation)।

গ্রীক মহাকাব্য ও নাটক বহুদিন ধরিয়া এই 'ট্রাজিক রস' পরিবেশন করিয়া আসিয়াছে। গ্রীক ট্রাজেডির অন্যতম প্রধান লক্ষণ 'নিয়তিবাদ'; ইংরেজীতে ইহাকেই বলা হয় "Tragedy of fate" অর্থাৎ এক অনির্দেশ্য, অনির্ণেয় রহস্যময় শক্তি ব্যক্তির জীবনের উপর কোন সূত্রে নামিয়া আসিয়া উহাকে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। "In tragedy we are confronted by infinite and the finite, by the unseen pressure of unfathomable forces and by man. These forces being infinite, have a power which far exceeds the power of humanity and they express themselves in ways which pass beyond, or operate on a plane different form, the ordinary morality governing our own lives. (The Theatre and Dramatic Theory : A Nicoll)। এই সূত্রটি কখনও মানবের ইচ্ছাকৃত অপরাধ, কখনও বা অজ্ঞানকৃত নীতিহীন কর্ম। এই দুর্জ্ঞেয় নিয়তি তাই কখনও ব্যক্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া, কখনও সামাজিক ন্যায়নীতির রূপ লইয়া, কখনও বা দেবতার অলৌকিক শক্তির রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কপালকুণ্ডলাকে ট্রাজেডি বলা যায় না। এখানে কোন একটি চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া মানবজীবনের কোন গুরুগম্ভীর ঘটনার উপস্থাপনা নাই। এই উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য বিষয় হইল সমাজজীবন বনাম প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ-জীবনের সঙ্গে কোন তীব্র সংঘাত এখানে দেখা দেয় নাই। নিয়তিবাদে হউক আর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে হউক, যে-কোন ট্রাজেডি নাটকেই একটি মহৎ জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘটিত হয়। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কোন চরিত্রের সেই নাটকীয় মহিমা নাই যাহাকে ট্রাজিক চরিত্র বলা যাইতে পারে। তাহার পরিবর্তে এই উপন্যাসে দেখিতে পাই কতক-গুলি ঘটনার আবর্ত। এই আবর্তই চরিত্রগুলির পরিণাম রচনা করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে এই ঘটনা-সংস্থিতির উপরই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং এই ঘটনা সংস্থিতির উপর ঐশী শক্তিরই বেশী প্রাধান্য দেখা যায়। দৈবনির্দেশে সংঘটিত কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার উপর এই

উপন্যাসের কাহিনী সৃষ্ট হইয়াছে। সেই দৈব-শক্তির সঙ্গে কোন ব্যক্তি বা চরিত্রের কোন সংঘাত নাই, আত্মপীড়ন নাই, অসহায় আত্মসমর্পণের কাহিনী নাই। এক কথায় ট্রাজেডি নাটকে আমরা মানবজীবনের গুরুতর সুখ-দুঃখের যে আলোড়ন অনুভব করি, এই উপন্যাসে তাহা অনুপস্থিত। কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত কোন ব্যক্তি-চরিত্রের বিকাশ এই উপন্যাসে সংঘটিত না হওয়ায় এই উপন্যাসকে ট্রাজেডির সংজ্ঞায় ফেলা যায় না।

উপন্যাসের প্রথমদিকে প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একটি অতিকায় পুরুষ দেখা গিয়াছিল। তিনি কাপালিক। নবকুমারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে এবং নবকুমারের পলায়ন পর্যন্ত তাহার যে ব্যক্তিত্ব দেখা গিয়াছিল পরে আর তাহা দেখা যায় না। বালিয়াড়ির এক শিখর হইতে পড়িয়া কাপালিকের দুই বাহু ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই ব্যক্তিত্বও যেন নষ্ট হইয়া গেল। উপন্যাসের শেষ দিকে নবকুমারের গৃহের নিকটবর্তী বনে আবার কাপালিককে দেখা গেল। কিন্তু এবার সেই তন্ত্রসাধক, ভয়ঙ্কর ব্যক্তিটিকে দেখা গেল না। কাপালিক কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে মতিবিবির সঙ্গে গোপন আলোচনায় রত, শব-সাধনা ছাড়িয়া সে চোরের মত কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিয়া তাহার গৃহের সন্ধান করিল। পরে নবকুমারের গৃহে কাপালিকের স্বীয় উদ্দেশ্য জ্ঞাপন এবং অবিশ্বাসিনী কপালকুণ্ডলা হত্যায় নবকুমারের সাহায্য প্রার্থনা প্রভৃতি কার্য কাপালিকের সেই ব্যক্তিত্ব খর্ব করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে কাপালিক পাঠকের যে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে পরে আর তাহা সম্ভব হয় না।

"কপালকুণ্ডলাকে যদি প্রেমের ট্রাজেডি বলা যায় তবে তাহা তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া ত্রিভুজাকৃতি রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু শেক্স-পীয়রের অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রায় কিংবা হ্যামলেট-ওফেলিয়ায় যেরূপ গভীর আলোড়ন ও হৃদয়বিক্ষোভ আছে, এখানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

পথহারা নবকুমার জ্যোৎস্নার স্বল্প আলোয় সমুদ্রতীরে অকস্মাৎ কপাল-কুণ্ডলার মোহিনী মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বনচারী কপাল-কুণ্ডলা নবকুমারের প্রতি কোন আকর্ষণই বোধ করে নাই। অধিকারীর কাছে শিব ও জগন্মাতার বিবাহের কথা শুনিয়া কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের পরেই নবকুমারের সঙ্গে সপ্তগ্রামের দিকে যাত্রাকালে সে ভবানীর নিকট যে বিল্বপত্র অর্পণ করিয়াছিল

তাহা পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কপালকুণ্ডলার মনে বিবাহিত জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা দেখা দিল। বিধাতার উপর ভরসা করিয়া সে নবকুমারের সংসারে দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু তখন সে বলে, "বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" অতএব কপালকুণ্ডলার নিকট প্রেমের কোন আকর্ষণই ছিল না। পরে অবশ্য স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে, তথাপি সংসারের নানা জটিলতা, এবং সন্দেহ তাহার ভালো লাগে নাই। শ্যামাসুন্দরীর নিকট সে বলিয়াছে, "যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" কপালকুণ্ডলার ছিল স্বভাব-বৈরাগ্য। সে নিরাসক্ত। জীবনের ভোগাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন। অন্তঃকরণ সম্পর্কে সে তান্ত্রিকের সন্তান। বিবাহ যেন তাহার নিষ্কাম ধর্ম পালনের নির্দেশ। তাহার মধ্যে ধর্মভাব প্রবল। ভবানীর ইচ্ছা অনিচ্ছাই তাহার নিকট প্রবল। সেজন্য ভবানীর বিল্বপত্র প্রত্যাখ্যানে সে আশঙ্কিত, আবার ভাবনীর দৈব নির্দেশে সে কাপালিকের পথানুসরণ করিয়া প্রাণ-বিসর্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প। অতএই যাহার জীবনের প্রতি কোন আগ্রহ নাই, মোহ নাই, তাহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কোন ট্রাজেডি হইতে পারে না।

নবকুমার কপালকুণ্ডলার স্বামী। উপন্যাসের প্রারম্ভেই আমরা তাহাকে দেখিয়াছি ধীর, নির্ভীক, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়বান যুবক হিসাবে। প্রকৃতির নিভৃত পটভূমিকায় কপালকুণ্ডলার মোহিনী শক্তি দেখিরা সে মুগ্ধ। তাহাকে আবার দেখিবার জন্য সে অস্থির। সে যেন কপালকুণ্ডলার প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়িয়াছে আর প্রেমে-পড়া মানুষের মতই সে অস্থির চঞ্চল। কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবেই সে ইতস্ততঃ করে। কপালকুণ্ডলা তাহার গৃহে কিরূপে গৃহীত হইবে তাহা লইয়া সে গভীর চিন্তা করে। সমাজ এবং সংসারের এই আশঙ্কায় সে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে একটু প্রেমালাপ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে। পরে কপালকুণ্ডলা তাহার গৃহে সমাদরে গৃহীত হওয়ায় তাহার প্রেমসিন্ধু বাঁধ ভাঙ্গিয়া উছলিয়া উঠিল। সকল সংসার তাহার নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হইল। তথাপি সংসার জীবনে তাহার সেই স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অতি সাধারণ মানুষের মতো সে শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশে রাখিবার জন্য ঔষধ তুলিতে বনে যাওয়ায় কপালকুণ্ডলার চরিত্রে বিচার-বিবেচনাহীন সন্দেহ করে। এই সন্দেহ এবং ঈর্ষাই তাহার ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন এবং অভিভূত করিয়া ফেলে।

ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পাইয়াই "নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল ; পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল ; শেষে বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইতিপূর্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন ; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন ; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরনিবার্য বৃশ্চিক দংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি একদিনের তরে সন্দেহকে স্থান দান করেন নাই। অদ্যও সন্দেহকে স্থান দিতেন না, কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" বঙ্কিমচন্দ্রের জবানীতে ইহা জানিলেও কপালকুণ্ডলার চরিত্রে আমরা সন্দেহজনক কোন কার্য দেখিতে পাই নাই। কাপালিক নবকুমারের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিল। সে সহজেই সুরাসক্ত হইয়া কপালকুণ্ডলার প্রাণ বলি দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইতে লইয়া যাইবার সময় সে বলিয়াছে যে, সে নিজের "হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে" আসিয়াছে। "এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।" আসলে কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের যতটা রূপ-মোহের আসক্তি ছিল ততটা প্রেম ছিল না। এই আসক্তির জন্য তাহার এত চিত্ত-বৈকল্য দেখা দিয়াছিল। আবার পরক্ষণেই কপালকুণ্ডলার মুখে প্রকৃত বিবরণ জানিয়া তাহাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বাহু প্রসারিত করিয়াছে। কপালকুণ্ডলা গঙ্গাবক্ষে পড়িয়া যাওয়ায় নিজেও ঝাঁপ দিয়া পড়িল, আর উঠিল না।

এই উপন্যাসে মতিবিবির চরিত্রই সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সাহসিকতায়, আত্মগর্বে তাহার তুলনা হয় না। তাহার ব্যক্তিত্ব প্রখর ও দীর্ঘস্থায়ী। আগ্রার আমীর-ওমরাহ পর্যন্ত তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল। আবাল্য তাহার সুখের তৃষ্ণা প্রবল। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ঐশ্বর্য, ধন-সম্পদ, গৌরব-প্রতিষ্ঠা ভোগ করিয়াও তাহার সেই তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই। সে কখনও কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার হৃদয় ছিল পাষাণ। চৌদ্দ বৎসর পর তাহার স্বামী নবকুমারকে দেখিয়া সেই পাষাণ মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। আর সেই পাষাণ দ্রব হইতেছিল। নবকুমারের প্রতি তীব্র

আকর্ষণ বোধ করিয়া সে আগ্রার সিংহাসনের লোভ ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে চলিয়া আসিল। সে নবকুমারের গৃহিণী নহে কেবল দাসী হইয়া থাকিতে চাহিল। কিন্তু মুসলমানী জানিয়া নবকুমার তাহাকে গ্রহণ করিল না। কুপিতা ফণিনীর মত তাহার সেই তেজোময়ী মূর্তি দেখিয়া নবকুমার ভীত হইল। তাহাকে পদ্মাবতী জানিয়া শঙ্কিত হইয়া চলিয়া গেল। নবকুমারের প্রতি পদ্মাবতীর প্রেমানুরাগের আমরা পরিচয় পাই; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। নবকুমারের মনে তাহা কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অথচ নবকুমারকে কেন্দ্র করিয়া পদ্মাবতী এবং কপালকুণ্ডলার প্রেম অবলম্বনে ইহাকে একটি ট্রাজেডির রূপ দেওয়া যাইতে পারিত। বঙ্কিমচন্দ্র সেই চেষ্টা করেন নাই। পদ্মাবতী শুধু বলিয়াছে, 'তুমি আমারই হইবে' এবং সে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের চির-বিচ্ছেদ ঘটাইবার কাজে আত্মনিয়োগ করিল। পদ্মাবতীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রথম আলাপেই যোগিনী কপাল-কুণ্ডলা পদ্মাবতীর ইচ্ছা পূরণের জন্য নবকুমারকে ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল। কারণ সে পৃথিবীর সর্বত্র এবং অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিল— কোথাও নবকুমারকে দেখিতে পাইল না। নবকুমার তাহার জীবনে একান্তই বাহ্যিক, তাহার অন্তরে নবকুমার কোন দাগ বসাইতে পারে নাই। পদ্মাবতীর ষড়যন্ত্র বা চেষ্টা এত অল্প আয়াসে সিদ্ধ হওয়ায় তাহারও এই উপন্যাসে আর করিবার কিছু ছিল না। সেও ট্রাজেডির বিষয়বস্তু হইতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির বিক্ষোভ লইয়া তাঁহার উপন্যাস সৃষ্টি করেন নাই বলিয়া আমরা এই উপন্যাসে ওথেলোর ট্রাজিক রস উপলব্ধি করিতে পারি না। "যে ঐশী লীলা মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহারই অলৌকিক ও অপ্রতিরোধ্য প্রভাব তিনি প্রধানতঃ কপালকুণ্ডলার চরিত্র মাধ্যমে পরিস্ফুট করিয়াছেন।" সেজন্য কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে পরিণতি করুণ হইলেও তাহা আমাদের নিকট গভীর শোকাবহ বলিয়া মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এই উপন্যাসে জীবনের রূপ ও রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, ইউরোপীয় আদর্শে তাহাকে ট্রাজেডি করিতে চাহেন নাই।

[জ] ॥ চরিত্র বিশ্লেষণ ॥

...লকুণ্ডলা ॥

(কপালকুণ্ডলা এই উপন্যাসের প্রধান নায়িকা। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই সকল ঘটনা ও চরিত্র আবর্তিত হইয়াছে। উপন্যাসের মূল কাহিনী তাহারই কাহিনী। কপালকুণ্ডলা রহস্যময়ী। বঙ্কিমচন্দ্র ফটোগ্রাফারের ন্যায় এই রহস্যময়ী নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নানা ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। "এক ব্যক্তি নানা ভঙ্গীতে বসিলে বা দাঁড়াইলে ফটো-শিল্পী তাহার ছবি তোলেন; বিভিন্ন ফটো বিভিন্ন ভঙ্গীর কিন্তু আসল মানুষটি এক। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নাই, নানা অবস্থায় চরিত্রের যে ভঙ্গীগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাদের চিত্র আঁকা হইয়াছে ঠিক এমনি রীতিতে। নূতনের মধ্যে পুরাতনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। (নবকুমারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে পরিচয় পাইলাম উহার সাহস, দয়া ও ক্ষিপ্রতার। তারপর অধিকারীর সঙ্গে আলাপে দেখি কপালকুণ্ডলা লৌকিক আচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এমন কি বিবাহ কাহাকে বলে তাহাই জানে না। ইহার পর মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ। নবকুমারকে প্রথম দেখিয়া কপালকুণ্ডলা বিস্মিত হয়েন নাই, কারণ অনুরূপ পুরুষ মূর্তি তাঁহার চোখে আরও পড়িয়াছে। কিন্তু মতিবিবিকে দেখিয়া তাঁহার কিছু বিস্ময় হইল। হয়ত দুই একটি রমণী ইহার পূর্বে তাঁহার চোখে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু তাহাদের সাজসজ্জা এমন অপরূপ নহে, তাহাদের অলঙ্কারের এত ঐশ্বর্যও থাকিতে পারে না। সুতরাং এই মূর্তি রমণীর মূর্তি হইলেও তাঁহার কাছে অপূর্ব। যে বিস্ময় নবকুমারকে দেখিয়া জাগে নাই এইবার তাহাই তাঁহাকে নির্বাক করিয়া দিল। নবকুমার ও মতিবিবিকে প্রথম দেখিয়া কপালকুণ্ডলার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে একটু পার্থক্য দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র অতি উচ্চাঙ্গের কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পরে গহনা দান। কপালকুণ্ডলা গহনা দান করিয়া ফেলিবেন এইরূপ আন্দাজ করা কঠিন নহে; এবং কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক এই কথা বলিয়াই থামিয়া যাইতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গহনাদানে নহে, ভিক্ষুকের ব্যবহারে তাঁহার বিস্ময়ে। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?" সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে তাঁহার অজ্ঞতার ইহা চরম দৃষ্টান্ত।) অপরাপর দৃশ্যের কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

সবাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, একটি দৃশ্য হইতে অপর একটি দৃশ্যে কোন পরিণতির লক্ষণ নাই, কোথাও মৌলিক পরিবর্তন নাই; শুধু ভঙ্গিটি বদলাইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিপালিতা। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লেখকও দুই একটি রমণীর চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন যাহারা সামাজিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাহাদের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার তুলনামূলক সমালোচনা চেষ্টাও কেহ কেহ করিয়াছেন। এই জাতীয় চরিত্র শকুন্তলা, য়া ও মীরাণ্ডা। নৌসিকায়াকে প্রথমেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে], নৌসিকায়া একজন রাজকন্যা এবং তাহার দেশবাসিগণ গ্রীকদের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত না হইলেও তাহাদেরও একটা সমাজ আছে এবং সেই সামাজিক বন্ধনের ছাপ নৌসিকায়ার উপরে আছে। শকুন্তলা ও মীরাণ্ডার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার তুলনা করিলে এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-কৌশলের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে। শকুন্তলা ও মীরাণ্ডা সমাজ হইতে অনেক দূরে মানুষ হইয়াছেন, তবু সেইখানকার প্রধান ব্যক্তি প্রস্পেরো ও কণ্বমুনি লোকাচারে অভিজ্ঞ। (শেক্‌সপীয়র ও কালিদাস নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকে প্রকৃতির প্রভাবকে রূপ দেওয়া খুব কষ্টকর। প্রকৃতিকে পাত্রপাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এইজন্যই বোধ হয় কণ্বমুনি ও প্রস্পেরো প্রভৃতির অবতারণা আবশ্যক হইয়াছে)। শকুন্তলার দুইটি বান্ধবী আছে এবং ঋষি রমণীরাও রহিয়াছেন। শকুন্তলা হংসপাদিকা বা অন্যান্য পুরনারীদের মত চতুরিকা না হইতে পারেন, কিন্তু লোকাচার সম্পর্কে অজ্ঞ নহেন। নর-নারীর প্রেম, বিবাহ, একনিষ্ঠ অনুরক্তি—এই সম্পর্কে তাঁহার স্পষ্ট ধারণা আছে। দুষ্মন্ত যে এত সহজে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন তাহার একটি কারণ তাঁহার সরলতা, অপর কারণ এই যে সংসার সম্পর্কে তাঁহার মোটামুটি জ্ঞান আছে। দুষ্মন্তের প্রণয়সম্ভাষণ কপালকুণ্ডলার উপর ব্যর্থ হইয়া যাইত। কারণ তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে কপালকুণ্ডলার অনেক সময় লাগিত। মীরাণ্ডা সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। মীরাণ্ডা পূর্বে বোধ হয় কোন পুরুষ চোখে দেখেন নাই। (তাঁহার পিতা ছাড়া), তাই ফার্ডিন্যাণ্ডকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ফার্ডিন্যাণ্ডের প্রণয়সম্ভাষণ তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন এবং খানিকক্ষণ পরেই তিনি ফার্ডিন্যাণ্ডকে প্রশ্ন করিলেন, 'My husband, then?" হয়ত ক্যালিবানের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্পেরো তাঁহাকে এই

বিষয়ে অনেকটা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং প্রস্পেরো নিজের যে ইতিহাস তাঁহার কাছে বলিয়াছেন তাহা হইতে তিনি জাগতিক রীতির পরিচয় পাইয়াছেন।

(বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে অনেকখানি সাহস দেখাইয়াছেন। তিনি কপালকুণ্ডলার একমাত্র সহচর করিয়াছেন দুরন্ত নরঘাতী কাপালিককে। তাঁহার কাছে লৌকিক আচার শিখিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কপালকুণ্ডলা আর মিশিয়াছেন অধিকারীর সঙ্গে, যিনি একা একা থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার স্নেহের আদান-প্রদান ছিল, কিন্তু তাঁহার কাছেও পৃথিবীর রীতিনীতি শিখিবার সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল না। অধিকারী ও কাপালিক উভয়েই পূজারী, এবংকাপালিক তদুপরি তান্ত্রিক। ইহার ফলে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে ধর্মবিশ্বাস খুবই গভীর হইয়াছে এবং কাপালিকের কাছে নরবলি দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাঁহার নিজ জীবনের বিশেষ কোন মূল্য নাই। এইজন্যই নবকুমারকে পৌঁছাইয়া দিয়া কপালকুণ্ডলা সেই দুরন্ত কপালিকের কাছে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছেন; ইহার মধ্যে সঙ্কোচহীনার সাহস ও আশ্রয়হীনার দীনতা আছে; কিন্তু আত্মজীবন সম্পর্কে ঔদাসীন্যও আছে। তবে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বাঁচাইতে চাহিলেন কেন? অন্যান্য মানুষের বলি তাহার চোখের সামনেই হইয়াছে; তাঁহাদের আর্তনাদ তাঁহার কানে গিয়াছে। সুতরাং কাপালিকের ধর্মের এই দিকটার বিরুদ্ধে তাঁহার মনে বিদ্রোহ হইয়াছে।) পরোপচিকীর্ষা হইতে এই বিদ্রোহ, না বিদ্রোহ হইতে পরোপচিকীর্ষা তাহা লইয়া তর্ক হইতে পারে। কিন্তু পরের উপকার করিবার ইচ্ছা কখনও লুপ্ত হয় নাই। কাহিনীর চরম ট্রাজেডির মূলেও শ্যামার উপকার করিবার ইচ্ছা। সমুদ্রতীরবাসিনীর দ্বিতীয় অনমনীয় প্রবৃত্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। এই স্বাধীনতার পক্ষচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়াই গৃহধর্মে তাঁহার এত অনাসক্তি। প্রকৃতির তৃতীয় দান নিঃসঙ্কোচ সাহস। ভয়ের মূলে থাকে লৌকিক ভালমন্দবোধ। যাহার সেই ভালমন্দ নাই, তাহার পক্ষে সঙ্কোচেরও কোন কারণ নাই। লোকালয়ে আসিয়া কপালকুণ্ডলা কিন্তু কিছু জাগতিক রীতিনীতি শিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে একটু ভয় বা সঙ্কোচ আসিয়াছিল। এইজন্য ব্রাহ্মণবেশীর প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁহার দ্বিধা হইল। কিন্তু এই দ্বিধা নগণ্য। অন্ধকার রাত্রিতে ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার একটুও ভয় হয় নাই; এলোচুলে ঔষধ আনিতে যাইতেও কোন সঙ্কোচ হয় নাই। (ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

কপালকুণ্ডলা আবাল্য ধর্মীয় প্রভাবে বড় হইয়াছে। "অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টি শাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখ প্লাবিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্যে ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না।" সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী সুখ-দুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা ধর্মীয় বিশ্বাসে তাহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সংসারে তাহার কোন বন্ধন ছিল না। এমন কি নবকুমারের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনেও তাহার মনে কোন দাগ বসে নাই। মতিবিবি তাহাকে স্বামী ত্যাগ করিতে বলিলে সে পৃথিবীর সর্বত্র তাহার অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিল—কোথাও নবকুমারকে দেখিতে পাইল না। সেজন্য সে মতিবিবির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ভৈরবীর স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিবার জন্য আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প করিয়াছে। আত্মবিসর্জনের এই উৎকট চিন্তায় তাহার মন যখন একাগ্র তখন সে দৈববাণী শুনিতে পাইল। 'আকাশমণ্ডলে নবনীরদ নিন্দিত মূর্তি' ভৈবরীকে দেখিতে পাইল। ভৈরবী যেন দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন। আর কপালকুণ্ডলা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া সেই রূপ দেখিতে দেখিতে চলিল। ভৈরবী কপালকুণ্ডলার আচরণে উল্লসিত। এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের পথ অনুসরণ করিবার সঙ্কেত করিতেছেন। আর কপালকুণ্ডলা অদৃষ্ট-বিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার চরিত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে যাহা করিবে বলিয়া ঠিক করে তাহা হইতে তাহাকে বিচলিত করা যায় না। এমন কি জীবনের শেষ সময়ে নবকুমার যখন তাহাকে অবিশ্বাসিনী নহে জানিয়া গৃহে ফিরিতে বলিল তখন সে উত্তর করিল, "ভবানীর চরণেই দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

অতএব কপালকুণ্ডলার চরিত্র গঠনে প্রকৃতির প্রভাব অসীম। প্রকৃতি তাহার চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে তাহাকে

পৃথক করিয়া দেখিবার কোন উপায় নাই। নবকুমার প্রকৃতির এই বৃহৎ প্রেক্ষাপটেই প্রথম কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল। সেই দৃশ্য চমৎকার। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বর্ণনায় বলিয়াছেন, নবকুমার "গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধি তীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণী মূর্তি! কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গভীর অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগর হৃদয়ে ক্রিয়াশীল চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্র নিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুর-জাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে, কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।"

নবকুমারের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কপালকুণ্ডলা যখন সপ্তগ্রামে সমাজ পরিবেশে প্রবেশ করিল তখনও সে প্রকৃতির প্রভাবমুক্ত নহে। কপালকুণ্ডলা শৈশবে দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছিল। তারপর আরণ্যক পরিবেশে কাপালিকের প্রভাবে বড় হইয়াছে। সমাজ সম্বন্ধে তাহার মূলগত কোন ধারণাই ছিল না। শ্যামাসুন্দরী তাহার যোগিনী রূপ অপসারিত করিয়া তাহাকে গৃহিণী করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে। সমাজে পুরুষের সংস্পর্শে আসিলে নারীর অনেক পরিবর্তন ঘটে। সমাজ সংসারের জন্য তাহার আকর্ষণ বাড়ে। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সংসারে প্রায় এক বৎসর কাটাইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে 'সমুদ্র তীরে আলুলায়িতকুন্তল ভূষণহীনা' কপালকুণ্ডলারও পরিবর্তন হইয়াছে। "শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে; স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে, এক্ষণে সে

অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল ভুজঙ্গের ব্যূহতুল্য, আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাজির পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণী সম্বদ্ধ হইয়াছে। বেণী রচনায়ও শিল্প পারিপাট্য রক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস কৌশল পরিচয় দিতেছে। কুসুমদাম পরিত্যক্ত হয় নাই, চতুষ্পার্শ্বে কিরীটমণ্ডলস্বরূপ বেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেশের যে ভাগ বেণী মধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে শিরোপরি সর্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমনও নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তরঙ্গরেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্ধলুক্কায়িত নহে, জ্যোতির্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে, কেবলমাত্র স্থানে স্থানে বন্ধনবিস্রংসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকগুচ্ছ, তদুপরি স্বেদ বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বর্ণ সেই অর্ধপূর্ণশশাঙ্করশ্মিরুচির। এখন দুই কর্ণে হেমকর্ণভূষণ দুলিতেছে; কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে। বর্ণের নিকট সে সকল ম্লান হয় নাই, অর্ধচন্দ্রকৌমুদীবসনা ধরণীর অঙ্গে নৈশকুসুমবৎ শোভা পাইতেছে। তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর; সে শুক্লাম্বর অর্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুভ্র মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।"

নবকুমারের সংসারে আসিবার পরও শ্যামাসুন্দরীকে কপালকুণ্ডলা বলিয়াছে, "সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" এই প্রকৃতিময়তা তাহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক বৎসর সংসার করিবার পরও শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশীকরণের ঔষধ তুলিবার প্রশ্নে কপালকুণ্ডলা নিঃসঙ্কোচে রাত্রে একাকী বনে যাইতে স্বীকৃত হইল, কারণ রাত্রে বেড়ান তাহার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস। সেই অভ্যাসের কথা সে ভুলিতে পারে নাই। বনে যাইতে যাইতে কপালকুণ্ডলার পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল। সেই স্মৃতি রোমন্থনে সে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল।

সমাজ সংসারে স্ত্রীলোকের স্থান তাহার নিকট দাসীত্ব বলিয়া মনে হইয়াছে। পুরুষ এবং স্ত্রীর সংসারে সমানাধিকার না থাকায় তাহার মন বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সংসারে সুখের প্রত্যাশায় মানুষ চাকার মত ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সুখের জন্যই তাহার পক্ষে সংসার ত্যাগ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, আবার "এ সংসার বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু।" কপালকুণ্ডলা এক বৎসর নবকুমারের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়াও সংসারের প্রতি কোন বন্ধন বোধ করিত না। এমন কি লুৎফ-উন্নিসা নবকুমারকে ত্যাগ

করিতে বলিলে কপালকুণ্ডলা "অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন— তথায় নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না।" কপালকুণ্ডলার স্বামী এবং সংসারের প্রতি এই নিস্পৃহ ভাবের মূলেও রহিয়াছে প্রকৃতির প্রভাব।

"এই উপন্যাসের রোমান্টিক উপাদানগুলি—বিজন সমুদ্রতীরের অতুলনীয় মহিমা, কাপালিকের নির্মম ধর্ম-সাধনা—কেবলমাত্র একটা বাহ্য বৈচিত্র্যের উপায়মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই; ইহারা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর একটি গভীর, অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া অসাধারণ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

"The beauty born of murmuring sounds.
Has passed into her face."

কেননা ইহারা সমস্ত রোমান্সের সার, এই সৌন্দর্য-জগতের মধ্যমণি হইতেছে কপালকুণ্ডলার চরিত্র। সুকোমল মাধুর্যের চারিদিকে একটা অনমনীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বেড়া, গার্হস্থ্য সুখভোগের মধ্যে একটা অক্ষুণ্ণ উদাসীনতার সংযম, সামাজিক বিধি-নিষেধের মাঝখানে একটা শান্ত অথচ অদম্য স্বাধীনতা; অথচ কোথাও পুরুষোচিত কঠোরতা বা পরুষতার লেশমাত্র নাই, সর্বত্রই রমণীয় কোমলতা; শিক্ষা-দীক্ষায় বিভিন্ন, কিন্তু অন্তরে একটি চিরন্তনী স্ত্রীমূর্তি (eternal feminine)—এরূপ অতুলনীয় চরিত্র-কল্পনা শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যেও বিরল।") (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

॥ নবকুমার ॥

নবকুমার কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়ক। অবশ্য তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাসের ঘটনা আবর্তিত হয় নাই। উপন্যাসের প্রথম দিকে তাহাকে বরং আমরা একটু সক্রিয় দেখি কিন্তু সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিবার পরই নবকুমার নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ উপন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আমরা কপালকুণ্ডলা উপন্যাস সম্বন্ধেও তাহা বলিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, রাজসিংহ উপন্যাসে নায়ক আছে কিনা জানি না, তবে নায়িকা জেবউন্নিসা। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও নায়ক নবকুমার নামমাত্র, নায়িকা কপালকুণ্ডলাই প্রধান।

নবকুমারকে লইয়াই উপন্যাসের আরম্ভ। সেখানে নবকুমার ধীর, স্থির,

সৌন্দর্যপ্রিয় এবং পরোপকারী এক যুবক। সপ্তগ্রাম নিবাসী এই ব্রাহ্মণকুমার প্রতিবেশীদের সঙ্গে গঙ্গাসাগর তীর্থে গিয়াছিল পুণ্য লোভার্থে নহে, সমুদ্র-সৌন্দর্য দেখিবার জন্য। যাহা সে দেখিয়াছে তাহা জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিবে না। ফিরিবার সময় ঘন কুয়াশায় মাঝি দিক ঠিক করিতে পারিল না, নৌকামধ্যে তখন মহা কোলাহল এবং আর্তনাদ উঠিল কিন্তু নবকুমার তখনো অচঞ্চল ভাবে নাবিককে বলিল, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে —চার পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্যোদয় হইবে। চার পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক ; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।" তারপর নৌকা নিরাপদ হইলে আরোহীরা সৈকতে পাকাদি সমাপন করিতে তৎপর হইল কিন্তু নৌকায় পাকের কাঠ ছিল না। বাঘের ভয়ে কেহ বন হইতে কাঠ আনিতেও সাহস করে নাই। তখন নবকুমার একাই বনে কাঠ আনিতে গেল। কাঠের জন্য তাহাকে বনের ভিতরে বহুদূরে যাইতে হইল। "নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কার্যে অভ্যাস ছিল না ; সম্যক বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না।" নবকুমার ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সহযাত্রীরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে ঠিক প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কারণ এরূপ কাজ মানুষ করিতে পারে নবকুমারের নিকট তাহা ছিল কল্পনাতীত।

এই বিশ্বাসই নবকুমারের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে সহযাত্রীদের বিশ্বাস করিয়াছিল। পরে শবাসনে যোগাসীন কাপালিককেও বিশ্বাস করিল। কাপালিক নিশ্চয়ই তাহাকে বাড়ী ফিরিবার কোন উপায় করিয়া দিবে সেই আশায় কাপালিকের সঙ্গ ছাড়িল না। নতুবা কাপালিকের নৃশংস প্রকৃতির কথা জানিলে সে পলাইতে পারিত। কপালকুণ্ডলাকেও সে বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝিল কপালকুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী হইয়াছে তখন হইতে সে আত্মপীড়ায় দগ্ধ হইয়াছে। নিজের সর্বনাশ নিজে করিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পড়িয়া নবকুমারের বিশ্বাসের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল। নবকুমার "প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না ; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে

জ্বালা। মনুষ্য হৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একেবারে গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে। নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল; পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল, শেষে বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইতিপূর্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরানিবার্য বৃশ্চিক-দংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি একদিনের তরে সন্দেহকে স্থানদান করেন নাই। অদ্যও সন্দেহকে স্থান দিতেন না, কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" তাহার ফলে নবকুমারের মনে তীব্র বেদনাবোধ দেখা দিয়াছে। সে নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিল।

নবকুমার ভাগ্যবিড়ম্বিত। সে রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের পর পদ্মাবতী কিছুদিন পিত্রালয়ে রহিল। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিত। যখন তাহার বয়স তের বৎসর তখন তাহার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় তিনি পাঠান সেনার হাতে পড়িলেন এবং সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। তখন নবকুমারের পিতা বর্তমান ছিলেন। তিনি জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সহিত জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকেও ত্যাগ করিলেন। নবকুমারের সঙ্গে তাহার স্ত্রী পদ্মাবতীর আর সাক্ষাৎ হইল না। নবকুমার বিরাগবশতঃ আর বিবাহ করে নাই।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর পর পথহারা নবকুমার সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে কপালকুণ্ডলার মোহিনী রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। কপালকুণ্ডলা যখন তাহাকে বলিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" তখন তাহার 'হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল'। "সাগর-বসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দরী; হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।" নবকুমার কুটীরে ফিরিয়াও নিস্পন্দ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, "এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র।" পরদিন নবকুমার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই সমুদ্রতীরে সেই মোহিনী

নারীকে দেখিবার জন্য অস্থির হৃদয়ে ব্যর্থ প্রতীক্ষা করিল। কিন্তু কাপালিক যখন তাহাকে রাত্রে বধ্যভূমির দিকে লইয়া চলিল তখন আবার সেই রমণীকে দেখিয়া নবকুমার বিস্মিত হইল। পরে 'সেই মোহিনী—কপালকুণ্ডলা'ই তাহাকে কাপালিকের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া পলায়নের পথে অধিকারীর নিকট লইয়া আসিল। অধিকারী তখন নবকুমারকে কপালকুণ্ডলার প্রাণ রক্ষার কোন উপায় বিবেচনা করিতে বলিল। নবকুমার বলিল "আমার প্রাণদান করিলে যদি কোন প্রত্যুপকার হয়, তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি।" সে অধিকারীর প্রস্তাবে কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল। এমন কি যদি কপালকুণ্ডলার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিবে বলিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার যত্নের কোন ত্রুটি করিল না। অধিকারী প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইল। অর্থাভাবে নিজে হাঁটিয়া চলিল।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া স্বদেশে উপনীত হইল। নবকুমার পিতৃহীন, তাহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। অজ্ঞাতকুলশীলা কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহে সাদরেই গৃহীতা হইল দেখিয়া নবকুমার খুবই আনন্দিত হইল। অনাদরের ভয়ে সে এপর্যন্ত কপালকুণ্ডলার নিকট কোন আহ্লাদ বা প্রণয় লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। কিন্তু সেই আশঙ্কা দূর হওয়ায় "নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উথলিয়া উঠিল।" তাহার নিকট "সকল সংসার সুন্দর বোধ হইল।" কিন্তু এক বৎসরের বেশী তাহার সেই আনন্দ স্থায়ী হয় নাই। তাহার বনচারী 'বউ' সংসারে মন টিকাইতে পারে নাই; প্রকৃতিপালিতা কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির বক্ষেই বিলীন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারের জীবনও শেষ হইয়া গেল। নবকুমারের ভাগ্য বিড়ম্বনার ইতি হইল।

নবকুমার-কপালকুণ্ডলার দাম্পত্য জীবনের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের নিকট উত্থাপিত করেন নাই; আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে যতদূর জানা যায় নবকুমারের মধ্যে রূপাসক্তিই ছিল প্রবল। সমুদ্রকূলে কপালকুণ্ডলার মোহিনীরূপ দেখিয়াই নবকুমারের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। তারপর স্বগৃহে কপালকুণ্ডলা সাদরে গৃহীত হওয়ায় বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত

তাহার হৃদয় তখন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার এই প্রেম রূপজ! শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করিবার জন্য রাত্রে ঔষধ তুলিতে যাওয়ার সময় নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে নিষেধ করিয়াছে। কপালকুণ্ডলার নিকট ব্রাহ্মণ-বেশীর পত্র পড়িয়া নবকুমার ঈর্ষায় দগ্ধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণবেশীকে কপালকুণ্ডলার উপপতি বলিয়া মনে করিল। কাপালিক তাহার এই সন্দিগ্ধ চিত্তকে বশীভূত করিয়া তাহার কাজে লাগাইয়াছিল। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে তাহার কাঁদিবার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছে, "তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি! তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই।...তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" অথচ একটু চেষ্টা করিলেই বা কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিলেই নবকুমার প্রকৃত কারণ জানিতে পারিত। এমন কি পদ্মাবতী যখন তাহাকে ভয় দেখাইল তখন নবকুমারের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

আসলে নবকুমার অবিবেচক ছিল। ঝোঁকের মাথায় সে কাজ করিয়া বসিত। 'সম্যক বিবেচনা না করিয়া' সে কাষ্ঠ আহরণে গিয়াছিল। সেজন্য তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে। অধিকারী কপালকুণ্ডলার প্রাণরক্ষার কোন উপায় বিবেচনা করিতে বলিলে নবকুমার বলিল "আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।" তখন অধিকারী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বাতুল। ইহাতে কি ফল দর্শিবে? তোমারও প্রাণ সংহার হইবে—অথচ ইহার প্রতি মহাপুরুষের ক্রোধোপশম হইবে না।" এই অবিবেচনাই নবকুমারের দাম্পত্য-জীবনে সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল। কপালকুণ্ডলার নিকট ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পড়িয়াই নবকুমার স্থির সিদ্ধান্ত করিল, কপালকুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী। ব্রাহ্মণবেশী তাহার উপপতি। তাহার সহিত নিভৃতে মিলিত হইবার জন্যই কপালকুণ্ডলা রাত্রে বনে গমন করে। অথচ সে একবারও তাহা কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। সে আত্ম-পীড়ন এবং যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল। তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। কপালকুণ্ডলা প্রকৃত বৃত্তান্ত নবকুমারকে বলিল, কিন্তু গৃহে আর ফিরিল না।

নবকুমারের এই অসহায়তা এবং আত্মনির্ভরতার অভাব কিন্তু পদ্মাবতীর সঙ্গে ব্যবহারের সময় দেখা যায় না। দস্যু হস্তে নিগৃহীতা স্ত্রীলোককে নিজের কাঁধে তাহার ভর রাখিয়া নিরাপদে চটিতে লইয়া গিয়াছে। তাহার ভাদ্রমাসের ভরা নদীর ন্যায় অতি সুন্দর রূপ লাবণ্য নবকুমার নিমেষশূন্য চক্ষে দেখিতেছিল। নবকুমার ভদ্রলোক। সেজন্য স্ত্রীলোকটি যখন জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কি দেখিতেছেন?' তখন অপ্রতিভ হইয়া সে মুখাবনত করিল। পদ্মাবতী নবকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার নাম লুৎফ-উন্নিসা। তাহার সহিত নবকুমারের আবার সাক্ষাৎ হইল। সে নবকুমারের দাসী হইয়া থাকিতে চাহে। কিন্তু নবকুমার স্বীকৃত হইল না। সে বলিল "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার ধনসম্পদ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।" নবকুমার তখনও জানিত না এই রমণী তাঁহার পত্নী। সেজন্য সে বলিল, "তুমি যবনী—পরস্ত্রী—তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।" এখানে নবকুমারের এই সংস্কারই প্রধান। এই কারণেই রমণীর হৃদয়ের কাতর অনুরোধও সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছে। লুৎফ-উন্নিসা নবকুমারের চরণযুগল ধরিয়া কাতরস্বরে কহিল, "নির্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।" নবকুমার বলিল, "তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও। আমায় ত্যাগ কর।" লুৎফ-উন্নিসা তখন দলিতফণা ফণিনীর মত সদর্পে বলিল, "এজন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।" সেই মূর্তি দেখিয়া নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে মনে পড়িল। যখন জানিল এই লুৎফ-উন্নিসাই পদ্মাবতী তখন সে অন্যমনে শঙ্কান্বিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। কিন্তু পরবর্তী কালে আমরা নবকুমারের সেই শঙ্কার কোন পরিচয় পাই না। তাহার জন্য সে নিজেও কোন সতর্কতা অবলম্বন করে নাই।

পরবর্তী কালে এই পদ্মাবতীর 'ব্রাহ্মণবেশী' নামে কপালকুণ্ডলার নিকট লিখিত পত্রই নবকুমারের মনে সন্দেহের জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। এখানে নবকুমারের সঙ্গে সেক্‌সপীয়রের ওথেলোর তুলনা করা যায়। ডেসডিমনা খুব সঙ্কট মুহূর্তে তাহার রুমাল হারাইল আর সেই রুমাল গিয়া পড়িল ইয়াগোর হাতে। ইহার সাহায্যে ইয়াগো ওথেলোর মনে ডেসডিমনার চরিত্র

সম্বন্ধে সন্দেহকে দৃঢ় করিল। ডেসডিমনার রুমাল হারানোর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পত্র হারানোর মিল রহিয়াছে। কিন্তু ইয়াগো ওথেলোর মনে পূর্বেই ডেসডিমনার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছিল। নবকুমার পূর্বে কপালকুণ্ডলাকে কোন সন্দেহ করে নাই। আসলে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের অভাবই নবকুমারের চরিত্রের বিপর্যয়ের কারণ। তাহার চরিত্রে বলিষ্ঠতা, আত্মনির্ভরতার অভাব তাহার চরিত্রকে ট্রাজিক করিয়া তুলিতে পারে নাই। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমার নিষ্ক্রিয়, কতকগুলি ঘটনার টানা-পোড়েনে তাহার জীবন দোলায়িত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে সর্বগুণান্বিত নায়কের আদর্শে সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু তাহাকে দোষেগুণে মানবিক করিয়াছেন। তাহার চরিত্রে কোন জটিলতা নাই। ভাবাবেগ তাহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

॥ পদ্মাবতী ॥

পদ্মাবতী নবকুমারের বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু মাত্র তের বৎসর বয়সেই তাহার পিতা সপরিবারে বাধ্য হইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় তাহাকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া নবকুমারের পিতা ত্যাগ করিয়াছিল। নবকুমারের সঙ্গে তাহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার মহম্মদীয় নাম হইল লুৎফ-উন্নিসা। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া "আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য-গীত রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, নীতি সম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। তাঁহার মনোবৃত্তিসকল দুর্দমবেগবতী ; ইন্দ্রিয়দমনের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি।" তাহার পূর্বস্বামী বর্তমান থাকায় ওমরাহেরা কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই। তাহার নিজেরও তেমন ইচ্ছা ছিল না। সে ফুলে ফুলে মধু খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

যুবরাজ সেলিম পর্যন্ত তাহার প্রিয়পাত্র। যুবরাজ লুৎফ-উন্নিসাকে তাঁহার প্রধান বেগমের সহচরী করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, "পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।" যুবরাজের উপর তাহার প্রভাব এত প্রবল হইল যে লুৎফ-উন্নিসা সম্রাজ্ঞী হওয়ার স্বপ্ন দেখিল। কিন্তু

হঠাৎ মেহের-উন্নিসার সৌন্দর্যে সেলিমের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় লুৎফ-উন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিল। সে নিশ্চিত জানিল, আকবরের মৃত্যু হইলে মেহের-উন্নিসার স্বামী শের আফগানের প্রাণান্ত হইবে এবং মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হইবে। লুৎফ-উন্নিসা তখন সেলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। রাজা মানসিংহ এবং প্রধান রাজমন্ত্রী খাঁ আজিমের সহ-যোগিতায় সেলিম পুত্র খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইল। মেহের-উন্নিসা ছিল লুৎফ-উন্নিসার বাল্যসখী। তাহার দাসীত্বে সামান্য পুরস্ত্রী হইয়া থাকা অপেক্ষা কোন রাজপুরুষের সর্বময়ী ঘরণী হওয়া তখন লুৎফ-উন্নিসার নিকট গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ হইল। তাহা ছাড়া প্রতিশোধ লওয়াও তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই ষড়যন্ত্রের কারণেই সে উড়িষ্যায় আসিয়াছিল।

উড়িষ্যা হইতে আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পথেই নবকুমারের সঙ্গে লুৎফ-উন্নিসার প্রথম সাক্ষাৎ এই উপন্যাসে দেখিতে পাই। পথে ভ্রমণকালে লুৎফ-উন্নিসা মতিবিবি নাম ব্যবহার করিত। মতিবিবি তখন দস্যু হস্তে নিগৃহীতা। নবকুমার তাহাকে উদ্ধার করিয়া পরবর্তী চটিতে লইয়া গেল। তখন তাহার বয়স সাতাশ। ভাদ্রমাসের ভরা নদীর মত তাহার রূপ-যৌবন। তাহার বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্য যে-কোন পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্যকারী। মতিবিবি তখন দস্যু হস্তে নিগৃহীতা এবং অসুস্থা হইয়াও মুখরা। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তাহার স্বচ্ছন্দ ভাব। ঐ চটিতেই মতিবিবি কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং কপালকুণ্ডলাকে তাহার অঙ্গের সকল অলঙ্কাররাশি খুলিয়া পরাইয়া দিল। ইহা 'রূপগর্বিতার পরাজয়ের নমস্কার।' পরে সপ্তগ্রাম নিবাসী নব-কুমারের পরিচয় পাইয়া মতিবিবির ভাবান্তর দেখা দিল। সে তাহার মনের ভাব গোপন রাখিবার জন্য ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিল। দাসী পেষমনের নিকট মতিবিবি নবকুমারের পরিচয় বলিয়াছিল, "মেরা শৌহর।"

মতিবিবির "সুখের তৃষ্ণা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল।" সেই তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিবার জন্য সে আগ্রায় আসিয়াছিল। এখানে 'ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, গৌরব প্রতিষ্ঠা সকলই' প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিয়াছে কিন্তু সে একদিনের জন্যও সুখী হয় নাই, এক মুহূর্তের জন্যও কখনও সুখভোগ করে নাই। সে কখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। কেবল তৃষ্ণা বাড়িয়াছে। মতিবিবি পেষমনকে বলিয়াছে,

"আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত, ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই।" নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এই 'রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ' সম্বন্ধে সে আশান্বিত হইয়াছে। সে আগ্রায় কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই। "সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখনও তাঁহার মনোমুগ্ধ করে নাই। এক্ষণে সেই পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।"

মতিবিবির নবকুমার-মুখী চিন্তা পরবর্তী ঘটনায় আরও প্রগাঢ় হইল। খস্রুকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্র আকবর ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। সেলিম জাহাঙ্গীর শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সম্রাট হইয়াছেন। তখনও মতিবিবির এক ভরসা ছিল। মেহের-উন্নিসা যদি জাহাঙ্গীরের প্রতি যথার্থ অনুরাগিণী না হয় তাহা হইলে জাহাঙ্গীর শত শের আফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। সেজন্য মতিবিবি বর্ধমানে মেহের-উন্নিসার মত জানিতে গেল। ইতিহাসে মেহের-উন্নিসার বুদ্ধিবৃত্তির যত প্রশংসা থাকুক না কেন উপন্যাসে মেহের-উন্নিসা লুৎফ-উন্নিসার বুদ্ধির সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। লুৎফ-উন্নিসা অতি সুকৌশলে মেহের-উন্নিসার মনের কথা জানিয়া লইল। মেহের-উন্নিসা যথার্থই জাহাঙ্গীরের অনুরাগিণী। মেহের-উন্নিসা কিন্তু লুৎফ-উন্নিসার মনের কথা জানিতে পারে নাই।

অতএব মতিবিবি আগ্রায় ফিরিয়া আর মন বসাইতে পারে নাই। বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু নবকুমার তাহার ভালবাসার মর্যাদা রাখিল না। এমন কি তাহাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিতেও স্বীকৃত হইল না। তাহাকে যবনী-পুরস্ত্রী বলিয়া অবজ্ঞা করিল। লুৎফ-উন্নিসার "যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারত রাজ্যশাসন কল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়দুর্বল দেহে সঞ্চারিত হইল। স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি লুৎফ-উন্নিসা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।"

লুৎফ-উন্নিসা তেজস্বিনী নারী। সে নবকুমারের অপমানকে সহজে স্বীকার করে নাই। দুই দিন ধরিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিজ কর্তব্যাকর্তব্য স্থির

করিল। তারপর রমণীবেশ ত্যাগ করিয়া পুরুষবেশ গ্রহণ করিল। আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সে নবকুমারের গৃহ-সন্নিকটস্থ বনে প্রবেশ করিল। তাহার ধারণা একবার কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলে নবকুমার পরে তাহারই হইবে। অন্ততঃ নবকুমার যদি জানিতে পারে ইহা বাদশাহেরও ইচ্ছা তাহা হইলে নবকুমার তাহাকে অমান্য করিতে সাহস পাইবে না। লুৎফ-উন্নিসার এই দুঃসাহসিক কার্যে অভাবিত রূপে সহায়ক হইল কপালকুণ্ডলার প্রতিপালক কাপালিক। কাপালিকের অভীষ্ট কপালকুণ্ডলার মৃত্যু। লুৎফ-উন্নিসার যদি ইহাতে অভিমত হয় তাহা হইলে সে লুৎফ-উন্নিসাকে সাহায্য করিবে। লুৎফ-উন্নিসার সুশিক্ষিত মন কাপালিকের কথায় সায় দিল না। সে বলিল, "আমিও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি; কিন্তু যাবজ্জীবন জন্য ইহার নির্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি কিন্তু হত্যার উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না, বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিব।"

লুৎফ-উন্নিসার সুশিক্ষিত মন নিরপরাধ কপালকুণ্ডলাকে নিজ প্রয়োজনেও হত্যা করিতে সায় দেয় নাই। ভয়ঙ্কর স্বভাব কাপালিকের সঙ্গে এখানেই তাহার প্রভেদ। সে কপালকুণ্ডলাকে আত্মপরিচয় দিয়া অকপটে সকল কথাই বলিল। তাহার অভিপ্রায় যে কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চির-বিচ্ছেদ ঘটানো তাহাও গোপন করিল না। সে স্বামী ত্যাগ করিবার জন্য কপালকুণ্ডলাকে কাতর অনুরোধ করিয়াছে। নবকুমারের জন্য কপালকুণ্ডলার কোন বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। স্বামী ত্যাগ করিলে কপালকুণ্ডলাকে লুৎফ-উন্নিসা অট্টালিকা, ধন-সম্পত্তি, বহু দাস-দাসী দিবার লোভ দেখাইল। কপালকুণ্ডলা বলিল, "অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাসদাসীর প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" লুৎফ-উন্নিসা চমৎকৃত হইল, এরূপ আশু স্বীকারের কোন প্রত্যাশা সে করে নাই। মোহিত হইয়া কহিল, "ভগিনী—তুমি চিরায়ুষ্মতী হও, আমার জীবনদান করিলে। কিন্তু আমি তোমাকে অনাথা হইয়া যাইতে দিব না। কল্য প্রাতে তোমার নিকট আমার একজন বিশ্বাস-যোগ্যা চতুরা দাসী পাঠাইব। তাহার সঙ্গে যাইও। বর্ধমানে কোন অতি-

...গা স্ত্রীলোক আমার সুহৃৎ—তিনি তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন। ...নি যে কার্য করিলে তাহার প্রতিশোধ করিবার আমার ক্ষমতা নাই; ...র্দি আমি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সে-ও আমার সুখ।" সে তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কপালকুণ্ডলাকে একটি অঙ্গুরীয় উপহার দিল। এখানে ...র সমবেদনা আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। এখানে আগ্রার নন্দন নরকের এক কেন্দ্রমণি লুৎফ-উন্নিসাকে চেনা যায় না।

আত্মসচেতন, দীপ্তিময়ী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না পদ্মাবতীর চরিত্র কপাল-কুণ্ডলারপার্শ্বে স্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এক বৈপরীত্যের সমাবেশ করিয়াছেন। নবকুমার বা কপালকুণ্ডলার মত তাহার চরিত্র একমুখীন নহে, তাহার চরিত্রে বৈচিত্র্য আছে, জটিলতা আছে। সে এক চিরন্তনী নারী। "সে পুরুষের ভোগকামনাকে উদ্রিক্ত করিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তোলে। এই উপন্যাসের উপকাহিনীর সে নায়িকা। মূল কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়া সে এই কাহিনীর মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। সুখ-তৃষ্ণায় কাতর, তাহার ভালবাসার প্রতিদানের জন্য রক্তশিরাবিশিষ্ট একটি অন্তঃকরণের জন্য সতত চঞ্চল। বঙ্কিমসাহিত্যে পদ্মাবতী একটি অত্যুজ্জ্বল চরিত্র। কপালকুণ্ডলা উপাখ্যানে সে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র। রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে, রোমান্টিকতায়, দুঃসাহসিকতায় সে অনন্য। কিন্তু বঙ্কিমের সৃষ্টিতে সে উপেক্ষিতা। তাহার ভালবাসা উদ্দাম। ভালবাসার জন্য সে চরম মূল্য দিতে জানে। তথাপি বঙ্কিম উপন্যাসে তাহার সেই মূল্য স্বীকৃত হয় নাই। সারা জীবন সে শুধু জ্বালা এবং অস্থিরতা ভোগ করিয়াছে। প্রেম পায় নাই, শান্তি পায় নাই। কপালকুণ্ডলার সলিল সমাধিতে সব শেষ হইয়াছে। মতিবিবির কেবল রহিয়াছে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ। তাহার কাহিনী অপরিণত! আমরা মতিবিবির শেষ দেখিতে পারি নাই।

॥ মেহের-উন্নিসা ॥

মেহের-উন্নিসা কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উপকাহিনীর একটি চরিত্র। মূল-কাহিনীর সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। মেহের-উন্নিসা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। সে লুৎফ-উন্নিসার বাল্যসাথী এবং পরবর্তী কালে প্রতিদ্বন্দ্বিনী। ৎফ-লুউন্নিসার চরিত্রকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই ঐতিহাসিক মেহের-উন্নিসার

চরিত্রায়নের প্রয়োজন হইয়াছে। উপন্যাসের একটিমাত্র দৃশ্যে এই চরিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে। এখানে "বঙ্কিমচন্দ্র ফটোগ্রাফারের কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। একটি মুহূর্তে মেহের-উন্নিসার মনের কপাট খুলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেন ক্যামেরা লইয়া অলক্ষিতে উপস্থিত ছিলেন; মেহের-উন্নিসার হৃদয়ের গোপন কথার প্রতিচ্ছবি লওয়া হইয়া গেল। এই মুহূর্তটি ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু ইহার মধ্যে মেহের-উন্নিসার চরিত্র সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি পাইয়াছে। মেহের-উন্নিসার রূপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন নূরজাহান। রঙমহালের অধিকাংশ রমণীই রূপসী, সুতরাং শুধু রূপের ঐশ্বর্য মেহের-উন্নিসাকে এত বিশ্ববিশ্রুত করিতে পারিত না। রূপের আলো হইতে অধিকতর উজ্জ্বল ছিল তাঁহার মনের আলো এবং ইহারই জন্য তিনি বাদ্‌শাহেরও বাদ্‌শাহ হইতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই মনের আলো তাঁহার উপন্যাসে প্রতিফলিত করিয়াছেন। দুই একটি কথাতে মেহের-উন্নিসার হৃদয়ের বিস্তৃতির, কল্পনার লীলা ও মতিবিবি হইতে তাঁহার পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। মতিবিবি মেহের-উন্নিসার রূপের প্রশংসা করিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, উপযুক্ত চিত্রকরের অভাবে তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের প্রতিচ্ছবি থাকিবে না। মেহের-উন্নিসা মতির মত চটুলস্বভাব বা প্রগল্‌ভা নহেন। মতির চতুর প্রশংসা তিনি চতুরতর প্রশংসার দ্বারা ফিরাইয়া দিলেন না। তিনি খুব সহজ সাধারণভাবে উত্তর করিলেন, 'কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।" এই সকল অর্ধ-অন্যমনস্ক উত্তরে মেহের-উন্নিসার হৃদয়ের বিস্তৃতির পরিচয় রহিয়াছে। তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন না, সৌন্দর্যের সীমানা সম্পর্কেও তাঁহার মন খুব সচেতন ছিল। এই মাত্রাবোধ ছিল বলিয়াই ভারত শাসনে তাঁহার অচলকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শেষ জীবনে এই মাত্রাবোধ চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই তিনি শাহজাদা খুররমের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

সেলিমের প্রতি মেহের-উন্নিসার মনোভাবও অতি কৌশলের সহিত ব্যক্ত হইয়াছে। ইতিহাসে কথিত আছে যে, শের আফগানের সহিত বিবাহের পূর্বেই মেহের-উন্নিসা সেলিমের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তখনই সেলিম তাঁহার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শের আফগানের বধের পর মেহের-উন্নিসা যখন রাজপ্রাসাদে আসিলেন তখন অনেক বৎসর পর্যন্ত তিনি স্বামী-

হন্তাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তাহার পরে তিনি জাহাঙ্গীরের বেগম হইলেন এবং শাহজাদা খুরম প্রধান হওয়া পর্যন্ত তিনিই ভারতের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিণতির অতি অপরূপ পূর্বাভাস দিয়াছেন। এই উপন্যাসে দেখিতে পাই যে, মেহের-উন্নিসা কায়মনোবাক্যে পতিপ্রাণা; তিনি সদর্পে ঘোষণা করিতেছেন যে,স্বামীহন্তাকে তিনি কখনও ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু তাঁহার অলক্ষিতে সেলিমের প্রতি তাঁহার গোপন প্রণয় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন যে, সেলিম দিল্লীর বাদ্‌শাহ হইয়াছেন। এই সংবাদটি মনের সঙ্গে যাচাই করিয়া লইবার সময় পাইলেন না। কল্পনা বুদ্ধির পূর্বগামী; মানসচক্ষে তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন ও তাহার পরিণতির চিত্র খেলিয়া গেল। তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিলেন, "সেলিম দিল্লীর সিংহাসনে আর আমি কোথায়?" মতিবিবির কাছে ভবিষ্যতের চিত্র স্পষ্ট হইয়া পড়িল; তিনি বুঝিলেন যে, হৃদয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষার কাছে বুদ্ধি ও নীতিকে একদিন হার মানিতেই হইবে। মেহের-উন্নিসা ও মতিবিবি উভয়েই প্রখর বুদ্ধি-শালিনী কিন্তু উভয়ের বুদ্ধিতে পার্থক্যও প্রচুর। মতিবিবির বুদ্ধির প্রখরতা দেখা যায় অতি সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে। তাঁহার হৃদয়ে কোন প্রশস্ত, উদার কল্পনার স্থান নাই। সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে মতিবিবির জয় হইল বটে; কিন্তু মেহের-উন্নিসা যে তাঁহার অপেক্ষা কত বড় তাহাও প্রমাণিত হইল।" (ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

॥ কাপালিক ॥

কাপালিক কপালকুণ্ডলার প্রতিপালক। দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত কপালকুণ্ডলাকে পাইয়া কাপালিক তাহাকে "আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।" কাপালিকের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। 'পরিধানে কোন কার্পাস বস্ত্র আছে কিনা, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দূল চর্ম আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতে ছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে" আসিয়া দেখিল, "জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন…সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া

রহিয়াছে—এমন কি যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে।"

কাপালিক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। তন্ত্রসাধনায় মোক্ষলাভই তাহার একান্ত কাম্য। তাহার সাধনা যত নৃশংস হউক না কেন, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ইহাতে মানুষের সত্যকারের মঙ্গল। সেজন্য পথহারা, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লান্ত অসহায় নবকুমারকে দেখিয়া কাপালিকের মনে হইল তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমন ভবানীর একান্ত ইচ্ছা। তিনিই নবকুমারকে কাপালিকের নিকট পাঠাইয়াছেন। কারণ তাহার বিশ্বাস মানুষ দৈবশক্তিরই ক্রীড়নক। তান্ত্রিকের পূজায় নরমাংসের প্রয়োজন। সেজন্য কাপালিক দুই দিন পরে নবকুমারকে পূজার স্থানে বধার্থ লইয়া চলিল। নবকুমার পূর্বে তাহা জানিতে পারে নাই। পরে জানিতে পারিয়া কাপালিকের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য বল প্রকাশ করিল। কিন্তু "এ বয়সেও কাপালিক মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে।" সে নবকুমারকে বলিল, 'মূর্খ! কি জন্য বলপ্রকাশ কর? তোমার আজি জন্ম সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?' ইহাই কাপালিকের দৃঢ় বিশ্বাস। সাধারণ মানুষ এই মতকে পৈশাচিক মনে করিলেও কাপালিকের ইহাই স্থির মত। সেই মত-বিশ্বাসে কাপালিক তখন দৃঢ়সংকল্প। কপাল-কুণ্ডলাকেও কাপালিক আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিল। নবকুমারের সঙ্গে সে পলায়ন না করিলে শীঘ্রই তাহা পূর্ণ করিত।

কাপালিকের অসাধ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু দৈব তাহারও প্রতিকূল হইয়াছিল। সেজন্য পলাতক কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমারের সন্ধানে সে এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিয়াছিল। "কাপালিক এক পার্শ্ব দিয়া উঠিল, তাহার অন্যতম পার্শ্বে বর্ষার জলপ্রবাহে স্তূপমূল ক্ষয়িত হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না, শিখরে আরোহণ করিবামাত্র কাপালিকের শরীর ভারে সেই পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া অতি ঘোর রবে ভূপতিত হইল। পতনকালে পর্বত শিখরচ্যুত মহিষের ন্যায় কাপালিকও তৎসঙ্গে পড়িয়া গেল।" তাহাতে কাপালিকের দুই বাহু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বর্তমানে 'বাহুদ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল নির্বাহের কোন বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ইহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এখন ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।"

কাপালিক নরঘাতক হইলেও ভণ্ড নহে। সে তাহার অপরাধের কথা নিজেই স্বীকার করিয়াছে। বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া সে যখন অসুস্থ অবস্থায় পড়িয়াছিল তখন সে এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কাপালিক নবকুমারকে তাহার গৃহে বসিয়া সেই স্বপ্নের কথা বলিয়াছিল, "যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রূকুটি করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন; কহিতেছেন, 'রে দুরাচার! তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজায় এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্বকৃত ফল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখন পূজা গ্রহণ করিব না।' তখন আমি রোদন করিয়া জননীর চরণে অবলুণ্ঠিত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার, আমার পূজা করিও না।"

কপালকুণ্ডলাকে সে পাপীয়সী মনে করে। কারণ ভবানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কাজ করিয়াছে। কাপালিক বহু সন্ধানে এই পাপীয়সীর আবাসস্থান জানিতে পারিয়াছে। কপালকুণ্ডলাকে ভবানীর নিকট বলি দিবার জন্য কাপালিকের একজন সহকারী আবশ্যক। কিন্তু কাপালিক এই পর্যন্ত কোন সহকারী সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কারণ তাহার মতে "মনুষ্যবর্গ ধর্মে অল্পমতি—বিশেষ কলির প্রাবল্যে যবন রাজা, পাপাত্মক রাজ-শাসনের ভয়ে কেহই এমত কার্যে সহচর হয় না।" সে সপ্তগ্রামে নবকুমারের গৃহের নিকটস্থ বনে আসিয়া ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীরও সাহায্য চাহিয়াছিল। তাহারা দুইজনেই কপালকুণ্ডলার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তথাপি ব্রাহ্মণবেশী কাপালিকের কথায় কপালকুণ্ডলাকে হত্যা করিতে সম্মত হইল না। তখন কাপালিক নবকুমারের সাহায্য চাহিল।

কপালকুণ্ডলার চরিত্রে সন্দিগ্ধচিত্ত নবকুমারের দুর্বলতার সুযোগ কাপালিক লইল। নবকুমারের সন্দেহকে আরও দৃঢ়তর করিল। কাপালিক বলিল, 'কল্য রাত্রে নিকটস্থ বনে হোম করিতেছিলাম, স্বচক্ষে দেখিলাম কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হইল। অদ্যও সে তাহার সাক্ষাতে যাইতেছে। দেখিতে চাও, আমার সহিত আইস, দেখাইব।"

তারপর নবকুমারকে বলিল, "বৎস! কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা—আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব। সে-ও তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী —তোমারও বধযোগ্যা, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য প্রদান কর। এই অবিশ্বাসিনীকে ধৃত করিয়া আমার যজ্ঞস্থানে লইয়া চল। তথায় স্বহস্তে ইহাকে বলিদান কর। ইহাতে ঈশ্বরের সমীপে যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার মার্জনা হইবে; পবিত্র কর্মে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইবে, বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে। প্রতিশোধের চরম হইবে।" নবকুমারকে সন্দেহচিত্ত করিয়া তুলিবার জন্য কাপালিক মিথ্যা এবং উত্তেজক সুরার আশ্রয় লইয়াছিল। অবশ্য কাপালিক জানিত না ব্রাহ্মণবেশী আসলে পদ্মাবতী। তথাপি ব্রাহ্মণকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার মিলনের কথাটি মিথ্যা। বরং ব্রাহ্মণ-কুমারের সঙ্গে কাপালিকের যে কথা হইয়াছিল তাহা যদি সে বলিয়া দিত তাহা হইলে নবকুমারের মনে এতটা সন্দেহ হইত না। সেজন্য উপন্যাসের প্রথম দিকে পাঠকচিত্তে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করিলেও এখানে তাহাকে একজন সাধারণ নরঘাতক ষড়যন্ত্রকারী বলিয়াই বোধ হয়।

কাপালিক দূর হইতে ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার কথোপকথন দৃশ্য নবকুমারকে দেখাইল। কপালকুণ্ডলার আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি ব্রাহ্মণ-বেশীর পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পড়িতেছিল দেখিয়া নবকুমার উন্মত্তপ্রায় চিত্তে মাটিতে বসিয়া পড়িল। কাপালিক স্বহস্ত প্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা ভবানীর প্রসাদ বলিয়া নবকুমারকে বার বার পান করাইয়া তাহার স্নেহের অঙ্কুর পর্যন্ত উন্মূলিত করিয়া দিল। তথাপি কপালকুণ্ডলা যখন কাপালিককে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা, তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?" তখন কাপালিক করুণার্দ্র মধুময় স্বরে বলিল, "বৎসে, আমাদিগের সঙ্গে আইস।" কাপালিকের এই মানবিক ভাব পাঠকের সহানুভূতি দাবি করে।

॥ অপ্রধান চরিত্র ॥

॥ অধিকারী ॥

কাপালিকের ন্যায় অধিকারীও শক্তিসাধক। কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে প্রতিপালন করিলেও তাহার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার কিরূপ ব্যবহার ছিল

আমরা তাহা দেখিতে পাই নাই। অধিকারী এই পৃথিবীতে 'তাঁহার একমাত্র সুহৃদ'। সে এক 'দেবালয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবক বা অধিকারী। বয়সে পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল।' এ দেবালয়ে মহাপুরুষ কাপালিক সর্বদা যাতায়াত করিত। অতএব কাপালিকের সঙ্গে অধিকারীর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। কিন্তু অধিকারী কাপালিকের মত নরঘাতক নহে। আশ্রিত ব্যক্তির উপকারে সে উদ্‌গ্রীব। কপালকুণ্ডলার নিকট হইতে নবকুমারের কথা শুনিয়া অধিকারী নবকুমারকে বলিল, "আজি এখানে লুকাইয়া থাক, কালি প্রত্যূষে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।" এমন কি নবকুমারের আহারাদি হয় নাই জানিয়া তাহার আহারের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু নবকুমার আহারে নিতান্ত অস্বীকৃত হইল। তখন অধিকারী নিজ রন্ধনশালায় নবকুমারের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল।

অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত। তাহাকে মাতার অধিক স্নেহ করিত। তাহার কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। সেজন্য পূর্বে যখন তাহার একজন শিষ্য আসিয়াছিল তখন সে কপালকুণ্ডলাকে তাহার সহিত যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, 'কারণ যুবতীর এরূপ যুবা পুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত'। আসলে অধিকারী জানিত তাহার সহিত কপাল-কুণ্ডলার বিবাহ হওয়া সম্ভব নহে। এক্ষণে নবকুমারকে ব্রাহ্মণ-যুবক জানিয়া তাহার সহিত কপালকুণ্ডলাকে দেশান্তরে যাইতে বলিল। তাহা না হইলে কাপালিকের আশ্রয়ে তাহার প্রাণরক্ষার কোন আশা নাই।

অধিকারী দেবীর সেবক বলিয়াই ধর্মভীরু। সেজন্য মনে মনে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়াও দেবীর মত লইতে গেল। অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিন্ন মন্ত্রপূত বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিল। বিল্বপত্র পড়ে নাই। দেবী তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব পথিক নবকুমারের সহিত তাহার বিবাহ মঙ্গলকর হইবে।

অধিকারী বিজন বনে দেবতার সেবক হইলেও সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে খুবই অভিজ্ঞ। কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে চিন্তাক্লিষ্ট হইলেও নবকুমার তাহাকে বিবাহ না করিলে সে কপালকুণ্ডলাকে তাহার সহিত যাইতে বলিবে না। কারণ তাহার সামাজিক পরিণাম কখনও ভাল হইতে

পারে না। কপালকুণ্ডলা বিবাহ কাহাকে বলে জানিত না। তখন সে ধর্মভাবাপন্ন কপালকুণ্ডলাকে শিব ও জগন্মাতার উল্লেখ করিয়া বলিল, "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান।" এই অস্পষ্ট কথায় তাহার মনে হইল কপালকুণ্ডলা সবই বুঝিল। তারপর অধিকারী নবকুমারের নিকট গিয়া তাহার মনের কথা জানিয়া লইয়া, তাহার জাতি-কুল-মানের বিস্তৃত খবর লইয়া কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল। সে ওস্তাদ ঘটকের মতই প্রস্তাবনা করিল। নবকুমারের সঙ্গে কথা বলিয়া অধিকারী খুশী হইল। মনে মনে বলিল, "রাঢ়দেশের ঘটকালী কি ভুলিয়া গিয়াছি নাকি?" ইহা দ্বারা এককালে সে যে ঘটকালী বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল তাহা বুঝা যায়।

পরদিন নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল তখন অধিকারীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিল, "এতদিনে জগন্মাতার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হইল।" অধিকারী নিজেই সেদিন গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিল। নবকুমারের সহিত কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।

পরদিন প্রত্যূষে অধিকারী নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে লইয়া যাত্রা করিল। যাত্রাকালে প্রতিমার পাদোপরি কপালকুণ্ডলার স্থাপিত বিল্বপত্রটি পড়িয়া যাওয়ার সংবাদে অধিকারী বিষণ্ণ হইল। কপালকুণ্ডলাকে বলিল, "এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।" অধিকারী তাহাদের লইয়া মেদিনীপুরের পথ পর্যন্ত আসিল। সেখান হইতে কপাল-কুণ্ডলাকে বিদায় দিতে গিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। কপালকুণ্ডলা যাহাতে পালকিতে যাইতে পারে তাহার জন্য কপালকুণ্ডলার কাপড়ে কিছু অর্থ বাঁধিয়া দিল। সন্তান বলিয়া তাহাকে মনে রাখিতে কপালকুণ্ডলাকে বলিল। তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে অধিকারী বিদায় লইল। কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল।

এই পিতৃকল্প সন্ন্যাসী এতকাল কপালকুণ্ডলাকে নিজের সন্তানের ন্যায় দেখিয়াছিল। অতি স্বল্প পরিসরে বঙ্কিমচন্দ্র এই সহৃদয় মানুষটির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের শেষে কপালকুণ্ডলার চরম

মতিবিবির অলঙ্কার এবং বহুমূল্যের পোশাকের প্রতি। আগ্রা ত্যাগ করিয়া আসিবার কারণ সম্বন্ধে মতিবিবি তাহাকে বলিয়াছে 'ললাট লিখন'। অতএব পেষমন হইল পদ্মাবতী ওরফে মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসার মনের ভাব প্রকাশের অবলম্বন।

এই তিনজন অপ্রধান চরিত্র ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র দুই একটি রেখার টানে নবকুমারের সহযাত্রীদের চরিত্র, বিশেষ করিয়া বৃদ্ধের চরিত্র, সৌন্দর্য লোলুপ সেলিমের চরিত্র অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তাহারাও বঙ্কিম-চন্দ্রের অপূর্ব শিল্প-শৈলীর স্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

॥ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ ॥

(১) যাহা জগদীশ্বরের হাতে, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে ? (প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

উক্তিটি গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্তনকারী এক যুবক নৌকারোহীর। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। সেদি ভীষণ কুয়াশা হইয়াছিল। নাবিকেরা দিক ঠিক রাখিতে পারিল না। নৌকা কোনদিকে যাইতেছে তাহার কিছু নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকার আরোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিল। কেবল একজন বৃদ্ধ এবং যুবক কথা বলিতেছিল। হঠাৎ বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাঝি, আজ কতদূর যেতে পারবি ?" মাঝিরা কুয়াসার জন্য চিন্তিত ছিল। তখনি তাহা প্রকাশ করিল না। মুখে বলিল, তাহারা ঠিক বলিতে পারে না। বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে যুবক এই উক্তি করিয়াছিল।

তখনকার সাধারণ মানুষ অধিক ধর্মভাবাপন্ন ছিল। আত্মপ্রত্যয়বোধ তাহাদের বেশী ছিল না। তাহারা মনে করিত মানুষের সমস্ত কার্যই এক অলৌকিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ ইচ্ছা করিলেও তাহার হাত এড়াইতে পারে না। ভবিষ্যতের কথা মানুষ অনুমান করে মাত্র। সঠিক বলিতে পারে না। সেজন্য যুবক বৃদ্ধকে বলিল, ভবিষ্যতের কার্য যাহা ভগবানের উপর নির্ভর করে তাহা পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেও বলা সম্ভব নহে পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা, তাঁহার জ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা অনেক

নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষেও অসাধ্য সাধন সম্ভব নহে। পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানের শক্তিকে অতিক্রম করা যায় না। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তিও যাহা বলিতে পারেন না মাঝির মত মূর্খ ব্যক্তি তাহা কি প্রকারে বলিবে ?

• আলোচ্য এই যুবকই সপ্তগ্রাম নিবাসী নবকুমার দেবশর্মা।

(২) আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন ? (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকদের উদ্দেশ্য করিয়া এই উক্তি করিয়াছেন। নবকুমারের সহযাত্রীরা যখন কেহই ব্যাঘ্র-ভয়ে বনে পাকের কাঠ সংগ্রহ করিতে গেল না তখন নবকুমার সকলের উপকারার্থে একাকী বনে প্রবেশ করিল। কাঠ সংগ্রহ করিতে তাহাকে অনেক দূরে যাইতে হইয়াছিল। তারপর কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিল না। এ সকল কার্য তাহার অভ্যাস ছিল না। কাষ্ঠভার বহন করিয়া আনিতে তাহার অনেক সময় লাগিল। ইতিমধ্যে জোয়ার আসিলে সহযাত্রিগণ নৌকা ছাড়িয়া দিল। নবকুমারের জন্য কেহ অপেক্ষা করিল না। মনে করিল নবকুমারকে বাঘে খাইয়াছে। এই ঘটনা পড়িয়া যদি কেহ পরোপকারে নিবৃত্ত হন সেজন্য স্বয়ং গ্রন্থকার এই মন্তব্য করিয়াছেন।

পরোপকার করা মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সাধারণ মানুষ স্বার্থমগ্ন। তাহারা প্রতি কাজে নিজের লাভ লোকসান হিসাব করিয়া কাজে আত্মনিয়োগ করে। আত্মসুখই তাহাদের নিকট প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু প্রতি নিয়মেই যেমন ব্যতিক্রম থাকে তেমনি সমাজস্থ এই মানুষের মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। তাহারা সংখ্যায় নগণ্য। তথাপি তাহাদের জন্য সমাজটা বাসযোগ্য হইয়াছে। তাহাদেরও স্বার্থ আছে, নিজেদের সুখ সুবিধা আছে। কিন্তু তাহা তাহাদের হৃদয়ের মহৎ প্রবৃত্তিকে নষ্ট করিতে পারে না। তাহারা অন্যের জন্য চিন্তা করে। নিজেদের হিতাহিতের সঙ্গে পরের মঙ্গল কামনা করে। পরের উপকারে ঝাঁপাইয়া পড়ে

তাহার প্রতিদানের কথা চিন্তা করে না। সেজন্য যখন মানুষ আত্মোপকারীর অনিষ্ট চিন্তা করে তখন তাহাদের চিত্ত বিচলিত হয় না। উপকারের বিনিময়ে অধিকাংশ সময়েই মনুষ্য সমাজে নিজের ক্ষতি সাধিত হয় তথাপি বহু প্রাচীন কাল হইতে মানুষ এই পরোপকার কার্য হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। ইহা তাহাদিগের নিকট স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। সেজন্য নিজের অনিষ্টের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তাহারা চিরকাল পরোপকার করিয়া আসিয়াছে। তখন তাহারা বোধ হয় একটি কথাই চিন্তা করে—যাহার উপকার করিতে যাইতেছি সে যদি পরে অধম ব্যক্তির ন্যায় আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন দেয় তাহা হইলে মানুষের মধ্যে যে দুর্লভ 'মহৎ ভাব' তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে কেন। যাহারা মহৎ কাজ করে তাহারাই উত্তম ব্যক্তি, তাহাদের কথাই যুগে যুগে ইতিহাসে কীর্তিত হয়, আর যাহারা অধম তাহারা সমাজের আবর্জনার মতই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহারা সমাজে ঘৃণ্য।

উদ্দেশ্য যত মহৎই হউক পাঠকের উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে মন্তব্য করা শিল্প বিচারে নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নহে। ঔপন্যাসিক জীবন-ব্যাখ্যার মধ্যেই সুন্দরকে ফুটাইয়া তুলিবেন। তাঁহার কাছে পাঠক জীবন-সত্যই কামনা করে, গুরুজনের মত নীতিবাক্য নহে।

(৩) বিপৎকালে সঙ্কোচ মূঢ়ের কাজ।

(দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

উক্তিটি নবকুমারের। নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারী প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইল। অপ্রাচুর্যহেতু স্বয়ং পদব্রজে চলিল। বাহকেরা তাহাকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ পথের মধ্যে দস্যুহস্তে নিগৃহীতা এক স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাইল। দস্যুরা তাহার পালকি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাহার একজন বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে, আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা স্ত্রীলোকটির অঙ্গের অলংকার সকল লইয়া তাহাকে পালকিতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। নবকুমার তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিল। দস্যুরা স্ত্রীলোকটিকেও এক ঘা লাঠি মারিয়াছিল সেজন্য তাহার পায়ে বেদনা আছে,

কোনকিছুর উপর ভর না করিয়া তাহার পক্ষে চলা অসম্ভব। তখন নবকুমার তাহাকে এই উক্তি করিয়াছিল।

নবকুমার স্ত্রীলোকটিকে তাহার কাঁধে ভর করিয়া চটি পর্যন্ত যাইতে বলিল। একজন যুবতী স্ত্রীলোকের এইরূপ একজন পরপুরুষের কাঁধে ভর দিয়া চলা শোভন নহে। কিন্তু বিপদের সময় সমাজের কোন স্বাভাবিক রীতিনীতি মানিয়া চলিলে অনেক কাজ করা সম্ভব হয় না। তাহাতে বিপদের আশঙ্কাই বাড়িয়া চলে। সেজন্য বিপৎকালে কোন কাজ করিতে সংকোচ বোধ করা মূর্খতার পরিচায়ক। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাজ করিয়া থাকেন। কোন নীতিই সর্বকালীন সত্য হইতে পারে না। স্থান কাল বিবেচনায় তাহার পরিবর্তন পরিবর্জন আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব নবকুমার বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতই স্ত্রীলোকটির নিকট এই আপাত-অসম্ভব প্রস্তাব করিল। স্ত্রীলোকটিও পরে তাহার কাঁধে ভর করিয়া চটিতে উপস্থিত হইল। অন্যথা তাহাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঐ পথের ধারে পড়িয়া থাকিতে হইত।

(৪) প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।

(দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

মন্তব্যটি স্বয়ং গ্রন্থকারের। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গৃহে সাদরে গৃহীত হওয়ায় নবকুমারের মধ্যে যে প্রেমের বিকাশ হইয়াছিল তাহারই আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক এই উক্তি করিয়াছেন।

নবকুমার সন্ধ্যালোকে সমুদ্রতীরে কপালকুণ্ডলার মোহিনীরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। পরে আকস্মিকভাবে তাহার সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ হইল। কিন্তু তাহার গৃহে কপালকুণ্ডলা কিরূপে গৃহীত হয়. সেই চিন্তায় কপালকুণ্ডলাকে লাভ করিয়াও নবকুমার কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয় লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। কিন্তু সেই আশঙ্কা দূর হইল। কপালকুণ্ডলা তাহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইল। তখন তাহার আনন্দ সাগর উছলিয়া উঠিল। বাঁধ ভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল। এই প্রেমের প্রকাশ বিচিত্র ভাবে দেখা দিল। সর্বদা তাহা কথায় ব্যক্ত হইত না। ভাবে ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইত। অকারণে কপালকুণ্ডলার কাছে

যাতায়াত করিত, বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার কথা আলোচনা করিত। এক কথায় তাহার প্রকৃতি পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। "যেখানে চাঞ্চল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য জন্মিল; যেখানে অপ্রসন্নতা ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল; নবকুমারের মুখ সর্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল; মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্মের জন্য মাত্র সৃষ্ট বোধ হইতে লাগিল।" সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয়ের ইহাই ধর্ম।

সমাজ-মানুষের নিকট ইহা এক অপূর্ব পরশপাথর। ইহার স্পর্শে অসুন্দরও সুন্দর হয়। রুক্ষতা দূরীভূত হয়। মানুষের যাহা কিছু মন্দ তাহা ম্লান হইয়া যাহা কিছু ভাল. যাহা কিছু কোমল, যাহা কিছু সুন্দর তাহাই প্রাধান্য লাভ করে। কর্কশতা, অন্ধকার, পাপ, অসৎ প্রবৃত্তি সবকিছুই খারাপ। প্রণয় এই খারাপকে দূর করিয়া তাহাকে মধুর, আলোকময়, সৎ এবং পুণ্যময় করিয়া তোলে।

(৫) যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে। (দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

মৃণ্ময়ী শ্যামাসুন্দরীব নিকট এই উক্তি করিয়াছে। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর অনুরোধে নবকুমারকে বিবাহ করিয়া সপ্তগ্রামে তাহার গৃহে আসিয়াছে। শ্যামাসুন্দরী নবকুমারের ভগ্নী, কপালকুণ্ডলার সখী। যোগিনী বনচারী কপালকুণ্ডলাকে গৃহস্থ মেয়ের মত সাজাইয়া গৃহিণী করিয়া তুলিতে তাহার খুব শখ। কিন্তু কপালকুণ্ডলা সমাজ-জীবন হইতে বহু দূরে অরণ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিল। সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই ছিল না। তাহার কিসে সুখ এই কথার উত্তরে সে শ্যামাসুন্দরীকে বলিয়াছে 'সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে'। কপালকুণ্ডলা নামটি বিকট বলিয়া গৃহস্থেরা তাহার নাম রাখিয়াছিল 'মৃণ্ময়ী'।

কপালকুণ্ডলা কাপালিক প্রতিপালিতা। অহর্নিশ শক্তি ভক্তি শ্রবণ ও দর্শনে তাহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। নবকুমারের সহিত যাত্রাকালে সে ভবানীর পায়ে বিল্বপত্র দিতে গিয়াছিল। কারণ, মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া সে কোন কর্ম করিত না। যদি কর্মে শুভ হইবার

হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে তাহার শঙ্কা হইতে লাগিল। ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেল। মা ত্রিপত্র ধারণ করিলেন না। ইহাতে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলেরই সূচনা করে। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গৃহে আসিয়াও তাহা ভুলিতে পারে নাই। এই ঘটনা তাহার সংসার জীবনে কণ্টকস্বরূপ হইয়া রহিল। শ্যামার সঙ্গে কথা বলিবার সময় সঙ্গতভাবে তাহার সেই আশঙ্কা প্রকাশ পাইল। সে সমস্ত কিছুই বিধাতার উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। কপালে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। ভবানী যেখানে বিরূপ সেখানে সে নিজে কী করিতে পারে?

(৩) ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে কিন্তু এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না। (তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

উক্তিটি লুৎফ-উন্নিসার। নবকুমারের সহিত সাক্ষাতের পর লুৎফ-উন্নিসার ভাবান্তর হইয়াছিল। অধিকন্তু দিল্লীর সাম্রাজ্ঞী হওয়ার আশা এবং আকবরের সিংহাসনে সেলিমের পরিবর্তে খস্রুকে বসাইবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় তাহার আগ্রার প্রতি আর কোন আকর্ষণ রহিল না। সেজন্য সে জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট বিদায় লইতেছে। জাহাঙ্গীর তাহাকে থাকিবার কথা বলিলে লুৎফ-উন্নিসা তাঁহাকে এই উক্তি করিয়াছিল।

আকবর-পুত্র যুবরাজ সেলিম ছিল সৌন্দর্য-বিলাসী। লুৎফ-উন্নিসা ছিল তাহার প্রণয়ভাগিনী। কিন্তু পরে মেহের-উন্নিসাকে দেখিয়া সেলিমের হৃদয় সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে এই মেহের-উন্নিসার সঙ্গে শের আফগানের বিবাহ হয়। মেহের উন্নিসা ছিল লুৎফ-উন্নিসার বাল্যসখী। আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পথে সে বর্ধমানে মেহের-উন্নিসার নিকট গিয়াছিল। সেখানে সে মেহের-উন্নিসার সঙ্গে কথা বলিয়া বুঝিতে পারিল মেহের-উন্নিসাও জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রতি অনুরক্তা। কালে মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরী হইবে। জাহাঙ্গীর মনে ভাবিল, লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসার জন্যই নিজ মনোভিলাষ বিফল হইল বলিয়া রাজাবরোধ হইতে বিরাগে অবসর লইতে চাহিতেছে। জাহাঙ্গীর লুৎফ-উন্নিসাকে বলিল, "আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য উভয়েই বিরাজ করে না? এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফোটে না?" তাহার উত্তরে লুৎফ-উন্নিসা আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছিল।

এক বৃন্তে একাধিক ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে। কিন্তু এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না। মেহের-উন্নিসা তাহার বাল্যসখী ; পরবর্তী কালে দিল্লীর সিংহাসনে তাহার প্রতিযোগিনী। মেহের-উন্নিসার অধীনে পুরস্ত্রী হইয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

(৭) আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয় সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখন আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরা-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই। (তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

দাসী পেষমনের সঙ্গে আলোচনা কালে লুৎফ-উন্নিসা নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে। লুৎফ-উন্নিসা আসলে নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। মাত্র তের বৎসর বয়সে তাহাকে পিতার সহিত মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে বলিয়া স্বামী ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাহার সুখের তৃষ্ণা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য সে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া আগ্রায় আসিয়াছে। এতটুকু সুখের জন্য সে কি না করিয়াছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে করিয়াছে তাহা পায় নাই। পরিবর্তে অবশ্য ঐশ্বর্য, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিয়াছে কিন্তু একদিনের তরেও সে সুখী হয় নাই, এক মুহূর্তের জন্যও কখনও সুখভোগ করে নাই। কখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। কেবল তৃষ্ণা বাড়িয়া চলিয়াছে। আসলে সে কাহাকেও ভালবাসে নাই। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখনও তাহার মনোমুগ্ধ করে নাই। ইন্দ্রিয়-সুখ সন্ধান করিয়া সে বহু মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছে কিন্তু কেহই তাহার হৃদয়ে ঠাঁই লাভ করিতে পারে নাই।

সে এতকাল হিন্দুদিগের পাষাণ দেবতার মত ছিল। এই পাষাণ দেবতার বাহিরে নানা রত্নালঙ্কারের চাকচিক্য এবং ঔজ্জ্বল্য। তাহাতে বহু মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ধাবিত হয়। কিন্তু পাষাণ দেবতার কোন পরিবর্তন হয় না। যেমনটি ছিল তেমনটি থাকে। লুৎফ-উন্নিসার অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। বাহিরের রূপ-যৌবনের ঔজ্জ্বল্যে অনেকের চিত্ত বিভ্রম ঘটিয়াছে কিন্তু তাহার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে এক চটিতে নবকুমারের সঙ্গে চৌদ্দ বৎসর পরে তাহার আকস্মিক সাক্ষাৎ ঘটে, তাহার চিত্ত চাঞ্চল্যকারী রূপ দেখিয়া নবকুমারও বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অধিক তাহার কোন কামনা ছিল না। এই নবকুমারকে দেখিয়া এবং তাহার পরিচয় লাভ করিয়া লুৎফ-উন্নিসার মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল। তাহার পাষাণ হৃদয়ে সত্যকারের ভালোবাসার অগ্নি প্রবেশ করিয়া ভাবান্তর সৃষ্টি করিল। তাহার পাষাণ হৃদয়ে সত্যকারের ভালোবাসার অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাতে পাষাণ গলিতেছিল। তাই পুরুষমানুষকে কেন্দ্র করিয়া একটি ভালবাসার নীড় বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে প্রবল হইল। এতদিন সে নানা মানুষের সংস্পর্শে আসিলেও রক্ত-মাংসের হৃদয় লইয়া তাহারা তাহাকে ভালবাসিতে চাহে নাই। তাহার রূপ যৌবনে আকৃষ্ট হইয়াছে মাত্র। নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে তাহার রিক্ততা অনুভব করিতে পারিয়াছে। রক্তশিরাবিশিষ্ট একটি অন্তঃকরণের জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই নবকুমারের প্রতি তাহার আকর্ষণ তীব্রতর হইল। সে আগ্রার সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া নবকুমারের নিবাস সপ্তগ্রামের দিকে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিল। দাসী পেষমনের সহিত আলোচনায় তাহার সেই রিক্ত বেদনার এবং ভবিষ্যৎ কার্য পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া গেল।

(৮) যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না। **(চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)**

উক্তিটি কপালকুণ্ডলার। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করিবার জন্য রাত্রে ঔষধ তুলিবার আলোচনা প্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর নিকট এই মন্তব্য করিয়াছে।

শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা। কারণ সে কুলীনপত্নী। পিতৃগৃহেই বাস করে। স্বামীদেব কচিৎ কদাচিৎ এক আধ দিনের জন্য আসেন। শ্যামাসুন্দরীর জীবনে সেজন্য খুব দুঃখ। স্বামীকে বশ করিবার জন্য সে এক ঔষধের সন্ধান জানিয়াছে। ঠিক দুই প্রহর রাত্রে কোন স্ত্রীলোকের তাহা এলোচুলে তুলিতে হয়। কিন্তু রাত্রে বনে বনে বেড়ান গৃহস্থের বউ-ঝির পক্ষে ভাল দেখায় না। গত রাত্রে তাহারা দুইজনে গিয়াছিল। কিন্তু খুঁজিয়া পায় নাই।

গৃহে যথেষ্ট তিরস্কার পাইয়াছে। কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর দুঃখে সহানুভূতিশীল। সে আজ দিনে সেই গাছ চিনিয়া আসিয়াছে। সে একাই আজ রাত্রে সেই ঔষধ তুলিয়া আনিবে। কিন্তু শ্যামাসুন্দরী তাহাকে নিষেধ করিয়াছে। লোকে নানা কথা বলিবে। মন্দলোকে মন্দ বলিবে। তাহা শুনিলে তাহাদের মনে ক্লেশ হইবে। নবকুমার শুনিলে অসুখী হইবে। •

কপালকুণ্ডলা সমাজজীবনের বাহিরে স্বাধীনভাবে অরণ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহার পদে পদে এত নিষেধের বাঁধন ছিল না। যখন যেখানে ইচ্ছা সে বিচরণ করিয়াছে। তাহাতে সে কুচরিত্রা হয় নাই। তবে আজ কেন একাকী বনে গেলে সে কুচরিত্রা হইবে! সে সামাজিক এত বিধি-নিষেধের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে না। তবে একটা কথা বুঝিয়াছে, সমাজজীবনে স্ত্রীলোকের কোন স্বাধীনতা নাই, মতামতের কোন মূল্য নাই। তাহার জীবন দাসীর মত। আষ্টে পৃষ্ঠে নানা শৃঙ্খলে বাঁধা। সমাজজীবনের বাহিরে সে বনে বনে মানুষ হইয়াছে বলিয়া সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই ছিল না। সেজন্য সে কিছু না জানিয়াই অধিকারীর কথায় নবকুমারকে বিবাহ করিয়াছে। সে যদি জানিত সমাজ-জীবনে স্ত্রীলোকের কোন স্বাধীনতা নাই, তাহাকে দাসীত্ব বরণ করিয়া কেবল অন্য লোকের মন যোগাইয়া চলিতে হইবে অথচ তাহার মনের কোন সংবাদ কেহ লইবে না, তাহা হইলে সে কখনও বিবাহ করিত না।

কপালকুণ্ডলার এই উক্তির মধ্যে আমরা সমাজ-সচেতন বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় পাই। তিনি এই উপন্যাসে বাস্তব সমাজ-জীবনের বিস্তৃত পরিচয় দেন নাই। কপালকুণ্ডলা একটি রোমান্স। তথাপি এই রোমান্সের মধ্যেই সমাজ-জীবনে নারীর মূল্য এবং স্থান কোথায় এখানে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র এই নারীত্ব অবলম্বনে অনেক গল্প উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যেন তাহার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

(৯) সংসার রচনা অপূর্ব কৌশলময়।

(চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিভৃত বনের মধ্যে যখন ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতী ও কপালকুণ্ডলা কথাবার্ত বলিতেছিল তখন দূর হইতে নবকুমার ও কাপালিক ইহাদিগের প্রতি

করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে নানা খারাপ কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করিয়াছেন।

এই সংসার অতি বিচিত্র। এখানে যেমন সুখ তেমনি দুঃখ। যেমন আনন্দ তেমনি বিষাদ। এই সুখদুঃখ মানুষ নিজেই সংসারে সৃষ্টি করে। সামান্য ভুল বুঝাবুঝিতে এই সংসারে সাঙ্ঘাতিক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তাহার পরিণামে দারুণ বিপর্যয় ঘনাইয়া আসে। অথচ মানুষ যদি সঠিক কারণ তলাইয়া দেখিত, যদি একটু বস্তুনিষ্ঠ হইয়া বিচার করিত তাহা হইলে অনেক ভুল বুঝাবুঝির হাত এড়াইতে পারিত। সংসার অনেক বেশী সুখের হইত। কিন্তু তাহা হয় না। যাহা হইবার নহে তাহাই এখানে ঘটিয়া থাকে। সেইজন্যই সংসারকে বিচিত্র বলা হয়।

কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। ইহার মধ্যে কপালকুণ্ডলার মনে কোনরকম কু-চিন্তা ছিল না। সে গত রাত্রে তাহারি সম্বন্ধে দুইজন লোকের বিস্তৃত আলোচনা শুনিয়া কৌতূহলী হইয়াছিল। তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্নে তাহার পাতাল গমনের কথা ছিল। তাহার ভবিষ্যৎ যে অমঙ্গলকর তাহা সে অনুমান করিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণবেশী স্বপ্নে তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিল। সেজন্য সে নানা কথা চিন্তা করিয়াই নিজের সম্বন্ধে কথা শুনিবার জন্য ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। সেখানে পদ্মাবতী তাহাকে নিজের পরিচয় দিল। তাহার নিজের উদ্দেশ্যের কথা বলিল। কপালকুণ্ডলা চলিয়া আসিবার পর কাপালিকের বাহু ভগ্ন, স্বপ্নদর্শন এবং বর্তমানে কপালকুণ্ডলাকে বধ করিবার জন্য সপ্তগ্রামে তাহার আগমন পর্যন্ত বলিল। তাহারা এইভাবে যখন গভীর কথা বলিতেছিল তখন তাহাদের অলক্ষ্যে নবকুমার ও কাপালিক তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলার উপপতি। কপালকুণ্ডলা তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্যই এই নিভৃত বনে আসিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, নবকুমার এবং কাপালিক যদি পদ্মাবতী এবং কপালকুণ্ডলার কথোপকথন শুনিতে পাইত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্তে আসিত না। মানুষ যতদূর দেখিতে পায় ততদূর যদি শুনিতে পারিত তাহা হইলে মানুষের দুঃখস্রোতের হয়তো পরিবর্তন হইত।

নবকুমার এবং কাপালিক দূর হইতে দেখিয়া যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহাদের কথা শুনিতে পারিলে তাহা নিশ্চয়ই একইরূপ হইত না। যে মিথ্যা সন্দেহের বশে কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমারের জীবনে দুঃখবহ পরিণতি সংঘটিত হইয়াছিল তাহা হয়ত ঘটিত না। কিন্তু ইহাই সংসার। এখানে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত না হইয়া মানুষ অনেক ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া নিজেদের কপালে দুঃখ টানিয়া আনে। ইহাই সংসারের বিচিত্র কৌশল।

(১০) যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ।

(চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। সে জীবনের উপর বীতস্পৃহ হইয়াছিল। আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প করিল। সেই সঙ্কল্প দুর্বার। তাহারই বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করিয়াছেন।

লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্তিত হইল। স্বপ্নে সে নিজের পাতাল গমন দেখিয়াছে, ভৈরবী কাপালিককে স্বপ্নে তাহার বলি দিবার নির্দেশ দিয়াছেন, লুৎফ-উন্নিসা নবকুমারের সঙ্গে তাহার চিরবিচ্ছেদ কামনা করিতেছে—এই সকল একত্রিত হওয়ায় কপাল-কুণ্ডলা নিজের জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হইল। সে আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হইল।

তাহা ছাড়া, কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ-সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলাও সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় আকাঙ্ক্ষায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তি প্রসাদ-প্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখ দুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্যে ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখ-বিধায়িনী কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবন-সমর্পণ আদেশ দিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা সেই আদেশ পালন করিতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছে।

সংসারে সাধারণ মানুষ সুখের আশায় ঘুরিয়া থাকে। এই সুখের

আশায় তাহারা সংসার ছাড়িতে চায় না। প্রণয় এই সংসার বন্ধনের প্রধান রজ্জু। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সেই বন্ধন ছিল না। নবকুমারের সঙ্গে এক বৎসর বাস করিয়াও নবকুমারের প্রতি তাহার কোন আসক্তি ছিল না। অতএব সে বন্ধন-বিহীন। তাহার বেগ অপ্রতিহত। গিরিশিখর হইতে যখন নির্ঝরিণী-ধারা নিম্নগামী হয় তখন তাহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য। কপালকুণ্ডলার চিত্ত যখন আত্মবিসর্জনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল তখন তাহাকেও স্থিতি স্থাপন করিবার কোন লোক ছিল না।

॥ অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ ॥

(১) যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থ দর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয় বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে। (১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)

(২) একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না। (১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)

(৩) সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী ; রমণী-সুন্দরী ; ধ্বনিও সুন্দর ; হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল। (১ম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

(৪) তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে ? (১ম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

(৫) বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না। (১ম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

(৬) পৃথিবীতে যে জন তাহার একমাত্র সুহৃদ, সে বিদায় লইতেছে। (১ম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ)

(৭) বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে। (২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)

(৮) স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে সে না দেখাইলে বাঁচে না। (২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)

(৯) শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা, কেন না তিনি কুলীনপত্নী। (২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ)

(১০) পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়।

(২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

(১১) মতির চরিত্র মহাদোষ কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত।

(৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)

(১২) কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব?

(৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)

(১৩) কবরের মাটিতে সুখের আদর্শ থাকিবে। (৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)

(১৪) পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।

(৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ)

(১৫) ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুরিত হয়।

(৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

(১৬) সিংহাসন যেন মন্মথশরসম্ভূত অগ্নিরাশি বেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। (৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

(১৭) মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে? কপালকুণ্ডলার হৃদয় সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, কে তাহা গণিবে?

(৪র্থ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)

(১৮) স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্ত-মধ্যে বিদ্যুৎচ্চঞ্চলা হইলেন। (৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)

(১৯) তুমি তো কখন আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই। (৪র্থ খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ)

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

(১) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' আখ্যায়িকাখানি ইতি-

হাসের ফ্রেমে বাঁধানো কিন্তু স্বরূপের দিক দিয়া ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। আলোচনা কর।

অথবা

(৩) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের ঘটনা-সমাবেশে ইতিহাসের প্রভাব কতদূর লক্ষণীয় তাহার আলোচনা কর। ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া সঙ্গত হইবে কিনা এই বিষয় বিচারপূর্বক তোমার অভিমত প্রকাশ কর। (ক. বি. ১৯৪৮)

অথবা

(৪) কপালকুণ্ডলার কাহিনীবিন্যাসে যে পরিমাণ এবং যে প্রকার ঐতিহাসিক উপকরণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া অভিহিত করা সংগত হইবে কি? যুক্তি সহকারে এ বিষয়ে তোমার মত প্রকাশ কর। (ক. বি. ১৯৬০)

॥ উত্তর ॥ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের 'ঐতিহাসিক পটভূমিকা' আলোচনা দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১৪৯—১৫৪)

(৫) রোমান্স ও উপন্যাসের পার্থক্য দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ইহাদের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আলোচনা কর।

অথবা

(৬) "কপালকুণ্ডলা রোমান্স-রস সমৃদ্ধ উপন্যাস"—এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

অথবা

(৭) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসখানি ইতিহাস-চেতন বঙ্কিম-মানসের সৃষ্টি নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসের সৃষ্টি, ইহাকে কাব্যধর্মী রোমান্স বলাই সঙ্গত। উপযুক্ত তথ্যসহ মন্তব্যটি আলোচনা কর। (ক. বি. অনার্স, ১৯৬৪)

অথবা

(৮) কপালকুণ্ডলাকে রোমান্স-জাতীয় রচনা বলা হয়

কেন? ইহার কাহিনী, চরিত্র, পটভূমি, ঘটনা-সংস্থান ও ফলশ্রুতি—সর্বদিক বিচার করিয়া সে সম্পর্কে আলোচনা কর। এই রোমান্সে ভারতীয় জীবন ধর্মের বৈশিষ্ট্য কিরূপ রচিত হইয়াছে তাহা দেখাও। (ক. বি. অনার্স, ১৯৬৫)

॥ উত্তর ॥ অন্ত্যপর্বের 'কপালকুণ্ডলা : রোমান্সধর্মী উপন্যাস' আলোচনা দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ১৫৪—১৫৯)

(৯) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

॥ উত্তর ॥ 'নামকরণের সার্থকতা' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১০) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে বঙ্কিম অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, আলোচনা কর।

অথবা

(১১) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের গঠন-কৌশল বুঝাইয়া দাও।

(১২) রসপরিণতির মানদণ্ডে বিচার করিলে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের গঠনকৌশল অনবদ্য। এই উক্তির সার্থকতা নিরূপণ কর। (ক. বি. অনার্স, ১৯৬৬)

॥ উত্তর ॥ 'কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের গঠন-কৌশল' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১৩) কপালকুণ্ডলার কাহিনী এবং মতিবিবির কাহিনী—এই দুইটি কাহিনীর অবতারণার কারণ কি—আলোচনা কর।

অথবা

(১৪) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মতিবিবির কাহিনীর উপযোগিতা এবং সার্থকতা বিচার কর।

॥ উত্তর ॥ 'উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা বিচার'-আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১৫) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে অবাস্তবতা ও অতিপ্রাকৃত সমাবেশ প্রসঙ্গে আলোচনা কর।

॥ উত্তর ॥ এই উপন্যাসে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত-এর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১৬) চরিত্র বিশ্লেষণ কর—(ক) কপালকুণ্ডলা, (খ) মতিবিবি, (গ) নবকুমার, (ঘ) কাপালিক।

॥ উত্তর ॥ অন্ত্যপর্বের 'চরিত্র বিশ্লেষণ' দেখ।

(১৭) কপালকুণ্ডলার চরিত্রে আরণ্য প্রকৃতির সহিত একাত্মতা কিরূপ বদ্ধমূল ছিল তাহা তাহার বিবাহোত্তর জীবনের বিশ্লেষণ দ্বারা বিশদরূপে দেখাও। (ক. বি. ১৯৪৮)

অথবা

(১৮) 'কপালকুণ্ডলার জীবন ও চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দুটি দুর্নিবার প্রভাবের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রকৃতির প্রভাব, অন্যটি তান্ত্রিকতার প্রভাব।' এই উক্তির সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৫০)

অথবা

(১৯) কপালকুণ্ডলার ভৈরবীমূর্তি দর্শন আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব ও অলৌকিক বলিয়া বোধ হইলেও কপালকুণ্ডলার চরিত্রে ইহার সম্ভাবনা রহিয়াছে—বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর। (ক.বি.১৯৫৮)

(২০) কপালকুণ্ডলার চরিত্র-গঠনে প্রকৃতি ও সমাজ-পরিবেশ কি পরিমাণে অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহা বুঝাইয়া লিখ।

(ক. বি. ১৯৬০)

॥ উত্তর ॥ কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

(২১) কপালকুণ্ডলায় নবকুমারের চরিত্র কি উপন্যাসের সর্বগুণান্বিত নায়কের আদর্শের অনুবর্তন করিয়াছে? তাহার দোষগুণে মিশ্রিত প্রকৃতির ভিতর দিয়াই যে তাহার চরিত্রের মানবিকতা স্ফুরিত হইয়াছে তাহা দেখাও। (ক. বি. ১৯৫৯)

॥ উত্তর ॥ নবকুমারের চরিত্র আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(২২) "মতিবিবির উপর বঙ্কিমচন্দ্র কিঞ্চিৎ অবিচার করিয়াছেন ; তবু মতিবিবিই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্ররূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"—উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার কর। (ক. বি. ১৯৫৯)

॥ উত্তর ॥ পদ্মাবতীর চরিত্র আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(২৩) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রগুলির অবতারণার সার্থকতা বিচার কর।

॥ উত্তর ॥ চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অপ্রধান চরিত্রগুলির আলোচনা দেখ।

(২৪) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসকে কতদূর ট্রাজেডি বলা যায় আলোচনা কর।

॥ উত্তর ॥ কপালকুণ্ডলার ট্রাজেডি আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(২৫) একজন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'কপালকুণ্ডলা tale নহে, উপন্যাস নহে, গদ্যরীতির কাব্যনাটক, গ্রীক নাটক।' এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

অথবা

(২৬) "কপালকুণ্ডলা ঠিক উপন্যাস নয়, ইহার কতকটা কাব্য, কতকটা নাটক।"—এই উক্তিটি কতটা সঙ্গত তাহা আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৫০)

॥ উত্তর ॥ কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের এক অনবদ্য সৃষ্টি। নিয়তি চালিত প্রকৃতি ও সংসারের দ্বন্দ্বনির্ভর ইহা এক অপূর্ব রোমান্স। আঙ্গিক বিচারে ইহাকে tale বা কাহিনী বলা যায় না। কাহিনী হইল পারম্পরিক ঘটনার বিবৃতি। একের পর এক ঘটনা যোগে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় তাহা অগ্রসর। তাহার সর্বদা প্রশ্ন হইল তারপর ? এখানে কার্যকারণ সমন্বিত কোন প্লট দেখা যায় না। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে সেক্সপীয়রীয় নাটকের মত কাহিনী গ্রন্থন রহিয়াছে। অতএব ইহাকে tale বা কাহিনী বলা উচিত নয়।

আবার উপন্যাস বলিতে কার্য-কারণ সমন্বিত মানব-জীবনের যে বাস্তব রূপায়ণ দেখা যায় কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে তাহারও একান্ত অভাব। সমাজ জীবন হইতে অতি দূরে আরণ্যক এক কাব্যিক পরিবেশে প্রকৃতি দুহিতা রহস্যময়ী এক নারীর রহস্যময় কাহিনী আছে এই উপন্যাসে। E. M. Forster বলিয়াছেন, "The great feature which distinguishes the novel from the other arts is that it has the power to make the secret life visible. It gives therefore a different view of reality from that given by poetry or the drama, or painting, or music." আমরা কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার secret life সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। আকস্মিক ঘটনার আবর্তে একটি সমাজ অনভিজ্ঞ নারীর অবশেষে সলিল সমাধি বর্ণিত হইয়াছে। উপন্যাসের চরিত্রের ভাব ও ভাবনার দ্বারা কেবল ঘটনা নিয়ন্ত্রিত বা রূপায়িত হয় নাই। উপন্যাসের প্রারম্ভে নবকুমারকে আদর্শনিষ্ঠ, পরোপকারী, সৌন্দর্য পিপাসু এক যুবক বলিয়া মনে হইলেও সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত হওয়ার পর সেও ঘটনার গতিপ্রবাহে পুতুলের মত চালিত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত রোমান্স রচনা করিয়াছেন; তিনি বাস্তবের ভিত্তিভূমি পরিত্যাগ করেন; আবার বিস্ময়কর ও অলৌকিকের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই রোমান্স সৃষ্টি করিতে বসিয়া তাহাকে যতদূর সম্ভব বাস্তবের স্পর্শে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইখানেই বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। নবকুমার-কপালকুণ্ডলা-মতিবিবির কাহিনীকে আপাত দৃষ্টিতে অবাস্তব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যে পটভূমিকায় তাহাদের ঘটনা সংঘটিত করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। কপালকুণ্ডলাকে সমাজ-জীবন হইতে বাহিরে প্রকৃতির সহিত একাত্ম করিয়া বিস্ময়-রস সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন কি কপালকুণ্ডলার পূর্ব পরিচয়ও পাঠকের নিকট অস্পষ্ট রাখিয়াছেন। সে যেন বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। নবকুমার সমাজে বাস করে। কিন্তু উপন্যাসে তাহার সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও বিশেষ উল্লেখ নাই। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কবি-কল্পনার আলোকে বাস্তবের গল্প-সত্যকে অপরূপ রূপে রঞ্জিত করিয়া একটি সার্থক রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছেন।

'কপালকুণ্ডলা' যেন এক গন্তরীতির কাব্যনাটক। কাব্যনাটকে একদিকে যেমন কাব্যের গীতিধর্মিতা, অনুভূতি ও আবেগের প্রকাশ থাকে, অপরদিকে তেমনি খাঁটি নাটকের ঘটনা-সংস্থান, চরিত্র ও ঘটনার সংঘাত থাকে। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-কল্পনার পরিচয় আছে অন্যদিকে তেমনি আছে তাঁহার নাট্যকারের মত বস্তুনিষ্ঠ ঐক্যরীতির পরিচয়। কপালকুণ্ডলা উপন্যাস গদ্যে রচিত হইলেও তাহা কাব্যিক সুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে। তাহার ঘটনাস্থল সাগর সংগমে, সমুদ্রের উপকূলে, বিজনে, সমুদ্রতটের বালুকা পাহাড়ের উপরে, সমুদ্রতলে, গঙ্গাতীরে, অরণ্যে, কাননতলে, উপনগর প্রান্তে, পথে, পান্থনিবাসে। চরিত্রগুলিও কাব্যিক। গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে কপালকুণ্ডলাকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না। নবকুমারও সাগর সংগমে গিয়াছিল সমুদ্র-সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার জন্য। কাব্যিক ভাব থাকা দোষের নহে কিন্তু উপন্যাসে এই কাব্যও বাস্তব জীবনের অংশ বিশেষ; তাহা এই উপন্যাসে দেখা যায় না। এখানে বিভিন্ন চরিত্রের আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশও সুরাশ্রয়ী হইয়া গীতি-কবিতার ব্যঞ্জনা প্রকাশ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী বর্ণনারীতিও কাব্যিক। যেমন :

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল, বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।"

কপালকুণ্ডলার গঠন-কৌশলের মধ্যেই তাহার নাট্যধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটি চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। নাটকের মতই ইহাতে পঞ্চমাঙ্ক বা পঞ্চসন্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন খণ্ড আবার নানা দৃশ্য বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে Exposition, প্রারম্ভ বা মুখবন্ধ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে Rising Action বা ঘটনার ক্রমোন্নতি বা প্রতিমুখসন্ধি বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে কাহিনী চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অবশ্য একই খণ্ডে যুগপৎ অবরোহ ও পরিণতিও দেখান

হইয়াছে। এই খণ্ডের প্রথম তিনটি দৃশ্যে কাহিনী climax-এ উঠিয়াছে। বাকী চতুর্থ হইতে নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে যুগপৎ অবরোহ (Denouncement) ও সমাপ্তি (Catastrophe)। প্রতিটি পরিচ্ছেদের মধ্যে নাটকের দৃশ্যের মত গতিবেগ সঞ্চারিত ও দীপ্তি লাভ করিয়াছে। প্রতিটি অধ্যায়ে সূচনা হইতে পরিণতি পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের অদ্ভুত ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া পাঠক মনে ঔৎসুক্য ও প্রতীক্ষা সদা জাগ্রত রহিয়াছে। উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীর একমুখীনতার জন্য সমস্ত কাহিনী নাটকের মত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার বিষয়বস্তু, চরিত্র এবং ঘটনাস্থল নির্বাচনে বঙ্কিমচন্দ্র কবিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। আবার ইহার ঐক্য নাটকের মত বলিয়া ইহাকে কাব্য-নাটক বলা সঙ্গত। মেটারলিঙ্কের নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া টি. এস, এলিয়ট বলিয়াছেন, "The poetic drama in prose is more limited by poetic convention or by our conventions as to what subject-matter is poetic, than is the poetic drama in verse." অর্থাৎ পদ্য-রীতিতে কাব্য-নাটক লিখিতে হইলে লেখককে সচেতনভাবে কাব্য সংস্কার মানিয়া চলিতে হইবে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের উপর এই কাব্যরীতির ব্যবহার নির্ভর করে। বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়বস্তু নির্বাচনে সেই ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন।

কেবল তাহাই নহে। কপালকুণ্ডলা "উপন্যাসখানি ঠিক একটি গ্রীক ট্র্যাজেডির মত সরল রেখায়, অবিসর্পিত গতিতে সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অনিবার্য বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায় এক নিগূঢ়-কলাকৌশল নিয়ন্ত্রিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হইয়াছে। এমন কি সুদূর মোগল রাজধানীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অন্তঃপুরিকাদের ঈর্ষাদ্বন্দ্ব পর্যন্ত বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার নিয়তির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। যে অগ্নিতে সে আত্মবিসর্জন করিয়াছে তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে। চারিদিকের সমস্ত শক্তি যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট-রথকে এক অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার সংসার অনাসক্তি, স্বামী প্রণয়বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি সমবেদনা, কাপালিকের অতন্দ্র প্রতিহিংসা, নবকুমারের আশঙ্কা-দুর্বল গভীর প্রেম, পদ্মাবতীর পাষাণ

প্রাণে প্রেমমন্দাকিনী ধারার অতর্কিত আবির্ভাব, সর্বোপরি এক ক্রুদ্ধ দৈবশক্তির সুস্পষ্ট অঙ্গুলিসংকেত—এই সমস্ত শক্তি, মানুষ এবং দৈব, সৎ ও অসৎ—একসঙ্গে ভিড় করিয়া যেন রথ-রজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে এতগুলি প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ—আমাদের মনকে এক গম্ভীর, সমাধানহীন রহস্যের বেদনায় ব্যথিত করে, নিয়তির দুর্জয় লীলায় একটা বিস্ময়কর বিকাশের ন্যায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।"

তথাপি কপালকুণ্ডলাকে নাটক বলা যায় না। এই উপন্যাসে কাব্য, নাটক, কাহিনী তিনটি গুণেরই সমন্বয় রহিয়াছে। মোহিতলাল মজুমদার ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "ইহা নাটকও বটে উপন্যাসও বটে, কাব্যও বটে। তথাপি উহা খাঁটি নাটক নয়, এইজন্য যে, উহা বিবৃতিমূলক, উহাতে কবির নিজের কথাও আছে; উহা উপন্যাস বা নভেল নয় এই জন্য যে, উহাতে যথাপ্রাপ্ত ও যথাদৃষ্ট জীবনেরই পরিধি-বিস্তার নাই, বরং সেই জীবনকে যেন চোলাই করিয়া তাহার একটা ঘনীভূত নির্যাস প্রস্তুত করা হইয়াছে; উহা রীতিমত কাব্যও নয়, এইজন্য যে, উহার কল্পনা যতই ঊর্ধ্বগ হউক, তথাপি সর্বদা তাহা বাস্তবের নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা আছে, কাহিনীগুলি ঘটনার কার্যকারণ শৃঙ্খলে দৃঢ়গ্রথিত হইয়া আছে" (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস)। অতএব আমরা ইহাকে কাহিনী, কাব্য ও নাটকের সমন্বয়ে একটি উৎকৃষ্ট রোমান্স বলিতে পারি।

প্রশ্ন (২৭) কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময়ের বাঙালী সমাজের যে চিত্র দিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা কর।

(ক. বি. ১৯৪৯)

॥ **উত্তর** ॥ বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ধর্মভীরু, দস্যুভীত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। আমাদের বাঙালী হিন্দু সমাজে ধর্ম এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তীর্থদর্শনে পুণ্যলাভ হয়, এই প্রতীতি সর্বজন বিদিত। মানবজীবনে তীর্থদর্শন দ্বারা পুণ্যঅর্জন না করিলে তাহার মুক্তি নাই। তাহাকে আবার পুনর্জন্মের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। উপন্যাসের প্রারম্ভেই আমরা সপ্তগ্রামনিবাসী এক তীর্থযাত্রীদলের পরিচয় পাই। সেখানে এক বৃদ্ধ তাহার পারিবারিক নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তিন কাল গিয়া এককালে ঠেকিবার জন্য পরকালের কর্ম করিবার উদ্দেশ্যে

সাগর-সংগমে আসিয়াছে। সেই সময়ে তান্ত্রিকতার প্রভাব কম ছিল না। শ্যামা হিন্দুদের অন্যতম প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নানা নামে নানা রূপে তাঁহার পরিচয়। একদিকে তিনি সংহার করেন, অন্যদিকে কল্যাণ করেন। সেজন্য অধিকারী তাহার অভিলাষ ব্যক্ত করিবার পূর্বে ভবানীর ইচ্ছা জানিতে চাহেন। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সঙ্গে যাত্রার পূর্বে ভবানীর নিকট বিল্বপত্র অর্ঘ্যরূপে দান করে। পদ্মাবতীর পিতা সপরিবারে উড়িষ্যায় জগন্নাথ দর্শনে যান। শ্যামাসুন্দরীও ভবানী কর্তৃক বিল্বপত্র প্রত্যাখ্যানের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠে। কাপালিক 'ভবানীর ইচ্ছা' বলিয়া নবকুমারকে কপালকুণ্ডলার নিধনে প্ররোচিত করে। কপালকুণ্ডলা ভবানীর একান্ত অভিপ্রায় জানিয়া আত্মবিসর্জনে দৃঢ় সংকল্প হইল।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাস্ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। তখন আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষ সময়। পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদের ভীষণ উৎপাত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইয়োরোপ হইতে পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজ বণিকগণ ব্যবসায়ে মুনাফার লোভে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। সুসংহত পদ্ধতিতে এদেশে ইয়োরোপীয় বণিকদের অনুপ্রবেশকে পরাজিত করা সম্ভব না হওয়ায় তাহাদের অনাচারও বাড়িয়া চলে। "পশ্চিমে দিউ ও দমন থেকে পূর্বে হুগলী পর্যন্ত ভারতের সমগ্র উপকূলেই পর্তুগীজ আস্তানা ছড়িয়েছিল। আকবরের যুগে ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহের এক 'ফরমান' অনুযায়ী বাংলাদেশে সপ্তগ্রামে তারা কুঠি বানায় এবং সেখান থেকে ক্রমে হুগলীর দিকে এগিয়ে যায়। শাহজাহানের আমলে এদের অনাচার সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুরা স্থানীয় পর্তুগীজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশের ভিতর বহুদূর চলে যেত, আর অনেক গ্রাম উজাড় করে লোক ধরে নিয়ে এসে তাদের ক্রীতদাস করত, জোর করে খ্রীষ্টান বানাত, হাত ফুটো করে তার মধ্যে সরু বেত ঢুকিয়ে যন্ত্রনা দিত। এই দুর্বৃত্তেরা জাঁক করে বলত যে বারোমাসে তারা যত লোককে খ্রীষ্টান করেছে, দশ বৎসরে সারা দেশের তত লোক খ্রীষ্টান হয় নি, এ খবর লিখেছেন ফরাসী পর্যটক বেণিয়ের স্বয়ং। মুঘল সরকারকে ফাঁকি দিয়ে এই পর্তুগীজরা তামাক এবং অন্যান্য বাণিজ্যবস্তুর উপর জোর করে

শুল্ক আদায় করত। হিন্দু ও মুসলমান ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিত। শোনা যায় এ ভাবে মহিষী মমতাজমহলের দুজন বাঁদীকে তারা ধরে নিয়ে যায়।"

এই দস্যুরা কপালকুণ্ডলাকে বাল্যকালে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পথে যান ভঙ্গ হওয়ায় কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়। এই দস্যুদিগের ভয়ে নাবিকেরা তখন দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করিত। রাষ্ট্র এবং সমাজে তখন নিরাপত্তার অভাব ছিল। তখন দস্যু-তস্কর ডাকাতের উপদ্রব ছিল। পথে চলাফেরা করা নিরাপদ ছিল না। মতিবিবি পথে দস্যু বিলুণ্ঠিতা হইয়াছিল। মতিবিবি নবকুমারকে বলিয়াছিল, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমার এক বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে, আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।" সপ্তগ্রাম নিবাসী বৃদ্ধের বিশ পঁচিশ বিঘার ধান তস্করেরা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে।

তখন বাঙালী সমাজের অবস্থা সপ্তগ্রামের ন্যায় ছিল। পূর্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এক কালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্ব দেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত; কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্যন্ত আসিতে পারিত না। বাঙালী সমাজেও তখন প্রাণধারা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। বাঙালীর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি যেমন ছিল না তেমনি তাহার জীবনধারায় সঙ্কীর্ণতা দেখা গেল। কৌলিন্যপ্রথা এবং কুসংস্কার আঁকড়াইয়া তাহারা বাঁচিয়া রহিল। শ্যামাসুন্দরী নবকুমারের ভগিনী। সে সধবা হইয়াও বিধবা, কারণ সে কুলীনপত্নী। কুলীন ব্রাহ্মণেরা তখন বহু বিবাহ করিত। স্ত্রীরা তাহাদের পিতৃ-গৃহেই থাকিত। স্বামী কখন কদাচিৎ তাহাদের দর্শন দিত। স্ত্রীরা স্বামীকে বশ করিবার জন্য বশীকরণের ঔষধ ব্যবহার করিত। শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে লইয়া এই বশীকরণের ঔষধ তুলিতে যাওয়ায় কপালকুণ্ডলার জীবনে যত অনর্থ ঘটিল।

"সপ্তগ্রামের এক নির্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না। রাজপথ সকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত। সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহটি ইষ্টকরচিত; দেশকাল বিবেচনা করিলে তাহাকে নিতান্ত সামান্য গৃহ বলা যাইতে পারিত না। দোতালা বটে, কিন্তু ভয়ানক উচ্চ নহে, এখন একতালায় সেরূপ উচ্চতা অনেক দেখা যায়।" আমরা কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমারের এই বাড়ির বর্ণনা পাই। সমাজের আর কোন পরিচয় পাই না। তবে তখন যে সমাজের মধ্যেও এই ভগ্নদশা দেখা দিয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। স্ত্রীলোকেরা সেই সমাজে আপন ভাগ্যকে স্বীকার করিয়া কালক্ষয় করিত। অল্পবয়সে তাহাদের বিবাহ হইত। ত্রয়োদশ বৎসরের পূর্বেই পদ্মাবতীর সহিত নবকুমারের বিবাহ হইয়াছিল। ছড়া কবিতার সঙ্গে তাহাদের নিবিড় যোগ ছিল। শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে শৈশবাভ্যস্ত কবিতা শুনাইয়াছিল। নারী চরিত্রে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস পুরুষ চরিত্রের স্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল। নবকুমার উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কপালকুণ্ডলার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া নিজের এবং কপালকুণ্ডলার ধ্বংস ডাকিয়া আনিল। শাস্ত্র এবং কাব্যানুশীলনও তখন পুরুষরা করিত। নবকুমারের সমুদ্রসৌন্দর্য সম্বন্ধীয় কালিদাসের রঘুবংশের বর্ণনা জানা ছিল।

কপালকুণ্ডলা একটি সার্থক রোমান্স। অরণ্যচারী কাপালিক প্রতিপালিতা এক নারীর কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত। কপালকুণ্ডলাকে সেই অরণ্য হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক সমাজে স্থাপন করেন নাই, করিয়াছেন এক আধা-অরণ্যে, এক ঔপনগরিক প্রান্তে। নবকুমারের ভগিনী শ্যামাসুন্দরী ছাড়া আর কোন সমাজ মানুষের পরিচয় আমরা সেখানে পাই না। সেজন্য তৎকালীন বাঙালী সমাজের কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই উপন্যাসে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন(২৮) কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারকেও বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গায় ডুবাইয়াছেন, কারণ নবকুমারের এই পরিণামই শিল্পসঙ্গত।—যুক্তি দিয়া এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন কর। (ক. বি. ১৯৫৮)

॥ উত্তর ॥ নবকুমার এক ভাগ্যহত যুবক। তাহার পিতা চতুর্দশ বৎসর পূর্বে রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু পদ্মাবতীর পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে পাঠানসেনার হাতে পড়িয়া ধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া নবকুমারের পিতা জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সহিত জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকেও ত্যাগ করিলেন। নবকুমারের সহিত তাহার স্ত্রীর আর সাক্ষাৎ হইল না।

এই ঘটনার চতুর্দশ বৎসর পরে নবকুমার অনন্যমনে সমুদ্রশোভা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। "ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব মূর্তি। সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব এক রমণীমূর্তি! কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফ-লম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমমধ্যে দেবী মূর্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল,—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।" নবকুমার বিস্মিত দৃষ্টিতে রমণীর দিকে তাকাইয়া রহিল। রমণীর দৃষ্টিতে কিন্তু কোন উদ্বেগ ছিল না। অনন্ত সমুদ্রের জনহীন তীরে এইরূপে দুইজন দুইজনের দিকে তাকাইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে রমণী মৃদুস্বরে বলিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

"এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়; সকলই লয়বিশিষ্ট হয়, সংসার-যাত্রা সেই অবধি সুখময় সংগীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না; ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।"

নবকুমার সুন্দরীর অনুসরণ করিয়া সেই কুটীরে পৌঁছিল। নিস্পন্দ হইয়া হৃদয়মধ্যে আলোড়ন করিতে লাগিল। "এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র।" কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরদিন সেই মায়াবিনীর সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে নবকুমার আবার সেইখানে আসিল। কিন্তু দেখা হইল না। কিন্তু রাত্রিকালে কাপালিক যখন তাহাকে লইয়া বধ্যভূমির দিকে রওনা হইল তখন পশ্চাৎ হইতে এই রমণীই তাহাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, কাপালিকের উদ্দেশ্য জানাইয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল। পরে রমণীই খড়্গ লুকাইয়া এবং তাহার বাঁধন কাটিয়া ফেলিয়া তাহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। অতএব প্রথমদর্শনে কপালকুণ্ডলার মোহিনীরূপে নবকুমার যেমন মুগ্ধ হইল তেমনি পরে কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় আপ্লুত হইল। সে কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসিল।

কপালকুণ্ডলা তাহার গৃহে সাদরে গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া নবকুমার আনন্দিত হইল। ইহার জন্য সে খুবই চিন্তিত ছিল। অনাদরের ভয়ে কপালকুণ্ডলাকে লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করে নাই।—অথচ তাহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এক্ষণে নবকুমারের বাঁধ-ভাঙা প্রেম প্রকাশ পাইল।

তাহার নিকট সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। নবকুমার একান্ত-ভাবেই কপালকুণ্ডলাকে ভালবাসিয়াছিল। কপালকুণ্ডলার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হইয়াছিল। সেজন্য মতিবিবির রূপ যৌবন নবকুমারকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। এমন কি মতিবিবি তাহার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী জানিয়াও নবকুমার তাহার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে নাই বরং এক অজানা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইল।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারের জন্য কোন আকর্ষণ বোধ না করিলেও কপাল-কুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের আকর্ষণের কোন অভাব দেখা যায় নাই। সে কপালকুণ্ডলাকে চোখে চোখে রাখিত। নবকুমারের আকর্ষণ প্রেমের জন্যই। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার অবিশ্বাস হঠাৎ তীব্রতর হইয়া উঠিল। নবকুমারের আপত্তি সত্ত্বেও কপালকুণ্ডলা একাকী রাত্রে বনে শ্যামাসুন্দরীর জন্য ঔষধ তুলিতে যাওয়ায় সেই রাত্রে নবকুমার হৃদয়বেদনায় অন্তঃপুরে আসে নাই। পরদিন ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পাইয়া নবকুমারের মধ্যে জীবিত মানুষের চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলে যেরূপ হয় সেইরূপ হইল। "নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল, পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল; শেষে বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইতিপূর্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন, অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বন-ভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরানিবার্য বৃশ্চিকদংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি এক দিনের তরে সন্দেহকে স্থান দান করেন নাই। অদ্যও সন্দেহকে স্থান দিতেন না। কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

নবকুমার সেদিন নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিল। কপাল-কুণ্ডলার মহাপাপ প্রত্যক্ষ করিয়া আপনার প্রাণসংহার করিবার স্থির করিল। কারণ, জীবনের এই দুর্বহ ভার বহন করা তাহার নিকট অসম্ভব বোধ হইল। কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের এই অবিশ্বাস

কাপালিকের সহায়তায় দৃঢ়তর হইল। কাপালিকের সাহায্যে ব্রাহ্মণবেশীর সহিত কপালকুণ্ডলার 'মিলন' নবকুমার প্রত্যক্ষ করিল। অপ্রকৃতিস্থ নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বধ করিতে স্বীকৃত হইল। নবকুমারের মানসিক অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। কপালকুণ্ডলাকে গঙ্গায় স্নান করাইতে গিয়া কপালকুণ্ডলার নিকট তাহার সেই হৃৎকম্প ধরা পড়িল। নবকুমার বলিল সে কাঁদিতে পারিতেছে না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছে। কপালকুণ্ডলা তাহার কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নবকুমার বলিল, "তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই—" বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। "তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপাল-কুণ্ডলার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল।

"মৃন্ময়ি!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর! এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা উত্তরে কহিল, "আজি যাহাকে দেখিয়াছ,—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি।" তথাপি কপালকুণ্ডলা আর নবকুমারের গৃহে প্রত্যাগমন করিল না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিবার স্থির সংকল্প লইয়া সে আসিয়াছে। এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পায়ের নীচের মাটি নদীপ্রবাহ মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কপালকুণ্ডলাও জলে পড়িয়া গেল। কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া নবকুমারও লাফ দিয়া জলে পড়িল। আর উঠিল না। নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলা উভয়ের সলিল সমাধি হইল।

পূর্বসংস্করণে ইহার সমাপ্তি অন্যরূপ ছিল। সেখানে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ছিল—

"কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, কি কি, এই আশঙ্কায় কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন

তাহা না হইলে ভয়ঙ্কর স্বভাব মহাপুরুষের হাত হইতে অত সহজে তাহারা রেহাই পাইত না। রাত্রির অন্ধকারের জন্য বালিয়াড়ির স্তূপ-মূল ক্ষয়িত হইয়াছিল তাহা কাপালিক লক্ষ্য করে নাই এবং সেজন্য স্তূপ-শিখর হইতে পড়িয়া তাহার দুই বাহু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। রাত্রি বলিয়াই অধিকারী নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলাকে সহজে আশ্রয় দিতে পারিয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারই দস্যু তস্করের উপযুক্ত সময়। একদিকে রাত্রির অন্ধকার অন্যদিকে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এমন সময়ে দস্যুরা মতিবিবির পালকিবাহকদের আক্রমণ করিল। রাত্রি প্রায় চার-ছয় দণ্ডের সময় নবকুমার দস্যু নিগৃহীতা মতিবিবিকে দেখিতে পাইল। মতিবিবিও রহস্য-মণ্ডিতা। রাত্রির নাট্য শাখাতেই তাহার লীলা রঙ্গভূমি। এই মতিবিবি আবার নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। বিস্মৃতির অন্ধকারে যখন পদ্মা-বতীর স্মৃতি বিলীন হইয়া গিয়াছিল তখন রাত্রির অস্পষ্ট আলোকে নবকুমার-মতিবিবির সাক্ষাৎ করাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে কপালকুণ্ডলার যে মোহিনী রূপ দেখিয়া নবকুার মুগ্ধ, রাত্রির সেই অস্পষ্ট আলোকে মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া তাহার রূপের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কপালকুণ্ডলার অঙ্গে সমস্ত অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া মতিবিবি তাহাকেই স্বীকৃতি দিল। সন্ধ্যাকালে রাত্রি সমাগমে শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলার সঙ্গে 'পরশপাতরের' আলোচনা করিয়াছে। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশীকরণের ঔষধ তুলিবার কালও রাত্রি। মতিবিবি এবং কাপালিকের ষড়যন্ত্রের জন্য কপচ রাত্রিই শ্রেয়। রাত্রির অন্ধকারে কত ষড়যন্ত্রের কথা ইতিহাসের পাতায় পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। কাপালিকের পক্ষে কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিয়া তাহার গৃহের সন্ধান জানা ঝড়ের রাত্রে বিদ্যুতালোকেই সম্ভব। কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন-দর্শন তাহার ভবিষ্যৎ স্থিরীকরণে খুবই সাহায্য করিয়াছিল। স্বপ্নে সে তাহার সলিল সমাধি দেখিয়াছিল। ব্রাহ্মণবেশী তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল। তাহার এই সাহায্যের কথা চিন্তা করিয়াই কপালকুণ্ডলা পরদিন ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ঠিক করিল আর তাহাতেই ঘটনার পরিণতি অনিবার্য হইয়া উঠিল। রাত্রির অন্ধকার প্রিয়-মিলনের উপযুক্ত সময়। সেজন্য কপালকুণ্ডলার চরিত্রের প্রতি নবকুমারের সন্দেহ দৃঢ় হইল।

কাপালিকের সাহায্যে সে দূর হইতে ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার 'মিলন' প্রত্যক্ষ করিল।—উপরে বর্ণিত সকল ঘটনা এবং ক্রিয়ার জন্য রাত্রি প্রয়োজন হইয়াছিল। ঘটনার প্রকৃতির উপরেই তাহার স্থান-কাল নির্ভর করে। বৈপরীত্যে শিল্পবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। শিল্পের ঔচিত্য বিচারে এই কাল নির্ণয় যথার্থ হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে দুই জায়গায় "প্রদীপ নিবিয়া গেল" ব্যক্ত হইয়াছে। প্রদীপের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের এক প্রকার দুর্বলতা আছে। তাঁহার আরও কয়েকটি উপন্যাসে ইহার উল্লেখ আছে। দুর্গেশনন্দিনীর দ্বিতীয় খণ্ড বিংশ পরিচ্ছেদের নাম "দীপ নির্বাণোন্মুখ," বিষবৃক্ষের চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদের নাম "স্তিমিত প্রদীপে" এবং ইন্দিরার দশম পরিচ্ছেদের নাম "আশার প্রদীপ।" কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মতিবিবি নবকুমারকে অপরিচিত যুবক জানিয়া তাহার সহিত প্রগলভতা-জনিত পরিহাস করিয়াছে, কিন্তু যে মুহূর্তে নবকুমার নিজের নাম বলিল অমনি প্রদীপ নিবিয়া গেল। সে ভাবিতে পারে নাই এতক্ষণ যাহার সহিত সে সরস আলোচনা করিতেছিল, যাহার কাঁধে ভর দিয়া পান্থনিবাস পর্যন্ত আসিয়াছিল সে আর কেহই নহে, তাহার স্বামী। চৌদ্দ বছর পরে আকস্মিক ভাবে স্বামীর সঙ্গে পথে তাহার দেখা হইল। তাহার মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। তাহার মুখরতা ব্যঙ্গ সবই মিলিয়া গেল। এতক্ষণ তাহার মনোভাব যেন উজ্জ্বল প্রদীপশিখার মতই ছিল, এখন নবকুমারের পরিচয় পাইয়া তাহার মুখে কালিমার ছায়া পড়িল। প্রদীপ নিবিয়া যাওয়া তাহারই দ্যোতক। তাহা ছাড়া হাস্য-পরিহাসমুখর যে নারী দস্যু-নিগৃহীতা হইয়াও স্বভাব চাপল্য হারায় নাই, যে নারীর উজ্জ্বল সৌন্দর্য নবকুমারের মনে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই নারীই পরবর্তীকালে নবকুমারের জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিল, যাহার ফলে নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলা উভয়েরই বিনাশ হইয়াছিল। হঠাৎ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার মধ্যে যেন তাহার অশুভ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে নবকুমারের জীবনে যে গভীর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবে এ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার মধ্যে যেন তাহার সূচনা রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিল্প-কৌশল অনবদ্য।

আবার চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদে "গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল।"—আর একটি অমঙ্গলের সূচনা। রহস্যময়তার ইঙ্গিত। কপালকুণ্ডলা বনে যাইবার সময় তাহার শয়নগৃহের প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে গৃহের বাহিরে যাইতে না যাইতেই তাহার প্রদীপটি নিবিয়া গেল। অর্থাৎ তাহাকে আর নিজের শয়নগৃহে ফিরিতে হয় নাই। ঘটনার দ্রুত বিপর্যয়ে তাহার জীবনের দীপই নিবিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর ভাবে প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার মধ্যে অতি সংক্ষেপে অনেক কথা বলিয়া দিলেন। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের অধিকাংশ ঘটনা যদি রাত্রিকালে সংঘটিত না হইত তাহা হইলে প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার এই দ্যোতনা সৃষ্টি সম্ভব হইত না।

পূর্বে বলিয়াছি, কপালকুণ্ডলা এক রহস্যময়ী নারী। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন কপালকুণ্ডলার "মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।" সেজন্যই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র রাত্রির পটভূমিকায়ই কপালকুণ্ডলার গতিবিধি আবদ্ধ রাখিয়াছেন, যাহাতে তাহার মোহিনী শক্তি সর্বত্র অনুভূত হইতে পারে। এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনাবলী যেন এক দুর্জ্ঞেয় অলৌকিক জাদুকরী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। রাত্রি যেন সেই ঐন্দ্রজালিকের জাদুদণ্ড।

'কপালকুণ্ডলা' বাংলা সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট রোমান্স। উপন্যাস যেন বাস্তবজীবনের দিবালোক আর রোমাঞ্চ রাত্রির রহস্য। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে রাত্রির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। রোমাঞ্চকর ঘটনাবস্তুর বর্ণনায়, ট্র্যাজেডির ভীষণতায়, পরিবেশের বৈচিত্র্যে এবং আকস্মিক পরিস্থিতি রচনায় এখানে রাত্রির অন্ধকার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কপালকুণ্ডলা রাত্রির মতই নৈসর্গিক, রাত্রির মতই সৌন্দর্যের তারকাখচিত, রাত্রির মতই সে রহস্যময়ী। রাত্রির মত ভয়ঙ্কর এক কাপালিক কর্তৃক সে প্রতিপালিতা, রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবানীর চরণে তাহার জীবন উৎসর্গিতা, রাত্রিকালেই বনে বনে তাহার বিচরণ সময়, রাত্রিকালেই তাহার আবির্ভাব এবং রাত্রির অন্ধকারেই অন্ধকার জলতলে তাহার বিলয়। শিল্পসৃষ্টিতে ইহার মূল্য অসামান্য।

(৩০) "কপালকুণ্ডলায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে এক বৎসর লাগিয়াছে। সময়ের গতি এই উপন্যাসে অতি সুকৌশলে সূচিত হইয়াছে।"—সমালোচক যে কৌশলের কথা বলিয়াছেন তাহা আলোচনা কর।

॥ উত্তর ॥ "সময়ের গতি দুই ভাবে দেখান যাইতে পারে। এক বাহিরের কোন যন্ত্রের সাহায্যে—যেমন ঘড়ির কাঁটার আবর্তন অথবা অনুরূপ কোন ব্যাপারের দ্বারা। আর একটি উপায় হইতেছে চরিত্রের পরিবর্তনের সাহায্যে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে 'পক্ষ', 'একদিবস', 'দুইদিবস', 'অপরাহ্ণ', 'সন্ধ্যা', প্রভৃতি শব্দের ছড়াছড়ি; তবু কালের গতি স্পষ্ট হয় নাই। 'কপালকুণ্ডলা'-য় শব্দের বাহুল্য নাই; অথচ সময়ের পরিবর্তন সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই এবং যে দুইটি উপায়ের কথা উল্লিখিত হইল সেই দুইটিই অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে দেখি মতিবিবি উড়িষ্যা হইতে আগ্রা যাত্রা করিয়াছেন; গ্রন্থের শেষে দেখি মতিবিবি আগ্রার বাস উঠাইয়া বঙ্গদেশে সপ্তগ্রামে উপনীত হইয়া তাঁহার কার্যে ব্যাপৃত আছেন। সেই আমলে আগ্রা হইতে উড়িষ্যায় আসিতে তিন চার মাস লাগিত। তাঁহার যাতায়াতে ছয় আট মাস লাগিয়া থাকিবে। তাহার পর তাঁহার বাদশাহের নিকট বিদায় লইতে, আগ্রার বাস উঠাইতে, সপ্তগ্রামে আসিয়া বাসস্থান ঠিক করিয়া নবকুমারের সঙ্গে দুই একবার সাক্ষাৎ করিতে কয়েকমাস লাগিয়াছে। সর্বসমেত প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকিবে। চতুর্থ খণ্ডের প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল নবকুমারের গৃহিণী।" আর একদিক হইতেও এই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থের যখন আরম্ভ তখন সেলিম সদ্য বাদশাহ হইয়াছেন; এমন কি যিনি পরে বাদশাহেরও বাদশাহ হইয়াছিলেন তিনিও এই সংবাদ পান নাই। মতি যখন আগ্রা ত্যাগ করেন তখনও জাহাঙ্গীর বাদশাহ মেহের উন্নিসাকে সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হন নাই, কিন্তু তাঁহার কৌতূহলে ভবিষ্যতের কার্যকলাপ সূচিত হইয়াছে। ইতিহাসের এই আভাস খুব স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নহে, কিন্তু ইহাও অন্যান্য প্রমাণকে সমর্থিত করে।

এই ত গেল বাহিরের বিচার। এই এক বৎসরে চরিত্রের পরিবর্তনও কম হয় নাই। চটিতে যে মতিবিবিকে দেখিয়াছিলাম তাঁহার বুদ্ধি, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও আত্মগরিমা অনন্যসাধারণ। সপ্তগ্রামে যাঁহাকে দেখি তাঁহার পূর্বতেজ আজও অটুট রহিয়াছে কিন্তু সেই চটুলতা নাই, আত্মগরিমার সঙ্গে আত্মাবমাননা, করুণ প্রণয় ভিক্ষা। কপালকুণ্ডলার চরিত্র এত সহজে পরিবর্তিত হইবার নহে। তিনি প্রকৃতি পালিতা, এক বৎসরে সমাজ তাঁহার উপর তেমন গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই। তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ধর্মভীরুতা ও পরোপচিকীর্ষা অটুট রহিয়াছে, কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান হইয়াছে। পূর্বে যে রমণী বিবাহ কাহাকে বলে তাহাই জানিতেন না এখন তিনি 'সতীত্ব', 'অবিশ্বাসিনী' প্রভৃতি কথার মর্ম বুঝিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্তন এক বৎসরে সাধ্য।

সময়ের পরিবর্তন শুধু যে মোটামুটি ভাবেই দেখান হইয়াছে তাহা নহে; এই এক বৎসরের মধ্যে নায়িকাদের জীবনে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাদের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার কালের গতির সঙ্গে ঘটনার গতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখাইয়াছেন। কপালকুণ্ডলার উপর সমাজের প্রভাব কম। সুতরাং তাঁহার কথা কয়েকটি সঙ্কেতময় দৃশ্যে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম ভিক্ষুককে গহনা দান, তারপর শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথন। এই পর্যন্ত সমাজের রীতিনীতি তিনি বুঝিতে পারেন নাই; এমন কি স্বামীকেও 'এই ব্রাহ্মণ-সন্তান' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই দুইটি দৃশ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে মতির চটি ত্যাগ ও বর্ধমানে উপস্থিতির মাঝখানে। তখন মেদিনীপুর হইতে বর্ধমান যাইতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইত। মতিবিবিকে যাত্রা করাইয়া গ্রন্থকার কপালকুণ্ডলার কিছু পরিচয় দিয়া লইলেন। ইহার পর মতিবিবির জীবনে পরিবর্তন আসিয়াছে খুব দ্রুতগতিতে; কপালকুণ্ডলার সামান্য পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহাও অর্ধ-অলক্ষিতে। গ্রন্থকার মতিবিবিকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু পরে মতিবিবি, কাপালিক, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা সকলে মিলিয়া কাহিনীর অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবার ঠিক প্রাক্কালে একটি ক্ষুদ্র দৃশ্যে কপালকুণ্ডলার পরিচয় দিয়া লইলেন। এই সময় মতিবিবি ও কাপালিক জল্পনা করিতেছিলেন এবং একটু পরেই তাঁহারা শেষ সঙ্কল্পে উপনীত হইবেন। সুতরাং গ্রন্থকার এই পরিচয়কে দীর্ঘ না করিয়া

মতিবিবির সঙ্গে কপালকুণ্ডলার ও নবকুমারের সঙ্গে কাপালিকের সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। মতিবিবির কাহিনীতেও এই পরিমাণবোধ ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবকুমারকে দেখিয়াই মতিবিবির হৃদয় আলোড়িত হয়। কিন্তু এক দিনেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসে নাই। প্রথম তিনি মেহের-উন্নিসার মন বুঝিয়া লইলেন। যদি মেহের-উন্নিসার মনের গতি অন্য প্রকার হইত তাহা হইলে হয়ত নবকুমার-সন্দর্শন তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হইয়া থাকিত, তিনিই বাদশাহের প্রধানা বেগম হইতেন। কিন্তু নবকুমারের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রার ভরসা লোপ একই সঙ্গে আসিল। মতিবিবির মত বুদ্ধিমতী রমণী সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই যাচাই করিয়া লইবেন, ইহাই স্বাভাবিক এবং ইহার জন্য কিছু সময় ও নিঃসঙ্গ চিন্তার প্রয়োজন। বর্ধমান হইতে আগ্রা তিন মাসের পথ। এই সময় সমস্ত দিক্ ভাবিয়া তিনি আপন মন ঠিক করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন, "......কেন যে এমন চিত্তপ্রসাদ জন্মিল তাহা মতি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।"

(ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

(৩১) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ঘটনার সমাবেশেও অপরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।"—আলোচনা কর।

॥ উত্তর ॥ 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের "বিমলার ন্যায় মতিবিবিরও একটা পূর্ব ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাস আগ্রার রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই ইতিহাসকে খুব লম্বা অথবা জটিল করেন নাই; কারণ তাহা হইলে মতি অপেক্ষা তাঁহার কাহিনী প্রাধান্য পাইত। শুধু তাহাই নহে, পূর্ব ঘটনাকে বড় করিয়া দেখাইলে মূল আখ্যায়িকার গতি বাধা পাইতে পারে। মতিবিবির সবচেয়ে গভীর রহস্য তাঁহার হৃদয়ে, বাহিরের ঘটনায় নহে। কাজেই বাহিরের রহস্যের সমাধান বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই করিয়া দিয়াছেন। মতিবিবির পূর্ব কাহিনী এমন ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহা আখ্যায়িকার অংশ হইয়া গিয়াছে অথবা আখ্যায়িকার যেখানে ফাঁক ছিল তাহা পূরণ করিয়াছে। প্রথমে অধিকারীর প্রশ্নে নবকুমার যখন

বলিলেন যে, তাঁহার এ পর্যন্ত এক সংসার মাত্র,তখন সেই কথাটা বিশদভাবে বুঝাইয়া বলার জন্য পদ্মাবতীর কথা উত্থাপন করিতে হইল। কিন্তু নবকুমার যতটুকু জানিতেন তদধিক গ্রন্থকার একটি কথাও প্রকাশ করিলেন না। পরে নবকুমারের সঙ্গে মতিবিবির যখন সাক্ষাৎ হইল তখন মতিবিবির ব্যবহারে আমাদের সন্দেহ হইল যে, এই প্রকৃতি চপলা যোষিৎই পদ্মাবতী। আমাদের সন্দেহ মতিবিবি অগোপে দূর করিয়া বলিলেন, "মেরা শৌহর!" তখন আমাদের কৌতূহল হইল যে,কেমন করিয়া পদ্মাবতী মতিবিবিতে রূপান্তরিত হইলেন। মতিবিবি যখন বর্ধমান অভিমুখে রওনা হইলেন তখন গ্রন্থের একটি যতি পড়িল। ইহাকে গ্রন্থকার ভরিয়া ফেলিলেন কপালকুণ্ডলার অভ্যর্থনা প্রভৃতির বর্ণনা দিয়া আর মতিবিবির পূর্ব ইতিহাস জ্ঞাপন করিয়া। লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা ত্যাগ করার সঙ্কল্প করার বর্ণনা পাই তৃতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে, পর পরিচ্ছেদেই দেখি তিনি নবকুমারের নিকট প্রত্যাখ্যান পাইতেছেন এবং এ সাক্ষাৎই প্রথম সাক্ষাৎ নহে। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, আগ্রাত্যাগ ও সপ্তগ্রামে এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে অনেকটা সময় চলিয়া গিয়া থাকিবে। তাহার কোন উল্লেখ নাই কেন? স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও কপালকুণ্ডলার সামান্য পরিবর্তনে তাহার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। বঙ্কিমচন্দ্র এইখানে অন্যরূপ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া থাকিবেন। গ্রন্থের চরম পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে চতুর্থ খণ্ডে. সেইখানে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে অতি দ্রুতবেগে। তখনকার প্রত্যেকটি ভঙ্গি, প্রত্যেকটি কথা ও কার্য অনিবার্য বেগে ট্রাজেডির দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। মতিবিবির আগ্রাত্যাগ ও সপ্তগ্রামে উপস্থিতির মাঝখানে যে ফাঁক আছে তাহা শেষ দুইদিনের দ্রুত পরিণতিতে ভরিয়া গিয়াছে। অন্য কোন বর্ণনা দিলে বা কাহিনীতে আরও জটিলতা আনিলে শেষের এই পরিণতির তীব্রতা নষ্ট হইয়া যাইত। এইজন্য কাপালিকের ইতিহাসও এই দুইদিনের ঘটনার বর্ণনার মধ্যেই সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহার জন্য কোন পৃথক স্থান নির্দেশ করা সম্ভব হয় নাই।

এই উপন্যাসে দুই একটি আকস্মিক ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে এবং তাহারা মূল কাহিনীতে অতি সুন্দর ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বড় আখ্যায়িকায় কখনও কখনও আকস্মিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখাইতে হয়। মনুষ্যজীবন যে

জ্যামিতির রেখার মত সরল নহে, তাহার মধ্যে যে বহু দুর্জ্ঞেয় শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে তাহা এই সকল আকস্মিক ঘটনার অভ্যাগমে সূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই জাতীয় ঘটনাকে প্রাধান্য দিলে জীবন ও আর্টের তাৎপর্য নষ্ট হইয়া যায়। সেক্সপীয়র এই বিষয়ে পরিমাণ-বোধের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। একটি উদাহরণের সাহায্যে তাঁহার কৌশলের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। ডেস্‌ডিমোনা খুব সঙ্কট মুহূর্তে তাহার রুমাল হারাইল আর সেই রুমাল পড়িল গিয়া ইয়াগোর হাতে। ইহার সাহায্যে ইয়াগো ওথেলোর মনে পূর্ব সন্দেহ দৃঢ় করিয়া দিল। ঐ রুমাল-হারান ডেস্‌ডিমোনার দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ; কিন্তু ইহা মুখ্য কারণ নহে। ইয়াগো পূর্বেই ওথেলোর মনে সন্দেহের বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছিল; ইহা সেই সন্দেহকে আরও পাকা করিয়া দিল মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা এক জাতীয় না হইলে তাঁহাদের বিবাহ হইতে পারিত না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই আকস্মিক ঐক্যকে খুব গৌণ করিয়া দেখিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণকন্যা কি না এবং নবকুমারের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ সর্বতোভাবে শাস্ত্রসঙ্গত কিনা সেই বিষয়ে নবকুমার বা তাঁহার মা কোন অনুসন্ধান করেন নাই। অধিকারীও তেমন ব্যস্ত হয়েন নাই; এবং যদিও সেইদিন বৈবাহিক যোগ ছিল না তবু গোধূলি লগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কাপালিক বালিয়াড়ির শিখর হইতে পড়িয়া যাইয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং ইহার সঙ্গে আখ্যায়িকার যোগ আছে। কিন্তু তাঁহার হাত ভাঙ্গিবার পূর্বেই কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন এবং অধিকারীর নিকট তাঁহারা এক দিনের বেশী থাকেন নাই। এইরূপ আকস্মিক ব্যাপারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও তাৎপর্যময় হইতেছে কপালকুণ্ডলা কর্তৃক ব্রাহ্মণ-বেশীর চিঠি হারান। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে পাইয়াও পান নাই, চিনিয়াও চিনিতে পারেন নাই। অব্যবহিত-পূর্ব রাত্রে তাঁহার নিষেধ অবহেলা করিয়া কপালকুণ্ডলা গভীর রাত্রিতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেইখানে অপর কাহার সঙ্গে কি কথা হইয়াছে তাহা তিনি স্বামীকে বলেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পড়িয়া নবকুমার "প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা।" ঘটনা যত ক্ষুদ্রই হউক, কখনও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইতে পারে না; তাহার শাখা-প্রশাখা

থাকিবেই। এই চিঠি-হারান কেবল যে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিল তাহাই নহে চিঠি খুঁজিতে যাইয়া কপালকুণ্ডলা কবরী খুলিয়া সমস্ত চুল আলুলায়িত করিলেন এবং বাহিরে যাইবার সময় অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্তিনী হইয়া চলিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, যখন তিনি ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন তখন তাঁহার অবিন্যস্ত কেশের রাশি ব্রাহ্মণবেশীকে স্পর্শ করিয়াছে। দূর হইতে নবকুমার ইঁহাদের কথা শুনিতে পান নাই, কিন্তু একজনের চুল অপরের দেহে প্রসারিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ মাত্র রহিল না যে কপালকুণ্ডলা অসতী। এমনি করিয়া একটি তুচ্ছ ব্যাপার ইহাদের জীবনে চরম অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এইখানে সেক্সপীয়রের রীতির (বিশেষ করিয়া ডেস্‌ডিমোনার রুমাল-হারান ব্যাপারের) প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছেন তাহার তুলনা সেক্সপীয়রের নাটকেও বিরল।" (ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

(৩২) কপালকুণ্ডলা "উপন্যাসে দুই-একটি আকস্মিক ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে এবং তাহা মূল কাহিনীতে অতি সুন্দর ভাবে মিশিয়া গিয়াছে।"—উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার কর।

।। উত্তর ।। একত্রিশ নম্বর প্রশ্নোত্তরের শেষার্ধ দ্রষ্টব্য।

(৩৩) একজন সমালোচক বলিয়াছেন, কপালকুণ্ডলা "উপন্যাসের প্রধান অবলম্বনীয় বিষয় কপালকুণ্ডলার অপরিণত যৌনবৃত্তি।"—উক্তিটি কতদূর সঙ্গত আলোচনা কর।

।। উত্তর ।। সমালোচক বলিয়াছেন, "সপ্তগ্রামে এক বৎসর স্বামীর ঘর করিয়াও সে বুঝিল না যে, স্বামী কী, নারীদেহ কী বস্তু। কপালকুণ্ডলা কাপালিক ও অধিকারীর সাহচর্যে বড় হইয়াছে। সমুদ্র সৈকতে অথবা অরণ্যানীর মধ্যে শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করিলেই প্রণয়বিদ্যা অনধীত থাকে না।...শকুন্তলা ও মীরাণ্ডার প্রণয়োৎপত্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর। কিন্তু বিবাহিতা ও স্বামি-সহবাসিনী কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের কুমারী কন্যাই থাকিবে ইহা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। প্রকৃতির শিশু এইরূপ হইবে

কেন? প্রকৃতি ত ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে নাই। স্বভাব যে ferociously sexual। তবে কি মনে করিব কপালকুণ্ডলা is a study in sexual sterility? কপালকুণ্ডলার সমুদ্রসৈকতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক; কিন্তু নবকুমারের প্রতি উপেক্ষা অস্বাভাবিক। নবকুমারের প্রতি তাহার কোনরূপ প্রণয় অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় গ্রন্থে নাই; সমুদ্রপ্রেম ও যৌনপ্রেম উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকা বিচিত্র ছিল না; কিন্তু এই দ্বন্দ্বের ইঙ্গিতও উপন্যাসে পাওয়া যায় না।"

"উপরি-উদ্ধৃত সুচিন্তিত, তীব্র সমালোচনা সম্পর্কে প্রথমেই একটি কথা বলা দরকার। যৌন প্রবৃত্তি নানা রমণীতে নানাভাবে পরিণতি লাভ করে। বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন, '......the capacity for it varies like any other capacity. I remember one woman, who had a quite innocent sort of affectionate worship for me, explaining that she had to leave her husband because sexual intercourse hurt her physically, 'like some one sticking a finger into my eye.' Between this extreme case and the heroine of my first adventure, who was sexually insatiable there is an enormous range of sensation......' বার্ণার্ড শ' যে দুই চরম দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কপালকুণ্ডলা ইহাদের একটির স্বজাতীয়া এবং মীরাণ্ডা ও শকুন্তলা অপর শ্রেণীর সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যসম্পন্না। কপালকুণ্ডলার যৌন প্রবৃত্তির পূর্ণ উন্মেষ হয় নাই, এই কথা বলিলে বঙ্কিমের উদ্দেশ্যেরই পুনরুক্তি করা হয়। দ্বিতীয়তঃ স্বভাব সৌন্দর্য 'ferociously sexsual' নহে, অ-যৌন। এই সৌন্দর্য কাহারও মন গভীর-ভাবে আকর্ষণ করিলে তাহার যৌন প্রকৃতি (অথবা অন্য যে কোন প্রবৃত্তি) সমধিক স্ফূর্তি পাইবে না।

এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের যে পরিণতি দেখান হইয়াছে তাহার মধ্যে স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্যের অভাব হইয়াছে কিনা। কপালকুণ্ডলা নির্জন সমুদ্রতীরে প্রকৃতির আহ্বান অনুভব করিয়াছেন, পুরুষের নহে। নরঘাতী কাপালিকের ব্যবহার মনুষ্যজাতি সম্পর্কে শুধু একটি ভাবেরই প্রেরণা যোগাইয়াছে—তাহা প্রেম নয়, অনুকম্পা। নবকুমারের সংস্পর্শে আসিয়াও প্রথমে করুণারই উদ্রেক হইয়াছে, তাই শুধু যে বিবাহের

কথাই মনে হয় নাই তাহা নহে নবকুমারের সঙ্গ পাইবার আকাঙ্ক্ষাও জাগে নাই। অবশ্য ইহার পর সপ্তগ্রামে আসিয়া কপালকুণ্ডলা এক বৎসর নবকুমারের সঙ্গে বাস করিয়াছেন এবং যৌন সম্পৃক্তির আস্বাদ পাইয়াছেন। (তাহা না হইলে তিনি 'অবিশ্বাসিনী' কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেন না।) সমালোচক প্রশ্ন করিয়াছেন, এই নূতন আকর্ষণ ও সমুদ্রের আহ্বান—ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হওয়া কি স্বাভাবিক নহে? একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, নবকুমারের গৃহিণীত্ব কপালকুণ্ডলার মনে রেখাপাত করিয়াছে এবং তাহার মধ্যেও কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা স্বামীকে পাইয়াছেন যৌন আকর্ষণের মধ্য দিয়া নহে, কর্তব্যবোধের আহ্বানে। বিবাহের পূর্বে ও পরে অধিকারীর সঙ্গে তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার মধ্যে কর্তব্যবোধেরই উল্লেখ আছে, প্রণয়ের নহে। নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলা কর্তব্যপরায়ণা গৃহিণী ছিলেন, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহিলেও গৃহত্যাগের কথা মনে আসে নাই। কিন্তু নবকুমার শুধু ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতে চাহিবেন কেন? এই অপরিতৃপ্তিই তাঁহার মিথ্যা সন্দেহের স্পর্শে এবং মতিবিবির প্রতি পরোপরিচিকীর্ষায় সংসারের সমস্ত মায়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল; কপালকুণ্ডলা যে গৃহিণীপণায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহা শুধু বিশ্বস্ততার অনুরোধে, সেই বিশ্বাসেই যখন আঘাত পড়িল তখন সংসারের সমস্ত আকর্ষণ চলিয়া গেল। এক বৎসরের সহবাস যে বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছিল, নবকুমারের সন্দেহ তাহা শিথিল করিয়া দিল। মতবিবি যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা হয়ত এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করিত, কিন্তু নবকুমারের ব্যবহার কপালকুণ্ডলার সকল সমস্যার সমাধান করিয়া তাঁহার মনকে প্রকৃতির উন্মুক্ততার প্রতি অনিবার্য বেগে ধাবিত করিয়া দিল।" (ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

(৩৪) "কপালকুণ্ডলা'র একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপূর্ব সাঙ্কেতিকতা যাহা বৃহত্তর জগতের আভাস আনিয়া দেয় এবং ইহারই জন্য নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক শক্তির মধ্যে অপরূপ সমন্বয় সাধিত হইয়াছে"—আলোচনা কর।

॥ উত্তর ॥ "কপালকুণ্ডলা প্রতিপালিত হইয়াছেন সমুদ্রের উপকূলে বিজন বনে। তাঁহার চরিত্র প্রকৃতিপরিপুষ্ট এবং নবকুমারের গৃহের নিকটে

যে বিস্তীর্ণ উপবন ছিল সেইখানে তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্ক অতিনীত হইয়াছে ; সমুদ্র-প্রতিপালিতা সমুদ্রের মধ্যেই চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মতিবিবি আবার রাজপ্রাসাদের ভূস্বর্গে কাটাইয়াছেন ; তিনিও কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন এই সমুদ্রতীরবর্তী উপবনে। কপালকুণ্ডলার চরিত্র ও জীবন প্রকৃতির লীলার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। তাঁহার দেহের রূপ ও কণ্ঠের মাধুর্যও যেন প্রকৃতির মহিমার অংশ। তাঁহার কটাক্ষ সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রলেখার ন্যায় ; তাঁহার দেহে এমন একটি মোহিনী শক্তি ছিল যে, তাহা গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে দাঁড়াইয়া না দেখিলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। তাঁহার কণ্ঠের শব্দ পবনে আন্দোলিত হইয়াছে, বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইয়াছে, সাগরনাদে মন্দীভূত হইয়াছে। তাঁহার লীলাচঞ্চল গতি নিসর্গমায়ার মতই নবকুমারকে মুগ্ধ করিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে, বিভ্রান্ত করিয়াছে। যখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে রক্ষা করিয়াছেন তখনও তাঁহাকে মায়া বলিয়াই ভ্রম হইয়াছে ; তাঁহার নিঃশব্দ সঞ্চার ও নিঃশব্দ অন্তর্ধানে নবকুমার চমৎকৃত ও বিমূঢ় হইয়াছেন। যখন এই পরমাশ্চর্য রমণী নবকুমারের বন্ধন কাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন মনে হইয়াছে এ এক মোহিনী মায়া, যাহার করে খড়্গ "দুলিতেছে"।

এইখানে প্রকৃতির প্রভাব ও অনৈসর্গিক জগতের সঙ্কেতের মধ্যে অতি অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নিয়তির কার্যকলাপের অতি সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলা'র এই সম্পর্কে তাঁহার কোন স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না ; কিন্তু অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কৌতূহল জাগরিত হইয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে অনির্দেশ্য ইঙ্গিত তাঁহার কাছে পৌঁছিয়াছে। এই ইঙ্গিতের সঙ্গে মানুষের প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির লীলায় যোগ আছে, কিন্তু সেই সংযোগকে কোন সরল সহজ আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ করা যায় না। ইহার মধ্যে মতিবিবির 'ললাটলিখন' আছে আবার সমুদ্রতীরের মোহিনী মায়াও আছে —আর সকলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে এক অদৃশ্যশক্তি, যাহার সঙ্কেত কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও অধিকারী খুঁজিতেছেন। কপালকুণ্ডলা যে বিবাহে রাজী হইলেন তাহার একটি কারণ এই যে, অধিকারীর বিল্বপত্র

ভবানী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলা সুখী হন নাই। তিনি সমুদ্রতীরের অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করিতেন ; কিন্তু তাঁহার দেওয়া অভিন্ন বিল্বপত্র যে দেবীর পদতল হইতে পড়িয়া গিয়াছিল ইহাই তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক পীড়া দিতে লাগিল। বোধহয় সমুদ্রতীরের আকর্ষণ ও দেবীর অপ্রসাদ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে গৃহধর্মে উদাসীন করিয়াছিল। তারপর ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কাপালিক-দর্শন। এইখানেও নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিকের মধ্যে অপরূপ সম্মিলন। ব্রাহ্মণবেশীর স্বরূপ সম্পর্কে কপালকুণ্ডলার পূর্বহইতেই সন্দেহ হইয়াছিল এবং রাত্রিতে যে ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণবেশীরও আবির্ভাব হইল। যে অনিবার্য শক্তি তাঁহাকে পুনরায় বাহিরে লইয়া গেল তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে এই ইঙ্গিতময় স্বপ্ন। "অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা ; কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্যমধ্যে যে সহচর পাইয়াছিলেন তাহার ভীমকান্ত গুণময় রূপ।" পরে তিনি যে আত্মবিসর্জন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন তাহার মধ্যেও নানাশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। কপালকুণ্ডলার মন একেবারে নিঃসঙ্গ, পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না ; তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? তারপর নিজের স্বপ্ন ও কাপালিকের স্বপ্ন তাঁহার কাছে ভবানীর সুনিশ্চিত প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রতীত হইল ; পঞ্চভূতের যে বন্ধন ছিল তাহাও শিথিল হইল ; কপালকুণ্ডলা নৈসর্গিক অনৈসর্গিক ও অন্তরস্থ-শক্তির আহ্বানে জীবন বিসর্জনে কৃতসংকল্প হইলেন।" (ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

(৩৫) 'সাগরতীর-বাসিনী, কাপালিক-প্রতিপালিতা, চির-সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার মূর্তি কল্পনায় বঙ্কিম যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একজন বাঙালী ঔপন্যাসিকের পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়কর।'—আলোচনা কর।

॥ উত্তর ॥ "আমাদের রুদ্ধ-দ্বার, সংকীর্ণ পরিসর বাস্তব-জীবনে রোমান্সের উদার আলোক ও মুক্তবায়ু নিতান্তই বিরল-প্রবেশ। সময়ে সময়ে আমরা বৈদেশিক সাহিত্যের অনুকরণ করিয়া বিদেশপ্রচলিত প্রণালীর দ্বারা আমাদের বাস্তব-জীবনে রোমান্সের উচ্ছৃসিত প্রবাহ বহাইতে চাহি ;

কিন্তু বাস্তব-জীবনের সহিত অসামঞ্জস্যের জন্য এই চেষ্টা সার্থক ও শোভন হইয়া উঠে না। যেমন প্রত্যেক দেশের মাটিতে এক এক বিশেষ রকম ফুল রঙীন হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রত্যেক দেশেই রোমান্স তথাকার বাস্তব-জীবনের সহিত এক নিগূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, সেই বাস্তব-জীবনেরই একটা উচ্চতর বিকাশ। যেমন সে রস আমরা পারিবারিক জীবনে ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে মন প্রাণ দিয়া খুঁজি, তাহাই সাহিত্যে গানের সুর হইয়া বাজিয়া উঠে, সেইরূপ রোমান্সের স্বপ্নও আমাদের বাস্তব-জীবন-বৃন্তের রঙীন ফুল মাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বা বিচিত্র, বিরোধ-জটিল প্রেমের অপ্রত্যাশিত বিকাশের মধ্য দিয়া রোমান্সের অনুসন্ধান হয়; ইউরোপীয় সভ্যতার এই স্বাভাবিক বিকাশের পথেই রোমান্স জীবনে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু ইতিহাস বা প্রেমের মধ্যে যে রোমান্সকে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের উপন্যাসে ঠিক স্বাভাবিক হয় না। বাস্তব-জীবনের ঠিক অনুবর্তন করে না। কেন না পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ইউরোপের মত আমাদের দেশে ইতিহাস বা রাজনৈতিক সংঘর্ষ সাধারণ জীবনের উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করে নাই। প্রেমের চিরন্তন লীলা আমাদের সাহিত্যে বা জীবনে ছিল না, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে; কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে প্রেমের বিচিত্র ধারা যেরূপ নূতন নূতন বিস্ময়ের মধ্যে বিকশিত হইয়াছে, আমাদের দেশে সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ঠিক সেরূপ হইতে পারে নাই। প্রেম বাহিরের দিকে বৈচিত্র্য ও বিস্ময়কর উন্মেষ লাভ না করিয়া, অন্তর্মুখী, গভীর ও একনিষ্ঠ হইবার দিকে চলিয়াছে। অবশ্য আমাদের অতীত যুগের সামাজিক অবস্থা যে ঠিক বর্তমানের মত নীরস ও বৈচিত্র্যহীন ছিল তাহা নহে। আমাদেরও একটা বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় যুগ ছিল, আমাদেরও জীবন এককালে দুঃসাহসিকতার রুদ্রতালে আবর্তিত হইত, আমাদেরও প্রেম হয়ত একটা গভীর ও প্রবল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজকাল আমাদের জীবনের ধারা এরূপ পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে, পুরাতন প্রণালী হইতে এত দূরে সরিয়া গিয়াছে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিকল্পনা দ্বারাও সেই পুরাতন দিনের জীবনযাত্রা পুনর্জীবিত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই পুরাতন আবেগ কোন্ চিরবিস্মৃতির মরুভূমে

ভবানী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলা সুখী হন নাই। তিনি সমুদ্রতীরের অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করিতেন; কিন্তু তাঁহার দেওয়া অভিন্ন বিল্বপত্র যে দেবীর পদতল হইতে পড়িয়া গিয়াছিল ইহাই তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক পীড়া দিতে লাগিল। বোধহয় সমুদ্রতীরের আকর্ষণ ও দেবীর অপ্রসাদ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে গৃহধর্মে উদাসীন করিয়াছিল। তারপর ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কাপালিক-দর্শন। এইখানেও নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিকের মধ্যে অপরূপ সম্মিলন। ব্রাহ্মণবেশীর স্বরূপ সম্পর্কে কপাল-কুণ্ডলার পূর্বহইতেই সন্দেহ হইয়াছিল এবং রাত্রিতে যে ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণবেশীরও আবির্ভাব হইল। যে অনিবার্য শক্তি তাঁহাকে পুনরায় বাহিরে লইয়া গেল তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে এই ইঙ্গিতময় স্বপ্ন, "অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা; কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্যমধ্যে যে সহচর পাইয়াছিলেন তাহার ভীমকান্ত গুণময় রূপ।" পরে তিনি যে আত্মবিসর্জন করিবার সকল্প গ্রহণ করিলেন তাহার মধ্যেও নানাশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। কপালকুণ্ডলার মন একেবারে নিঃসঙ্গ, পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না; তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? তারপর নিজের স্বপ্ন ও কাপালিকের স্বপ্ন তাঁহার কাছে ভবানীর সুনিশ্চিত প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রতীত হইল; পঞ্চভূতের যে বন্ধন ছিল তাহাও শিথিল হইল; কপালকুণ্ডলা নৈসর্গিক অনৈসর্গিক ও অন্তরস্থ-শক্তির আহ্বানে জীবন বিসর্জনে কৃতসংকল্প হইলেন।" (ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

(৩৫) 'সাগরতীর-বাসিনী, কাপালিক-প্রতিপালিতা, চির-সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার মূর্তি কল্পনায় বঙ্কিম যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একজন বাঙালী ঔপন্যাসিকের পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়কর।'—আলোচনা কর।

॥ উত্তর ॥ "আমাদের রুদ্ধ-দ্বার, সংকীর্ণ পরিসর বাস্তব-জীবনে রোমান্সের উদার আলোক ও মুক্তবায়ু নিতান্তই বিরল-প্রবেশ। সময়ে সময়ে আমরা বৈদেশিক সাহিত্যের অনুকরণ করিয়া বিদেশপ্রচলিত প্রণালীর দ্বারা আমাদের বাস্তব-জীবনে রোমান্সের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ বহাইতে চাহি;

কিন্তু বাস্তব-জীবনের সহিত অসামঞ্জস্যের জন্য এই চেষ্টা সার্থক ও শোভন হইয়া উঠে না। যেমন প্রত্যেক দেশের মাটিতে এক এক বিশেষ রকম ফুল রঙীন হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রত্যেক দেশেই রোমান্স তথাকার বাস্তব-জীবনের সহিত এক নিগূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, সেই বাস্তব-জীবনেরই একটা উচ্চতর বিকাশ। যেমন সে রস আমরা পারিবারিক জীবনে ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে মন প্রাণ দিয়া খুঁজি, তাহাই সাহিত্যে গানের সুর হইয়া বাজিয়া উঠে, সেইরূপ রোমান্সের স্বপ্নও আমাদের বাস্তব-জীবন-বৃন্তের রঙীন ফুল মাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বা বিচিত্র, বিরোধ-জটিল প্রেমের অপ্রত্যাশিত বিকাশের মধ্য দিয়া রোমান্সের অনুসন্ধান হয়; ইউরোপীয় সভ্যতার এই স্বাভাবিক বিকাশের পথেই রোমান্স জীবনে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু ইতিহাস বা প্রেমের মধ্যে যে রোমান্সকে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের উপন্যাসে ঠিক স্বাভাবিক হয় না। বাস্তব-জীবনের ঠিক অনুবর্তন করে না। কেন না পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ইউরোপের মত আমাদের দেশে ইতিহাস বা রাজনৈতিক সংঘর্ষ সাধারণ জীবনের উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করে নাই। প্রেমের চিরন্তন লীলা আমাদের সাহিত্যে বা জীবনে ছিল না, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে; কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে প্রেমের বিচিত্র ধারা যেরূপ নূতন নূতন বিস্ময়ের মধ্যে বিকশিত হইয়াছে, আমাদের দেশে সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ঠিক সেরূপ হইতে পারে নাই। প্রেম বাহিরের দিকে বৈচিত্র্য ও বিস্ময়কর উন্মেষ লাভ না করিয়া, অন্তর্মুখী, গভীর ও একনিষ্ঠ হইবার দিকে চলিয়াছে। অবশ্য আমাদের অতীত যুগের সামাজিক অবস্থা যে ঠিক বর্তমানের মত নীরস ও বৈচিত্র্যহীন ছিল তাহা নহে। আমাদেরও একটা বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় যুগ ছিল, আমাদেরও জীবন এককালে দুঃসাহসিকতার রুদ্রতালে আবর্তিত হইত, আমাদেরও প্রেম হয়ত একটা গভীর ও প্রবল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজকাল আমাদের জীবনের ধারা এরূপ পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে, পুরাতন প্রণালী হইতে এত দূরে সরিয়া গিয়াছে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিকল্পনা দ্বারাও সেই পুরাতন দিনের জীবনযাত্রা পুনর্জীবিত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই পুরাতন আবেগ কোন্ চিরবিস্মৃতির মরুভূমে

একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই উপন্যাসে আমাদের অতীত যুগের কাহিনী নিশীথ-স্বপ্নের প্রহেলিকাজড়িত বলিয়া মনে হয়; আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা একটা ইন্দ্রজালরচিত আকাশসৌধের ন্যায় বাস্তব-সংস্পর্শশূন্য হইয়া পড়ে। আমাদের যুদ্ধজয় একটা মত্ত আস্ফালন ও অর্থহীন কোলাহলে পরিণত হয়; আমাদের প্রেমাভিব্যক্তি একটা বহু পুরাতন মন্ত্রের প্রাণহীন আবৃত্তির মতই শোনায়। 'আনন্দমঠ', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', ইত্যাদি উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রতিভা এই কেন্দ্রস্থ ও অপরিহার্য দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেকে ব্যয়িত করিয়াছে, অসাধারণ সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যেও একটি গূঢ় ব্যর্থতার বীজ রাখিয়া গিয়াছে।

'কপালকুণ্ডলা'র রোমান্টিক আবেষ্টন-রচনায় বঙ্কিম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ইতিহাস ও প্রেমকে যতদূর সম্ভব পশ্চাতে রাখিয়া রোমান্সের এমন একটি উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমাদের বাস্তব-জীবনের কঠিন মৃত্তিকা হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইতে পারে। আমাদের শান্ত, ধর্মাভিভূত জীবনের উপর যদি কখনও কল্পলোকের আলোকপাত সম্ভব হয়, তবে তাহা প্রবল ধর্মোন্মাদনার দিক হইতেই আসিতে পারে, যুদ্ধের উদ্দীপনা বা প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে নহে। এইজন্যই কপালকুণ্ডলার জীবনের উপর যে একটা অসাধারণত্ব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তান্ত্রিক-প্রথার ভীষণতা ও সহজ ধর্ম-প্রবণতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমাদের বাস্তব-জীবনের সহিত একটা সুসংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। আবার এই উপন্যাসের রোমান্টিক উপাদানগুলি—বিজন সমুদ্রতীরের অতুলনীয় মহিমা, কাপালিকের নির্মম সাধনা—কেবলমাত্র একটা বাহ্য বৈচিত্র্যের উপায়মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই; ইহারা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর একটি গভীর, অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া অসাধারণ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কেননা ইহা সমস্ত রোমান্সের সার, এই সৌন্দর্য-জগতের মধ্যমণি হইতেছে কপালকুণ্ডলার চরিত্র। সুকোমল মাধুর্যের চারিদিকে একটা অনমনীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বেড়া, গার্হস্থ্য সুখভোগের মধ্যে একটা অক্ষুণ্ণ উদাসীনতার সংযম, সামাজিক বিধি-নিষেধের মাঝখানে একটা শান্ত অথচ অদম্য স্বাধীনতা; অথচ কোথাও পুরুষোচিত কঠোরতা বা পরুষতার লেশমাত্র নাই, সর্বত্রই রমণীয় কোমলতা; শিক্ষা-দীক্ষায় বিভিন্ন, কিন্তু অন্তরে একটি চিরন্তনী স্ত্রীমূর্তি (eternal

feminine)—এরূপ অতুলনীয় চরিত্র কল্পনা শুধু বঙ্গ সাহিত্যে কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যেও বিরল।

সামাজিক জীবনে প্রবেশের পরেও বাল্যকালের রোমান্টিক প্রতিবেশ কপালকুণ্ডলাকে বেষ্টন করিতে ছাড়ে নাই। পারিবারিক জীবনের নিয়ম শৃঙ্খল, স্বামীর অপরিচিত ভালবাসাও তাহার নয়নের অপার্থিব স্বপ্নঘোর ঘুচাইতে পারে নাই। সমুদ্রতীরের বন্যলতাটি গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত ও অজস্র স্নেহধারাসিক্ত হইয়াও নূতন স্থানে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই, খুব আলগা হইয়াই লাগিয়াছিল; পুরাতন জীবন হইতে একটি তরঙ্গ আসিয়াই তাহাকে একেবারে উন্মূলিত করিয়া লইয়া গেল। তাহার অন্তরমধ্যে যে একটি চির-উদাসিনী আলুলায়িতকুন্তলা অতীত স্বাধীনতার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাকে সংসার তাহার শত আদর-প্রলোভনেও পোষ মানাইতে পারিল না। অথচ তাহার মধ্যে একটা অসামাজিক বন্যতা বা রমণীসুলভ কোমলতার অভাব কিছুই নাই। বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' নামক গল্পের নায়ক 'তারাপদ'ই কপালকুণ্ডলার একমাত্র তুলনাস্থল; অথচ আবেষ্টনের অসাধারণত্বে ও প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যে উহাদের মধ্যেও কত প্রভেদ! তারাপদর ঔদাসীন্য একটি চিরচঞ্চল, ক্রীড়াশীল হরিণ-শিশুর বন্ধন-ভীরুত্বের ন্যায়, দিগন্ত রেখাস্থিত নীল-মায়ার প্রতি একটা নামহীন রহস্যময় আকর্ষণ মাত্র। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সংসার বিরক্তির পশ্চাতে আমরা একটি বিশেষ ধর্মসাধনায়, একটি অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সমস্ত দুর্নিবার শক্তি অনুভব করি। তাহা ছাড়া, তারাপদ কপালকুণ্ডলার একটা অপেক্ষাকৃত শান্ত ও বাস্তব সংস্করণ; পল্লীর সাধারণ জীবনযাত্রার সহিত তাহার মুক্ত, বন্ধনহীন জীবন একটা ক্ষণিক, অথচ নিগূঢ় একাত্মতা লাভ করিয়াছে। কপালকুণ্ডলার নিঃসঙ্গতা আরও প্রগাঢ়তর; এক দয়া ও সমবেদনা ছাড় সাধারণ সামাজিক জীবনের সহিত তাহার আর কোন যোগসূত্র নাই।"

(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

(৩৬) 'কপালকুণ্ডলা' ট্রাজেডি হইলেও একটা নূতন ধরনের ট্রাজেডি—ইহার উপকরণ ও প্রেরণা স্বতন্ত্র।"—আলোচনা কর।

।। উত্তর ।। 'ট্রাজেডি পরিকল্পনা' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

।। সমাপ্ত ।।

সাহিত্য সম্পুট

সাধারণ ভূমিকা

'সম্পুট' [সং-পুট্ (লগ্ন হওয়া)+অ (র্তৃ)] কথাটির অর্থ হইতেছে কৌটা, ঠোঙা ইত্যাদি জাতীয় আধার।

সুতরাং 'সাহিত্য-সম্পুট'-এর অর্থ সাহিত্যের সংকলন, যেখানে বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা গ্রথিত হইয়াছে। সাহিত্য-সম্পুট-এর নির্বাচিত রচনাগুলিতে আমরা মননশীলতা, কল্পনার বিচিত্র বর্ণবিন্তার, লেখকের ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগ সম্পাদনের ঐশ্বর্য এবং বাংলা গদ্যের কারুকর্মের বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। ইহাদের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ করিবার পূর্বে পটভূমি হিসাবে গদ্যের স্বরূপধর্ম এবং তাহার বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। জেম্‌স্ সাদারল্যাণ্ড ইংরেজি গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের পর্যালোচনায় বলিয়াছেন, যে কোনও জাতীয় সাহিত্যের প্রথম অপরিণত, কুহেলিকাচ্ছন্ন আবির্ভাবের পর্যায়টির দিকে তাকাইলে আমরা কবিতারই সাক্ষাৎ পাই, তাহার পর বহু শতাব্দী পার হইয়া আসিলে তবে গদ্যের দর্শন মেলে। প্রথম দিকে গদ্য ছিল নিছক প্রয়োজনের বাহন, কবিতার তুলনায় অনভিজাত, ব্রাত্য ; বৈষয়িক চিঠি পত্র, দলিল দস্তাবেজ, শব্দ প্রভৃতিতে গণ্ডিবদ্ধ। বহু লেখকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, শিল্পীদের প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অহল্যার পাষাণী মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চারের মত গদ্যের শুষ্ক, নিষ্প্রাণ দেহে সৃষ্টির প্রাণ-ছন্দ ও লাবণ্য ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতে থাকে, অবশেষে আধুনিক যুগে উহা কবিতার মতই পাঠকের গভীরতম রসচৈতন্যকে স্পর্শ করিবার মত পূর্ণাংগ শিল্পসৃষ্টির গৌরব অর্জন করিতে পারিয়াছে। রেনেশাঁস বা নবজাগৃতির প্রেরণাপুষ্ট এলিজাবেথীয় যুগের কাব্যে ও নাটকে কবি-কল্পনার যে সমারোহ লক্ষ্য করা যায়, তাহার প্রভাবে তৎকালীন গদ্য ছিল আচ্ছন্ন। জন লিলি, ফিলিপ সীডনি, রবার্ট গ্রীন, টমাস লজ, রবার্ট বার্টন—প্রভৃতি লেখকদের রচনায় গদ্যের তীক্ষ্ণ ঋজু নিজস্ব স্বরূপধর্মটির পরিবর্তে কবিতার অন্ধ অনুকরণ

ও পল্লবগ্রাহিতা-সঞ্জাত আতিশয্যদুষ্ট আলংকারিকতা, তরল উচ্ছ্বাস, প্রতিটি বাক্য ও শব্দযোজনার উপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণের অভাব প্রভৃতি বিচ্যুতি লক্ষিত হয়। এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী ফ্রান্সিস বেকনের রচনায়ই যুক্তিপূর্ণ সুশৃংখল বিন্যাস, ঋজুতা, মিতভাষণ প্রভৃতি গদ্যের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইতে দেখি। অন্য দিকে ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী লেখক মন্‌তেজের রচনায় গদ্যের ঋজুতা, প্রাঞ্জলতার নিজস্ব কাঠামোয়ই ব্যক্তিহৃদয়ের নিবিড় স্পন্দন এক বিচিত্র ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিয়াছে। টমাস ব্রাউন, জেরেমি টেলর, মিলটন, বুনিয়ান, ড্রাইডেন, স্যামুয়েল পিপ্‌স, প্রভৃতি সপ্তদশ শতাব্দীর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অ্যাডিসন, স্টীল, সুইফট্, বার্ক, স্যামুয়েল জনসন প্রভৃতি লেখকদের চর্চায় ইংরেজি গদ্য নূতন নূতন শক্তি অর্জন করিয়া নিজের মহিমাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ল্যাম্ব, হ্যাজলিট, ডিকুইন্সি, লেহান্ট, ল্যাণ্ডর প্রভৃতি রোমান্টিক যুগের লেখকদের গদ্য রচনা মন্ময় (Subjective), নিভৃতহৃদয়ের আবেগ ভাষণে গীতিধর্মী, স্বচ্ছতোয়া নদীর মত ইহার ছন্দোময় গতি। ভিক্টোরীয় যুগের কার্লাইল, রাস্কিন, ম্যাথু আর্নল্ডের রচনায় যেমন মননশীলতার গাম্ভীর্য, তেমনি স্টিভেনসন, ওয়াল্টার পেটার প্রভৃতিদের রচনায় প্রকাশভঙ্গির কারুকার্য লক্ষ্য করা যায়।

বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক বনামি ডব্রে গদ্যরচনাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :

(ক) Descriptive Prose (বর্ণনাত্মক গদ্য), (খ) Explanatory Prose (ব্যাখ্যাধর্মী গদ্য), (গ) Emotive Prose (আবেগধর্মী গদ্য)। একই রচনায় এই তিন জাতীয় গদ্য সূক্ষ্মভাবে অনুমিশ্রিত হইতে পারে, তবে মোটামুটিভাবে বিভিন্ন রচনায় গদ্যের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর গদ্যে বর্ণনা বা বিবৃতিই প্রাধান্য লাভ করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গদ্যও বস্তুনিষ্ঠ, বিষয়বস্তু প্রধান, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমালোচনা ইহার অন্তর্ভুক্ত। লেখকের রচনা নৈপুণ্যে এই দুই জাতীয় গদ্যও সাহিত্যরস-সিক্ত হইতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর গদ্য সম্পূর্ণরূপে সৃজনধর্মী, পাঠকহৃদয়ের আবেগের উদ্বোধনই ইহার লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার, যথার্থ সৃষ্টিধর্মী গদ্য (creative prose) গদ্যের নিজস্ব যুক্তিশীল কাঠামোটিকে (logical structure) অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই কবিত্ব সুরভিত, ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগে

সুর ও ছন্দোময় হইয়া উঠে। গদ্যের প্রকাশশৈলী সম্বন্ধ মিড্‌লটন মারে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : স্টাইল বা রচনাশৈলীর দুইটি দিক আছে। প্রথম শ্রেণীর রচনাশৈলী বলিতে আমরা শিল্পীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এমন এক লক্ষণকে বুঝি যাহার দ্বারা তাঁহার রচনার উজ্জ্বল স্বকীয়তাকে সহজেই চিনিয়া লইতে পারা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্টাইল হইল technique of expression বা বিষয়বস্তু চিন্তাভাবনাকে প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করিবার নিছক ভঙ্গী বা কৌশল মাত্র। গদ্য রচনার চূড়ান্ত সার্থকতা সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারা যায়, লেখকের ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তাদীপ্ত যে রচনা পাঠকের হৃদয়ের আনন্দের সামগ্রী হয় তাহাই রসোত্তীর্ণ গদ্যরচনার উদাহরণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শেই বাংলাসাহিত্যে গদ্য আবির্ভূত হয়। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশসম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন : 'ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা খ্রীষ্টধর্মের বাণীপ্রচার ও দেশীয় চিত্তকে আকর্ষণ করিবার প্রয়াস, শাসনকার্যে সুবিধার জন্য তরুণ ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শিখাইবার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন ও সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব ও বিস্তার এবং ধর্মবিষয়ক বাদ-প্রতিবাদ, তীক্ষ্ণ সমাজ পর্যবেক্ষণ ও সর্বশেষে মৌখিক মননশক্তির আবির্ভাব প্রভৃতি নানামুখী কারণের সমবায়ে এই নবজাত গদ্য সাহিত্য শিক্ষানবীশী স্তর হইতে পরিণত শিল্প সৌন্দর্যের পর্যায়ে উন্নীত হইল।' উইলিয়ম কেরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের গদ্যরচনায় মৌলিকতার পরিচয় বিশেষ মেলে না। রামমোহনের রচনায়ই প্রথম প্রবন্ধ-সাহিত্যের কায়াকে নির্মিত হইতে দেখি, অবশ্য তাঁহার রচনায় তাঁহার ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য ও চিন্তাশীলতার ছায়াপাত ঘটিলেও আধুনিক অর্থে প্রবন্ধের আত্মা বা অন্তরের বিশেষ রসাবেদন সেখানে পাই না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে বিভিন্ন যতিচিহ্নের ব্যবহারে ছন্দোপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া উহার বিকাশের এক নূতন দিগন্তকে উন্মোচিত করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির গদ্য রচনার মাধ্যমে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য তথা গদ্য সাহিত্য এক বিপুল সম্ভাবনার ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রে ঐশ্বর্যময় পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে; তাহার পরে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষীদের দানে

বাংলা গদ্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, অবশেষে রবীন্দ্রনাথের রচনায় উহা এক বিচিত্র, বিস্ময়কর, প্রাণোচ্ছল ও বহুমুখী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গদ্য রচনাই সৃষ্টির সুষমামণ্ডিত। বাংলাগদ্যের ক্রমবিকাশে প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ উত্তরসুরীদের দানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য-সম্পুট-এর প্রথম প্রবন্ধ 'হিমাচল ভ্রমণ' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন : 'তাঁহার আত্মজীবনীতে যুক্তিধর্মী, তথ্যভারবাহী প্রবন্ধ আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের, মন্ময় অন্তরঙ্গতার একটি নূতন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে।' মহর্ষিদেবের হিমাচল ভ্রমণ ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক রচনা, কিন্তু তাঁহার আবেগ গভীরতায় ইহাতে descriptive এবং emotive prose-এর এক নিগূঢ় সমন্বয় আমরা লক্ষ্য করি। এই মন্ময়তা (subjectivity) প্রধান রচনা নিছক ভ্রমণ কাহিনী নয়, তাঁহার হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য-পথচারণা আসলে আত্মানুসন্ধান ও আত্মোপলব্ধির চরিতার্থতায় উপনীত হইবার ইতিহাস। এই জাতীয় ভ্রমণ-কাহিনীকেই অ্যালান-প্রাইস জোন্স্ 'Subjective travel book' আখ্যা দিয়াছেন—'The book which describes even more lovingly the Journey towards a writer's heart than towards a traveller's destination'—অর্থাৎ যেখানে ভ্রমণকারীর লক্ষ্যস্থলের দিকে যাত্রা অপেক্ষা লেখকের হৃদয়াভিমুখী যাত্রাই হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আমার মন' তাঁহার অনন্যসাধারণ রচনা কমলাকান্তের দপ্তরের একটি বিশিষ্ট অংশ। কমলাকান্তের দপ্তর সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : 'গোধূলিসন্ধ্যার একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ যেমন দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে, ইহার চারিদিকে যেমন বর্ণালী-মায়া অদৃশ্য-মায়া অদৃশ্য চিত্রকরের সমাবেশ-সুষমায় এবং স্বপ্নলোকের সুসম্বদ্ধ চিত্ররূপে প্রতিভাত হয়, কমলাকান্তের প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তেমনি ভাবোচ্ছ্বাসের একটি বিন্দু মনোলোকে ঘন হইয়া উঠে, নানা বর্ণের সংমিশ্রণে, সুরের সমবায়ে একটি অপরূপ সত্তা গ্রহণ করে ও অন্তঃসঙ্গতি ও প্রাণলীলার স্পন্দনে একটি চিরন্তন অধ্যাত্ম সত্যরূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়।"'আমার মন' অংশটিতে বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের প্রাণস্পন্দনের ঐক্যসূত্রেই emotive prose-এর আবেগধর্মিতা এবং explanatory prose-এর মননশীলতা নিগূঢ়ভাবে সমন্বিত

হইয়াছে। 'দুর্বাসার শাপ' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) এবং 'শকুন্তলা' (রবীন্দ্রনাথ) এই দুইটি সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধটি explanatory prose-এর সার্থক উদাহরণ : আলাপচারিতার সহজ ভঙ্গিতে লেখক এখানে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্রের বিকাশে দুর্বাসার অভিশাপের ভূমিকা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় কালিদাসের সৃজন-মাহাত্ম্য পূর্ণাঙ্গরূপে উম্মোচিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় ব্যাখ্যা, interpretation, কালিদাস অংকিত শকুন্তলা চরিত্রের মর্মোদ্ঘাটনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাঁহার প্রতিভার সঞ্জীবনী স্পর্শে গভীর সাহিত্যরসোপলব্ধি সঞ্জাত এই ব্যাখ্যায় কালিদাসের কবিপ্রতিভার মহিমা যেমন উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে. তেমনি উহা সৃজনধর্মী রচনার লাবণ্যেও আমাদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়' emotive prose-এর উজ্জ্বল উদাহরণ; এই মন্ময়তা প্রধান রচনাটি গীতি-কবিতার মতই রসনিটোল। স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটি মূলত বিশ্লেষণধর্মী, এখানে তিনি বর্তমান ভারতের পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহান্ধতা ঋজু তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। সমগ্র প্রবন্ধটিই স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রাণময় আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের 'কোনারক' সম্পূর্ণরূপেই আত্মগতভাবমূলক রচনা, emotive prose-এর উজ্জ্বল উদাহরণ। গীতিকবিতার মত সংগীত-ধর্মী, ব্যক্তিগত হৃদয়ের আবেগঘন এই জাতীয় রচনাকেই ইংরেজীতে 'lyric in prose' বলা হয়। এইভাবে 'সাহিত্য সম্পুট'-এর পাঠ্য প্রবন্ধগুলিতে আমরা বাংলাগদ্যের বহুমুখী ঐশ্বর্যের একটি সার্থক পরিচয় লাভ করি।

হিমাচল ভ্রমণ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচিতি ঃ

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় ১৫ই মে, ১৮১৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার মৃত্যু হয় ২৯শে জানুয়ারী ১৯০৫। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি তাঁহার মেধার পরিচয় দেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা রূপে বাঙলা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বাংলা গদ্যের বিকাশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। প্রথম দিকে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে মহর্ষির দান অপরিসীম শ্রদ্ধায় স্মরণীয়। তৎকালীন ব্রাহ্ম-সমাজের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০ খ্রীঃ), ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (১৮৬৯-১৮৭২), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮১৫ শক), স্বরচিত জীবন-চরিত (১৮৯৮ খ্রীঃ) ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সার-সংক্ষেপ ঃ

মহর্ষিদেব তাঁহার অনুচর কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হিমালয়-ভ্রমণে তাঁহার সঙ্গী হইতে অনিচ্ছুক বুঝিয়া ঝাঁপানে চড়িয়া এবং ভারবাহী কুলিদের লইয়া একাকী পর্বত-যাত্রায় অগ্রসর হইলেন। সিমলা ছাড়াইবার পর তিনি দেখিলেন যে পার্শ্ব-পর্বতে যাইবার সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরপ্রসাদে তিনি উহার কার্নিশ দিয়া একা একা চলিয়া সেই বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিলেন। ঝাঁপানীরা খালি ঝাঁপান লইয়া খাদ দিয়া অপর পারে গমন করিল। দুই প্রহরের পর একটা শূন্য পান্থশালা পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ সেদিনের জন্য সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেইখানে তিনি নিকটবর্তী গ্রামের কতকগুলি পাহাড়ী লোকের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সরল প্রকৃতিতে অত্যন্ত প্রীত হন। পরদিন অপরাহ্ণে মহর্ষিদেব একটা পর্বতের চূড়ায় গিয়া

অবস্থান করেন। এখানে কয়েকজন গ্রামবাসীর মুখে দুরূহ পার্বত্য জীবন-যাত্রার বিবরণ তিনি শ্রবণ করেন। পরদিন ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি আরণ্যক প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। শ্বেত, রক্ত, পীত, নীল, স্বর্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পের সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে এবং নির্মল শুচিতায় ঈশ্বরের করুণা ও স্নেহ অনুভব করিয়া মহর্ষিদেবের হৃদয় পবিত্র আনন্দে উদ্বেলিত হয়। কোনও পর্বতের মধ্যে বেশ কিছু ব্যবধানে সূর্যকিরণে দীপ্ত এক একটি গ্রামের গৃহপুঞ্জ, অন্ধকার পর্বতের স্থানে স্থানে মনুষ্য-বসতির পরিচয়-চিহ্ন কেবল প্রদীপের আলোক, পর্বতের তলদেশ হইতে তাহার চূড়া পর্যন্ত সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ এবং বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান বৃক্ষসকল—এই দৃশ্যসমূহ তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। বোয়ালি পর্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে সূর্যকিরণে রৌপ্যপত্রের ন্যায় চিক্‌চিক্ করিতে দেখা যায়। বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ডে প্রতিহত হইয়া প্রবল গর্জনে এবং ফেনোচ্ছ্বাসে নগরী নদীকে প্রবাহিত হইতেও মহর্ষিদেব দেখেন। অতঃপর দীপমালার মত দাবানলের উৎপত্তি, বিস্তার ও নির্বাণের বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া তিনি আনন্দ লাভ করেন। উদ্যত বজ্রের ন্যায় ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণারত এক উচ্চ তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ এবং পরে দারুণঘাটে উপস্থিত হইয়া তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ-সংলগ্ন মেঘসমূহ হইতে তুষারবর্ষণ তিনি দর্শন করেন। কিছুকাল পরে মহর্ষিদেব সিমলায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অনুতপ্ত কিশোরীকে ক্ষমা করেন। তাহার পর ঐ কুড়ি দিনের পার্বত্য ভ্রমণে ঈশ্বর তাঁহাকে যেভাবে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, বিবেক ও বৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি মঙ্গলময়ের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হন।

রচনা-পরিচিতি এবং রসগ্রাহী সমালোচনা ঃ

'হিমাচল-ভ্রমণ' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ হইতে সংকলিত স্বরচিত জীবন-চরিত নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার একখানি উজ্জ্বল কীর্তি। হিমালয়ের সৌন্দর্যমহিমা এবং নির্মমতার প্রতি মহর্ষিদেবের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। সুযোগ পাইলেই তিনি তাঁহার আত্মার পরিচর্যার জন্য হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মহর্ষিদেব ১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসে সিমলাতে আসিয়া উপনীত হন এবং সেখান হইতে ৬ই জুন হিমালয়

যাত্রা করেন। তাঁহার হিমালয় ভ্রমণ সূচী এইরূপ ছিল : ১৮৫৭-এর ৬ই জুন সিমলা হইতে সুন্নী পর্বতচূড়ায় (সিমলা হইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত) ভ্রমণের জন্য যাত্রা, ১০ই জুন নারাকাণ্ডা এবং ১১ই জুন সুন্নীতে উপস্থিতি, ১২ই জুন অবরোহণ আরম্ভ, ১৩ই জুন 'নগরী' নদীতীরে দাবানল দর্শন এবং ২৬শে জুন সিমলায় প্রত্যাবর্তন—(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী)।

ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে হিমাচল-ভ্রমণের মূল্য অপরিসীম, কারণ মহর্ষির ব্যক্তিত্বের স্পর্শেই সমগ্র রচনাটি অভিষিক্ত। জীবনের বহুসময় তিনি হিমালয়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। সাধারণ ভ্রমণকারীর মন লইয়া ভারতবর্ষের ঋষি এবং কবিদের দ্বারা পূজিত হিমালয় পর্বতে যান নাই; সহজাত নিসর্গ-প্রীতিতে যেমন, তেমনি গভীর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতায় তীর্থ-যাত্রীর শ্রদ্ধানম্র হৃদয় লইয়াই এইখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সেইজন্য একদিকে এই সাধক পুরুষটি যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগের ঐকান্তিকতায় হিমালয়-প্রকৃতির প্রতিটি চিত্র, প্রতিটি বর্ণ এবং সেই প্রকৃতিলালিত জীবনের ছোটখাট কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি হিমালয়ের সৌন্দর্যে ঈশ্বরের মহিমাকে অনুভব করিয়া ধ্যানগাম্ভীর্যে তাঁহার সৌন্দর্যের উপলব্ধিকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছেন। হিমাচল-ভ্রমণের গদ্যভঙ্গিও প্রাঞ্জল, গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং প্রসাদগুণযুক্ত। দেবেন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রাকৃতিক রূপ-বর্ণনায় উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নাই, তাঁহার ভগবৎ-প্রীতির অভিব্যক্তিও সেইরূপ সংযত। মহর্ষির গদ্য রচনাভঙ্গি সম্পর্কে শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন : "দেবেন্দ্রনাথের রচনার বিস্তর নমুনা আমরা এই জীবন-চরিত্রে দেখিতে পাইয়াছি। সেই সমস্ত নমুনাগুলিতেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্টরূপে পড়িয়াছে, তাঁহার চিত্তের রূপ লেখার ভিতরে এমন অনায়াসে ধরা দিয়াছে যে, তাঁহার সমসাময়িক আর কারো লেখার কথা দূরে থাকুক, আধুনিক কালের অল্প লেখক আছেন যাঁহাদের লেখায় সমস্ত মানুষটার ছাপ এমনিভাবে চোখে পড়ে।" মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীর ভ্রমণবৃত্তান্ত অংশসম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্তের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে উহার মর্মগত বৈশিষ্ট্যটি সুন্দররূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে : 'আত্মজীবনীর ভিতরে টুকরা টুকরা অনেক ভ্রমণকাহিনী রহিয়াছে; বহুস্থানে এই ভ্রমণ-কাহিনীগুলিও চমৎকার রচনা-সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সাহিত্যেই ভ্রমণ-কাহিনী রচনা-সাহিত্যের একটি প্রিয়

বিষয়বস্তু। ইহার কারণ, প্রথমত, ইহাদের ভিতরে আমাদের কোনও গুরুগম্ভীর বক্তব্যই মুখ্য থাকে না,—বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ মনের খুশিটাই এখানে সর্বপ্রধান; দ্বিতীয়ত, এখানে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপরেই আমাদের মনকে সর্বদা কঠোরভাবে নিবদ্ধ রাখিতে হয় না, সার্থক ভ্রমণের ভিতরে যেমন আটঘাট বাঁধিয়া কোনওরূপে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোটাই বড় কথা নহে,—সেটাকে উপলক্ষ করিয়া প্রধান হইয়া উঠে খেয়ালখুশিতে আশে-পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিচিত্র অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার আনন্দ, ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনার সাহিত্যিক ধর্মটাও সেইরূপ। বর্ণনা হইতে বর্ণনান্তরে, প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে খোলা মনে বিচরণ করিয়া আনন্দ দিতে ও পাইতেই আমরা ব্যস্ত। দেবেন্দ্রনাথের অনেকগুলি ভ্রমণকাহিনী বর্ণনার ভিতরে এই সকল গুণ বর্তমান। বর্ণনা করিতে করিতে কোথাও গিয়া তিনি হয়ত কোনও গভীর তত্ত্বে পৌঁছিয়াছেন; কিন্তু সেইটিকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি রওনা হন নাই—সেই সকল তত্ত্ব বা বাণী চলার পথেই আসিয়া পড়িয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের এই জাতীয় বর্ণনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি এপাশে সেপাশে তাকাইয়া চলতি পথের সমস্ত খুঁটিনাটির বর্ণনা করিতে গিয়া কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতেন না। ঘন ঘন উচ্ছ্বাসের আতিশয্যও তাঁহার লেখনীর গতিপথে বাধা হইয়া দাঁড়াইত না। সর্বত্রই একটা বর্ণনার সংযম পরিস্ফুট।...এই জাতীয় রচনার ভিতর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি; উহা তাঁহার নিসর্গপ্রীতি। বিশ্বপ্রকৃতিকে তিনি দুই ভাবে ভালোবাসিয়াছেন, এক তাহাকে তাহার সকল দৃশ্য বর্ণ গন্ধ সুষমায় স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, আর তাহাকে এক পরমপুরুষের বিলাস বিভূতি-রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া। এই অধ্যাত্মদৃষ্টি তাঁহার মানসদৃষ্টি, কিন্তু এই মানসদৃষ্টি তাঁহার ইন্দ্রিয়দৃষ্টিকে একেবারে গৌণ করিয়া ফেলে নাই। তাই তাঁহার বর্ণনার ভিতরে দেখিতে পাই প্রকৃতির প্রতিটি ছবি, প্রতিটি রং, প্রতিটি গান বর্ণনার ভিতরে ফুটাইয়া তুলিতে তাঁহার কি আনন্দ! প্রকৃতির ভিতর দিয়া তিনি এক পরমপুরুষের স্পর্শ লাভ করিতে ব্যাকুল হইলেও তাহার নিজস্ব বাহিরের রূপকেও তিনি অবহেলা করেন নাই। অন্তর্দৃষ্টি এবং বহির্দৃষ্টি সর্বত্রই মিলিয়া পরস্পরের পোষকতা করিয়াছে।' ৫

শব্দার্থ ও টীকা

(অনুচ্ছেদ ১-৫) : ২৫শে জ্যৈষ্ঠ দিবস—৬ই জুন ১৮৫৭, সিপাহী বিদ্রোহের কাল। **কিশোরীনাথ চাটুয্যে**—মহর্ষিদেবের অনুচর।

ঝাঁপান—পার্বত্যপথে ব্যবহৃত একজাতীয় দোলা, যাহাতে কুলীরা যাত্রীদের বহন করিয়া লইয়া যায়।

বাঙ্গীবর্দারেরা—ভার (বাঙ্গী)-বাহী কুলীরা।

পঙ্গুঃ লঙ্ঘয়তে গিরিম্—পঙ্গু পর্বত লঙ্ঘন করে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীধর স্বামীকৃত টীকার মঙ্গলাচরণের 'মূকং করোতি বাচালাং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্' শ্লোকটিকে অনুসরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ নিজ বাক্যের সহিত মিল রাখিবার জন্য কর্তৃকারক পঙ্গুঃ লিখিয়াছেন। **কেলু**—পাইন গাছ।

রূখা সুখা গমকা টুকড়া…রোনা ক্যা ?—রুক্ষ শুষ্ক কষ্টে লব্ধ রুটির টুকরা, তাহা লবণযুক্ত বা লবণহীন হোক, তাহাতে কী ? মস্তক অর্থাৎ জীবন দিয়াছি, কান্না কেন ? এই হিন্দী প্রবচনটির মর্মার্থ হইল—প্রিয়তমের (অর্থাৎ ঈশ্বরের) জন্য যে (ফকির, বৈরাগ্যসাধক) প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, সে কাঁদিবে কেন ? আহার যেমনই জুটুক না কেন, সে বাছবিচার করিবে কেন ?

পাকদণ্ডীর পথ—হিন্দী পগ্‌দণ্ডীর (পদরেখা) রূপান্তর ; পায়ে পায়ে চলিয়া যে পথ হইয়া যায়।

(অনু ৬-১৮) : ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে—মাটির উপর শুইয়া পড়িয়া প্রণাম করিলে তাহা ভূমিষ্ঠ প্রণাম হয়। বৃক্ষগুলিও ভূমিষ্ঠ প্রণতের মত মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া মাটির উপর পড়িয়া ছিল।

হরগিজম্ মেহরে…জাঁন-রবদ্—হাফিজের এই কবিতার বঙ্গার্থ মহর্ষিদেব নিজেই উপরে দিয়াছেন ; 'তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মনে প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।' এই সম্পর্কে মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীর সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিয়াছেন : 'আত্মজীবনীর পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথ সুন্ধী পর্বত ভ্রমণের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের একটি অতি পবিত্র ও অতি

মধুর অংশ। এই ভ্রমণের সময়ে নির্জন অরণ্যে বনফুল দেখিতে দেখিতে তিনি যে একদিন ঈশ্বরের করুণার অনুভবে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন ও পথে পথে হাফিজের একটি কবিতা গান করিয়াছেন, এই বর্ণনাটি বড়ই প্রাণস্পর্শী। হাফিজের সেই কয় পংক্তির সহিত ঐ দিনের স্মৃতি জড়িত হওয়াতে, উহাই তাঁহার নিকটে তাঁহার প্রিয় হাফিজের রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া গিয়াছিল। মহর্ষির সমগ্র জীবনের ভাবটি ঐ কয় পংক্তি যেমন সম্যক্‌-রূপে প্রকাশ করে বোধহয় আর কোন ভাষার কোন উক্তিই তেমন করে না।'

হাফেজ—পারস্যদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি মহম্মদ শাম্‌সুদ্দিন হাফিজ পারস্যের অন্যতমশ্রেষ্ঠ গীতিকবি, মহম্মদীয় যুগের আনুমানিক অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে (এ. ডি. ১৩০০) জন্ম। তাঁহার প্রধান রচনা হইতেছে 'দিওয়ান', ইহা সংক্ষিপ্ত ওড বা সনেট জাতীয় 'গজল' নামধেয় কবিতার সংকলন। মহর্ষিদেব 'দিওয়ান' হইতেই এই পংক্তিগুলিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাফিজ ছিলেন সূফী মতাবলম্বী। হৃদয়ের অকৃত্রিম, গভীর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের অনাবিল প্রকাশে তাঁহার রচনা সমুজ্জ্বল।

ঋক্ষ—ভল্লুক। **গোধূম**—গম। **হরিৎবর্ণ**—সবুজবর্ণ। **অজা অবি**—ছাগল ও ভেড়া।

শতদ্রু—পাঞ্জাবের নদী, সিন্ধুর এই উপনদীটির ইংরেজী নাম সট্‌লেজ; ইহার সহিত এই পৌরাণিক আখ্যানটি জড়িত : বিশ্বামিত্রের চক্রান্তে এক রাক্ষস তাঁহার শতপুত্রকে খাইয়া ফেলিলে বশিষ্ঠ মুনি পুত্রশোকাতুর হইয়া নিজের হস্তপদাদি বন্ধন পূর্বক এই নদীতে নিমজ্জিত হওয়ায় ইহা শতধা ধাবিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার শতদ্রু নাম হইয়াছে। **পর্বতো বহ্নিমান**—পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ, ধূম হইতে পর্বত যে অগ্নিপূর্ণ তাহা বোঝা যায়, ন্যায়-সূত্রের শ্লোকের অংশ। উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয় ঈশ্বরের মহিমা—ঈশ্বর অন্যায়কারীদের মহৎ ভয়ের কারণ, তাঁহার ন্যায়বিচার বজ্রের মতই তাহাদের আঘাত করে। উচ্চ পর্বতশৃঙ্গটিকে ঈশ্বরের বজ্র অর্থাৎ ন্যায়দণ্ডের মতই তাঁহার মহিমা ঘোষণায় রত বলিয়া মনে হইতেছে।

আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে…দর্শন করিলাম—ইহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুনের ঘটনা। 'মেঘদূতের ছায়া এখানকার বর্ণনায় পড়িয়াছে।' কালিদাসের এই কাব্যের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—'আষাঢ়স্য

প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট—সানুং বপ্রক্রীড়া—পরিণতগজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ'—'আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে, পর্বতের সানুদেশে প্রমত্ত মাতংগের ন্যায় নূতন মেঘের ক্রীড়া দর্শন করে।' আশ্লিষ্ট—আলিঙ্গিত, সম্মিলিত, জড়িত। আধিভৌতিক—ত্রিতাপের অন্যতম ; পঞ্চভূত বা জন্তুগণ হইতে যে উপদ্রব, ভয় বা দুঃখ জন্মে।

জ্বালামুখী—ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের প্রসিদ্ধ তীর্থ, কাঙ্গড়া জেলায় অবস্থিত। এখানে সতীর জিহ্বা পতিত হইয়াছিল বলা হয়। এখানে ভূগর্ভস্থ এক প্রকার বাষ্প বায়ু সংযোগে জ্বলিয়া থাকে, সেই কারণেই ইহার নাম জ্বালামুখী। এই প্রাচীন শহরে প্রতিষ্ঠিত দেবীমন্দির হিন্দু তীর্থযাত্রীদের পীঠস্থান। মন্দিরটি ভূগর্ভ হইতে উত্থিত কয়েকটি অগ্নিশিখার উপর প্রতিষ্ঠিত, শিখাগুলি দিবারাত্র সমানভাবে আলোক প্রদান করে ; প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে এই অগ্নিশিখা জালন্ধর নামক দৈত্যের মুখনিঃসৃত, মহাদেব ইহাকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা

(১) এই পুষ্প সকলের……বোধ হইল। (অনু ৯)

উদ্ধৃত অংশটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমাচল-ভ্রমণ শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত। এইখানে পর্বতগাত্রে প্রস্ফুটিত শ্বেত, রক্ত, নীল, স্বর্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পের সৌন্দর্যে ঈশ্বরের স্পর্শ লেখক যেভাবে অনুভব করিয়াছেন, তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে।

ঈশ্বর-ভাবুক মহর্ষিদেব পার্বত্য পুষ্পসমূহের বিচিত্র সৌন্দর্যে কেবলমাত্র প্রকৃতির রূপের আয়োজনকে লক্ষ্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন নাই ; ত ন তাহাদের সৌন্দর্য ও সুষমায়, নির্মল শুচিতায় ঈশ্বরের কল্যাণময় সৃজন-শ।৯৩।.ক অনুভব করিয়াছেন। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা সেই পরম পবিত্র বিরাট্ পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বরের স্পর্শের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

(২) আমার চক্ষু খুলিয়া…দেখিলাম। (অনু ৯) (ক. বি. ১৯৬৩)

হিমালয়-ভ্রমণকালে পথিমধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গী এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা তাঁহাকে আনিয়া দিলে তিনি ঐ শাখার

পুষ্পগুলির সৌন্দর্যে বিধাতার কল্যাণস্পর্শ যেভাবে অনুভব করিয়াছিলেন—আলোচ্য অংশে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

বনলতার শাখায় ছোট ছোট শ্বেত-পুষ্পগুলি হিমালয়ের এক নির্জন অরণ্যপ্রান্তে ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাদের গন্ধ আঘ্রাণের এবং সৌন্দর্য উপভোগ করিবার মত কেহ নাই। তবু এই আরণ্যক পুষ্পগুলি ঈশ্বরের স্নেহ এবং করুণা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি অপরিসীম যত্নে স্নেহে তাহাদের সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পুষ্পগুলির স্নিগ্ধশুচি সৌন্দর্য দর্শনেই মহর্ষি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিলেন, তাঁহার হৃদয় বিকশিত হইল। সেই ধ্যানদৃষ্টিতে এবং বিকশিত হৃদয়েই তিনি উহাদের মধ্যে বিধাতার করুণা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন।

টীকাঃ অখিলমাতা—পুষ্পগুলির সৌন্দর্যে দেবেন্দ্রনাথ বিধাতার জননীসুলভ সযত্ন মমতা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে অখিল (জগৎ) মাতারূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির……কথনই যাইবে না।

(অনু ৯) (ক. বি. ১৯৬৫)।

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। বনলতার শাখায় ছোট ছোট শ্বেতপুষ্পগুলি হিমালয়ের এক নির্জন, দুর্গম অরণ্য-প্রান্তে ফুটিয়া রহিয়াছে, এখানে কেহ বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কেহ বা তাহাদের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিবে। তথাপি এই ক্ষুদ্র আরণ্যক পুষ্পগুলি ঈশ্বরের স্নেহ এবং করুণা লাভে ধন্য হইয়াছে : তিনি কত যত্নে, স্নেহে তাহাদের সুগন্ধ, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এই পুষ্পগুলি দেখিয়া ঈশ্বরের সর্বত্রচারী করুণা ও স্নেহ অনুভব করিয়া মহর্ষিদেব উদ্বেলিত হইলেন। তাঁহার সেই স্বর্গীয় করুণা ও স্নেহের আবেগাপ্লুত হৃদয় হইতে সর্বনিয়ন্তার উদ্দেশ্যে এই কৃতজ্ঞতার মন্ত্র উচ্চারিত হইল, এই ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরই যখন তাঁহার এত করুণা, তখন তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের উপর করুণার কোন সীমা নাই। ঈশ্বরের এই করুণায় মহর্ষিদেবের হৃদয়মন চিরকাল আশ্রয় লাভ করিবে, তাহা কখনই তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইবে না। মহর্ষিদেবের ঈশ্বরের এই স্নেহ ও করুণার মহিমার উপলব্ধি মুহূর্তজীবী অনুভূতিমাত্র নয়, তাহাদের সমগ্র জীবনের সম্পদ হৃদয়াকাশে অনির্বাণ ধ্রুবতারকা।

(৪) এখানে ঈশ্বর……শান্তিসুখ দুর্লভ। (অনু ১৩)

হিমালয়-ভ্রমণকালে জনমানবশূন্য এক উপত্যকা ভূমিতে পর্বতের গহ্বরে স্ত্রী-পুত্র লইয়া একটি মানুষকে সুখে বাস করিতে দেখিয়া মহর্ষিদেবের মনে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, এখানে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

মহর্ষিদেব এইখানে জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণহীন, দুরূহ পার্বত্য-জীবনযাত্রার মধ্যেও এই পরিবারের লোকজনদের আনন্দপূর্ণ জীবনের একটি চিত্র দেখিতে পাইলেন: লোকটির স্ত্রী একটি শিশুকে পিঠে নিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, তাহার আর একটি ছেলে পর্বতের উপরে সঙ্কটস্থান দিয়া হাসিয়া হাসিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে; তাহার পিতা একটি ছোট ক্ষেতে আলু চাষ করিতেছে। মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণায় এই সরলচিত্ত প্রকৃতিলালিত মানুষগুলিকে কোনও অভাববোধে পীড়িত হইতে হয় না, তাহাদের নির্মল সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনে অতৃপ্তির অশান্তি অন্ধকার ছায়া ফেলিতে পারে না। এই সুখ-শান্তি ঈশ্বরের দান, রাজাসনে বসিয়া সকল রাজকীয় ঐশ্বর্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও রাজারা তাহা এমন সহজভাবে লাভ করিতে পারেন না; তাঁহাদের জীবনে এই শান্তি সত্যই দুর্লভ।

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

১। 'হিমাচল-ভ্রমণের পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, সৌন্দর্য-দর্শনের সহজাত নেত্র লইয়া দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, হিমাচলের সৌন্দর্যে তিনি হিমাচল-স্রষ্টার সৌন্দর্য দেখিয়াছেন' —মন্তব্যটির সমীচীনতা বিচার কর এবং এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্র-নাথের নিসর্গ চেতনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

উত্তর: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমাচল-ভ্রমণের উপক্রমণিকা হইতে উপসংহার পর্যন্ত তাঁহার সৌন্দর্য দর্শনের সহজাত ক্ষমতার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। হিমালয়-পর্যটনে মহর্ষির কবিমানসের দৃষ্টি সকল সময়েই ছিল সৌন্দর্যসন্ধিৎসু, এইখানে প্রকৃতির বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রতম সমস্ত শোভার আয়োজন দর্শনের অভিজ্ঞতা মূল্যবান স্মৃতিরূপে তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত। সহজাত এবং সদাজাগ্রত সৌন্দর্য-সচেতনতায়ই তিনি প্রকৃতির প্রতিটি দৃশ্যকে বর্ণোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

হিমালয়ের পার্বত্যপথ পরিক্রমায় ক্ষুদ্র চারার মত প্রতীয়মান নীচের খাদের কেলু বা পাইন গাছকে লক্ষ্য করিতে মহর্ষিদেব ভোলেন নাই। মধ্যে মধ্যে নিবিড় বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়াতে বনের শোভা আরও দীপ্তি পাইতেছে, এই আরণ্যক চিত্রের চারুতাও তাঁহার সৌন্দর্যবোধের অভিজ্ঞান। ভূমিষ্ঠ প্রণতের মত মূল হইতে উৎপাটিত বৃক্ষসমূহ, হরিদ্-বর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষরাজি, পর্বতগাত্রের বিবিধ প্রকারের তৃণলতাদির চমৎকারিত্ব, কোনও পর্বতের মধ্যে মধ্যে বেশ কিছু দূরত্বে সূর্যকিরণে দীপ্ত এক একটি গ্রামের গৃহপুঞ্জ, অন্ধকার রাত্রিতে মনুষ্য বসতির চিহ্নস্বরূপ পর্বতের স্থানে স্থানে দৃশ্যমান প্রদীপের আলোক, পর্বতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্যন্ত সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান বৃক্ষসকল—হিমাচল-ভ্রমণের এই সকল চিত্র হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, এক গভীর, মর্মগত সৌন্দর্য-গ্রাহিতায় দেবেন্দ্রনাথ চক্ষু মেলিয়া হিমালয়ের রূপ নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধেই তিনি বোয়ালি পর্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে সূর্যকিরণে রৌপ্যপত্রের ন্যায় চিক্‌চিক্ করিতে দেখিতে পাইয়াছেন, উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া গম্ভীর গর্জনে এবং ফেনোচ্ছ্বাসে প্রবহমান নগরী নদীর গতির সৌন্দর্যও তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়াছে। প্রথমে পর্বতের উপরে দীপমালার শোভায় দাবানলের উদ্ভব, তাহার বিস্তারে সমস্ত বৃক্ষের অগ্নিরূপ ধারণ, হিমালয়ে দাবানলের এই সৌন্দর্যও তিনি মুগ্ধদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার হিমালয়ের সৌন্দর্য-সঞ্চয়ে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ এবং দারুণঘাটে পর্বতশৃঙ্গ-সংলগ্ন মেঘাবলী হইতে তুষারবর্ষণের দৃশ্যও স্থান পাইয়াছে।

ভগবৎ-প্রেমিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের সৌন্দর্যকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করেন নাই, উহাতে তিনি হিমাচল-স্রষ্টার সৌন্দর্যকেও অনুভব করিয়াছেন। অধ্যাত্মচেতনায়, ঈশ্বরের মহিমার নিবিড় উপলব্ধিতেই তাঁহার সৌন্দর্য-দৃষ্টি পূর্ণতার সন্ধান পাইয়াছে। হিমালয়ের এক পর্বত-গাত্রে প্রস্ফুটিত বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পের সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে তিনি সেই পরমস্রষ্টার সৃষ্টির শুভময়তাকে আবেগের ঐকান্তিকতায় অনুভব করিয়াছেন। বনলতার শ্বেতপুষ্পে বিধাতার স্নেহ ও করুণাকে অভিব্যক্ত হইতে তিনি দেখিয়াছেন। শীতকালে

তুষারপাতের মধ্যেও পাইন-গাছের পত্র আরো সতেজ হয়, তাহার সবুজবর্ণ অপরিবর্তিত থাকে—এই সৌন্দর্যের চিরনবীনতার মূলে ত ঈশ্বরের করুণাই লক্ষণীয়। সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষসমূহের দৃশ্যের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য তাঁহারই দান। দাবানলের অপরূপ রূপেও ত তাঁহার মহিমা উদ্ভাসিত। এক নিদারুণ উচ্চ তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ উদ্যত বজ্রের ন্যায় তাহার সৌন্দর্যের গাম্ভীর্যে বিধাতার ঐশ্বর্যের চিত্রটিকেই তুলিয়া ধরে। আমরা দেখি, হিমাচল ভ্রমণে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সমীক্ষা মহর্ষির অধ্যাত্ম ব্যাকুলতায় সকল শোভার প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরের সৌন্দর্যধ্যানে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার কবিমানসের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধের সহিত অধ্যাত্মচেতনা মিলিত হইয়া রচনাটিকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে।

সৌন্দর্য-চেতনার সহিত অধ্যাত্মদৃষ্টির সুসমঞ্জস সমন্বয়ই হইল দেবেন্দ্রনাথের নিসর্গ চেতনার বৈশিষ্ট্য, হিমাচল-ভ্রমণের বিশ্লেষণে ইহাই আমাদের নিকট পরিস্ফুট হয়। প্রকৃতিকে তিনি তাহার সকল দৃশ্য-বর্ণ-গন্ধ-সুষমায় অনুভব করিয়াছেন, তাহার প্রতিটি চিত্র এবং বর্ণকে যে আবেগের নিষ্ঠায় এবং অভ্রান্ত পর্যবেক্ষণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সৌন্দর্যসচেতন ইন্দ্রিয়দৃষ্টি লক্ষণীয়। তিনি আবার প্রকৃতির রূপেই পরম-পুরুষের স্পর্শকে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই চেতনার আলোকে প্রকৃতি মহনীয়া হইয়া উঠিয়াছে। মহর্ষির এই বহির্দৃষ্টি পরস্পরকে আচ্ছন্ন করে নাই, সুষ্ঠুভাবে সমন্বিত হইয়া তাঁহার নিসর্গচেতনাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

(২) ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে দেবেন্দ্রনাথের হিমাচল-ভ্রমণের মূল্য নিরূপণ কর।

উত্তর ঃ ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমাচল-ভ্রমণের একটি বিশেষ মূল্য আছে। তাঁহার চিত্ত ছিল ভ্রমণরসিক, সৌন্দর্য-পিপাসু, এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের প্রতিটি অংশেই আমরা তাহার উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করি। সাধারণ ভ্রমণ-কাহিনীর মত তিনি একদিকে যেমন নিছক তথ্যগত বর্ণনার বাহুল্যে তাঁহার রচনাকে ভারাক্রান্ত করেন নাই, তেমনি প্রকৃতির বাহিরের রূপকে উপেক্ষা করিয়া শুধু আত্মগত উচ্ছ্বাসে উহাকে পূর্ণ করেন নাই। তাঁহার ধ্যান-দৃষ্টি এবং রূপ-দৃষ্টি এক নিগূঢ় ঐক্যে সম্মিলিত হইয়াছে বলিয়াই হিমাচল-ভ্রমণের উৎকর্ষ অসাধারণ দীপ্তি পাইয়াছে।

মহর্ষিদেবের সহজাত সৌন্দর্যবোধের সহিত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ যুক্ত হইয়াছে বলিয়াই তিনি হিমালয়ের পার্বত্য প্রকৃতিকে তাহার সকল দৃশ্য-বর্ণ-গন্ধ-সুষমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই নিজস্ব সৌন্দর্যচেতনার আলোকে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। তাই তাঁহার হিমালয়ের বিভিন্ন দৃশ্যের খুঁটিনাটি বর্ণনা যেমন প্রত্যক্ষ ও বাস্তব, তাহাদের যাথার্থ্যেই তেমনি তাঁহার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মাহাত্ম্যে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের জ্যোতি ফুটিয়াছে। মহর্ষি তাঁহার পথপরিক্রমায় হিমালয়ের শোভার সঙ্গে তাহার বন্ধুরতা এবং বিপদসঙ্কুলতার বিবরণ দিতেও ভোলেন নাই। মধ্যে মধ্যে বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়ায় বনের শোভার চমৎকারিত্ব, পর্বত-গাত্রে সূর্যকিরণে দীপ্ত গৃহপুঞ্জ, পর্বতের তল হইতে চূড়া পর্যন্ত সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষসকল, সূর্যালোকে রৌপ্যপত্রের ন্যায় মসৃণ ও উজ্জ্বল শতদ্রু নদী, প্রবল গর্জনে ও ফেনোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত নগরী নদী—এই সকল দৃশ্যের চিত্র-সৌন্দর্যে এই ভ্রমণ-কাহিনীটি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। পর্বতের উপরে দীপমালার শোভায় দাবানলের উদ্ভব এবং তাহার বিস্তার, তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ-সংলগ্ন মেঘাবলী হইতে তুষারবর্ষণ—দেবেন্দ্রনাথ বর্ণিত এই সকল দৃশ্যগুলিতে প্রকৃতির সৌন্দর্য সজীব হইয়া উঠিয়াছে। মহর্ষি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে প্রকৃতির মত প্রকৃতিলালিত মানুষদেরও একটি মূল্যবান স্থান দিয়াছেন। পাহাড়িয়াদের নৃত্যগীতে তাহাদের সরল প্রকৃতির উল্লাস, রুক্ষ, বন্ধুর প্রকৃতির পরিবেশে তাহাদের জীবনযাত্রার দুরূহতা, একটি পরিবারের প্রাণোচ্ছলতা—প্রকৃতির পটে মানবজীবনও বিধৃত হইয়া রচনাটিকে ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

হিমালয়কে মহর্ষিদের কতকগুলি দৃশ্যের সমষ্টিরূপে গ্রহণ করেন নাই, হিমালয়ের সৌন্দর্যে তিনি ঈশ্বরের কল্যাণস্পর্শকে অনুভব করিয়াছেন। সেই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির আলোকেই প্রকৃতির রূপ এক অপরূপ ঐশ্বর্যে দীপ্ত হইয়াছে। বনলতার ছোট ছোট শ্বেতপুষ্পে বিধাতার করুণা এবং স্নেহ অনুভব করিয়া তিনি অভিভূত হইয়াছেন, দাবানলের রূপে, তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গে তাঁহার মহিমাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। মহর্ষির সৌন্দর্য-সচেতন ভগবৎপ্রেমিক পবিত্র ও গম্ভীর ব্যক্তিত্বটি চিত্রসৌন্দর্যে, আবেগের গভীরতায়, বর্ণনার প্রত্যক্ষতায় স্পন্দিত হইয়াছে বলিয়াই ভ্রমণ-সাহিত্য হিসাবে হিমাচল ভ্রমণের মূল্য অসাধারণ।

আমার মন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সার-সংক্ষেপ ঃ

কমলাকান্ত একদিন শূন্যতা অনুভব করিয়া, তাহার মন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, সেই প্রশ্নের সূত্রে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে ভোজনপ্রিয় কমলাকান্ত পাকশালায় অন্বেষণ করিয়া দেখে, সেইখানে তাহার মন নাই। প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট হইতে দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, ননী লাভ করিবার জন্য সে তাহার গুণমুগ্ধ, কিন্তু প্রসন্নের নিকট অথবা তাহার গোয়ালে তাহার হারানো মনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পথিমধ্যে বাহির হইয়া জলের কলসী-কক্ষে এক যুবতীকে দেখিয়া কমলাকান্ত ভাবে, সেই তাহার মন চুরি করিয়াছে। যুবতীর নিকটে সেকথা বলাতে সে তাহাকে কটূক্তি করিয়া গালি দেয়। অবশেষে কমলাকান্ত বুঝিতে পারে, এ সংসারে কোথায়ও তাহার মন নাই। সে কখনও কিছুতে তাহার মনকে বাঁধে নাই বলিয়াই তাহার এই অস্থিরচিত্ততা। মানুষকে অন্যের নিকট আত্মনিবেদন করিতেই হয়। কমলাকান্ত অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখে, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ব্যতীত পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্যবস্তু বলিয়া পরিচিত, তাহা সমস্তই তৃপ্তিহীন যন্ত্রণার কারণ। একমাত্র পরার্থপরতায়ই যে স্থায়ী সুখ লভ্য, বুদ্ধদেব এবং তাহার পরে আরও অনেক মনীষী সে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আমরা আবার ইংরেজ সাম্রাজ্যের শাসনাধীন হইয়া ইংরেজী সভ্যতার বাহ্য-সম্পদের বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হইয়াছি, এডাম স্মিথ, মিল প্রভৃতি ইংরেজ চিন্তানায়কদের বাহ্য সুখপ্রশস্তিকেই জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া জানিয়াছি। কমলাকান্ত চিরকাল নিজের উদর পরিতৃপ্তি লইয়া ব্যস্ত থাকিয়াছে, তাই সংসারে তাহার সুখ নাই। কেবল বিবাহ করিয়াও মানুষ সুখী হয় না, নিজের সংসারকে ভালবাসিয়া মনুষ্য জাতিকে ভালবাসিতে না শিখিলে সে বিবাহের কোনও মূল্য নাই। মানবপ্রীতি শিক্ষার জন্যই কমলাকান্ত বিবাহ করিতে উৎসুক।

রচনা-পরিচিতি এবং রসগ্রাহী সমালোচনা ঃ

'আমার মন' রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের অন্যতম অংশ। "১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লোকরহস্য, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কমলাকান্তের দপ্তর এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানরহস্য, সাম্য ও বিবিধ প্রবন্ধে এবং পরবর্তী জীবনের অনুশীলন-তত্ত্বমূলক রচনাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের যে দিকটির পরিচয় পাই, তাহাকে তাঁহার গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা পরায়ণ গম্ভীর দিক্ বলা যায়। বঙ্গদর্শনের সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য এবং প্রধানতঃ বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য সব্যসাচী বঙ্কিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে—কমলাকান্ত, লোক রহস্য ও মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘুদিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজ-বিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘু নহে। তাঁহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে। প্রবন্ধগুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন নাই, বিদ্রূপের আবরণে সে সকল কথা তিনি অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্রতম সৃষ্টি; বস্তুতঃ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কমলাকান্ত চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন। কমলাকান্ত বলিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝিয়া থাকি।...গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় মন প্রথমটা লোকরহস্যের সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মাসের পর মাস নিছক রহস্য সৃষ্টি করিয়া থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন তাঁহার ছিল না। প্রবহমাণ সংসার স্রোতের উপরিভাগে আপাতমনোহর তরঙ্গভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তীক্ষ্ণধী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কখনও গভীর রহস্যগহনে তলাইয়া যাইতেন, এবং মরণশীল মানবের ও বিশেষ করিয়া যে সকল হতভাগ্য জীব তাঁহার আশ পাশে চিন্তাহীন নিঃশঙ্কতায় ভাসমান, তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হালকা হাসির বুদ্বুদ্‌বিলাসে তাঁহার মন সায় দিত না। অর্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন

তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাসুজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্স, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত-জন্মের ইহাই ইতিহাস' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

কমলাকান্ত চরিত্রটি বঙ্কিমের এক বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙলা সাহিত্যে অনন্য। কমলাকান্ত নেশাখোর, অর্ধোন্মাদ, ভবঘুরে। এই ধরনের চরিত্রের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতেই ত জীবনের গভীরতর সত্য প্রতিভাত হয়! লঘু পরিহাসে, কৌতুকে, কঠিন ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে আমাদের সমাজ-জীবনের সমস্ত মিথ্যাচার ভেদ করিয়া সে সত্যকে উদ্ঘাটিত এবং প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। কমলাকান্তের মাধ্যমে তাহার স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের প্রাণময়তাই দপ্তরের প্রায় প্রতিটি অংশ লঘু কৌতুক, ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, গম্ভীর আবেগ, তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতা প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

কমলাকান্তের দপ্তরের প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য যথার্থ: 'এইগুলিতে শুধু রচয়িতার ব্যাক্তিমানস নহে, তাঁহার আবেগ অনুভূতি কল্পনাস্বপ্ন জীবনবোধ প্রভৃতি বৃত্তির সূক্ষ্ম তন্তুজালে রচিত, নিগূঢ় ব্যক্তিসত্তা এক অবর্ণনীয় আবেদন লইয়া পাঠকের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে।'

'আমার মন' রচনাটিতেও দপ্তরের এই বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে প্রতিফলিত। কৌতুকের লঘুতায়ই রচনাটির উপক্রমণিকা রচিত। কমলাকান্ত তাহার ঔদরিকতা, প্রসন্ন গোয়ালিনীর সহিত দুগ্ধ-ক্ষীর-ননী প্রাপ্তিঘটিত ছদ্ম প্রণয়ীর সরস সম্পর্ক, একটি যুবতীকে নিজের মনের কথা জানাইতে গিয়া বিপত্তি ইত্যাদি লইয়া পরিহাস করে। তাহার পরিহাসতরল কণ্ঠস্বর আমাদের অলক্ষ্যেই গম্ভীর হইয়া উঠে। মনুষ্যপ্রীতিতেই যে মানুষের চিরস্থায়ী সুখ, সেই সত্য ভুলিয়া গিয়া আমরা যে-ভাবে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে বাহ্য-সম্পদ প্রীতিকে জীবনের সর্বস্ব করিয়া তুলিয়াছি, কমলাকান্ত কাহাকে

কঠিন ব্যঙ্গে ধিক্কার দেয়। সেই ধিক্কারে কেবল তাহার হৃদয়ের জ্বালাই নয়, আমাদের অধোগতিতে তাহার বেদনাও অনুভূত হয়। 'আমার মন'-এর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কমলাকান্তের তথা বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বকেই স্পন্দিত হইতে অনুভব করি। দপ্তরের অন্যান্য অংশের মত রচনাটির গদ্যভঙ্গিও অভিনব। 'আমার মনে' লঘু, তরল ভঙ্গি আলংকারিক প্রকাশভঙ্গি এবং গম্ভীর, ঋজু, তীক্ষ্ণ গদ্যরীতির এক বিচিত্র সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। কমলাকান্তের হৃদয়-মনের ঐকতানের সমস্ত-কিছুই এক গভীর সুর-সঙ্গতি লাভ করিয়াছে।

'আমার মন' নামকরণটিও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুপ্রযুক্ত। নিজের মনকে জানা, নিজের হৃদয়মন অর্থাৎ সমগ্র সত্তার আশ্রয় কি, তাহার চরম সার্থকতা কোথায় নিহিত উহাই মানবজীবনের প্রথম মৌলিক জিজ্ঞাসা। কমলাকান্তও প্রথমে তাহার মনের প্রকৃত আশ্রয়স্থল কি, নিজের মধ্যেই তাহারই উত্তর খুঁজিয়াছে। এই আত্মানুসন্ধান অবশেষে আত্মাবিষ্কারে শেষ হইয়াছে। সে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, পরোপকার ব্যতীত মানবমনের অন্য কোনও ধ্রুব আশ্রয়, স্থায়ী সুখ নাই; ইন্দ্রিয়সুখের কোনও উপকরণ নয়, এই আত্মোপলব্ধিই মানুষকে তাহার চিরস্থায়ী শান্তির অমৃত আনিয়া দিতে সক্ষম।

শব্দার্থ ও টীকা

[অনু ১-১০]—**ডেকচি-সমারূঢ় অন্নপূর্ণা**—অন্নপূর্ণা সকলের ক্ষুধা নিবারণ করেন, কমলাকান্ত তাহাই স্মরণ করিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিতেছে, ডেকচিরূপ সিংহাসনে আরূঢ় অর্থাৎ স্থাপিত অন্ন অন্নপূর্ণার মতই ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিবার আশ্বাস দেয়।

কাবাব—(আরবী কবং শব্দ হইতে) মাংস কুটিয়া গুলি পাকাইয়া লৌহ শলাকায় বিঁধিয়া আগুনের আঁচে ভাজা।

কোফতা—পেষা ভাজা মাংস।

দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়—দেবতাদের পরম শত্রু বৃত্রাসুর বধের অস্ত্র অর্থাৎ বজ্র নির্মাণের জন্য দধীচি তাঁহার অস্থি দানকরিয়াছিলেন। ছাগবৎসও সেইভাবে যেন নিজেকে বিসর্জন দেয়, তাহার মাংসযুক্ত অস্থিতে কোরমারূপ

বজ্র নির্মিত হইয়া মানুষের ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুরকে বধ করে অর্থাৎ ক্ষুধা দূর করে। কমলাকান্তের পরিহাসোক্তি।

কোরমা—বিনা জলে এবং কেবল দধিতে কিসমিস ও অন্যান্য মসলার সহিত পক্ব মাংস।

লুচিরূপ সুদর্শন চক্র—মহাদেবের আদেশানুসারে বিশ্বকর্মা সকল দেবতার তেজ লইয়া এক চক্র প্রস্তুত করেন। পরে দৈত্যদানবাদি ধ্বংসের জন্য মহাদেব এই চক্র বিষ্ণুকে দান করেন। সুদর্শন চক্রই বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র। সুদর্শন চক্র গোলাকার বলিয়া কমলাকান্ত কৌতুকরসসিক্ত ভঙ্গিতে লুচিকে তাহার সহিত তুলনা করিয়াছে।

মন-রাহু—রাহু বিপ্রচিত্তি দানব ও দিতির কন্যা সিংহিকার সন্তান। বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে যখন অমৃত ভাগ করিয়া দিতে-ছিলেন, তখন রাহু অমৃত পানের আশে দেবরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে উপবিষ্ট হয়। তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত অমৃত প্রবেশ করিলে চন্দ্র ও সূর্য তাহাকে চিনিতে পারিয়া দেবতাদের কাছে তাহার আসল পরিচয় উদ্ঘাটিত করিয়া দেন। তখন বিষ্ণু তাঁহার সুদর্শন চক্রে রাহুর মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু অমৃত পান করিবার ফলে রাহুর মৃত্যু হইল না, তাহার মস্তকভাগ রাহু এবং দেহভাগ কেতু নামে খ্যাত হয়। সেই সময় হইতেই চন্দ্র ও সূর্যের সহিত রাহুর চির শত্রুতার সূত্রপাত, সে তাঁহাদের গ্রাস করিয়া ফেলে। পুরাণে বলা হয়, রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিলে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যকে গ্রাস করিলে সূর্য-গ্রহণ হয়। কমলাকান্ত এই পৌরাণিক বৃত্তান্তকে অনুসরণ করিয়া পরিহাস-ছলে বলিয়াছে—যে আকাশে লুচিরূপ চন্দ্র দেখা যায়, সেইখানেই তাহার মনরূপ রাহু তাহাকে গ্রাস করিতে চায়, অর্থাৎ লুচিভক্ষণের জন্য তাহার মন লুব্ধ হয়।

অখণ্ড মণ্ডলাকার—সম্পূর্ণ গোলাকৃতি লুচির আকার গোল বলিয়া কমলাকান্ত এইরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে ভগবানই বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া অখণ্ড মণ্ডলাকার।

সন্দেশরূপ শালগ্রাম—সন্দেশ শালগ্রামের মতই গোলাকার, পূর্বে সন্দেশ গোল করিয়াই পাকানো হইত। শালগ্রাম যেরূপ ভক্তিতে পূজিত

কমলাকান্তও সেইরূপ ভক্তিতে সন্দেশের প্রতি আকৃষ্ট। নিজের ভোজন-প্রিয়তা লইয়া সে এইখানে পরিহাস করিয়াছে।

প্রসক্তি—প্রণয়, অনুরাগ।

পলান্ন—পল (মাংস মিশ্রিত)+অন্ন, মৎস্য মাংসাদি সহযোগে—ঘৃতপক্ক অন্ন, পোলাও।

প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক—প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট হইতে গব্য অর্থাৎ গোদুগ্ধজাত ঘৃত-ক্ষীর-ননী ইত্যাদি কমলাকান্ত লাভ করিত বলিয়াই তাহার সহিত কমলাকান্তের প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

উলকী—গাত্রে সূচী বিদ্ধ করিয়া রচিত চিত্র; tattoo।

গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন—বিষ্ণু তাঁহার বামনাবতারে বলী রাজার নিকট হইতে ত্রিলোক হরণের সময় তাঁহার বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখরাঘাতে মৃত্তিকা হইতে যে জলধারা নির্গত করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাহাই গঙ্গা নামে পরিচিত হয়। সূর্যবংশীয় রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ কপিলের শাপে ভস্মীভূত নিজেদের বংশের সগর-সন্তানদের উদ্ধারের জন্য দুরূহ তপস্যায় গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেন।

ঘটোধ্নী—ঘটের ন্যায় স্থূল স্তনবিশিষ্টা।

কুঞ্চিতালকরাজি—কুঞ্চিত অলক অর্থাৎ চুলের রাশি।

অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষা—যে আকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্ত হয় না।

যশের অনুগামিনী নিন্দা—খ্যাতি হইলে তাহার সঙ্গে নিন্দাও জোটে, ইহাই জগতের নিয়ম।

পত্নীজার—পত্নীর উপপতি।

শাক্যসিংহ—শাক্যবংশোৎপন্ন বলিয়া বুদ্ধদেবের এক নাম শাক্যসিংহ

মেটিরিয়েল প্রস্পারিটি—বাহ্য-সম্পদবৃদ্ধি বা বৈষয়িক উন্নতি ইংরেজী সভ্যতার মোহে বাহ্য-সম্পদের উপর অনুরাগকেই শিক্ষিত বাঙালীর জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া বঙ্কিম ব্যঙ্গভরে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—এদেশীয়রা পাশ্চাত্ত্য বাহ্য-সম্পদবৃদ্ধির সাধনাকে জীবনের মূল লক্ষ্য করিয়া

তোলায় ভারতবর্ষের দেবমূর্তিসকল, অর্থাৎ অন্যান্য জীবনাদর্শসমূহ অবহেলিত ও অনাদৃত হইয়াছে।

টাকা ধর্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—হিন্দু শাস্ত্র-পুরাণাদিতে ইহাই চারিটি পুরুষার্থরূপে উল্লিখিত হয়। এই চতুর্বর্গ-প্রাপ্তিই জীবনের লক্ষ্যরূপে বর্ণিত। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শে টাকাই এখন চতুর্বর্গরূপে পরিগণিত।

রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থপ্রসূতি—রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি হইতে প্রচুর অর্থোপার্জন হয়; ইংরেজ তাহার বৈষয়িক সভ্যতার ঐশ্বর্য-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এদেশে রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফ প্রবর্তিত করিয়াছিল।

যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া, বঞ্চনা বিল্বদলে মিষ্ট কথা চন্দন মাখাইয়া—দেবমূর্তিকে গঙ্গার জলে স্নাত করিয়া চন্দনভূষিত বিল্বপত্রে তাঁহার পূজা করিতে হয়। সেইরূপ অর্থের প্রতি খ্যাতি, যশ জড়িত, অর্থের আরাধনায় যশের আকাঙ্ক্ষা থাকে; বঞ্চনায় এবং মিষ্ট কথায় অপরকে বশীভূত এবং প্রতারিত করিয়াই অর্থোপার্জন করিতে হয়।

এই মহাদেবের—অর্থের।

আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু—কমলাকান্ত ব্যঙ্গভরে বলিতেছে, আর দেরী কেন, অর্থের পূজার পুরোহিতেরা আমাদের পুরাতন ঘৃত অর্থাৎ জনহিতৈষণার ঐতিহ্যকে পূজার যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করুন।

ব্যাখ্যা

১। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি……অন্য কোন মূল নাই। (অনু ১০)

উদ্ধৃত অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আমার মন' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। লেখক এখানে কমলাকান্তের উক্তির মাধ্যমে মানুষের স্থায়ী সুখের ভিত্তিটি নির্দেশ করিয়াছেন।

নিজের মনের প্রকৃত অবলম্বন অনুসন্ধান করিতে গিয়া কমলাকান্ত জীবনের এক গভীর ও মৌলিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছে। ঐশ্বর্য, খ্যাতি প্রভৃতি হইতে মানুষ যে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করে, তাহা যেমন ক্ষণভঙ্গুর, স্বল্পকাল-

স্থায়ী, তেমনি অতৃপ্তিদায়ক। এইজাতীয় সুখলাভে সুত্যকারের মানসতৃপ্তি ঘটে না, সুখের তৃষ্ণা আরও তীব্র হইয়া প্রচণ্ড জ্বালায় মানুষকে অস্থির এবং অশান্ত করিয়া তোলে। আত্মকেন্দ্রিক সুখের মরীচিকা-তৃষ্ণার ইহাই হইল একমাত্র অনিবার্য পরিণাম। শুধু পরার্থপরতায়, পরের জন্য আত্মোৎসর্জনেই অক্ষয়সুখ মানুষ লাভ করিতে পারে। পরহিতৈষণায় যে সুখ মানুষ লাভ করে, তাহাই অমৃত, চিরস্থায়ী ; চিরস্থায়ী সুখের অন্য কোনও উৎস নাই।

২। আমি মরিয়া ছাই......স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই।

(অনু, ১০) (ক. বি. ১৯৬২)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। ইন্দ্রিয়সুখের প্রতিটি উপকরণই পরিণামে মানুষকে অশান্তি ও অতৃপ্তির অগ্নিদহনে দগ্ধ করে। ধন, যশ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ চিরস্থায়ী নয়। এই সকল সুখের আরাম ভোগে সুখের অনুভূতি চলিয়া যায়, কিন্তু উহারা দুইটি অশান্তির কারণ হয়। প্রথমতঃ, অভ্যস্ত বস্তুর অভাবে সুখ না হইলেও তাহার অভাবে গুরুতর অতৃপ্তি হয়, দ্বিতীয়তঃ তৃপ্তিহীন কামনার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। পৃথিবীর প্রতিটি কাম্যবস্তুই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল। যশের সঙ্গে নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের পর ব্যাধি, ঐশ্বর্যের সঙ্গে ক্ষতি এবং মানসিক অশান্তি, সুনামের সঙ্গে মিথ্যা কলঙ্ক জড়িত থাকিবেই। ধনোপার্জনে বা যশোলাভে সুখী হইয়াছে, একথা কোনও মানুষকে কখনও বলিতে শোনা যায় না। বিভিন্ন সুখের কামনা মানুষের হৃদয়ে রাবণের চিতাগ্নির মতই অনির্বাণ জ্বলে। তবু মানুষ স্থূল, পার্থিব সুখের জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। তাই তীব্র ক্ষোভে কমলাকান্ত বলিতেছে, সে একদিন মরিয়া ছাই হইবে, তাহার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু তাহার সেই অমোঘ পরিণাম স্মরণ করিয়াও সে মুক্তকণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করিতেছে, একদিন প্রতিটি মানুষ তাহার কণ্ঠোচ্চারিত এই সত্য বুঝিবে যে, পরোপকার ব্যতীত মানবজীবনের স্থায়ী সুখের অন্য কোনও উৎস নাই। ইন্দ্রিয়জ বাসনা কামনার নিষ্ফলতার পটভূমিকায় এই সত্য তাহাদের একদিন উপলব্ধি করিতেই হইবে।

৩। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ...হৃদয় ইহাতে ছাগবলি।

(অনু ১২)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। ইংরেজী আত্মসুখপরায়ণতার শিক্ষা ও অর্থকেন্দ্রিক সভ্যতার মোহে শিক্ষিত বাঙালীরা যেভাবে বাহ্যসম্পদ তথা অর্থের আরাধনায়

মত্ত হইয়াছিল, কমলাকান্তের মাধ্যমে বঙ্কিম কঠোর ব্যঙ্গে সেই মোহান্ধতাকেই আক্রমণ করিয়াছেন।

দেবতার পূজায় পুরোহিত, পুরাণ এবং তন্ত্র হইতে সংগৃহীত মন্ত্র, ঢাক-ঢোল-কাঁসি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, নৈবেদ্য এবং ছাগবলির প্রয়োজন হয়। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীরাও বাহ্যসম্পদের পূজায় ইংরেজদের পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছে, অর্থাৎ তাহারা ইংরেজদের বৈষয়িক সুখসমৃদ্ধির বিপুল আয়োজনেই অনুপ্রাণিত হইয়াছে। এডাম্ স্মিথের অর্থনৈতিক তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ এই পূজার পুরাণ এবং জেম্‌স্ ও জন্ স্টুয়ার্ট মিলের সামাজিক তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থাদি হইতে ইহার মন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে : ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীরা তাঁহাদের রচনাবলী হইতেই বৈষয়িক সভ্যতার শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি প্রতিনিয়ত অর্থের মহিমাই কীর্তন করিয়া চলিয়াছে, আর বাঙলা সংবাদপত্রসমূহ তাহার অনুসরণ করিতেছে। তাই বঙ্কিম এই অর্থের পূজায় ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিকে ঢাক-ঢোল এবং বাঙলা পত্রগুলিকে কাঁসিদার রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। দেবপূজার নৈবেদ্যের মতই বাহ্য-সম্পদের পূজায়, অর্থাৎ অর্থোপার্জনে শিক্ষা এবং উৎসাহকে নিয়োজিত করিতে এবং ছাগলের মত হৃদয়কে বিসর্জন দিতে হয়, কারণ হৃদয়ের স্নেহমমতাকে নিষ্পেষিত না করিলে কঠোর বৈষয়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া যায় না।

টীকা ঃ এডাম্ স্মিথ—উনবিংশ শতাব্দীর এই বিখ্যাত ইংরেজ অর্থ-নীতিবিদ্ ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এডাম্ স্মিথ তাঁহার 'দি ওয়েলথ্ অফ নেশন্‌স' গ্রন্থে আধুনিককালে জাতির ধনবৃদ্ধির অর্থনৈতিক পটভূমির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং পরিশ্রমে ঐশ্বর্যসংগ্রহে জাতিরও যে সমৃদ্ধি ঘটে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। **মিল**—জেম্‌স্ মিল (১৭৭৩-১৮৩৩) এবং তাঁহার পুত্র জন স্টুয়ার্টমিল, বিশেষতঃ শেষোক্ত জন উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক ছিলেন। বেন্‌থামের ইউটিলিটেরিয়ান তত্ত্ব অর্থাৎ উপযোগিতাবাদ কিছুটা পরিবর্তিত করিয়া জন স্টুয়ার্ট মিল প্রচার করেন। ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, অধিকতম সংখ্যক লোকের জন্য অধিকতম সুখের ব্যবস্থাই সমাজের ভিত্তি। ইহা এক ধরনের সামাজিক শৃঙ্খলাবিধি, হৃদয়ের আবেগ বা মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ইহাতে বিবেচ্য নয়।

৪। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়ান কামার..........তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর। (অনু ১২)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। কমলাকান্ত বৈষয়িকতাসর্বস্ব হিতবাদ বা উপযোগিতা-বাদকে কঠিন ধিক্কার দিয়া এই উক্তিগুলি উচ্চারণ করিয়াছে।

বর্তমান যুগের বিষয়সর্বস্বতা মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, তাহাকে লোভের, স্বার্থের ক্রীতদাস করিয়া তোলে, এইভাবে তাহার আত্মার অপমৃত্যু ঘটে। মানুষের সেই মর্মান্তিক পরিণতি স্মরণ করিয়া ক্ষোভের তীব্র ব্যঙ্গে কমলাকান্ত বলিতেছে, বৈষয়িক সুখের নেশায় সকলেই যখন উন্মত্ত হইয়াছে, তখন আর দেরি কেন, যাহারা বৈষয়িকতাসর্বস্ব উপযোগিতা-বাদ শিক্ষা দিয়াছে, তাহারা আসিয়া কামারের হাড়িকাঠে ছাগ কাটিয়া ফেলার মত হৃদয়কে সমূলে ধ্বংস করুক, অর্থাৎ তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে হৃদয় মনকে গ্রাস করুক। পঞ্চানন, মহাদেবের নাম করিয়া যেমন বলি দেওয়া হয়, তেমনি পঞ্চানন্দ, মদ্যমাংস প্রভৃতি আনন্দ, অর্থাৎ বৈষয়িক সুখের নামে মানুষের মনুষ্যত্বকে বলি দেওয়া হোক। কমলাকান্তকে, যেন মুণ্ড অর্থাৎ লাভের অংশ দেওয়া হয়, সে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিক্ষিত বাঙালীরা স্বচ্ছন্দে বাহ্য-সম্পদের পূজা করুক, কমলাকান্ত কোনও বাধা দিবে না।

টীকা ঃ ইউটিলিটেরিয়ান কামার—ইউটিলিটেরিয়ানরা অধিক-সংখ্যক মানুষের জন্য অধিকতম সুখের ব্যবস্থার নীতি প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উপযোগিতাবাদে বৈষয়িক চেতনাই প্রাধান্য পাইয়াছে, অধিকতম সুখের নামে হৃদয়বৃত্তি নষ্ট করিয়া মানুষকে বিষয়ের দাস করিয়া তোলা হইবে। সেইজন্যই বঙ্কিম কমলাকান্তের মাধ্যমে হিতবাদীদের কামার আখ্যা দিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর

১। 'কমলাকান্তের উক্তিগুলির আপাতলঘুতার মধ্যে যে গভীরতা, বাহ্য হাস্যরসের মধ্যে যে করুণা এবং অত্যন্ত প্রকট অসম্বদ্ধ প্রলাপের মধ্যে যে নিগূঢ় মনস্বিতা আছে, বাঙলা

পারি। সুতরাং কমলাকান্তের আপাত-লঘুতার মধ্যে যে গভীরতা, বাহু হাস্যরসের মধ্যে যে করুণা এবং অত্যন্ত প্রকট অসম্বদ্ধ প্রলাপের মধ্যে যে নিগূঢ় মনস্বিতা আছে, বাঙলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই, 'আমার মন' বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তিটিকে যুক্তিপূর্ণ বলিয়াই বোধ হয়।

২। 'কথাটি প্রাচীন। সার্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শতসহস্র লোকশিক্ষক শতসহস্রবার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন।' এখানে কোন্ শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে? আধুনিক যুগে এই প্রাচীন কথার অবতারণার বিশেষ উপযোগিতাটি লেখককে অনুসরণ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর : এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আমার মন' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে অন্যের কল্যাণবিধানেই মানুষের যে চিরস্থায়ী সুখ, সেই শিক্ষার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মসুখ কামনায় মানুষের ধ্রুব শান্তি, সুখ, মিলিতে পারে না। অর্থ, খ্যাতি হইতে যে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করা যায় তাহা স্বল্পকালস্থায়ী। এইজাতীয় সুখে ক্রমাগত অভ্যস্ত হইলে সুখানুভূতি লোপ পায়, অথচ ইহারা দুই প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, অভ্যস্ত বস্তুতে সুখ না হোক অভাবে গুরুতর অস্বস্তি এবং তৃপ্তিবিহীন কামনায় বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। পৃথিবীতে যে সমস্ত বিষয় কাম্যবস্তু বলিয়া পরিচিত, তাহা সমস্তই অতৃপ্তিকর যন্ত্রণা জড়িত। মানুষের জীবনের স্থায়ী সুখ একমাত্র পরোপকারেই লভ্য, সেই সুখই অমৃত, একমাত্র তাহাই অক্ষয়বটের মত মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে। কথাটি অনেক প্রাচীন, বুদ্ধদেব তাঁহার বিভিন্ন বাণীতে জীবনের এই মূল্যবোধই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন; তাহার পরে লোক-শিক্ষক আরও অনেক মনীষী শতসহস্রবার এই শিক্ষাই দান করিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক যুগে এই প্রাচীন, বহু কণ্ঠোচ্চারিত কথাটির অবতারণার বিশেষ উপযোগিতা আছে। আধুনিক কালের সভ্যতার মূল লক্ষ্য বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি, ইহা মানব-জীবনের যথার্থ চরিতার্থতাকে উপেক্ষা করিয়া মানুষের অন্তরে রাবণের চিতাগ্নির মতই অনির্বাণ এবং তৃপ্তিবিহীন ব্যক্তিগত ভোগসুখ কামনাকে প্রজ্বলিত করে, তাহার জীবনকে মরুভূমি করিয়া তোলে। ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতার বাহ্যসম্পদের আড়ম্বরে আমরা মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত

হইয়াছিলাম, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় সেই বাণিজ্যিক সভ্যতার যে ঐশ্বর্যদীপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাকেই জীবনের সারবস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আধুনিক যুগের প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমে, সংবাদপত্রে, বক্তৃতায়, বিতর্কে সেই বৈষয়িক সভ্যতার মহিমাই কীর্তন করা হইত। এডাম্ স্মিথ, জেম্স মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির রচনায় বাহ্যসম্পদের প্রশস্তিতেই শিক্ষিত বাঙালীরা তাহাদের জীবনের পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল। শিক্ষা উৎসাহকে বৈষয়িক স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়োজিত করিয়া হৃদয়ের সমস্ত শুভবোধকে বিসর্জন দিয়াছিল। অথচ তাহারা ভাবিয়া দেখে নাই যে, বাহ্যসম্পদ মানুষকে মনুষ্যত্ব আনিয়া দিতে পারে না। এই মোহচ্ছন্নতা লক্ষ্য করিয়াই বঙ্কিম পরের হিতবিধানে মনুষ্যের স্থায়ী সুখ অসুখের সেই প্রাচীন শিক্ষার বাণীটিকে আমাদের নূতনভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

৩। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র ব্যক্তিপুরুষটি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে'—মন্তব্যটি 'আমার মন' প্রবন্ধটি সম্পর্কে কতদূর প্রযোজ্য বিচার করিয়া দেখাও। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধটির নামকরণের সার্থকতাও বিচার কর।

উত্তর : সাধারণ বিষয়নিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভর প্রবন্ধে এবং উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মপ্রকাশের যথার্থ ক্ষেত্রটিকে খুঁজিয়া পান নাই। প্রবন্ধে তাঁহাকে বক্তব্য এবং যুক্তির শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে, উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনার পশ্চাতে আত্মগোপন করিতে হইয়াছে। একমাত্র কমলাকান্তের দপ্তরের কমলাকান্তের মত অসাধারণ চরিত্রে, তাহার উদ্ভট কল্পনায়, কৌতুক পরিহাসের তারল্যে, আবেগের গভীরতায়, মননশীলতার গাম্ভীর্যে বঙ্কিম নির্দ্বিধায় তাঁহার মানস অভিব্যক্তির পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই কমলাকান্তের দপ্তরের মধ্যে বঙ্কিমের কৌতুক, রহস্যপ্রিয়তা, জীবনরস রসিকতা, সমাজসচেতনতা, তীক্ষ্ণ মননশীলতা, আমাদের নৈতিক দুর্গতিতে তাঁহার সহজাত বেদনাবোধ—তাঁহার সমগ্র ব্যক্তিপুরুষটিই উহার সকল পরিচয়চিহ্ন লইয়া ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

'আমার মন' রচনাটি কমলাকান্তের দপ্তরের অন্যতম প্রধান অংশ। স্বভাবতঃই এখানেও আমরা বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের রূপটিকে আমাদের নিকট

উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখি। বঙ্কিমের সমস্ত আবেগ, চিন্তা ও প্রত্যয়ের মূল ভিত্তি ছিল মনুষ্যপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রেম। 'আমার মন'-এ বঙ্কিমের ব্যক্তিসত্তার সেই দুইটি মূল বৈশিষ্ট্য—মানবিকতা এবং স্বাদেশিকতা অনন্যসাধারণ ভঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কমলাকান্ত যখন আলোচ্য রচনাটির একস্থলে বলে 'আমি মরিয়া ছাই হইব, নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মানুষের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই', তখন আমরা তাহার উক্তিটিতে এই মানবিক প্রত্যয়ের আবেগে উদ্দীপিত বঙ্কিমের হৃদয়ের উত্তাপই অনুভব করি। ইংরেজ জাতির বাহ্য-সম্পদপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত বাঙালীদের ব্যক্তিগত ভোগ-সুখের মোহে ভারতবর্ষের সনাতন মানবপ্রীতির আদর্শসমূহকে উপেক্ষিত হইতে দেখিয়া কমলাকান্ত যে তীব্র খেদোক্তিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে, তাহাতে স্বদেশের কল্যাণ কামনাই সতত উৎকণ্ঠিত। স্বদেশবাসীর লক্ষ্যভ্রষ্টতায় ক্ষুব্ধ, সন্তপ্ত বঙ্কিমের হৃদয়ের জ্বালা ও বেদনাই অগ্নিবর্ণে উদ্ভাসিত হয়। 'টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থপ্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর, শূন্য হইতে টাকাবৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার ঝন্‌ঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক! মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি?'—এই ভাবে যে কঠিন, ক্ষুরধার ব্যঙ্গে কমলাকান্ত বাঙালীর অর্থপ্রীতিকে আঘাত করে, তাহাতে আমরা বঙ্কিমের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনি। 'আমার মন'-এর কৌতুক ব্যঙ্গে, মানবপ্রীতির গভীর আবেগে, মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা ও আমাদের মোহাচ্ছন্নতার উপলব্ধি ও বিচারের মননশীলতায় বঙ্কিমের সমগ্র ব্যক্তিপুরুষটিই আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

(নামকরণের সার্থকতার জন্য রচনা পরিচিতি এবং রসগ্রাহী সমালোচনার শেষ অংশ দেখ।)

৪। সুখের মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে কমলাকান্ত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে 'আমার মন' প্রবন্ধ অবলম্বনে তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও। (ক. বি. ১৯৬৫)

উত্তর: মানুষের মনের সত্যকারের আশ্রয়, অবলম্বন কি, ইহা একটি মৌলিক জীবনজিজ্ঞাসা। জীবনের সত্যানুসন্ধানী, পার্থিব মোহমুক্ত

কমলাকান্ত প্রথমে আপাত লঘু পরিহাসেই সেই প্রশ্নকে উপস্থাপিত করিয়াছে। কমলাকান্ত তাহার মনকে কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না। বন্ধুর পরামর্শ মত পাকশালায় গিয়া সে তাহার হারানো মনকে খুঁজিতে গেল। সে ভোজনপ্রিয় ঔদরিক। পোলাও, কাবাব, কোফতা, ইলিস-মাছের ঝোল, কোরমা, লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি লোভনীয় খাদ্যবস্তুগুলির প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট ছিল। কিন্তু আজ ব্যাকুল আত্মানুসন্ধানে সেখানে গিয়া কমলাকান্ত তাহার হারানো মনকে খুঁজিয়া পাইল না। প্রসন্ন গোয়ালিনী বিনামূল্যে ক্ষীর, মাখন, ননী দিয়া তাহার তৃপ্তি সাধন করে, কিন্তু তাহার নিকটও সেই পলাতক মনকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পথিমধ্যে এক সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া কমলাকান্তের মনে হইল, হয়ত তাহার সৌন্দর্যের নিকট তাহার মন ধরা দিতে পারে। কিন্তু এইবারও তাহাকে হতাশ হইতে হইল। কমলাকান্তের আত্মানুসন্ধান যে আত্মোপলব্ধিতে সার্থক হইবে, এই লঘু পরিহাস তাহারই প্রস্তাবনা। এই আপাত রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়া কমলাকান্ত বলিতে চাহিয়াছে, ইন্দ্রিয় নির্ভর সুখ কখনও মনের ধ্রুব আশ্রয় হইতে পারে না।

যশ, অর্থ প্রভৃতি হইতে যে ইন্দ্রিয়সুখ মানুষ লাভ করে তাহার প্রকৃত মূল্যও কমলাকান্ত তাহার প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে। ঐশ্বর্য খ্যাতি হইতে লব্ধ সুখ স্থায়ী নয়। এই জাতীয় সুখের ক্রমাগত অভ্যাসে সুখানুভূতি লোপ পায়, অন্যদিকে ইহারা দুই ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, অভ্যস্ত বস্তুতে সুখ না হোক, অভাবে গুরুতর অস্বস্তি এবং তৃপ্তিবিহীন কামনার বৃদ্ধিতে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পৃথিবীর প্রতিটি কাম্যবস্তুই অতৃপ্তিকর ও দুঃখের মূল। যশের সঙ্গে নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের সহিত রোগভোগ, ঐশ্বর্যের সঙ্গে ক্ষতি ও তজ্জনিত মনস্তাপ জড়িত থাকিবেই। বিদ্যাও মানবহৃদয়কে চিরকালের জন্য শান্ত, স্নিগ্ধ, আশ্বস্ত করিতে পারে না। মানুষ তাহার জীবনের চতুর্দিকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের যত উপকরণই জড়ো করুক না কেন, রাবণের চিতাগ্নির মত বাসনা কামনার অনির্বাণ অগ্নিদহনে তাহাকে দগ্ধ হইতেই হইবে।

এই ভাবে সুখের মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে কমলাকান্ত অবশেষে উপলব্ধি করিয়াছে, পরোপকার ব্যতীত মানবজীবনের স্থায়ী সুখের অন্ত

কোনও মূল নাই। ইংরেজ এদেশে আসিয়া ভোগসুখের বাহ্যসম্পদের বিপুল আয়োজন করিয়াছে, আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হন। কিন্তু সেই বৈষয়িক সম্পদ, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত অর্থকরী রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ মনের প্রকৃত চিরস্থায়ী সুখশান্তি আনিয়া দিতে—মানবজীবনকে শুচি, পবিত্র করিয়া তুলিতে পারে নাই। অপরের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্জনের ব্রত উদ্‌যাপনেই মানবজীবনের চিরস্থায়ী সুখ, তাহাই মানবমনের প্রকৃত আশ্রয়। কমলাকান্তের ইন্দ্রিয়সুখভোগ ও তাহার মোহান্ধতার অন্তঃসারশূন্যতা এবং নিষ্ফলতা উন্মোচনের পটভূমিতেই মানবজীবনের স্থায়ী সুখের এই সত্যটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

৫। কমলাকান্ত মানুষের স্থায়ী সুখের কি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন 'আমার মন' প্রবন্ধ অনুসারে তাহা বিবৃত কর।

(ক. বি. ১৯৬২)

উত্তর : ৪র্থ প্রশ্নের উত্তর দেখ।

৬। আমি মরিয়া ছাই হইব, নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্যমাত্র আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই'—কমলাকান্ত ঠাকুর মানুষের স্থায়ী সুখের কি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, 'আমার মন' প্রবন্ধ অনুসারে তাহা বিবৃত কর।

(ক. বি. ডিগ্রী কোর্স ১৯৬২)

উত্তর : ৪র্থ প্রশ্নের উত্তর দেখ।

দুর্বাসার শাপ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লেখক পরিচিতি :

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের নিবাস নৈহাটি, পিতা রামকমল ন্যায়রত্নের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি

ছিল। বাংলা রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্বের আলোচনায় তিনি যে তথ্যনিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং অনির্বাণ জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা দুর্লভ। বাংলাভাষার আদি নিদর্শন "হাজার বছরের পুরাণ বাংলাভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা" আবিষ্কার তাঁহার অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি। ভারতমহিলা, বাল্মীকির জয়, কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

সার-সংক্ষেপ ঃ

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকটি দুর্বাসার শাপেই উজ্জ্বল হইয়াছে। মহাভারতে দুষ্মন্ত যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তিনি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া কেবলমাত্র লোকলজ্জার ভয়ে শকুন্তলাকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, দৈববাণীতে তাঁহাদের বিবাহের কথা যখন উচ্চারিত হইল, তখনই তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কালিদাসের নাটকে দেখা যায়, দুর্বাসার শাপে দুষ্মন্ত সমস্ত বিস্মৃত; শকুন্তলাকে পরস্ত্রীজ্ঞানে, ধর্মবুদ্ধিতেই তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে অপারগ। যে ইন্দ্রঘাটে শচীকুণ্ডের জল স্পর্শের সময় শকুন্তলা তাহাদের বিবাহের অভিজ্ঞান আংটিটি হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সেখানকার জেলের নিকট হইতে তাহা লাভ করিবার পরই দুষ্মন্তের মনে সমস্ত স্মৃতি জাগ্রত হয়, অনুতাপের যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। রাজা বিদূষককে শকুন্তলা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাই সেও কোন সাক্ষ্য দিতে পারে নাই। দুষ্মন্ত মিথ্যা কথা বলার জন্য শাস্তি পাইলেন। অবশেষে তিনি শকুন্তলাকে মারীচের আশ্রমে দেখিতে পাইয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। রাজার যখন ধারণা ছিল, তিনি শকুন্তলাকে বিবাহ করেন নাই এবং তিনি সে বিবাহের ঘটনাকে স্মরণ করিতে পারেন নাই, তখন বীরের মতই সে ধারণা অনুযায়ী শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আবার যখন সমস্ত মনে পড়িল, তখন শকুন্তলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বীরের মতই স্ত্রীপুত্রকে গ্রহণ করিলেন। দুর্বাসার শাপে শকুন্তলাও পরিবর্তিত হইয়াছে। শকুন্তলা অপরিণত, অনাভিজ্ঞ ছিল। দুর্বাসার শাপের মধ্য দিয়াই সে বুঝিল যে সংসার কঠিন কর্তব্য পালনের ক্ষেত্র, এখানে প্রত্যেকটি বিচ্যুতির

কঠোর মূল্য দিতে হয়। বস্তুতঃ কর্তব্যপালনে অবহেলার শাস্তিই হইল ব্রহ্মশাপ।

রচনা-পরিচিতি এবং রসগ্রাহ্য সমালোচনা ঃ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রধানতঃ বাংলা ও সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ আছে, যেমন, মেঘদূত, রঘুবংশ, কালিদাসের বসন্ত-বর্ণনা, রঘুবংশের গাঁথুনি, শকুন্তলার মা ইত্যাদি। দুর্বাসার শাপ প্রবন্ধটি ইহাদের অন্যতম। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা এবং অনুশীলনের ফলে যে পাণ্ডিত্যকণ্টকিত প্রকাশভঙ্গি, গুরুগম্ভীর আলংকারিক ভাষার প্রতি পক্ষপাত, কঠিন বিষয়ের কঠিনতর পরিবেশন পদ্ধতি দেখা দেয়, তাহা তাঁহার রচনায় প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধচিত্তেই শাস্ত্রী মহাশয়ের অনাবিলবুদ্ধির উজ্জ্বলতা, পাণ্ডিত্যের সহিত পারদর্শিতা যুক্ত হওয়ার ফলে অনায়াসেই যে কোনও বিষয়ের জটিল গ্রন্থিগুলি মোচনের ক্ষমতা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দুর্বাসার শাপরূপ দুঃখের কঠিন পরীক্ষায় দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্রেও ঐশ্বর্যের উদ্ভাসই দুর্বাসার শাপ প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ; কিন্তু শুষ্ক পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে তিনি ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন নাই। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে এই প্রবন্ধটিও কথ্যভাষাসুলভ সহজ, সরল ভঙ্গি ও স্মিত কৌতুকহাস্যের স্নিগ্ধ জ্যোতি আমাদের হৃদয়কে তৃপ্ত করে। বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইতে জাত হইলেও তাহার যে নিজস্ব একটা প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সজাগ ছিলেন, তাঁহার সেই সচেতনতা দুর্বাসার শাপেরকথ্যভাষানুসারীসাধুভাষায়ই লক্ষণীয়। সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, 'মনে হয় যেন বঙ্কিম যুগের একটা দক্ষিণী হাওয়া, একটা প্রাণোচ্ছলতার তরঙ্গ শতাব্দীর এক পাদ অতিক্রম করিয়া, বিংশ শতকের গম্ভীরতর পরিবেশে লালিত ও যুগোচিত পাণ্ডিত্য-প্রধান গবেষণাকার্যে নিয়োজিত হরপ্রসাদকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার মধ্যে অতীত স্মৃতির সার্থক উদ্বোধন ঘটাইয়াছিল।'

শব্দার্থ ও টীকা

অনু ১-৫ ঃ মহাভারতের রাজা দুষ্মন্ত—মহাভারতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনী কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' হইতে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র।

মহাভারতে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহেন, এবং তাহার দাবি অনুযায়ী তাহার পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কণ্বের আশ্রমেই শকুন্তলার পুত্র হয়। অতঃপর পুত্রকে লইয়া শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিকট গমন করিলে পূর্বকথা স্মরণ হইলেও লোকনিন্দার ভয়ে তিনি সমস্ত কিছু অস্বীকার করিলেন। অবশেষে শকুন্তলার সমর্থনে অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী শুনিলে দুষ্মন্ত তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। মহাভারতের দুষ্মন্তের চরিত্র-চিত্রণে ভীরুতাই লক্ষ্য করা যায়, তাই শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না। আর কালিদাস তাঁহার নাটকে দেখাইয়াছেন যে, গুরুজনদের অজ্ঞাতসারে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গন্ধর্বমতে বিবাহ করিয়া তাঁহার রাজধানীতে চলিয়া যান এবং দীর্ঘকাল কোনও সংবাদ দেন না। এই অবস্থায় শকুন্তলা একদিন যখন তাহার স্বামীচিন্তায় বিভোর ছিল তখন, দুর্বাসা আতিথ্য কামনায় সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া বলেন, এই যে আমি। কিন্তু পতিচিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত শকুন্তলা সেই আহ্বান শুনিতে পাইল না। কোপনস্বভাব দুর্বাসা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, 'তবে শোন্ অতিথির অবমাননাকারিণি! আমি দুর্বাসা, সারা জীবন তপস্যা ছাড়া যাহার অন্য কাজ নাই, সেই আমি তোর দরজায় দাঁড়াইয়া, আর তোর খেয়াল নাই। যাহার ভাবনায় আত্মহারা হইয়া আজ তুই আমাকে চিনিতে পারিলি না, ঠিক জানিস্ হাজার মনে করাইয়া দিলেও, মাতাল যেমন তাহার প্রথম প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ তোর কথাও ঐ ব্যক্তি কিছুতেই মনে করিতে পারিবে না।' শকুন্তলার সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ঐ অভিশাপ শুনিতে পাইয়া উৎকণ্ঠিত হয়। প্রিয়ংবদা তাঁহার নিকট গিয়া শকুন্তলাকে ক্ষমা করিবার জন্য স্তুতিমিনতি করিলে তিনি বলেন, কোনরূপ অভিজ্ঞান (স্মারক, পরিচায়ক বস্তু) দেখাইতে পারিলে এই অভিশাপের মোচন হইবে। আত্মভাবনামগ্ন শকুন্তলা এই সকল ঘটনার কিছুই জানিতে পারিল না। শকুন্তলাকে লইয়া গৌতমী এবং মহর্ষি কণ্বের শিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত দুষ্মন্তের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে বলিলে রাজা দুর্বাসার শাপজনিত বিস্মৃতিতে পূর্বসম্বন্ধ অস্বীকার করিলেন। দুষ্মন্ত নিজের নামাংকিত একটি অঙ্গুরী

শকুন্তলাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় অঙ্গুরীটি তাহার আঙুল হইতে পড়িয়া যাওয়ায় দেখাইতে পারিল না। শকুন্তলার মাতা মেনকা তাহাকে মারীচের আশ্রমে রাখিয়া আসে। এক ধীবর রোহিত মৎস্যের উদরে সেই অঙ্গুরীটি পায়, রাজা ঘটনা ক্রমে তাহা পাইলে শাপের অবসানে সমস্ত কথা স্মরণ করিতে পারেন এবং অনুতপ্ত হন। অবশেষে মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা পুনর্মিলিত হন।

দুর্বাসা—মহর্ষি অত্রি এবং অনসূয়ার পুত্র, তপস্যা প্রভাবে অপরিসীম তেজের অধিকারী; অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন বলিয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে অনেকে দগ্ধ হন। তাঁহার নিজের স্ত্রীও তাঁহার শাপে ভস্মীভূত হন। দুর্বাসার শাপেই শাম্ব যদুবংশনাশক মুষল প্রসব করেন, তাহার ফলেই যদুবংশ ধ্বংস হয়।

গান্ধর্ব-বিধান—পাত্রপাত্রীর ইচ্ছানুক্রমে বিবাহ পদ্ধতি।

প্রতিহারী—দ্বারপালিকা। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পঞ্চম অঙ্কে প্রতিহারীর এই উক্তি আছে: 'অহো ধর্ম্মাবক্খিতা ভত্তুণো। এরিসং নাম সুহোবণঅংরূবং দেক্খিঅ কো অণ্ণো বিচারেই'—('অহো আমাদের প্রভুর কি ধর্মভয়! বিনা আয়াসে আসিয়া উপস্থিত, এমন রূপ দেখিয়া আর কেহ হইলে কি আর বিচার বিতর্ক করে!'

ধর্মের কাচ—ধর্মের ছল; কাচ প্রাচীন বাংলা শব্দ। **সানুমতি**—স্বর্গের অপ্সরা এবং মেনকার সহচরী, মেনকার অনুরোধে অদৃশ্য থাকিয়া শকুন্তলার সম্বন্ধে দুষ্মন্তের অবস্থা দেখিবার জন্য দুষ্মন্তের রাজভবনে উপস্থিত ছিল। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে দুষ্মন্তের রাজপ্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সানুমতি এই স্বগতোক্তি করিয়াছে: 'এই রাজর্ষি দুষ্মন্তের ব্যাপারটা একবার নিজের চোখে দেখিয়া লই। মেনকার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, তাহাতে শকুন্তলা আমার দেহের এক অংশ বলিলেও হয়। আর মেনকাও তাহার মেয়ে শকুন্তলার বিষয়ে খোঁজ-খবর লইতে আমাকে বলিয়াছে, সুতরাং একবার দেখাই যাক্ না।'

প্রেক্ষককুল—দর্শকবৃন্দ।

সদাগরের মরার খবর—শকুন্তলার অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শনে সমস্ত স্মৃতি মনে পড়ায় দুষ্মন্ত যখন অত্যন্ত বেদনার্ত ছিলেন, তখন মন্ত্রী-প্রেরিত একটি পত্রে

তিনি জানিতে পারেন, বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রী ধনমিত্র নামক বণিক নৌকাডুবিতে প্রাণ হারাইয়াছে। মন্ত্রী লিখিয়াছেন, তাহার ধনদৌলত রাজার প্রাপ্য, কেন না সে নিঃসন্তান ছিল। শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার সময় সন্তানসম্ভবা ছিল, সেই জন্যই এই সংবাদে রাজার মনস্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। **মাতলি**—দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি। **অগ্নিশরণ**—যে গৃহে যজ্ঞাগ্নি রক্ষিত হয়।

অনু ৬-১০ঃ রক্ষামঙ্গল—মারীচ মুনি শকুন্তলার পুত্রের হস্তে যে রাখীর লতা পরাইয়া দেন, তাহার নামই রক্ষামঙ্গল ; পিতামাতা ছাড়া অন্য কেহ ভূমিতে পতিত এই লতাকে স্পর্শ করিলে উহা সাপ হইয়া ছোবল দিত।

রোহিণী—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং চন্দ্রের পত্নী।

বল্লাল সেন—বাংলার সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের পুত্র। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক বল্লাল সেন আনুমানিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী এই রাজার একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বলিয়া জনশ্রুতিমূলক কাহিনী প্রচলিত আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, তাঁহার মৃত্যুর মূলে ছিল ব্রহ্মশাপ। এমন যে রামচন্দ্র, তিনিও আত্মবিস্মৃত হইলেন ব্রহ্মশাপে। কথিত আছে, বিষ্ণুর নৃসিংহাবতারের সময় তাঁহার গর্জনে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয় বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভিশাপ দেন, তিনি তাঁহার অবতারত্ব বিস্মৃত হইবেন। বিষ্ণু যখন রামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁহার অবতারত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; সেইজন্যই তাঁহার পক্ষে বালীবধের মত অন্যায়কার্য করা সম্ভব হইয়াছিল।

বাহমনা মুসলমানী রাজবংশ—হাসান গঙ্গু বহমনি নামে একজন সেনাপতি দক্ষিণ ভারতে ১৪৩৭ সালে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। হাসান হইতেই বাহমনী রাজবংশের উদ্ভব। হাসানের পর ১৫২৬ পর্যন্ত চৌদ্দজন সুলতান রাজত্ব করেন ; তাঁহাদের মধ্যে ছয়জন সিংহাসনচ্যুত হন, চারিজনকে হত্যা করা হয়, আর দুইজনকে অন্ধ করিয়া আজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল ; অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে এবং ষড়যন্ত্রে এই বংশ ধ্বংস হয়। ইহার মূলেও শাস্ত্রী মহাশয় ব্রহ্মশাপ নির্দেশ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা

১। কঠোর শাপ তাঁহাকে কঠোর…হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন।
(অনু ৯)

উদ্ধৃত অংশটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত 'দুর্বাসার শাপ' নামক প্রবন্ধটি হইতে চয়িত হইয়াছে। দুর্বাসার শাপে শকুন্তলার চরিত্র যেভাবে বিকশিত হইয়াছিল, আলোচ্য অংশে লেখক তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

পতিচিন্তায় বিভোর শকুন্তলা অতিথি সেবার কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছিল বলিয়াই দুষ্মন্তও একদিন তাহাকে চিনিতে পারিবে না, দুর্বাসা তাহাকে এই কঠোর শাপ দিয়াছিলেন। এই শাপ মর্মান্তিক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার ফলেই সংসারের দুঃখের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া শকুন্তলা পরিণত হইতে পারিয়াছিল। ইহার পূর্বে শকুন্তলা মহর্ষি কণ্ব ও গৌতমীর স্নেহে এবং সখীদের প্রীতিতে অভিষিক্ত হইয়া অনভিজ্ঞ, অপরিণত বালিকামাত্র ছিল; সংসারের জটিলতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। দুর্বাসার শাপের বলেই সে সংসারের কঠোর দুঃখ জানিতে পারিল, বুঝিতে পারিল যে এখানে কেবল নিজের আবেগটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকা চলে না, প্রতি পদে নিজের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়। দুষ্মন্ত প্রদত্ত তাহাদের বিবাহের একমাত্র অভিজ্ঞান আংটিটি পর্যন্ত যত্ন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার মত শিক্ষা শকুন্তলার ছিল না, তাই দুর্বাশার শাপের মধ্য দিয়া সেই অবহেলার জন্য তাহাকে কষ্ট পাইতে হইল এবং সংসারের প্রকৃত রূপ চিনিতে হইল।

২। যে যে-কোন ঝোঁকে পড়িয়া……লোকে শাপ বলিত।
(অনু ১০)

আলোচ্য অংশে প্রবন্ধকার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দুর্বাসার শাপের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন।

এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য দায়িত্ব আছে, তাহাই তাহাদের ধর্ম। যেমন আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার পক্ষে অতিথি সেবাই ছিল তাহার আচরণীয়, পবিত্র ধর্ম। মানুষ যখনই কোনও না কোনও প্রবণতায় তাহার ধর্মাচরণে বিমুখ হয়, তখন তাহাকে শাস্তি

পাইতেই হয়, ইহাই জগতের নিয়ম। শকুন্তলাও স্বামী-চিন্তায় বিভোর হইয়া আতিথ্য কামনায় সমাগত দুর্বাসার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, অতিথি-সেবায় অবহেলা করিয়াছিল। এই অপরাধের জন্যই দুষ্মন্ত তাহাকে চিনিতে পারিবে না, দুর্বাসা এই কঠোর শাপ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মশাপ ব্রাহ্মণ ঋষিদের আকস্মিক ক্রোধের বিস্ফোরণ মাত্র ছিল না, উহা ছিল কর্তব্যবিচ্যুতির পাপের দণ্ড, অতীতে তাহাই ব্রহ্মশাপ নামে অভিহিত হইত।

৩। ব্রহ্মশাপ কাজে অবহেলা করার শাস্তি। (অনু ১০)
(ক. বি. ১৯৬৩)

ীয় ব্যাখ্যা দেখ।

প্রশ্নোত্তর

১। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটক দুর্বাসার শাপেই উজ্জ্বল। দুর্বাসার অভিশাপের দ্বারা কিভাবে নাটকের উজ্জ্বলতা সাধিত হইয়াছে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও। (ক. বি. ১৯৬৫)

উত্তর ঃ মহাভারতে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার সংঘাত এবং পুনর্মিলনের কাহিনীটি যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্রের সৌন্দর্য তত উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। মহাভারতে দেখা যায়, শকুন্তলা যখন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দুষ্মন্তের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের পরিচয় দেয়, তখন সমস্ত ঘটনা স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র লোক-নিন্দার ভয়েই তিনি তাহাদের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক অস্বীকার করেন; তাঁহার তীব্র কটূক্তিতে শকুন্তলাকে জর্জরিত হইতে হয়। অবশেষে অন্তরীক্ষ হইতে যখন এই দৈববাণী ঘোষিত হইল যে, দুষ্মন্ত সত্যই শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছেন, শকুন্তলার উক্তি সত্য, তখনই তিনি জনমত সম্পর্কে নির্ভয় হইয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কালিদাস দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার মাঝখানে দুর্বাসার শাপকে সংস্থাপিত করিয়া একদিকে দুষ্মন্তের চরিত্র যেমন, অন্যদিকে শকুন্তলার চরিত্রকেও তেমনি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। কালিদাস দুর্বাসার শাপের নিকষেই দুষ্মন্তের চরিত্রশক্তির মহত্ত্বকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়াছেন। মহাভারতের দুষ্মন্তের মত ভীরুতায় নয়, দুর্বাসার শাপজনিত বিস্মরণে তিনি শকুন্তলাকে

গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দ্বারপালিকা, পুরোহিত প্রভৃতি নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মত দর্শকবৃন্দও দেখিতে পাইলেন যে, শকুন্তলার অপরিসীম রূপ-লাবণ্য সত্ত্বেও পরস্ত্রীজ্ঞানে, অটল ধর্মজ্ঞানেই দুষ্মন্ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, দুর্বাসার শাপে সমস্ত স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সুতরাং শকুন্তলাকে বিদায় দেওয়া ছাড়া রাজার আর কোনও উপায় ছিল না। আবার শকুন্তলার অঙ্গুরীয় দর্শনে শাপমোচনের ফলে যখন সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল তখন অনুতাপের যন্ত্রণায়, আত্মদহনে দুষ্মন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন; তাঁহার এই অস্থিরতায় এবং বিদূষকের নিকট সমস্ত ঘটনার অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিতে তাঁহার ধর্মবোধ, সততা, আবেগের অকপটতা ও গভীরতা দীপ্ত হইয়া উঠে। মারীচের আশ্রমে কৃচ্ছ্রতায় শুষ্ক তাপসীর ন্যায় কঠোর নিয়মব্রতধারিণী শকুন্তলাকে দেখিয়াই দুষ্মন্ত চিনিতে পারিয়াছিলেন। অনুতাপখিন্ন দুষ্মন্ত উন্মুক্ত হৃদয়ে শকুন্তলার নিকট সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই ভাবে দুর্বাসার শাপের মধ্য দিয়াই দুষ্মন্তের বীরচরিত্রসুলভ মহত্ত্ব ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

দুর্বাসার শাপের ফলেই শকুন্তলা চরিত্রটিও তাহার পরিণত সৌন্দর্য লইয়া আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছে। শকুন্তলা প্রথমে ছিল কোমলপ্রাণা, অনভিজ্ঞ বালিকা মাত্র, তাহাকে আমরা সকল সময়েই সখীদের সঙ্গেই দেখিয়াছি; সে যে সকলের স্নেহের, উৎকণ্ঠার পাত্রী, সংসারের অভিজ্ঞতা যে তাহাকে স্পর্শ করে নাই তাহা বুঝিয়াছি। এই অধ্যায়ে শকুন্তলার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ফুটে নাই। দুর্বাসার শাপই দুঃখের কঠোরতায় তাহার চরিত্রকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সংসার যে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র, প্রতিটি মুহূর্তেই যে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়, দুর্বাসার শাপের মধ্যে সংসার সম্বন্ধে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াই শকুন্তলা পরিণত হইয়া উঠে। মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার ব্যবহারে তাহার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ও সৌন্দর্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং দুর্বাসার শাপই হইল কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের এমন এক কেন্দ্রীয় শক্তি, আলোকবর্তিকা, যাহার মাধ্যমে ইহার নায়ক-নায়িকার চরিত্রের সমস্ত ঐশ্বর্য আমাদের নিকট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাসের নাটক দুর্বাসার শাপেই উজ্জ্বল, এই উক্তি যথার্থ—সন্দেহ নাই।

। 'ব্রহ্মশাপ কাজে অবহেলা করার শাস্তি'—লেখক যে প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করিয়াছেন তাহার পটভূমিকায় ইহার যৌক্তিকতা নির্ণয় কর।

উত্তর ঃ দুর্বাসার অভিশাপের কষ্টিপাথরে কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র যেভাবে বিকশিত হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ প্রসংগেই লেখক আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন।

অতীতকালে মানবজীবনে ব্রহ্মশাপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। অতীতের পুরাণ-আখ্যায়িকা-কাব্য সর্বত্রই ব্রহ্মশাপের একটি ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বল্লাল সেন বা তাঁহার মত বহু নৃপতির ধ্বংসের কারণরূপে ব্রহ্মশাপ উল্লিখিত হয়। স্বয়ং রামচন্দ্র ব্রহ্মশাপেই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিরাট বাহমনী রাজবংশের ধ্বংসের কারণও ব্রহ্মশাপ। এই ব্রহ্মশাপ আসলে পাপের দণ্ড। যে মানুষ কোনও না কোনও প্রবৃত্তির ঝোঁকে আপনার ধর্ম পালন করিতে পারে না তাহাকে তাহার শাস্তি পাইতেই হয়। এই শাস্তিকেই ব্রহ্মশাপ বলিয়া অতীতের লোকেরা বিশ্বাস করিত।

কালিদাস অতীতের লোক বলিয়া সেই বিশ্বাসের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারেই তাঁহার অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে ব্রহ্মশাপকে সার্থকভাবে প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কালিদাসের নাটকের উপক্রমণিকায়, শকুন্তলাকে কোমলপ্রাণা, অনভিজ্ঞা, সকলের স্নেহে-আদরে লালিতা বালিকা রূপেই দেখি। সংসারের কোনও অভিজ্ঞতাই তাহার ছিল না। এই সংসার যে কঠোর, ইহা যে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের কঠিন ক্ষেত্র, তাহা শকুন্তলা জানিত না। দুষ্মন্ত তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে তাহাকে তাঁহার নামাংকিত একটি অঙ্গুরী দিয়া গিয়াছিলেন, ইহাই ছিল তাহাদের সম্পর্কের অভিজ্ঞান। এই অঙ্গুরীকে যে যত্ন করিয়া রাখিতে হয়, সে দায়িত্ববোধ তাহার ছিল না; তাই দুর্বাসার শাপের মাধ্যমে বিচ্ছেদের কঠোর শাস্তি তাহাকে পাইতে হইল। অতিথি সেবা একটি অবশ্য পালনীয় ধর্ম, নিজের আবেগ-মত্ততায় জীবনাচরণের সেই ধর্ম শকুন্তলা বিস্মৃত হইয়াছিল বলিয়াই কর্তব্য-পালনে অবহেলার দণ্ড হিসাবে তাহার উপর দুর্বাসার শাপ বর্ষিত হইয়াছিল। দুর্বাসার শাপজনিত দুঃখ আঘাত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়াই শকুন্তলা জীবনকে চিনিয়াছে, নারীত্বের পূর্ণতায় বিকশিত হইতে পারিয়াছে। রাজা দুষ্মন্তকেও

তাঁহার পাপের দণ্ড পাইতে হইয়াছে। তিনি বিদূষকের নিকট শকুন্তলা সম্পর্কে মিথ্যাভাষণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য দুর্বাসার শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। শকুন্তলাকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া পরে অঙ্গুরীয় প্রাপ্তিতে সকল স্মৃতির জাগরণে অনুশোচনার মর্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন বিশ্বাসের ঐতিহ্যাশ্রিত অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে ব্রহ্ম-শাপের প্রয়োগের ব্যাখ্যায়, শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে যে কাজে অবহেলার শাস্তি রূপে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

৩। 'তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির আলোকে 'দুর্বাসার শাপ' প্রবন্ধটির রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

উত্তর ঃ বাংলা ভাষাকে শিল্পমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান বিদ্যাসাগর; ইহা তাঁহার অন্যতম প্রধান স্মরণীয় কীর্তি। বাংলা সাধুভাষার অন্তর্নিহিত ছন্দের সৌন্দর্য তিনিই প্রথম প্রদর্শন করেন। তাঁহার ভাষাচর্চার দৃষ্টান্তে অন্যান্য লেখকেরা উপকৃত হন। অবশ্য বিদ্যাসাগর তাঁহার রচনায় সাধুভাষা ভিন্ন চলিতভাষার লঘু ও চটুল গতি অনুসরণ করেন নাই। বিদ্যাসাগরের সমকালীন প্যারিচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা ভাষার বিকাশে মৌখিক ভাষার শক্তি যে কিরূপ সুফলপ্রসূ হইতে পারে, তাঁহাদের রচনায় সেই সম্ভাবনাকে তুলিয়া ধরেন। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সাধুভাষা ও চলিতভাষার সমন্বয়ের শক্তি ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতিকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের রচনা কোথাও কোথাও মৌখিক ভাষানুযায়ী হইলেও তাঁহার সাহিত্যশৈলী যে সংস্কৃতবহুল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পরিণত জীবনে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ-চর্চায় সম্পূর্ণরূপে মৌলিক, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রাণবন্ত এক রচনাশৈলী উদ্ভাবন করেন। বিষয়বস্তু যতই দুরূহ হোক না কেন, প্রকাশভঙ্গি এমনই স্বচ্ছ, সহজ, সর্বজনবোধ্য হওয়া দরকার যাহাতে বক্তব্যবিষয় অনায়াসে যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকটই গ্রহণীয় হইয়া উঠিতে পারে, ইহাই তাঁহার আদর্শ ছিল। তাই তিনি তাঁহার সাধুভাষায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চলতি ভাষার ছন্দটিকেই অনুসরণ

করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় খাঁটি দেশজভাষা যে স্বচ্ছতা ও সরসতায় প্রাণময় হইয়া উঠে, তাহার তুলনা অন্য কোথাও মেলে না।

'দুর্বাসার শাপ' প্রবন্ধটির রচনারীতি বিশ্লেষণ করিলেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই রচনামাহাত্ম্য আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে দুর্বাসার শাপে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র যে ভাবে ঐশ্বর্যদীপ্ত হইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয়বস্তু। বক্তব্যের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় আলংকারিক গদ্যের আড়ম্বরে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়কে উপস্থাপিত করেন নাই; সহৃদয় বন্ধুর মত, কথকতার আলাপচারিতার সহজ-সরল সুরে সমস্ত বাহুল্য বর্জন-পূর্বক একটির পর একটি ঘটনা বিবৃত করিয়া এক আশ্চর্য প্রাঞ্জলতায় তাঁহার বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। দুর্বাসার শাপের প্রতিটি বাক্যই সংহত, পরিমিত, আলাপচারী ভাষার স্বতোৎসারিত ছন্দোমাধুর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'দেখিবামাত্র বলিলেন, এই সেই শকুন্তলা। যদিও তখন কঠোর নিয়ম করিয়া শকুন্তলার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, একটি চুলের বিনুনী পিছন দিকে ঝুলিতেছে; আর একখানি আধময়লা বাকল পরিয়া আছেন; তথাপি রাজা দেখিবা মাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন'—এই অংশটির গদ্যে খাঁটি বাংলাভাষার প্রাণই অনুভব করা যায়; ইহার স্বচ্ছতায় এবং প্রসাদ-গুণেই দুঃখের তপস্যারত শকুন্তলার শুচিসৌন্দর্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'পায়ে পড়িয়া শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন, বিবাহ স্বীকার করিলেন। ছেলে ও স্ত্রী গ্রহণ করিলেন। দুর্বাসার শাপে রাজার চরিত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে।' কিংবা, এই অংশটিতে—'কঠোর শাপ তাঁহাকে কঠোর দুঃখ জানাইয়া দিল। সংসার যে বড় নিদারুণ, সংসারে যে পান থেকে চুন খসিবার যো নাই, তাই তিনি হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন'—আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের অতুলনীয় গদ্য-রীতির স্বচ্ছতা ও সরলতার সৌন্দর্য লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হই। বাক্যের সুমিত গঠনে ও তাহার কথ্যভাষাসুলভ সহজ প্রাণবন্ত ছন্দে নিরলঙ্কৃত ভাষার সরলতার লাবণ্যে, তৎসম, তদ্ভব ও খাঁটি দেশী শব্দের নিপুণ মিশ্রণে দুর্বাসার শাপের সাধু ভাষায়ই খাঁটি বাংলার যে স্বচ্ছ ও সরল রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহার তুলনা সত্যই অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের মৌখিক ভাষানুযায়ী স্বচ্ছ ও সরল শ্রীমণ্ডিত সাধুভাষার তুলনায় আলালী

ভাষাকে গ্রাম্য এবং আধুনিক কালের বীরবলী চলিত ভাষাকে কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়।

৪। 'দুর্বাসার শাপে রাজার চরিত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে'— দুর্বাসার শাপে দুষ্মন্তের চরিত্র যে কিভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর ঃ শেষ অনুচ্ছেদ বাদ দিয়া প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেখ।

শকুন্তলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার-সংক্ষেপ ঃ

সেক্সপীয়রের টেম্পেস্ট নাটকের নির্জনলালিত মিরান্দা ও যুবরাজ ফার্দিনান্দের প্রেমের সহিত কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয়ের মত রচনা দুইটির ঘটনাস্থলের সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায় ঃ প্রথমটিতে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, অপরটিতে তপোবন। কিন্তু এই সাদৃশ্য বাহ্যিক, আখ্যানমূলক মাত্র; আন্তরিক অনৈক্যে দুইটি রচনার কাব্যরসের স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইয়োরোপের মহাকবি গ্যেটে এক শ্লোকে অভিজ্ঞান-শকুন্তলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত্য ও স্বর্গ কেহ একত্র দেখিতে চাহিলে তাহা শকুন্তলায় পাইবে। কালিদাস অত্যন্ত সহজেই স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলন রচনা করিয়াছেন। শকুন্তলা একদিকে যেমন তাহার প্রকৃতিসুলভ সরলতায় যৌবনের লীলাচাঞ্চল্যে, বাসনার নিকট আত্মসমর্পণে তরুলতা ফল-পুষ্পের মতই অকুণ্ঠিত, নিজের সংশয়মুক্ত স্বভাবধর্মে অনুগত, অন্যদিকে সে তেমনি নিয়মচারিণী, কল্যাণধর্মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত। কালিদাস যেভাবে লীলা ও ধৈর্য, স্বভাব ও নিয়ম, সৌন্দর্য ও সংযম, মর্ত্য ও স্বর্গের বিচিত্র বৈপরীত্যের পটভূমিকায় শকুন্তলাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা টেম্পেস্টে দেখা যায় না। তাহার কারণ, শকুন্তলার সারল্য তাহার স্বভাব

হইতে উৎসারিত, মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত, একমাত্র পিতার সাহচর্যে, দ্বীপের নির্জনতায় লালিত মিরান্দা শকুন্তলার মত সখীদের সহিত হাস্য-পরিহাস ভাববিনিময়ের সম্পর্কে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। সংসারের অভিজ্ঞতার সূত্রে মিরান্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই। আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখি, আর কালিদাস শকুন্তলাকে প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন।

টেম্পেস্টে দেখা যায়, দ্বীপপ্রকৃতির সহিত মিরান্দার অন্তরের কোনও সম্পর্ক নাই, এখানে বহিঃপ্রকৃতিএরিয়েলের মানবিকআকার ধারণ করিলেও মানুষ হইতে সে দূরেই রহিয়াছে, মানবিক শক্তিদ্বারা সে পীড়িত, আবদ্ধ। এখানে মানুষ বিশ্বের সহিত কল্যাণের সম্বন্ধে নিজের হৃদয়কে বিস্তৃত করে নাই, বিশ্বকে শাসিত করিয়া নিজে প্রভু হইতে চাহিয়াছে। কিন্তু শকুন্তলার গাছপালা, পশুপক্ষী, সমস্ত প্রকৃতিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়তায় মিলিত হইয়াছে। শকুন্তলা যেমন তপোবনের সমস্ত কিছুকে তাহার প্রীতির স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত করিয়াছে, তপোবনও তেমনি মূক থাকিয়াও সেই সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায় বাঁধা পড়িয়া প্রাণবন্ত চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

বস্তুত: আধিপত্য লইয়া দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের উপজীব্য। মানুষের প্রবৃত্তি এইরূপ সংঘাতের ঝড় তুলিয়া থাকে, কেবল শাসন পীড়নে তাহাকে অবদমিত করিয়া রাখিলে জীবনের সত্যপরিণতির কল্যাণ ও শ্রীকে পাওয়া যায় না। মঙ্গল মাধুর্যে পাপের অবসানই মানুষের নিগূঢ় আত্মার লক্ষ্য, সাহিত্যে সেই লক্ষ্যসাধনের প্রয়াসই অভিব্যক্ত হয়। কালিদাস অনুতাপযন্ত্রণার দহনে প্রবৃত্তির নির্বাণসাধন করিয়াছেন। নির্মম সংঘাতের তীব্র আলোড়নের পরিবর্তে দুর্বাসার শাপের ইঙ্গিতে পাপ হইতে পুণ্যে উত্তরণকে উপস্থাপিত করিয়া কালিদাস তাঁহারনাটকের শান্তি ও সামঞ্জস্যকে আনুপূর্বিক রক্ষা করিয়াছেন। দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যানের পর মহর্ষি মারীচের তপোবনের স্তব্ধতার মধ্যেই আমরা শকুন্তলার নিয়মসংযত, ধৈর্যগম্ভীর অপরিসীম দুঃখকে অনুভব করিতে পারি। অপর দিকে দুষ্মন্তকেও অনুতাপের তপস্যায় তাঁহার নাগরিক বৃত্তিসুলভ স্বেচ্ছাচারের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শকুন্তলাকে লাভ করিতে হইয়াছে। টেম্পেস্টে প্রস্পেরো কেবল বাহিরের

ক্লেশ দ্বারা ফার্দিনান্দের প্রেমকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। আমরা শেষ বিচারে দেখি, টেম্পেস্টের নায়িকা মিরান্দার সরলতার মূলে ছিল অনভিজ্ঞতা, শকুন্তলার সারল্য দুঃখে, অভিজ্ঞতায়, ধৈর্য ও ক্ষমায় পরিণত ও স্থায়ী। গ্যেটের সমালোচনা অনুসরণ করিয়া পুনরায় বলা যায়, শকুন্তলার যৌবনের সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত মিলিত করিয়াছে।

রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা :

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির মত সমালোচনার মূল্যও যথোচিত গুরুত্বে স্বীকৃত। যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনার আলোকেই আমরা সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্যকে আবিষ্কার করি, আমাদের রসোপলব্ধি গভীর হয়। সাহিত্য সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। প্রাচীনপন্থী আলংকারিক সমালোচনা Deductive Criticism-এর অন্তর্ভুক্ত ; এই জাতীয় সমালোচনায় পূর্ব-প্রচলিত বা নির্ধারিত আলংকারিক মানদণ্ড প্রয়োগে কোনও রচনার গুণাগুণ নির্ধারিত করা হয়। এই শ্রেণীর সমালোচনায় কোনও রচনার শিল্পগত অনন্যতা উদ্ভাসিত হয় না। আর এক ধরনের সমালোচনায় appreciation বা সমালোচকের নিজস্ব রসোপভোগই প্রাধান্য লাভ করে, সমালোচক এখানে কোনও রচনা সম্বন্ধে নিজের আবেগ প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেন ; এই শ্রেণীর সমালোচনাকে Impressionistic Criticism বলা যায়। এই জাতীয় সমালোচনায় সাহিত্যে সৃষ্টির মর্মগত সৌন্দর্য যেমন প্রাণবন্তভাবে উদ্ঘাটিত হইতে পারে, তেমনি যথার্থ বিচারবোধের অভাবে উহা নিছক ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে। আর এক শ্রেণীর সমালোচনার লক্ষ্য মূল রচনার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা, interpretation ; আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সমালোচক এই ব্যাখ্যাকে 'Commentation and exposition of works of art'কে সমালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। রসোপভোগ-প্রধান সমালোচনা কখনও কখনও সমালোচকের প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে নূতন সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে। ইহা Aesthetic criticism-এর অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি এই জাতীয় সমালোচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাহিত্য সমালোচনায় ব্যাখ্যার স্থান

গুরুত্বপূর্ণ হইলেও কেবলমাত্র উহাই পর্যাপ্ত নয়, সমালোচনাকে evolution বা রচনার মূল নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, ইহাই সাহিত্য সমালোচনার কঠিনতম দিক। যে সমালোচনায় রসোপলব্ধি, ব্যাখ্যা এবং রস-বিচার সুসমন্বিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সন্দেহ নাই।

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে সাহিত্য-সমালোচনা আরম্ভ হইলেও বঙ্কিম-পূর্ববর্তী সমালোচনায় রসোপলব্ধির গভীরতা এবং পরিণত বিচারবোধ-এর পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। 'কাব্যের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের রসাস্বাদনে প্রকৃত সমালোচনা হয় না, উহার সমগ্রতার বিচার করিতে হইবে, জীবদেহের মত কাব্যদেহেও যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া একটি অখণ্ড ঐক্য প্রতিবিম্বিত হয়, প্রাচীন আলংকারিকগণ কর্তৃক অপরিজ্ঞাত এই সত্য বঙ্কিম প্রথম অনুভব ও প্রচার করেন' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। রবীন্দ্রনাথেই সমালোচনায় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা বুদ্ধিপ্রধান বিশ্লেষণ-ধর্মী। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা মূলত অনুভূতিপ্রধান, সংশ্লেষণ (synthesis) প্রধান। তাঁহার অধিকাংশ সাহিত্য সমালোচনায়ই গভীর রসোপলব্ধি সঞ্জাত মূলরচনার মর্মানুসন্ধানী ব্যাখ্যা (Imterpretation)-ই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁহার মূলরচনায় মর্মগ্রাহিতা কখনও নিছক ব্যক্তিগত, বিচারহীন আবেগোচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হয় না, কবির রসোপলব্ধিতে সর্বদাই সাহিত্যিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা লক্ষ্য করিতে পারা যায়, 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি ইহার উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

শকুন্তলা প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত। গ্রন্থটিতে তিনি মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, কাদম্বরী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যসৃষ্টির ঐশ্বর্য তাঁহার বিশ্লেষণ-বৈশিষ্ট্যে পাঠকের নিকট উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেয়োবোধের অনির্বাণজ্যোতি প্রদীপের আলোকে জীবনের আরতি করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার সাহিত্য সমালোচনায়ও প্রতিফলিত হইয়াছে। সাহিত্যের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি শকুন্তলার এক স্থলে বলিয়াছেন—'সে ভালোকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রেয়, সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে। শ্রেয়ো ও প্রেয়োবোধের, সৌন্দর্য ও কল্যাণের

রাখীবন্ধনেই সাহিত্যের সার্থকতা, এখানেই এক আশ্চর্য সমন্বয়ে মর্ত্য ও স্বর্গ সম্মিলিত হয়, পল্লব প্রান্তের শিশিরবিন্দুটিতেই সিন্ধুর বিরাট সৌন্দর্য ধরা পড়ে। মহাকবি কালিদাসের রচনায় সাহিত্যের সত্যকারের স্বরূপধর্মটি এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়াছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের এত অনুরাগী ছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে আলোচিত আটটি প্রাচীন রচনার মধ্যে চারিটিই কালিদাসের, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় কালিদাস যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা হইতেই বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণে বিচারের নিক্তিতে কালিদাসের রচনার উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ নির্ণয় করিতে চাহেন নাই; এই জাতীয় বুদ্ধিপ্রধান সমালোচনা ছিল তাঁহার মানসধর্মের বিরোধী। তাঁহার 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটিতে সুষ্ঠুভাবে না হউক সূক্ষ্মভাবে বঙ্কিমের শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসদিমোনা প্রবন্ধটির বক্তব্য এবং তুলনামূলক সমালোচনাকে খণ্ডন করা হইয়াছে। বঙ্কিমের বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনায় সেক্সপীয়রের টেম্পেস্টের নায়িকা মিরান্দার চরিত্রচিত্রণের মহিমার যতটা ব্যাখ্যা আছে, কালিদাসের 'শকুন্তলা' চরিত্রচিত্রণের নিজস্ব সৌন্দর্যের উপলব্ধি তত নাই। রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি ভিন্নপ্রকৃতির চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের অসঙ্গতি গভীরভাবেই নির্দেশ করিয়াছেন।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, সকল বিশ্লেষণের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের একটা সাঙ্ঘটিক বা সামগ্রিক রসদৃষ্টি রহিয়াছে—লোকসাহিত্য সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই মন্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের সকল সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির প্রতিও প্রযোজ্য। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকটিতে কালিদাস সৌন্দর্য ও মঙ্গলের সমন্বয়ে সত্যকে যে ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন, তিনি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সমগ্রতায়, নিবিড় রসোপলব্ধিতে পাঠকের নিকট তাহা এক নূতন গৌরবে ও দ্যোতনায় তুলিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যালোচনার মতই 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটিও তাঁহার স্বকীয় উপলব্ধির ঐকান্তিকতায় ও প্রকাশভঙ্গির ঐশ্বর্যে মূলের সৌন্দর্যকে অনুবর্তন করিয়াই একটি নূতন রসসৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত স্মরণীয়: 'প্রাচীন সাহিত্যের ভাব-প্রতিবেশটি তিনি তদাত্মমূলক কল্পনাবলে একেবারে নূতন করিয়া

অনুভব ও গঠন করিয়াছেন। কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও কাদম্বরীর রসাস্বাদন-ব্যাপারে তিনি যে কেবল উহাদের কাব্যসৌন্দর্যের মূল প্রস্রবণ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন তাহা নহে, যে জীবনদর্শনের গভীর চেতনাশ্রয়ী, অটল ভিত্তির উপর এই কাব্যকলা প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রাসঙ্গিক প্রভাবটি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কালিদাসের প্রকৃত মাহাত্ম্য যে তাঁহার যৌবনসুলভ, ভোগাসক্ত প্রেমের বর্ণাঢ্য চিত্রণে নহে, পরন্তু তপশ্চর্যাপূত, আত্মসংযমে মহীয়ান, কল্যাণধর্মী প্রেমের শান্ত, নিরুচ্ছ্বাস পরিণতিতে—এই সত্যই রবীন্দ্রনাথ উক্ত কাব্যদ্বয় হইতে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ইহারই সঙ্গে আধুনিক বিচারবুদ্ধি প্রাচীন কাব্যে যে অমীমাংসিত সমস্যার দ্বারা পীড়িত হয় তাহারও সন্ধান তিনি দিয়াছেন।'

শব্দার্থ ও টীকা

অনু ১-১৫ঃ টেম্পেস্ট—সেক্‌সপীয়রের এই মিলনান্তক নাটকটি সম্ভবতঃ ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১৬১১-এর প্রথম দিকে রচিত হয়। ইহার আখ্যানবস্তু হইল এই : মিলানের ডিউক প্রস্পেরো তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অ্যাণ্টনিওর উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়া নিজে বিদ্যাচর্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। অ্যাণ্টনিও সেই সুযোগে নেপল্‌স্-এর রাজার সহায়তায় প্রস্পেরোকে রাজ্যচ্যুত করে; তাহার কূট চক্রান্তের ফলে তিনি কন্যা মিরান্দাকে লইয়া এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসিতের জীবনযাপন করিতে বাধ্য হন। এখানে ইতঃপূর্বে এক ডাইনী নির্বাসিত হইয়াছিল, প্রস্পেরোর আগমনের কিছু পূর্বে তাহার মৃত্যু হয়। সে অনেক সুশীল আত্মাদের বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, প্রস্পেরো নিজের যাদুবিদ্যার শক্তিতে তাহাদের মুক্তি দেন। তাহারা প্রস্পেরোর বশ্যতা স্বীকার করে। এরিয়েল ছিল উহাদের মধ্যে প্রধান। ডাইনীর পুত্র বিকটাকৃতি দানব ক্যালিবানকে প্রস্পেরো দাসরূপে পরিচর্যায় নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নেপল্‌স-এর রাজা এবং তাঁহার পুত্র ফার্দিনান্দ যে জাহাজে করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার নির্দেশানুযায়ী সমুদ্রের প্রচণ্ড ঝড়ে তাহা উৎক্ষিপ্ত হইলে তাঁহারা সেই দ্বীপে আসিয়া পড়েন। ফার্দিনান্দ মিরান্দার পিতার ঐন্দ্রজালিক

মায়ায় তাঁহাদের নিকট আসে এবং মিরান্দা ও ফার্দিনান্দ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশেষে প্রস্পেরোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও নেপল্‌স-এর রাজাও তাঁহার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহার জন্য অনুতপ্ত হন। সকলের শুভেচ্ছার মধ্যে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার মিলন ঘটে, প্রস্পেরোও তাঁহার হৃত রাজ্য ফিরিয়া পান। দ্বীপ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে এরিয়েলকে স্বাধীনতা দান করিয়া যান। **কালিদাসের শকুন্তলা**—শকুন্তলা—শকুন্ত (পক্ষী) কর্তৃক, লা (লালন করা) + আ, যে পক্ষী কর্তৃক লালিত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। জন্ম মাত্র মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল; মহর্ষি কণ্ব সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া নিজের তপোবনাশ্রমে আনয়ন করেন এবং তাহার শকুন্তলা নাম রাখিয়া নিজ কন্যার ন্যায় লালনপালন করেন। মহাভারতে শকুন্তলার কাহিনী যেভাবে বিবৃত হইয়াছে, কালিদাসের শকুন্তলার কাহিনী-বিন্যাস তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এই বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দুর্বাসার অভিশাপের শব্দার্থ ও টীকা অংশ দেখ।

য়ুরোপের কবিগুরু গেটে……সমালোচনা লিখিয়াছেন—জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও কবি গেটে (Johann Wolfgang Von Goethe) ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগস্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্য জীবন দুই ক্ষেত্রেই তাঁহার বিপুল কর্মযজ্ঞের মহিমা দেখিতে পাই। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি—মানব সভ্যতার প্রতিটি শাখাই তাঁর চর্চার বিষয় ছিল। তাঁহার রচনার মধ্যে ফাউস্টই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। গেটের প্রজ্ঞাদৃষ্টি, গভীর মনীষা এবং বিশ্ব-সভ্যতা চেতনার জন্য, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত কারণেই তাঁহাকে 'য়ুরোপের কবিকুলগুরু' রূপে অভিহিত করিয়াছেন। গেটে শকুন্তলার স্যার্ উইলিয়ম জোন্স-কৃত ইংরেজী অনুবাদের ফস্টর-এর জার্মান অনুবাদ পড়িয়া একটি কবিতায় বলিয়াছেন—'যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফললাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই একনামে সন্নিবিষ্ট করিবার অভিলাষ করে তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তলা! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি, এবং তাহা হইলেই সকল বলা

হইল।' **মীনকেতু**—মীন (মৎস্য) কেতু (ধ্বজ, পতাকা) যাহার, মদনদেব, কন্দর্প।

ঋষ্যশৃঙ্গ—ঋষ্য (মৃগ), মৃগশৃঙ্গবৎ শৃঙ্গ যাহার; কশ্যপপুত্র বিভাণ্ডব মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের মস্তকে একটি শৃঙ্গ ছিল। তিনি কৌশিক নদীর তীরে পিতার তপোবনে পুণ্যাখ্য নামক আশ্রমে একমাত্র পিতার সাহচর্যেই পালিত হন বলিয়া নরনারীর প্রভেদ সম্পর্কে অচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন, শকুন্তলা কেবল মহর্ষি কণ্বের সান্নিধ্যে লালিত-পালিত হইলে সংসার সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত সরলতায় সে নারী-ঋষ্যশৃঙ্গ হইয়া উঠিত।

ঝড়ের সময় ভগ্নতরী—ফার্দিনান্দেরা যে জাহাজে করিয়া যাইতেছিল, প্রস্পেরোর ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ে তাহা বিপর্যস্ত হয়।

সোদরস্নেহে—ভ্রাতৃস্নেহে। **বনজ্যোৎস্না**—বনলতার শকুন্তলা প্রদত্ত নাম।

টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে…দূরে রহিয়াছে—প্রস্পেরো এরিয়েলকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিলে তাহাকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকারপূর্বক সকল নির্দেশ পালন করিয়া চলিতে হইত। এরিয়েল বহিঃপ্রকৃতির প্রতীক, সে বার বার মুক্ত হইয়া প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিয়াছে, বন্যপাখীর মত আকাশে যদৃচ্ছা বিচরণে, সবুজ বৃক্ষরাজির নীচে সুগন্ধি পুষ্পসমূহের মধ্যে পরিভ্রমণে স্বাধীনতার স্বাদ লইবার জন্য তাহাকে আর্ত হইতে দেখি। প্রস্পেরো বা মিরান্দার সহিত তাহার কোনও মানবিক সম্পর্ক হয় নাই।

ভো ভো রাজন্…ন হন্তব্য—রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া একটি পলায়মান মৃগের অনুসরণ করিয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের নিকটউপস্থিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ধনুকে তীর যোজনা করিলে নেপথ্য হইতে ঋষিদের কণ্ঠোচ্চারিত এই নিষেধবাণী শুনিতে পান: ওহে, রাজন্, ইহা আশ্রমের হরিণ, ইহাকে হত্যা করা উচিত নয়, উচিত নয়।

দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ—দুইজনেই এই অরণ্যের।

অনু ১৬—১৭: ইঙ্গুদির তৈল—ইঙ্গুদি বা ইঙ্গুদী, লতাফটকী, ইঙ্গুদীবৃক্ষ ১৫/১৬ হাত উচ্চ হয়, ইহার ফল আম্রফলের মত, কিন্তু স্বাদ তিক্ত;

ইহার বীজ হইতে তৈল হয়। পূর্বকালে ঋষিরা এই তৈল ব্যবহার করিতেন।

প্রত্যাসন্ন—নিকটবর্তী।

শ্যামাধান্য—শ্যামাক, বন্য ক্ষুদ্র ধান্য বিশেষ।

রূপকনাট্য—যেখানে সমধর্মী অপর একটি বিষয়বস্তুর আবরণে মূল বিষয়কে প্রকাশ করা হয়, সেখানে আমরা রূপক বা allegory-র উদাহরণ পাই। যেমন স্পেন্‌সারের রূপককাব্য ফেইরী কুইন-এ মানুষের সৎগুণ এবং কুপ্রবৃত্তিগুলিকে বিভিন্ন চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এইভাবে রূপককাব্যও রচিত হয়।

উত্তররামচরিত—ভবভূতির রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক। রাম কর্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান এবং তাঁহাদের পুনর্মিলন ইহার বিষয়বস্তু।

কৃতকপুত্র—কৃতক (কল্পিত) যে পুত্র, অন্যের দ্বারা পালিত পুত্র।

ক্যালিবান—প্রস্পেরো যে নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার পূর্বে এক ডাইনী বাস করিত, তাহারই পুত্র দানব ক্যালিবান। ক্যালিবান ছিল দুষ্টপ্রকৃতির, কেবল প্রস্পেরোর ঐন্দ্রজালিক শক্তির দ্বারাই সে ক্রীতদাসের মত তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল।

নবমধু লোভী……তুমি—অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পঞ্চম-অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজা দুষ্মন্ত এবং বিদূষক সঙ্গীত গৃহ হইতে রাণী হংসপদিকার এই সঙ্গীত শুনিতে পান :

অহিণঅমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং
কমল বসই মেত্তিণিব্বুদো মহুঅর বিসুমেরি ণোসিণং কহং ॥

'অহে মধুকর! অভিনব মধুর লোভে সহকার মঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, এখন কমল-মধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া উহারে একেবারে বিস্মৃত হইলে কেন' (বিদ্যাসাগর কৃত অনুবাদ)। **চূতমঞ্জরী**—আম্রের (চূত) নবপল্লব (মঞ্জরী) বা কোরকদলযুক্ত বৃন্ত।

সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জন—আমরা একবার মাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পরে ছাড়িয়া দিই।

বসুমতী, হংসপদিকা—দুষ্মন্তের মহিষী।

নাগরিক বৃত্তিদ্বারা—নগরবাসীর চরিত্রসুলভ সৌজন্যে, চতুরতায়।

অনু ৩৮-৫১ : অভিঘাত—গুরুতর আঘাত।

টেম্পেস্টে ফার্দিনান্দের প্রেমকে…পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন—ফার্দিনান্দ মিরান্দার প্রতি আকৃষ্ট হইলে তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্পেরো কঠিন শ্রমসাধ্য কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এমন কি ফার্দিনান্দকে কাঠের বোঝাও বহন করিতে হইয়াছিল।

Paradise Lost, Paradise Regained—ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মিল্টনের (১৬০৮—১৬৭৫) রচিত মহাকাব্য। জগৎ সৃষ্টির পরে আদি মানব আদম ও তাহার সহচরীরূপে ইভ্‌কে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। স্বর্গে তাহারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই ছিল, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় ইভ জ্ঞান-বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে এবং আদমকেও তাহা গ্রহণ করায়, ফলে মানুষকে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়; ইহাই হইল প্রথম কাব্যের উপজীব্য বিষয়। খ্রীষ্টের আবির্ভাব ও আত্মদানে মানুষের স্বর্গের অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই হইতেছে দ্বিতীয় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু।

ন খলু ন খলু…পুষ্পরাশাবিবাগ্নি—পুষ্পরাশির উপর অগ্নি নিক্ষেপের মত এই অতিকোমল মৃগের দেহে ঐ বাণ কদাচ নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত নয়, উচিত নয়। দুষ্মন্ত ধনুকে শর যোজনা করিয়া একটি আশ্রমমৃগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ঋষি বৈখানস তাঁহাকে এই কথাগুলি বলিয়াছেন (অভিজ্ঞান শকুন্তল, প্রথম অঙ্ক)।

মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব…স্যন্দনা লোকভীত—এক বন্যহস্তী রথ দেখিয়া ভীত হইয়া ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, দলবদ্ধ হরিণকুল ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, হস্তীটা যেন তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রথম অঙ্কে উদ্যানে প্রথম সাক্ষাতের পর দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার উপস্থিতিতে তাহার সখীদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তখন নেপথ্য হইতে ঋষিদের কণ্ঠে দুষ্মন্তের সৈন্যদলের আবির্ভাবে অরণ্যের শান্তি কিভাবে বিঘ্নিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এই বার্তা শোনা যায়।

তিরস্করণী—তিরস্ (অপ্রকাশ্য) করণী (যে করে), পর্দা, বস্ত্রাদির আড়াল।

সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা পরিস্ফুট হইয়াছে ইহাও তাঁহার সরলতার অভ্রান্ত নিদর্শন। বাসনার ধূলি তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সারল্যের মাধুর্যসুরভিত সত্তাটিকে মলিন এবং আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। শকুন্তলা নিজের সহজাত সরলতায় অরণ্যফুলের, নির্ঝরের জলাধারার মতই মলিনতার সংস্পর্শেও অনায়াসেই নির্মল।

৪। **এই অনুতাপ তপস্যা…কোনো গৌরব ছিল না।** (অনু ৪১)

রবীন্দ্রনাথ এখানে দুষ্মন্ত যে ভাবে অনুতাপজর্জরিত হইয়া মহর্ষি মারীচের আশ্রমে শকুন্তলাকে পুনরায় লাভ করিলেন, তাহার তাৎপর্যই তুলিয়া ধরিয়াছেন।

দুষ্মন্ত যৌবনমত্ততায় শকুন্তলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সহজেই তাহাকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা প্রেমের সত্যকারের চরিতার্থতা নয়। সহজে যাহা পাওয়া যায়,মোহাবেশের মুষ্টিতে যাহা মুহূর্তের মধ্যেই আহৃত হয়, তাহা শিথিলভাবেই স্খলিত হইয়া পড়ে। শকুন্তলাকে তিনি অনায়াসেই পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে হারাইতে হইয়াছিল। রাজসভায় প্রবেশ করিবামাত্র দুষ্মন্ত যদি সেই মুহূর্তেই শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতেন, তবে তাহার চরিত্রের পূর্ণতার ঐশ্বর্যে শকুন্তলাকে পাইতেন না ; সে তাঁহার অন্যতমা মহিষী হংসপদিকার মত তাঁহার অন্তঃপুরে স্থান পাইত মাত্র, তাঁহার যথার্থ সহধর্মিণী হইতে পারিত না। দুষ্মন্ত দুর্বাসার শাপে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া আবার পূর্বস্মৃতি তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছিল, তখন অনুতাপের তীব্র যন্ত্রণায় দুষ্মন্ত অস্থির হইয়াছিলেন। এই অনুতাপই হইল তাঁহার জীবনে পরম ঐশ্বর্য, শকুন্তলাকে লাভ করিবার তপস্যা,তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণাবেদনা হইল সেই তপস্যার কৃচ্ছ্রতা, ব্রত উদযাপনের দুরূহতা। অনুতাপের অগ্নিদহনে বাসনার কলুষ দগ্ধ হইবার পর অন্তরের নির্মলতায় দুষ্মন্ত মহর্ষি মারীচের আশ্রমে শকুন্তলার সহিত যখন মিলিত হইলেন, তখনই তিনি যথার্থ এবং চিরন্তনভাবে তাহাকে লাভ করিতে পারিলেন। এই তপস্যা ছাড়া দুষ্মন্ত বিনা আয়াসে শকুন্তলাকে লাভ করিলে তাঁহার প্রাপ্তি এমন মহিমায় মণ্ডিত হইতে পারিত না।

৫। শকুন্তলায় আমরা অপরাধের···দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। (অনু ৪৪)

আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথ দুষ্মন্তের হৃদয়শুদ্ধির প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করিয়াছেন।

এই সংসারে পাপেরও একটি সার্থকতা আছে, ইহা বিধাতার বিধান। অপরাধের মধ্য দিয়াই পুণ্যের জ্যোতি বিকশিত হয়, পাপের আঘাত যন্ত্রণা ব্যতীত মঙ্গল তাহার শাশ্বত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তপস্যার মধ্য দিয়াই মানুষকে শুভময়তায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে আমরা ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করি। ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত রাজা দুষ্মন্ত যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই, তাহার অমৃত হইতে তিনি ছিলেন বঞ্চিত। শকুন্তলাকে তিনি প্রথমে কামনার উদ্দামতায়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর দুর্বাসার শাপে স্মৃতিভ্রষ্টতার জন্য শকুন্তলাকে তিনি হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় প্রত্যাখ্যান করিলেন; তাহার অঙ্গুরীয় দর্শনে যখন পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইল, তখন অনুশোচনার যন্ত্রণায় তাঁহাকে জর্জরিত হইতে হইল; দুষ্মন্ত তাঁহার সংযমহীনতার কঠিন দণ্ড লাভ করিলেন। কিন্তু সেই রূপমোহ, প্রগল্ভ, অস্থির বাসনার পাপসঞ্জাত কঠিন যন্ত্রণার মধ্য দিয়াই দুষ্মন্তের হৃদয় শুদ্ধ হইল, সত্যকারের প্রেমের কল্যাণে তিনি স্থিত হইতে পারিলেন। কালিদাস এইভাবে পাপও যে কি ভাবে মঙ্গলের সোপান হইয়া দাঁড়ায়, তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর

১। 'শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে'—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর: মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট-এ শয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া আদম তথা সমগ্র মানবজাতি কি ভাবে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত এবং ঈশ্বরের করুণা হইতে বঞ্চিত হইল, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্যারাডাইস রিগেনড-এ

কিভাবে যিশুখ্রীষ্টের আত্মোৎসর্জনের ফলে প্রলোভন অতিক্রম করিয়া মানবজাতি পুনরায় স্বর্গের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলায়ও এই ধরনের স্খলন এবং উদ্ধারের পর্যায় চিত্রিত হইয়াছে।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা প্রথমে যৌবনের বিলাসের, কামনার যে স্বর্গে মিলিত হয়, তাহার সৌন্দর্য যতই সম্পূর্ণ এবং নিটোল হোক না কেন, তাহা নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর, পদ্মপত্রে শিশিরের মত ক্ষণজীবী। এই আত্মকেন্দ্রিক, সঙ্কীর্ণ সৌন্দর্যের স্বর্গ হইতে মানুষের মুক্তিই একান্তভাবে কাম্য ; ইহাতে জীবনের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি মেলে না। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার বাসনার মত্ততায় আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ এই স্বর্গটি সহজেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, আঘাতে যন্ত্রণায় তাহাদের হৃদয় মথিত হইল। তাহার পর বাকি রহিল সাধনার স্বর্গ।

সুখের বুদ্বুদবিলাসের ক্ষুদ্র স্বর্গটি এই ভাবেই সংঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সহজ স্বর্গও তাই সহজেই নষ্ট হইল। দুর্বাসার শাপ কঠিন বজ্রের আঘাতে তাহাদের মধ্যে দুঃসহ বিচ্ছেদ আনিয়া দিল ; শকুন্তলাকে যেমন তাহার হৃদয়ের গভীরে সেই আঘাতের রক্তচিহ্নকে ধারণ করিতে হইয়াছে, দুষ্মন্তকেও তেমনি শকুন্তলার অঙ্গুরীয় দর্শনে সমস্ত স্মৃতি জাগ্রত হইবার পর অনুতাপের অগ্নিদহনে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। এই বিক্ষোভ, অপরাধের আঘাত ও অনুতাপের দাহ তাহাদের জীবনের পূর্ণবিকাশের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। পাপ, অপরাধ যাহা ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী অথচ আপাত-মনোরম, তাহাকে ভাঙ্গিয়া দেয় ; অনুতাপ, বেদনা যাহা চিরস্থায়ী তাহাকে গড়িয়া তোলে। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে অনুতাপে, দুঃখের নির্মম কঠিন তপশ্চারণে তাহাদের সাধনার স্বর্গটিকে জয় করিতে হইল। মহর্ষি মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা যখন পুনর্মিলিত হইলেন, তখনই তাঁহারা যৌবনের বিলাসমোহের ক্ষণভঙ্গুরতা হইতে সত্যকারের প্রেমের ধ্রুব শান্তি ও কল্যাণে উত্তীর্ণ হইলেন। এই মিলনের স্বর্গটিই শাশ্বত, তাহার আশ্রয়ই চিরস্থায়ী। শকুন্তলায় কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার স্বর্গচ্যুতি হইতে স্বর্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন বলিয়াই তাহাকে একত্রে প্যারাডাইস লস্ট এবং প্যারাডাইস রিগেনড বলা যাইতে পারে ; রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটিতে শকুন্তলার স্বরূপ বৈশিষ্ট্যটি যথার্থ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

২। 'বন্ধন ও অবন্ধনের সংগমস্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা নাটকটি একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে'—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া ইহার যৌক্তিকতা নির্ণয় কর।

উত্তরঃ অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে বৈপরীত্যের এক বিচিত্র ও সুষ্ঠু সমন্বয় লক্ষ্য করিতে পারা যায়। মহাকবি কালিদাস শকুন্তলাকে দ্বিধাসংশয়মুক্ত স্বভাবের পথে বিচরণ করিতে দিয়াছেন, তাহাকে কোথায়ও বাধা দেন নাই। যৌবনমত্ততার হাবভাব লীলাচাপল্যে, পরম লজ্জার সহিত প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রামে, দুষ্মন্তের নিকটে সহজেই আত্মসমর্পণে তাহার দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন সহজাত সরলতাই পরিস্ফুট। কোন সন্দেহে প্রশ্নে বিচারে আমরা তাহাকে ক্লিষ্ট হইতে দেখি না, দয়িতের নিকট আত্মদান করিতে গিয়া সে চিন্তাভাবনায় বিড়ম্বিত হয় নাই। তরুলতা-ফল-পুষ্পের মতই শকুন্তলা আত্মবিস্মৃত, ঐকান্তিক সরলতায় নিজের স্বভাবধর্মকেই সে অনুসরণ করিয়াছে।

আবার অন্যদিকে কালিদাস তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া তুলিয়াছেন। কামনার চাঞ্চল্য এবং তাহার নিকট আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও আমরা অনুভব করি, নিজের সত্তার গভীরে শকুন্তলা সংযত, সহিষ্ণু, একাগ্র-তপঃপরায়ণা, কল্যাণধর্মের শাসনের একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। তাহার বাহিরে বাসনার আলোড়ন, নিভৃততম অন্তরে নারীত্বের প্রদীপ শিখাটি অকম্পিত, চির উজ্জ্বল।

কালিদাস সত্যই এক অপূর্ব কৌশলে শকুন্তলাকে লীলা ও ধৈর্যের, স্বভাব ও নিয়মের সন্ধিস্থলে, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহানার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন। ঋষি বিশ্বামিত্র তাহার পিতা, মাতা অপ্সরা মেনকা ; মেনকার রূপমুগ্ধ বিশ্বামিত্রের ব্রতভঙ্গে তাহার জন্ম, আর মহর্ষি কণ্বের তপোবনে তাহার পালন। তপোবন স্থানটিও এমন, যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য এবং সংযম এক আশ্চর্য সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। এখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান, অনুশাসন নাই, এখানে অরণ্যের মৃগীর, নির্ঝরের জলধারার মতই শকুন্তলা নিজস্ব স্বভাবধর্মের বাধাবন্ধনহীন মুক্ত স্বচ্ছন্দে বিকশিত হইতে পারিয়াছে, আবার অন্যদিকে এস্থলে ধর্মের কঠোর নিয়মও সর্বব্যাপ্ত। যে গন্ধর্ব বিবাহে শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত মিলিত হয়,

যাইতেছে, তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, প্রতিটি পদক্ষেপেই তাহার বেদনা, অরণ্যের সহিত মানুষের বিচ্ছেদবেদনা কি করুণ, কি মর্মান্তিক !

টেম্পেস্ট নাটকে ইয়োরোপীয় জীবনধর্ম অনুযায়ী মানুষ মমতার কল্যাণে নিজের হৃদয়কে চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া দেয় নাই, সে সকল কিছুর উপরে নিজের ক্ষমতার আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। এইরূপ মনোভাব যেখানে ক্রিয়াশীল, সেখানে শকুন্তলার মত প্রকৃতি মূক থাকিয়াও হৃদয়ের উষ্ণতায় এমনভাবে সজীব হইয়া উঠিতে পারে না।

৪। 'সাহিত্য সেই লক্ষ্যসাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে'—রবীন্দ্রনাথ এখানে কোন্ লক্ষ্যের কথা বলিয়াছেন ? শকুন্তলায় ইহা যে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর ঃ আধিপত্য লইয়া দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্ট নাটকের উপজীব্য। মিরান্দার পিতা প্রস্পেরো কনিষ্ঠ ভ্রাতার চক্রান্তে স্বরাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া নির্জন দ্বীপে মন্ত্রবলে প্রকৃতিরাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পরিশেষে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকতা নিবৃত্ত হইল সত্য, কিন্তু তাহা যে শেষ হইল, একথা বলা যায় না। মানুষের দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি টেম্পেস্ট নাটকের মতই বিরোধের ঝড় তুলিয়া থাকে, শাসন-পীড়নে তাহাকে আপাতত সংযত করিয়া রাখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি এই সাময়িক দমনকে যথার্থ পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে নাই। সৌন্দর্যে, প্রেমে এবং মঙ্গলে পাপ কেবল অবদমিত না হইয়া একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। ইহার প্রতি মানুষের একটি ঐকান্তিক লক্ষ্য আছে, রবীন্দ্রনাথ এখানে তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই লক্ষ্যসাধনের নিগূঢ় প্রক্রিয়া যে-ভাবে অভিব্যক্ত হয়, দণ্ডনীতি ধর্মনীতির মত ফলাফল নির্ণয় ও বিভীষিকা দ্বারা মানুষকে কি ভাবে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা যায়, সেই আলোচনার পরিবর্তে উচ্চ সাহিত্য যে-ভাবে অন্তরাত্মার ভিতরের পথে তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়া ধরে, তাহা শকুন্তলা নাটকটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি।

শকুন্তলায় দুষ্মন্ত যে সংযমহীন কামনার মত্ততায় শকুন্তলাকে লাভ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা ধর্মকে লংঘন করিয়াছিল। কালিদাস পরেও দুষ্মন্তের নাগরিক স্বভাবসুলভ চপল প্রণয়ের পাপের সার্থক ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বাহির হইতে দুষ্মন্তের নাগরিকবৃত্তির যথেচ্ছাচারের দণ্ডবিধান করেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার কাব্য নীতিশাস্ত্রের স্থূলতায় পর্যবসিত হইত। দুর্বাসার শাপজনিত বিস্মৃতিতে শকুন্তলাকে অপমানের দুঃসহতায় প্রত্যাখ্যান করিবার পর তাঁহার অঙ্গুরীয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনে যখন স্মৃতি জাগ্রত হইল তখন তিনি তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হইলেন। সেই অনুতাপজনিত হৃদয়দহনেই বাসনার সমস্ত মালিন্য হইতে দুষ্মন্তের হৃদয় শুদ্ধ হইয়াছে। কালিদাস দুষ্মন্তের প্রবৃত্তির দাবদাহকে তাহার অনুতপ্ত, বেদনায় বিগলিত চিত্তের অশ্রু-বর্ষণেই নির্বাপিত, পাপকে হৃদয়ের ভিতর দিক হইতে আপনার অনলেই আপনি দগ্ধ করিয়াছেন। বাহিরের দণ্ডবিধানে প্রবৃত্তির শাসন-দমনের স্থূলতায় নয়, হৃদয়ের গভীরেই সমস্ত অমঙ্গল নিঃশেষিত হইয়া নাটকটি সমাপ্ত হইয়াছে। এই গভীর অনুতাপ-যন্ত্রণায়ই সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া নির্মল, শুচি হয়। সাহিত্য কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের মতই এই প্রক্রিয়ায়ই শ্রেয়কে প্রেয়, পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে।

৫। 'কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল'—এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলায় দুর্বাসার শাপের ভূমিকার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাদের তুলনাপ্রসঙ্গে কাহার বিশ্লেষণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য, নির্দেশ কর।

উত্তর : দুষ্মন্ত একদিন শকুন্তলাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবেন না, দুর্বাসার এই শাপের একটি গভীর তাৎপর্য আছে, তাহা দুষ্মন্তের চরিত্রের একটি দিকের ইঙ্গিত দিয়াছে। শকুন্তলা দুষ্মন্তের রাজসভায় উপস্থিত হইবার পূর্বে যে দৃশ্যে দুষ্মন্তকে কালিদাস উপস্থাপিত করেন, তাহাতে আমরা দেখি রাজা তাহার প্রেম বিস্মৃত হইয়াছেন, রাজঅন্তঃপুর হইতে অন্যতমা মহিষী হংসপদিকার গানের ভিতর দিয়া এই অনুযোগ শুনিয়া দুষ্মন্ত তাঁহার বয়স্যকে বলিয়াছেন : আমরা একবার মাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পরে ছাড়িয়া দিই,

সেইজন্য হংসপদিকার ভর্ৎসনার যোগ্য হইয়াছি। ফুলে ফুলে ভ্রমরের মধুপানের মতই আত্মসুখসন্ধান, লঘুচিত্ত রাজা দুষ্মন্তের নিকট প্রেম ছিল মুহূর্তের বিলাস। হংসপদিকার গানের মধ্য দিয়া আমরা বুঝি, বহুবল্লভ রাজার এমন কত সুখলব্ধ প্রণয়সঙ্গিনী ক্ষণজীবী সৌভাগ্যের বেদনাপূর্ণ স্মৃতিটুকু মাত্র লইয়া অনাদরের অন্ধকারে নিষ্ফল জীবনের গ্লানি বহন করিতেছে। দুর্বাসার শাপের ফলে রাজার বিস্মৃতি যে আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তাঁহার নাগরিক স্বভাবে যে এইরূপ স্মৃতিস্খলনের বীজ নিহিত ছিল, পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার এই চপল পরিণয়ের পরিচয়ে কবি তাহার নিপুণ ইঙ্গিত দিয়াছেন; কেবল বাহিরের দিক হইতে নয়, অন্তরের দিক হইতে কবি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মর্মান্তিক বিচ্ছেদের পটভূমিকে প্রস্তুত করিয়াছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্রবিকাশের উপায়রূপে দুর্বাসার শাপের ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যায়ও দুর্বাসার শাপ বাহিরের ঘটনারূপেই আসিয়াছে। রাজা শকুন্তলা সম্পর্কে বিদূষককে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, শকুন্তলা অতিথিসেবায় অবহেলা করিয়াছিল, তাই তাহাদের ব্রহ্মশাপরূপ অপরাধের দণ্ড পাইতে হইল। সেই প্রায়শ্চিত্তের দুঃখে তাহাদের চরিত্র পরিস্ফুট ও পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহাও আমাদের নিকট নীতিকথা বলিয়া মনে হয়; কালিদাসের কবিত্বের মহিমা এই ব্যাখ্যায় আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের মর্মসন্ধানী গভীর ব্যাখ্যায়ই কালিদাসের রচনার কাব্য-সৌন্দর্যের প্রয়োজনে দুর্বাসার শাপ যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সার্থকভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাঁহার নিপুণ বিশ্লেষণে দেখি, দুর্বাসার শাপ বাহির হইতে আরোপিত নিছক একটি ঘটনা নয়; জীবনের সত্যের সৌন্দর্য-মূর্তি কালিদাস রচনা করিয়াছেন, কাব্যে সেই আন্তর-গূঢ় প্রয়োজনেই চরিত্রের সহিত অন্তর্লীন সঙ্গতিতেই দুর্বাসার শাপ উপস্থিত হইয়াছে। সৌন্দর্যে, মঙ্গলে, পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত, বিলীন হইবে, ইহাই আমাদের আত্মার আকাঙ্ক্ষা। সাহিত্য নীতিকথার আড়ম্বরে নয়, সৌন্দর্যের বিচিত্র আয়োজনে, শ্রেয়কেই প্রেয় করিয়া তুলিয়া সেই লক্ষ্যের পূর্ণতার চিত্রণকে আমাদের হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তোলে। উপক্রমণিকা হইতে

উপসংহার পর্যন্ত যে শান্তি ও সৌন্দর্য কালিদাসের কাব্যে ব্যাপ্ত, তাহারই সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, দুষ্মন্তের বাসনার পাপের পল্লবিত বর্ণনায় রচনাকে ভারাক্রান্ত না করিয়া অটল সংযমে দুর্বাসার শাপের গূঢ় ইঙ্গিতেই দুষ্মন্তের পাপ এবং অনুতাপের তপস্যায় সেই পাপের স্খালনে তাঁহার শুদ্ধতা অর্জনকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাস্তব সংসারে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে অনুসরণ করিয়া দুর্বাসার শাপের মাধ্যম ব্যতীত যদি কালিদাস পাপ ও পাপের প্রতিক্রিয়া বিক্ষোভে আলোড়নে উপস্থাপিত করিতেন, পংকস্তর পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্যের সেই বিশিষ্ট কল্যাণশ্রীর মহিমা ক্ষুণ্ণ হইত সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের দুর্বাসার শাপের এই বিশ্লেষণেই আমরা কালিদাসের কবিত্বের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারি।

৬। 'টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান'—উক্তিটির যৌক্তিকতা নির্ণয় কর।

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রের টেম্পেস্টের সহিত কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম-এর তুলনা করিয়া শকুন্তলার সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ নির্দেশ করিয়াছেন। শকুন্তলায় পূর্ণতার যে মঙ্গলমাধুর্যসিক্ত সৌন্দর্য আছে, তাহা টেম্পেস্টে নাই। এই নাটকটিতে আমরা মানুষে-প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে-মানুষে বিরোধ লক্ষ্য করি, এই বিরোধের মূলে ছিল ক্ষমতা-লাভের প্রয়াস। টেম্পেস্টে প্রস্পেরো কনিষ্ঠ ভ্রাতার চক্রান্তে স্বরাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া মন্ত্রবলে প্রকৃতি রাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শক্তিতেই শত্রুদের সন্ত্রস্ত, ভীত করিয়া হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু কালিদাস শকুন্তলার অনুতাপের তপস্যায়, অশ্রুতে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে নির্বাপিত করিয়াছেন। বেদনাস্নাত দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার শুচি-মিলনে নাটকটির উপসংহার রচিত হইয়াছে, পাঠকের চিত্ত সেই সংশয়হীন পরিপূর্ণ পরিণতির মধ্যে শান্তিলাভ করিয়াছে

বস্তুতঃ টেম্পেস্টে কেবল শক্তিরই জয় দেখি। প্রস্পেরো কনিষ্ঠ ভ্রাতার

ক্রুট চক্রান্তে পরাজিত হইয়া দ্বীপের উপর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার সাহায্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শক্তিতেই পুনরায় নিজের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিরোধের বীজ যে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। আর শকুন্তলায় কল্যাণের পথে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার জীবন যথার্থ পরিণতি লাভ করিয়াছে। সৌন্দর্যের সহিত কল্যাণের সমন্বয়ই কালিদাসের লক্ষ্য ছিল, দুঃখের তপস্যায় দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে শুচি করিয়া অবশেষে কল্যাণের পবিত্র নির্মলতায়, স্নিগ্ধ মাধুর্যে তাহাদের উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াই কালিদাস তাঁহার সেই লক্ষ্যকে সিদ্ধ করিয়াছেন।

টেম্পেস্টে দ্বীপপ্রকৃতি-লালিত মিরান্দার সারল্য চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু এই সরলতা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সে একমাত্র তাহার পিতার সাহচর্যে লালিতপালিত হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিক বিকাশের আনুকূল্য পায় নাই। পরবর্তী কালেও সংসারজীবনের অভিজ্ঞতার ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই। আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি। সুতরাং সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে মিরান্দার জীবনের পূর্ণতা উন্মোচিত হয় নাই, তাহার এই আংশিকতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ। কালিদাসের নাটকের আরম্ভে শকুন্তলাকে আমরা একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে দেখি, সেখানে তাহার সহজাত সরল আনন্দে আপন সখীজনও কামনার দুর্বলতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু এই বিচ্যুতির আঘাত-পীড়নেই, দুঃখের দুরূহ তপস্যায়ই তাহার সারল্য পরিণত, তাহার হৃদয়ের পুণ্যপ্রীতি নম্রকঠিন শুচিতায় বিকশিত হইয়াছে। অপরাধের দুঃখে, অভিজ্ঞতায়, ধৈর্যে ও ক্ষমায় শকুন্তলার সরলতা পরিপক্ক, গম্ভীর ও স্থায়ী। শকুন্তলার জীবনের এই পূর্ণতার সৌন্দর্য টেম্পেস্টের মিরান্দায় ফোটে নাই। টেম্পেস্ট ও শকুন্তলার সামগ্রিক মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের উপরিউদ্ধৃত উক্তিটিকে যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলাবিষয়ক প্রবন্ধের তুলনামূলক সমালোচনা কর।

উত্তর : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'দুর্বাসার শাপ' প্রবন্ধটিতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার

চরিত্রের পরিস্ফুটনে দুর্বাসার শাপের উপস্থাপনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাজা বিদূষকের নিকট শকুন্তলা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন বলিয়া এবং শকুন্তলা অতিথি-সেবায় অবহেলা করিয়াছিলেন তাহার জন্য দুর্বাসার শাপের মাধ্যমে শাস্তি পাইয়াছিলেন। দুর্বাসার শাপসঞ্জাত দুঃখবেদনাই তাহাদের চরিত্রকে বিকশিত করিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের আলোচনায় দেখা যায়, দুষ্মন্ত বিদূষকের নিকট শকুন্তলা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার বিচ্যুতি কেবলমাত্র এইটুকুই; দুর্বাসার শাপ তাঁহার মহত্ত্বকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। অনুতাপের বেদনা-তপস্যায় নিজের বাসনার মত্ততা দগ্ধ হইবার পর দুষ্মন্ত কি ভাবে শুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রের এই মঙ্গলময় পরিণতি এই বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয় নাই। সমালোচক ব্রহ্মশাপের মধ্য দিয়া শকুন্তলার অভিজ্ঞতা পরিণত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সেই পরিণতিতে কালিদাস জীবনের যে কল্যাণের সত্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা তাঁহার ব্যাখ্যায় মেলে না। কবির সেই জীবনাদর্শের পটভূমিকায় নয়, তিনি বিচ্ছিন্নভাবেই দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন। আপনার ধর্ম পালন করিতে না পারিলে মানুষকে শাস্তি পাইতেই হয়, সেই শাস্তির নামই ব্রহ্মশাপ—প্রবন্ধটি উপসংহারে বিবৃত শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তে সাহিত্য-সমালোচনার সৌন্দর্যদৃষ্টির পরিবর্তে নীতি-প্রবণতাই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটির বক্তব্য অনুধাবন করিয়া আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটির প্রতিক্রিয়ায়ই ইহা রচিত। তিনি সঙ্গত ভাবেই মিরান্দা ও শকুন্তলার বাহ্যসাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন নাই, কারণ উভয়ের মধ্যে অবস্থায়, ঘটনায়, প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভেদ; শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত, মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত, অনভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কালিদাস দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেমকে স্বভাবসৌন্দর্য হইতে মঙ্গলসৌন্দর্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক রসদৃষ্টিতে কবির এই জীবনের মূল্যবোধের পটভূমিকায়ই সমগ্রভাবে তাঁহার রচনাকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন বলিয়াই দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্রটির পরিণতির সৌন্দর্য এমন অভ্রান্তভাবে আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কালিদাস যে ভাবে মানুষ ও প্রকৃতির স্বভাব ও ধর্মের মিলনে, মর্ত্য ও স্বর্গের, সৌন্দর্য ও কল্যাণের

স্বাধীবন্ধনে তাঁহার কাব্যে মঙ্গলমাধুর্যশিক্ত বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, রসোপলব্ধির গভীরতায়, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট কালিদাসের কাব্যকলার সেই সৃষ্টিগৌরবকে সার্থকভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। শকুন্তলা নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে শান্তি সৌন্দর্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার সহিত অন্তর্গূঢ় সামঞ্জস্যে কাব্যসৌন্দর্যেরই প্রয়োজনে দুর্বাসার শাপ যেভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, নিপুণ ভাবেই তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মর্মসন্ধানী সাহিত্য-সমালোচনায়ই দুঃখের তপস্যায় শুদ্ধ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্রের বিকাশের সৌন্দর্য যথাযথ ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণের আংশিকতা এবং চন্দ্রনাথ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নীতি-প্রবণ আলোচনার সংকীর্ণতার তুলনায় প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্যের মর্মোদ্ঘাটনে রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির গভীরতা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের রসোপলব্ধির মহিমা এবং তাহার প্রকাশভঙ্গির ঐশ্বর্যে তাঁহার প্রবন্ধটি কালিদাসের রচনার সার্থক পরিচিতি হওয়ার সঙ্গে উহা একটি মৌলিক সৌন্দর্যসৃষ্টিও হইয়া উঠিয়াছে। আমরা একদিকে যেমন তাঁহার প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রাচীন সাহিত্যে বিধৃত ভারতবর্ষের সেই কল্যাণসুরভিত জীবনের স্নিগ্ধশ্রী নূতন ভাবে আবিষ্কার করিয়া নির্মল স্নানের শুচিতাকে অনুভব করি, অপরদিকে তেমনি তাঁহার রচনাসৌন্দর্যের হীরকদীপ্তিতে মুগ্ধ হই। রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলার বিশিষ্ট গৌরব এইখানেই।

অবশ্য সাধারণ এবং ব্যাপক ভাবে বিচার করিলে দৃষ্টিভঙ্গি এবং আলোচনা-পদ্ধতির পার্থক্য সত্ত্বেও শকুন্তলা-বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধের মধ্যে একটি ভাগবত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যে জীবনে যে মঙ্গলধর্মের অনুবর্তন চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

আষাঢ়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার-সংক্ষেপ ঃ

ব্যবহারের পার্থক্যের জন্য মানুষের বর্ণবিভেদ অনুযায়ী ঋতুগুলিকেও শ্রেণী চিহ্নিত করিয়া লওয়া যায়। প্রখর রৌদ্রতাপ ও শুষ্কতার জন্য গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। মুহুর্মুহু বজ্রনির্ঘোষে, বিদ্যুৎস্ফুরণে আর বরুণ-বাণবর্ষণে বর্ষা ক্ষত্রিয়রূপেই প্রতিভাত হয়। শস্যসঞ্চয়ের কাল শীতকে বৈশ্য বলা যায়। আর শরৎ ও বসন্ত বর্ণে শূদ্র, একজন শীতের, অপরজন গ্রীষ্মের আবির্ভাবকে প্রস্তুত করিয়া রাখে। প্রকৃতিতে যেখানে সেবা সেইখানেই ঐশ্বর্য বলিয়া শরৎ এবং বসন্তের এই বিচিত্র শোভার সমারোহ লক্ষ্য করা যায়। এই হিসাবে একটি ঋতু বাদ পড়িয়া গেল, হেমন্ত। উহাকেও বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, বসন্ত ও গ্রীষ্মে ফলের।

এই ঋতুগুলির মধ্যে বর্ষা তাহার স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট, তাহার সহিত মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনের কোনও সম্পর্ক নাই। নিষ্প্রয়োজনের ঋতু বলিয়াই বর্ষা বিশেষভাবে কবির ঋতু, বর্ষার কর্মহীন অবকাশেই মানুষের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পায়। যে শিল্পকলায় মানুষের নিভৃততম হৃদয়টি অবাধে উন্মুক্ত হয়, তাহা হইতেছে সঙ্গীত। ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার এবং বসন্তের আছে। আর বর্ষার সুরই সংখ্যায় বেশি। ইহা হইতেই বর্ষার সহিত মানুষের হৃদয়ের আত্মীয়তা বুঝিতে পারি। কর্মের প্রয়োজনে মানুষ আড়ষ্ট থাকে, অবকাশেই তাহার হৃদয় পরম চরিতার্থতার স্বাদ পায়। অবকাশের শূন্যতায়, বিরতিতেই মানুষের ভাষা ইঙ্গিতময়, কবিতার ছন্দ সুরময় এবং বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য প্রাণময় হইয়া উঠে। একমাত্র বর্ষাই মানুষের জীবনে সেই কর্মহীন অবকাশের মুক্তিকে বহন করিয়া আনে, সেই কারণেই যুগে যুগে কর্মের বিষয়বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত মানুষের গভীরতম হৃদয়ে বর্ষার এই চিরকালীন প্রতিষ্ঠা।

রচনাপরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা :

আষাঢ় প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র-প্রবন্ধের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর গদ্য বিষয়গৌরব অপেক্ষা প্রকাশভঙ্গির মাহাত্ম্যেই আমাদের নিকট আকর্ষণীয়, এইগুলিই বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনা। বিচিত্র প্রবন্ধে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলি ইহার সার্থক উদাহরণ। বিচিত্র প্রবন্ধের 'বাজে কথা' প্রবন্ধটির এই অংশে তাঁহার এই শ্রেণীর রচনার স্বরূপধর্ম প্রতিফলিত হইয়াছে : 'বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে-পথে আপনার গো-যান টানিয়া আনে, সে-পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।' এই রচনাগুলিতে—'যুক্তিবাদ ও তথ্যালোচনার পরিবর্তে কবির একটি বিশেষ ভাবানুভূতি, ধ্যান-দৃষ্টির একটি অতর্কিত উৎক্ষেপ, স্বপ্নাতুর কল্পনার একটি বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই রচনাগুলি সম্পূর্ণরূপে মন্ময় ও আবেগধর্মী। ইহাদের ক্ষেত্রে গদ্যপদ্যের সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' (শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই জাতীয় প্রবন্ধকে 'ভাবস্থ রচনা' আখ্যা দিয়া বলিয়াছেন : 'এই ভাবস্থ রচনার পশ্চাতে থাকে লেখকের একটা বিশেষ মানসিক অবস্থান এবং তাহার ভিতর দিয়াই জাগে একটা বিশেষ ভাবদৃষ্টি। মজা এই, এই বিশেষ ভাবদৃষ্টির ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ লাভ করে লেখকের ভিতরকার সহজ মানুষটি। এই ভাবদৃষ্টি আপনার ভিতরে আপনি যখন একান্ত অনির্বচনীয় হইয়া ওঠে তখন প্রকাশের জন্য সে সঙ্গীতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তখনই সে রূপ গ্রহণ করে লিরিক কবিতার ; আর ভাবনার দোলায় স্থিরবদ্ধ ভাবটি যখন নিজেকে একটু একটু করিয়া চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে থাকে তখনই সৃষ্টি হয় এই জাতীয় রচনার। লিরিক কবিতার সহিত এই জাতীয় রচনার আকৃতিগত ভেদ যতই থাকুক, প্রকৃতিগত ভেদ বিলক্ষণ নহে। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই এই ভাবের সহিত ভাবনা। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি স্থানে স্থানে তাঁহার লিরিক কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।'

প্রকৃতিরসিক রবীন্দ্রনাথের নিকট বর্ষা ঋতুই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, ইহার

সহিতই কবিহৃদয়ের যোগ সুনিবিড়। এই ঋতুতেই কবিহৃদয়ের স্বপ্নাভিসার প্রবণতা তাহার উপযুক্ত পটভূমি খুঁজিয়া পায়। বর্ষা-ঋতুর কাব্য বলিয়াই কালিদাসের মেঘদূত ছিল তাঁহার নিকট এত প্রিয়। বর্ষার দিনে, মেঘদূত (মানসী), সোনার তরী (সোনার তরী), মেঘদূত (চৈতালি), বর্ষামঙ্গল (কল্পনা), আষাঢ়, নববর্ষা (ক্ষণিকা), বর্ষার রূপ (গীতাঞ্জলি), প্রভৃতি কবিতায় কবির নিসর্গ চেতনায় বর্ষা যে কী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেকাধ্বনি, নববর্ষা, শ্রাবণ সন্ধ্যা প্রভৃতি রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বর্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহার হৃদয়ের প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। এই সকল রচনায়ও কোথায়ও বর্ষার সৌন্দর্যোপলব্ধি ও সৌন্দর্যচিত্রের সহিত এই ঋতু-সম্পর্কিত কবির বিচিত্র ভাবনা প্রকাশিত হইয়াছে, কোথায়ও বা বর্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির ভাবনাই প্রাধান্য পাইয়াছে, যেমন 'আষাঢ়' প্রবন্ধটিতে।

'আষাঢ়' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ বর্ষার বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যগত পরিচয় নিতে চাহেন নাই, এই ঋতুর বিচিত্র সৌন্দর্য তাঁহার মনে যে ভাবনা উদ্রিক্ত করিয়াছে, তিনি তাহারই একটি বাণীমূর্তি রচনা করিয়াছেন। বর্ষা কর্মহীনতার ঋতু, বর্ষার অনুকূল পরিবেশেই প্রয়োজনের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া মানুষের মন বিস্তারের আনন্দে চরিতার্থ হয়, সে ভাবনার পথ বাহিয়া কবি মানুষের জীবনে অবকাশের রহস্যময় সুদূরপ্রসারী প্রভাবের উপলব্ধিতে ধ্যানতন্ময় হইয়াছেন। সুচয়িত উপমায়, এক একটি চিত্রের বর্ণসৌন্দর্যে, বর্ণনার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় শব্দলালিত্যে সেই ধ্যাননিবিড়তা 'আষাঢ়'-এ গীতিকবিতার রসনিটোল সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা

অনু ১—১৫ঃ বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে—বর্ণের এক অর্থ হইল, গুণ এবং কর্মের যোগে যাহা গ্রহণ করা যায়; যাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি জাতি (caste) রূপে বিভৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে বর্ণকে শ্বেত, পীত, নীল ইত্যাদি বর্ণ (রঙ) রূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, এক এক ঋতুর বর্ণ এক এক রকম, কিন্তু এই বর্ণগত পার্থক্য ছাড়া

পূর্বকালে যেমন বৃত্তি বা কর্ম অনুযায়ী বর্ণ বা জাতিভেদ হইত, তেমনি জাতিগুলির কর্মগত পার্থক্যও আছে।

বর্ণসঙ্কর—বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি জাতির) মিশ্রণ (সঙ্কর), মিশ্রজাতি, দুই ভিন্নবর্ণের স্ত্রী পুরুষের মিলনে যে বর্ণের উৎপত্তি হয়। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বর্ণের (রঙ) মিশ্রণ অর্থে শব্দটিকে প্রয়োগ করিয়াছেন।

সাবিত্রী মন্ত্র—সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (সাবিত্রী), তাঁহার আরাধনা-মন্ত্র।

ক্ষত্রিয়—দ্বিতীয় বর্ণ, যুদ্ধ, রাজ্য পালন ইত্যাদি ছিল এই জাতির আচরণীয় ধর্ম।

তমালতালী বনরাজী—কালিদাসের রঘুবংশম্-এর ত্রয়োদশ সর্গের পঞ্চদশ শ্লোকের একটি অংশ। রামচন্দ্র এখানে সীতার নিকট প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইল :

দূরাদয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী তমাল-তালীবনরাজী-নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

তমাল ও তালবনমালায় বেলাভূমি নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অতিদূরে নিতান্ত ক্ষীণরেখার ন্যায় প্রতীয়মান লবণাম্বুরাশির বলয়াকার তীরভূমি দেখা যাইতেছে।

রথের ঘর্ঘরধ্বনি—মেঘগর্জন।

বাঁকা তলোয়ারখানা—বঙ্কিম বিদ্যুৎস্ফুরণ।

কিংখাব—ঘন রেশমী বস্ত্র, যাহাতে সোনার তারের ফুল, কলকা ইত্যাদি কাটা থাকে।

পূর্বদিগ্‌বধূ—অষ্টদিকের অধিবাসিনীরূপে অষ্ট দিব্যাঙ্গনা কল্পনা করা হয়। বর্ষাকালে পূর্বদিক হইতে প্রবল বাতাস বহে বলিয়া কবি কল্পনা করিয়াছেন, পূর্বদিকবধূ যেন বন্দিনী অবস্থায় কেতকীফুলের গন্ধপূর্ণ জলসিক্ত পাখার বাতাসে ক্ষত্রিয়যোদ্ধারূপ বর্ষার পরিচর্যায় নিযুক্ত।

বীজন—বাতাস দেওয়া।

বৈশ্য—তৃতীয় বর্ণ, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, পশুপালনই ছিল উহাদের নির্দিষ্ট বৃত্তি।

শূদ্র—চতুর্থ বর্ণ, সমাজের সর্বনিম্নে এই বর্ণের ব্যক্তিদের স্থান ছিল, উচ্চ বর্ণের সেবায় ইহাদের ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে হইত।

নক্সা—পত্রাকার নক্শা।

টিদার—যেখানে বুটি অর্থাৎ সূচে তোলা ফুল আছে।

রত্তের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কলকা—শরৎকালের নীল আকাশ রৌদ্রালোকে সোনার মত ঝল্মল্ করিতে থাকে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, শরৎ যেন তাহার মাথায় সোনার নক্শা-কাটা পাগড়ি পরিয়া আবির্ভূত হয়।

বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা—বসন্তকালের পীতাভ বর্ণ এবং অজস্র ফুলের জন্য লেখক কল্পনা করিয়াছেন, বসন্ত যেন সুগন্ধ পীত এবং ফুলখচিত চাদর পরিয়া আসে।

ইহারা যে পাদুকা পরিয়া ধরণীপথে বিচরণ করে তাহা রঙবেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার—শরৎ এবং বসন্তে বিভিন্ন বর্ণের ফুলে মৃত্তিকা আকীর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, এই দুই ঋতু যেন বুটিদার অর্থাৎ সূচে তোলা ফুলযুক্ত জুতা পরিয়া বিচরণ করে।

অঙ্গদ—কেয়ূর বাজু ইত্যাদি বাহুতে পরিধানযোগ্য অলংকারবিশেষ।

কুণ্ডল—কর্ণাভরণ, বা করভূষণ, বলয়।

সমাজের নীচের বড়ো ভিত্তি ঐ বৈশ্য—কৃষক, বণিক ও পশুপালকেরা ছিল বৈশ্যবর্ণভুক্ত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের নীচস্থ এই বর্ণের ক্রিয়াকর্মে সামাজিক জীবনযাত্রার অধিকাংশ প্রয়োজনই নির্বাহ হইত।

একদিন পরলা আষাঢ়ে…অনুসরণ করিয়াছে—বিক্রমাদিত্যের রাজ্য মালবদেশের প্রাচীন নাম উজ্জয়িনী, কালিদাস তাহারই অধিবাসী ছিলেন। এখানে তাঁহার মেঘদূতের কাহিনী স্মরণ করা হইয়াছে। মর্ত্যের রামগিরিতে নির্বাসিত যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম মেঘকে তাহার দূত হইয়া নিজের প্রেয়সীর নিকটে বাণী বহন করিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিল; সেই মেঘ কি ভাবে মর্ত্য পরিভ্রমণ করিয়া রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্য হইতে কৈলাসে উপনীত হইবে তাহাই সে বর্ণনা করিয়াছে। কৈলাসপর্বতেই কুবেরের নগর অলকাপুরী স্থাপিত।

ব্যাকরণে হৃদয়…তাহাতে সন্দেহ নাই—ব্যাকরণে যে সকল শব্দকে পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গরূপে নির্দিষ্ট করা হয়; তাহাদের সকলের মধ্যেই যে লিঙ্গানুযায়ী স্বভাবধর্ম প্রকাশ পায় তাহা নয়। ব্যাকরণে হৃদয়কে হয়ত

পুংলিঙ্গরূপে বিশেষিত করা হইবে, কিন্তু প্রবণতা, স্বভাবধর্মের দিক দিয়া সে স্ত্রী জাতীয়, অবগুণ্ঠনবতীর মতই পর্দানশিন, অর্থাৎ নির্জনতাপ্রিয়, নিভৃতচারী।

অনু ১৬—২৯ঃ—পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট—গভর্ণমেন্টের যে বিভাগের অধীনে রাস্তাঘাট সেতু নির্মাণ-রক্ষণ ইত্যাদি কাজ করা হয়।

যে রসের উত্তেজনা—ভোজন রসের।

মুজরা—আরবী শব্দ, নৃত্যগীতের পরীক্ষা বা প্রদর্শন।

ঊনপঞ্চাশ বায়ু—পুরাণে বলা হয়, বায়ু যখন দিতির গর্ভে ছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাঁহাকে সাতভাগে (আবহ, প্রবহ, সম্বহ, নিবহ, উদ্বহ, বিবহ ও পরিবহ) বিভক্ত করেন; তাহাতে গর্ভস্থ বালক রোদন করিতে থাকিলে ইন্দ্র আবার সাত খণ্ডকে সাতভাগে বিভক্ত করেন এবং এইভাবে ঊনপঞ্চাশ বায়ুর উদ্ভব হয়। ঊনপঞ্চাশ বায়ু একত্রিত হইলে উন্মত্ততার সৃষ্টি হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

ইহাদের পরিচয় তাদ্ধতপ্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে—শব্দের উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে সকল প্রত্যয়যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ গঠিত হয়, তাহাদিগকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন মনুর অপত্য, এই অর্থে মনু শব্দটির সহিত ষ্ণ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ মানব হইয়াছে। কিন্তু শব্দের এই ব্যাকরণগত অর্থই তাহার সমস্ত কিছু নয়; ইহার ফাঁকে যে ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ছড়াইয়া থাকে, তাহাতেই মানুষের চিত্তের প্রত্যয় অর্থাৎ বিশ্বাস উপলব্ধি প্রকাশিত হয়, মানবমনের সেই পরিচিতিতেই শব্দের সত্যকারের মূল্য।

তাণ্ডব নৃত্য—শিবের নৃত্য, উদ্দাম নৃত্য।

মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দ—সপ্তদশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দ, যাহার প্রথম চতুর্থ দশম একাদশ ত্রয়োদশ পঞ্চদশ ষোড়শ সপ্তদশ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট সকল বর্ণ লঘু। দীর্ঘবিলম্বিত এই তালের ছন্দেই কালিদাস মেঘদূত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

আষাঢ়ে—কাল্পনিক কাহিনী, মিথ্যা কথা। আষাঢ় মাসের দিনগুলি দীর্ঘ এবং বৃষ্টি-বাদলে বাহিরে যাইবারও বিশেষ উপায় থাকে না বলিয়া অদ্ভুত ও আনন্দজনক গল্প শুনিয়া পূর্বে লোকে দিন কাটাইত, ইহা হইতেই

কাল্পনিক, অর্থহীন, অবসর-বিনোদনের গালগল্প বুঝাইতে 'আষাঢ়ে' উৎপন্ন হইয়াছে।

মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণমঞ্জীরমুখর—আষাঢ়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং এই মাসের দিনরাত্রি অবিরাম বর্ষণমুখরিত থাকে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, মেঘ যেন আষাঢ়ের অবগুণ্ঠন, এবং বর্ষণ তাহার মঞ্জীর অর্থাৎ নূপুর।

বাজে কথার অমৃত—বৈষয়িক প্রয়োজনের কথায় মানুষের হৃদয় তৃপ্ত হয় না। নিষ্প্রয়োজনের বাজে কথাতেই হৃদয়ের সত্যকারের আবেগ স্বতঃ উৎসারিত হয় বলিয়া উহা মানুষকে আনন্দদান করে; বাজে কথার সেই অমৃত অর্থাৎ আনন্দের ঐশ্বর্যের কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র-প্রবন্ধের' 'বাজে কথা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়, কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। যেমনি বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।···এক একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো অকারণ ঝলমল করিতেপারে। যে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে তাহার কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারও থাকে না—সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ।'

আলোল—ঈষৎ লোল অর্থাৎ চঞ্চল।

নীলকান্তমণির পেয়ালা—নীল আকাশ নীলমণির পেয়ালারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আষাঢ়ের মেঘে আকাশ ভরিয়া যায়, তাই কবি বলিয়াছেন, সে এই পেয়ালা ভরিবার ভার লয়।

জাতী পুষ্প—মালতী ফুল।

ব্যাখ্যা

প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা···সেইখানেই গৌরব।

(অনু ৫)

উপরি উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়' শীর্ষক রচনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কর্ম অনুযায়ী ঋতুদের বর্ণবিভাগ করিতে গিয়া লেখক এই উক্তিটি করিয়াছেন।

বৃত্তি অনুযায়ী ঋতুদের শ্রেণীবিভাগ করিলে শরৎ ও বসন্তকে শূদ্র বা দাসরূপে চিহ্নিত করা যায়, কারণ একটি শীতের,অপরটি গ্রীষ্মের আবির্ভাবের সূচনা বহন করিয়া আনে। মানুষের সমাজে পরিচর্যার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত, তাহাদের কোনও গৌরব নাই, ক্ষুদ্রতার গ্লানি তাহাদেরই অনুভব করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে যেখানে সেবার ভার অর্পিত হয়, সেইখানেই সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে; যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। প্রকৃতির রাজত্বে যে শূদ্র তাহাকে ক্ষুদ্রতার অসম্মানে লাঞ্ছিত হইতে হয় না, সেবার ভার যে বহন করে সমস্ত ঐশ্বর্যের আভরণ তাহারই প্রাপ্য। সেই-জন্যই রৌদ্রস্নাত নীল আকাশের স্বর্ণোজ্জ্বলতায়, বিচিত্রবর্ণের পুষ্প সমারোহে শরৎ ও বসন্তের ঐশ্বর্যদীপ্ত সজ্জা আমরা লক্ষ্য করি। মানুষের সমাজের সঙ্গে অরূপণ প্রকৃতির রাজ্যের পার্থক্য এইখানেই।

বিশ্বসভায় অমিল-শয়তানটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। (অনু ৬)

বর্ণ বিভেদ অনুযায়ী পাঁচটি ঋতুকে চিহ্নিত করিবার পর হেমন্ত ঋতু বাদ পড়িয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি প্রকাশ করেন।

লেখক গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ, বর্ষাকে ক্ষত্রিয়, শীতকে বৈশ্য এবং শরৎ ও বসন্তকে শূদ্র বলিয়াছেন। ইহাতে পাঁচটি ঋতুর হিসাব পাওয়া গেল, কিন্তু জনসমাজে ছয়টি ঋতুর গণনাই প্রচলিত। তাঁহার মতে, উহা নিতান্তই জোড় মিলাইবার জন্য। জগতে সমস্ত কিছু যদি নিখুঁতভাবে মিলিয়া যাইত তবে সেই গতানুগতিকায় নিশ্চিত প্রত্যাশার জড়তায় ও আলস্যে, অভ্যাসের পুনরাবৃত্তিতে মানুষ বৈচিত্র্যের কোনও স্বাদ পাইত না। মানুষের সেই অলস মিলের স্বর্গকে সজাগ রাখিবার জন্যই অমিলরূপ শয়তান কাজ করিয়া চলে। নৃত্যপরা উর্বশীর নূপুরের তাল মধ্যে মধ্যে কাটিয়া যায়, সেই অমিল, বেতালকে আয়ত্ত করিবার সময়ই দেবসভায় তালের রসানুভূতি উদ্বেলিত হইয়া উঠে। অমিলের জন্যই মিলের সৌন্দর্য তাহার সমস্ত বৈচিত্র্যে অনুভূত হয়, অমিল মিলের সৌন্দর্যকেই সচল ও সজীব রাখে।

সঙ্গীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত। (অনু ২০)

(ক. বি. ১৯৬২)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। নিষ্প্রয়োজনের ঋতু বলিয়াই যে সঙ্গীতের পটভূমি রূপে বর্ষার প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক, আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথ তাহাই নির্দেশ

করিয়াছেন। নিষ্প্রয়োজনেই মানুষের 'সকল নিভৃতচারী আবেগ অনুভূতি সুরে ছন্দে আত্মপ্রকাশের চরিতার্থতা লাভ করে, বৈষয়িক জীবনের স্থূল প্রয়োজনগুলির সংকীর্ণ গণ্ডিতে তাহার হৃদয় ছাড়া পায় না। বর্ষা নিষ্প্রয়োজনের ঋতু বলিয়াই মানুষ বহু রাগরাগিণীতে ইহাকে তাহার হৃদয়ে আবাহন করিয়া লইতে পারিয়াছে। শরৎ হেমন্ত শীতে শস্য কর্তন, শস্য সঞ্চয় প্রভৃতি বহুবিধ কর্মের আয়োজন চলে, এই প্রয়োজনের পরিবেশে মানব-হৃদয়ের মর্মকোষের মধুসিঞ্চিত রাগরাগিণী উৎসারিত হইতে পারে না; তাই রাগিণীতে শরৎ-হেমন্তের প্রকাশ নাই। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার; কিন্তু বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ এবং আরও কত রাগ-রাগিণী। সুতরাং সংগীতের মহলে বর্ষার প্রতিই সর্বাধিক পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, সেখানে ভোট লইলে নিঃসন্দেহে বর্ষাই জয়ী হয়।

মানুষের যে অতি-চৈতন্যলোকে…তাহাদের বিহার। (অনু২৩)

মানুষের জীবনে অবকাশের গভীর প্রভাবের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন।

প্রয়োজনে, বস্তুর কারবারে মানুষের হৃদয় মুক্তি পায় না, সেইখানে সে আবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। পৃথিবীর মাটিতেই মানুষের সমস্ত প্রয়োজন নির্বাহ হয়, কিন্তু হৃদয়ের বিহারের জন্য চাই আকাশ, তাহার বিরাট শূন্যতা; ধূপের সুরভিত ধোঁয়ার মত তাহার সঙ্গীত সেইখানেই ছড়াইয়া পড়ে। মানুষের মনের চারিদিকেও একটি বিশাল অবকাশের আকাশ আছে, সেইখানে হৃদয়-নিষ্পেষণকারী কর্মের সমস্ত বোঝা হইতে তাহার মুক্তি, অনন্তের স্বাদ। কর্মের হিসাব-নিকাশের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মানুষের গভীরতম চেতনা বিচিত্র নিগূঢ় ভাব-কল্পনায় স্বপ্নে আবেগ অনুভূতিতে উদ্বেলিত হইতে চায়। চিত্তের অনির্দেশ্য ব্যাকুলতায় যাহারা বিরাটের, অনন্তের রহস্যময় অভাবনীয় লীলা অনুভব করিতে চায়, অবকাশের অনুকূল পরিবেশেই তাহাদের মানস-বিহারের সুযোগ মেলে। তাই তাহারা পৃথিবীর মাটিতে অর্থাৎ তাহার প্রয়োজনকে স্বীকার করে বটে, কিন্তু অবকাশকেই হৃদয়ে বরণ করিয়া লয়।

বুদ্ধির দরকার গণ্ডিতে……নৃত্যে। (অনু ২৪)

রবীন্দ্রনাথ মানবহৃদয়ের সহিত অবকাশের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া এই উক্তিটি করিয়াছেন।

মানুষের হৃদয়ের গভীরতর আকুতির চরিতার্থতার জন্য তাহার প্রকাশ চাই, অবকাশই সেই প্রকাশের সুযোগ আনিয়া দেয়। বুদ্ধির প্রয়োজন গতিতে, কর্মের বিরতিহীন চক্রাবর্তনে। গতির লক্ষ্য হইল একাগ্র হইয়া লাভ করা, সেই উপযোগিতায়ই বুদ্ধির সন্তুষ্টি। কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করাই নৃত্যের লক্ষ্য, নৃত্যের ছন্দেই ময়ূরের কলাপ-বিস্তারের মত হৃদয় বিকশিত হয়। বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করাই ত নৃত্যের লক্ষ্য। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায়, সেখানে একটি পথরেখা ধরিয়া কেবল নিজের প্রয়োজনের অনুবর্তনে পদচারণেই কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। যে ছন্দোময় সৌন্দর্যের প্রকাশ নৃত্যের লক্ষ্য, তাহার জন্য চারিদিকে অবকাশ চাই। সেইজন্যই অবকাশের জন্য হৃদয়ের তৃষ্ণা এত গভীর।

সমস্ত ছন্দের ভাবটাই……নিয়মিত করে। (অনু ২৪)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অবকাশতত্ত্বের একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে আলোচ্য অংশে ছন্দে যতির ভূমিকা নির্ধারণ করিয়াছেন।

যতিকে ইংরেজিতে pause বলা হয়, কিন্তু pause শব্দে একটি অভাব সূচিত হয়, যতি সেই অভাব নয়; উহাকে নিছক বিরতি বা ছেদ বলা যায় না। কবিতায় এক ধরনের বিরাম গ্রহণের প্রয়োজন হয়; তাহারই উপর নির্ভর করিয়াই ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে, কবিতার এইরূপ বিরামকে যতি বলা হয়। এক নিঃশ্বাসে বাগ্‌যন্ত্র যতখানি উচ্চারণ করিতে পারে, তাহার পরই যতি পড়ে। সুতরাং এই অংশটি শূন্য, কিন্তু ছন্দের প্রাণ এখানেই, পৃথিবীর প্রাণ যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। যতিতে ছন্দ শেষ হয় না, যতি তাহাকে নিয়মিত করিয়া তাহার ধ্বনিগত ঐশ্বর্যকে প্রকাশিত করে। যতির শূন্যস্থানগুলিতে থামিতে হয় বলিয়াই ছন্দের সুরমাধুর্য সৃষ্ট হয়; উহার ধ্বনি তরঙ্গের সমস্ত প্রাণ-বৈশিষ্ট্য যতির মধ্যেই নিহিত।

এই বিপুল বিচ্ছেদের……যত কিছু লীলাখেলা। (অনু ২৬)

যেখানে অবকাশ যতি—সেখানেই বিশ্বের প্রাণের পূর্ণতা, তাহা পরিস্ফুট করিতে গিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন।

যতিতে যেমন ছন্দ সুরময় হইয়া উঠে, তেমনি বিশ্বরচনায় যেখানে যত অবকাশের বিরাম, শূন্যতা আছে, সেইখানেই নিখিল প্রাণ তাহার সমস্ত ঐশ্বর্যে স্পন্দিত। বস্তু শূন্যতারই লীলা। অণু-পরমাণুর ছিদ্রগুলির শূন্যতাই বস্তুকে আকার, গতি এবং প্রাণ দেয়। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, মহাযতিরই পরিচিতি মাত্র। যতিকে অবলম্বন করিয়াই যেমন কবিতার পংক্তির বিভিন্ন অংশ ছন্দের সুরতরঙ্গ বাঁধা পড়ে, সেইরূপ এই সর্বব্যাপ্ত শূন্যতার মধ্য দিয়াই অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের—জগতের সমস্ত কিছুর যোগসাধন সম্ভব হইতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি নিরেট বস্তুতে ভরিয়া যাইত, তবে এই নিগূঢ় শৃঙ্খলার ঐক্যের ছন্দ আমরা কিছুতেই পাইতাম না। মানুষও তাহার কর্মে, প্রয়োজনের সকল সম্পর্কে, একেবারে লিপ্ত হইয়া পড়ে না এবং তাহাকেও সেই বিচ্ছেদের, বন্ধনহীনতার মধ্যে থাকিতে হয় বলিয়া শক্তিতে, জ্ঞানে, প্রেমে, অসাধারণত্বের বিচিত্র লীলায় মানুষ বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। তাহার চতুর্দিকে যদি অবকাশের শূন্যতা না থাকিত, বস্তুজগৎ যদি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিত, তবে মানুষের কোনও মহিমাই প্রকাশিত হইতে পারিত না।

মৃত্যু আর কিছু নহে······তখন তাহাই মৃত্যু। (অনু ২৭)

আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথ বস্তুজগতের অবকাশের ভূমিকা নির্ণয় করিয়াছেন। অবকাশের যতি বা শূন্যতা আছে বলিয়াই অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের যোগসাধন সম্ভব হইতেছে। সেই শূন্যতায়ই বস্তুজগতের প্রাণ প্রবহমাণ, বস্তুগুলি তাহারই অবিশ্রান্ত লীলা। বিরাট আকাশের শূন্যতায়ই পৃথিবী ও নক্ষত্রের সূর্য প্রদক্ষিণের ছন্দ ফুটিয়া উঠে। অণু পরমাণুগুলির মধ্যে যে সকল ছিদ্র আছে, তাহাদের সেই শূন্যতাই উহাদিগকে আকার, গতি, প্রাণ দেয়। সুতরাং প্রাণ সেই মহা-অবকাশ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে আপনি অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে। বস্তু যখন এই অন্তর্নিহিত অবকাশের যতিকে হারায়, তখনই তাহার মৃত্যু ঘটে। সেই শূন্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বস্তু কেবল নিরেট জড়পিণ্ড মাত্র, সে তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তাহার বেশী নহে।

বস্তুবাদীরা মনে করে......তাহাকে গতি দেয়। (অনু ২৮)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

যাঁহারা বৈষয়িক প্রয়োজনের গণ্ডিতেই পৃথিবীর সমস্তকিছুকে সীমিত করিতে চাহেন, সেই বস্তুবাদীরা অবকাশকে কোন গুরুত্ব দিতে চাহেন না। তাঁহাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে মনে হয়, কর্মহীন বিরতিতে অবকাশ নিশ্চল, গতি-হীনতাই তাহার লক্ষণ। অবকাশের মর্মার্থ তাঁহাদের নিকট অনুদ্ঘাটিত। কিন্তু যাঁহারা অবকাশের রসিক তাঁহারা জানেন, অবকাশের শূন্যতাই বস্তুজগৎকে সচল করিয়া রাখে। ছন্দের পংক্তিগুলিতে যদি যতির ফাঁক না থাকিত, তবে শব্দগুলিকে নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের সমষ্টি বলিয়া বোধ হইত; যতিতে আসিয়া আমাদের থামিতে হয় বলিয়াই তাহারা ছন্দের হিল্লোলে প্রাণময় ও গতিময় হইয়া উঠে। সেইরূপে অবকাশেই প্রাণের গতি সৃষ্ট হয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যদের অবকাশ নাই, তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহ রচনা করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু যে সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে অটুট স্তব্ধতায় নিরীক্ষণ করিতেছে, সৈন্যদলের গতিবেগ তাহার মধ্যেই নিহিত। যে বিরাট পুরুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতির উৎস, তিনি নিজে অবকাশের শূন্যতায় স্থির, নিশ্চল বলিয়াই নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, যুগপরিবর্তনে, তাঁহার দ্রুত গতিবেগ আমরা অনুভব করি।

প্রশ্নোত্তর

১। 'ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে'—উক্তিটির সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর ঃ গ্রীষ্মের বর্ণ পিঙ্গল, বর্ষার ধূসর, শরতের উজ্জ্বল নীল, শীত পীতাভ—বিভিন্ন ঋতুর এই বর্ণের পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। বৃত্তি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—মনুষ্য সমাজের এই যে বর্ণবিভেদ করা হয়, ঋতু-প্রকৃতির বিভিন্ন আচরণ অনুসারে ঋতুগুলির এইরূপ বৃত্তিভেদও লক্ষ্য করা যায়।

আমরা গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারি। তপস্যা, পৌরোহিত্য, কৃচ্ছ্রসাধন—চতুর্বর্ণের মধ্যে আদি ও প্রধান বর্ণ ব্রাহ্মণের ইহাই ছিল

আচরণীয় ধর্ম। তাহার রুক্ষতায় গুমট উত্তপ্ত পরিবেশ এবং উহার স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যখন ঝড় দেখা দেয় তাহার ভয়াবহতায়—ব্রাহ্মণের তপস্যাক্লিষ্ট ধ্যানগম্ভীর রূপ যেমন, তেমনি অভিশাপ দিবার সময় তাহার ক্রোধের আগ্নেয় রূপও অনুভূত হয়। মেঘ-নির্ঘোষে আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎস্ফুরণে বর্ষা ক্ষত্রিয় বীররূপেই আবির্ভূত হয়। যুদ্ধ, বীরধর্ম পালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি। দিগ্বিজয়ী ক্ষত্রিয় যোদ্ধার মতই সে সমস্ত আকাশ অধিকার করিয়া বসে, বনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে যে মেঘগর্জন ধ্বনিত হয় তাহা যেন তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি, তাহার বিদ্যুৎস্ফুরণে মনে হয়, সে যেন তাহার তরোয়ালটিকে কোষমুক্ত করিয়া বিদীর্ণ করিতেছে; আর অবিরাম বারিধারা তাহার তূণের অফুরন্ত বরুণবাণ। পৃথিবীর শ্যামল প্রান্তর তাহার সাজের কিংখাবের আস্তরণাবৃত পাদপীঠ, কদম্ব বৃক্ষের শ্যামল পত্ররাজি এই যোদ্ধার চন্দ্রাতপ, আর প্রস্ফুটিত কদম্বফুলগুলি যেন সোনার ঝালর। পূর্বদিকের জলসিক্ত বাতাসে এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণে মনে হয়, বন্দিনী পূর্বদিক্‌বধূ যেন বর্ষাকে কেতকীর গন্ধসুবাসিত জলসিক্ত পাখার বাতাস করিবার সময় বিদ্যুতের মতই উজ্জ্বল মণিখচিত তাহার কঙ্কণ ঝলকিয়া উঠিতেছে। • •

ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষিকার্য বৈশ্যের বৃত্তি। সকল সময়ে পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজন, চারিদিকে শস্যপ্রাচুর্যের আশ্বাস, প্রাঙ্গণে ধানভর্তি গোলা, গোষ্ঠে রোমন্থনরত গরুর পাল, ঘাটে ঘাটে বোঝাই নৌকা, পথে পথে ভার-মন্থর গাড়ি, ঘরের নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্যোগে মুখরিত ঢেঁকিশালা—শীতের এই রূপে ব্যবসায়ী বৃত্তিসুলভ সঞ্চয় ও কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায় বলিয়াই তাহাকে বৈশ্য বলা যায়। উচ্চবর্ণ বা জাতিদের দাসোচিত সেবাই ছিল শূদ্রের বৃত্তি। শরৎ ও বসন্তকে শূদ্র বলা যায়, প্রথম জন শীতের, দ্বিতীয় জন গ্রীষ্মের ভার বহন করিয়া আনে। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা, নম্রতা, সেখানেই গৌরব বলিয়া তাহার রাজত্বে যে শূদ্র সে ক্ষুদ্র নয়। তাই আকাশের উজ্জ্বল নীল বর্ণে এবং অজস্র ফুলের সমারোহে শরৎ ও বসন্তের সাজের বাহার। লেখকের এই হিসাবে হেমন্ত বাদ থাকিয়া গিয়াছে। তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে গণনা করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহাকে শরৎ বা শীতের দলেই ফেলা যায়।

ঋতুদের এই বৃত্তি বর্ণনায় গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের রূপবৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। গ্রীষ্মের, রুক্ষতার সহিত ব্রাহ্মণত্ব বেশ মিলিয়া যায়, বর্ষার মেঘগর্জন ও ধারাপাতে ক্ষত্রিয় যোদ্ধার লক্ষণগুলি পরিস্ফুট ; শীতের শস্যসম্ভার ও কর্মচাঞ্চল্যে বৈশ্যের বাণিজ্যবৃত্তিকে অনুভব করা যায়। কিন্তু শূদ্রত্বের সহিত শরৎ ও বসন্তের রূপ ঠিক সুসমঞ্জস বলিয়া বোধ হয় না। এই দুই ঋতুর রাজকীয় রূপই কবিতায় সংগীতে নন্দিত। প্রকৃতির রাজ্যে যেখানে সেবা সেখানেই সৌন্দর্য, এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও শরৎ ও বসন্তকে শূদ্ররূপে চিহ্নিত করিতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করি। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথ এখানে তথ্যগত যাথার্থ্যে ঋতুর বৃত্তিবর্ণনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন নাই। ইহা তাঁহার কবিকল্পনারই একটি অভিব্যক্তি, সুতরাং কল্পনানুভূতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই এই বর্ণনাকে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। ঋতু-বর্ণনা হিসাবে নয়, কবির কল্পনা-বৈচিত্র্যের প্রকাশ হিসাবেই ঋতুর এই পরিকল্পনা মূল্যবান ; যাহা অভাবনীয়, বিস্ময়কর, বাস্তব ধারণার বিরোধী, কবিকল্পনায় তাহাই অপরূপ, হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে শরৎ ও বসন্তের শূদ্র-উপমার একটি নিজস্ব সার্থকতা আছে সন্দেহ নাই।

২। 'এই নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এই জন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি'—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর এবং এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে কেন বিশেষ-ভাবে কবির ঋতু বলিয়াছেন তাহাও ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনের সকল হিসাব-নিকাশ মানুষের শুষ্ক বুদ্ধির বিষয়, মানুষের হৃদয় সেখানে উপবাসী, তৃষ্ণার্ত থাকে। প্রয়োজনের নিষ্পেষণে সে বন্দীশালার গ্লানি এবং ক্ষুদ্রতার যন্ত্রণা অনুভব করে। বৈষয়িক বুদ্ধি যাহাকে নিষ্প্রয়োজনীয়, মূল্যহীন, অপচয় বলিয়া রায় দেয়, মানুষের হৃদয় সেইখানেই মুক্তির স্বাদ অনুভব করিয়া এক পরম চরিতার্থতার আনন্দে তৃপ্ত ও ধন্য হয়। চাতক পাখীর তৃষ্ণা যেমন বিরাট আকাশের জল না হইলে মেটে না, তেমনি যাহা নিষ্প্রয়োজনীয়, ব্যবহারিক জীবনের সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত, তাহাতেই মানুষের চাতকহৃদয়ের তৃষ্ণা মেটে।

সেইজন্যই ফলের চেয়ে ফুলেই মানবহৃদয়ের তৃপ্তি। ফলের সহিত মানুষের রসনার লোভ এবং ক্ষুধার যে সম্বন্ধ আছে, তাহাতে হৃদয়ের কোনও আশ্রয় মেলে না। তাই আমরা দেখি, তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে রসনায় যে রসের উত্তেজনা জাগে, তাহাকে লইয়া গীতিকাব্য রচনা করা যায় না; সেটা অত্যন্ত বাস্তব, তাহার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহাকে টাকা আনা পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে। আর ওদিকে অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর এক-বেলায় ঝরিয়া যায়, তাহাদেরই বোঁটা হইতে পাতার ডগা পর্যন্ত এত অজস্র কারুকার্য হিসাবী বাস্তববুদ্ধির নিকট নিছক অপব্যয় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু হৃদয় তাহাদেরই অপরূপ সৌন্দর্যে অসীম অনন্তের উপলব্ধিতে চরিতার্থ হয়। বাস্তব জীবনের সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরেই, কিন্তু হৃদয়ের সংগীত শূন্যেই ছড়াইয়া পড়ে।

একমাত্র বর্ষা ছাড়া সমস্ত ঋতুরই সহিত অল্পবিস্তর পরিমাণে মানুষের প্রত্যক্ষ উপযোগিতার সম্বন্ধ আছে। গ্রীষ্মের ফলের ভাণ্ডার বা শীতের সঞ্চয়ের মত বর্ষার কোনও প্রয়োজনের আয়োজন, তাহার সহিত প্রত্যক্ষ-ভাবে মানুষের দেনাপাওনার সম্পর্ক নাই। বর্ষাঋতুতে ফলের চেষ্টা অল্প এবং তাহার সমস্ত বৈশিষ্ট্য কর্মের প্রতিকূল বলিয়াই এই ঋতুতে মানবহৃদয় প্রয়োজনের সংকীর্ণতা হইতে নিষ্প্রয়োজনের বিস্তীর্ণতাই অবাধে ছাড়া পায়। ব্যবহারিক জীবনের ভাবনাচিন্তায় লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশে আচ্ছন্ন হৃদয় এই ঋতুর বর্ষণমুখরিত কর্মহীন, অখণ্ড অবকাশের দিনরাত্রিগুলিতে সম্পূর্ণ-ভাবে উন্মোচিত হয় বলিয়াই বর্ষা বিশেষভাবে কবির ঋতু। হৃদয়ের যে সকল আবেগ অনুভূতি কবির উপজীব্য, বর্ষাই তাহার উপযুক্ত পটভূমি। বর্ষার অনুকূল পরিবেশে মানুষের হৃদয়ে যে অনির্দেশ্য ভাবব্যাকুলতা জাগে, সেই আকুতির সহিত ব্যবহারিক জীবনের কোনও সম্বন্ধ নাই; সেই কারণেই তাহা কবির কবিতায় সংগীতে ছন্দিত ও সুরঝংকৃত হইয়া উঠে। এই নিষ্প্রয়োজনের ঋতুর সহিত কবিচিত্তের যোগ তাই এত নিবিড়, ঘনিষ্ঠ। সেইজন্যই উজ্জয়িনীর কবি কালিদাস আষাঢ়ের মেঘে মেঘে, মর্ত্যে রামগিরি হইতে স্বর্গের অলকাপুরী পর্যন্ত মেঘের পর্যটনের অনুসরণে কুবের-নির্বাসিত বিরহী যক্ষের বেদনা যেমন অনুভব করিয়াছেন, তেমনি স্বর্গমর্ত্যের বিচিত্র

সৌন্দর্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ষায় হৃদয়ের সমস্ত বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই তখন বিরহিণীর নিকট হৃদয় আপনার সমস্ত নিভৃত বেদনার দাবি লইয়া উপস্থিত হয়। সংগীতেই মানুষের অন্তরতম বাণীটি স্বতোৎসারিত হয়, আর প্রয়োজনের বন্ধন হইতে মুক্ত বর্ষাঋতুরই রাগরাগিণী সর্বাপেক্ষা বেশি। বর্ষায়ই মানুষ তাহার হৃদয়ের মুক্তির নিষ্প্রয়োজনের ক্ষেত্রটিকে লাভ করে বলিয়াই এই ঋতুর সহিতই তাহার হৃদয়ের রাখীবন্ধন, সেইজন্যই তাহা বিশেষ ভাবেই কবির ঋতু।

৩। 'কবি মনে করেন যে, কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের শক্তির বিকাশ, কিন্তু কর্মহীনতার মধ্যেই বিকাশ মনুষ্যত্বের। আষাঢ় সেই কর্মহীন মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের সংসারের মধ্যে'—এই উক্তিটির পটভূমিকায় 'আষাঢ়' প্রবন্ধে বর্ষাঋতুকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনে অবকাশের মূল্য যেভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর ঃ বর্ষাই মানবজীবনে কর্মহীন অবসরের যথার্থ পরিবেশটি আনিয়া দেয়; সেই অবকাশেই মানবহৃদয় মুক্তি পায়; এই নিষ্প্রয়োজনের ঋতু অবকাশের মাধ্যমেই মানবহৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তোলে। বর্ষার সহিত অবকাশের সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের জন্যই রবীন্দ্রনাথ বর্ষার প্রাণবৈশিষ্ট্যের পরিচিতিতে মানবজীবনের অবকাশের প্রভাব তথা অবকাশ-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। বর্ষার প্রাণধর্মের প্রসঙ্গে যেমন অবকাশ-তত্ত্বটি সার্থক এবং অনিবার্য ভাবেই উত্থাপিত হইয়াছে, তেমনি তাহার আলোকে বর্ষার সৌন্দর্যের সার্থকতাটিও নূতনভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

মানুষকে যখন কর্মের প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া চলিতে হয়, তখন তাহার শক্তির বিকাশ ঘটে সত্য, কিন্তু তাহাই মানবজীবনের সত্যকারের ঐশ্বর্য নয়। বুদ্ধিবিবেচনার ক্ষেত্র কর্ম, কিন্তু কর্মের বৈষয়িক উপযোগিতায় হৃদয় চরিতার্থ হয় না, সে উপবাসী থাকে। কর্মহীন অবকাশেই মানুষ তাহার হৃদয়ের ধর্ম, তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের যথার্থ সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। অসীম অনন্তের লীলানুভূতিতে মানুষের মধ্যে যে গভীর চৈতন্যের বিকাশ হয়, তাহাই মানুষের মনুষ্যত্বের নিদান। সেই চৈতন্যের ঐশ্বর্যকে

যাহারা ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করে, কর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিলে তাহাদের চলে না; তাহাদের মুক্তির বিপুল অবকাশ পাইতেই হয়। অবকাশের শুদ্ধতায়ই তো মানুষ কর্মের প্রয়োজনসম্বন্ধ-শাসিত জীবনের দাসত্ব ও পীড়ন হইতে মুক্তি পাইয়া নিজের অন্তরতম সত্তাকে একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। তাহার জীবনের পূর্ণতা এইখানেই। রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি রচনায়ও এই বিষয়ে বলিয়াছেন, 'হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে।'

মানুষের ভাষার দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহা হইলে দেখি, শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। কিন্তু নিছক অর্থের প্রয়োজনেই কোনও কোনও শব্দ নিঃশেষিত হইয়া যায় না, তাহাদের অর্থপিণ্ডের চারিদিকে একটা অবকাশ আছে; অর্থের উচ্চকণ্ঠের ঘোষণার পরিবর্তে সেই অবকাশের আভাসে-ইঙ্গিতে শব্দ সুরময় হইয়া উঠে। কবিরা তাঁহাদের রচনায় শব্দের এই অবকাশ বা অব্যক্ত অংশগুলিকে নানা ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন। হাটের মাঝখানে, ভিড়ের মধ্যে কর্মের প্রয়োজনকে অনুসরণ করিয়া চলা যায়, কিন্তু নৃত্যের সৌন্দর্য বিকাশের জন্য চারিদিকে অবকাশ চাই। ছন্দের যে অংশে আমাদের থামিতে হয়, অবকাশ লইতে হয়, সেই যতিই তো তাহার প্রাণ; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ছন্দ হিল্লোলিত হইয়া উঠে। মানুষ তাহার চারিদিকে অবকাশের শূন্যতা পায় বলিয়াই সে তাহার মনুষ্যত্বের শক্তিতে, জ্ঞানে, প্রেমে, বিকশিত হইতে পারে। মানুষের প্রতিদিনের চিন্তা-চেষ্টা কাজকর্মের সহিত বর্ষাঋতুর কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই বলিয়াই সে তাহাকে অবকাশ আনিয়া দেয়। কর্মের প্রয়োজনের ভারে যাহারা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত হইতে না দিয়া মনুষ্যত্বের সজীবতায়, প্রাণপ্রাচুর্যে সঞ্জীবিত হইতে চায়, তাহারা বর্ষাকে নিজেদের হৃদয়ে গ্রহণ করে। মেঘের মৃদঙ্গধ্বনিতে, তাহার বিপুল সমারোহে, নব-মালতীর শোভায় ও সুগন্ধে, বর্ষণমুখরতায়, সজল বাতাসে, প্রথম আষাঢ়ে বর্ষা যখন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বাস্তব-জগতের উপযোগিতাবিহীন বাজে কথার গভীরতায় আনন্দের অমৃতপানকারী সেই অবকাশ-রসিকেরা তাহাদের হৃদয়ের পরম আত্মীয় এই নিষ্প্রয়োজনের ঋতুকে প্রীতিতে অভিষিক্ত করিয়া থাকে।

৪। "রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়' প্রবন্ধটিতে যুক্তিবাদ — তথ্যালোচনার পরিবর্তে কবির একটি বিশেষ ভাবানুভূতিই অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে"— আলোচনা কর।

উত্তর ঃ যুক্তির শৃঙ্খলানুসরণ ও বিষয়ানুগত্যের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও প্রবন্ধের মূল্য উহাদের কাব্যসুলভ রসসৌন্দর্যেই নিহিত। কবিকল্পনার একটি উচ্ছ্বাস, কোনও বিশেষ ভাবানুভূতির ধ্যানই বর্ণাঢ্য চিত্রকল্পে, শব্দের ব্যঞ্জনায়, অপরূপ লালিত্যে প্রকাশিত হইয়া এই জাতীয় রচনাগুলিকে আমাদের হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্গত 'আষাঢ়' ইহার অন্যতম সার্থক উদাহরণ।

'আষাঢ়' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যালোচনায় বর্ষাঋতুর পরিচিত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিবৃত করিতে চাহেন নাই। বর্ষার কর্মহীন অবকাশে মানবহৃদয় অখণ্ড মুক্তির সুযোগ পাইয়া যেভাবে পরম চরিতার্থতার আনন্দে ধন্য ও তৃপ্ত হয়, কবি এখানে তাঁহার সেই ভাবানুভূতিরইএক অপরূপ বাণীমূর্তি রচনা করিয়াছেন। বর্ষার স্বাতন্ত্র্য অঙ্কিত করিতে গিয়া তিনি যে ভাবে ঋতুগুলির বর্ণবিভেদের পরিকল্পনা তুলিয়া ধরিয়াছেন, যুক্তির যাথার্থ্যের দিক হইতে বিচার করিলে হয়তো তাহার কোনও কোনও অংশে অসঙ্গতি আবিষ্কার করিতে পারা যাইবে ; যেমন শরৎ ও বসন্তের শুভ্রপরিচয় প্রচলিত ধারণার বিরোধী। কিন্তু কবিকল্পনার অন্তর্লীন সঙ্গতিতেই সমস্ত কিছু সুসমঞ্জস, সুবলয়িত, ছন্দময় বলিয়া বোধ হয়।

সমস্ত ঋতুর মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বর্ষা স্বতন্ত্র। রথের ঘর্ঘরধ্বনির মতো বর্ষার মেঘনির্ঘোষ, কোষমুক্ত দীপ্ত তলোয়ারের মতো তাহার বিদ্যুৎস্ফুরণ, ধরিত্রীর শ্যামল প্রান্তর তাহার সবুজ কিংখাবমণ্ডিত পাদপীঠ, পূর্বদিকের কেতকীগন্ধ-সুরভিত জলসিক্ত বাতাস যেন বন্দিনী পূর্বদিগ্‌বধূর বীজন—এই চিত্রকল্পগুলিতে বর্ষার ক্ষত্রিয় বীরোচিত রূপ অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধের উপক্রমণিকা রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই আমাদের মন কবির অনুভূতির সুরে বাঁধা পড়ে, আমরা এক বিচিত্র সৌন্দর্যের আস্বাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হই।

অতঃপর বর্ষা তাহার সঙ্গীতে, সমারোহে, অন্ধকারে, তাহার দীপ্তিতে, চাঞ্চল্যে, তাহার গাম্ভীর্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে আবৃত করিয়া মানুষের জীবনে অবকাশের বিস্তার আনিয়া দেয়—সহস্রদল পদ্মের সৌন্দর্য বিস্তারের মতো এক একটি উক্তির প্রকাশকলায় কবি তাঁহার সেই হৃদয়ের উপলব্ধিকে আমাদের নিকট মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। 'বর্ষায় আমাদের হৃদয়বধূর পর্দা থাকে না। বাদ্‌লার কর্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে, তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্য হইতে কৈলাস পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন'—মানবহৃদয়ের সহিত বর্ষার গূঢ় আত্মিক সম্বন্ধের এই বর্ণনা প্রকাশভঙ্গির কাব্যসৌন্দর্যের গুণেই আমাদের রসচেতনাকে স্পর্শ করে।

পরবর্তী অংশে কবি অবকাশের বর্ষাঋতুকে অবলম্বন করিয়াই মানবজীবনে অবকাশের গূঢ় প্রভাবের অনুভূতিকে সৌন্দর্যধ্যানে পরিণত করিয়াছেন। অবকাশের শূন্যতা, নিশ্চলতায়ই তো সচল প্রাণের লীলাছন্দ প্রকাশিত হয়। অনন্তের গতির উপলব্ধিকে এই কল্পচিত্রে যে ভাবে তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে আত্মভাবনিষ্ঠ গীতিকবিতার সৌন্দর্য অনুভব করি: 'নিশ্চলের যে ভয়ঙ্কর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগ-যুগান্তরের তাণ্ডবনৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।'

উপসংহারে কবির অবকাশের, নিষ্প্রয়োজনের ঋতু বর্ষার আবাহন উপলব্ধির নিবিড়তায়, চিত্রসৌন্দর্যে এবং শব্দলালিত্যে ও ঝঙ্কারে গীতি-কবিতার বিচিত্র সৌন্দর্যই রচনা করিয়াছে। মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণমঞ্জীরমুখর মেঘছায়াচারিণী, নব মালতীর মালাবিজড়িত চঞ্চল কুন্তল—আষাঢ়ের এই চিত্রগুলির সৌন্দর্যে, কিংবা 'এসো গো অভিসারিকা; কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রা বাহির হইবে—জাতীপুষ্পসুগন্ধি বনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল —কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা'—এই অংশটির কল্পনার উত্তাপে ও সুরলালিত্যে কবির ভাবানুভূতি যে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেই 'আষাঢ়' প্রবন্ধটির সমস্ত মূল্য নিহিত।

৫। 'আষাঢ়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বর্ষাঋতুটা বিশেষ ভাবে কবির ঋতু।"—বর্ষাকে 'কবির ঋতু' বলিবার তাৎপর্য কি, বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দাও। (ক. বি. দ্বিবার্ষিক কোর্স ১৯৬৫

উত্তর : দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেখ।

৬। 'গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে।...বর্ষাকে ক্ষাত্রিয় বলিলে দোষ হয় না...আর শীতটা বৈশ্য।' রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়' প্রবন্ধ অবলম্বনে এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

(ক. বি. দ্বিবার্ষিক কোর্স, ১৯৬৩)।

উত্তর : প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেখ।

৭। 'ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবলমাত্র একা, একামাত্র। তাহার জুড়ি নাই।'—আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৬৩)

উত্তর : বর্ষা ব্যতীত অন্য সকল ঋতুর মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। শরৎ-হেমন্ত-শীত-গ্রীষ্ম নানাভাবে মানুষের সাংসারিক, ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনগুলির সহিত যুক্ত। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের শস্যসঞ্চয়ের পালা, এই তিন ঋতুর তিন মহলেই তাহার ফসলের ভাণ্ডার, ঐখানেই তাহার গৃহলক্ষ্মী। ফসলের জন্য কর্ষণ বীজরোপণ জলনিষেক প্রভৃতি প্রস্তুতি আয়োজন সকল ঋতুতেই চলে, কিন্তু তাহার প্রকাশ শরৎ হইতে শীত পর্যন্ত এই সময়েই। শরতে মানুষের কর্মের আয়োজনের ও কর্মপ্রচেষ্টার সফলতা নবীন শস্যের সমারোহে দেখা দেয়, 'হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণতি রূপে সঞ্চিত হয়। আর মানুষের বনলক্ষ্মী যেখানে আছেন সেখানে তাহার দুই মহল, বসন্ত ও গ্রীষ্ম—ঐখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বন-ভোজনের ব্যবস্থা; ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণগ্রহণ আর গ্রীষ্মে স্বাদগ্রহণ।'

কিন্তু ঋতুর এই সভায় বর্ষা নিঃসঙ্গ, একাকী। কারণ মানুষের সাংসারিক জীবনের কোনও প্রয়োজনের সহিত সে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। গ্রীষ্মের সঙ্গে সে মিলিতে পারে না, কারণ গ্রীষ্ম দরিদ্র, রিক্ত, আর সে ঐশ্বর্যবান। মেঘের সঙ্গীতে, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের বিচিত্র সমারোহে, অন্ধকারে, বিদ্যুতের

দীপ্তিতে—বর্ষার ঐশ্বর্য পরিস্ফুট। বর্ষার যাহা কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মের ভাণ্ডারেরই উদ্‌বৃত্ত। বর্ষার সঞ্চয় লইয়াই শরৎ পূর্ণ, সেইজন্যই যেন সে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এত সচেষ্ট; 'শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; কেননা, শরৎ তাহারই সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠ-ঘাটে বেনামি করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।' বর্ষার—'দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল ফসল নির্ভর করে, কিন্তু সে তেমন ধনী নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মতো মাঠে-ঘাটে পত্রে-পত্রে সে আপনার বদান্যতা ঘোষণা করে না।' প্রত্যক্ষভাবে দেনাপাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়াই মানুষ বর্ষার নিকট কোনও প্রয়োজনমূলক প্রত্যাশা লইয়া উপস্থিত হয় না। বর্ষা তাহার স্থূল প্রয়োজননিরপেক্ষ গভীর আবেগের, পরিপূর্ণ অবকাশের, সঙ্গীতের ঋতু। ঋতুরাজ্যে বর্ষা সত্যই স্বতন্ত্র, একাকী; তাহার কোনও সঙ্গী নাই।

বর্তমান ভারত

স্বামী বিবেকানন্দ

লেখক-পরিচিতি :

জন্ম ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ সাল; মৃত্যু ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ সাল। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে বিবেকানন্দের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৮৩ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সংযোগ ঘটিবার পর হইতেই তাঁহার জীবনের ধারা আমূল পরিবর্তিত হয়; রামকৃষ্ণের প্রেরণায় সন্ন্যাসগ্রহণের পরই তাঁহার নাম হয় বিবেকানন্দ। পরিব্রাজকরূপে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটন, আমেরিকার চিকাগো ধর্মসভায় ভারতবর্ষের ধর্মের মহনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা—তাঁহার কর্মবহুল জীবনের প্রধান কীর্তি। অগ্রসর মানবিক চেতনার উপরই তিনি ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজীবন ও দেশাত্মবোধকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীকে

বাংলা দেশে যে নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল, বিবেকানন্দ ছিলেন তাহার অন্যতম প্রধান উদ্গাতা। ভাববার কথা, বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক, পত্রাবলী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ইত্যাদি তাঁহার প্রধান রচনা।

সার-সংক্ষেপ ঃ

সমাজের নেতৃত্ব বিভিন্ন ব্যক্তি বা শ্রেণী যেভাবেই অধিকার করুক না কেন, দেশের প্রজাবৃন্দই সে শক্তির আধার। স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত না হইলে তাহারা নিজেদের শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারে না। ভারতবর্ষ ইংরেজশাসনাধীনে বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে ধীরে ধীরে জাগ্রত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের গৌরবজ্যোতি এবং ভোগ-সুখের চমকপ্রদ আয়োজন, অপরদিকে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজীবনের সুমহান ঐতিহ্য। আধুনিক ভারতবর্ষ এই বিপরীত জীবনাদর্শের সংঘাতে আন্দোলিত ও দ্বিধাগ্রস্ত। একদিকে নব্যভারত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণে ব্যক্তিগত সুখপরিতৃপ্তির জয়গান গাহিতেছে, অপরদিকে প্রাচীন ভারত এই মোহান্ধতা সম্পর্কে তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্য অনুকরণ-মোহে বুদ্ধিবিচার শাস্ত্রবিবেক-বিসর্জনই ভারতের পক্ষে প্রবল বিভীষিকা। য়ুরোপীয় বেশভূষা, আচার-আচরণের অন্ধ অনুকরণমত্ত আধুনিক ভারত-বাসীরা স্বদেশবাসীদের ঘৃণায় দূরে সরাইয়া রাখিতে সচেষ্ট। কিন্তু এই পরমুখাপেক্ষিতা ও দাসসুলভ দুর্বলতায় কেহ স্বাধীনতার মর্যাদা লাভ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভারতবাসীদের তাই এদেশের প্রাচীন জীবনাদর্শকে নূতন উদ্দীপনায় বরণ করিয়া আদ্বিজচণ্ডাল ভারতবাসীদের সহিত একাত্ম হইতে হইবে।

রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা ঃ

বাংলা দেশের ঊনবিংশশতাব্দীর নবজাগরণের মানবমহিমাবোধ ও দেশ-প্রেম স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ অগ্নিশিখার মতো আবেগোচ্ছ্বল ও উজ্জ্বল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সাহিত্য সৃষ্টি করিবার সচেতন উদ্দেশ্য লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রবন্ধরচনায় অবতীর্ণ হন নাই, উহা ছিল তাঁহার ধর্ম ও দেশপ্রেমের বাণীপ্রচারের বাহন। কিন্তু গূঢ় অধ্যাত্মবোধে স্বদেশের

মৃত্তিকামমতার গভীর আবেগ, তীক্ষ্ণ মননশীলতায় প্রতিষ্ঠিত তাঁহার ব্যক্তিত্ব যে ঋজু, ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার রচনাবলীকে সাহিত্যিক প্রবন্ধের মর্যাদায় মণ্ডিত করিয়াছে। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটিতে তিনি প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সভ্যতার আদর্শের সংঘাত এবং আধুনিক ভারত-বাসীর পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের অন্ধমোহের পটভূমিকায় স্বদেশবাসীদের স্বাজাত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। 'বর্তমান ভারত'-এর প্রতি ছত্রে তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনি, তাঁহার প্রাণের উত্তাপ অনুভব করি। লেখকের আন্তরিকতা যে কি ভাবে তাঁহার রচনাকে একটা নিজস্ব মাহাত্ম্য দান করিতে পারে, বিবেকানন্দের এই প্রাণ-প্রদীপ্ত প্রবন্ধটিই তাহার সার্থক নিদর্শন। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন, "প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অকৃত্রিম ভাবানুভূতি ও উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব হইতে সাহিত্য আত্মবিকাশের অনিবার্য প্রেরণা লাভ করে। যেমন সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হইতে ছোট ঝরণা নিঃসৃত হইলেও তাহা ক্রমশঃ বিরাট নদীর আকার ধারণ করে, তেমনি সুমহান ব্যক্তিসত্তার ধর্ম এবং সংস্কৃতিবিষয়ক চিন্তা ও অনুভূতি স্বতঃই সাহিত্যরূপে বিকশিত হয়।"

শব্দার্থ ও টীকা

অনু ১-৭ঃ শক্ত্যাধার—শক্তির আধার।

প্রতিগ্রহ——দান গ্রহণ।

পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ…পরাভূত হইল—মধ্যযুগে ধর্মজীবনের মতো সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও পুরোহিততন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। কালক্রমে উহা স্বেচ্ছাচারে জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী হইয়া উঠে। তখন রাজশক্তি যাজক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে অবলম্বন করিয়া উহার ক্ষমতা কর-তলগত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরী (১৫০৯-১৫৪৭) এই ভাবেই রোমান ক্যাথলিক যাজকগোষ্ঠীর অধিকার খর্ব করিয়া নিজের ক্ষমতাকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন…ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল—রাজশক্তিও একসময় স্বেচ্ছাচারের মত্ততায়, জনসাধারণের স্বার্থকে

আঘাত করে এবং নিজেকে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। তখন বণিকশ্রেণী ক্ষুব্ধ জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়া রাজতন্ত্রের নিকট হইতে নেতৃত্বের অধিকার দখল করে। ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস্ (১৬২৫-১৬৪৯) নিজের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য প্রজাদের সহানুভূতি হারাইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বণিকশ্রেণী সে-সময় প্রজাদের আনুকূল্য লাভ করিয়া গৃহযুদ্ধে (১৬৪২-১৬৪৯) চার্লস্‌কে পর্যুদস্ত করে এবং ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এই সম্রাটকে নিহত হইতে হয়। অতঃপর ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র একে একে তাহার সমস্ত ক্ষমতা হারায়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবেও ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইকে প্রাণ হারাইতে হয়। এই বিপ্লবেও বণিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটে।

মনুজবংশ—সূর্যতনয় মনু হইতেই জগতে মানবকুলের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া পুরাণ ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়। মনুজবংশ, অর্থাৎ মানবজাতি।

ইরাণবিদ্বেষ গ্রীক জাতির—কোনও জাতির উন্নতিতে ঐকান্তিক দেশপ্রেম এবং অপর জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। বিবেকানন্দ এখানে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। খ্রী পূঃ ৫৪৬ অব্দে ইরাণ বা পারস্য দেশের Cyrus একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিলে গ্রীসের সহিত সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ইহার পর দুই শত বৎসর ধরিয়া পারস্যের সাম্রাজ্যশক্তির সহিত এই দেশের সংঘাত তাহার জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। গ্রীকরাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র, সুতরাং গ্রীকেরা পারস্যের স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে তাহাদের স্বাধীনতা, নিয়মতন্ত্র ও প্রগতিরক্ষার সংগ্রামরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্-এর ইতিহাসে উল্লেখিত আছে, ইরাণের সম্রাট দারিয়ুস এবং তাহার পুত্র জারেক্‌সেস্ গ্রীকদের সহিত সংগ্রামে পর্যুদস্ত হইলে প্রাচ্য দেশের বর্বরতার উপর গ্রীক গণতন্ত্রের জয়লাভে আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের—খ্রীঃ পূঃ নবম অথবা দশম শতকে বাণিজ্যবৃত্তিতে পটু ফিনীসিয়ানরা বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে যে সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশে আফ্রিকার উত্তর তীরে অবস্থিত কার্থেজ উহাদের অন্যতম। কালক্রমে এই শক্তিশালী রাষ্ট্রটির

বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রোমের সহিত সংঘর্ষ ঘটে। খ্রীঃ পূঃ ২৬৪ হইতে ১৪৬ পর্যন্ত একশত বৎসরেরও অধিক কাল এই যুদ্ধ চলিয়াছিল, ইহা ইতিহাসে পিউনিক যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। খ্রীঃ পূঃ ২৬৪-২৪১ সালে প্রথম এবং ২১৮-২০১ সালে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১৪৯-১৪৬ সালে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং যুদ্ধে জয়লাভের ফলে রোম ভূমধ্যসাগরসংলগ্ন একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

কাফের-বিদ্বেষ আরব জাতির—মুসলমান ধর্মগ্রহণের পূর্বে আরবেরা সুশৃঙ্খল, সংহত জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে মহম্মদের প্রচেষ্টায় মুসলমান ধর্ম আরবদেশে বিস্তৃত হয়। আরবজাতি এই ধর্মোন্মাদনায় সংঘবদ্ধ হয় এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা কাফের (আরবী রূপ কাফির) অর্থাৎ সত্যধর্মে অবিশ্বাসী অমুসলমান, এই বিশ্বাসে তাহাদের জয় করিবার জন্য অভিযান চালাইয়া যায়। মহম্মদের মৃত্যুর এক শতাব্দী পরেই তাঁহার উত্তরাধিকারীরা পারস্য, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া নবধর্মে দীক্ষিত আরবদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

মুরবিদ্বেষ স্পেনের—বারবের ও আরবজাতির সংমিশ্রণে মুরজাতি উৎপন্ন হয়, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ইহাদের নিবাস। মুরেরা দীর্ঘকাল স্পেনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত স্পেনের ছোট ছোট খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলি তাহাদের আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফার্দিনান্দ মুরদের গ্রানাডা রাজ্য জয় করিলে মুসলমান-ধর্মাবলম্বী মুরদের প্রাধান্য খর্ব হয়। তৃতীয় ফিলিপের রাজ্যকালে ১৬০৯ হইতে ১৬৪০-এর মধ্যে মুরদের স্পেন হইতে বিতাড়িত করা হয়।

স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের—স্পেনের সহিত ফ্রান্সের শত্রুতার সম্পর্ক দীর্ঘকালের। ফ্রান্সের অষ্টম চার্লস্‌-কর্তৃক ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালি অভিযানের পর হইতে ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালীতে প্রাধান্য লইয়া ফ্রান্স এবং স্পেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের তদানীন্তন সম্রাট চতুর্থ হেনরী স্পেনের কবল হইতে ফ্রান্সের কয়েকটি অঞ্চল মুক্ত করেন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের মৃত্যুর পর হইতে স্পেনের শক্তি ও প্রভাবের ক্ষয় হইতে থাকে। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস্‌-

র শেষ বংশধর দ্বিতীয় চার্লস্ ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের এক পৌত্র ফিলিপকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার অর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। খন এই উত্তরাধিকার লইয়া ফ্রান্সের সহিত য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের দীর্ঘ-কাল যুদ্ধ চলে। অবশেষে এক চুক্তিতে ফিলিপকে স্পেনের রাজারূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, এবং স্পেন তাহার অধিকারভুক্ত অনেক য়ুরোপীয় অঞ্চলই হারায়। স্পেন এই বুরবন্ বংশধর ফিলিপের শাসনাধীনে আসিবার র হইতেই উহা ফ্রান্সের প্রভাবাধীন হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নিকট স্পেন বশ্যতা স্বীকার করিলে তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার ফলে স্পেনে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবশেষে ইংলণ্ডের সহায়তায় বিভিন্ন পেনিনসুলার যুদ্ধগুলির (১৮০৭ সালে উহার সূচনা দেখা দেয়) মাধ্যমে স্পেন বোনাপার্টের শাসনমুক্ত হয়।

ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানীর—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঈর্ষা-বিদ্বেষের সম্পর্কের ইতিহাস দীর্ঘকালের। ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৩৩৮-১৪৫৩) ইহার অন্যতম প্রধান উদাহরণ। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ফ্রান্সের মধ্যে কেবলমাত্র ক্যালে বন্দরটি হাতে রাখিয়া ইংরেজদের নিবৃত্ত হইতে হয়। স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সংগ্রামেও (১৭০১-১৭১৪) ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডকে অবতীর্ণ হইতে হয়। আমেরিকায়ও উপনিবেশের অধিকার লইয়া ফরাসী ও ব্রিটিশের মধ্যে যুদ্ধ হয় (১৭৫৬-১৭৬৩)। নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকেই ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু বলিয়া মনে করিতেন।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ইংলণ্ড ফ্রান্সের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। জার্মানীর সহিতও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফ্রাংকো-প্রাসিয়ান যুদ্ধে (১৮৭০-৭১) ফ্রান্সকে জার্মানীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার—আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশ-কারীরা ইংলণ্ডের শাসন ও শোষণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, উহাই আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ।

সহকারিত্ব—সাহায্য।

পাটলিপুত্র সাম্রাজ্য—মগধ সাম্রাজ্য দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত ছিল। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতেই মগধরাজ বিম্বিসারের শক্তি বৃদ্ধি হয়। বুদ্ধদেবের তিনি একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলি গ্রামে দুর্গ নির্মাণ করেন, পরে সেইখানেই অজাতশত্রুর পুত্র উদয়িভদ্রের রাজত্বকালে ইতিহাসকীর্তিত পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা) নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। নন্দবংশের ধ্বংসের পর চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র বিন্দুসার, বিন্দুসারের পর অশোক মগধ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। অশোকের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে আনুমানিক ১৮৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মগধ সাম্রাজ্যের পতন হয়।

অস্মদ্দেশে—আমাদের দেশে।

বৈশ্যাধিকার—বাণিজ্যবৃত্তিজীবী ইংরেজদের অধিকার অর্থাৎ শাসন বা রাজত্ব।

মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ—মঙ্গলের চিহ্ন বা নিদর্শন।

ঋতপথ—সত্য, যথার্থ পথ। **ভূদেব**—ব্রাহ্মণ; যিনি ব্রহ্মকে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরম সত্যকে জানেন, এই অর্থেই এখানে 'ভূদেব' শব্দটিকে প্রয়োগ করা হইয়াছে। **তমোগুণ**—প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, তমোগুণ প্রবল হইলে মানুষ নিজ প্রবৃত্তির অধীন হয়।

প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা সম্রাটাধিষ্ঠিত রোমক-শাসনে…এজন্যই হইয়াছিল—প্রজাতন্ত্র রোমের প্রথম পর্যায়েই (৫০৯-৩৬৭ খ্রীঃ পূঃ) দেখা যায়, নিম্নশ্রেণী ও বিজিতদের অধিকার এবং নিরাপত্তা বিশেষ ছিল না। এই সময়ে একটি এট্রুস্কান নগর বিজিত হইলে সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীদেরই হত্যা করা হয় অথবা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হয়। প্রজাতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে (১৩২-৩১ খ্রীঃ পূঃ) সিসিলিতে রোমান সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রীতদাসেরা বিদ্রোহ করে। রোম তাহার বিজিত জনগণকে সম্পূর্ণরূপেই তাহার নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। রোম সাম্রাজ্যের প্রথম পর্যায় (৩১ খ্রীঃ পূঃ-১৪ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার ভাঙন পর্যন্ত মন্দ রোম সম্রাটদের শাসনাধীনেও প্রদেশগুলির শাসন-পরিচালনা মোটামুটি সহৃদয় এবং ন্যায়পূর্ণ ছিল।

এজন্যই বিজিত য়ীহুদী বংশসম্ভূত....ক্ষমতা-প্রাপ্ত হইয়াছিল—সেন্টপল (৩-৬৭-খ্রী: ?) ছিলেন রোমানদের বিজিত খাঁটি ইহুদী বংশোদ্ভূত। তিনিই প্রধান খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক এবং খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ববিদ্। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকালেই তাঁহার বিরুদ্ধে Thessalonica-তে রোমের রাজশক্তি এবং তাহার ধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করা হয়। পল যখন জেরুসালেম-এ আসেন, তখনও তিনি অভিযুক্ত হন। তদানীন্তন রোম-সম্রাট নীরোর (কেশরী সীজার, অর্থাৎ রোমসম্রাট) নিজস্ব আপীলের আদালতে তিনি আবেদন করেন এবং শৃঙ্খলিত অবস্থায় বিচারার্থ সেখানে আনীত হন। তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

জিহ্বাচ্ছেদ-শরীর ভেদাদি—প্রাচীনকালে শূদ্রদের জিহ্বা কর্তন, শরীর বিদারণ প্রভৃতি দণ্ড দেওয়া হইত।

পণ্যবীথিকা—বীথিকার অর্থ হইতেছে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ ; পণ্যসজ্জিত পথ, অর্থাৎ ভারতবর্ষ বৃটিশ পণ্যের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে।

অনু ৮—২০ঃ প্রমাণ-বাহন—প্রমাণ বহনকারী। **দৃষ্টিপ্রতিঘাতি প্রভা**—যে আলোকে দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়।

সাবিত্রী—অশ্বপতি রাজার কন্যা এবং রাজা সত্যবানের সহধর্মিণী, নিজের চরিত্রের পবিত্রতায় যমরাজকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার দাক্ষিণ্যে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

কাষায়—কষায় (খয়ের বা অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ) দ্বারা রঞ্জিত সন্ন্যাসীদের পরিধেয় বস্ত্র।

সমাধি—এক বিষয়ে মনোনিবেশই একাগ্রতা, একাগ্রতা বদ্ধমূল হইলেই তাহার নাম ধারণা, ধারণা দৃঢ়মূল হইলেই উহা ধ্যান হয়, ধ্যান প্রগাঢ় হইলেই উহাকে সমাধি বলে। সমাধিদশায় অহংবোধ থাকে না, অন্তরে কেবল ধ্যেয়বস্তুরই আভাস থাকে।

ইতি সংসারে···তু সন্তোষ—সংসারে এই স্পষ্ট দোষ (দুঃখযন্ত্রণা), হে মানব, এখানে তোমার কি করিয়া সন্তোষ হইতে পারে? ইহা মোহমুদ্গর অর্থাৎ শঙ্করাচার্য-প্রণীত মোহনিরসনকারী উপদেশমালার অংশ।

চতুর্দশ শতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন—খ্রীষ্টীয় সপ্তম এবং অষ্টম শতকে একদল ইরাণ বা পারস্যদেশবাসী মুসলমানদের নির্যাতনের ফলে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই জরথুস্ত্রের ধর্মাবলম্বী, অগ্নির উপাসক পারস্যবাসীদের বংশধরদেরই পার্সী বলা হয়। তাহারা এদেশে দীর্ঘকাল বসবাস, বিবাহাদি করিয়াছে, এখানকার ঐতিহ্যে লালিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইংরেজী বেশভূষা, আচার-ব্যবহারের অনুকরণে তাহারা "নেটিভ" অর্থাৎ এদেশীয়দের নিকট হইতে নিজেদের পৃথক করিয়া রাখে। ইংরেজরা ভারতীয়দের অবজ্ঞায় "নেটিভ" (এদেশজাত) বলিয়া অভিহিত করিত।

জাতিহীন ব্রাহ্মণাম্মন্যের…বিলীন হইয়া যায়—জাতিহীন যে ব্যক্তি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করে, তাহার ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার দাক্ষিণাত্যের কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্যাদাকে ছাড়াইয়া যায়। সেইরূপ যে সকল ভারতবাসী ইংরেজদের অনুকরণ করে, তাহাদের সাহেবিয়ানা, স্বদেশবাসীদের প্রতি অবজ্ঞা মাত্রাহীন আতিশয্যে ইংরেজদের চালচলনের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ববোধকেও অতিক্রম করিয়া যায়।

ব্যাখ্যা

স্বার্থ ই স্বার্থত্যাগের……প্রথম দৃষ্টিপাত। (অনু ৪)
(ক. বি. ১৯৬২)

উপরি উদ্ধৃত অংশটি স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। লেখক স্বার্থরক্ষার্থ মানবজাতির ঐক্যবন্ধন প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি করিয়াছেন।

বৃহত্তর এবং স্থায়ী স্বার্থের চেতনায়ই মানুষ তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করিতে অনুপ্রাণিত হয়। আদিম অরণ্যচারী মানুষ যদি তাহার স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা বর্জন করিয়া সমাজের ঐক্যবন্ধনে, শাসনশৃঙ্খলায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত না করিত, তবে তাহার অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী হিংস্র পশুদের সহিত অস্তিত্বরক্ষার কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে সে কিছুতেই জয়ী হইতে পারিত

না; বৃহদাকার অনেক প্রাণীর মতোই তাহাকে নিশ্চিহ্ন হইতে হইত। সেইজন্যই ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা ও নিরপত্তাবিধানের জন্যই মানবজাতিকে সমষ্টিগত, সমাজগত কল্যাণের দিকেই প্রথম দৃষ্টি দিতে হইয়াছে। সমাজের মঙ্গল নিশ্চিত হইলেই ব্যক্তির সুখসমৃদ্ধি সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়া যায়। বৃহজনের সহায়তা ব্যতীত ব্যক্তির অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত সম্ভব হয় না। স্বজাতির স্বার্থেই ব্যক্তির নিজের স্বার্থ, স্বসমাজের কল্যাণেই তাহার নিজের কল্যাণ। সেই কারণেই ব্যক্তিকে নিজের স্বার্থের প্রেরণায়ই সমষ্টিগত মঙ্গল সম্পর্কে অবহিত হইতে হয়।

যে ভ্রমে পতিত হয় ঋতপথ···নরকুলেই। (অনু ৬)

ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিদেশীয় যে সমস্ত ভাবধারা এদেশের সমাজদেহে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কল্যাণকর, কতক অমঙ্গলস্বরূপ। ইহাদের গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া, ভুলভ্রান্তির মধ্যেই যেভাবে কল্যাণ সূচিত হইয়াছে, তাহারই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ এই উক্তি টি করিয়াছেন।

ভারতীয়েরা বিদেশী ও প্রাচীন দেশীয় ভাবধারার সংঘাতে ধীরে ধীরে তাহাদের দীর্ঘকালের জড়তা হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় তাহাদের ত্রুটিবিচ্যুতি বিভ্রান্তি ঘটিবে। কিন্তু তাহার জন্য আমাদের আতঙ্কিত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। সকল কাজে ভ্রম-প্রমাদের মধ্য দিয়াই মানুষকে শিক্ষা পাইতে হয়; এই ভাবেই সে ঋতপথ অর্থাৎ সত্য, যথার্থ পথ লাভ করে। বৃক্ষ, প্রস্তরখণ্ড কখনও ভুল করে না, কারণ তাহারা নিশ্চল, জড়পদার্থ; পশুরাও তাহাদের প্রবৃত্তিনির্দিষ্ট নিয়মগুলি অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া চলে, তাহাদের আচরণে উহার ব্যতিক্রম অতি অল্পই লক্ষ্য করা যায়, কারণ তাহাদের চিন্তাশক্তি নাই। কিন্তু মানুষ সজীব, সচল এবং চিন্তাশীল, তাই ভুল-ভ্রান্তি, সংশয়-বিচ্যুতির মধ্য দিয়াই স্বাধীন বিচারশক্তির সাহায্যেই জীবনের প্রকৃত পথকে সে চিনিয়া লয়; সেই জন্যই ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ মানবসমাজেই নরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা ও প্রজ্ঞাবান মানুষ আবির্ভূত হয়। নিয়মের বজ্রবন্ধনে মনুষ্যসমাজ পরিবেষ্টিত হইলে মানবের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইত না।

অর্জন না করিলে কোন বস্তুই…গর্দভ সিংহ হয়? (অনু ১০)
(ক. বি. ১৯৬৩)

আলোচ্য অংশে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যসভ্যতামুগ্ধ আত্মবিস্মৃতি-পরায়ণ নব্যভারতীয়দের অনুকরণপ্রিয় নিষ্ফলতা নির্দেশ করিতে গিয়া এই উক্তিটি করিয়াছেন।

বিচারবিহীন অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তায় নব্যভারতীয়েরা ঘোষণা করেন, পাশ্চাত্ত্যভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার গ্রহণ করিলেই তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্যসম্পন্ন হইতে পারিবেন। দুশ্চর তপস্যা, আত্মত্যাগ, মুক্তির সাধনা প্রভৃতির ঐতিহ্যসমৃদ্ধ প্রাচীন ভারত নব্যভারতের এই অনুকরণ-প্রিয়তার মোহান্ধতাকে ধিক্কার দিয়া বলেন, অনুকরণের দ্বারা পরের ভাব, ঐশ্বর্য কখনও আত্মসাৎ করা যায় না। কোনও বস্তুর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিজস্ব শক্তির সাধনায়, কঠিন আত্মপ্রয়াসে তাহাকে অর্জন করিতে হয়। অর্জন না করিলে কোনও কিছু আপনার হয় না। কথামালার গল্পে আছে, এক গর্দভ সিংহচর্মাবৃত হইয়া নিজেকে সিংহরূপে জাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু নিজের প্রকৃত স্বরূপ গোপন করিতে না পারিয়া সে পশুসমাজে উপহসিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল। সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই গর্দভ যেমন সিংহ হয় না, সেইরূপ পাশ্চাত্ত্য জাতির আচার-ব্যবহার বেশভূষা অনুকরণ করিলেই শক্তিমানরূপে স্বীকৃতি পাওয়া যাইবে না, নিজেদের দৈন্যই শোচনীয়রূপে উদ্ঘাটিত হইবে মাত্র।

শিখিবার অনেক আছে……ততদিন শিখি। (অনু ১২)
(ক. বি. ১৯৬৫)

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্বন্ধে নব্যভারতীয়দের বিচারহীন মোহান্ধতা যে জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, সেই প্রসঙ্গেই স্বামীজী আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্য জাতিদের সকল কিছু অন্ধ অনুকরণের যুক্তি হিসাবে নব-ভারতীয়েরা বলেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যাহা কিছু করে তাহা সমস্তই ভালো; ভালো না হইলে তাহারা এত শক্তিশালী কি করিয়া হইল। প্রাচীন ভারতবর্ষ বলেন, বিদ্যুতের আলোক অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। তাহাতেই নব্যভারতবর্ষের চক্ষু ধাঁধিয়া যাওয়ায় সে সত্য দেখিতে পাইতেছে

না। তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিক্ষণীয় কিছুই নাই? আমাদের সমাজ কি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ? স্বামীজী বলিয়াছেন, অবশ্যই শিখিবার আছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার এমন অনেক সম্পদ আছে যাহা শিক্ষা করিয়া আমরা লাভবান হইব। শিক্ষার জন্য, সভ্যতার ঐশ্বর্য সংগ্রহের জন্য আমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত সচেষ্ট ও সক্রিয় থাকিতে হইবে। ইহাই মানবজীবনের লক্ষ্য; আমরা আমাদের সীমাটুকুতে নিশ্চল, আত্মতৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারি না। যাঁহার নিকট স্বামীজীর অধ্যাত্মজীবনে 'শিক্ষা ও দীক্ষা' সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'যতদিন বাঁচিতে হইবে, ততদিনই শিখিতে হইবে'। মানবজীবনে শিক্ষার শেষ নাই।

হে ভারত ভুলিও না……সর্বত্যাগী শঙ্কর। (অনু-২০)

পরানুকরণ এবং পরমুখাপেক্ষিতায় যে উচ্চাধিকার এবং বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, সেই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ এই উক্তিগুলির মাধ্যমে দেশাত্মবোধের উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

ইংরেজ সভ্যতার প্রতি দাসসুলভ দুর্বলতায়, মোহে পথভ্রষ্ট পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীরা ভারতীয় সভ্যতায় কোনও গ্রহণীয় সম্পদ নাই, এই ভ্রান্ত ধারণায় স্বদেশকে অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছে। তাহাদের সেই মোহান্ধতা সবলে দূর করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনাদর্শের গৌরবময় ঐতিহ্যের আশ্রয় গ্রহণে আত্মস্থ হইতে হইবে; এদেশের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শঙ্করের মধ্যে তাহাই উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। বিচিত্র পরিচ্ছদ সজ্জিত, প্রসাধনে উজ্জ্বল, আত্মসুখসন্ধানী ও লজ্জাহীনা পাশ্চাত্ত্য নারীদের ইন্দ্রিয়বিলাসকেই এদেশের নারীজাতির আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে আমরা সর্বনাশকেই বরণ করিয়া আনিব। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, রামায়ণ মহাভারত পুরাণের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীই এদেশের নারীজাতির ধ্রুব আদর্শ। দুঃখ বরণের অবিচল সহিষ্ণুতায়, ক্ষমায়, ধৈর্যে, আত্মসুখ-বিস্মৃতিতে, একান্ত নম্রতায় এই ব্রতচারিণীদের নারীত্বের যে আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহাই আধুনিক ভারতবর্ষের নারীদের অবলম্বনীয়। পাশ্চাত্ত্য ভোগসুখের দৃষ্টান্তে বিভ্রান্ত না হইয়া আমাদের উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্করকেই আরাধনা করিতে হইবে। সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রতি বিমুখ শ্মশানচারী, ধূলিভূষিত

শঙ্করের মধ্যে ত্যাগের যে মহনীয় আদর্শ ভাস্বর, তাহাই তো আমাদের আরাধনার পরম সম্পদ।

টীকাঃ সাবিত্রী (শব্দার্থ ও টীকা অংশ দেখ)। দময়ন্তী—বিদর্ভ রাজকন্যা ও নলরাজার পত্নী। কলির ছলনায় মতিচ্ছন্ন নল অশেষ দুর্গতিতে পতিত হইলেও, এমনকি স্ত্রীকে অরণ্যে একাকিনী অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিলেও দময়ন্তী পতিভক্তিতে অবিচল ছিলেন।

ভারতের সমাজ আমার......বার্দ্ধক্যের বারাণসী। (অনু-২০)

আধুনিক ভারতীয়দের বিদেশীমুখাপেক্ষিতাকে ধিক্কার দিবার পর আলোচ্য অংশে স্বামীজী দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

পরানুকরণে কখনও শক্তি ও সম্মান অর্জন করা যায় না। তাই আধুনিক যুগের ভারতবাসীদের ইংরেজী সভ্যতার অন্ধ মোহ হইতে নিজেদের সবলে মুক্ত করিয়া নিজেদের দেশকেই সমস্ত হৃদয়মন দিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। স্বদেশই আমাদের জীবনের যাহা কিছু আশ্বাস ও সান্ত্বনা। শয্যা যেমন শিশুর আশ্রয়, তেমনি ভারতবর্ষের সমাজকে আমাদের জীবনের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

যৌবনের আনন্দ উপভোগের জন্য তরুণদের নিকট উপবন যেমন প্রিয়, কাম্য, তেমনি আমাদের সমস্ত প্রেয়োবোধ যেন স্বদেশের সমাজকে অবলম্বন করিয়াই চরিতার্থ হয়, আমরা যেন যৌবনের উপবনের মতোই ঐকান্তিক কামনায়, স্বদেশকে প্রিয় মনে করি। বারাণসীতে মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম নিবারিত হয়, এই বিশ্বাসে বৃদ্ধ বয়সে হিন্দুরা এই সর্বপাপহর পুণ্যতীর্থে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হয়। বার্ধক্যের সেই পরম বাঞ্ছিত বারাণসীর মতোই যেন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আমাদের সকল শ্রেয়োবোধের আশ্রয় হয়, আমরা তাহাকে যেন একান্তভাবে আপনার করিয়া লইতে পারি।

প্রশ্নোত্তর

১। 'পাশ্চাত্ত্যের উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতের উদ্দেশ্য—মুক্তি,

ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ'। উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ঃ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বরূপধর্ম বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখি, তাহার সমস্ত জীবনাচরণ, কর্মপ্রচেষ্টা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করিয়াই পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুখবিধানের জন্যই বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সভ্যতার বিপুল ও বিস্ময়কর আয়োজন লক্ষ্য করি। যে আত্মসুখকামনার পরিতৃপ্তিতে সেই ব্যক্তি স্বাধীনতার চূড়ান্ত চরিতার্থতা, পাশ্চাত্ত্য দেশে জড়-বিজ্ঞান তাহার পথ প্রশস্ত করিবার জন্যই সতত সচেষ্ট ; তাহার দানস্বরূপ বিভিন্ন উপকরণ ব্যক্তির স্বাধীন নিরঙ্কুশ ভোগসুখকামনার স্বাধীনতাকেই স্বাচ্ছন্দ্যতৃপ্তি আনিয়া দেয়। পাশ্চাত্ত্য সমাজে বিবাহের উদ্দেশ্যও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুখভোগ, তাই সামাজিক কল্যাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন স্বেচ্ছা-নির্বাচনমূলক বিবাহপদ্ধতিই সেখানে প্রচলিত।

এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জীবনাদর্শের ভাষা অর্থকরী বিদ্যা, উহাতেই তাহা প্রতিফলিত। পাশ্চাত্ত্য দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান, সমাজ, অর্থনীতি সমস্ত বিদ্যাচর্চার লক্ষ্য অর্থোপার্জন, বৈষয়িক সমৃদ্ধিই তাহাদের সার্থকতার মানদণ্ড। বৈষয়িক-স্বার্থসন্ধানী, অর্থকরী প্রতীচ্যের বিদ্যাচর্চায় সে সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং পাশ্চাত্ত্যজীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাষা হইল অর্থকরী বিদ্যার। অর্থকরী বিদ্যার প্রকাশিত ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক স্বাধীনতা চরিতার্থ করিবার উপায় হইল রাষ্ট্রনীতি। ছলে-বলে-কৌশলে রাষ্ট্রশক্তিকে যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার এবং তাহার শাসনশোষণে ব্যক্তির ভোগসুখের বিধান—ইহাই হইল পাশ্চাত্ত্যের রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু ভারতবর্ষের সকল জীবনাচরণের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে মুক্তি। এদেশের মানুষ ভোগসুখে আবদ্ধ থাকিয়া নিজেকে নিঃশেষিত করিতে চাহে নাই, বিলাস ঐশ্বর্যের সমারোহের মাঝখানে থাকিয়াও মুক্তির জন্য ভারতবাসীর হৃদয় ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। ভারতবর্ষ আবহমানকাল বৈরাগ্যের, মুক্তির সাধক, তাহাতেই এদেশের সমাজ জীবনের পরম সার্থকতা খুঁজিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন, যাহাতে অমৃত নাই তাহা লইয়া কি হইবে। মৈত্রেয়ীর সেই উক্তিটিতে ভারতবর্ষের আত্মার

মর্মবাণীটিই প্রতিধ্বনিত। মুক্তিই হইল অমৃত, তাহাই ভারতীয় সমাজের লক্ষ্য।

ভারতবর্ষের মুক্তির এষণা সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে বেদে, তাহার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের গম্ভীর সংহত শ্লোকগুলিতে। এই সংসারে মানুষের সত্যকারের আশ্রয় নাই, এখানে তাহার হৃদয় ধ্রুব, নিশ্চিত শান্তি পাইতে পারে না। সংসারের জরা ব্যাধি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যে সমস্ত জীবনকেই মুক্তির সাধনায় একাগ্র করিয়া তুলিতে হইবে—সেই সত্যকে বেদ আশ্চর্য গভীরতায় তুলিয়া ধরিয়াছে। সেইজন্যই যুগে যুগে ভারতবর্ষের মনীষী সাধকেরা তাঁহাদের জীবনের সাধনায় বেদের মুক্তির বাণীকে স্মরণ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন, ভারতীয় সমাজের উদ্দেশ্য মুক্তির ভাষা হইল বেদ।

ত্যাগই হইল এই মুক্তিসাধনার পথ। নানারূপ আসক্তিতে, ভোগসুখে মানুষের আত্মা বন্দী এবং কলুষিত হয়। কামনার মোহপাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে আত্মা শুদ্ধ, মুক্ত হইতে পারে না। বৈরাগ্য, ত্যাগই হইল মুক্তির সোপান। আমরা বিভিন্ন যুগে ঐশ্বর্য-বিলাসসুখের সমস্ত আয়োজন, এমনকি একান্ত প্রিয়জনের আকর্ষণকে পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের সাধকদের মুক্তির সাধনায় ব্রতী হইতে দেখিয়াছি। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ভারতবর্ষ ত্যাগের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে; এমনকি বিবাহেও নিজেদের সুখ-ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিয়া সমাজের কল্যাণের আদর্শকে অনুসরণ করিবার জন্য সে নির্দেশ দিয়াছে।

২। 'হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা।' 'ইহাই' বলিতে লেখক কোন্ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন? 'প্রবল বিভীষিকা' বলিবার কারণ কি? এই বিভীষিকা নিবারণের যে পথ লেখক নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিককালে উহার গ্রহণযোগ্যতা কতখানি, তাহাও নির্দেশ কর।

উত্তর: স্বামী বিবেকানন্দ 'ইহাই' শব্দটি দ্বারা পাশ্চাত্ত্য অনুকরণ-মোহকেই সুস্পষ্টভাবে এবং যথোচিত গুরুত্বে নির্দেশ করিয়াছেন। এই

অনুকরণের মোহ আমাদের সমগ্র চৈতন্যকে যে কি ভাবে গ্রাস করিয়াছে, স্বামীজী তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন: কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্মুখে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত, একদিন সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'বুঝি কোনও ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।' এই দৃষ্টান্তটিতেই আমরা লক্ষ্য করি, ভালো-মন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি-বিচার শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। য়ুরোপীয়েরা যে ভাব ও আচারের প্রশংসা করে তাহাই ভালো, তাহারা যাহার নিন্দা করে তাহাই মন্দ, বর্জনীয়—এই বিচারবোধশূন্য মনুষ্যত্বহীন, দাস-সুলভ দুর্বলতায় জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সমস্ত সম্ভাবনা রুদ্ধ হইয়া সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হয় বলিয়াই স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য অনুকরণমোহকে 'প্রবল বিভীষিকা'-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

জীবনাচরণের সকল ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনাদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণই হইল স্বামীজী-নির্দেশিত এই প্রবল বিভীষিকা নিবারণের পথ। পাশ্চাত্ত্যসমাজ ও ভারতবর্ষীয় সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য এতই গভীর যে পাশ্চাত্ত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এ দেশে নিষ্ফল হইবে। ভারতের সনাতন নীতি ও আদর্শই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। ভারতবর্ষের সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী নারীত্বের যে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, এ দেশের নারীদের তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে। সর্বত্যাগী উমানাথ শঙ্করই আমাদের আরাধ্য দেবতা, তাঁহার ত্যাগের মহনীয়তায়ই আমাদের অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। প্রাচীন ভারতের জীবনসাধনার পবিত্র ঐতিহ্যে ভারতবাসীদের হৃদয় অর্পণ করিতে হইবে। ভারতবাসীকে মনে রাখিতে হইবে, তাহার বিবাহ, ঐশ্বর্য, সমগ্র জীবনই ইন্দ্রিয়সুখের বা ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়; সমস্তই বৃহত্তর জীবনের কল্যাণব্রতের অর্ঘ্য। দেশাত্মবোধের গভীর আবেগে এ দেশের নীচ জাতি, 'মূর্খ', দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলকেই নিজের রক্ত, নিজের ভাইরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের মৃত্তিকাই তাহার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণই তাহার কল্যাণ, দেশাত্মবোধের এই মন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া সমস্ত দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য তাহাকে ঈশ্বরের নিকট আকুলকণ্ঠে প্রার্থনা জানাইতে হইবে।

আধুনিক কালেও স্বামীজী নির্দেশিত ভারতবর্ষের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথটির উপযোগিতা সুস্পষ্ট। বৈদেশিক মোহ সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া, আমরা এখনও আত্মস্থ হইতে পারি নাই, দেশের প্রতি ঐকান্তিক মমতায় দেশীয় জীবনাচরণের আদর্শের অনুসরণে ও গৌরববোধে আমাদের দেশাত্মবোধের পরিপূর্ণ উদ্বোধন ঘটে নাই। বিদেশী সভ্যতার মোহে ও শিক্ষার অহংকারে অশিক্ষিত দরিদ্র দেশবাসীদের আমাদের হৃদয়প্রাঙ্গণ হইতে দূরে নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছি, রক্তগত আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতায় তাহাদের গ্রহণ করি নাই। সেই মোহ ছিন্ন করিয়া আমরা যাহাতে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারি, তাহার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের এই উদাত্তকণ্ঠের আহ্বানকে নূতনভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

কণারক

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচিতি :

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। বলেন্দ্রনাথ মাত্র ঊনত্রিশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই পরিমিত জীবনেই নিজের প্রতিভার পরিচিতিতে বাংলাসাহিত্যে তিনি চিরস্থায়ী আসন অধিকার করিয়াছেন। প্রথমে তিনি 'বালক' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেন, পরে 'সাধনা' পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক হন। বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও প্রভাবে বিকশিত হইলেও তিনি তাঁহার রচনায় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে দিল্লীর চিত্রশালিকা, প্রাচীন উড়িষ্যা, কণারক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সার-সংক্ষেপ :

জনশূন্য প্রান্তরে শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহার অতীতের সমৃদ্ধির স্মৃতি ছাড়া কণারকে এখন আর কিছু নাই। একসময়ে এখানে বহু মানুষের সমাগম হইত, এখন দৈবাগত পথিকজন এবং পুরাতত্ত্ববিদ্ ব্যতীত ইহা অপর কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করে না। মন্দিরের ভিত্তিতে পূর্ণ নগ্ন নারীমূর্তির বিলাসকলা হইতে অনুমান করা যায়, তাহার প্রাঙ্গণেই নর্তকীর লাস্যলীলা চলিত। অন্যদিকে আবার এই বিলাস-খচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোকে কতদিন অন্তরের বৈরাগ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। হয়তো এই সংসার-লীলারই একটি রূপক : চারিদিকে যৌবনের বিলাসমত্ততার মাঝখানে নিশ্চল দেবতার মতোই অন্তরকে স্থির, অবিচলিত রাখিতে হইবে। বৈরাগ্য ও বিলাস দুইদিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে। কণারকে এখন দেবতা না থাকিলেও সেখানকার সর্বব্যাপ্ত বৈরাগ্য অনুভব করা যায়। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব পিতৃশাপে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়া কঠোর তপস্যায় সূর্যকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে রোগমুক্ত হইয়া মুক্তিদাতা দেবতার নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া কণারকের সেই প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ করিতে হয়। আজ আর সূর্যমন্দিরের সে মহিমা নাই, তাহার

দ্বার হইতে সমুদ্র সরিয়া গিয়াছে, যাত্রীদলও এখানে আসে না, অস্তগামী সূর্যের আলোকে সমস্তটা একটা চিন্তাদৃশ্যের মতো প্রতিভাত হয়।

রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা :

প্রাচীন ভারতের তীর্থ, মন্দির বা বিশেষ কোনও জনপদ সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রবন্ধ আছে, 'খণ্ডগিরি', 'বারাণসী' 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'কণারক' ইত্যাদি উহাদের অন্তর্গত। 'বলেন্দ্রনাথের চিত্তের ভিতরে যথার্থ কবিজনোচিত নব নব উন্মেষ ছিল, আর সেই বিচিত্র চিত্ত-স্পন্দনকে শব্দময় রূপদান করিবার তাঁহার একটি সহজ নৈপুণ্য ছিল।...মূলত ভাবাশ্রয়ী হওয়াতে বলেন্দ্রনাথের রচনার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি অনেক স্থলে কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। স্বভাবতই প্রাচীন, সুদূর অতীতের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল; কবি-কল্পনার বহু বিচিত্র বর্ণের সহিত হৃদয়ের ঐকান্তিক আবেগের স্নিগ্ধতা মিলিত হইবার ফলে তাঁহার অঙ্কিত অতীতের চিত্রগুলিতে এক অপরূপ কাব্য-সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। কণারকের মন্দিরের কোন ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচয় তিনি পরিবেশন করিতে চাহেন নাই, এই মন্দির তাঁহার মনে যে গভীর ভাবানুভূতি উদ্রিক্ত করিয়াছিল, তাহাকেই তিনি প্রকাশভঙ্গির ঐশ্বর্যে প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছেন। এক নিবিড় ধ্যানতন্ময়তায় অতীতের কণারকের সেই বৈরাগ্য ও বিলাসের বিচিত্র সমাবেশ বলেন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়াছেন, আজ আধুনিক যুগে জীর্ণ কণারকের মন্দিরকে চিন্তাদৃশ্যের মতো অনুভব করিয়া তাঁহার সেই অতীতের স্বপ্নচারী মন বেদনাতুর হইয়াছে। এই ভাবেই অতীতের মর্মোদ্ঘাটনকারী গভীর সহৃদয় দৃষ্টিতে, ভাবনার বিস্তারে এবং আন্তরিকতায় ও প্রকাশকলার মাহাত্ম্যে 'কণারক' প্রবন্ধটি গীতিকাবতার মতো সাহিত্যিক রচনা হইয়া উঠিয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা

অনু ১-৫ : কণারক—চক্রক্ষেত্র বা পুরীর অবস্থানের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া কণারক (কোণ + অর্ক, সূর্য) নামকরণ হইয়াছে বলিয়া অনেকে

মনে করেন। উড়িষ্যার পুরী জেলায় এবং বঙ্গোপসাগরের তীরে উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী ভুবনেশ্বর হইতে ৫২ মাইল এবং পুরী হইতে ৪২ মাইল দূরে কণারকের সূর্যমন্দির অবস্থিত। কণারকের মন্দির-এর সহিত একটি পৌরাণিক কাহিনী জড়িত আছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব একদা নারদের ক্রোধভাজন হন এবং তাঁহার অভিশাপ অনুযায়ী তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হইতে হয়। অবশেষে তিনি নির্দোষ প্রতিপন্ন হন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই ব্যাধি নিরাময়ের জন্য সূর্যদেবকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে মৈত্রেয়ী অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর কৃচ্ছ্রতাসাধন করিতে বলেন। শাম্ব তদনুযায়ী তপস্যা করেন এবং দ্বাদশ বৎসর পরে সূর্য তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহার বিভিন্ন কুড়িটি নাম তাঁহাকে আবৃত্তি করিতে বলেন। পরের দিন সকালে শাম্ব যখন চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন তিনি পদ্মের উপর স্থাপিত এক সূর্যমূর্তি দেখিতে পান এবং একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া উহাতে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। সূর্যদেবকে উপাসনা করিয়া শাম্ব সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন। এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, এই স্থানে শাম্বের এই পৌরাণিক আখ্যানজড়িত পূর্বপ্রতিষ্ঠিত একটি সূর্যমন্দিরই সম্ভবত গঙ্গরাজবংশের প্রথম রাজা নরসিংহদেবকে কণারকের প্রখ্যাত সূর্যমন্দির নির্মাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এই কাহিনীটির ভিন্নরূপ দেখা যায়। উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের মতো কণারকের সূর্যমন্দিরের এই কয়টি অংশ ছিল বিমান অর্থাৎ দেবমূর্তির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, ইহাই মূল মন্দির; জগমোহন, বিমানের সম্মুখবর্তী কক্ষ যেখান হইতে পূজারীরা দেবমূর্তির দর্শন পাইত এবং ইহাই নাটমন্দির বা নৃত্যকক্ষ। সমগ্র মন্দিরটিকে চব্বিশটি চক্রবিশিষ্ট সাতটি অশ্ববাহিত রথের আকারে নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং সূর্যের সারথি অরুণের মূর্তিও ছিল। এই মূর্তিটিকে মারাঠারা পুরীতে অপসারণ করিয়া লইয়া যায় বলিয়া কথিত আছে। এখানে সূর্যমূর্তি আর নাই, মূল মন্দিরের একটি অংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে, জগমোহনটি কালের ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

ধূধূ প্রান্তরমধ্যে—কণারকের মন্দিরের চতুর্দিকে জনবসতিবিরল বালুকাময় প্রান্তর।

কল্পবট—অভীষ্ট ফলদায়ক বটবৃক্ষ।

তাম্রলিপ্তি—তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত ছিল কলিকাতার প্রায় ৭০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্রোপকূলস্থিত বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ও বন্দর, আধুনিক তমলুক বা তমোলুক।

চীনাংশুক-কেতু—অংশুক (বস্ত্র), তাহার কেতু (পতাকা), পট্টবস্ত্র-নির্মিত পতাকা।

সিদ্ধ গন্ধর্বসেবিত—সিদ্ধ অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ মুনি এবং গন্ধর্বদের দ্বারা আরাধিত।

অর্কক্ষেত্রে—কণারক উড়িষ্যার যে পাঁচটি তীর্থক্ষেত্রের অন্যতম পঞ্চদেবতার নামানুসারে তাহাদের চক্রক্ষেত্র (পুরী, বিষ্ণুর চক্র বা মহিমা অনুসারে), শিবক্ষেত্র (ভুবনেশ্বর) অর্ক (সূর্য), ক্ষেত্র (কণারক-ইত্যাদি) রূপে অভিহিত করা হয়।

জগমোহন—প্রাচীনকালের মন্দিরের কয়েকটি অংশ থাকিত। যেখানে বিগ্রহ দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইত সেই মূল অংশের নাম বিমান, আর তাহার বহির্ভাগে বিমানের সম্মুখবর্তী কক্ষের নাম জগমোহন; এখান হইতেই পূজারীরা দেবতার দর্শন লাভ করিত। নাটমন্দিরে নৃত্যাদি সহযোগে দেবতার আরতি ইত্যাদি করা হইত।

শৃঙ্গার ভাস্কর্য—নরনারীর অনুরাগ-মিলন ইত্যাদির আদিরসমূলক ভাস্কর্য অর্থাৎ প্রস্তরাদি খোদিত করিয়া মূর্তি-গঠনশিল্প।

সুগ্রীব—সুন্দর গ্রীবা (ঘাড়) যুক্ত।

এখন এই নবগ্রহমূর্তি মন্দির হইতে............লোহরথোপরি শায়িত—কণারকের সূর্যমন্দিরের জগমোহন-এর প্রধান প্রবেশপথের উপরে কুড়ি ফুট লম্বা এবং চার ফুট চওড়া সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু এই নয়টি গ্রহের প্রতীক নয়টি মূর্তিখোদিত বিরাট একটি প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত ছিল, কালক্রমে উহা ঐস্থান হইতে খসিয়া পড়ে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উহাকে দুইখণ্ডে কাটিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বালুকাময় পথে এই ভারী জিনিসটিকে টানিয়া লইয়া যাইতে অসুবিধা হওয়ায় মন্দিরস্থান হইতে প্রায় দুই ফার্লং দূরে ফেলিয়া রাখা হয়। বলেন্দ্রনাথ এখানে ইংরেজের লোহার গাড়িতে স্থাপিত নবগ্রহমূর্তিখোদিত সেই প্রস্তরখণ্ডটির কথাই বলিয়াছেন।

উড়িষ্যার দ্বাদশবর্ষের রাজস্ব…নিঃশেষিত হইয়াছে—উড়িষ্যার গঙ্গরাজবংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন নরসিংহ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি মুসলমানবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন এবং সেই বিজয় গৌরবের উদ্দীপনায় কণারকের মন্দির নির্মাণে উদ্যোগী হন। কথিত আছে, মন্দিরটি নির্মাণ করিতে ১৬ বৎসর সময় এবং দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব লাগিয়াছিল এবং ইহার নির্মাণকার্যে বারোশত জন শিল্পী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

নর্তকীর লাস্যলীলা…গৌরব স্থাপিত ছিল—কণারকের সূর্যমন্দিরের বাহিরে নর্তকীদের বিলাসলীলার নানামূর্তি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। বলেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া বলিয়াছেন, হয়তো বাহিরে যেমন, ভিতরেও সেইরূপ ছিল। দেবদাসীদের লাস্য অর্থাৎ নৃত্যের লীলায় দেবতার আরধনা করা হইত, এবং ভোগবিলাসের আড়ম্বরে দেবচরিত্রের ঐশ্বর্য-গৌরব প্রকাশিত হইত।

নির্বেদ—সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া যে বিরক্তি, বৈরাগ্য জন্মে। বিচ্ছেদ, হিংসা, মহাদুঃখ, অকার্যের অনুষ্ঠান এবং কর্তব্য না করার জন্য অনুশোচনা, অপমান—এই সকল কারণে নির্বেদ উপস্থিত হয়।

অনু ৬-১২ঃ **বৈদান্তিক মায়াবাদী**—বেদান্তে (বেদের শেষ ভাগ, উপনিষৎ) ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎকে মায়া, মিথ্যা বলা হইয়াছে। বেদান্তের সেই বাণীকে বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা জগৎসংসারকে মায়া মনে করেন, তাঁহারাই বৈদান্তিক মায়াবাদী।

দ্বাদশ বৎসরের দুর্ভিক্ষ দিয়া—কণারকের সূর্যমন্দির নির্মাণে দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, সাধারণ প্রজাদের উপবাসী রাখিয়া, ক্ষুধার অন্ন হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিয়া ঐ বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং দ্বাদশ বৎসরের রাজস্বের প্রকৃত অর্থ হইল দ্বাদশ বৎসরের দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধাক্লিষ্ট জনসাধারণের দুর্গতি।

শাম্ব—শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার অন্যতমা মহিষী জাম্ববতীর পুত্র।

দান্ত—দম্ (শাসন করা)+ত, যিনি নিজের রিপুদের দমন করিয়াছেন।

চন্দ্রভাগা—কণারকের সূর্যমন্দির-এর উত্তরদিকে এক মাইলের মধ্যে

এই নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িত। একসময়ে ইহার উত্তরতীরে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। বর্তমানে নদীটি মৃত।

কপিলসংহিতা-রচয়িতা—সাংখ্যদর্শনকার কপিল মুনির সংহিতা (যাহাতে বিষয়সমূহ সংহত, মিলিত, বা সংগৃহীত করা হয়) বা স্মৃতিশাস্ত্র।

পুরুষোত্তম—নীলাচল, জগন্নাথদেবের ক্ষেত্র। কণারকের মন্দিরে দেবমূর্তি দীর্ঘকাল হইতেই নাই বলিয়া ইহার প্রতি ধর্মোলোলুপ তীর্থযাত্রীদের কোনও আকর্ষণ নাই, তাঁহারা পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়াই ভিড় করেন।

অবসিত—সমাপ্ত, শেষ।

যদুপতেঃ ক···গতোত্তরকোশলা—ইহা একটি সংস্কৃত প্রবচন, মোহ-মুদ্গর বা মোহনিরসনকারী উপদেশ। বলেন্দ্রনাথ ইহার প্রথম অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, দ্বিতীয় অংশটি হইল "ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়": কোথায় গেল যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী, কোথায় গেল রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের উত্তরকোশলা (অযোধ্যানগরী); সে সবেরই যখন কিছুই রহিল ন, তখন জগৎটাকে নশ্বর বলিয়া জানিও। এই শ্লোকটি সম্বন্ধে কথিত আছে, রূপ গোস্বামীর ভ্রাতা সনাতন এক ব্রাহ্মণের ভূমি অপহরণে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনবাসী রূপের নিকট গিয়া আবেদন করেন। তখন রূপ গোস্বামী ভ্রাতাকে য র ই ন এই চারিটি অক্ষর লিখিয়া পাঠাইলে সনাতন উহাদের দ্বারা উক্ত কবিতাটি রচনা করেন এবং তাহার মর্মার্থ অবগত হইয়া ভূমি হরণ বাসনা ত্যাগ করেন।

ব্যাখ্যা

বৈরাগ্য ও বিলাস যেন······শুধু দেহ মন। (অনু ৬)

উপরি-উদ্ধৃত অংশটি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কণারক' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কণারকের সূর্যমন্দিরে নারীদের বাসনাবিলাসমত্ততার বিভিন্ন মূর্তিদর্শনে তাঁহার মনে যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, এখানে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

কণারকের মন্দিরের বাহিরে বিলাসিনী নারীমূর্তির প্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া বোঝা যায়, অতীতে নর্তকীর নৃত্যলীলা দেবতার মনোরঞ্জন করিত এবং

ভোগবিলাসেই দেবচরিত্রের সমস্ত গৌরব স্থাপিত ছিল। আবার অন্যদিকে এই বিলাসচিহ্নখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোক কতদিন অন্তরের গভীর ব্যাকুল বৈরাগ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেবতাও তাঁহার সম্মুখে মদন-বিলাসের মত্ততার মাঝখানে নিশ্চল থাকিতেন। তাই মনে হয়, কণারকের সূর্যমন্দিরে বৈরাগ্য ও বিলাস দুই দিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছিল। বাহিরে কামনার আয়োজন, শতদীপালোকে দেবতার সম্মুখপ্রাঙ্গণে নর্তকীর নৃত্যচ্ছন্দে তাহার বিচিত্র প্রকাশ; ভিতরে বৈরাগ্যের অটুট স্তব্ধতা। বিলাসের হিল্লোল শুধু দেহেই, বাহিরেই—মন স্থির, অচঞ্চল। সুতরাং বৈরাগ্য ও বিলাস যেন মন্দিরের এপিঠ-ওপিঠ, ভিতর-বাহির, মন এবং দেহ; এই বৈপরীত্যের সমাবেশেই তাহার মহিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কিন্তু সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া....কেবল হায় হায়। (অনু ৭)

বর্তমান কালের কণারক মন্দিরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন।

কণারকের সূর্যমন্দিরে পূর্বে বৈরাগ্য ও বিলাসের এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল। একদিকে এই বিলাসিনী নারী-মূর্তিসজ্জিত মন্দিরের দ্বারে বহুলোক অন্তরের বৈরাগ্যব্যাকুলতায় উপস্থিত হইত, অন্যদিকে শতদীপালোকে দেবমূর্তির সম্মুখপ্রাঙ্গণে প্রতিদিন মদনবিলাসের একটি অঙ্ক অভিনীত হইত। কিন্তু কণারকে এখন আর দেবতা এবং অতীতের সেই সমারোহ নাই। আধুনিক যুগে জনবসতিবিরল ধু ধু বালুকাময় প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত কণারকের ভগ্ন, জীর্ণ পরিত্যক্ত এবং নির্জন মন্দিরটি দেখিয়া মনে হয়, সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া যেন এক নিশ্চল বৈরাগ্য বিরাজ করিতেছে। সেখানে কান পাতিয়া থাকিলে এই জীবনের অভিজ্ঞতা ও নিষ্ফলতার হাহাকারধ্বনি অবিরাম শুনিতে পাওয়া যায়। বৈরাগ্যে গাম্ভীর্যে প্রান্তরস্থিত সূর্যমন্দিরটি যেন পথযাত্রীদের নিকট কেবল ঘোষণা করে, জীবনযৌবন, ঐশ্বর্যসুখ, সংসার সমস্ত কিছুই অনিত্য।

প্রশ্নোত্তর

১। 'তবে একি মায়া? একি এই সংসার-খেলার একটা

রূপক ?'—কণারকের মন্দির সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর : কণারকের সূর্যমন্দিরের সমস্ত ভিত্তি পূর্ণ করিয়া খোদিত, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও সুডৌল গঠন এবং অধিকাংশস্থলে কামনার উদগ্র প্রকাশের কুৎসিৎ কল্পনায় যে সমস্ত নগ্ন নারীমূর্তি দেখা যায়, তাহা হইতেই বোঝা যায়, সেই যুগে বিলাসকলার কোন ত্রুটি ছিল না। তখন বিলাসিনী নর্তকীর নৃত্যলীলাই দেবতার মনোরঞ্জন করিত এবং ভোগবিলাসেই দেবচরিত্রের সমস্ত গৌরব স্থাপিত ছিল।

অন্যদিকে, এই বিলাসচিহ্নখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোক কতদিন অন্তরের তীব্র বৈরাগ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। সংসার হয়তো কামনা উদ্রিক্ত করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে। যদি কোনও দিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটানো না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজলে যদি বৈরাগ্য প্লাবিত হয়, সেই শঙ্কায় তাহারা মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য আকুল প্রার্থনায় দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণ দীপালোকে, দেবতার নিকট ভক্তহৃদয়ের বৈরাগ্য উদ্বেলিত হইয়াছে, অন্যদিকে শতদীপালোকে তাহারই সম্মুখপ্রাঙ্গণে নিত্য মদনবিলাসের স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

এই বিচিত্র বৈপরীত্য উপলব্ধি করিয়াই মনে প্রশ্ন জাগে, বৈরাগ্য ও বিলাসের এই সমাবেশ কোন্ মায়ার লীলা, সংসার-খেলার রূপক ? চারিদিকে বাসনা কামনা যৌবনকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য যে আলোড়নের তরঙ্গ, মায়ার আন্দোলন উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে অন্তর কিভাবে অবিচলিত শান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, তাহা প্রদর্শনের জন্যই হয়তো দেবতার এই বিচিত্র লীলার আয়োজন। অতীতে প্রতিদিন এই সূর্যমন্দিরের সম্মুখপ্রাঙ্গণ যখন ভোগসুখমত্ত জনতায় পূর্ণ হইয়া উঠিত, বিলাসিনী নর্তকীদের সুরমূর্ছনায়, তাহাদের দেহবল্লরীর নৃত্যচ্ছন্দে, সেই রূপমুগ্ধ বিলাসচঞ্চল ব্যক্তিদের হৃদয়ে কামনার প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, তখন বাসনার এই ফেনিল আবর্তের মাঝখানে মৌনপ্রশান্তিতে দেবতা থাকিতেন স্থির অবিচল। লেখকের সেইজন্য মনে হইয়াছে, বৈরাগ্য ও বিলাস যেন দেবতামন্দিরে দুই দিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে, কেবল

ভিতর-বাহির, দেহ-মন। বাহিরে ভোগবিলাস, যৌবনোন্মত্ততা; ভিতরে বৈরাগ্য, মোহমুক্তির কঠোর সাধনা; একদিকে দেহ এবং তাহার প্রবৃত্তির আলোড়ন, অন্যদিকে মন এবং তাহার বৈরাগ্য সাধনা। এই বৈরাগ্য ও বিলাস, ভিতর ও বাহির, দেহ ও মন লইয়াই কণারকের বিচিত্র সম্পূর্ণতা। বৈরাগ্য ও বিলাস তাঁহার মহিমার এপিঠ আর ওপিঠ। এই সংসারও তাঁহার সেই লীলার রূপক। চতুর্দিকের ইন্দ্রিয়সুখমত্ততার মাঝখানে তাঁহার সত্তাটি নিশ্চল রহিয়াছে, সংসারের সমস্ত কলকোলাহলের মাঝখানেও আমাদের নিভৃততম অন্তরে সেই বৈরাগ্যের স্তব্ধতাকে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে মদনবিলাসের আলোড়ন যতই চলুক ভিতরে সেই বৈরাগ্যের নিশ্চলতা ও স্তব্ধতা অটুটই থাকে; বোধ হয় সেইজন্যই কণারকের সূর্যমন্দির দেখিয়া কবি-হৃদয় ভাবে, কণারকের মন্দিরগাত্রের যৌবনবিলাসপূর্ণ নারীমূর্তিগুলির মতো, এইরূপ ভাস্কর্যের ন্যায় বিশ্বসংসারের বহিঃপ্রাচীরে নিজ নিজ বিচিত্র জীবন যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্বপাষাণে খোদিত হইতেছে; কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে যে বিরাট দেবতা অতন্দ্রধ্যানে বিরাজমান, এ সংসারমায়ার বুদ্বুদ্ তাঁহার নিকটে পৌঁছায় না।

২। 'বৈরাগ্য ও বিলাস যেন দেবতামন্দিরে দুই দিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে—শুধু এপিঠ ওপিঠ, শুধু ভিতর বাহির, শুধু দেহ মন।' কণারক মন্দির প্রসঙ্গে লেখকের এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (ক. বি. দ্বিবার্ষিক কোর্স ১৯৬৫)।

উত্তর : প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেখ।

৩। 'বলেন্দ্রনাথের ভাষা কণারকের পরিত্যক্ত মন্দিরের মতোই। কণারকের মন্দিরের মতোই তাহাতে বলিষ্ঠ বিশালতার সঙ্গে কমনীয় সৌন্দর্যের কি অপরূপ সমন্বয়'—কণারক রচনাটি অবলম্বনে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার কর এবং 'কণারক'কে কোন্ জাতীয় রচনারূপে চিহ্নিত করা যায়, তাহাও নির্দেশ কর।

উত্তর : কণারকের পরিত্যক্ত, নির্জন সূর্যমন্দিরে বলিষ্ঠ বিশালতার সহিত সুকুমার সৌন্দর্যের এক অপরূপ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়; একদিকে মন্দিরগাত্রে খচিত নারীমূর্তিগুলির যৌবনের সুকুমার লাবণ্য, অন্যদিকে কঠিন

বৈরাগ্যের মহনীয়তা—এই সমন্বয়েই কণারকের সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত। বলেন্দ্রনাথের 'কণারক' প্রবন্ধটির ভাবদর্শন-এ কণারকের সূর্যমন্দিরের মতো বলিষ্ঠ বিশালতার সহিত কোমল, স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের অপূর্ব সমন্বয় আমরা লক্ষ্য করি।

বলেন্দ্রনাথের মধ্যে কল্পনার সমুন্নতির সহিত অনুভূতির আন্তরিকতা সম্মিলিত হইয়াছিল বলিয়াই বিশালতা ও কমনীয়তার সমন্বয়ে তিনি তাঁহার ভাষার ঐশ্বর্যকে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। এক একটি চিত্রের বর্ণাঢ্যতায়, অলঙ্কৃত প্রকাশভঙ্গির কারুকার্যে তাঁহার কল্পনা-গৌরবেরই উপযুক্ত দৃঢ়পিনদ্ধ ভাষার গাম্ভীর্যপূর্ণ আভিজাত্যে বলেন্দ্রনাথ বিশালতার সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'মন্দিরদ্বারে, দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীত-জড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিতেন ; নীলজল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্বাদধারা বর্ষণ করিত, এবং তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্ক-মন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত এবং দেবতার জয়ঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত'—প্রবন্ধটির প্রথমাংশেই এই বর্ণোজ্জ্বল চিত্রের বিশেষত প্রথম চিত্রটির সৌন্দর্যের মহনীয়তায়ই বলেন্দ্রনাথের কল্পনা অতীতের কণারকের মহিমাকে আমাদের নিকট উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরে। 'নীলজল শুভ্র আনন্দে', নীল আকাশের 'অরুণিম আশীর্বাদধারা'—এই শব্দবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যে অলঙ্করণের সংহতিতে তরঙ্গোচ্ছ্বাসে নীল সমুদ্রের ফেনশুভ্র রূপ এবং সূর্যোদয়ে নীল আকাশ হইতে ক্ষরিত রক্তাভ আলোকের প্রাকৃতিক চিত্রসৌন্দর্যকে তিনি যে ভাবে মহিমাদীপ্ত করিয়াছেন, তাহা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

অলঙ্কৃত ভাষার এই রাজকীয় আভিজাত্যেই বলেন্দ্রনাথ, আধুনিক যুগের পরিত্যক্ত, নির্জন ও জীর্ণ দেবালয়ের বিষাদ গাম্ভীর্যপূর্ণ রূপ অঙ্কিত করিয়াছেন। রৌদ্রদীপ্ত নারিকেল তরুশ্রেণীর গায়ে চিত্রার্পিতবৎ শৈবালশ্যাম কণারক পরিত্যক্ত নির্জন পাষাণস্তূপের হিমশিলাখণ্ডের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন বিষধর ফণিনী, এই চিত্রগুলিতে এবং অস্তগামী

শেষ রশ্মিরেখায় রক্তিম মন্দিরের সহিত চিতাবহ্নের সার্থক তুলনায় ও [illegible] কল্পনায় কণারকের বিলাস- [illegible] অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার মত।

বলেন্দ্রনাথের হৃদয়ের নির্মল আবেগ স্নিগ্ধতার সাক্ত সমাবৃত হইয়াছে বলিয়াই কল্পনার গৌরববাহী ভাষায় এই ঐশ্বর্যকে কখনই নিষ্প্রাণ আড়ম্বর বলিয়া বোধ হয় না। কণারকের প্রাণবন্ত ভাষায় লেখকের ব্যক্তিসত্তার উজ্জ্বমধুর স্পর্শ, এবং অতীতস্মৃতিচারী ধ্যানতন্ময় হৃদয়ের বেদনার দীর্ঘশ্বাস আমরা অনুভব করি। 'কণারকে এখন কিছুই নাই, ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধি-মন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিলুপ্ত কাহিনী, কিন্তু সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া সেখানে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে'—এই বাক্য দুইটির নম্র, শান্ত ভঙ্গিতে, নিরলঙ্কৃত সরলতায় লেখকের বিষাদের আবেগ যে ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে সমগ্র প্রবন্ধটিতেই একটি স্নিগ্ধ করুণ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতীতে এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে সমাগত পুরুষদের বৈরাগ্য ব্যাকুলতা, আকুলতা, আধুনিক যুগে নিশ্চল বৈরাগ্যে কণারকের স্তব্ধতা, কৃষ্ণপুত্র শাম্বের শাপগ্রস্ততার বর্ণনা, স্পর্শ-কাতরতা ও ধ্যানের নিবিড়তায় এক অপূর্ব বিষাদ-জড়িত সুকুমার সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। কল্পনার সহিত হৃদয়ের কোমল, সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা, কল্পনার ঐশ্বর্যের সহিত হৃদয়ের বিষাদপূর্ণ অনুভূতি, বিশালতার সহিত কমনীয় সৌন্দর্যের অপূর্ব সমন্বয়েই বলেন্দ্রনাথের ভাষাশৈলী কণারকের মন্দিরের মতোই মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে।

কণারক প্রবন্ধটিকে ভ্রমণকাহিনী বা শিল্পপ্রবন্ধরূপে চিহ্নিত করা যায় না। ভ্রমণকাহিনীতে তথ্যনিষ্ঠায়, পর্যবেক্ষণে দ্রষ্টব্য বস্তুর যে রেখাচিত্র অঙ্কিত করা হয়, এখানে তাহার অভাব সহজেই চোখে পড়ে। কণারকের সূর্যমন্দিরের শিল্পবৈশিষ্ট্য, তাহার ভাস্কর্য নৈপুণ্যও লেখক বিশ্লেষণ করেন নাই, সুতরাং ইহাকে শিল্পপ্রবন্ধ বলা সম্পূর্ণরূপেই অসঙ্গত। এই মন্দিরে বৈরাগ্য ও বিলাসের সমাবেশ উপলব্ধি করিয়া বলেন্দ্রনাথ সংসারের বাসনা-চাঞ্চল্যের মাঝখানে দেবতার নিশ্চলতার প্রসঙ্গটির অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ কণারককে দার্শনিকতত্ত্বনিবদ্ধ রূপে গ্রহণ করিতে চাহেন

কিন্তু এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। দার্শনিক নিবন্ধে তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহই প্রকাশিত হয়; সেই যুক্তিপরায়ণতা, বিশ্লেষণী বুদ্ধির লেশ মাত্রও আলোচ্য প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় না।

বলেন্দ্রনাথের মধ্যে যথার্থ একটি কবিপ্রাণ ছিল, তাহারই ভাবানুভূতিকে তিনি তাঁহার প্রবন্ধের অনুপম রচনাশৈলীতে রূপদান করিতেন। কণারকে তাঁহার সেই কবিপ্রাণের স্পন্দন যে ভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তাহাতেই এই প্রবন্ধটির যথার্থ মূল্য লক্ষণীয়। আমরা তাই দেখি, অতীত কণারকের সৌন্দর্য বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার পরিবর্তে লেখকের হৃদয়ের আবেগে, তাঁহার কল্পনার স্বপ্নচারিতায়ই আমাদের নিকট প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। বিলাসের মাঝখানে দেবতার বৈরাগ্য নিশ্চলতা তত্ত্বের আকারে নয়, লেখকের হৃদয়ের ধ্যানরূপেই আমাদের গভীরতর চেতনাকে স্পর্শ করে। ভগ্ন, পরিত্যক্ত কণারকের বিষাদ-গম্ভীর রূপও সেই ধ্যানতন্ময়তায়ই আমরা পাই। কণারককে অবলম্বন করিয়া বলেন্দ্রনাথ তাঁহার কবিপ্রাণের সেই ভাববিভোরতাকেই প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া কণারক মন্দির নির্মাণের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বিবৃত করিবার পরিবর্তে তাহার পৌরাণিক ইতিবৃত্তই তিনি স্মরণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করিলেই সমগ্র প্রবন্ধটির ধ্যান সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হইত। কণারককে যদি আমাদের বিশেষরূপেই চিহ্নিত করিতে হয়, তবে ইহাকে আত্মভাবনিষ্ঠ রচনা বলিতে পারি। কণারকের এই স্বরূপধর্ম মনে রাখিলে প্রবন্ধটি যতটা ভাবনিষ্ঠ ততটা বস্তুনিষ্ঠ নয় বলিয়া কেহ কেহ যে অভিযোগ করেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই ভিত্তিহীন বোঝা যায়। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনায় কোনও উদ্দেশ্যই বলেন্দ্রনাথের ছিল না, সুতরাং ঐ অভিমত নিতান্তই অযৌক্তিক। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় কণারক সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন: 'উড়িষ্যার কণারকের মন্দির বিষয়ে তাঁহার যে লেখা তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল সমধিক, কিন্তু একটি গভীর সহৃদয় দৃষ্টিতে, ভাবনার ব্যাপ্তিতে এবং আন্তরিকতায়, প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যে লেখাটি সাহিত্যিক রচনা হইয়া উঠিয়াছে। নিপুণ বিশ্লেষণী বুদ্ধি অপেক্ষা সৌন্দর্য ও মহিমার একটা সামগ্রিক দৃষ্টিই এখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।'

রাজা ও রানী

আদি পর্ব

॥ রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ-দর্শন ॥

"একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" রবীন্দ্রনাথের এই আত্মপরিচয়ের মধ্যেই নিহিত আছে রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তাই উদাত্ত কণ্ঠে আত্মঘোষণা করিয়াছিলেন :

"আমি পৃথিবীর কবি
যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি"

এ বিশ্ব নিখিলের চিত্ত যে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, কবির চিত্তবীণায় তাহারই তরঙ্গ-দোলা লাগিয়া নানা সুরের জন্ম দিতেছে। কবি তাই বিচিত্রের দূত; চঞ্চলের লীলাসহচর। কবির কাব্যে তাই নানা রূপে আর রঙে, গন্ধে আর গানে, প্রকৃতি ও মানবেরই জয়গান বিঘোষিত। কবির কাব্যের শেষ কথাও এই। "এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে শুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্য ভাগ পর্যন্ত এই বিশ্বজয়ী প্রতিভার আলোক-বিচ্ছুরণে সমগ্র বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রটি উদ্ভাসিত। এই লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শেই বাংলা সাহিত্যের সমস্ত শাখায় সঞ্চারিত হইয়াছে এক নব-চেতনার নবীন জোয়ার। ইহারই ফলে রবীন্দ্র-স্পর্শধন্য বাংলা সাহিত্যে 'ঋতু ও রীতি' বদল হইয়াছে বহুবার। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই বৈচিত্র্যের স্রষ্টা। তাই রবীন্দ্রনাথ কবি—ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রধানতম পরিচয় হইলেও শেষতম পরিচয় নহে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম প্রধান বাহন কবিতা ও গান হইলেও তাঁহার প্রতিভার অন্যতম বাহন হইল নাটক। 'নাটক' শব্দটির আর একটি পরিচয়

আছে, নাটক দৃশ্যকাব্য। অর্থাৎ কাব্য সাধারণত হৃদয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে, নাটকে সেই সাধারণ ধর্মের পরিবর্তন ঘটে। নাটকে এই কাব্যের তান-মান-লয়ের সমন্বয়ে ছন্দের বাহনে রসিকের মানস-গোচর না হইয়া, দৃশ্যাঙ্কের মাধ্যমে তাহা দর্শকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হইয়া উঠে। দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হইয়া উঠিয়া কবির ভাবনা এক নবাস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করে। কবি রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি তাই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ। একে অন্যের পরিপূরক হইয়া, দুই-এ মিলিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন।

রবীন্দ্র-প্রতিভার সামগ্রিক স্বরূপ দর্শনলাভ করিতে, রবীন্দ্র-মানসের উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিলে আমরা দেখি, কবি ও নাট্যকার এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছেন। তাঁহার নাট্য-ভাবনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিলে তাঁহার কবি-ভাবনার স্বরূপ সন্ধানলাভ অনিবার্য। কারণ, তাঁহার প্রতিটি নাট্য-বিষয়ের অন্তরালে অন্তর্লীন হইয়া আছে তাঁহার সমকালীন কবি-মানস। এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথ বিশী মন্তব্য করিয়াছেন, "তাঁহার (রবীন্দ্র-নাথের) কবিতার মতোই তাঁহার নাটকেরও, বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনারই একটিমাত্র মূল সুর। কবি জীবনস্মৃতিতে বলিতেছেন—

'আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনার পালা। এই ভাবনাটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।'

বাস্তবিক ইহাই রবীন্দ্রসাহিত্যের সূক্ষ্মতম সূত্র। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিস্তীর্ণ ও জটিল জগতে এ সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিলে পাঠক অনেক বাধা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।....এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহের মধ্যেও অবতীর্ণ হওয়া যাইতে পারে। স্বয়ং কবিকর্তৃক স্বীকৃত মূল সুর বা সূত্রটিকে মনে রাখিলে তাঁহার সংখ্যা ও ভাবের জটিলতা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া সহজ-আয়ত্ত হইয়া পড়িবে।"

সুতরাং, এই বক্তব্য স্মরণে রাখিয়া আমরা কবির কাব্যের পালা-বদলের

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে যেমন তাহার মধ্যে একটি মূল ভাবের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসটিকে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইব, তেমনি তাঁহার নাটকসৃষ্টির ক্রমবিকাশের ইতিহাসটিকে অনুসরণ করিলে এইরূপ একটি মূল বক্তব্যের সুস্পষ্ট পরিণতির ধারাটিকে এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইব।

।। রবীন্দ্র নাট্য-সম্ভার ঃ নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ।।

আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ দর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের প্রধান ও প্রথম পরিচয় তিনি কবি, মহাকবি, "রবীন্দ্রনাথ 'কবীণাং কবিতমঃ'। তাঁহার মত মনে-প্রাণে, চিন্তায়, মর্মে, দুঃখে-সুখে, জীবনে-মরণে সমান ভাবে রসদৃষ্টিমান সাহিত্যস্রষ্টা মানুষের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি জন্মায় নাই।" আত্মভাবমুখীনতা (subjectivity)—তাঁহার আত্মপ্রকাশের সার্থক বাহন ইহাই। তাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। গীতিকবিদের দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যও হইল, তাঁহারা বস্তুর বহিরঙ্গ রূপসৌন্দর্য প্রকাশ অপেক্ষা বস্তুর অন্তরঙ্গ স্বরূপ দর্শন ও আবিষ্কার করিতে বেশী আগ্রহী। আত্মভাব-প্রধান গীতি-ধর্মিতার ইহাই অনিবার্য ফলশ্রুতি। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই সবিশেষ বৈশিষ্ট্য যেমন তাঁহার কাব্যধারায় সুস্পষ্ট, তেমনি তাহা নাট্য-প্রবাহেও দুর্নিরীক্ষ্য নহে।

রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কারণ, তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে 'বিসর্জন' নাটকখানি উৎসর্গ করিতে বসিয়া যে দীর্ঘ কাব্য-ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহারই একস্থানে লিখিয়াছেন—

"রক্ত মাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে
চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।

অনেক সমালোচক মনে করেন, 'বিসর্জন' নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই নিজস্ব উক্তি তাঁহার সমগ্র নাট্যসম্ভার সম্পর্কেই সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। ইহা তাঁহার রচিত নাটক প্রসঙ্গে সাধারণ সত্য। কারণ নাটকে প্রত্যাশিত—

বস্তুধর্মিতা, আত্মমুখীনতা নহে। এবং সৃষ্ট চরিত্রগুলি আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়াই আত্মপ্রকাশ করে, স্রষ্টার ভাবের বাহন হইয়া নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য নাট্য-সমালোচক আলোচনা-প্রসঙ্গে এই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নাট্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা ভাবের অনুভূতি প্রকাশই রবীন্দ্রনাথের নাটকের বৈশিষ্ট্য—তাহার ফলে প্রায় সর্বত্রই তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ঘটনা ভাবের অধীনস্থ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিত ছিল ইহার বিপরীত। তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, অনেক নাটকেই ঘটনা-প্রবাহ একেবারে রুদ্ধ হইয়া চরিত্রগুলির সুদীর্ঘ সংলাপ কিংবা দীর্ঘতর স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া বিশেষ কোন সূক্ষ্ম ভাবের সুচতুর বিশ্লেষণ চলিয়াছে—ইহাও রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যের গীতিপ্রবণতারই ফল। গীতিকবির দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নাট্যিক কাহিনীর গতি-সাম্য রক্ষা করা কঠিন। কারণ, গীতিকবির লক্ষ্য খণ্ড সৌন্দর্যের উপর; খণ্ডতার মধ্য দিয়াই তাঁহার অখণ্ডতার উপলব্ধি হইলেও খণ্ড বস্তু আশ্রয় করিয়াই তাঁহার ভাব-সাধনা সিদ্ধিলাভ করে। সমগ্র নাট্য কাহিনীর একটি খণ্ডাংশ যত আকর্ষণীয়ই হউক না কেন, তাহা নাট্যিক কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হয়; কেবল সমগ্র কাহিনীর অনুরোধে যতটুকু অত্যাবশ্যক তাহাই রক্ষা করিয়া অনাবশ্যক অংশ সতর্কতার সঙ্গে পরিত্যাগ করিতে হয়—কিন্তু সৌন্দর্যের কোন খণ্ডাংশই গীতিকবির পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই; কাহিনীর জন্য ইহার প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সমগ্র কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া না লইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার চিত্ত উহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। যে নৈর্ব্যক্তিকতা নাট্য-সাহিত্যের প্রধানতম গুণ, তাহাও রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যে বহুল পরিমাণে খর্ব হইয়াছে। প্রখর আত্মসচেতনতা রবীন্দ্র-কবি-মানসের বিশিষ্ট ধর্ম; আত্মকেন্দ্রিকতাই রবীন্দ্র-সাধনার মূল; রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যেও তাঁহার এই আত্মসচেতনতার ধর্ম সম্পূর্ণ সজাগ রহিয়াছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের যে-কোন নাটক পাঠ করিবার সময়ই তাহার ভিতর তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তাটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই ব্যক্তি-অভিসার তাঁহার সমগ্র নাট্য-সৃষ্টির মধ্যেই অব্যাহত রহিয়াছে বলিয়াও রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্য 'বৈচিত্র্য-সৃষ্টি'র বড় অবকাশ পায় নাই। এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নাটকই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নাট্যরচনা যাহা রঙ্গমঞ্চের

াহিরেও সাহিত্যরূপে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে। ইহাদের মধ্য দিয়া র জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া সার্থক ভাবে প্রকাশ না পাইলেও, সাধারণ পাঠকের ইহা হইতে রসোপলব্ধির কোন বাধা হয় না। রবীন্দ্রনাথের নাটকই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র পাঠ্য নাটক ('reading drama')।"

॥ রাজা ও রানী-পূর্ব রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ ॥

"রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যও রবীন্দ্র-কবি-মানসেরই এক অভিনব অভিব্যক্তি মাত্র"—এ কথা আমরা প্রথমেই বলিয়াছি। এইজন্যই রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহের প্রবাহ-পথ অনুসরণ করিতে, রবীন্দ্র-কবি-মানসের বিস্তৃত ভূমিটি প্রদক্ষিণ ও পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। তাঁহার সমগ্র কাব্য-ধারা যেমন বিভিন্ন পর্ব ও অধ্যায়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাঁহার নাট্যধারাও সেইভাবেই অগ্রসর হইয়াছে। তাই ঋতু ও রীতি পরিবর্তনের ইতিহাস বিচার যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জীবন-মন-পরিবেশ-সমাজের ইতিহাস-বিশ্লেষণ। আমরা এই পর্বে সেই পথেই অগ্রসর হইব।

॥ রবীন্দ্র-নাট্য : প্রথম পর্ব ॥

নিতান্ত বালক বয়সেই রবীন্দ্র-কবি-সত্তার উদ্বোধন ঘটিয়াছিল। বহু কষ্টের এই উদ্বোধনকে তপস্যা বলিলে অসঙ্গত হয় না। ভৃত্য-শাসনের গণ্ডী-বদ্ধ জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল বলিয়াই কবি শৈশব ও কৈশোরে বাহিরে মিশিবার অবাধ স্বাধীনতা লাভ করেন নাই। "বাহিরে মিশিবার স্বাধীনতা না থাকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শৈশব কল্পনাকে এইভাবে দৌড় দিয়া খেলাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অলোকসামান্য সাহিত্য-প্রতিভা অত শীঘ্র, অত অনায়াসে ও বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল। সকাল-সন্ধ্যার আলোছায়ার খেলা, নির্জন দুপুরে আলোর প্লাবন এবং চিলের ডাক, চুড়ি-খেলনাওয়ালার হাঁক ও ঘণ্টার শব্দ, আষাঢ়ের মেঘশ্যাম দিবস, শ্রাবণের ধারা-মুখর রজনী, ছেলেভুলানো ছড়ার করুণ মূর্ছনা, রোমান্টিক রূপকথার রঙীন স্বপ্নাভিসার—বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির এই যে একাত্মভূত আনন্দরস,

যাহা রবীন্দ্র-কাব্যের মূলগত বৈশিষ্ট্য, তাহার বীজ এইভাবেই উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ রসের দীক্ষা পাইয়াছিলেন অন্তর্যামীর কাছে, রূপের শিক্ষা বিশ্বপ্রকৃতির হাতে।"

এইভাবে রূপের শিক্ষা ও রসের দীক্ষা লাভ করিয়া কবি-মানস গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র রবীন্দ্র-নাট্য-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ। ইহার পূর্বে কবি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ও 'কবিকাহিনী' রচনা করিলেও, কবি-মানস অনুকরণ, অনুসরণ ও অস্পষ্টতার যুগ অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই সময়েই (১২৮৬) কবি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিলাত-গমনও করিলেন এবং যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর সঙ্গীতাসর সুরের মূর্ছনায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। কবিও উৎসাহে তাহাতে যোগ দিলেন। সুরের প্লাবনে কবি-মন প্লাবিত হইয়া উঠিল। এই সুর-পরিপ্লুত রবীন্দ্র-মানসই 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র স্রষ্টা (১২৮৭)। কিন্তু এই মন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সুরমায়া' এবং বিহারীলালের 'সারদা-মঙ্গল'-এর প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াই সুরের মাধ্যমে করুণা ও বাৎসল্যের জয়গান-মূলক এই নাটকটিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এইভাবেই রবীন্দ্র-নাট্যরচনার প্রথম পর্বের সূত্রপাত।

দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদে দস্যু রত্নাকর হইলেন ভারতের আদি কবি। রামায়ণ-কাব্যের বাল্মীকির কবিত্বলাভের এই প্রসঙ্গটি পাঠক সাধারণের নিকট নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট ইহার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। অধ্যাপক বিশী বলিয়াছেন, '....রবীন্দ্রনাথই এখানে বাল্মীকি, তিনিই নূতন ভারতবর্ষের আদি কবি।' এই প্রসঙ্গটি অবলম্বন করিয়া কিশোর কবি তাঁহার গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনা করিলেন। সমালোচক Edward Thompson এই নাটকটি সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন: "His English stay further manifested its influence in the Genius of Valmiki, a musical drama. Music was always a main passion with him—he was as fertile composer of tunes as of songs, and from his brain meaning and melody often sprang together—and while in England he had paid some attention to western music. The tunes of the Genius of Valmiki are half

Indian, half European, inspired by Moore's Irish Melodies." এই নাটকটির উপর বিদেশী প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি এইটিকে 'First important drama' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

নাটকটির গঠনে ত্রুটি আছে, নাটকের স্বাভাবিক গতি যখনই করুণ রসে দানা বাঁধিয়া উঠিতে চাহিয়াছে, তখনই প্রথম দস্যুর আবির্ভাবে তাহা হাস্ত-তরল হইয়া পড়িয়াছে এবং রসের হানি ঘটাইয়াছে। বাল্মীকির চরিত্রটিও সুষ্ঠু ভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। ইহা 'Lack of proportion'-দোষদুষ্ট। চরিত্রটির পরিবর্তন—বহিরঙ্গ ঘটনাশ্রিত না হইয়া অন্তরঙ্গ অন্তর্দ্বন্দ্বাশ্রিত হইলে ইহা সার্থক ও সুন্দর হইত। কিন্তু এই ত্রুটি সত্বেও নাটকটির সঙ্গীত-ঐশ্বর্য যেন সব ফাঁক ভরিয়া তুলিয়া ইহাকে পূর্ণতা দিয়াছে। সঙ্গীতের এই মোহময় স্বপ্ন-সুন্দর জগতে প্রবেশের অধিকার পাইয়া দর্শকেরা এক অপার্থিব আনন্দের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া যায়। এই নাটকটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে কবি স্বয়ং তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন: "বস্তুত, বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনও স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা, অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করে নাই। ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।"

দ্বিতীয় নাটিকা 'কাল-মৃগয়া'র জন্ম-তারিখ ১২৮৯ সাল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কাল-মৃগয়া।" দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র-বধকে কেন্দ্র করিয়া কবি যে কারুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সহজেই দর্শকহৃদয় স্পর্শ করে ও দর্শকচিত্তকে বেদনাতুর করিয়া তোলে। বাৎসল্য ও কারুণ্যের বিঘোষণা থাকিলেও কবি ইহার মধ্যে এক ক্ষমা-স্নিগ্ধ সংযমের আদর্শান্বিত রূপকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া যেন সঙ্গীত-জগতের স্বপ্নময় পরিবেশ হইতে তত্ত্বভাবনার জগতে অনুপ্রবেশের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। ইহাই প্রথম তত্ত্ব-চেতনার ইঙ্গিতবাহী।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় নাটক, প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে। এই নাটক 'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থের সমসাময়িক। ইহার পূর্বে কবি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর হৃদয়কারায় অবরুদ্ধ, নিখিল বিশ্বের বিচিত্র লীলা ও প্রাণতরঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া 'প্রভাত সঙ্গীত'-এর শেষ করিয়াছেন। অর্থাৎ এতদিনের অবরুদ্ধ চিত্ত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে। স্বপ্নের জগৎ হইতে কবি চেতনার জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ছবি ও গানে তাহারই প্রকাশ। কৃতী সমালোচক অজিত চক্রবর্তী মন্তব্য করিয়াছেন: 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এর পর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক একটি নাট্যকাব্য লিখিত হয়। এই নাটকের নায়ক এক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।....আমার নিজের বিশ্বাস যে নাটকের কাহিনীটি যেমনি হউক না ইহাও একপ্রকার প্রভাত সঙ্গীতেরই অনুবৃত্তি। একসময়ে যে তাঁহার প্রকৃতির সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছিল, আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হইয়া তিনি বেদনা পাইতেছিলেন, সেইটা কাটিয়া গিয়া পুনরায় বিশ্বের আনন্দলোকের সঙ্গে মিলিত হইবার আত্মকাহিনীর এক অংশ এই নাটকের মধ্যে আছে।" এই নাট্যকাব্যটিতে রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহের প্রথম পর্বের অবসান ঘটে।

• •

এই নাট্য-কাব্যটির মধ্যে রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের একটি বিশেষ তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। হৃদয়বৃত্তির নিরোধের দ্বারা দুঃখকে অস্বীকার করিয়া, সংসার হইতে পলায়ন করিয়া নহে, মানব-জীবনের সুখ-দুঃখকে গ্রহণ করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির সামঞ্জস্য-বিধানের মধ্যেই আছে মুক্তির বাণী। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই বিশেষ বাণীই নাট্যায়িত রূপ লাভ করিয়াছে। কবি নিজে এই নাটকটি সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে আলোচনা প্রসঙ্গে এই বক্তব্যটিই সুন্দর করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন, "কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম,

প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই সেখানে চোখ মেলি, সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।"...এই তত্ত্ব-বাণীর কথা স্মরণে রাখিয়াও ডঃ সুকুমার সেন এই নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম fundamental নাট্যকাব্য' বলিয়াছেন।

গানের রসে অভিষিক্ত মন লইয়া কবি রচনা করিলেন 'মায়ার খেলা' (১২৯৫)। 'মায়ার খেলা' গদ্য-নাট্য 'নলিনী'র গীতিনাট্য-রূপ। এই নাটকটি ঘটনা-স্রোতের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, হৃদয়াবেগের উপকরণে সৃষ্ট হইয়াছে। কাব্যক্ষেত্রে তখন কবির পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালার শেষ— 'মানসী' পর্যায়ে পৌঁছিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা,' 'কাল-মৃগয়া' যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, 'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ইহাই 'মায়ার খেলা'র পরম বৈশিষ্ট্য।

॥ রবীন্দ্র-নাট্য : দ্বিতীয় পর্ব ॥

'রাজা ও রানী' নাটকে রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। দ্বিতীয় পর্বের এই নাটকটির সহিত প্রথম পর্বের অন্তর্গত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকটির ভাবগত সাদৃশ্য কবি-লিখিত 'রাজা ও রানী'র ভূমিকায় সুন্দর ভাষায় অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কবি বলিয়াছেন, "প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সঙ্গে 'রাজা ও রানী'র এক জায়গায়-মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বতঃউদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়—
এমনি মায়ার ছলনা।"

কবির এই বক্তব্য পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজিক নাটক—'রাজা ও রানী'র মধ্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। নাটকটির আলোচনার গভীরে প্রবেশ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। আলোচ্য নাটকটির অধিকাংশ অংশই গদ্যে রচিত, শুধু

কাহিনীতে সরসতা রক্ষায় উদ্দেশ্যে কবি কিছু গন্তও ব্যবহার করিয়াছেন। এই পর্বের নাটকগুলি—'রাজা ও রানী,' 'বিসর্জন' ও 'মালিনী'তে এমন একটি tragic height-এর আভাস দেখা যায়, বাংলা নাট্যসাহিত্যে যাহা নিঃসন্দেহে এক দুর্লভ বস্তু। ট্র্যাজেডির উপকরণ বহুল পরিমাণে থাকিবার জন্ম নাটকীয় কাহিনীগুলি রসঘন হইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছে। চরিত্রগুলিও প্রাণবন্ত পূর্ণতা লাভ করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। গতিধর্মের বিচারে এই পর্বের প্রথম নাটকটি একটু ম্লান হইলেও অন্ত দুটি সম্পর্কে একথা সত্য নহে।

জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন কাশ্মীর-রাজকন্যা সুমিত্রার সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই এক অস্বাভাবিক আসক্তিতে আপন রাজকর্তব্য ভুলিয়া প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। এই সুযোগে রানীর কাশ্মীরের আত্মীয়েরা দেশ জুড়িয়া বসিয়া রাজক্ষমতা ভাগ করিয়া লইয়া শাসক হইয়া বসিয়া এমন অত্যাচার ও উপদ্রব শুরু করিলেন যে, রাজ্যের প্রজারা জর্জর হইয়া পড়িল।

রাজার বাল্যসঙ্গী দেবদত্ত রাজাকে তাঁহার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিবার অবকাশ না পাইয়া পরিহাসছলে রানীকে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিলেন। রানী সুমিত্রা রাজার এই আত্মবিস্মৃতি এবং রাজকার্যে অবহেলার ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়া বহুপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও রাজাকে তাঁহার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে না পারিয়া গৃহত্যাগের পরিকল্পনা করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার অবর্তমানেই রাজার রাজকর্তব্যবোধ পুনর্জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই পরিকল্পনানুসারে পুরুষের ছদ্মবেশে রানী কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুমিত্রার গৃহত্যাগ ঘটনাস্রোতকে জটিল করিয়া তুলিল। বিপরীত ফল ফলিল। রাজার প্রেমোচ্ছ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড হিংসার তাণ্ডবে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার পরম প্রার্থনীয় প্রেয়সীর নিকট হইতে যখন আঘাত আসিল তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য রাজ-অন্তরে সুপ্ত ক্ষাত্রধর্ম পুনঃপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্খল-মুক্ত দানবের ন্যায় তাঁহার অসংযত পৌরুষ পাশবিক নিষ্ঠুরতায় আত্মপ্রকাশ করিল। কুমারসেন-সুমিত্রাকে ভস্ম করিয়া এই দারুণ দাবানল নির্বাপিত হইল।

আত্মগোপনে ক্লান্ত কুমারসেনের ক্লান্তি দূর করিয়া সুমিত্রা তাঁহার ছিন্ন

মুণ্ড আনিয়া রাজা বিক্রমদেবকে উপহার দিলেন। এই শোকে তাঁহার নিজেরও মৃত্যু হইল।

উপসংহারটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু এই নাটকটির কাহিনী-বৃত্ত অসামান্য নাটকীয় গুণসমৃদ্ধ—ইহা অনস্বীকার্য। সমগ্র আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনা-টির কথা চিন্তা করিলে পরিণতিটি সুসঙ্গত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অনুতপ্ত বিক্রমদেবের মর্মস্পর্শী উক্তিতেই এই করুণ-রসাত্মক নাটকটির পরি-সমাপ্তি: "ইহজন্ম নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি ক্ষমা তব; তাহারও দিলে না অবকাশ?"

রবীন্দ্রনাথ এই সময় 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া চলিয়াছেন ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির মধ্যে এই নাটকটির বীজ নিহিত আছে। হৃদয়ের ধনকে দেহের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার বাসনা নিষ্ফল। চিরকালই ইহা ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করে, 'রাজা ও রানী' নাটকের ইহাই ট্র্যাজেডি।

এতদিন কবি-মানস কল্পনার লঘুপক্ষ সঞ্চালনে নভোচারী হইয়াছে, এই প্রথম মর্তের মৃত্তিকায় তাহার অবতরণ। ইহার পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে গান ছিল, তত্ত্ব ছিল, আখ্যানও ছিল, কিন্তু ছিল না মানবের পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য এই নাটকেই বাহ্য সংঘাত নহে—মানস সংঘাতময় নরনারীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কবি বাস্তব জীবনবোধের পরিচয় রাখিলেন।

রাজা বিক্রমদেব এমনই এক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত মানবচরিত্র। অন্ধপ্রেমে আসক্ত রাজা আপন প্রেয়সীর নিকট হইতে আঘাত পাইয়া হিংসায় উন্মাদ হইয়া উঠিলেন, আবার ক্রোধান্ধ রাজাই কুমারসেন-ইলার প্রণয় দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং শেষপর্যন্ত নিজের অপরাধের জন্য আত্মধিক্কারে অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন। এই বৈচিত্র্যই তো মানবজীবনের সত্য। কবির অন্তর্মুখী দৃষ্টি এই প্রথম এই সত্যকে শুধু আবিষ্কারই করিল না, তাহাকে সার্থকভাবে রূপায়িতও করিয়া তুলিল। রাজার চরিত্র সম্পর্কে এ কথা যেমন সত্য, এই নাটকের অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কেও এই উক্তি কমবেশী সত্য।

এক প্রেম-চেতনাকে আশ্রয় করিয়াই নাটকের প্রায় সবগুলি চরিত্রই আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সমালোচক Stopford Brooke 'As You Like It' নাটক সম্পর্কে—In this play love live in many

drama' বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটি সম্পর্কে সেই উক্তি অনেকখানি সত্য বলিয়া মনে হয়। এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে এই প্রেম-চেতনার ভিন্ন রূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং ইহার ভিতর দিয়াই তাঁর মনের গোপন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; ফলে সার্থক নাটকীয় চরিত্রের অগ্রদূত হিসাবে এই নাটকের চরিত্রগুলি বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।'রাজা ও রানী' নাটকে যাহার সূত্রপাত, 'বিসর্জন' নাটকে তাহাই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে বিচার করিলে 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' নাটকের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রাজা বিক্রমদেবের প্রবল আসক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিল মহিষী সুমিত্রার মৃত্যুবরণে; রঘুপতির দম্ভ সম্পূর্ণ বিচূর্ণ হইল পালক-পুত্র জয়সিংহের আত্মবিসর্জনে। উন্মত্ত বিক্রমদেব ইলার প্রেমের গভীরতায় বিস্ময়মুগ্ধ হইয়াছেন; রঘুপতি সত্যোপলব্ধির সুযোগ পাইয়াছেন অপর্ণার প্রেমে। কুমারসেন ও জয়সিংহের মৃত্যুতে রাজা বিক্রম ও বিপ্র রঘুপতি পরাজয় বরণ করিয়াছেন। এই ধরনের সাদৃশ্য হয়তো আরও আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়; কিন্তু ইহাতেই প্রথমটির পরিণতি হিসাবে দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করা চলে না। এই পরিণতির মূলটি আরও গভীরে নিহিত। 'বিসর্জন' পরিণত কবি-মানসের সার্থক ফসল। বাল্মীকি-প্রতিভায়' হিংসার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ধ্বনি অস্পষ্টোচ্চারিত, বিসর্জনে সেই ধ্বনি সোচ্চার হইয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীই যেন 'বিসর্জন' নাটকে বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। স্নেহের নিকট রুক্ষতার পরাজয় নূতন করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এইভাবে রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহের উন্মেষ-লগ্নের প্রথম নাটক 'বাল্মীকি-প্রতিভা' হইতে শুরু করিয়া দ্বিতীয় পর্বের 'রাজা ও রানী' পর্যন্ত বিভিন্ন নাটকে রবীন্দ্রচিন্তার যে বিশিষ্ট ভাবপুষ্পগুলি সঞ্চিত হইতেছিল, সেই ভাবপুষ্পগুলি সংগ্রহ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ একটি সম্পূর্ণ মালা গাঁথিলেন। 'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্র-প্রতিভা সাফল্যের মাল্যভূষিত হইল।

॥ নাট্য-তত্ত্ব ও সাহিত্য-প্রসঙ্গ ॥

'রাজা ও রানী'—রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রচনা। এই নাটকটি বিশ্লেষণ করিতে হইলে নাট্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় গ্রহণ করা অপরিহার্য। আমরা এই অংশে তাই নাট্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবেশ করিতেছি।

॥ জীবন, কাব্য ও নাটক ॥

শিল্প ও সাহিত্য মাত্রই জীবন-সম্ভব। জীবনের প্রকাশই ইহাদের মূল লক্ষ্য, কিন্তু জীবন-ধর্ম ও জীবন-সত্যকে আয়ত্তাধীন করিবার আকার ও প্রকারের বিভিন্নতানুযায়ী শিল্প-সৃষ্টির বিভিন্নতা সৃষ্ট হয়। বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে জীবন-ধর্ম ও জীবনবোধের পার্থক্য থাকে বলিয়াই সাহিত্যের ভাবধর্মের পরিবর্তন ঘটে, আবার এই স্বভাবের পরিবর্তন অনুসারেই বাগ্‌ভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ধারানুসরণেই পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাহিত্যেই নানা সাহিত্যিক রূপের, নানা প্রকাশ-শৈলীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। দেখা দিয়াছে নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ইত্যাদি। সাহিত্যের এই বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে নাটকের একটি বিশিষ্ট রূপ ও ধর্ম আছে। কাব্য, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতিতে লেখক যে শিল্প-রীতির অনুসরণ করেন নাটকের শিল্প-রীতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

জীবনের বিচিত্র রূপ ও প্রকৃতির প্রকাশই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। জীবন একই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও মেজাজ লইয়া তাহার আত্মপ্রকাশ। জীবন মূলত এক, জীবনের এই ভিন্নতানুযায়ী তাহার বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। জীবন যখন প্রশান্ত ও সুন্দর, ভাবাবিষ্ট ও কল্পনারঞ্জিত —তখন জন্ম হয় কবিতার, আবার জীবন যখন বিচিত্র ও জটিল ভাবনা ও বস্তুভারে নিপীড়িত হইয়া লেখকের সৃষ্টির পথে মন্থর গতিশীল, তখন দেখা দেয় উপন্যাস। কিন্তু দারুণ অশান্তি ও প্রচণ্ড বিক্ষোভ, ক্ষিপ্র গতি ও তীব্র বিরোধের মধ্যে যখন দেখা দেয় জীবন, তখন তাহার সেই বিশেষ রূপ ধরা পড়ে নাটকে। অর্থাৎ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার নিদারুণ ব্যর্থতা, মহৎ উদ্যমের চূড়ান্ত নিষ্ফলতা, প্রিয়জনের চরম বিশ্বাসঘাতকতা, অপ্রত্যাশিত ভাগ্য-বিপর্যয়, বিরুদ্ধ প্রকৃতির কঠোর সংঘাত, কঠিন সংগ্রাম ও শোকাবহ পরাজয়— মানবজীবনের এই সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়া নাট্যকার নাটক সৃষ্টি করেন। এই নাট্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন করিতে নাট্যকারকে শিল্প-রীতির কঠিন শাসন মানিয়া লইতে হয়। কারণ নাটকের শিল্পরীতি দৃঢ় ও সতর্ক এবং কঠোর নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। মানবজীবনের এই নাটকীয় উপাদানগুলি যখন নাটকের দৃঢ়, সতর্ক ও কঠোর নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত বিশিষ্ট শিল্পরূপের মধ্য দিয়া সার্থক ভাবে রূপায়িত হয় তখনই জন্মলাভ করে নাটক। প্রাচীন

ারতীয় সাহিত্য-শাস্ত্রীগণ নাট্য-সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রাখিয়া হার একটি বিশেষ নাম দিয়াছেন—দৃশ্যকাব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে—ংস্কৃত সাহিত্যে 'কাব্য' শব্দটি ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইত, আলংকারিকগণ াহিত্য বুঝাইতে 'কাব্য' শব্দটির প্রয়োগ করিতেন। এই কাব্যকে আবার াহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। হাকাব্য, গীতিকাব্য, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু াটক দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। সংস্কৃত আলংকারিকগণের মতে আবার সকল াকার কাব্যের মধ্যে নাটকই শ্রেষ্ঠ—"কাব্যেষু নাটকম্ রম্যম্।"

নাটকের আকৃতি-বিচার ॥

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ হইতে নাটককে স্বতন্ত্র করিবার জন্যই আলংকা-িকেরা দৃশ্য শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ই শব্দটির অর্থ অভিনেয়ত্ব। অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যে শুধুমাত্র কাব্যত্ব থাকিলেই লে না, তাহাকে অভিনেতব্যও হইতে হয়। সুতরাং শ্রব্যকাব্যের রস াস্বাদনে শ্রবণাতিরিক্ত অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিতে হয় না। শ্রব্যকাব্য াই স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কিন্তু দৃশ্যকাব্যকে দৃশ্যত্বের জন্যই য়মুখাপেক্ষী হইতে হয়। ইহা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। বক্তব্যটি আরও সুস্পষ্ট রিয়া বলা চলে—দৃশ্যকাব্য নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে তবেই নাট্যরস পলব্ধি করা চলে। তাহার পূর্বে নহে। অর্থাৎ নাটক—প্রযোজক, রঙ্গমঞ্চ, াভিনেতা, দৃশ্যপট, সাজ-সজ্জা ও দর্শককে লইয়াই পূর্ণতা অর্জন করে। The Drama is a multiple art, using words scenic effects, ıusic, the gestures of the actors, and the organising talents f the producers।" এইজন্যই নাটক—বিশুদ্ধ শিল্প নহে, মিশ্রশিল্প।

নাটক যৌথ শিল্প। সার্থক নাট্য-সৃষ্টির মূলে আছে একটি অখণ্ড জাতি, াট্যকার একা নহেন। কারণ, প্রবহমান জীবনধারা, স্রষ্টা নাট্যকার, ানুকারক অভিনয়কারিগণ এবং আস্বাদক দর্শকমণ্ডলীকে লইয়া গড়িয়া উঠে াটকের চতুরঙ্গ কাঠামো। নাটকের সহিত উপন্যাসের উপাদানগত পার্থক্য থাকিলেও, এই আকৃতিগত পার্থক্যের জন্যই সাহিত্যে এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব টিয়াছে। এই প্রসঙ্গে Dr. B. Ifar Evans তাঁহার "A Short History

of English Drama" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"To the creation of a play the author is only one contributor. For success co-partnership is essential, and in it actors, producers, designers and technicians must also be constituents." রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে এই সকল উপাদানের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়াই সম্ভবত এই সময়ে ইংলণ্ডে নাট্য-কলার সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই সময়েই ইংরেজী সাহিত্যের প্রতিভাবান নাট্যকার শেকস্‌পিয়রের আবির্ভাব। শেকস্‌পিয়র শুধু নাট্যকার নহেন, প্রতিথযশা অভিনেতাও বটে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই কথাটি সত্য।

নাটকের এই শিল্প-রূপ সম্পর্কে আলোচনার বিস্তৃতির মধ্যে অনুপ্রবেশের পূর্বে নাটকের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারিত করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

প্রাচীন কাল হইতেই গ্রীক দেশে সাহিত্য সম্পর্কে নানারূপ আলোচনা হইয়া আসিতেছে। দার্শনিকেরা বলেন, মানুষের অনুকরণ-স্পৃহা হইতেই সাহিত্যের জন্ম। নাটকের জন্ম সম্পর্কেও এ কথা সত্য। নাটক শুধুমাত্র যাহা ঘটে তাহারাই অন্ধ অনুকরণ নহে। নাটক জীবনের মূল্যায়ন, জীবন-সমালোচনা। বাস্তব জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠে নাটক; কিন্তু নাটকে যখন বাস্তব জীবন-সত্য রূপায়িত হয় তখন তাহা বস্তুরসকে অতিক্রম করিয়া অনির্বচনীয় সাহিত্য-সৌন্দর্যকে সপ্রকাশ করিয়া তোলে; তাই নাটক শুধুমাত্র অনুকরণ নহে, তাহা অনন্তসৃষ্টি। এই কথা স্মরণ করিয়াই ইংরেজ মনীষী নাটকের সংজ্ঞা দিয়াছেন, "Drama is the creation and representation of life in terms of theatre."

এই সংজ্ঞাটি হইতে বোঝা যায়, নাটকের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, পরিবেশ নির্দিষ্ট, অভিব্যক্তির ধারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একটি প্রবহমান ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া মানব-মানবীর ভাষণ ও কার্য দ্বারা যে রূপ ফুটিয়া উঠে, তাহাই নাটকের সুনির্দিষ্ট রূপ। এখানেই উপন্যাসের সহিত তাহার চরম পার্থক্য। নাটকের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অতিরিক্ত উপাদান বা উপকরণ প্রয়োজন হয়, উপন্যাসে তাহা প্রয়োজনীয় নহে। সজ্জা, দৃশ্যপট, স্থান-কাল-পাত্র প্রভৃতি যাহা-কিছু নাটকে চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়, অতি সহজেই বর্ণনার সাহায্যে ঔপন্যাসিক সেই কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

।ইজন্তই উপন্তাসের আকৃতি এবং গতি অবাধ, ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং প্রকৃতি ।মনীয়। উপন্তাসের মধ্যে ঔপন্তাসিক অতি সহজেই আত্মপ্রকাশ করিতে ।ারেন, কিন্তু নাটকে নাট্যকারের স্থান নেপথ্যে। একটি ঘটনার উদ্ভব ।ইতে পরিণাম পর্যন্ত প্রসারিত যে অনিবার্য গতিবেগ পাত্রপাত্রীর সংলাপ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়া উঠে, তাহার মধ্যে নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্য বা মন্তব্যের স্থান নাই। সাহিত্যে যদি তন্ময়তার objectivity) ভাব কোথাও থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা কাব্য বা উপন্তাসের ক্ষেত্রে নহে, নাটকে। কারণ, যে ভাব-কল্পনা-চিন্তার বিকাশ আমরা নাটকের মধ্যে দেখি, তাহা নাট্যকার-সৃষ্ট পাত্রপাত্রীর মনোজগতের অঙ্গীভূত। তাই নাটকে জীবন বর্ণনীয় নহে—দর্শনীয়। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা স্রষ্টার মনের আনন্দধারায় অবগাহন করে না, আবার বেদনার প্লাবনে অভিভূত হইয়া পড়ে না। স্রষ্টার কবিমানসের কোন বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি ইহাতে থাকে না। নাটক যেহেতু দৃশ্তকাব্য সেহেতু তাহাতে কাব্যত্ব থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এই কাব্যত্বের পরিপ্রকাশ পাত্রপাত্রীর অন্তরলোকে। তাহা নাটকের বহিরঙ্গ শিল্পকলাশ্রিত নহে। অর্থাৎ এককথায় স্রষ্টা এখানে তাঁহার সৃষ্টির সহিত একাত্ম হইয়া পড়েন না। শিল্পীর এই নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonality) বা নির্লিপ্ততাই (detachment) নাট্যশিল্পের প্রধান বিশিষ্টতা।

গতি নাটকের প্রাণ। নাটকের এই গতি-ধর্ম ঘটনার সহিত বিজড়িত অর্থাৎ এই গতি ঘটনারই গতি। আবর্তনেই চরিত্রের বিকাশ সংসাধিত হয় এবং ঘটনার দ্বারাই চরিত্র সুস্পষ্ট ও বিমূর্ত হইয়া উঠে। সজীব, সক্রিয় মানুষকে আমরা তাহার কার্যের মাধ্যমেই পাইয়া থাকি এবং তাহার ক্রিয়াশীল রূপই তাহার চারিত্রিক পরিচয় বহন করে। নাট্যকারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য যখন নরনারীর চরিত্র-চিত্রণ, তখন গতিশীল ঘটনাপুঞ্জ তাহার অপরিহার্য উপাদান।

এই বিচিত্র ঘটনাবলীর সংঘাতে একদিকে যেমন নাট্য-কাহিনী অনিবার্য পরিণতির পথে অগ্রসর হয়, তেমনি এই পরস্পর-বিরোধী, বিরুদ্ধধর্মী ঘটনার সংঘাতের মাধ্যমেই চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয় এবং মানবজীবনের গূঢ় রহস্ত উদ্ঘাটিত হয়। এই বিরোধের অবসানেই

চরিত্রগুলিও পরিণতি লাভ করে, কাহিনী-ধারাও পরিণতির মোহনায় আসিয়া পৌঁছায়।

নাটকের সাফল্য মঞ্চ-নির্ভর। মঞ্চকে বাদ দিয়া শুধু নিছক সাহিত্য হিসাবেই নাটকের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়—এ ধরনের একটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণাও কেহ কেহ পোষণ করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে Dr. Evans লিখিয়াছেন, "The excessive and inevitable attachment of criticism to the author has had a number of unhappy consequences. In the first place an illusion, utterly false, has been created that drama can be appreciated in independence of the theatre."

এই মন্তব্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। অভিনয়ই নাটকের প্রধান গুণ। অভিনয়ই—অভিনেতৃবর্গ ও দর্শকমণ্ডলীর সেতুবন্ধ রচনা করে। অভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের অন্তর্গূঢ় রসাবেদন ও সৌন্দর্যাবেদন আমাদের কল্পনা ও বোধকে স্পর্শ করিয়া উজ্জীবিত ও সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। তাই নাটক বিশুদ্ধ সাহিত্য নহে। শুধু মাত্র পাঠেই পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য ধরা দেয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহা মঞ্চস্থ হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য অধরাই থাকিয়া যায়। এইখানেই, সাহিত্য-শিল্পে নাটকের স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং, আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, কাব্যত্ব ও দৃশ্যত্ব লইয়া নাটকের পরিপূর্ণতা। যেখানে নাট্যরচনা অভিনয়-উপযোগী নয়—অর্থাৎ যেখানে নাটক দৃশ্যধর্মী হইয়া উঠিতে পারে নাই, সেখানে নাটক মূল্যহীন, নাটক ব্যর্থ। প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক গ্রেগেনও তাই নাটক বিচারের কালে দুইটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন, দেখিতে হইবে, "........how far it is poetical and how far it is theatrical."

॥ নাটকের প্রকৃতি বিচার ॥

উপরের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, সুখদুঃখমণ্ডিত লোকজীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা 'দৃশ্যের' মধ্য দিয়া উপস্থাপিত হইয়া অভিনয়-উপযোগী হইয়া উঠিলে তাহাকে নাটক বলা হয়। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাই নাটকের সংজ্ঞা দিয়াছেন: "অভিনয়োপেতো লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যম্।"

এখন প্রশ্ন হইল,* লোকবৃত্ত—অর্থাৎ মানবজীবনের ঘটনা বর্ণনাত্মক না হইয়া, উক্তি-প্রত্যুক্তি-বদ্ধ হইয়া দৃশ্যধর্মী ও অভিনয়-উপযোগী হইয়া উঠিলেই কি রচনা খাঁটি নাটক হইয়া উঠিবে? উত্তরে বলা চলে, বাহিরের আকৃতি দেখিয়াই কোন রচনাকে খাঁটি নাটকের মর্যাদা দেওয়া চলে না, কেননা তাহার প্রকৃতিও দেখিতে হয়।

নাটকের প্রকৃতি বিচারে তাই আমাদের নাটকের অন্তর্লক্ষণগুলির সহিত যথার্থ পরিচিত হইয়া উঠিতে হইবে। তবেই নাটকবিচার সম্পূর্ণ হইবে।

বহু প্রাচীনকাল হইতে নাটক লইয়া আলোচনা শুরু হইয়াছে। অনেক নাট্য-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত নিজের নিজের বিচারবুদ্ধির সাহায্যে নাটকের নানা লক্ষণের কথা বলিয়াছেন। এইসমস্ত পণ্ডিতদের আলোচনায় পার্থক্য থাকিলেও কয়েকটি মূল অন্তর্লক্ষণ সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত পোষণ করেন, সুতরাং আমরা সেই মূল অন্তর্লক্ষণগুলিকেই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতেছি।

নাটকে জীবনের গতিশীল ও পরিবর্তমান রূপেরই প্রতিফলন হয়। বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্রকার অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, "...All human happiness or misery takes the form of action : the end for which we live is a certain kind of activity, not a quality." দর্শকের কৌতূহল ও আগ্রহ ধরিয়া রাখাই নাটকের মূল লক্ষ্য। এই উদগ্র কৌতূহল ও আন্তরিক আগ্রহ বজায় থাকে সেইখানে যেখানে ঘটনা ও চরিত্র নিরন্তর রূপান্তরিত ও ভাবান্তরিত হয়। শ্লেগেল তাঁহার একটি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "Action is the true enjoyment of life : nay, life itself." যাহা আমাদের চিত্তে আন্দোলন সৃষ্টি করে তাহাতেই আমরা আনন্দ পাই ; গতিশীল দৃশ্য আমাদের চিত্তে আনন্দ সৃষ্টি করে, কিন্তু শুধুমাত্র গতিতে আনন্দ নাই। এই গতি যখন বৈচিত্র্য ও রূপান্তরের মধ্য দিয়া ঘটিতে থাকে, তখনই আনন্দ। অর্থাৎ—পূর্ব-নির্দিষ্ট বৈচিত্র্যমুখী গতিই আনন্দজনক। এই যে গতি বা action—ইহাই নাটকের প্রাণ। দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া নাটকের action আমাদের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আমাদের চিত্তকে কৌতূহলী ও উত্তেজিত করিয়া তোলে। ইহার জন্য নাটকের গতিকে হইতে হইবে অবিচ্ছিন্ন ও অবিরাম। অঙ্গসঞ্চালন, বাক্যসঞ্চালন, স্বরগ্রামের ওঠানামা প্রভৃতির আশ্রয়ে নাটকে

নানা ভাবে সঞ্চারিত হয়। দৃশ্য ও অঙ্ক বিভাগের সময়ে মঞ্চে সাময়িক ভাবে গতির প্রকাশ স্তব্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সেই গতি তখন চলিতে থাকে দর্শকের মনের মধ্যে অর্থাৎ দর্শকের emotional response-এর মধ্যে। সুতরাং গতির আসল স্থান হইল দর্শকের মনোজগৎ। তবে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে নাটকীয় গতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইতে পারে। গতির প্রকৃতি এবং তীব্রতা যে-রকমই হউক না কেন—গতি নাটকের অপরিহার্য উপাদান। "In a word, dramatic action is the movement from one mental or emotional state to another and no play, however quite, however lyrical, can exist without it." নাটকের গতিবেগ সম্পর্কে একথা সত্য। দেখা গেল, নাটক নাট্য-গুণের অধিকারী হয় তখন যখন নাটকে থাকে উপযুক্ত ক্রিয়াধর্মিতা (Action), ঘটনার দ্রুতধাবনতা (Progressiveness) ও ক্রমাগ্রসরতা (Movement)।

নাটকের অপরিহার্য উপাদান—যে গতিবেগের কথা আলোচিত হইল, সেই গতিবেগ সৃষ্টি করিতে নাট্যকারগণ যে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করেন, তাহার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য হইল নাট্যসংঘাত (Conflict)। সংঘাত গতিবেগের মতই নাটকের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কোন কোন নাটক সংঘাত ব্যতীতই গতিসমন্বিত হইলেও, অধিকাংশ সমালোচকই সংঘাতের অনিবার্যতার উপর সঙ্গতভাবেই জোর দিয়াছেন। হেগেল, শ্লেগেল এবং আধুনিক নাট্য-সমালোচক নিকল প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিরা সংঘাতের উপর জোর দিয়াছেন, তবে এই মতবাদের প্রধান সমর্থক সম্ভবত ফার্ডিনাণ্ড ব্রুনেতিয়ের।

দ্বন্দ্ব বা সংঘাত—নাটকীয়তার অন্যতম উপাদান। ইহাকে নাটকের প্রাণশক্তি বলা চলে। যে নাটকে যত বেশী দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সেই নাটক তত বেশী নাটকীয়। দ্বন্দ্বগর্ভ পরিস্থিতির সুষম বিন্যাসের উপর নাটকের সার্থকতা অনেকখানি পরিমাণে নির্ভরশীল, কারণ সংঘাতময়, দ্বন্দ্ব-জটিল ঘটনাই প্রকৃত নাটকীয় ঘটনা এবং এই দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের নাটকীয় অভিব্যক্তিকেই আমরা নাট্য-ক্রিয়া বা Dramatic action বলিয়া থাকি।

সংঘাত নানারূপী হইতে পারে। মানবজীবনে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নানা ভাবে দেখা দেয়। কখনও অদৃশ্য দৈবশক্তির সহিত মানুষের দ্বন্দ্ব, কখনও মানুষের সহিত মানুষের সংঘাত, কখনও বা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সহিত সমাজসত্তার

সংঘর্ষ সৃষ্ট হইতেছে দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এই যে গতিবেগ সৃষ্ট হয় তাহাই নাটককে জীবন্ত করিয়া তোলে। উল্লিখিত এই তিন শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে বহির্দ্বন্দ্ব (Outer Conflict) বলে। ইহা বহির্লোকে সংঘটিত হয়। কিন্তু নাটকে আর এক প্রকার দ্বন্দ্ব আছে, তাহাই নাটকের সর্বপ্রধান দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব নাটকের সর্বপ্রধান চরিত্রের বাহিরে নয়, হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিহিত। প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির, হৃদয়বৃত্তির সহিত কর্তব্যবোধের, ব্যক্তি-চৈতন্যের সহিত সমাজ-চেতনার, অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত সীমিত সামর্থ্যের, স্বাদেশিকতার সহিত ব্যক্তি-অনুরাগের, হৃদয়ের সহিত বুদ্ধির, আদর্শের সহিত বাস্তবের, এক জীবননীতির সহিত অন্য জীবননীতির নানা বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সংঘটিত হইতে পারে। ইহাই অন্তর্দ্বন্দ্ব (Inner Conflict)।

বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বহির্দ্বন্দ্ব দেখে আমাদের চিত্ত উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখে আমাদের বাহ্য উত্তেজনা তেমন তীব্র না হলেও আমাদের মর্মের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে, অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্রে এক সর্বত্রসঞ্চারী বেদনার দুর্দমনীয় আলোড়ন সঞ্চারিত হয়। সে দ্বন্দ্ব বাহিরে দৃশ্যমান নয়, যা অন্তরকে দগ্ধ করে নিঃশেষ করে ফেলে, তা দর্শন করে আমরা নিরুপায় মানবজীবনের নিঃসহায় দুর্ভাগ্য অনুভব করি এবং বুদ্ধি ও বিচারের বাঁধানো রাজপথ ছেড়ে বিচিত্র জীবনগতি যে কত গোপন ও নিষিদ্ধ পথে অগ্রসর হয় তা দেখে চমৎকৃত হই।"

অনেক বিশিষ্ট নাট্য-সমালোচক নাটকীয় সংঘাতের উপর প্রাধান্য আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন নাট্য-সমালোচক এই মত পোষণ করেন না। তাঁহারা বলেন, সংঘাত না থাকিলেও নাটক হইতে পারে। উদাহরণ হিসাবে তাঁহারা শেকভের নাট্যসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। তবে একথা ঠিক যে, সংঘাত না থাকিলে নাটকীয় কাহিনীর বর্ণনামূলক ও সংবাদধর্মী হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা খুব বেশী। কারণ সংকট ও আবর্ত সৃষ্টি করিতে না পারিলে দর্শকের চিত্তের মধ্যে কৌতূহল ও উত্তেজনা জাগাইয়া তোলা যায় না এবং তাহাতে নাটক জমিয়া উঠে না। দ্বন্দ্ব সকলক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু বাক্যের সংঘর্ষে, অন্তর্নিহিত হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম বিরুদ্ধতায়, ঘটনাসন্নিবেশের বৈষম্যে, সংঘাতের নানা জটিল ও প্রচ্ছন্ন রূপ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। যে

সমস্ত নাট্যতত্ত্ববিদ্ সংঘাতকে প্রাধান্য দিবার পক্ষপাতী নহেন তাঁহারা সংকট (Crisis)-এর উপর প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত। তাঁহারা বলেন—সংকটই নাটকের আত্মা-স্বরূপ। সংকটের শিল্প-রূপই—নাটক।

নাটকীয় গতির আলোচনার প্রসঙ্গে আর কয়েকটি দিক উল্লেখ করিতে হয়; তাহা হইল—আকস্মিক (Sudden), অপ্রত্যাশিত (Unexpected) ও অদ্ভুত (Strange) ঘটনার সমাবেশ। এই জাতীয় ঘটনা সহজেই দর্শক চিত্তকে উৎসুক ও কৌতূহলী করিয়া তোলে। নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্র আকস্মিক হইয়াও যখন দর্শকচিত্তে অস্পষ্টভাবে আভাসিত ও প্রত্যাশিত হয় তখনই নাটকের গতিবেগ সর্বাপেক্ষা বেশি বর্ধিত হয়, তখন নাটকীয় আকস্মিকতা একটি নূতন নাট্যরীতি অবলম্বন করে। তাহাকে বলা হয় নাট্যোৎকণ্ঠা (Dramatic Suspense)। নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি নাটকের প্রয়োজনীয় অঙ্গ, কারণ ইহার ফলে দর্শক উত্তেজিত আগ্রহ সহকারে নাট্যাভিনয় দর্শন করে।

নাটকীয় গতি সৃষ্টির আরও একটি কৌশল নাট্যশ্লেষ (Dramatic Irony) সৃষ্টি। শ্লেষ শব্দটির যেমন দুইটি অর্থ, নাট্যশ্লেষেরও তেমনি। নাট্যকার ঘটনার সংলাপের মধ্যে সুকৌশলে দ্ব্যর্থতার সৃষ্টি করেন। নাটকীয় ঘটনা জানার ব্যাপারে যখন অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান ঘটে তখনই নাট্যশ্লেষ দেখা দেয়।

এই বিস্তৃত আলোচনা হইতে দেখা গেল, বিচিত্র ভাবাবর্তিত, সুপ্রযুক্ত, সুসম্বদ্ধ, ঔৎসুক্যসৃষ্টিসক্ষম গতিশীল ঘটনাবিন্যাসের কুশলতার উপর নাট্য-রচনার সার্থকতা নির্ভরশীল। গ্রীক নাট্যশাস্ত্রবিদ্ অ্যারিস্টটল নাট্যরচনার এই কৌশলের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে কার্য-ঐক্যের (Unity of Action) কথা তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঘটনাকে সার্থকভাবে কৌতূহলোদ্দীপক করিয়া তুলিতে হইবে। নাটকের ঘটনার বহুমুখীনতা নাট্য-রস সৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া তিনি মনে করেন। তবে স্মরণ রাখা উচিত, কার্য-ঐক্য (Unity of Action) ঘটনা-বৈচিত্র্যের বিরোধী নহে। মোট কথা, এই প্রখ্যাত নাট্য-শাস্ত্রীর মতে ঘটনার সংহতি ও ঔৎসুক্যসৃজনক্ষম আকর্ষণীয় ঘটনাই নাটকের প্রাণ।

আধুনিক কালে কিন্তু নাট্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে অনেকখানি মত-পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। কারণ যে ক্রিয়াশীলতা বা action-কে নাটকের অপরিহার্য

উপাদান বলিয়া বহু পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করিতেন, আধুনিক কালের অনেক সমালোচকই সেই মত সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির পরিবর্তনের সহিত নাটকের রসকেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটিতেছে। ঘটনা-প্রধান কিংবা চরিত্র-প্রধান হওয়া যেমন নাটকের পক্ষে স্বাভাবিক, তেমনি ভাবাত্মক বা সংকেতধর্মী হওয়া বা বিতর্ক-প্রধান হওয়াও তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং ঘটনার গতিশীল সংঘাতময়তা কিংবা পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব-গর্ভতা ব্যতিরেকেও মানব আত্মার গভীর আকূতি কিংবা সমাজ-সমস্যার নানামুখী আলোচনাকে আশ্রয় করিয়াও নাটকসৃষ্টি সম্ভব। আধুনিক কালের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার বার্নার্ড শ তাই পিরান্দেল্লোর মত "Drama is action sir, action, not confounded philosophy" না বলিয়া বলিয়াছেন: 'Drama is discussion and nothing but discussion and discussion is the test of the playwrights." বর্তমানে নাটক ক্রমেই আইডিয়াধর্মী বা ভাবনা-প্রধান হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক নাটক ঘটনাত্মক নহে—ভাবাত্মক।

॥ নাটকসৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান ॥

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁহার পোয়েটিকস্ গ্রন্থে নাটক সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা আধুনিক কালেও পূর্ণ গুরুত্ব লইয়াই বর্তমান। মনীষী অ্যারিস্টটল নাট্য-সৃষ্টির উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ছয়টি অংশের কথা বলিয়াছেন—(১) কাহিনী (Plot), (২) চরিত্র (Character), (৩) রচনাশৈলী (Diction), (৪) ভাব (Thought), (৫) দৃশ্য (Spectacle) এবং (৬) সঙ্গীত (Melody)। এই ষড়ঙ্গের সমন্বয়েই গড়িয়া উঠে নাটক।

কাহিনী: কাহিনী বা বৃত্ত (Plot) নাটক-বিচারের প্রথম কথা। বিশ্বের সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই ইহা প্রথম কথা। কাহিনী-গঠন বা বৃত্ত-সৃজন বা ঘটনা পরম্পরার সুনিপুণ সংযোজন—নাট্যস্রষ্টার প্রধান কাজ। ঘটনা-বিন্যাসই নাটকের মুখ্য স্থান অধিকার করে, কারণ মানবজীবনধারার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে ঘটনাধারার মাধ্যমে। দ্বন্দ্বময়, গতিশীল ঘটনার অনুকরণই—জীবনের অনুকরণ। তাহাই নাটক। এই নাটক সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন:

"....is an imitation, not of men but of an action, and life consists in action and its end is a mode of action, not a quality.......

নাট্যকার জীবনের যে কাহিনী গড়িয়া তুলিবেন তাহা এলোমেলো, গতিহীন ও পরিণতিহীন হইলে চলিবে না। তাহার সূচনা, বিকাশ ও সমাপ্তি থাকিবে। সেই কাহিনী যুগ ও বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রকৃতি অনুযায়ী কখনও ঘটনাপ্রধান, কখনও চরিত্রপ্রধান, আবার কখনও তত্ত্বপ্রধান হইতে পারে। কখনও তাহার রূপ বহির্মুখী ও গতিপ্রধান হইতে পারে, কখনও বা তাহা অন্তর্মুখী ও আবর্তপ্রধান হইতে পারে। অ্যারিস্টটলের মতে কাহিনী দুই প্রকার হইতে পারে—সরল (Simple) ও জটিল (Complex)। নাট্য-শাস্ত্রবিদ্ অ্যারিস্টটল যথাযথ ভাবেই নাটকে প্রধান স্থান দিয়াছেন কাহিনী বা বৃত্ত গঠনকে। ইহাকেই তিনি নাটকের প্রাণসত্তা বলিয়াছেন।

নাটকের কাহিনী নির্মাণে নাট্যকারকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। নাটকীয় কাহিনী বা বৃত্তকে হইতে হইবে সম্পূর্ণ (Complete) এবং তাহা হইবে পরিণামমুখী। এই নাট্য-কাহিনীকে একক কাহিনী বলা চলে তখন যখন কাহিনীতে ব্যবহৃত সমস্ত ঘটনাগুলি অনিবার্য কারণ-সূত্রে দৃঢ়-সম্পর্কিত এবং যাহাদের পরিণতি হইতে হইবে একমুখী। ইহাই ঘটনা-ঐক্যবিধি বা Unity of action। এই ঘটনা-ঐক্যবিধি বজায় রাখিতে গেলে পরস্পর নিরপেক্ষ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমবায়ে গঠিত কাহিনী নহে—পরস্পর সাপেক্ষ ঘটনার দৃঢ়-সংহতি অপরিহার্য।

কোন কোন নাটকে একক বা মূল কাহিনীর সমান্তরালভাবে উপকাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজীতে ইহাকে sub-plot বলে। উপকাহিনীর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকে। কিন্তু কোন নাটকের পক্ষে উপকাহিনী তখনই উপযোগিতা সৃষ্টি করে যখন তাহা মূল কাহিনীকে অতিক্রম করিয়া স্বয়ং প্রধান হইয়া উঠে না। এবং যেখানে মূল কাহিনী ও উপকাহিনী ঘটনাগত ও চরিত্রগত যোগসূত্রে আবদ্ধ। এই উপকাহিনী কখনও সাদৃশ্য (Parallelism) বা বৈসাদৃশ্য (contrast) প্রকট করিয়া তুলিয়া নাটকের রসোত্তীর্ণতার পক্ষে সহায়ক হয়।

নাটকীয় কাহিনীকে বাহুল্যবর্জিত হইতে হইবে। অতিবিস্তৃত হইলে

তাহার চলিবে না এবং তাহাকে সংহত হইতে হইবে। কারণ, নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে নাট্যাভিনয় শেষ করিতে হয়। তাই অতিবিস্তৃত কাহিনী কিংবা নানামুখী কাহিনী হইলে নাটক দর্শকচিত্তে কোন সংহত, সুসম্পূর্ণ আবেদন রাখিতে সক্ষম হয় না। তাই নাটকীয় কাহিনীর উপাদান—ক্রিয়া, ঘটনা, চরিত্র প্রভৃতিকে অপরিহার্য হইয়া উঠিতে হইবে। কোন অপ্রয়োজনীয় উপাদানের স্থান নাটকে নাই। নাট্য-সৃষ্টির এই নিয়ম-শৃঙ্খলার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে নাট্য-শাস্ত্রকার অ্যারিস্টটল ত্রি ঐক্যের কথা বলিয়াছেন—স্থানগত ঐক্য (Unity of place), কালগত ঐক (Unity of time) এবং ভাবগত ঐক্য (Unity of action)।

আধুনিককালে নাট্য-রচনাতে যেমন পরিবর্তন আসিয়াছে, তেমনি স বিচারের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্য দেখা দিয়াছে। আধুনিক সমালোচকগ অ্যারিস্টটলের ত্রি-ঐক্যকে অপরিহার্য নাট্য-রচনা-বিধি বলিয়া মনে করে না। ইংরেজ নাট্যকার শেকস্‌পিয়রের রচনাতে এই বিধি শিথিল হইয় পড়িয়াছে, পরবর্তীকালে তাহা আরও বর্ধিত হইয়াছে। তবে একটি ঐক্যে কথা বর্তমানেও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে—তাহা Unity of impression অর্থাৎ রসাস্বাদনেই নাটকের দোষগুণ চূড়ান্তভাবে ধরা পড়িবে।

চরিত্র : আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, নাট্য-সমালোচক অ্যারিস্টটল ঘটনা বিন্যাস বা কাহিনী-নির্মাণের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। নাটকীয় চরিত্র এ কাহিনীর অধীন। তিনি মনে করেন চরিত্র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করে না কাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং প্রথম স্থান কাহিনীর, তাহার প চরিত্রের। অর্থাৎ নাটক মানবজীবনকে যদি প্রতিফলিত করিতে চাহে ত বাস্তব সংসারের নানা ঘটনাকে অনুকরণ করিতে হইবে। ঘটনাময় মানবজীব পুরুষ ও নারীর নানা আচরণের মধ্য দিয়াই অভিব্যক্তি লাভ করে। ঘটনা উপস্থাপন ব্যতীত চরিত্রকে চিত্রিত করা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব নহে আচার-আচরণ, কার্য-কলাপ ও ঘটনার মাধ্যমে যে জীবনের অভিপ্রকাশ— নাটকের মূল লক্ষ্য সেই জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ।

এখন প্রশ্ন হইল চরিত্রের সংজ্ঞা কি? উত্তরে বলা চলে, মানুষের ে আচরণ-বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তি-স্বভাব—তাহাই চরিত্র। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষে দোষগুণের যাহা পরিচায়ক—তাহাই চরিত্র। যেহেতু মানুষের দোষগু

অনুশীলনে ধরা পড়ে তাহার ব্যক্তিত্বের, যেহেতু : ব্যক্তি-বিশিষ্টতাই—চরিত্র। চরিত্রই ঘটনা বা কর্মের স্রষ্টা। সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টি বলিতে তাই ঘটনারাজির মাধ্যমে ব্যক্তি-স্বভাবকে পরিস্ফুট করাকেই বোঝায়।

মনীষী অ্যারিস্টটল নাটকীয় চরিত্রের চারিটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম, চরিত্র ভাল (good) হইবে। তবে অবিমিশ্র ভাল হইলে জগতে ট্র্যাজেডি গড়িয়া উঠিত না। সুতরাং ভাল ও মন্দের মাখামাখি অবস্থাই বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়, চরিত্রকে যথাযথ হইতে হইবে (appropriate)। তৃতীয়, চরিত্র বাস্তব (real) হইবে। চতুর্থ, চরিত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ (consistent) হইবে। রসসন্ধানী দৃষ্টি লইয়া অ্যারিস্টটল যে বক্তব্যগুলি রাখিয়াছেন তাহা সর্বকালের নাটকেই প্রযোজ্য। তবে একটি নির্দিষ্ট সমাজে ও সময়ের মধ্যেই অ্যারিস্টটলের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ।

অন্যভাবেও চরিত্রের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। যেমন, চরিত্র সরল হইতে পারে বা জটিল হইতে পারে, প্রকাশধর্মী হইতে পারে বা বিকাশধর্মী হইতে পারে, সক্রিয় হইতে পারে বা নিষ্ক্রিয় হইতে পারে।

সরল চরিত্র বলিতে অমিশ্রিত ভাল বা অমিশ্রিত মন্দ চরিত্রকে বোঝায়, কিন্তু ভালমন্দে মিশ্রিত যে চরিত্র তাহা জটিল। এই জটিলতা নিঃসন্দেহে ভাবের জটিলতা। সরল চরিত্রকেই আর এক অর্থে প্রকাশধর্মী বলা চলে, কারণ প্রকাশধর্মী চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় না ; আর বিকাশধর্মী চরিত্র হইল সেই চরিত্র—যাহা ঘটনার আবর্তে পড়িয়া পরিবর্তিত হয়। আবার সক্রিয় চরিত্র বলিতে আমরা সেই চরিত্রকে বুঝি, যাহা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া চলে, মুহূর্তের জন্যও রণে ভঙ্গ দেয় না। নিষ্ক্রিয় চরিত্র ঠিক ইহার বিপরীত। কারণ নিষ্ক্রিয় চরিত্র প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং পরিবেশের দ্বারা পরিচালিত হয়।

কোন নাটকেই সমস্ত চরিত্র সমান প্রাধান্য লাভ করে না। যে চরিত্রটি নাটকে প্রাধান্য লাভ করিয়া সকল ঘটনার কেন্দ্রে আসিয়া দাঁড়ায়, আমরা তাহাকেই মুখ্য চরিত্র বলি। অনেক সময় একাধিক চরিত্র মুখ্য চরিত্র হইয়া উঠিতে পারে। প্রধান চরিত্রের পার্শ্বে সৃষ্ট হইয়া উঠে পার্শ্বচরিত্র। পার্শ্বচরিত্রের উদ্দেশ্য নাটকীয় ক্রিয়াকলাপের সহায়তা করা, কখনও কখনও পার্শ্বচরিত্রকে অতি প্রাধান্য লাভ করিয়া বসিতে দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি দিক আলোচ্য। ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের প্রাধান্য, কমেডিতে কাহিনীর। কারণ মানবজীবনের গুরুগম্ভীর দিকটিই ট্র্যাজেডিতে প্রতিবিম্বিত। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, দীর্ণবিদীর্ণ চরিত্রের রূপায়ণই ট্র্যাজেডির লক্ষ্য, কিন্তু কমেডির লক্ষ্য জীবনের লঘু দিকটির রূপায়ণ। নিপুণ ঘটনাবিন্যাসের মাধ্যমে কমেডি-স্রষ্টা তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও নায়ক ও অন্যান্য প্রকার চরিত্রের লক্ষণ লইয়া বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। আলঙ্কারিকগণ নায়কের বহু গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নায়ককে সুদর্শন, তরুণ, উদার, বিনয়ী, কর্ম-নিপুণ, লোকপ্রিয়, বুদ্ধিমান, সুভাষ, কলারসিক, বীর, দৃঢ়চেতা ইত্যাদি হইতে হইবে। অলঙ্কারশাস্ত্রে—ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদাত্ত ও ধীরোদ্ধত—এই চারিপ্রকার নায়কের কথা বলা হইয়াছে।

আধুনিক কালের অনেক নাট্যসমালোচক নাট্যতত্ত্ববিদ্ অ্যারিস্টটলের কাহিনী ও চরিত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্তটির সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে নাট্য-বৃত্ত অপেক্ষা নাট্য-চরিত্রের গুরুত্ব অধিক। ইঁহাদের মতে সজীব সক্রিয় প্রাণবন্ত নাটকে চরিত্রই নাট্য-কাহিনীর নিয়ন্তা। আর যে নাটক নির্জীব, নিষ্ক্রিয়, প্রাণহীন, সেই নাটকে বৃত্তই চরিত্রের নিয়ামক। কারণ চরিত্রের মর্যাদার উপর নির্ভর করে নাটকের মর্যাদা। অপরিস্ফুট কতকগুলি চরিত্র লইয়া নাটক সার্থক হইতে পারে না। চরিত্রের প্রকাশ ও বিকাশের সহিত নাট্য-কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু চরিত্ররা তাহাদের ভাগ্যের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, সেহেতু কাহিনী বা বৃত্ত তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; নাট্যক্রিয়াও তাহাদের দ্বারা পরিচালিত। তাই আধুনিক মতবাদ হইল: Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work." ইঁহাদের মতে চরিত্রই নাটকের প্রধানতম উপাদান।

নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রসৃষ্টি মূল্যবান অংশ। প্রেক্ষণীয় চরিত্র নাটককে মর্যাদা দান করে।

রচনাশৈলী বা সংলাপ:

নাটকের কাহিনী-নির্মাণ বা বৃত্ত-রচনা এবং চরিত্রের যে প্রসঙ্গ আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি তাহা মূলত যে উপায়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়,

তাহা 'সংলাপ'। ঘটনার বিকাশ, ভাবনার প্রকাশ ও চরিত্রের পরিস্ফুটনে সংলাপই প্রধান অবলম্বন। গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটল ইহাকে বলিয়াছেন—'Diction'; ইংরেজী অনুবাদকগণ ইহাকে 'Expression' রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা ইহাকে রচনাশৈলী বা সংলাপ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

নাট্যকার তাঁহার নাটকে জীবনের বাস্তব-ঘনিষ্ঠ রূপটিকে ফুটাইয়া তোলেন বলিয়াই নাট্যতত্ত্ববিদ্ তাহাকে 'imitation of action' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ এই 'action'-এর ধারক ও বাহক হইল মানবজীবন। আর মানব-জীবনের সমস্ত কিছুই অর্থপূর্ণ ভাষার মাধ্যমে অনুকরণ-যোগ্য। নাট্যরচনায় তাই পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন বা সংলাপ হইল এক অপরিহার্য উপাদান। আবার সংলাপ শুধুমাত্র নাট্যচরিত্রের কথা নয়, সংলাপ নাট্যকারের রসসৃষ্টি ও তত্ত্বপ্রচারের প্রধান বাহন। এজন্য নাটকে সংলাপের গুরুত্ব এত বেশি।

সাহিত্যের কোন শ্রেণীতে যদি নৈর্ব্যক্তিকতা থাকিয়া থাকে তবে তাহা নাটকে। কারণ সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের স্রষ্টা তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতি উপলব্ধির কথা আপন ভাষাতেই ব্যক্ত করিবার অবকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন গল্প বা উপন্যাসে গল্পকার বা ঔপন্যাসিক প্রয়োজন হইলে আপন রচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় না। নাট্যকার নির্লিপ্ত (detached) এবং নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) না হইলে নাটকরচনা সার্থকতা অর্জন করে না। সুতরাং নাটকে নাট্যকারের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সম্ভব নহে, তাঁহাকে নাটকের নেপথ্যে থাকিয়া নাটকের গতি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে স্বইচ্ছায় সংঘটিত হইতে দিতে হইবে। সুতরাং নিজে নেপথ্যচারী হইয়া যদি নাট্যকারকে এ দায়িত্ব পালন করিতে হয়, তবে তাহার একমাত্র উপায় পাত্রপাত্রীকে সংলাপমুখর করিয়া আপন উদ্দেশ্য সফল করা। এই সংলাপের মাধ্যমেই একদিকে ঘটনা যেমন গতিশীল ও প্রাণময় হইয়া উঠে অন্যদিকে তেমনি চরিত্রগুলি বিকশিত হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, নাট্যবস্তুকে প্রাণবন্ত ও শ্রব্য করিয়া তুলিয়া কুশীলব ও দর্শকের মধ্যে সেতুবন্ধনের দায়িত্ব এই সংলাপের।

নাটকীয় সংলাপ বলিতে আমরা পাত্রপাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি বুঝিয়া থাকি। কিন্তু সকল উক্তি-প্রত্যুক্তিই সংলাপ নহে। নাটকে কথোপকথন বা উক্তি-প্রত্যুক্তি কয়েকটি বিশেষ গুণে মণ্ডিত হইয়া উঠিলে তবে তাহা নাটকীয়

লাপের মর্যাদালাভ করিতে পারে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নাটকে সংলাপের য়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা নাটকীয় কাহিনীকে গতিশীল করিয়া তুলিতে, রিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে, সমগ্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সুনিয়ন্ত্রিত রিতে এবং সর্বোপরি সমগ্র নাটকটির ধারাকে পরিণতির মোহনায় পৌছাইয়া তে—সংলাপের ভূমিকা অনিবার্য হইয়া উঠে। সুতরাং সংলাপকে হইতে ইবে যথোপযুক্ত শক্তিশালী, সঙ্গত ও ঔচিত্যবোধ-সঞ্জাত। সংলাপ সার্থকতা াভ করে যখন তাহা পরিবেশ, পরিস্থিতি ও চরিত্রের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি জায় রাখিতে সমর্থ। পরিবেশের দৃশ্য দেখিয়া এবং চরিত্রের রূপসজ্জা দেখিয়া বং তাহার পরিচয় পাইয়া দর্শকের মনে সংলাপের যে ভাষা প্রত্যাশিত হইয়া ঠে তাহা চরিত্রের মুখে যদি শোনা না যায় তবে তাহাদের প্রত্যাশা রূঢ়ভাবে ণ্ডিত হয় এবং চরিত্রগুলির সহিত দর্শকের সহমর্মিতা গড়িয়া উঠিতে পারে া। ঘটনা-পরিস্থিতি-চরিত্রের সহিত সঙ্গতিহীন ঔচিত্য-বিরোধী সংলাপ াটকের পক্ষে দুর্বলতা স্বরূপ।

৫

শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশনের জন্যই সংলাপ নহে। পরিবেশের সহিত যেমন াহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, তেমনি চরিত্রসত্তার সহিত সংলাপের ভাষা ও াকাশভঙ্গিরও একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ থাকে। সংলাপে যেখানে চরিত্রের শুধু খের কথা নহে, সমগ্রসত্তার অভিব্যক্তি হয়, সেখানে সংলাপ সার্থক। আর ংলাপ যেখানে শুধু কেবল ভাষার অহেতুক আড়ম্বর মাত্র, স্থান-কাল-পাত্রের হিত সঙ্গতিবিহীন, সেখানে তাহা চরিত্রকে যান্ত্রিক করিয়া তোলে মাত্র; াণবান, সজীব মানুষে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে না। অর্থাৎ যে সংলাপ াবেগচঞ্চল, দ্বন্দ্ব-উৎকণ্ঠায় স্পন্দিত, যে সংলাপ যত স্বাভাবিক, সেই সংলাপ ত সার্থক। স্বাভাবিকতা সংলাপের এক বিশিষ্ট গুণ। ইহার সহিত সংলাপের াস্তবিকতা ও সরলতার প্রশ্নটিও গভীরভাবে জড়িত। সূক্ষ্ম-মার্জিতরুচি-সম্পন্ন ্যক্তির মুখে স্থূল বক্তব্য ও অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তির মুখে সূক্ষ্ম-তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি াস্তব এবং স্বাভাবিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং পরিবেশ ও রিত্রবিশেষে সংলাপের ভাষা কখনও গুরু কখনও লঘু, কখনও মার্জিত কখনও ল, কখনও সাধু কখনও চলিত রূপ ধারণ করিয়া থাকে। ভাষার মধ্যে বিশিষ্ট াগ্‌ভঙ্গি, শব্দপ্রয়োগবৈচিত্র্য, আঞ্চলিকতা, চিত্রকল্পপ্রয়োগ ইত্যাদির দ্বারা রিত্ররূপ অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রের মুখে

সমাসবদ্ধ, যুক্তব্যঞ্জনপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ, অলঙ্কার-সমৃদ্ধি ও সংলাপের দীর্ঘতা উপযোগী, কারণ ইহাদের মাধ্যমে চরিত্রের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য ফুটিয়া উঠে। সামাজিক নাটকের চরিত্রগুলি বাস্তব ও পরিচিত জগৎ হইতে গ্রহণ করা হয় বলিয়া তাহাদের ভাষার মধ্যেও একটা সহজ নিত্যব্যবহার্যতা রহিয়াছে। তবে নাটকের ভাষা অবিকৃত বাস্তবের ভাষা হইতে পারে না, সে ভাষা শিল্পের ভাষা, তাহাকে একটু সাজাইয়া বর্ণ ও সুরের স্পর্শ দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, "The perfection of Diction is for it to be at once clear and not mean." বক্তব্যটি বিশদ করিয়া তুলিলে দেখা যায় যে, সাধারণ ও অসাধারণ শব্দের প্রয়োগেই নাটকীয় ভাষা নিখুঁত হইয়া উঠে। সাধারণ শব্দের প্রয়োগে নাটকের ভাষায় সুবোধ্যতা আসে ও অসাধারণ বা অসচরাচর ব্যবহৃত শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে ভাষা নীচতা ও গদ্যময়তা হইতে রক্ষা পায়। তবে শুধু ভাষা হইলেই হইবে না, ইহার সহিত বাগ্‌ভঙ্গি ও উচ্চারণ-রীতিকেও সার্থকভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। বৈচিত্র্যহীন ভাষা নাটকীয় উৎকর্ষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম।

নাটকীয় সংলাপ সাধারণত হ্রস্ব ও ক্ষিপ্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কেননা হ্রস্ব সংলাপ তীব্র গতি সৃষ্টি করিয়া চরিত্রগুলির বিকাশে যেমন সাহায্য করে, তেমনি নাটকীয় কাহিনীকে পরিণতির দিকে দ্রুত আগাইয়া যাইতে সাহায্য করে। তবে কখনও দীর্ঘ সংলাপও নাটকে সংযোজিত হইতে পারে। জীবনের কোন গভীর দর্শন, অন্তহীন বেদনা, মর্মান্তিক যন্ত্রণা, তীব্র আবেগ, সূক্ষ্ম চিন্তা প্রভৃতির প্রকাশে অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সংলাপ কার্যকর হইয়া উঠে। অলঙ্কৃত কিংবা কবিত্বমণ্ডিত ভাষা কখনও গ্রহণীয় কখনও বর্জনীয়। এ বিচারের ভার সম্পূর্ণ ভাবে নাট্যকারের উপর ন্যস্ত। কবিত্ব নাটকে ততক্ষণ স্থান অধিকার করিতে পারে যতক্ষণ তাহা নাটকের ধর্মকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া তাহার সহায়তা করে। যেখানে কবিত্ব নাটকীয়তাকে অতিক্রম করিয়া প্রাধান্য পাইতে চাহে—সেখানেই কবিত্ব বর্জনীয়।

পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী নাটকীয় সংলাপ হইবে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু পদ্যবন্ধে রচিত সংলাপ উপযুক্ত কিনা এই লইয়া সমালোচকগণ তর্কের ঝড় তুলিয়াছেন। অতীতে সাহিত্যের বাহন ছিল পদ্যভাষা, তখন সেই ভাষাতেই সব নাটক রচিত হইয়াছিল। গ্রীক নাটক, শেক্‌স্‌পিয়রের নাটক

গদ্যভাষার মাধ্যমে চরম উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগ হইল গদ্যের যুগ, তাই বর্তমান নাটকে ভাষা মূলত গদ্যভাষা। সুতরাং পদ্য ভাষা বা গদ্য ভাষা তাহা লইয়া তর্ক তোলা অবান্তর, কারণ যুগের প্রয়োজনে, দর্শকের রুচি ও রস-বস্তুর বিশিষ্টতা অনুযায়ী ভাষার বৈচিত্র্য ও বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান কালের কোন সামাজিক নাটক পদ্যবন্ধে রচিত হইলে তাহা আমাদের বাস্তব বুদ্ধিকে আহত করিবে, কেননা আমরা দৈনন্দিন জীবনে পদ্য ভাষায় কথা বলি না। সুতরাং এই জাতীয় রচনা কৃত্রিমতা-দোষদুষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে মতটি প্রচলিত তাহাও একেবারে মূল্যহীন নহে। কারণ ইঁহাদের মতে সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব, সুতীক্ষ্ণ ভাবাবেগ, সুগভীর হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করিতে পদ্যবন্ধ-ভাষা যতখানি উপযোগী, গদ্যভাষা সম্ভবত ততখানি নহে। তাই তাঁহাদের মতে, পদ্যভাষা নাটকে শুধু অংশবিশেষেই নহে সমগ্র নাটকের পক্ষে উপযোগী। বর্তমান কাল নানা সংঘাতে জর্জর, সমাজ-জীবন আবর্ত-সংকুল। আধুনিক নাটকের বিষয়বস্তু বর্তমান কাল ও বর্তমান সমাজ হওয়ায় তাহার সার্থক প্রকাশ-মাধ্যম পদ্য-ভাষা নহে—গদ্য-ভাষা। সুতরাং বলা চলে, নাটকে পদ্য-ভাষার কাল গত। ইহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। গদ্য-ভাষা এখন নাটকের প্রায় একছত্র অধিপতি। ইহাই যুগধর্ম, ইহাই যুগরুচি।

নাটকে ব্যবহৃত সংলাপকে ব্যবহারের পার্থক্যানুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে, যথা : (১) প্রকাশ (Expression), (২) স্বগতোক্তি (Soliloquy), (৩) অপবারিত (Disclosure), (৪) জনান্তিক (Aside), (৫) নেপথ্যভাষণ (Voice from within)।

সকলের শ্রবণের উদ্দেশে যে ভাষণ তাহাই প্রকাশ। অন্য পাত্রপাত্রীর শ্রবণের অযোগ্য ভাষণের নাম স্বগতোক্তি। রহস্যজাল উন্মোচন করিবার জন্য অন্য পাত্রের নিকট হইতে ফিরিয়া যে উক্তি করা হয় তাহাই অপবারিত। জনান্তিক হইল—যাহা অন্য পাত্রকে প্রচ্ছাদন করিয়া একজন অপরের নিকট প্রয়োগ করে। এবং উপস্থিত নাটকীয় পাত্রপাত্রীকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে রঙ্গমঞ্চের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া যে কথা বলা হয় তাহাই নেপথ্য ভাষণ। কিন্তু বাস্তবতার ও স্বাভাবিকতার দাবি মিটাইতে গিয়া এই কয়েক ধরনের সংলাপ বা ভাষণ আত্মবলিদান করিয়াছে।

স্বগতোক্তি, জনান্তিক, বা নেপথ্যভাষণ পূর্বের উপযোগিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই আধুনিক কালের নাটকে ইহারা সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত।

শেষকথা, নাট্যকার শিল্পী ও তাত্ত্বিক হইতে পারেন কিন্তু আগে তিনি শিল্পী পরে তাত্ত্বিক। তাই প্রতিভাধর নাট্যকার, যিনি শক্তিশালী শিল্পী—তাঁহার হাতে সংলাপ প্রকৃত আর্টের বস্তু হইয়া উঠে। নাটকীয় সংলাপ হইয়া উঠে "embellished with each kind of artistic ornaments."

ভাব : যে উপাদানগুলি লইয়া নাটক পূর্ণতা লাভ করে, তাহার মধ্যে ভাবনা বা মননের স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মনীষী অ্যারিস্টটল তাঁহার আলোচনায় উপাদানগুলির গুরুত্ব অনুযায়ী বিন্যাস করিতে বসিয়া ইহাকে তৃতীয় স্থান দিয়াছেন। মনন-বিহীন সাহিত্যকর্ম উচ্চমূল্য লাভ করিবার অযোগ্য ; অর্থাৎ যে নাটক শুধুমাত্র আবেগ-সর্বস্ব, কিংবা কল্পনা-সর্বস্ব, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়কে কিংবা হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে, কিন্তু আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করিতে পারে না। নাটক শুধু আমাদের হৃদয়ের কাছেই আবেদন জানাইবে না, তাহা আমাদের বুদ্ধির কাছেও আবেদন জানাইবে। আমাদের ভাবজগৎ বা মনোজীবনে সাড়া জাগাইবে। বিচিত্র সূক্ষ্মভাবনা যখন শুধুমাত্র রসিকচিত্তে আনন্দোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিয়া নিঃশেষ না হইয়া গিয়া ভাবুকের অন্তরে প্রতিফলিত হয় তখনই তাহা উচ্চতর শিল্পকর্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে। উপযুক্ত ভাবনা বা সূক্ষ্মমনন-প্রধান রচনা ভাব কিংবা অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত হইবার যোগ্য।

অতীত কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নাটকের ধারাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, নাটকের সূচনা কালে পাঠক ও দর্শক কাহিনীরস পান করিয়াই তৃপ্ত, কিন্তু কালের ধারা পরিবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র কাহিনী নহে—কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থিত চরিত্রগুলির অন্তর-গভীরে প্রবেশ করিবার আগ্রহ দর্শকচিত্তে জাগ্রত হইয়া উঠিল। কিন্তু এখানেই দর্শক-আগ্রহের শেষ হইল না, তাহারা চরিত্রগুলি যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন সেই সকল সমস্যার বাহ্য ও আন্তর রূপটিকে চিনিয়া লইতে চাহিল। ফলে তাহারা জটিল ভাবনায় জড়াইয়া পড়িল ; এবং নাটক দেখিতে বসিয়া ভাবনাই প্রধান হইয়া উঠিল। সমাজজীবনে নানা সমস্যায় জটিলতা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাও ক্রমেই

গুরুত্ব লাভ করিতেছে। বিখ্যাত আধুনিক নাট্যকার বার্নার্ড শ তো নাটককে 'discussion' বা ভাবনাকেই নাটকের রসকেন্দ্র বলিয়া চিহ্নিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাঁহার রচিত নাটকগুলি 'Discussion Drama' নামে চিহ্নিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত, একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। নাটকে যে উপাদানগুলি প্রয়োজন তাহার কোন একটিকে মাত্র লইয়া নাটক রচনা করা সম্ভব নহে। কাহিনী বা চরিত্রকে বাদ দিয়া শুধুমাত্র ভাবনাকে লইয়া যেমন নাটকসৃষ্টি সম্ভব নহে, তেমনি ভাবনাকে অস্বীকার করিয়াও তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং সমস্ত উপাদানের মিশ্রিত সামঞ্জস্যই নাট্য-রচনায় উৎকর্ষের উৎস। এই উৎকর্ষ রসোৎকর্ষ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দৃশ্য ঃ সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের অপর নাম দৃশ্যকাব্য, সুতরাং দৃশ্য নাটকের পক্ষে কম মূল্যবান নহে। যদিও দৃশ্য বস্তুটি নাটকের বহিরঙ্গ উপাদান, তাহা সত্ত্বেও নাটকে ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নাটকে পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে, আবেগ সঞ্চারে, উদ্দীপন বিভাবের কাজে দৃশ্য স্বীকৃতি পাইবার যোগ্য উপাদান। ইহার উপযোগিতা অস্বীকার করা চলে না, কেননা দৃশ্য পাত্রপাত্রীর অবস্থান ও আকৃতির ব্যঞ্জনা বহন করে।

'দৃশ্য' শব্দটি সাজসজ্জাকেও বুঝায়। আধুনিককালে কোন কোন নাটকে দৃশ্যসজ্জার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হইতেছে বটে কিন্তু সাজসজ্জাহীন নাটকাভিনয় অসম্ভব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে কথাটি স্মরণীয় তাহা হইল এই যে, দৃশ্যসজ্জা ও সাজসজ্জা নাটকের বাহ্য উপাদান বলিয়াই ইহার ব্যবহার সীমিত হওয়া একান্তই প্রয়োজন এবং মঞ্চমায়া সৃষ্টি করিতে দৃশ্যের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াও বলি—ইহাতে নাট্যকারের ভূমিকা যতটুকু তাহা অপেক্ষা মঞ্চশিল্পীর অধিকার অনেক বেশী।

সঙ্গীত ঃ প্রাচীনকালে নাটক যেমন পদ্য-বন্ধে রচিত হইবার রীতি প্রচলিত ছিল, তেমনি, তৎকালীন নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহারও ছিল সুপ্রচলিত একটি রীতি। গ্রীক নাটকের 'কোরাস' (chorus) সঙ্গীত এই উক্তি সমর্থন করে। কোরাস সঙ্গীত বা সমবেত সঙ্গীত গ্রীক নাটকের এক বিশিষ্ট অংশ রূপেই গৃহীত হইত। কিন্তু আধুনিক নাটকে সঙ্গীত তাহার পূর্ব মূল্য লইয়া

আজ আর উপস্থিত নাই। তাহার প্রাধান্যের দিন গত হইয়াছে। পূর্বে সঙ্গীত যে ভূমিকা লইত বর্তমান কালের নাটকে সংলাপ সেই স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন কালের স্রোত আধুনিক কালের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই স্রোতে পুরাতন ধারণা ভাসিয়া গিয়াছে। আধুনিক নাটক সঙ্গীতবিহীন হইয়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে সক্ষম। কোন কোন নাট্যকার তো সঙ্গীতকে অবাঞ্ছিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, যে স্রষ্টা সংলাপ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীতের সাহায্যে রসসৃষ্টি করিতে উদ্যোগী তিনি স্রষ্টা হিসাবে দুর্বল। সঙ্গীত আধুনিক নাটকে বর্জনীয়, কেননা তাহা কৃত্রিম। ইহাই নাট্যকারগণের ধারণা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আধুনিক সাঙ্কেতিক নাটকে সঙ্গীতের স্থান সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয় নাই। গীতিনাট্যেও ইহার স্থান পূর্ববৎ রহিয়াছে। কেন তাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে, দৃশ্যাদির মত সঙ্গীত নাটকের বাহ্য উপাদান মাত্র।* কিন্তু তাই বলিয়া নাটকের আঙিনায় সঙ্গীতের প্রবেশ চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে এমন কথা বলা চলে না। উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত স্থানে ও কালে পাত্রপাত্রী পরিবেশিত সঙ্গীত নাট্যরসকে সমৃদ্ধ করিতে যে সক্ষম—এ সত্য অনস্বীকার্য। তবে প্রয়োজনবিহীন সঙ্গীত সংযোজন নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর।

নাটকের গঠন প্রসঙ্গ ঃ

আমরা উপরে যে উপাদানগুলি লইয়া আলোচনা করিলাম এ উপাদানগুলি লইয়া নাটকের দেহটি গড়িয়া উঠে। মানবদেহের যেমন জন্ম, বিকাশ ও বিনাশ আছে অর্থাৎ তাহার যেমন সূচনা হইতে সমাপ্তি আছে, তেমনি নাট্যদেহেরও আদি, মধ্য ও অন্ত আছে। মানব-জীবনের গতিশীল পরিণামমুখী রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিতে নাট্যকার যে কাহিনী বা বৃত্তকে নির্বাচন করেন তাহা আদি, মধ্য ও অন্ত সম্বলিত। এলোমেলো ও কার্যকারণ সূত্রের দ্বারা গ্রথিত ও নিয়ন্ত্রিত না হইলে তাহার চলে না। কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ, পরস্পর সম্পর্কিত ঘটনাগুলিই সূচনা হইতে সমাপ্তির দিকে আগাইয়া গিয়া একটি বিশ্বাসযোগ্য পরিণতি লাভ করে। কাহিনীর এই সূচনা হইতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবার স্তরপরম্পরাকে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাট্যাকারগণ পাঁচটি ভাগে চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহাই নাটকের

পঞ্চসন্ধি। আমরা ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলায় ইহা ক্রমানুসারী করিয়া সাজাইয়া দিতেছি :

	ইংরেজী	সংস্কৃত	বাংলা
(১)	Exposition or Introduction	মুখসন্ধি	প্রস্তাবনা
(২)	Rising action or Complication	প্রতিমুখসন্ধি	ক্রমোন্নতি
(৩)	Climax or Turning point	গর্ভসন্ধি	তুঙ্গতা
(৪)	Falling action or Resolution	বিমর্ষসন্ধি	ক্রমাবনতি
(৫)	Catastrophe or Conclusion	নির্বহণসন্ধি	উপসংহার

নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ী অঙ্ক বিভাগ হয় এবং নাটকের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত হয়। বিশেষ একটি কালের সীমায় সীমিত কাহিনীর ক্রম-বিকাশের ধারা অঙ্ক বিভাগের ভিত্তি। এক একটি অঙ্কের মধ্যে নাটকীয় গতি এক একটি বিশেষ রূপ ও বেগ লাভ করে। নাটকীয় ঘটনার গতি পাঁচটি অঙ্কে আরোহণ ও অবরোহণের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করে। নাটকের ঘটনাগতি উপরোল্লিখিত পঞ্চ-রীতি অনুযায়ী পঞ্চ অঙ্কে বিভক্ত হইলেও সব নাটকের ঘটনাগতি যে একই পর্যায় গ্রহণ করে তাহা নহে।

অঙ্কের ক্ষুদ্র বিভাগ হইল দৃশ্য। অঙ্ক বিভাগ যেমন নির্দিষ্ট কালসীমায় সীমিত, দৃশ্য তেমনি দেশ বা স্থানের সীমায় ঘটনাস্থাপনের দ্বারা চিহ্নিত। অঙ্কের আর এক নাম যেমন পর্ব তেমনি দৃশ্যের আর এক নাম পর্বাঙ্গ।

নাটকীয় কাহিনী একটি অখণ্ড কাহিনী। কিন্তু নাট্যকার অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত করিয়া সেই কাহিনীকে উপস্থিত করেন। প্রত্যেকটি অঙ্ক আপাত-বিচ্ছিন্ন, পূর্ণায়ত ও স্বাধীন হইলেও সমগ্র কাহিনীর ক্রমবিকাশের ধারার সহিত তাহা গভীরভাবে যুক্ত। অঙ্কগুলি পরস্পর সম্পর্কিত, তাহারা নিবিড় যোগসূত্রের দ্বারা আবদ্ধ, এককভাবে ও সমবেতভাবে নাটকীয় কাহিনীর অখণ্ডতা ও ঐক্য বজায় রাখিতে তাহাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৃশ্য অঙ্কের ক্ষুদ্রতর বিভাগমাত্র। ইহা চরিত্রের স্থানিক বা দৈনিক অবস্থান নির্দেশ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। দৃশ্যের মধ্যে ঘটনা বিশেষ বিশেষ চিত্র পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হয়। এই চিত্র পরিবেশ নাটকীয় চরিত্রগুলিকে বাস্তবানুগ করিতে এবং তাহাদের ভাব দর্শকচিত্তে সঞ্চার করিতে বিশেষ সাহায্য করে। দৃশ্যগুলির মাধ্যমে নাট্যকাহিনীর বিচিত্র ধারাও আত্মপ্রকাশ করে।

সুতরাং, ইহা স্পষ্ট যে, একাধিক দৃশ্য একটি বিশেষ অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সেই অঙ্কের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ করে। যেখানে তাহা করে না সেখানে দৃশ্য সংযোজন অযৌক্তিক ও অনৌচিত্য দোষদুষ্ট।

গ্রীক ও সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের এই সন্ধি বিভাগ বহুদিন ধরিয়া প্রচলিত। বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার শেকস্পীয়র তাঁহার অনেকগুলি নাটককে এই বিভাগের দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক কালে পঞ্চাঙ্ক নাটক ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়া চার অঙ্ক কিংবা তিন অঙ্কের স্থান করিয়া দিতেছে। ইহা ব্যতীত আধুনিক কালের আর একটি বিশেষ নাট্যরূপ —একাঙ্কিকা। একটিমাত্র অঙ্কেই সমগ্র নাটকের সমাপ্তি। বলা বাহুল্য, অঙ্কসংখ্যা কমিলেও নাট্যকারগণ পঞ্চ-সন্ধির তাৎপর্যকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাই আধুনিক কালের নাটকের বহিরঙ্গের পরিবর্তন ঘটিলেও অন্তরঙ্গ বিচারে সুপ্রাচীন রীতি আজও অনুসৃত।

নাটকের শ্রেণী বিন্যাস :

নাটকের শ্রেণী বিন্যাস করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় দার্শনিক কোচের মতে সাহিত্যেও শ্রেণী বিভাগ সম্ভব নহে। তিনি মনে করেন যে, শ্রেণী বিভাগ করিতে বসিলে কয়েকটি মূলগত নীতি মানিয়া লইতে হয়, মূলগত নীতি মানিতে গেলে সাহিত্যিক ও শিল্পীর সৃজনীশক্তিকে অস্বীকার করা হয়। তাহা সত্ত্বেও সমালোচকগণ আলোচনার সুবিধার্থে নাটকের নানা শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, বিষয় ও রীতির আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর নির্ভর করিয়া আলঙ্কারিকগণ সংস্কৃত নাটকে দশটি রূপক [সংস্কৃত নাটকের ভিন্ন নাম] ও আঠারটি উপ-রূপকের ভাগকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যেরও আমরা বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্য করি।

আধুনিক কালের একজন নাট্যতত্ত্ববিদ্ চারটি শ্রেণীর বিভাগকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন :

(১) রসপ্রধান—ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা ও ফার্স ;

(২) ভাবপ্রধান—ক্লাসিক্যাল, রোমান্টিক ও বাস্তব ;

(৩) রূপপ্রধান—গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ;

এবং (৪) উদ্দেশ্যপ্রধান—সমস্যামূলক নাটক ও চরিত নাটক।

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীবিভাগ কোন দিক হইতেই সম্পূর্ণতার দাবি করিতে পারে না। কিন্তু আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম যে, বিভিন্ন উপায়ে নাটকের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। নাট্যশ্রেণীর বিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে উপরিউল্লিখিত উপায়গুলি ব্যতীত আরও কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করা চলে, যেমন রচনারীতি অনুসারী কিংবা আয়তন অনুসারী।

গ্রীক নাট্যসাহিত্যের বিচারে দুই শ্রেণীর নাটকের কথা উল্লিখিত ছিল—দুঃখাত্মক বা Tragedy এবং সুখাত্মক বা Comedy। পরবর্তী কালে ইংরেজী নাট্যশাস্ত্রালোচনায় পণ্ডিতেরা ইহাকে আরও সম্প্রসারিত করিয়া তিনটি প্রধান ও দুইটি উপপ্রধান জাতিতে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করেন। যথা: (১) Tragedy, (২) Comedy, (৩) Tragi-comedy.

উপজাতি—(১) Melodrama, (২) Farce।

আমরা লক্ষ্য করিলাম, নানা উপায়ে নাটকের শ্রেণীবিভাগ করা চলে। তবে রস সংবেদনার ভিত্তিতে যে বিভাগ, আমাদের বিস্তৃত আলোচনায় আমরা শুধুমাত্র তাহাই গ্রহণ করিব। এই শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম নাম—ট্র্যাজেডি।

ট্র্যাজেডি: আনন্দ ও বেদনা মিশ্রিত জীবনরস পরিবেশন করা সাহিত্যের কাজ। তাই সাহিত্যে কখনও হর্ষোৎফুল্ল জীবনের অভিব্যক্তি, কখনও বেদনা-বিহ্বল জীবনের অভিপ্রকাশ। জীবনের এই দুই রূপ নাটকে যতখানি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট, সম্ভবত সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগে তাহা নহে। উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার জীবন-পরিণতি কোথাও মিলনান্তক, কোথাও বা বিয়োগান্তক, কিন্তু সেজন্য উপন্যাসের শিল্পরূপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু নাটকে বিয়োগান্তক ও মিলনান্তক পরিণতি সম্বলিত নাটকের শিল্পরূপে দুস্তর ব্যবধান। ফলে সৃষ্টির পূর্বেই নাট্যরস সম্পর্কে নাট্যকারকে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল, মানবজীবনের সত্যতম রূপটি কোন্ শ্রেণীর রচনায় উদ্ঘাটিত হয়? মিলনের আনন্দে, না বিচ্ছেদের বেদনায়? মানব-জীবনে সুখ আছে, আনন্দ আছে—কিন্তু তাহা আকাশের বুকে অঙ্কিত রামধনুর মতই ক্ষণস্থায়ী! অপর পক্ষে নিষ্ঠুর দুঃখময় জীবনের উপলব্ধিই হইল জীবনের সত্যতম, নিবিড়তম উপলব্ধি। এই জীবনসত্যের সার্থক উপলব্ধি হইতে

শিল্পকলার উৎপত্তি, দর্শনের উৎপত্তি, ধর্মসাধনার উৎপত্তি। ট্র্যাজেডির মধ্যে এই জীবনসত্যের সর্বোত্তম রূপায়ণ হয় বলিয়াই, ট্রাজেডি শিল্পসাধনার মহত্তম সৃষ্টি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি রচয়িতাগণ জীবনের এই করুণ ও মর্মান্তিক সত্যকেই চিরন্তন রসরূপ দান করিয়াছেন।

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা : ট্র্যাজেডির জন্মস্থান—প্রাচীন গ্রীসদেশ। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটল তাঁহার 'Poetics' নামক অলঙ্কার শাস্ত্রে এই ট্র্যাজেডির একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কালের পরিবর্তনে ও ধর্মের প্রভাবে আধুনিক কালে গ্রীক মনীষী প্রদত্ত সংজ্ঞাটির সামান্য পরিবর্তন হইলেও—ইহার প্রয়োজনীয়তা মূল্য হারায় নাই।

অ্যারিস্টটল গ্রীক ভাষায় যে সংজ্ঞাটি লিখিয়াছিলেন, পরবর্তী কালের ইংরেজ পণ্ডিতগণ তাহা ইংরেজী ভাষায় ভাষান্তরিত করেন। ফলে একই সংজ্ঞা ভাষান্তরিত হইবার সময় সামান্য পরিবর্তিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যেমন ইন্‌গ্রাম বাইওয়াটার যে অনুবাদ করিয়াছেনতাহা নিম্নরূপ:

"A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also as having magnitude, complete in itslf, in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative form, with incidents arousing pity and fear wherewith to accomplish its catharsis of such emotions"

কিন্তু আধুনিক কালের নাট্যালোচনায় যে অনুবাদ বহু ব্যবহৃত তাহা অধ্যাপক বুচারকৃত। অধ্যাপক বুচারের অনুবাদ নিম্নরূপ :

"Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornaments, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.

মনীষী অ্যারিস্টটল প্রদত্ত এই সংজ্ঞা হইতে আমরা ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে কয়েকটি লক্ষণ জানিতে পারি।

প্রথমত, ট্র্যাজেডি হইল জীবনের কোন ঘটনার অনুকরণ—imitation of an action ;

দ্বিতীয়ত, ট্র্যাজেডিতে জীবনের কোন গুরুতর—serious ঘটনা থাকিবে;

তৃতীয়ত, ট্র্যাজেডির ঘটনা হইবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পরিমিত—complete and of certain magnitude ;

চতুর্থত,ট্র্যাজেডির ভাষায় থাকিবে আনন্দজনক উপাদান—in language embellished with each kind of artistic ornaments ;

পঞ্চমত, ট্র্যাজেডির প্রকাশ রীতি হইবে নাটকীয় অর্থাৎ দৃশ্যাত্মক, বর্ণনাত্মক নহে—in the form of action, not of narrative: এবং

ষষ্ঠত, ট্র্যাজেডি সহানুভূতি ও আতঙ্ক উদ্রেক করিয়া ঐ অনুভূতিগুলি হইতে দর্শকের চিত্তকে মুক্তি দিবে।

আধুনিক কালে এই সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করিয়া নানা তর্ক-বিতর্ক দেখা দিলেও ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব বিচারের ইহাই মূল ভিত্তিস্বরূপ।

আদর্শবাদী দার্শনিক হেগেল ট্র্যাজেডির মধ্যে একটি শাশ্বত বিচারবোধের (eternal justice) সন্ধান পাইয়াছেন। দুঃখবাদী শোপেন হাওয়ারের মতে ট্র্যাজেডি আমাদের অন্তরে এই ধারণাই সৃষ্টি করে যে, জীবনে সুখ নাই, তাই জীবনের প্রতি আকর্ষণেরও কোন মূল্য নাই। দার্শনিক নীটশে ট্র্যাজেডির মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন জীবনের গৌরব ও নিষ্ফলতার দ্বন্দ্ব।

দার্শনিকগণের সহিত নাট্যতত্ত্ববিদ্ সাহিত্য সমালোচকগণও তাঁহাদের নিজস্ব বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন। বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক লুকাস ট্র্যাজেডির মধ্যে জীবন-সত্য ও জীবন-সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : "So the essence of Tragedy reduces itself to this —the pleasure we take in a rendering of life both serious and true."

উপরের আলোচনা হইতে ইহা প্রমাণিত হইল যে, ট্র্যাজেডিতে জীবনের সত্য ও গুরুতর রূপ, দুঃখ ও সংঘাতের রূপই উদ্‌ঘাটিত হয়। এখন প্রশ্ন হইল, জীবনে অন্তর্নিহিত সত্য ও গুরুতর রূপের যে অনিবার্য বেদনা তাহাই যদি ট্র্যাজেডির মূল উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা আমাদের আনন্দ দান করে কেন ?

ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয় কেন ?

এই প্রশ্নটির আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে অ্যারিস্টটল ব্যবহৃত একটি শব্দকে কেন্দ্র করিয়া—'catharsis'। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, ট্র্যাজেডি চিত্তে সহানুভূতি, করুণা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া, এই অনুভূতি হইতে দর্শক-চিত্তকে মুক্ত করে। অনেকে মনে করেন অ্যারিস্টটল ব্যবহৃত Catharsis শব্দটি চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত। দেহে রক্তাধিক্য ঘটিলে চিকিৎসকগণ যেমন কিছুটা রক্ত বাহির করিয়া সুস্থ করিয়া তোলেন, ট্র্যাজেডিও তেমনি দর্শকের মন হইতে কৃত্রিম বাসনা কামনার প্রবলতা দূর করিয়া মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনে। অর্থাৎ "its function is to purge away our excess emotions." নাট্য-সমালোচক লেসিং এই শব্দটির অর্থ করিয়াছেন পবিত্রীকরণ—'purification.'

কিন্তু লেসিং প্রদত্ত এই ব্যাখ্যা অনেকে স্বীকার করেন না। বাসনা-কামনাকে যেমন পরিপূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করা চলে না, আবার তাহাদিগকে পুরামাত্রায় ভোগ করাও তেমনি সম্ভব নহে। সুতরাং ট্র্যাজেডি মনের রুদ্ধ অতিপ্রবল ভাবকে দূর করিয়া দেয়। এই রুদ্ধ ভাবের সহজ নিষ্ক্রমণ না হইলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

অধ্যাপক লুকাস শব্দটির আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আমাদের চিত্ত হইতে অতিশয়িত আবেগ দূর করা অপেক্ষা আমাদের স্বভাবশীতল চিত্তে আবেগ জাগাইয়া তোলার প্রয়োজনই বেশী।

আমরা আলোচনা হইতে দেখিতেছি, ট্র্যাজেডি আমাদের চিত্তদেশে আবেগ সৃষ্টি করিয়া এবং তাহা প্রশমিত করিয়া আমাদের শেষপর্যন্ত চরম আনন্দ দান করে। কিন্তু কেন ? যে দুঃখ জীবনে সত্য হইয়া উঠিলে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে—সেই জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে পাইবার এই আন্তরিক প্রয়াস কেন ? উত্তরে বলা চলে, নাটকের কুশীলবদের দুঃখে বিগলিতচিত্ত হইয়া যখন দর্শকদের আত্মবিলুপ্তি ঘটে, তখনকার সেই মুহূর্তে দর্শকের মন আনন্দদর্শনের গভীর চেতনায় যে রূপের সাক্ষাৎ পায়, তাহাতে সে আনন্দিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :

"দুঃখ অপ্রিয় নয় ; সাহিত্যই তার প্রমাণ। যা কিছু আমরা বিশেষ ক'রে অনুভব করি তাতে আমরা বিশেষ ক'রে আপনাকে পাই, সেই পাওয়াতেই

আনন্দ। চারিদিকে আমাদের অনুভবের বিষয়ে যদি কিছু না থাকে, তাহ'লে সে আমাদের পক্ষে মৃত্যু, কিংবা যদি কেবলমাত্র তাই থাকে যাতে স্বভাবত আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব বা ক্ষীণতা তাহ'লে মনে অবসাদ আসে, কেননা তাতে ক'রে আমাদের আপনাকে অনুভব করাটা সচেতন হয়ে ওঠে না। দুঃখের অনুভূতি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি চেতিয়ে রাখে, কিন্তু সংস্কারে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি এবং আঘাত জড়িয়ে থাকে, সেইজন্য আমাদের প্রাণপুরুষ দুঃখের সম্ভাবনায় কুণ্ঠিত হয়। জীবন-যাত্রার আঘাত বা ক্ষতি সাহিত্যে নেই বলেই বিশুদ্ধ অনুভবটুকু ভোগ করতে পারি।"

সুতরাং বলা অসঙ্গত নহে যে—Tragedy is a luxury of sorrow. অন্যভাবে বক্তব্যটিকে রাখিলে বলা চলে যে, "প্রবল অনুভূতিমাত্রই আনন্দ-জনক, কেননা সেই অনুভূতিদ্বারা প্রবলরূপে আমরা আপনাকে জানি।"

ট্র্যাজেডির আনন্দসঞ্চারী ক্ষমতা সম্পর্কে আরও নানা মতের সন্ধান পাওয়া যায়। Fontenelle বলেন, ট্র্যাজেডির দুঃখ কাল্পনিক। তাই এই বোধ আমাদের আনন্দ দান করে। দার্শনিক হিউম বলেন, ট্র্যাজেডি আমাদের আনন্দ দেয় তাহার কারণ উহার বাক্‌শক্তি—Eloquence। ট্র্যাজেডির বাক্‌স্পন্দ, ছন্দ ও সংগীত আমাদের চিত্তের বেদনাকে আনন্দে রূপান্তরিত করে। এই মতবাদটির সহিত রবীন্দ্রনাথের মতের অনেকখানি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বিখ্যাত নাট্য-তত্ত্ববিদ অধ্যাপক লুকাস বলিয়াছেন: "Tragedy, then, is a representation of human unhappiness which pleases us notwithstanding, by the truth with which it is seen and the still with which it is communicated!"

ট্র্যাজেডি বোধের তিনটি উপাদান:

ট্র্যাজেডি-বোধের তিনটি উপাদান:—(১) দুঃখবোধ (Suffering), (২) সংকট (Struggle) এবং (৩) কার্যকারণত্ব (Casuality)। শুধুমাত্র দুঃখবোধ থাকিলে শোকের উৎপত্তি হয়, কেবলমাত্র সংঘর্ষে বীরত্বের প্রকাশ ঘটে; আবার কেবলমাত্র কার্যকারণত্বে যুক্তিসিদ্ধতার প্রমাণ ঘটে। কিন্তু ট্র্যাজেডির সৃষ্টিতে এই তিনটি উপাদানের সমন্বয় প্রয়োজন।

ট্র্যাজেডির নায়ক কে ?

এই প্রসঙ্গে ট্র্যাজেডির নায়কের কথা আসিয়া পড়ে। মানুষের নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্যয়ই ট্র্যাজেডিতে দৃশ্যধর্মী হইয়া উঠে। কিন্তু যে-কোন ভাগ্য-বিপর্যয়ই ট্র্যাজিক হইবার যোগ্য নহে—সেই ভাগ্য-বিপর্যয়ই ট্র্যাজিক আবেদন সৃষ্টি করে যাহা অপ্রত্যাশিত, যাহা unmerited misfortune। এই অপ্রত্যাশিত ভাগ্য-বিপর্যয় যে-কোন ব্যক্তির জীবনে আসিতে পারে, কিন্তু কোন অতি সৎ, অতি ধার্মিক ব্যক্তির জীবনে নামিয়া আসিতে দেখিলে আমরা আহত হই বটে কিন্তু এইরূপ ব্যক্তির পতন আমাদের চিত্তে করুণা বা ভয় উদ্রিক্ত করে না ; আবার অতি দুর্বৃত্ত ব্যক্তির পতন মানুষের অন্তরকে সুখী করে, কারণ তাহা আমাদের নীতিবোধকে তৃপ্ত করে ; আমাদের চিত্তে তাহা সহানুভূতি বা ভয় উদ্রেক করে না। তাহা হইলে প্রশ্ন হইল, ট্র্যাজেডির নায়ক কে ? অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, "He (a tragic hero) falls from a position of lofty eminence; and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness but to some great error of frailty." উক্তিটি যে সত্য নির্দেশ করে তাহা হইল—নায়কের ভাগ্যে যে বিপর্যয় নামিয়া আসিবে তাহা কোন চারিত্রিক হীনতা বা পাপকর্মের জন্য নহে, ঘটিবে ভ্রান্তবিচারবুদ্ধি কিংবা দুর্বলতার জন্য—error of frailty। ইহাকেই অন্য পণ্ডিতেরা 'fatal flaw', 'hamartia', 'error of judgement' প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করিয়াছেন।

ট্র্যাজেডির নায়কের জীবনের কোন ভ্রান্তির ফলে যখন বিপর্যয় দেখা দেয় তখন তাহা দেখিয়া আমাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়। আবার বিপর্যস্ত লোকটির সহিত একাত্ম হইয়া আমাদের মনে সহানুভূতি জাগ্রত হয়। ঝড়ের পর যেমন বিশ্বপ্রকৃতি প্রসন্ন হইয়া উঠে, আমাদের অন্তরও আলোড়িত হইয়া ক্রমে প্রসন্ন হইয়া উঠে। তখন নাটক রসোত্তীর্ণ হয়। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে এই অবস্থাটিকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, লৌকিক ভাব শোক, হর্ষ প্রভৃতি বিভাব অনুভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া যখন দর্শকের চিত্তে রসে পরিণত হয় তখন তাহা আনন্দ সৃষ্টিতে সক্ষম। কারণ তখন সেই রস লৌকিকতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অলৌকিক হইয়া উঠে।

ট্র্যাজেডির পরিণতি কি ?

প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে ট্র্যাজেডির সমাপ্তি বা পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। ইংরেজী Tragedy শব্দটির বাংলা অনুবাদ করিয়া বিয়োগান্ত করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় ট্র্যাজেডির পরিসমাপ্তি ঘটিবে এক বা একাধিক মৃত্যুতে। অর্থাৎ মৃত্যুই হইবে ট্র্যাজিক নাটকের অনিবার্য পরিণাম। কিন্তু আধুনিক অনেক সমালোচক মৃত্যুকে ট্র্যাজেডির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করেন না। এই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন: "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়।..." উদ্ধৃত হইতে ইহা প্রমাণিত হইল যে, আপাত মিলনের মধ্যেও ট্র্যাজেডির মর্মবিদারী বেদনা আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং চিরবিচ্ছেদ-সৃষ্টিকারী মৃত্যু যেমন, তেমনি তীব্র বেদনাজনক ব্যর্থতার কাহিনী ট্র্যাজেডির উপজীব্য ; অর্থাৎ শুধুমাত্র বিয়োগান্তই নহে—যে কোন দুঃখবহ বিষাদান্ত পরিণতিই—unhappy ending—ট্র্যাজিক।

আধুনিক কালের ট্র্যাজেডি ঃ

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিলেও, গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই। শুধুমাত্র কিছু কিছু সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

অ্যারিস্টটল তাঁহার সংজ্ঞাটিকে ত্রি-ঐক্য অর্থাৎ স্থানগত ঐক্য (Unity of place), কালগত ঐক্য (Unity of Time) এবং ঘটনাগতঐক্য (Unity of Action)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের নাট্য-কারদের পক্ষে এই ত্রয়ী-বিধি মানিয়া চলা যে সম্ভব হয় নাই তাহার প্রমাণ বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের নাট্যসৃষ্টি। শেকস্‌পীয়র অনেক ক্ষেত্রে এই ঐক্য-বিধি রক্ষা করিয়া চলেন নাই। সুতরাং আধুনিক কালের নাট্য-রচনায় এই ত্রয়ী-ঐক্য-বিধি অনেকাংশে শিথিল। তবে ইহা অপেক্ষা পরিবর্তিত যে রূপটি আরও বেশী চোখে পড়ে তাহা হইল ট্র্যাজেডির নায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে। প্রাচীন কালের ট্র্যাজেডির নায়ক সমাজের উপর-তলার অধিবাসী, উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন, মহৎ ও অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, অ্যারিস্টটল

ইহাকেই 'position of lofty eminence' বলিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক যুগ গণতন্ত্রের যুগ। এই যুগে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, মহৎ ও অসাধারণ ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে সাধারণ মানুষ। বর্তমানে যে-কোন ব্যক্তির হ্রস্ব-দীর্ঘ রূপায়ণ ট্র্যাজেডির মর্যাদা পাইবার যোগ্য। আধুনিক গণতন্ত্র ব্যক্তিমানুষকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং গ্রীক ট্র্যাজেডির পরিবেশের সহিত শেকস্পীয়রের ট্র্যাজেডি-পরিবেশের অনেক পার্থক্য, আবার তাহার পরবর্তী স্তরে আধুনিক ট্র্যাজেডির পরিবেশের সহিত শেকস্পীয়রীয় পরিবেশের দুস্তর ব্যবধান। আধুনিক কালের ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তুর যেমন ঘটিয়াছে পরিবর্তন, তেমনি রূপের হইয়াছে রূপান্তর। ঘটনার উপর হইতে সরিয়া চরিত্রের উপর প্রাধান্য পড়ায়, সাধারণ মানব-মানবীর জীবনের দুঃশোক, ব্যথা-বেদনা লইয়া আধুনিক ট্র্যাজেডি জন্ম লইতেছে। ইহাই Domestic Tragedy নামে পরিচিত। ট্র্যাজেডির এই বিবর্তনের মূলে আছে—কালের পরিবর্তন।

ট্র্যাজেডির শ্রেণী বিভাগ :

গঠন-রীতির দিক হইতে বিশ্লেষণ করিলে ট্র্যাজেডিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা :

(১) সিম্‌পল (Simple) ট্র্যাজেডি—করুণা ও বিস্ময়-উদ্রেককারী ঘটনাহীন ও জটিলতাহীন রচনা, যাহা ভয় ও অনুশোচনা সৃষ্টি করে।

(২) কম্‌প্লেক্স (Complex) ট্র্যাজেডি—এই জাতীয় রচনায় ভয় ও অনুশোচনার সহিত বিস্ময়-উদ্রেককারী ঘটনার সমন্বয় ঘটে।

(৩) এথিক্যাল (Ethical) ট্র্যাজেডি—এই জাতীয় ট্র্যাজেডির মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয়-নৈতিক সমস্যা।

(৪) প্যাথেটিক (Pathetic) ট্র্যাজেডি—এই জাতীয় রচনার অন্যতম অবলম্বন কারুণ্য মিশ্রিত প্রলাপ ও বিলাপ।

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যেমন : (১) ভয়প্রধান (Horror Tragedy); (২) শোচনা-প্রধান (Pathetic Tragedy); (৩) বিস্ময়প্রধান (High Tragedy); (৪) ধর্ম-বিষয়ক (Moral Tragedy); (৫) বাসনা-বিষয়ক (Passion Tragedy); (৬) প্রতিহিংসামূলক (Revenge Tragedy)। এই ভাবে আরও নানান শ্রেণীতে ইহাকে ভাগ করা চলে।

ট্র্যাজেডি ভারতীয় জীবনাদর্শ :

গ্রীস দেশের ডায়োনিসস মন্দিরের বেদীতে গ্রামের ভক্ত পূজারীরা যে কোরাস সঙ্গীত গাহিত তাহা হইতে ট্র্যাজেডির জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং ট্র্যাজেডির জন্মস্থান—প্রতীচী—প্রাচী নহে। আমাদের প্রাচীন জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বিষাদ-করুণ পরিণতির দিক দিয়া সর্বোৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডির আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে ট্র্যাজেডির জন্ম হয় নাই। কিন্তু কেন ?

সম্ভবত আমাদের বিশিষ্ট জীবনবোধ ও রসদৃষ্টি ইহার জন্য দায়ী। এই সম্পর্কে একজন নাট্য-শাস্ত্র আলোচকের আলোচনা উদ্ধৃত হইল : "ট্র্যাজেডিতে আমরা জীবনকে দুঃখময় রূপে দেখি বটে, কিন্তু সেই দুঃখময় রূপের জন্য জীবন আরও সুন্দর, আরও মহীয়ান হয়ে ওঠে। আঘাত আছে বলে জীবন এত রোমাঞ্চকর, বেদনা আছে বলেইতো জীবন এত নিবিড়ভাবে উপভোগ্য! ট্র্যাজেডিতে মানুষ যখন প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ক'রে ব্যর্থতা ও মৃত্যু বরণ ক'রে নেয় তখন দুঃখের অম্লান গৌরব ও মানুষী জীবনের অপরাজিত মর্যাদাই ঘোষিত হয়। সুতরাং ট্র্যাজেডি জন্মলাভ করতে পারে এমন একটি পরিবেশে, যেখানে জগতের প্রতি আসক্তি গভীর, যেখানে জীবন-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান বলে সেখানে ট্র্যাজেডির উদ্ভব এমন স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় জীবনদর্শন পূর্বজন্মের কর্মফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহ-জীবনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও উদ্যম সেখানে নিষ্ফল বলে বিবেচিত, পরলোকের স্বর্ণময় রাজ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। যেখানে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল নয় সেখানে বাঁচবার ব্যর্থতায় ট্র্যাজিক দুঃখবোধ আসবে কি করে? দুঃখই যদি দুঃখের পরিণাম হয়, তবে সেই দুঃখের প্রভাবে জীবন আকর্ষণীয় ও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে এবং দুঃখপীড়িত লোকও আমাদের সহানুভূতির উপর দাবি জানিয়ে বসে। কিন্তু ভারতীয় জীবনদৃষ্টি জীবনের এই আকর্ষণীয়তা ও মহিমা স্বীকার করেনি এবং দুঃখপীড়িত লোকের প্রতিও সহানুভূতি প্রকাশ সমর্থন করেনি। দৈববিধানের প্রতি অবিচল আনুগত্যের জন্যও সমাধানহীন দুঃখের চিত্র ভারতীয় সাহিত্যিক অঙ্কন করতে চাননি, কারণ এরূপ দুঃখের চিত্র দেখলে মানুষের মন দৈববিধানের কল্যাণময় রূপের

প্রতিও শ্রদ্ধাহীন হয়ে উঠতে পারে। লৌকিক উপায়ে হোক আর অলৌকিক উপায়ে হোক, সমস্ত প্রকার দুঃখময় সমস্যার সমাধান করে নায়ক নায়িকার মিলন ঘটিয়ে ভরতবাক্য উচ্চারণের মধ্যে দর্শকদের চিত্তক্ষোভ নিবারণ ও অলৌকিক দৈবশক্তির মঙ্গলময় ও সন্তোষজনক বিধানে বিশ্বাস উদ্রেক করবারই সচেতন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।"

কমেডির উদ্ভব ঃ

ট্র্যাজেডির পাশে কমেডিকে রাখিয়া বিচার করিলে এই দুইটি বিশিষ্ট রূপের পার্থক্য ধরা পড়িবে।

নাটক যখন জীবনের রূপায়ণ তখন শুধুমাত্র জীবনের গভীর, করুণ, গুরু দিকটিই নহে—জীবনের সরস, তরল, লঘু দিকটির রূপায়ণও তাহার লক্ষ্য। এই দুইটি দিকের আকর্ষণেই জীবনের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এই হাসি ও কান্না একই সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আছে বলিয়াই ট্র্যাজেডি ও কমেডির উদ্ভব সর্বত্র প্রায় একই সময়ে হইয়াছে।

গ্রীসে ডায়োনিসস দেবতার শীতকালীন উৎসব হইতে কমেডি ও বসন্ত-কালীন উৎসব হইতে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐ দেবতার পূজায় যে 'ডিথিরাম্ব সঙ্' প্রচলিত ছিল তাহা হইতে উদ্ভূত হইল ট্র্যাজেডি এবং পরিহাসযুক্ত শোভাযাত্রা ও 'ফ্যালিক সঙ্' হইতে জন্ম লইল কমেডি। ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে দশ প্রকার রূপকের উল্লেখ করিয়াছেন, এই রূপকগুলির মধ্যে হাস্যরসাত্মক প্রহসনের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

কমেডি ঃ

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মানব-জীবনের বৃন্ত দুইটি—বেদনার ও আনন্দের। মানব-জীবনের এক কোটিতে মর্মযন্ত্রণা, দুঃখ, দুর্ভোগ, বিষাদ, ব্যর্থতা, হতাশা, ক্রন্দন, হাহাকার এবং মৃত্যু ; অন্য কোটিতে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রফুল্লতা ও প্রসন্নতা। অর্থাৎ এক কোটিতে জীবন দ্বন্দ্ব-জর্জর, অন্য কোটিতে জীবন দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ। এই দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ জীবনের শুভান্ত পরিণতি লইয়াই কমেডির সৃষ্টি। বেদনাবৃন্তে প্রস্ফুটিত হয় ট্র্যাজেডি-কুসুম, আর আনন্দবৃন্তে প্রস্ফুটিত হয় কমেডি-কুসুম। ট্র্যাজেডি স্রষ্টার দৃষ্টি—গভীর, কমেডি স্রষ্টার দৃষ্টি—তির্যক।

এবং বিচিত্রতায় ইহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং নাট্য-সাহিত্যের অভিজাত শ্রেণীতে ইহার স্থান নাই। ইহা অনভিজাত।

কোন কোন পণ্ডিত বিকলাঙ্গ ট্র্যাজেডিকে অর্থাৎ যে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হিসাবে ব্যর্থ তাহাকেই মেলোড্রামা বলিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু মনে রাখা দরকার ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের রচনা, উভয়ের অন্তঃ-প্রকৃতি ভিন্ন। সুতরাং এইরূপ বলা সমীচীন নহে। সাধারণত ভাবের অগভীরতা ও গভীর চরিত্রের অভাবেই নাটক মেলোড্রামা হইয়া বসে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। কোন কোন সিরিয়াস নাটকের বৃত্তে আকস্মিক বা উত্তেজক মেলোড্রামাটিক ঘটনা প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া গুরু নাটকের মধ্যে এই জাতীয় দুই চারিটি ঘটনার সমাবেশ হইলেই রচনা মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয় না। ভাবব্যঞ্জনায় যদি গভীরতা থাকে, আবেদন যদি সর্বজনীন হয়, তবে মেলোড্রামাটিক ঘটনায় কিছু কিছু সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও রচনাকে মেলোড্রামা বলিয়া শ্রেণীচ্যুত করিবার কারণ নাই।

প্রহসন:

ইংরেজী 'ফার্স' শব্দটির বাংলা নাম প্রহসন। প্রহসনের হাস্যরস সম্পূর্ণ ঘটনাগত এবং ইহাতে কৌতুকরসেরই দুর্দমনীয় প্রাবল্য দেখা যায়। ঘটনার বাহ্য আকস্মিকতা, উদ্ভটত্ব ও অতিরঞ্জনই প্রহসনের প্রধান লক্ষণ। প্রহসনের মধ্যে চিন্তা বা অনুভূতির স্থান নাই। ইহার পরিস্থিতি কৃত্রিম, চরিত্র সব অস্বাভাবিক। আতিশয্যপূর্ণ বলিয়াই নাট্যশাস্ত্রবিদ্‌গণ ইহাকে অতি লঘুরসের ক্ষুদ্র নাটিকা বলিয়াছেন। ইহার আর এক নাম লাফিং ড্রামা (Laughing Drama)। মেলোড্রামার মতই ইহা নিঃসন্দেহে নিম্নশ্রেণীর রচনা।

'রাজা ও রানী' নাটক বিচার করিতে বসিয়া আমরা সাধারণ ভাবে নাটকের তত্ত্বগত যে আলোচনায় অনুপ্রবেশ করিব, এই অংশে আমরা প্রয়োজনীয় সেই নাট্যতত্ত্বের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছি। পরবর্তী স্তরে নাটকীয় তত্ত্বের সম্যক ধারণা লইয়া আমরা বিশ্লেষণের কাজে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে।]

মধ্য পর্ব

॥ রাজা ও রানী : সৃষ্টিকাল ও পরিবেশ ॥

রবীন্দ্র-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় 'রাজা ও রানী' নাটকটির সৃষ্টিকাল ও পরিবেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শোলাপুরে সতেন্দ্রনাথের কাছে চলিলেন, সপরিবারে বলিতে বুঝায় স্ত্রী, আড়াই বৎসরের কন্যা ও চারিমাসের খোকা রথীন্দ্রনাথ। শোলাপুরে মাসখানেক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে জায়গাটা খুব মনোরম নয়, কারণ 'জমিতে ঘাস নেই, গাছে পাতা নেই, জলাশয়ে জল নেই —লোকালয়ে অধিক লোক নেই—চারিদিকে মরুভূমির মত ধূ ধূ করছে··· দেখতে দেখতে দোয়াতের কালি শুকিয়ে জমে আসে···রচনা করবার সময় আমার কাব্য শুকিয়ে আসে কিনা জানিনে···।'

শোলাপুরে মাসখানেক থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়াতেই পুনার নিকট খিড়কি শহরতলীতে গিয়া কিছুকাল বাস করেন ; বাড়ীটি ছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বন্ধু অধ্যাপক গোবিন্দ বিঠ্ঠল কড়কড়ের···

এবার এই বৈশাখমাসে শোলাপুরে বাসকালে লিখিলেন 'রাজা ও রানী' — তাঁহার প্রথম নাটক।"

॥ রাজা ও রানী : নাটক পাঠের ভূমিকা ॥

সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। শুরু হইয়াছে 'মানসী' কাব্যের পালা। এই কাব্য-রচনা যুগের আর একটি বিশিষ্ট রচনা—রাজা ও রানী। প্রকাশ কাল ১৮৮৯। কবি তখন পূর্ণযৌবনে উপনীত। যুবক কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম মঞ্চ-সফল নাটক রচনা করিলেন—রাজা ও রানী। ইহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা প্রভৃতি গীতিনাট্য, রুদ্রচণ্ড—নাটিকা, নলিনী—গদ্যনাট্য লিখিয়াছেন আর লিখিয়াছেন—প্রকৃতির প্রতিশোধ ; ইহা

নাটকাকারে কাব্য মাত্র। ইহাদের কোনটিকেই পূর্ণাবয়ব নাটকের মর্যাদা দেওয়া চলে না।

চলে না এই কারণেই যে, এই সকল রচনাগুলিতে বাস্তব-কল্প জীবনের যে প্রত্যাশা থাকে তাহা অনুপস্থিত; তাই ভাবের গভীরতা, কল্পনার সমৃদ্ধতা, কবিত্বের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও—এই রচনাগুলি পূর্ণ নাটক পদবাচ্য হইয়া উঠে নাই।

নাটক তো জীবনেরই অভিপ্রকাশ। তাই নাটকের রূপকল্পনাতে, পরিস্থিতি পরিস্থাপনে, ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্র নির্মাণে, ভাবে ভাষায় চাই বাস্তবতা। এই বাস্তবতা না থাকিলে নাটক সার্থকতা অর্জন করিতে পারে না। 'রাজা ও রানী'-পূর্ব নাটকগুলিতে জীবনের সহিত, সংসার মৃত্তিকার সহিত নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের যোগ এখনও পর্যন্ত তত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই বলিয়াই তাঁহার এই রচনাগুলির মধ্যে বাস্তব জীবনধর্মিতার অভাব সুস্পষ্ট। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, সিদ্ধি না আসিলেও এই সময় হইতেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার যথার্থ প্রয়াসের শুরু। এই সব নাট্যরচনার নাট্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর হইলেও একথা ঠিক যে, এই সময়েরবীন্দ্রনাথ নাটকের আন্তররূপটি, বিশেষভাবে ট্র্যাজেডির রূপটিকে যেন সঠিক ভাবে চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন। মনুষ্যত্বের বিকৃতিজনিত আত্মিক অবক্ষয় যে রচনাকে ট্র্যাজিক পরিণতি দান করে, এই সত্য উপলব্ধি করা কবির পক্ষে সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই কালমৃগয়া, রুদ্রচণ্ড, নলিনী, মায়ার খেলা প্রভৃতি নাটকগুলির পরিণতি ট্র্যাজিক—করুণ।

এই রচনাগুলির পরবর্তী পর্যায়ে রচিত হইল রাজা ও রানী—প্রথম সার্থক নাটক। এই নাটকের যে বৃত্ত বা কাহিনী কাঠামো তাহা অনেকখানি বাস্তব ভিত্তিক। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নাটকগুলির পাত্রপাত্রীদের মত এই নাটকের পাত্রপাত্রীরা শূন্যলোকবাসী নহে। ইহাদের সামাজিক সত্তাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা ব্যতীত এই সকল পাত্রপাত্রীদের আচার-আচরণ সম্ভবতার সীমা অতিক্রম করে নাই। ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক বলিয়াই—এই নাটকে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের সহজ বিশ্বাসকে ব্যাহত করে না। এই বাস্তব কার্যকারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ঘটনা বিন্যাস যেমন অনেকখানি পরিমাণে ত্রুটিমুক্ত, চরিত্রচিত্রণও অনেকখানি

পরিমাণে সুপরিস্ফুট। সর্বশেষে, উপস্থাপনারীতিতে রোমান্টিক হওয়া সত্ত্বেও রচনাটি বহুলাংশে নাটকীয় হইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে এবং একটি ট্র্যাজিক সুর নাটকটির সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

নাটকটি 'মানসী' পর্বের রচনা হওয়ায় একটি বিশিষ্ট প্রেমানুভূতি—এই নাটকটির অবলম্বন হইয়াছে। এই প্রেমানুভূতির পরিচয় লাভ করিতে হইলে এই সময়কার কবি-মানসের সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

'মানসী'-পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে কবি-অন্তর দুঃখ, যন্ত্রণা ও বেদনায় বিষণ্ণ। এই অন্তর্বেদনার কারণটিও খুব অস্পষ্ট নহে। 'কড়ি ও কোমল'-এর রচনা পর্বে রূপমুগ্ধ কবি নারীদেহের রূপ-সীমাতে বিদেহী সুন্দরকে লাভ করার বাসনায় ব্যাকুল। সম্ভোগ বাসনা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে; দুটি বাহুলতা দিয়া কবি এক অধরকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ক্রমেই কবি বুঝিয়াছেন দেহের স্থূলতায় দেহাতীত সুন্দর-স্বরূপ ধরা পড়ে না। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দেহসৌন্দর্য মানুষের অন্তরে শুধু অতৃপ্তির বেদনা জাগায়—পরিতৃপ্তির প্রশান্তি দিতে পারে না। সম্ভোগের মোহ কবির কাটিতে শুরু করিয়াছে। দেখা দিয়াছে ইহার বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া। 'মানসী' পর্বে এই প্রতিক্রিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কবির অন্তরে দেখা দিয়াছে দ্বন্দ্ব। একদিকে ইন্দ্রিয়জ বাসনা, অন্যদিকে ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যানুভূতি; একদিকে দেহাশ্রিত প্রেমা-কাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে আত্মার রহস্য উদ্ভাসন কবিচিত্ততটে বীচিবিক্ষেপ সৃষ্টি করিয়াছে। দ্বন্দ্বমথিত কবিচিত্তের এই বেদনার সুর তৎকালীন কয়েকটি কবিতায় ধ্বনিত। শেষ পর্যন্ত এই বিষণ্ণতাই বৈরাগ্যে পরিণতি লাভ করিল। মানসী কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাতেও এই সুর ধ্বনিত।

এতদিন পর্যন্ত যে প্রেমানুভূতি ছিল দেহাশ্রিত, রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে তাহা দেহাতীত করিয়া তুলিতেছেন। নিঃসন্দেহে ইহা কবি অন্তরের এক সূক্ষ্ম অনুভূতি। কবি 'মানসী' পর্বে—'নয়নের নীরে বাসনা-বহ্নি' নির্বাপিত করিয়া বিরহের তীরে কামনার মোক্ষধামের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। কবি উপলব্ধি করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়জ ভোগবাসনা-উদ্বেলিত অন্তরে শুচিশুভ্র আনন্দের স্নিগ্ধ স্পর্শ লাভ করা সম্ভব নহে। অথচ ভোগতৃষ্ণাকে প্রশমিত করিতে না পারিলে অনিবার্য অতৃপ্তির তীব্র দহন মর্মলোককে দগ্ধ করিবে, নিরন্তর মর্মভেদী হাহাকার অন্তরলোককে বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে। কারণ, বাসনা-বিজড়িত,

আসক্তি-বিজড়িত রূপমুগ্ধ অতৃপ্ত সৌন্দর্য-পিপাসা প্রেম নহে—মোহ। কবি-মানসের এই দ্বিবিধ উপলব্ধি যেমন মানসীতে কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে তেমনি, সমসাময়িক নাট্য-সৃষ্টি—'মায়ার খেলা' এবং 'রাজা ও রানী'তে' নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে। শূন্য-পরিণাম বিষাদ-ক্লান্ত জীবনের ট্র্যাজেডি—'মায়ার খেলা' আর আসক্তি-বিজড়িত রূপমুগ্ধ অন্তরের অতৃপ্ত প্রণয়-পিপাসার ট্র্যাজেডি—'রাজা ও রানী'। তাই কবি-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই নাটকের ভূমিকায় লিখিলেন :

"...সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে, সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না
শুধু সুখ চলে যায়—
এমনি মায়ার ছলনা।"

মায়াকুমারীদের এই খেদোক্তি তো রাজা বিক্রমের ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ার্তির সামিল। অর্থাৎ 'মানসী'র যুগে আসক্তিজড়িত প্রেমের ব্যর্থতায় কবিহৃদয়ে যে বেদনা, রাজা বিক্রমদেবের অন্তরেও আমরা সেই অনিঃশেষ প্রেমতৃষ্ণার চরম ব্যর্থতার বেদনাই সঞ্চারিত হইতে দেখিয়াছি।

॥ রাজা ও রানী ঃ কাহিনী বিশ্লেষণ ॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ঃ জালন্ধর-রাজ বিক্রমদেবের প্রাসাদের এক কক্ষ। রাজা বিক্রমদেব ও রাজসখা দেবদত্ত উপস্থিত। দেবদত্ত ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু রাজার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি সব 'ব্রাহ্মণ্য বালাই' বিসর্জন দিয়াছেন। এই সম্পর্কে আলোচনা করিতে করিতে রাজা বন্ধু দেবদত্তকে কাব্যালোচনা করিতে আহ্বান জানাইলেন। কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে দেবদত্ত বলিলেন, 'শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে।' ইহা শাস্ত্রবচন। কিন্তু রাজা পুরাতন প্রসঙ্গের জন্য অভিযোগ করিলে দেবদত্ত বলিলেন, যাহা সত্য তাহাই-পুরাতন। এই সময়ে মন্ত্রীর আগমনে আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হইল।

মন্ত্রীর আগমন লক্ষ্য করিয়া রাজা কক্ষ ছাড়িয়া অন্তঃপুরের দিকে পলায়ন করিলেন, কারণ রাজ্যের নানান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। মন্ত্রী প্রবেশ করিয়া দেবদত্তের নিকট রাজার উপস্থিতির কথা

জানিলেন এবং শুনিলেন রাজা অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে মন্ত্রী দুঃখপ্রকাশ করিলেন। কারণ রাজ্যে দেখা দিয়াছে নানা বিশৃঙ্খলা। এই মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন রাজাকে অথচ রাজা অনুপস্থিত। তাই রাজ্য আজ হতশ্রী। এমন সময় দূরে কোলাহল শুনা গেল, সশস্ত্র বিদ্রোহী প্রজাদের কোলাহল। দেবদত্ত ও মন্ত্রী অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য: রাজপথ। কিনু নাপিত, মনসুখ চাষা, কুঞ্জরলাল কামার, নন্দলাল, শ্রীহরি কলু, হরিদাস কুমোর প্রভৃতি দরিদ্র প্রজাগণ আজ খুবই উত্তেজিত। তাহারা আর সহ্য করিবে না। অনেক অনুনয়, বিনয়, প্রার্থনা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্রবচন শোনা হইয়াছে। আর নয়। এবার ঠিক হইল 'শাস্তর চুলোয় যাক—অস্তর ধরো।' এমন সময় প্রবেশ করিলেন দেবদত্ত। বিদ্রোহী প্রজাদের উত্তেজনা দেখিয়া তাহাদের প্রশমিত করিবার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দেবদত্ত সাধারণ দরিদ্র লোকগুলির নিকট 'ঠাকুর' বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার মুখে মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া তাহারা ক্রমেই শান্ত হইয়া আসিল এবং তাঁহার পরামর্শমতো বিদ্রোহ নয়, রাজার নিকট অশ্রু-আকুল প্রার্থনা জানাইবার সংকল্প করিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইল।

তৃতীয় দৃশ্য: অন্তঃপুরের প্রমোদ কানন। রাজা বিক্রমদেব আকুল আগ্রহে রানী সুমিত্রাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে চাহেন। তাই তিনি রানীকে সমস্ত কাজ ফেলিয়া তাঁহার নিকট আসিবার আহ্বান জানাইতেছেন; কিন্তু সুমিত্রা তো শুধু প্রেয়সী নহেন, মহিষীও বটে। ইহাতে ক্ষুব্ধ রাজা রানীকে তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নন বলিয়া অভিযোগ করিলে রানী তাঁহাকে শুধু স্বামী হিসাবে নহে, রাজা হিসাবেও কর্তব্য পালনের জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এমন সময় কঞ্চুকী প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীমহাশয়ের আগমনবার্তা দিলে রাজা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। কঞ্চুকী প্রস্থান করিয়াছে।

রানী এই অবস্থায় স্বামী বিক্রমদেবকে রাজার কর্তব্য পালনের জন্য অনুরোধ করিলে রাজা সুমিত্রাকে কঠিনহৃদয়া নারী বলিয়া অনুযোগ জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রজাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া রানীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তিনি কেবল এই রাজ্যের রানীই নহেন, প্রজাদের জননীও বটে। সুতরাং তিনি বিদায় লইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য: অন্তঃপুরের কক্ষ। রানী সুমিত্রা রাজসখা ব্রাহ্মণ দেবদত্তের নিকট রাজ্যের সংবাদ লইবার জন্য তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষারত। এমন সময় প্রবেশ করিলেন দেবদত্ত। রানীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, রাজ্যে আজ দারুণ অশান্তি, কারণ রাজ্য আজ 'সহস্ররাজক'। রানী সুমিত্রার কাশ্মীরী আত্মীয়েরা আজ নানাভাবে প্রজাদের উৎপীড়ন করিতেছে। শুনিয়া ক্রুদ্ধা রানী ইহার প্রতিকার করিবার সংকল্প করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য: দেবদত্তের গৃহ। দেবদত্তের স্ত্রী নারায়ণী গৃহকার্যে নিযুক্ত থাকিয়াই স্বামীর সহিত স্ত্রীসুলভ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় উপস্থিত হইলেন শাস্ত্রাচারী ব্রাহ্মণ ত্রিবেদী। সংবাদ দিলেন, দেবদত্ত রাজপুরোহিত হইয়াছেন এবং তার পর দেবদত্তের নিকট হতে কুমড়ো লইয়া বিদায় লইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য: অন্তঃপুরের পুষ্পোদ্যান। রাজা বিক্রমদেব এবং রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য কথোপকথনরত। বৃদ্ধ অমাত্য মন্ত্রীর নিকট হইতে সংবাদ লইয়া রাজাকে রাজ্যের অবস্থা বিচার করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন, কিন্তু রাজা কাশ্মীরাগত আত্মীয়দের কোন অপরাধই বিচার করতে প্রস্তুত নহেন, কারণ তাঁহার মতে তাহারা সুজন। শুধুমাত্র তাহারা বিদেশী বলিয়া আজ তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ উঠিয়াছে। শুনিয়া অমাত্য বিদায় লইলেন। এমন সময় রানীর আত্মীয় অমাত্য প্রবেশ করিয়া নির্দোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিবার কথা শুনাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাদের উপর নিজের অগাধ বিশ্বাসের কথা শুনাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। প্রবেশ করিলেন রানী সুমিত্রা।

অশান্ত রাজা সেই মুহূর্তে রানীর নিকট প্রেম-প্রত্যাশী। কিন্তু আজ রানী সুমিত্রা প্রজাদের জননীরূপেই রাজার নিকট সমস্ত অত্যাচার এবং অবিচারের প্রতিকার প্রার্থনা জানাইতে আসিয়াছেন। কিভাবে এই অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করা যায় এ প্রশ্ন করিলে রানী শেষপর্যন্ত নিজের অত্যাচারী আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার কথা জানাইলেন। রাজা রানীর এই প্রস্তাবে সম্মত, কিন্তু একটি শর্তে। রানীকে তাঁহার বাহুপাশে ধরা দিয়া তাঁহার তৃষিত অন্তরকামনাকে তৃপ্ত করিতে হইবে। তখন রানী নিজেই প্রজাদের রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাতে রাজ-অন্তর আরও অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সময়ে দেবদত্ত প্রবেশ করিলে রাজা

বাহিরের সংবাদ অন্তঃপুরে আনিবার জন্য তাঁহাকে দায়ী করিয়াছেন, কিন্তু দেবদত্ত বলিয়াছেন, নিতান্ত সংসারের প্রয়োজনেই তিনি রানীর নিকট আসিয়াছেন; অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। নিঃসঙ্গ রাজা শেষপর্যন্ত উপায় নির্ধারণের কথা চিন্তা করিতে করিতে বিদায় লইলেন।

সপ্তম দৃশ্য : মন্ত্র-গৃহ। রাজা বিক্রমদেব ও মন্ত্রী পরামর্শরত। রাজা তাঁহার রাজ্যে যে অরাজকতা চলিয়াছে তাহার অবসান ঘটাইতে চাহেন, তাই তিনি মন্ত্রীকে সকল বিদেশীকে দূর করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু বহুদিনের প্রচলিত অবস্থার রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাহার জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রস্তুতি। মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া রাজা দরিদ্র প্রজাদের খাদ্য ও অর্থ দিয়া বিদায় করিবার আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। বিদায় লইলেন রাজা, প্রবেশ করিলেন রানী সুমিত্রা, সঙ্গে দেবদত্ত। অন্তঃপুর-চারিণীকে আজ মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত মন্ত্রী আগমনের কারণ জানিতে চাহিলে রানী প্রজাদের বেদনায় তাঁহার হৃদয়-বেদনার কথা জানাইলেন এবং সকল বিদেশীকে আহ্বান করিবার আদেশ দিলেন। আকস্মিক আহ্বান জানাইলে সংশয় দেখা দিতে পারে বলিয়া শেষপর্যন্ত কালভৈরবের পূজোৎসবে নিমন্ত্রণ করিবার কথা স্থির হইল এবং সেদিন বিচার হইবে। এই সংবাদ পাঠাইবার জন্য ত্রিবেদী ঠাকুর দূত নিযুক্ত হইলেন।

অষ্টম দৃশ্য : ত্রিবেদীর কুটির। মন্ত্রী কুটিরে আসিয়া ত্রিবেদীকে দূত হইবার সংবাদটি দিলেন এবং তাহাকে কর্তব্য পালন করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়া বিদায় লইলেন।

[পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রথম অঙ্কটিকে বলে 'সূচনা' বা 'প্রস্তাবনা' (Exposition)। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই নাটকের প্রথম অঙ্কে মূল বক্তব্যের সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ কামনার্ত রাজা রানী সুমিত্রার নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অশান্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং রানী সুমিত্রা আপন হস্তে রাজকর্তব্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য : সিংহগড়। জয়সেনের প্রাসাদ। নির্বোধ ব্রাহ্মণ ত্রিবেদী দূত হইয়া বিদেশী রাজাত্মীয়দের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সংবাদটি

দিতে গিয়া সে তাহাদের নিকট নাজেহাল হইয়া শেষপর্যন্ত আপন কর্তব্য সমাধা করিয়া ফিরিয়াছে। কালভৈরবের পূজোৎসবে যোগদান করিবার আহ্বান তাহাদের অন্তরে সংশয় জাগাইয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করার জন্য প্রস্তুত হইল।

তৃতীয় দৃশ্য : অন্তঃপুর। সভাসদ আসিয়া কালভৈরবের পূজোৎসবে আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ হইয়াছে বলিয়া রাজার স্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা বিশেষ কর্ণপাত করিলেন না। সভাসদ বিদায় লইলে প্রবেশ করিলেন রানী সুমিত্রা। রানীকে দেখিয়া অতৃপ্ত রাজ-অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কাঙ্গাল বাসনা লইয়া রানীকে পাইবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রানী তাঁহার এই আসক্তিপূর্ণ আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন নাই। কারণ রাজা তাঁহার সমস্ত পৌরুষ বিসর্জন দিয়া ক্লীবত্ব লাভ করুন ইহা তাঁহার কাম্য নহে। ফলে যখন রাজা মহিষীকে 'পাষাণ-প্রতিমা' বলিয়া অভিযোগ জানাইয়াছেন তখন আহত নারী-অন্তর স্বামীর পদপ্রান্তে আপনাকে সমর্পিত করিয়া শান্তি প্রার্থনা করিয়াছে। এই মুহূর্তে রাজা পদশায়িত প্রেয়সীকে বক্ষে গ্রহণ করিয়া স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে দীপ্ত হৃদয়জ্বালা নির্বাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময় নেপথ্যে দেবদত্তের কণ্ঠে আহ্বান আসিয়াছে।

দেবদত্ত আসিয়া রানীর আত্মীয়দের আসন্ন বিদ্রোহের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কামনার্ত রাজা সেই মুহূর্তে এই সংবাদ শুনিয়া অপ্রসন্ন চিত্তে দেবদত্তকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই স্থান অন্তঃপুর—মন্ত্রগৃহ নয়। রানী সুমিত্রা এই সংবাদ শুনিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই, তাই তিনি স্বামীকে অবিলম্বে সসৈন্য যাত্রা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু বিক্রমদেব যাইতে রাজী নহেন, বরং সন্ধিপত্র পাঠাইয়া বিদ্রোহীদের সহিত আপস করিতে তিনি প্রস্তুত। রাজার এই কথা শুনিয়া ধিক্কার দিতে দিতে রানী বিদায় লইয়াছেন।

রানীর এই ধিক্কারধ্বনিতে আহত রাজা বাল্যবন্ধু দেবদত্তকে অন্তঃপুরে বিরহ ও হাহাধ্বনি আনিবার জন্য দায়ী করিয়াছেন এবং দেবদত্ত শান্তচিত্তে সব শ্রবণ করিয়া রাজাকে আপন কর্তব্যে ব্রতী হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন তখন বাসনাহত বিক্রমদেব তাঁহাকে বিদায় দিয়া রানীর সন্ধানে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য : মন্দির। পুরুষবেশী সুমিত্রা অনুচরসহ মন্দিরে আসিয়া বিদায়ের পূর্বে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। আজ পতি-সত্য পালনের জন্যই তাঁহাকে বাহির হইতে হইয়াছে। এই সময় একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী মন্দিরে প্রার্থনা জানাইতে আসিলে পুরুষবেশী সুমিত্রা প্রজাদের দুঃখের সংবাদ শুনিলেন এবং জানিলেন প্রজাদের ধারণা রানী তাঁহার আত্মীয়দের দ্বারাই এই সমস্ত অত্যাচার ও অবিচার চালাইতেছেন। শুনিয়া তখন বিদায় লইলেন রানী, কিন্তু এই মুহূর্তে ব্রাহ্মণ ত্রিবেদী পুরুষবেশী সুমিত্রাকে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া বুঝিলেন, রানী রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন।

চতুর্থ দৃশ্য : প্রাসাদ। উপস্থিত দেবদত্ত ও মন্ত্রীর নিকট রাজা বিক্রমদেব রানীর পলায়নবার্তা শ্রবণ করিয়া আপন অন্তরবেদনার কথা প্রকাশ করিলেন এবং সব কথা শোনা হয় নাই বলিয়া ব্রাহ্মণ ত্রিবেদীকে ডাকিয়া পাঠাইবার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই পলায়নপর নারী-হৃদয়ের পিছনে ছুটিবার সব আকাঙ্ক্ষাই তিরোহিত হইল। রাজা আর কোন সংবাদ শ্রবণ করিতে আগ্রহী নহেন। তাই ত্রিবেদী প্রবেশ করিবার মুহূর্তেই রাজা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছেন এবং আপন কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়া মন্ত্রীকে সমরায়োজন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। পার্শ্বে নতমুখ, ম্লান-দৃষ্টি দেবদত্তকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আগাইয়া আসিয়াছেন রাজা। ক্রমে দুই বাল্য-বন্ধুর মধ্যে যে বিরোধ জাগিতেছিল, তৃপ্ত আলিঙ্গনে তাহা যেন দূরীভূত হইল।

[দ্বিতীয় অঙ্ককে বলে 'ক্রমোন্নতি' (Rising action)। এই অঙ্কে নাট্যকার রাজা বিক্রমদেবের নিকট হইতে রানীর পলায়নের চিত্র অঙ্কন করিয়া সেই কামনার্ত রাজ-অন্তর কিভাবে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই দেখাইলেন।]

প্রথম দৃশ্য : কাশ্মীর। প্রাসাদদ্বারে রাজভৃত্য শঙ্কর। আপন মনে কুমারের কথা ভাবিতেছে। শেষপর্যন্ত কুমারকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে পারিবে কিনা ইহাই তাহার ভাবনা। এমন সময় রাজ-প্রাসাদের

সম্মুখস্থ পথে দুইজন সৈনিক আসিয়া আলাপরত হইল। তাহাদেরও ইচ্ছা যুবরাজ রাজা হউন। তাহা হইলে তাহারা আনন্দোৎসব করিবে। শঙ্করকে দেখিয়া তাহারা আগাইয়া আসিয়া যুবরাজের রাজত্ব পাওয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর তাহাদের নানাকথা বলিয়া বিদায় করিল। এই সময়ে প্রবেশ করিলেন পুরুষবেশী সুমিত্রা এবং শঙ্করকে দ্বারে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কি শঙ্কর দাদা?' বিস্ময়াহত শঙ্কর যেন স্বপ্ন দেখিল। ঠিক চিনিতে না পারিলেও সুমিত্রার স্মৃতি তাহার অন্তরকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য: ত্রিচূড়। ক্রীড়াকাননে কুমারসেন, ইলা এবং সখীগণ উপস্থিত হইয়াছে। আসন্ন পূর্ণিমা রাত্রে সব বিরহের অবসান ঘটিবে। কুমারসেন ইলাকে পাইবেন, ইলা কুমারসেনকে লাভ করিবে—এই বিষয় লইয়া যখন তাহারা সকলেই আলাপরত সেই সময় পরিচারিকা আসিয়া জালন্ধর হইতে গোপন সংবাদ লইয়া কাশ্মীরে দূত আসিবার সংবাদ দিল। ফলে কুমার যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ইলার নিকট পূর্ণিমা রাত্রে আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য: কাশ্মীর। যুবরাজের প্রাসাদে কুমারসেন এবং ছদ্মবেশী সুমিত্রা মিলিত হইলেন। জালন্ধর-রানী সুমিত্রা ভ্রাতার নিকট আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য: কাশ্মীর প্রাসাদ। অন্তঃপুরে রাজা চন্দ্রসেনকে রানী রেবতী যুবরাজ কুমারসেনকে যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য প্ররোচিত করিতেছেন। কারণ প্রজারা যুবরাজের অভিষেকের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং যুবরাজকে বাহিরে পাঠাইতে পারিলে প্রজাদের সেই অভিলাষ অপূর্ণ রাখা সম্ভব হইবে। এমন সময় কুমারসেন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রেবতী তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা করিবার নির্দেশ দিলেন, পিতৃব্য চন্দ্রসেনও জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার আশীর্বাদ জানাইয়া বিদায় দিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য: ত্রিচূড়। ক্রীড়াকাননে ইলার সখীগণ আসন্ন পূর্ণিমা রাত্রে সখীর বিবাহে কে কি আয়োজন করিবে তাহা লইয়া আলোচনায় মত্ত, এমন সময় ইলার সহিত কুমারসেনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। কারণ এই অসময়ে তো তাঁহার আসিবার কথা নহে।

ইল। শান্তচিত্তে কুমারসেনের নিকট তাঁহার যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিল এবং তাঁহার অপেক্ষায় থাকিবে বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল। কিন্তু বিদায় দিয়াই বুঝিল তাহার জীবনের সুখ চিরতরে বিসর্জিত হইল।

[তৃতীয় অঙ্ক 'তুঙ্গতা' (Climax) অর্থাৎ নাটকীয় সংঘাত তাহার তীব্রতম রূপ লাভ করিয়াছে। আজ রাজা বিক্রমদেব ও রানী সুমিত্রা ঘটনাচক্রে বিরোধের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিরোধের যে চূড়ান্ত রূপটি এইখানে পাওয়ার প্রয়োজন ছিল তাহা পাওয়া যায় নাই। ইহার জন্য আমাদের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য : জালন্ধর। রণক্ষেত্র-শিবিরে আসীন রাজা বিক্রমদেবকে সেনাপতি—শিলাদিত্য ও উদয়ভাস্করের বন্দী হওয়ার ও যুধাজিৎ এব জয়সেনের পলায়ন-সংবাদ দিল। যুদ্ধোন্মাদ রাজা বিক্রম এখন একমাত্র যু করার জন্যই প্রস্তুত, সুতরাং তিনি সেনাপতিকে বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাব করিবার আদেশ দিলেন। আজ রাজা রক্তলোভী, যুদ্ধোন্মাদ হইয় উঠিয়াছেন। সুতরাং কোন সন্ধির প্রস্তাব তাঁহার গ্রহণযোগ্য নহে। উন্মা হিংসায় তাঁহার চিত্ত আজ উদ্বেলিত। সেনাপতি এবং চর প্রবেশ করিয় রাজাকে বিদ্রোহী সৈন্যের মার্জনাশায় আগমনের সংবাদ দিল। দ্বিতীয় চ আসিয়া বিপক্ষের সন্ধিদূতের আগমনের কথা ঘোষণা করিল। সর্বশে সৈনিক প্রবেশ করিয়া ভ্রাতা কুমারসেনকে সঙ্গে করিয়া মহারানী সুমিত্রা আগমনবার্তা শোনাইল। একথা রাজা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তা সেনাপতিকে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। সেনাপ বলিলেন, রানী সুমিত্রা ভ্রাতা কুমারসেনের সাহায্যে যুধাজিৎ ও জয়সেনে বন্দী করিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মহারা বিক্রমদেব রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত নহেন। সেনাপতি সে আদেশ ঘোষণা করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য : দেবদত্তের কুটির। রাজা বিক্রমদেব আজ যুদ্ধোন্মা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাকে যুদ্ধের পথ হইতে সরাইয়া আনিতে আ কেহই সক্ষম নহে। একমাত্র বাল্যবন্ধু হিসাবে দেবদত্ত এই কার্যে সক্ষ

াতে পারেন, তাই দেবদত্ত উন্মত্ত রাজাকে শান্ত করিবার জন্য স্ত্রী ায়ণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইতেছেন।

তৃতীয় দৃশ্য: জালন্ধর। শঙ্করকে রাজা বিক্রমদেবের নিকট দূত াবে পাঠাইয়া কুমারসেন ও সুমিত্রা শিবিরে শৈশবস্মৃতিচারণায় রত। ন সময় অপমানিত শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার মুখে অপমানের শুনিয়াও শান্ত কুমারসেন সকলকে লইয়া কাশ্মীরের পথে ফিরিয়া বার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য: বিক্রমদেবের শিবির। পূর্বে বিদ্রোহী কিন্তু বর্তমানে ার পক্ষাবলম্বী যুধাজিৎ ও জয়সেন রাজাকে কুমারসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা াবার জন্য নানাভাবে উত্তেজিত করিতেছে এবং শেষপর্যন্ত রাজাকে াত্রায় রাজী করাইয়াছে। এমন সময় প্রহরী আসিয়া ব্রাহ্মণ দেবদত্তের ামন সংবাদ দিল। রাজা প্রথমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার আদেশ াও শেষপর্যন্ত আদেশ প্রত্যাহার করিলেন এবং বাল্যবন্ধু ব্রাহ্মণ দেব- ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিলেন। রাজার অলক্ষ্যে জিৎ ও জয়সেন তাঁহাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করিল।

[চতুর্থ অঙ্ক: 'অবনতি' (Falling action)। তৃতীয় অঙ্কে যে কট ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহা যেন বিগলিত হইবার পক্ষায়। এখানে দেবদত্ত সেই ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য: কাশ্মীর। প্রাসাদে রানী রেবতী ও রাজা চন্দ্রসেন লাচনারত। বিক্রমদেব সৈন্যসহ কাশ্মীর আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসিতে- , সুতরাং যুদ্ধসজ্জার প্রয়োজন। চন্দ্রসেন তাই প্রস্তুত হইতেছেন, কিন্তু ী রেবতী তাঁহাকে অন্য মন্ত্রণা দিতেছেন। কিন্তু রাজা চন্দ্রসেন যখন ী হইলেন না তখন অভিমানাহতা রানী নিজ হস্তে আপন সন্তানকে া করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, কারণ তাঁহার গর্ভজাত সন্তান যদি াসনের অধিকার না পায় তবে তাহার জন্মই বৃথা। এই সময় কঞ্চুকী সিয়া যুবরাজ কুমারসেনের আগমনসংবাদ দিল। সংবাদ শুনিয়াই রানী ী চন্দ্রসেনকে কুমারকে আত্মসমর্পণ করিবার আদেশ দিতে বলিলেন এবং ং আত্মগোপন করিলেন।

সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া কুমার পিতৃব্যকে প্রণাম করিয়া যুদ্ধায়োজনের কথা জানিতে চাহিলেন, কারণ শত্রুসৈন্য প্রায় দ্বারপ্রান্তে। এই সময় যুদ্ধসজ্জা না দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং পিতৃব্যকে তাঁহার হস্তে সৈন্যভার দিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। এই সময়ে অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া রানী রেবতী কুমারকে ভীরু, কাপুরুষ ও পলাতক বলিয়া ধিক্কার দিয়া বনে গিয়া লুকাইয়া থাকিবার কথা বলিলেন। কিন্তু সুমিত্রা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রানী রেবতীকে রাজকার্যে হস্তক্ষেপ না করিবার অনুরোধ জানাইলেন, কারণ নারীর কাজ রাজকার্য পরিচালনা নহে; নারী স্নেহময়ী জননী, অন্তঃপুরই তাহার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। বিভ্রান্ত কুমার আবার পিতৃব্যের নিকট আদেশ প্রার্থনা করিলেন। এবং শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে বিলম্ব দেখিয়া সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া বিদায় হইলেন। রানীর প্ররোচনায় কুমারকে বিদায় দিয়া চন্দ্রসেন আহত অন্তরে বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য: কাশ্মীর। হাটে প্রচুর লোক সমাগম হইয়াছে। সকলের মুখে আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ আলোচিত হইতেছে। সকলেই জানে পিতৃব্য চন্দ্রসেন শত্রুপক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া যুবরাজ কুমারসেনকে বনবাসী করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা প্রাণ দিয়া যুবরাজকে উদ্ধার করিবে। এমন সময়ে দূরে শত্রুসৈন্যের আগমন সংবাদ শোনা গেল।

তৃতীয় দৃশ্য: ত্রিচূড়। প্রাসাদে কুমারসেন অমরুরাজের নিকট আসিয়া ইলার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। অমরুরাজ তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার দুহিতাকে জানাইয়াছেন যে, রাজ-সিংহাসনাসীন কুমারসেন তাহার সহিত মিথ্যা ছলনা করিয়াছে। সুতরাং আজ আর তিনি কুমারকে ইলার সহিত মিলিত হইতে দিতে রাজী নহেন। ইহাতে সরলা বালিকাকে প্রতারণা করিবার জন্য কুমারসেন অমরুরাজকে ধিক্কার দিলেন। এই সময়ে শঙ্কর আসিয়া শত্রু আসিবার সংবাদ দিল এবং বনপ্রান্তে সুমিত্রার অপেক্ষার কথা বলিল। হতভাগ্য কুমার ইলার সহিত দেখা না করিয়াই ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য: ত্রিচূড়। অন্তঃপুরে ইলা তাহার সখীদের তাহাকে সজ্জিত করিয়া দিতে বলিতেছে। সজ্জিত হইয়াই সে প্রতিদিনের মতো কুমার আগমন অপেক্ষায় মুহূর্ত যাপন করিবে। কারণ, যে-কোন

দতে পারে। তাহার অন্তর কখনও আশায় কখনও নিরাশায় ল্যমান।

পঞ্চম দৃশ্য : কাশ্মীর। শিবিরে বিশ্রামরত বিক্রমদেবের সম্মুখে ষুত জয়সেন পলাতক কুমারকে ধরিয়া আনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি চছে, যুধাজিৎ পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ জানাইতেছে, কুমারকে বন্দী- বার জন্য রাজা উদ্‌গ্রীব। তাঁহাকে বন্দী করিতে পারিলে তবে রাজা ন অরাজক রাজ্যে ফিরিয়া গিয়া শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন। রী প্রবেশ করিয়া রানী রেবতীর আগমনবার্তা জানাইল। এই সংবাদে লই বিদায় নিল। প্রবেশ করিলেন রাজা চন্দ্রসেন ও রানী রেবতী। রা কুমার সম্পর্কে রাজা বিক্রমদেবের মতামত জানিতে চাহিলেন। । চন্দ্রসেন অপরাধী কুমারসেনের প্রাণদণ্ড ছাড়া যে-কোন শাস্তির কথা লেন; কিন্তু রানী রেবতী তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দিবার জন্যই অনুরোধ য়া বিদায় লইলেন। তাঁহারা ফিরিয়া গেলে রাজা নিষ্ঠুর নারীর রতার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া আত্মসচেতন হইয়া উঠিলেন এবং সেই মুহূর্তে নারীর অন্তরলালিত 'গুপ্ত লোভ, বক্র রোষ' ব্যর্থ করিবার সংকল্প লেন। চর প্রবেশ করিয়া ত্রিচূড় অভিমুখে কুমারের গমনসংবাদ দিল। ণ চরকে এ সংবাদ গোপন রাখিবার আদেশ দিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য : অরণ্য। শুষ্ক পর্ণশয্যায় শায়িত কুমারের পাশে আসীন ত্রা। নিদ্রামগ্ন কুমারের পাশে নিদ্রাহীন সুমিত্রা বিনিদ্র রাত জাগিয়াছেন। াভঙ্গ হইতেই কুমার সুমিত্রার সহিত জীবনের দুঃখ-বেদনা লইয়া লোচনারত হইলেন। একে একে কাঠুরিয়া, মধুজীবী, শিকারী আসিয়া জার শত্রুসৈন্যের অত্যাচার অবিচারের সংবাদ দিল।

সপ্তম দৃশ্য : ত্রিচূড়। প্রমোদবনে অমরুরাজ বিক্রমদেবের হস্তে আপন । ইলাকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সখীরা ইলাকে সঙ্গে লইয়া ানে প্রবেশ করিল। রাজা বিক্রমদেব ম্লানমুখ, নতশির, কম্পিতা ইলার রূপ মূর্তি দেখিতেছেন। নতজানু হইয়া ইলা রাজা বিক্রমদেবের নিকট াকে ফিরাইয়া দিবার জন্য ভিক্ষা করিল। কারণ সে এ পৃথিবীতে জনের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত করিয়া দিয়াছে—তিনি শ্মীর-যুবরাজ কুমারসেন। কিন্তু রাজা বিক্রমদেব যখন বলিলেন, যুবরাজ

কুমারসেন আজ পলাতক বনবাসী, দীনতম ভিখারীর চেয়েও অসহায়, তখন প্রেমময়ী ইলা অস্থিরচিত্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে জীবন সঁপিবে বলিয়া পথের নির্দেশ চাহিল। রাজা বিক্রমদেব ইলার এই প্রবল প্রেমের পরিচয় পাইয়া কুমারসেনের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবার আশ্বাস দিলেন এবং তাহাকে কাশ্মীরের রাজধানী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। প্রস্তুত হইবার জন্য ইলা সখীদের সহিত প্রস্থান করিল। প্রহরী ব্রাহ্মণ দেবদত্তকে লইয়া প্রবেশ করিল। বাল্যবন্ধু দেবদত্তকে দেখিয়া তিনি সুখী হইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে তাঁহার উপর অত্যাচারের কথা শুনিয়া মর্মাহত হইলেন এবং পাষণ্ডদের শাস্তি দিবার অঙ্গীকার করিলেন। দেবদত্ত রাজাকে রাজ্যে ফিরিবার অনুরোধ জানাইলেন। রাজা দেবদত্তকে কুমারসেনের অনুসন্ধান করিবার অনুরোধ জানাইয়া রাজ্যে ফিরিলেন।

অষ্টম দৃশ্য ঃ অরণ্য। কুমারসেন ভগ্নী সুমিত্রা এবং অনুচর সঙ্গে করিয়া অনেকদিন কাটাইয়াছেন এবং তাঁহার নিজের জন্য সমস্ত প্রজার উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনিয়াছেন, আজ আর তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। তাই ভগ্নী সুমিত্রাকে বলিলেন, তিনি প্রাণ বিসর্জন করিয়া এই অত্যাচারের অবসান ঘটাইবেন। ভগ্নী তাঁহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া বিক্রমদেবকে উপহার দিলেই সবকিছুর অবসান ঘটিবে। প্রথমে এই প্রস্তাবে রানী সুমিত্রা মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেও শেষপর্যন্ত রাজী হইলেন।

নবম দৃশ্য ঃ কাশ্মীর। রাজসভায় বিক্রমদেব ও চন্দ্রসেন আসীন। বিক্রমদেব কুমারকে ক্ষমা করিয়াছেন কিন্তু চন্দ্রসেন বলিতেছেন, বিদ্রোহী কুমারকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া তিনি তাঁহার শাস্তি বিধান করিবেন। কিন্তু বিক্রমদেব তাঁহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল শিবিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া যুবরাজ আসিতেছেন। দেবদত্তও সেই সময়ে প্রবেশ করিয়া কুমারের আগমনবার্তা জানাইলেন। শুনিয়া রাজা বিক্রমদেব তাঁহাকে রাজার মতো অভ্যর্থনা জানাইবার কথা বলিলেন এবং দেবদত্তকে অভিষেকের রাজপুরোহিত হইতে বলিলেন। একে একে নগরের ব্রাহ্মণেরা আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন। প্রবেশ করিল শঙ্কর। সে কুমারসেনের আত্মসমর্পণের সংবাদ শুনিয়া আত্মগ্লানিতে আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং বলিল মার্জনার চেয়ে দণ্ড

প্রয়। বাহিরে হুলুধ্বনি শোনা গেল, প্রহরী বলিল, দুয়ারে শিবিকা উপস্থিত। রাজা বিক্রম বাদ্যের আয়োজন করিতে বলিয়া অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন। সহসা সুমিত্রা স্বর্ণথালিতে কুমারের ছিন্নমুণ্ড লইয়া রাজার সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, সবকিছুর শাস্তি হোক এবং সেই মুহূর্তে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইলা দৌড়িয়া আসিয়া প্রিয়তমের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। শঙ্কর ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া তৃপ্ত হইল। চন্দ্রসেন সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া রাজমুকুট ত্যাগ করিলেন। নতজানু বিক্রমদেব আত্মগ্লানিতে জর্জর হইয়া প্রাণহীন স্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

[**পঞ্চম অঙ্ক ঃ 'চরম পরিণতি' বা 'সমাপ্তি'** (Catastrophe or Conclusion)। **রাজা বিক্রমদেব ও রানী সুমিত্রার মধ্যে যে বিরোধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, কুমারসেন ও সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের অবসান ঘটিল।**]

॥ রাজা ও রানী ঃ ভাবসত্য ॥

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একজন ভাববাদী স্রষ্টা। বাস্তব সংসারের কঠিন মৃত্তিকায় তাঁহার পদক্ষেপ নহে, ভাবজগতের কল্পলোকে তাঁহার সতত সঞ্চরণ। বস্তুসত্য নহে—ভাবসত্যের প্রতিই তাঁহার অধিক আকর্ষণ। তাই তাঁহার রচনায় কোন একটি বিশেষ ভাব বা আইডিয়াকে রূপ দিতেই তাঁহার আগ্রহ বেশী। ফলে তাঁহার অধিকাংশ রচনাই যে ভাবতাত্ত্বিক হইয়া উঠিয়াছে—তাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

নাট্যকার হিসাবে তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ তখন বাস্তব জীবনের রসরূপায়ণই ছিল অপেক্ষিত, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও ভাববাদী কবি তাঁহার অন্তর সত্তার এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার নাটকগুলি অনেকাংশেই ভাবধর্মী বা আইডিয়া-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সহযোগী ডঃ টমসন মন্তব্য করিয়াছিলেন : "Tagore's dramas are vehicles of ideas rather than the expression of action". এই মন্তব্য যে অনেকখানি পরিমাণে সার্থক তাহার প্রমাণ ভাবাত্মক রূপক সাংকেতিক নাটকের এই জাতীয় রচনা রূপরস অপেক্ষা ভাবরসেই অধিকতর সমৃদ্ধ।

'রাজা ও রানী' নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া আমরা একটি তত্ত্ব বা

আইডিয়াকেই উপভোগ্য নাট্যরূপ লাভ করিতে দেখিয়াছি। প্রশ্ন হইতে পারে এই তত্ত্ব বা আইডিয়াটি কি? নিঃসন্দেহে ইহাকে আমরা প্রেমতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। দেহাশ্রিত, ইন্দ্রিয়জ অতৃপ্ত প্রেম-কামনা যে মানবজীবনে কতখানি দুঃখজনক ও শোচনীয় পরিণাম সৃষ্টি করে—এই নাটকে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাহাই চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রেমচেতনা—মানবজীবনের সহজাত, স্বাভাবিক, সূক্ষ্ম সুকুমার একটি বৃত্তি। ইহা আত্মার জ্যোতির্ময় শিখা-স্বরূপ। প্রেমের জ্যোতির্ময় আলোকে মানবীসত্তা আপন চলার পথটিকে সহজেই চিনিয়া লইতে পারে। বিশুদ্ধরূপে এই প্রেমর্ণবিপুল কর্মশক্তির উৎস, কল্যাণের কমনীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল। ইহা আত্মতৃপ্তির সংকীর্ণ পথে অগ্রসর হয় না, মানবজীবনের সমস্যাকে বিঘ্নিত করে না, বিশ্ববিধানের নীতি-নির্দেশকে লঙ্ঘন করে না। মঙ্গলশ্রী-বিভাসিত, শান্ত সংযত, স্বাধিকার-অপ্রমত্ত এই প্রেম জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সদা-সচেতন। আত্মসংবৃত বলিয়াই ইহা সত্য ও সুন্দর। আত্মশক্তিতে প্রাণদ বলিয়াই এ প্রেম সংসারের যে কোন ক্ষয়-ক্ষতি, দুঃখ-সন্তাপ, এমনকি মৃত্যুর আহ্বানকেও সাগ্রহে বরণ করিতে সক্ষম। মাধুর্যমণ্ডিত এই প্রেমের গভীরে আছে ভোগবৈরাগ্য—ভোগচঞ্চলতা নহে। দেহাশ্রিত, ইন্দ্রিয়জ বাসনা-কলুষিত অন্তরে দেহাতীত এই প্রেমের আনন্দ-উপলব্ধিকে আস্বাদন করা চলে না। ভোগের বাসনা-রঞ্জিত নহে, ত্যাগের গৈরিক-লাঞ্ছিত অন্তরে এই প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ সন্ধান লাভ করা সম্ভব।

ধূলিধূসর ধরিত্রীর সাধারণ নরনারী আসক্তিমুক্ত, অকলঙ্কিত প্রেমের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে অক্ষম। তাই প্রেমকে তাহারা দেহের সীমায় সীমিত করিয়া সংকীর্ণ করিয়া তোলে। আসঙ্গলিপ্সা উদগ্র হইয়া উঠে বলিয়া দেখা দেয় বিকৃতি। ভোগস্পৃহা সৃষ্টি করে প্রমত্ত আবর্ত। তখন মহত্তর প্রেমবৃত্তি—মূঢ় সম্ভোগ-কামনায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। প্রেমানুভূতি কলুষক্লিন্ন লালসায় পর্যবসিত হয়। তখন প্রকৃত প্রেম আপন জ্যোতির্ময় রূপটি হারাইয়া মলিন হইয়া পড়ে। ইহা হইয়া উঠে শুভবোধবিহীন ও অবিবেকী। অন্ধদৃষ্টির ফলে তখন মানব-মানবী সত্যপথটিকে চিনিয়া লইতে পারে না। অতিইচ্ছার দুরন্ত আবেগে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইহা আত্মতৃপ্তি সন্ধান করে। লুব্ধদৃষ্টিতে পরমপ্রেয়কে পাইতে চাহিয়া তাহাকে সমাজসংসার হইতে উৎপাটিত করিয়া

বলে, ফলে দেখা দেয় চরম বিনষ্টি। পরিণাম হয়—নিষ্ফল। কারণ, ভোগস্পৃহাচঞ্চল মানুষ বিচারবুদ্ধি হারাইয়া এমনই হইয়া উঠে যে, যে-কেহ বাধা সৃষ্টি করিলে উন্মত্ত উন্মত্ত রোষে সে তাহার উপর আঘাত হানিতে অগ্রসর হয়, এবং সেই আঘাত শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাতরূপে ফিরিয়া আসিয়া আঘাতকারীকে বিপর্যস্ত করে। এই প্রেম বিকৃত বলিয়াই প্রণয়ী-যুগলকে আত্মহননের পথে ঠেলিয়া দেয়। ফলে দেখা দেয় মানব-আত্মার মহতী বিনষ্টি। সর্বভুক বহ্নির মতো লালসা-বহ্নিও একবার জাগ্রত হইলে তাহা সবকিছু নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিয়া তবে নির্বাপিত হয়।

জ্ঞান, প্রেম, কর্ম প্রভৃতি সকল মানবীয় বৃত্তির সুসামঞ্জস্যই মানবীসত্তার প্রকৃতিস্থ অবস্থা। এই সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হইলে নরনারী অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে। অপ্রকৃতিস্থ আত্মা চির অশান্ত। এই অশান্ত, অতৃপ্ত, অন্তর্দাহ-দগ্ধ অন্তর তখন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং ব্যক্তিত্ব তাহার ভারসাম্য হারাইয়া ফেলে। ফলে অনিবার্য ভাবে নামিয়া আসে ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি শুধুমাত্র মোহাবিষ্ট ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না, তাহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত জীবন—সেইসকল জীবনেও ট্র্যাজেডির বিষাদময়তা ছড়াইয়া দেয়।

আসক্তিক্লিন্নতা, মোহাচ্ছন্নতা—প্রেমকে বিকৃত করিয়া তোলে। তাহাকে কল্যাণ বিচ্যুত করিয়া ফেলে। ইহা প্রেম নহে—কাম। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছাই ইহার স্বরূপ। আত্মকেন্দ্রিত বলিয়া ইহা সংসারসমাজ হইতে ভ্রষ্ট।

আসক্তিমুক্ত হইলে তবেই আত্মার মুক্তি। মুক্ত আত্মাই আত্মিক আনন্দের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মুক্তাত্মা ভোগের রঙে রঞ্জিত নহে—বৈরাগ্যের গৈরিক-লিপ্ত। ভোগ নহে—ত্যাগের সাধনা প্রকৃত প্রেমের সাধনা।

'রাজা ও রানী' নাটকের নায়ক রাজা বিক্রমদেব কামনাকলুষিত প্রেমার্তি লইয়া রানী সুমিত্রাকে পাইতে চাহিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রেয়সী সুমিত্রাকে একান্ত ভোগের বস্তু বলিয়া জানিয়াছেন, কিন্তু রানী সুমিত্রা মুহূর্তের জন্যও তাঁহার শ্রেয়সী সত্তাকে বিস্মৃত হন নাই। তাই রাজা জৈব প্রবৃত্তির উন্মত্ততায় দুইটি বাহুলতা দিয়া যতই তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়াছেন, ততই রানী সুমিত্রা তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছেন। ধরা পড়েন নাই। লোকমাতা সুমিত্রা প্রেয়ঃস্বপ্নকে শ্রেয়স্তপস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহী ছিলেন

বলিয়াই তিনি বার বার রাজাকে তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মোহান্ধ রাজা আত্মবিস্মৃত। আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার কাটাইয়া রাজা কিছুতেই সত্যের দীপ্ত আলোকে বাহির হইয়া আসিতে পারেন না। রাজ্যেশ্বরের, হৃদয়েশ্বরের মোহাচ্ছন্নতা দূর করিতে না পারিয়া, রানী সুমিত্রা শেষপর্যন্ত নিজেকে সরাইয়া লইয়া স্বামীর অন্তরে সত্যবোধ জাগ্রত করিবার সংকল্প করিলেন। বিক্রমের প্রেমেই সুমিত্রা বিক্রমকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রানী বিদায় লওয়ায় ভোগ-কেন্দ্রিত রাজা ভোগকেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়িলেন। তাই তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল ক্রোধাগ্নি। অন্ধ প্রেম দুর্দান্ত হিংস্রতায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। দেখা দিল নিষ্ঠুর বীভৎসতা। রাজা বিক্রম—মহৎ প্রেমের যে সমুচ্চ ভূমিতে রানী সুমিত্রার অবস্থান—সেই ভূমিতে নিজেকে তুলিয়া আনিতে পারেন নাই। যখন পারিলেন তখন রানী সুমিত্রা তাঁহার নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু তাঁহাদের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়াছে। অনুতপ্ত চিত্তে রানীর নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিবার অবকাশ না দিয়াই রানী সুমিত্রা রাজ্যেশ্বর বিক্রমের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বিক্রম হইয়াছেন চির-অপরাধী। ভোগসর্বস্ব প্রেমের ইহাই একমাত্র পরিণতি। দেহাশ্রিত কামনার্ত প্রেম চির-অভিশপ্ত।

এই বিশিষ্ট প্রেমতত্ত্বই যে 'রাজা ও রানী' নাটকটির অবলম্বন—এ সত্যের প্রতি কবি-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই নাটকের ভূমিকাতেই ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন, "...বিক্রম...প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। ...এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে ব্যতউদ্যত হয়েছে যে সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।" এইখানেই নাট্যকারের বক্তব্য শেষ হয় নাই। এই নাটকেরই রূপান্তর ঘটাইয়া রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যে 'তপতী' নাটক রচনা করিয়া-ছিলেন, তাহার ভূমিকাতেও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য-উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো—এইটেই রাজা ও রানীর মূলকথা।"

কিন্তু এই মুখ্য তত্ত্বটি ব্যতীত আর একটি দিক সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা রবীন্দ্রজীবনদর্শনে নারীর বিশিষ্ট স্থান। বক্তব্যটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে দেখা যায় যে, পুরুষের অসীম শক্তি মোহ-বিকারগ্রস্ত হইয়া যখনই ব্যাপক অকল্যাণের আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছে, তখনই ঘটনাধারায় শুভদ্রা নারীচরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। এই সমস্ত নারী আসিয়া প্রমত্ত পুরুষের অমানবীয় পরিণতিকে মঙ্গলমুখী করিয়া তুলিয়াছে। কোমলতার জীবন্ত মূর্তি এই সকল নারী কখনও দয়াময়ী, কখনও প্রেমময়ী, কখনও করুণাময়ী, কখনও বা প্রেমস্বরূপিণী। এহেন কল্যাণী নারীর কল্যাণ-স্পর্শে অপ্রকৃতিস্থ, অবিবেকী পুরুষ তাহার হিংস্রতা, কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা হইতে মুক্তি পাইয়া চিত্তের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থাটি ফিরিয়া পাইয়াছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকের বালিকা, 'রুদ্র চণ্ড' নাটকের অমিয়া, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের বালিকা, 'বিসর্জন' নাটকের অর্পণা, 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনী—ইহারা কেহ সৌন্দর্য, কেহ আনন্দ, কেহ করুণা, কেহ প্রাণ, কেহ বা প্রীতির জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে সংকটময় নাটকীয় মুহূর্তে আবির্ভূত হইয়াছে। 'রাজা ও রানী' নাটকের এমনই এক সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভূত হইয়াছে প্রেমের ধ্রুবজ্যোতিস্বরূপিণী ত্রিচূড়রাজকন্যা ইলা—কুমারসেনের প্রণয়িনী। লুব্ধবুদ্ধি, বিবেকবিহীন বিক্রমদেবের নিকট মুক্তিপথের দূতী এই নারীমূর্তি। এই প্রেমময়ী নারীর সান্নিধ্যে আসিয়া প্রেমস্বর্গচ্যুত রাজা গ্লানিমুক্ত প্রেমের শান্তিস্বর্গে অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন। সর্বজয়ী প্রেমের স্পর্শে রাজা বিক্রমের জন্মান্তর ঘটিয়াছে।

॥ রাজা ও রানী ও প্রকৃতির প্রতিশোধ : ভাব-সাদৃশ্য ॥

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাজা ও রানী' নাটকের ভূমিকায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে।'—বলিয়া যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সেই সাদৃশ্যটুকু সহজেই চিনিয়া লইতে পারি। তবে সাদৃশ্যটুকু আবিষ্কার করিতে হইলে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকাটির সংক্ষিপ্ত কাহিনীর সহিত পরিচিত হইবার প্রয়োজনও একান্ত অনিবার্য হইয়া উঠে।

মায়াবাদী, জ্ঞানমার্গের অধ্যাত্মসাধনারত, বিজনগুহাবাসী এক সন্ন্যাসী বিশ্বকে অস্বীকার করিয়া পর্বতগুহায় বসিয়া অনন্ত সত্তার ধ্যান করিয়া মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছেন :

"বনে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি,
তিল তিল জগতের ধ্বংস করিতেছি,
সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কী আনন্দ আজি।"···একদিন ছিল যখন এই সন্ন্যাসী ছিলেন বাসনা-কামনাবদ্ধ, তখন ভোগস্পৃহার তাড়নায় তিনি দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন—

"বাসনার বহ্নিময় কশাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মতো।
নিজের ছায়ারে নিজ বক্ষে ধরিবারে
দিন রাত্রি করিয়াছি নিষ্ফল প্রয়াস।"······বাসনা-বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া শেষপর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসী হইলেন। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় বসিয়া যে তপস্যা তিনি করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ভোগের আকাঙ্ক্ষা দূর হইয়াছে। আজ প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তুত। কারণ একদিন যে প্রকৃতি তাঁহার চিত্তে বাসনা-বহ্নি জ্বালাইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছে, তাহার স্বরূপ তিনি সকল মানুষের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবেন। প্রকৃতির হাত হইতে সকলকে উদ্ধার করা তাঁহার কর্তব্য :

"বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে।
সেই ভস্মমুষ্টি আজি মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হতে হইব বাহির।
তোরি রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ গান।" ···এইখানেই দ্বন্দ্বের সূচনা। সন্ন্যাসী গুহা হইতে বাহিরে না আসিলে প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোন বিরোধ বাধিত না ; কিন্তু বহিরাগত সন্ন্যাসীর প্রতিশোধ গানই প্রকৃতির প্রতিশোধ ঘটাইল।

আত্মদম্ভে আত্মহারা সন্ন্যাসী গুহা ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া আসিয়া, দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া এ সংসারের যাহা-কিছু দেখেন তাহাই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। সমস্ত জগৎ যখন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে

চল-চঞ্চল, তখন এই নিষ্কাম সন্ন্যাসী বলেন, "দেখি হেথা বসে সংসারের খেলা।" 'সংসার খেলা'ই জীবন্ত রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। সীমিত জগতের এই বিচিত্র লীলা দেখিয়া সন্ন্যাসীর চিত্তে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহাতে যেন বেদনার অস্ফুট চিহ্ন।

অপরাহ্নপ্রায়। এমন সময় ধ্বনিত হইল "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে।" সন্ন্যাসী দেখিলেন, এক ম্লেচ্ছকন্যাকে সকলে তাড়াইয়া দিতেছে। নিরাসক্ত সন্ন্যাসী বালিকাটিকে আশ্রয় দিলেন। করুণা বা অনুকম্পার বশবর্তী হইয়া সন্ন্যাসী এই কাজ করেন নাই। ভেদাভেদ, জাতিবিচার, সংকীর্ণ সংস্কারের ঊর্ধ্বচারী বলিয়াই সন্ন্যাসী ম্লেচ্ছকন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন। অবহেলিতা, উপেক্ষিতা বালিকাটিকে তাই সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, "জেনো, বৎসে, মোর কাছে সকলি সমান।"

কুটিরবাসিনী অনার্য রঘুর কন্যা আশ্রয় পাইল। সন্ন্যাসী নিত্যই তাহার নিকট আসেন। স্নেহকাঙ্গালিনী কন্যা একদিন এই সন্ন্যাসীকেই 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া বসে। এই ক্ষুদ্র সম্বোধনটুকু নিষ্কাম, নির্মোহ সন্ন্যাসীর চিত্তে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া তোলে। সন্ন্যাসী অনুভব করেন তিনি মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। স্নেহরেখাহীন নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিবেন না বলিয়াই তিনি বালিকাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যান।

কিন্তু কি এক অদৃশ্য-আকর্ষণে তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। অপেক্ষমানা বালিকাও সন্ন্যাসীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল-চিত্তে গান গাহিয়া উঠে। সন্ন্যাসী-চিত্ত শঙ্কিত হইয়া উঠে। তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁহার বন্ধনবিহীন হৃদয় মায়াবিনী প্রকৃতির বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে :

> "একী রে মদিরা আমি করিতেছি পান!
> একী মধু-অচেতনা পশিছে হৃদয়ে।
> * * * * *
> ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
> কেন রে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে।"

স্নেহরেখাহীন কঠোর সন্ন্যাসী-চিত্ত স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। বালিকার স্নেহপাশ তাঁহাকে কেবলই কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু

জনে বাঁধা পড়িলে এতদিনকার সকল সাধনাই যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, বঞ্চিত হইবে সত্যোপলব্ধি। অসহায়া বালিকার কাতর ক্রন্দনকে অস্বীকার করিয়াও সন্ন্যাসী তাই পলাইয়া গেলেন গভীর অরণ্যে। আশ্রয়-উপেক্ষিতা মূর্ছাহত হইয়া পড়িয়া থাকিল। শুরু হইল ঝড়ের তাণ্ডব।

সন্ন্যাসী পলাইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু ভুলিতে পারিলেন না ক্রন্দনাতুরা বালিকাটির মূর্ছাহত রূপ। ফলে সন্ন্যাসীর চিত্তদেশে দেখা দিল পরিবর্তন। নিষ্কাম সন্ন্যাসব্রত মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। অনার্য বালিকার স্নেহাকর্ষণে ফিরিতে হয় সন্ন্যাসীকে—সংসার অভিমুখে। আর তখনই ধীরে ধীরে জগতের সত্য স্বরূপটি তাঁহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

"এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।…"

সন্ন্যাসী ফিরিলেন দুর্যোগময়ী রাত্রির অবসানে। কিন্তু গুহামুখে পৌঁছাইয়া দেখিলেন উপেক্ষিতা, অনাদৃতা, অসহায়া বালিকার নিথর, নিস্পন্দ দেহ ধূলায় লুটাইতেছে। সন্ন্যাসীর অন্তর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। এক নিঃসীম শূন্যতায় তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যন্ত্রণাজর্জর অন্তরে তিনি বলিয়া উঠিলেন :

"নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
বাছা , বাছা, কোথা গেলি কী করিলি রে!
হায়, হায়, একী নিদারুণ প্রতিশোধ!"

নিখিল বিশ্বের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া, নিজেকে জগৎসংসার হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়া, অনন্তের ধ্যানে বসিয়া সন্ন্যাসী মায়াবিনী প্রকৃতির উপর জয়ী হইতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু জগৎকে তুচ্ছ করিয়া সার্থকতা অর্জন করিতে গেলে প্রকৃতিও প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সন্ন্যাসীর হৃদয়ে নিঃসীম শূন্যতা জাগ্রত করিয়া প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, প্রায় অভিন্ন একটি তত্ত্বচিন্তা বা কবি-ভাবনা সামান্য পরিবর্তিত হইয়া দুইটি নাটকে নাটকায়িত হইয়াছে। তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় : মানবীয় প্রেমসাধনা বা অধ্যাত্মজীবনসাধনা যদি বাস্তব

সংসারসম্পর্কশূন্য ও আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে, তবে তাহা অসম্পূর্ণ ও মানব-সত্যের বিরোধী। বিরোধী বলিয়াই তাহা জীবনচর্চায় ব্যর্থতা ডাকিয়া আনিয়া পরিণামে নিঃসীম শূন্যতা সৃষ্টি করে। ইহা নিঃসন্দেহে ট্র্যাজিক। এই ট্র্যাজেডি স্বভাবভ্রষ্ট, সত্যভ্রষ্ট হইবার ট্র্যাজেডি।

সামঞ্জস্যবাদী নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ 'স্বভাব' শব্দটিকে একটি বিশেষ ব্যঞ্জনায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মানবাত্মার স্বভাবে অনুষ্ঠানের অর্থ হইল—জ্ঞান, প্রেম, কর্ম এই তিন বৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অবস্থান। এই তিনটি বৃত্তির কোন একটি প্রাধান্য লাভ করিয়া অন্য বৃত্তি-গুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে সামঞ্জস্য বিচলিত হয়—মানবাত্মা স্বভাবভ্রষ্ট হয়। কারণ প্রেম ও কর্মের সম্পর্কবিচ্যুত জ্ঞান মানবজীবনকে বৈরাগ্যের গৈরিক ধূসরতায় ধূসরিত করিয়া তোলে। তখন সত্যের মূর্তিটি হয় আচ্ছন্ন। জ্ঞান ও কর্ম-বিযুক্ত প্রেম হৃদয়কে আবেগবিহ্বলতায় প্রমত্ত করিয়া তোলে এবং জ্ঞান ও প্রেমহীন কর্মপ্রচেষ্টা উদ্দেশ্যহীনতার আবর্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে থাকে—সার্থকতার তীরে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সংকীর্ণ স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া তাহা নানা অনর্থ সৃষ্টি করিয়া বসে। সুতরাং জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের পূর্ণ সামঞ্জস্যেই স্বভাবের প্রতিষ্ঠা। স্বভাবের সার্থক প্রতিষ্ঠাতেই শান্তি ও মুক্তি। যেখানে সামঞ্জস্য বিচলিত—সেখানেই অপূর্ণ আত্মা স্বভাবভ্রষ্ট, সত্যভ্রষ্ট।

স্বভাবভ্রষ্ট মানুষ জগৎসংসারের সকল-কিছুর সহিত মঙ্গলসুন্দর যোগটি ছিন্ন করিয়া আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠে: আত্মকেন্দ্রিক জীবনচর্চায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ সাধনা সম্ভব নহে, ফলে মনুষ্যত্বের বিকৃতি ঘটে। স্বভাববিরোধী, বিকৃত মনুষ্যত্ব শেষপর্যন্ত নিষ্ফলতা, ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনারই আধার হইয়া উঠে। পরিণামে ডাকিয়া আনে আত্মার অতৃপ্তি, আক্ষেপ, অশান্তি, ক্রন্দন ও হাহাকার। ইহাই তো মানবজীবনের মহতী বিনষ্টি। ইহাই তো মানব-জীবনের বিষাদকরুণ ট্র্যাজেডি।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এবং 'রাজা ও রানী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ এই জীবন-সত্যেরই বাণীরূপ দিয়াছেন।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের মায়াবাদী সন্ন্যাসী ভূমাপিপাসী—অধ্যাত্ম-সাধক। শাস্ত্রজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া তিনি অনন্তের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ সমন্বিত এই জগৎ তাঁহার নিকট মিথ্যা হওয়ায় এবং

সীমা ও অসীমকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার ফলে অনন্তের প্রকৃত রহস্য তাঁহার নিকট ধরা পড়িল না। আত্মভাবসাধনায় মগ্ন সন্ন্যাসী জগদ্‌বিমুখ হইয়া উঠায় বাস্তব সংসারের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়াছেন। হৃদয়ের ধর্ম হইয়াছে উপেক্ষিত। প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসা তাঁহার নিকট মূল্য হারাইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া জাগতিক মায়ামোহের বহু উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার গর্বে সন্ন্যাসী গর্বিত। সন্ন্যাসীর বিশ্বাস—এইখানে তিনি প্রকৃতির উপর বিজয়ী। কিন্তু এইখানে তাঁহার পরাজয়ও বটে, কারণ অন্ধকার গুহাবাসী এই সন্ন্যাসী আত্মকেন্দ্রিত জীবনসাধনায় বসিয়া বিশ্ব-নিখিলের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। জগৎ ও জীবনের উপর সহজ অধিকারটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

নির্জনতায় বসিয়া সন্ন্যাসীর এই পরমার্থ সাধনা—আত্মবিনাশী সাধনা। কারণ "জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় মাত্র, প্রেমের দ্বারা পাওয়া যায়। তত্ত্বরূপে জ্ঞানের দ্বারা যাহা জানি, সত্যরূপে প্রেমের দ্বারা তাহাকে না পাওয়া পর্যন্ত পূর্ণতা আসে না।" প্রেমদৃষ্টি উন্মীলিত না হওয়াতে জগতের সত্য রূপটি সন্ন্যাসীর নিকট ধরা পড়ে নাই। সন্ন্যাসী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—সান্তকে লইয়া অনন্ত, খণ্ডকে লইয়া অখণ্ড, সীমাকে লইয়া অসীম। প্রেমের পূর্ণদৃষ্টিতেই কেবল সীমা ও অসীমের মিলনসেতুটি আবিষ্কার করা সম্ভব।

বিশ্ববিহীন বিজনে সাধনারত, মোহময় সন্ন্যাসীর জীবনে যখন সীমার তুচ্ছতা ও অসীমের শূন্যতা বিরোধ বাধাইয়াছে, তখন সেই বিরোধের সমাপ্তি ঘটাইল অনার্য অনাথিনী বালিকা। সংসারভীরু, পলাতক সন্ন্যাসীকে এই সংসারে ফিরাইয়া আনিল এই বালিকা—স্নেহের আকর্ষণে। সন্ন্যাসী-চিত্তের এতদিনকার রুদ্ধদ্বার হইল উন্মুক্ত। মোহমুক্ত সন্ন্যাসী তখন যেদিকেই দৃষ্টিপাত করিলেন সেইদিকেই দেখিলেন আনন্দের অনাবিল স্রোত, সৌন্দর্যের অপরূপ তরঙ্গভঙ্গ।

সংসারে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে এই সংসারের হাতেই চরম শাস্তি গ্রহণ করিতে হইল। এ শাস্তি স্নেহ-প্রেমের দাবিকে অস্বীকার করিবার শাস্তি। স্নেহকাঙালিনী বালিকার স্নেহাকর্ষণে সন্ন্যাসী সংসারে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন বালিকা চিরকালের মতো বিদায় লইয়াছে। সন্ন্যাসীর হৃদয়হীন উপেক্ষাই তাহার মৃত্যুর কারণ। এই আঘাতে সন্ন্যাসী-হৃদয়

ার্তনাদ করিয়া উঠিল। অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সারাজীবন ধরিয়া এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, বিবেক ও বাসনা, বিশেষ ও নির্বিশেষের মধ্যে সামঞ্জস্য াধন করিতে পারেন নাই বলিয়াই সন্ন্যাসী জীবনের ভারসাম্য হারাইয়া ফলিয়াছেন। মিথ্যাজ্ঞানের মোহ তাঁহার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। স্নহ-প্রেম-প্রীতিশূন্য, মানবিক সম্পর্কবিচ্যুত জগতে সন্ন্যাসী শেষপর্যন্ত ব্যর্থ ইয়াছেন। মনোধর্ম ও প্রাণধর্মকে সমন্বিত করিতে পারেন নাই বলিয়াই ন্ন্যাসীর এই ব্যর্থতা। সন্ন্যাসী হৃদয়সত্যকে উপেক্ষা করিয়া স্বভাবকে ঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়াই প্রকৃতি তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইয়াছে।

দার্শনিক কবি-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে হৃদয়ধর্মই সত্যধর্ম। ৃদয়কে নিপীড়িত করিয়া যে জীবনসাধনা—তাহা আত্মবঞ্চনা মাত্র। ইহা নুষ্যস্বভাবের বিকৃতি ঘটায় বলিয়াই দেখা দেয় আত্মার মহতী বিনষ্টি।

'রাজা ও রানী' নাটকেও আমরা এই একই জীবন সত্যের রূপায়ণ দেখি। াসনা-বিবর্জিত বিবেক যেমন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের সন্ন্যাসী-জীবনে নিদারুণ ট্র্যাজিক পরিণতি ডাকিয়া আনিয়াছে, বিবেক-বিবর্জিত াসনা তেমনি 'রাজা ও রানী' নাটকের নায়ক বিক্রমদেবের ট্র্যাজিক ারিণতির কারণ হইয়াছে।

হৃদয়ধর্মকে অস্বীকার করিয়া চিত্তদুয়ার রুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া সন্ন্যাসী াস্তব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, আর ভোগরতিমত্ত জালন্ধররাজ বিক্রমদেব হৃদয়াবেগের অতি-প্রাধান্যকে স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই বাস্তব সংসারের বিরাট বিস্তৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্তঃপুরকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া তুলিয়াছেন। মঙ্গল ও কল্যাণের যোগসূত্রটি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আসক্তিপূর্ণ াসনাকে সর্বস্ব করিয়া লইয়াছেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পূর্ণসামঞ্জস্য বিচলিত হইয়াছে বলিয়াই উভয়ের জীবনে দেখা দিয়াছে বিকৃতি। মনুষ্যত্ব হইয়াছে বিকলাঙ্গ। তাঁহার কল্যাণময় সামাজিক রূপটি হইয়াছে বিকারগ্রস্ত। দুইজনের দৃষ্টিই মোহাচ্ছন্ন—মুক্তদৃষ্টি নহে। নিবৃত্তির প্রবলতায় সন্ন্যাসী স্বভাবভ্রষ্ট হইয়াছেন আর প্রবৃত্তির প্রমত্ততায় রাজা বিক্রম সত্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। ফলে দেখা দিয়াছে শোচনীয় ট্র্যাজিক পরিণাম।

আসক্তিপূর্ণ অন্তর লইয়া রানী সুমিত্রাকে একান্ত করিয়া পাইতে গিয়া

রাজা বিক্রম রাজ্যের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলেন, রাজধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। প্রেমিকসত্তার সহিত রাজসত্তার প্রবল বিরোধ সৃষ্টি হইল। মোহময় প্রেমের প্রবল উন্মাদনায় রাজা কর্তব্যবিমুখ হইলেন। কল্যাণময়ী, প্রেমময়ী রানী সুমিত্রা কর্তব্যবিমুখ রাজার অন্তরকে মোহমুক্ত করিয়া সত্যবোধ জাগ্রত করিতে আগ্রহী এবং শেষপর্যন্ত নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়া তিনি স্বামীর অন্তরে সত্য-চেতনা জাগ্রত করিতে চাহিলেন। দেহধর্মী কামনার্তির মোহনিমগ্নতা হইতে রাজা বিক্রমদেব হিংস্রতার প্রচণ্ডতায় নিমজ্জিত হইলেন। মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়া বসিলেন। রাজ-অন্তরের সামঞ্জস্য বিচলিত হইল। কুমারী ইলার ঐকান্তিক প্রেম বিক্রমদেবের হিংস্রতাকে প্রশমিত করিল। রাজার প্রণয়ীসত্তা প্রেমময়ী ইলার স্পর্শে পুনর্বার জাগিয়া উঠিল। বিচলিত ভারসাম্যকে সামঞ্জস্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে রাজা আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আপনকৃত পাপের শাস্তিকে অস্বীকার করিবার শক্তি রাজার নাই। যে হিংস্রতার অগ্নি রাজা বিক্রম নিজহস্তে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছেন—কাশ্মীররাজ কুমারসেন ও সহধর্মিণী সুমিত্রার আত্মাহুতিতে সেই অগ্নি নির্বাপিত হইল বটে, কিন্তু রাজার অন্তর চিরকালের মত দগ্ধ হইয়া গেল। যে সামঞ্জস্যের জন্য রাজা বিক্রমদেব ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা আর ফিরিয়া আসিল না। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া রাজাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে, যন্ত্রণায় জর্জরিত হৃদয় লইয়া রাজা বিক্রম নৈরাশ্যের দুঃসহতায় ডুবিয়া গিয়াছেন।

প্রচণ্ডতম আঘাতের মধ্য দিয়া মানবজীবনে মোহমুক্তি ঘটে—সত্যের জ্যোতির্ময় মূর্তি আত্মপ্রকাশ করে। আত্মবিস্মৃত, বাস্তব বিবর্জিত, অন্ধদৃষ্টি ও মোহগ্রস্ত সন্ন্যাসী এবং বিক্রমদেবের জীবনেও বালিকা ও সুমিত্রার মৃত্যু কঠিন আঘাত হানিয়া মোহমুক্তি ঘটাইয়াছে। দুটি কোমল প্রাণের বিসর্জনের মধ্য দিয়া সন্ন্যাসী ও বিক্রমদেব সত্যলোকে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন।

ধূসর বৈরাগ্য কিংবা অন্ধ আসক্তি—কোনটিই মানবজীবনের প্রত্যাশিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। অথচ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামঞ্জস্যেই মনুষ্যত্বের পরম চরিতার্থতা। জগৎ-বিমুখ, ইন্দ্রিয়রুদ্ধ অধ্যাত্মসাধনায় নিষ্কাম সন্ন্যাসী এবং কর্তব্যবিচ্যুত, আসক্তিপূর্ণ প্রণয়সাধনায় রাজা বিক্রম—পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটাইতে পারেন নাই বলিয়াই শেষপর্যন্ত অনিবার্য ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ

য়াছেন। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটুকু প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন : ীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে; বিক্রম নি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে।"

॥ রাজা ও রানী ঃ কবিভাষ্য ॥

রবীন্দ্রনাথ অজস্র সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বহুসময় বহুভাবে তাঁহার দর রচনার নানা ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার অনেক ার গভীরে প্রবেশ করা সহজসাধ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আবার া ঘটনাও ঘটিয়াছে যখন নিজের রচনা সম্পর্কে কবির ভাষ্য পাঠকদের ট সর্বৈব সত্য বলিয়া মনে হয় নাই। এমন দেখা গিয়াছে যে, কবি ার প্রথম জীবনের রচনাকে পরবর্তী জীবনে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেন । 'রাজা ও রানী' সম্পর্কে দেখা যায় যে, এই নাটকটির দোষত্রুটি গত বয়সের কবিকে যথেষ্ট পীড়া দিয়াছে এবং কবি এই মানস-যন্ত্রণামুক্ত ার জন্যই পরিশেষে এই নাটকটির পরিবর্তন সাধন করিয়া 'তপতী' নাম । একখানি নূতন নাটক রচনা করিয়া ইহার সম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্ব শোধ য়াছেন।

কবি 'রাজা ও রানী' নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন: "বড়ো আকারে া দিল একটি নাটক—রাজা ও রানী। এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের ান, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ রিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা ান্ত শোচনীয়রূপে অসঙ্গত। এই নাটকে যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা য়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত ংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"

এই রচনা তাঁহাকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে নাই বলিয়াই তিনি ১৩৩৬ াল একই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রচনা করিলেন 'তপতী' এবং ১৩৩৬ ালের ১৯শে ভাদ্র এই নূতন নাটকের ভূমিকায় লিখিলেন, "সুমিত্রা এবং ক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই রোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে

গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই ক্লান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য-উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো—এইটেই 'রাজা ও রানী'র মূলকথা।

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।"

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় 'নিত্যনব-অনুভূতিশীল' কবির পক্ষে বুদ্ধিবিদগ্ধ মন নাই বলিয়াই নূতন সৃষ্টির আয়োজন, ইহা স্বাভাবিক।

॥ রাজা ও রানী : একটি তত্ত্ব ॥

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'রাজা ও রানী' নাটকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যা আমরা 'কবিভাষ্য' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু রবীন্দ্র রচনার ঐ একটি ব্যাখ্যা পাইয়াই বাঙ্গালী সমালোচকরা তৃপ্ত হন নাই। তাঁহারা নিজের নিজের চিন্তা ও কল্পনানুসারে এ রচনার ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। শুধু মাত্র 'রাজা ও রানী' নাটকের সম্পর্কেই একথা সত্য নহে; সমগ্র রবীন্দ্র-রচনা সম্পর্কেই একথা সত্য।

অধ্যাপক সমালোচক প্রমথ বিশী 'রাজা ও রানী' নাটকটিকে ঋতুচক্রের আবর্তনের একটি ধাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে একটি ঋতু-নাট্য বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং বলা চলে, অধ্যাপক বিশী 'রাজা ও রানী' নাটকের মাধ্যমে একটি তত্ত্বই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহী। আমরা এই পর্বে অধ্যাপক সমালোচক বিশীর বক্তব্যটিই এখানে গ্রহণ করিব।

"রবীন্দ্রনাথের নাটকের তিনটি ধাপ আছে।

প্রথম ধাপে কতকগুলি নাটক যাহাতে রঙ্গমঞ্চের সবটা জায়গা জুড়িয়া ব সব পাত্রপাত্রী; প্রকৃতি তাহাতে অল্পই স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় ধাপে কতকগুলি নাটক, প্রত্যক্ষত যাহার পাত্রপাত্রী প্রকৃতি—মানুষের কথা, তাহাতে কেবল

নাতেই ধ্বনিত। মাঝখানে একটা ধাপ আছে, সেখানে মানুষ ও প্রকৃতি রে ধীরে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইহাকে মানব ও প্রকৃতির সীমান্ত দেশ বলা চলিতে পারে; প্রথম ধাপের মানবীয় গুরুত্ব কমিয়া আসিয়াছে, ন্তু এখানে তৃতীয় ধাপের প্রাকৃতিক প্রাধান্য শুরু হয় নাই। প্রকৃতি এখনও টভূমিতে পড়িয়া আছে। কিন্তু সে পটভূমি নির্জীব ও অর্থহীন নহে। এই টকগুলি পড়িলে মনে হয় কবির নাট্যজগতে একটি প্রধান চরিত্র প্রবেশের খ, এখনও তাহার সবটা পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই। এখনো সে নেপথ্যের াড়ালে, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার দূরাগত পায়ের শব্দ, ওড়ানীর আভাস, লর সুগন্ধ, সুরের মূর্চ্ছনা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। এইসব নাটকে কৃতি পটভূমিতে আছে বটে, কিন্তু সে নিজে পটভূমি নয়—কবির ইঙ্গিত ইলেই মানবচরিত্রকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া নিজে রঙ্গমঞ্চের সবটা ায়গা জুড়িয়া বসিবে।

* * * * *

দ্বিতীয় ধাপে নয়খানি নাটক আছে—অচলায়তন, বিসর্জন, শারদোৎসব, কঘর, রক্তকরবী, রাজা, ফাল্গুনী, রাজা ও রানী এবং তপতী। তপতীকে তন্ত্র নাটক বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই কয়খানি নাটক মনোযোগ দিয়া পড়িলে দেখা যাইবে—ইহাদের তের দিয়া বৎসরের ঋতুচক্র ঘুরিয়া আসিয়াছে—এবং আবর্তন গতানুগতিক াত্র নয়—প্রত্যেক নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে এক-একটি ঋতুর ভাবসংযোগ হিয়াছে, অর্থাৎ নাটকের মানব-পাত্রপাত্রীর জীবনে যে লীলা চলিতেছে কৃতির পরিবেশে সেই একই ভাবের লীলা—প্রকৃতি ও মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, রিপূরক; ভারতীয় কবি-প্রকৃতির নখদন্ত হইতে জীবরক্তের ধারা ঝরিয়া ড়ে না।

অচলায়তন নাটকের ঘটনাকাল গ্রীষ্ম, ইহার অন্ত্যভাগে নববর্ষার মাগম।

বিসর্জন বর্ষাকালের নাটক, ইহার নাটকীয় চরম মুহূর্ত শ্রাবণের শেষ ইদিনে সংঘটিত; শেষতম দৃশ্যটির সময় শরতের প্রথম প্রভাত।

শারদোৎসব, বলা বাহুল্য, শরৎকালের নাটক—কিন্তু সে শরৎ আগমনীর রৎ, অর্থাৎ ঋতুর অংশ। ডাকঘরও শরৎকালের নাটক বটে; কিন্তু সে-

শরতে বিজয়ার বিষাদের সুর লাগিয়াছে, কখন শরৎ অজ্ঞাতসারে হেমন্তের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

রক্তকরবীর সময় হেমন্তের শেষ এবং শীতের প্রারম্ভ ; ইহাকে পৌষমাস বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

• বসন্তকালের নাটক রাজা ও রানী, রাজা ও ফাল্গুনী।

এমনি করিয়া এই কয়খানি নাটকের ভিতর দিয়া ঋতুচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইয়া আসিয়াছে।

॥ বসন্ত ঃ রাজা ও রানী।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজার মতো ঋতুরাজ বসন্ত সন্ন্যাসী, বাহিরে তাহার ঐশ্বর্য, অন্তর তাহার বৈরাগী—"অন্তরে তার বৈরাগী গায়" ; যে কেবল বাহিরের সম্পদে মুগ্ধ হইল সে কিছুই দেখিল না ; যে ভিতরের উদাসীকে দেখিল, সে-ই দেখিল। কিন্তু বসন্তের এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের মনে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বয়সে তিনি রাজা ও রানী লিখিতে-ছিলেন তখন বসন্তের ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্ব তাঁহার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয় নাই, অর্ধগোচরভাবে অবশ্যই ছিল।

বিক্রমদেব ও সুমিত্রার সম্বন্ধের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব আছে, বিক্রমদেবের প্রচণ্ড আসক্তিই সুমিত্রাকে পাইবার পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার কারণ, বিক্রমদেব বসন্তের বাহিরটাকে কেবল দেখিয়াছেন, সেখানে ঐশ্বর্য, এবং ভোগরতি ; অন্তরে যেখানে বৈরাগ্য ও আসক্তিহীনতা সেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই ; তিনি প্রেমের বিলাসকেই দেখিয়াছেন, প্রেমের আত্মবিসর্জন-পরতাকে দেখেন নাই, কাজেই তিনি প্রেমে তৃপ্তি পান নাই ; সুমিত্রাকে পাইয়াও পান নাই ; বিক্রমদেবের প্রচণ্ড আসক্তিই ঢেউ তুলিয়া আকাঙ্ক্ষিত পদ্মটিকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই নাটকে বসন্তের ভাবটি কবির কাছে অর্ধগোচর ; সচেতন ভাবে প্রত্যক্ষ নয়।

'রাজা ও রানী'র রূপান্তর 'তপতী' সুপরিণত বয়সে লেখা, তখন কবির মনে ঋতুর ভাবের ক্রমবিকাশ স্পষ্ট রূপ ধরিয়াছে, কাজেই 'রাজা ও রানী'র চেয়ে 'তপতী'তে বসন্তের আইডিয়াটি পরিণততর ; সত্য কথা বলিতে কি, তপতীর কাহিনী এই আইডিয়াটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কবি লিখিয়াছেন :

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে........."

রচনার দোষে ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই ইহা সত্য নয়, ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়াই রচনার দোষ হইয়াছে। মানবজীবন ও বসন্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে যে ঐক্য আছে তাহা স্পষ্টভাবে ধরিতে পারিলে নাটকের ঘটনাস্রোত স্বাভাবিক পরিণামের দিকেই যাইত—অযথা কুমার ও ইলার প্রেম-কাহিনীর অসঙ্গতির মধ্যে ঠিক প্রবেশ করিত না। তপতীতে এই দোষ কবি শুধরাইয়া লইয়াছেন ; ভাবটি পরিস্ফুট হওয়াতে রচনা অন্তত এই দোষ পরিমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

॥ দৃশ্য-পরিচিতি : তাৎপর্য-বিচার ॥

॥ প্রথম দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

নাটকের নায়ক রাজা বিক্রমদেব রাজকার্যবিমুখ। রানীর আসঙ্গলিপ্সাই কামনার্ত রাজার একমাত্র কাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাহারই ফলে সমগ্র রাজ্যে দেখা দিয়াছে অরাজকতা। এই অরাজক অবস্থা হইতে একমাত্র যিনি রক্ষা করিতে পারেন তিনি সুমিত্রা। এই দৃশ্যে রাজ-সখা দেবদত্ত ও বিমর্ষ মন্ত্রীর কথোপকথনের মাধ্যমে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। নাট্যকার প্রত্যক্ষের ও ইঙ্গিতের সাহায্যে নাটকের মূল তিনটি চরিত্র—রাজা বিক্রমদেব, রানী সুমিত্রা ও রাজ-সখা দেবদত্তের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া নাটকের পটভূমিটিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

স্থান—জালন্ধর। রাজ-প্রাসাদের এক কক্ষে বসিয়া বাল্যবন্ধু দেবদত্তের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে রাজা বিক্রমদেব কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাল্য-সখা দেবদত্ত সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে শাস্ত্র, নৃপ ও রমণী যে সহজে বশ্যতা স্বীকার করে না সেই কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু রাজা বলেন, নারীহৃদয় বিধির বিধানের মতো অজ্ঞেয় একথা সত্য হইলেও অবিশ্বাস করা চলে না, কারণ রমণীর প্রেমই পুরুষের পরম আশ্রয়। আলোচনাকালে মন্ত্রীকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া রাজা অন্তঃপুরে পলায়ন করিলেন। কারণ রাজ্যের

নানা সমস্যার কথা শুনিতে তাঁহার ভালো লাগে না। তাই দেবদত্ত তাঁহাকে বলিলেন, "রানীর রাজত্বে তুমি লও গে আশ্রয়।" এইভাবে দেবদত্তের উক্তির মধ্য দিয়া নাট্যকার নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই চারিত্রিক দুর্বলতাই যে সংঘাতের মূলে তাহাও ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহার পর মন্ত্রী ও দেবদত্তের আলোচনায় পরবর্তী অধ্যায়ে রানী সুমিত্রা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবেন তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন।

আমাকে করিবে না……নির্বিষ খোলস—দেবদত্ত ব্রাহ্মণতনয়, রাজা বিক্রমদেবের বাল্যবন্ধু। বিক্রমদেবের রাজপ্রাসাদে কুলদেবতা আছেন, রাজা দেবদত্তকে সেই কুলদেবতার পূজার জন্য কুলপুরোহিত নিযুক্ত করিতে চাহেন। অথচ ব্রাহ্মণতনয় হইলেও দেবদত্ত সমস্ত শাস্ত্র ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র, যাগযজ্ঞবিধি—পুরোহিতের কর্তব্য পালনে যেগুলির প্রয়োজন, তিনি সব-কিছুই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে ব্রাহ্মণের পরিচয়স্বরূপ একটি শুভ্র উপবীত আছে বটে, তবে তাহার কোন মূল্য নাই। সর্প সময় সময় খোলস ছাড়ে। সেই খোলসের যেমন দংশনে বিষক্রিয়া ঘটাইবার শক্তি থাকে না, তেমনি শাস্ত্রাচারহীন ব্রাহ্মণের উপবীতও তেজোহীন। তাই তো নির্ভয়ে……ব্রাহ্মণ্য-বালাই—রাজা কুল-পুরোহিত-রূপে দেবদত্তকে বরণ করিতে চাহেন কারণ অন্যান্য ব্রাহ্মণের মতো ব্রাহ্মণ্য-গর্ব তাঁহার নাই। কথায় কথায় শাস্ত্র ও মন্ত্রের দোহাই তিনি পাড়েন না। পুরোহিত……আশীর্বাদ—সাধারণত সকল পুরোহিত রাজাশ্রয়ে থাকিয়া নানা আচার অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণার প্রতিই বেশী আগ্রহী, প্রকৃত প্রাণখোলা আশীর্বাদ করিবার মতো মানসিকতা তাহাদের নাই। এই জাতীয় পুরোহিত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ নয়, ব্রহ্মদৈত্যস্বরূপ। রাজা এইজাতীয় পুরোহিতকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের…ক্রিয়া-কর্ম জান…দেবদত্ত রাজাকে ব্রাহ্মণ ত্রিবেদীকে পুরোহিত পদে বরণের কথা বলিতেছেন। ব্রাহ্মণ ত্রিবেদী অত্যন্ত সাধু ব্যক্তি, সবসময়েই জপতপ ও মন্ত্রোচ্চারণ লইয়া আছেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য বলিতে তাঁহার কিছুই নাই, কারণ শাস্ত্রালোচনা করিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার নাই। অতি ভয়ানক ……সোহাগে শীতল—দেবদত্তের এই প্রস্তাবে রাজা আরও আতঙ্কিত,

কারণ এই সমস্ত ব্রাহ্মণ যাহারা জীবনে শাস্ত্রচর্চা করে নাই, কবিবার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য যাহাদের নাই, তাহারাই সর্বাপেক্ষা বেশী শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান নাই বলিয়াই সব-কিছু অশুদ্ধ বলিতে তাহাদেব বাধা নাই। তাই একই সঙ্গে রাজা নিজে এবং শাস্ত্রগুলি যাহাতে এইজাতীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা উৎপীড়িত না হয়, রাজা তাহাই কামনা করিতেছেন। রেখে দাও....তর্ক যত—দেবদত্ত কুলপুরোহিত হইলে রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এবং কুলদেবতা রোষদীপ্ত হইয়া উঠিবেন—এইজাতীয় আশঙ্কার কথা বলিলে রাজা বলিলেন, যদি কুলদেবতাব রোষ মাথা নত করিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহাতেও তিনি প্রস্তুত, কিন্তু অশিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, আত্মাভিমানী কুলপুরোহিতদের মিথ্যা আস্ফালন সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন, সূর্যের উত্তাপ সহ্য করা যায়, কিন্তু সেই সূর্যের উত্তাপে উত্তপ্ত যে বালুকাবাশি, তাহাব উত্তাপ অসহ্য। কবিব এ বর্ণনা বাস্তববোধসঞ্জাত [রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম পরিবাবে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাস ও প্রাণহীন শাস্ত্রাচারের নীরস কাঠিন্যের তিনি বিরোধী ছিলেন। এই বিরোধিতার চিত্র আমরা অন্যান্য রচনায়, বিশেষত 'অচলায়তন' নাটকে লক্ষ্য করি। এখানেও হিন্দুর নিরর্থক শাস্ত্রাচারেব প্রতি কবির প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লক্ষণীয়]। যত চিন্তা...নাহি মানে—মানুষ যতই শাস্ত্র লইয়া আলোচনায় রত হয় ততই সে আরও বৃহত্তর আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষাব অন্ত নাই। একটি শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে বিদ্যা আয়ত্তে আসিল মানুষ সেই অধীত বিদ্যার সাহায্যে বিদ্যাসমুদ্রের আরও গভীরে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নৃপতি প্রজাবর্গের নিকট যত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করেন ততই আরও বেশী লাভের আকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠেন। নারী সম্পর্কেও এমন উক্তি সত্য। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করা, রাজানুকূল্য লাভ করা ও নারীকে বশ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। রমণীর হৃদয়ের...জীবের জীবন—বিশ্ববিধাতার এই সৃষ্টিতে রহস্যের অন্ত নাই। তেমনি অন্ত নাই নারীহৃদয়-রহস্যের। কিন্তু নারীহৃদয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সহজসাধ্য নয় বলিয়া আমরা নারীহৃদয়ের প্রেমকে অবজ্ঞা বা অবিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ নারী তাহার প্রেমময়ী,

কল্যাণময়ী সত্তা লইয়াই এই সংসারক্ষেত্রকে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছে। তাহা না হইলে এই কঠিন সংসারক্ষেত্রটি মরূদ্যান না হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়া যাইত। এ পৃথিবীতে নদী বহিয়া চলিয়া রুক্ষভূমিকে সরস করিয়া তুলিতেছে, ফলে অজস্র ফসলে ধরিত্রী ফলবতী হইয়া উঠিতেছে। যে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে তাহা সকল জীবকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নদী ও বায়ু কিভাবে ও কাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে আমরা জানি না, কিন্তু এইটুকু জানি আমাদের কল্যাণের জন্যই তাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনি নারীহৃদয়ের প্রেম যে এ সংসারে সকলের পরম আশ্রয় তাহা অনস্বীকার্য। [তুলনীয়—স্ত্রীয়াঃ চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা।] বন্যা আনে…ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে—দেবদত্ত রাজার বক্তব্য শুনিয়া বলিলেন, যে-নদী প্রাণ দেয় সেই নদীই বন্যার কারণ, আর যে-বায়ু জীবন দেয় সেই বায়ুই ঝঞ্ঝার স্রষ্টা অর্থাৎ দুই-ই ধ্বংসের। প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়…মৃত্যুর নিদান—রাজা আলোচনা প্রসঙ্গে সৃষ্টি ও ধ্বংস এই দুই রূপের কথাই স্বীকার করিয়া লইলেন এবং মানুষ যে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির এক সামান্যতম অংশ তাহাই বুঝাইয়া বলিলেন,—স্রষ্টার সৃষ্টিকে বশ করিবার চেষ্টা যে করে সে মূর্খ। বিশ্ববিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মানুষ স্বইচ্ছায় কিছু পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিলে তাহা ধ্বংসেরই কারণ হয়। শুন তবে, বলিয়াছেন কবি ভর্তৃহরি…দাবানল—রাজার নিকট বলিবার অনুমতি পাইয়া দেবদত্ত কবি ভর্তৃহরির কাব্যের অংশবিশেষে নারীর যে রূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই রাজাকে শোনাইলেন। নারীর বাক্য আপাতমধুর, কিন্তু নারীহৃদয় অত্যন্ত কঠিন, তাহার হৃদয় যেন একটি বিষকুম্ভ; অধরে তাহার পিপাসা কিন্তু অন্তরে যেন সর্বদাই দাবানল জ্বলিতেছে। যেন সেই দাবানলে একমুহূর্তে সকল-কিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহার মাধ্যমে দেবদত্ত প্রেমময়ী কল্যাণময়ী নারীর মূর্তি অঙ্কিত না করিয়া নারীর ভয়ংকরী রূপই চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছেন।

[কবি ভর্তৃহরি—পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কবি ভর্তৃহরি ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অমরু ও ভর্তৃহরি উভয়েই প্রেমকে উপজীব্য করিয়া তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। অমরুর নিকট

প্রেম জীবনের বৃহত্তর সত্তা হইতে অসংশ্লিষ্ট, প্রেমেই প্রেমের পরিচয়। প্রেম নিজেতেই নিজে বিকশিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রেমের মধুরতা অপেক্ষা জীবনের রুক্ষতা তাঁহার কাছে কম সত্য নহে। অমরুর রচনা কাব্য হিসাবে উচ্চস্তরের, ভর্তৃহরির রচনায় ভাবের গভীরতা ও অকৃত্রিমতা বেশী।] মিথ্যা অবিশ্বাস ··মিথ্যা অবিশ্বাসে—দেবদত্তের এই বর্ণনা শুনিয়া রাজা বিক্রমদেব তাহাকে অলীক মিথ্যা কল্পনা ও আত্মপ্রবঞ্চনা বলিলেন। তাঁহার মতে ক্ষুদ্র মানুষ তাহার ক্ষুদ্র প্রেমে বিশ্বাসী। এই অবিচলিত বিশ্বাসের ফলে মানুষের মনের সজীবতা, সচেতনতা ও সক্রিয়তা নষ্ট হইয়া যায়। মানব-অন্তর মৃত মানুষের মতো জড়ত্ব লাভ করে। এই 'মৃত জড়বৎ' অন্তরকে সক্রিয় সজীব করিয়া তুলিবার জন্যই মানুষ অবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করে, আত্মপ্রবঞ্চনার মাধ্যমে সে তাহার সচেতনা ফিরিয়া পাইতে উৎসাহী হয়। এইজন্য যুগ যুগ ধরিয়া কাব্যকারেরা তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে এই বক্তব্য প্রচার করিয়াছেন। রানীর রাজত্বে···বিচার আসন পানে—মন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেবদত্ত হাস্যরসিকতার সাহায্যে একটি সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া তুলিলেন। রাজা বিক্রমদেব প্রকৃতপক্ষে রানী সুমিত্রার বক্ষলগ্ন হইয়া থাকিতে আগ্রহী। কামনার্ত রাজা সমস্ত রাজকীয় কার্য অবহেলা করিয়া, সমস্ত কর্তব্য বিসর্জন দিয়া আত্মবিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন তাই তাঁহার রাজ্যে দেখা দিয়াছে বিশৃঙ্খলা। প্রজারা আজ অসহায়। রাজা যদি এইভাবে আপন কর্তব্য বিস্মৃত হন, ক্রমে ক্রমে সমস্ত কার্য সঞ্চিত হইয়া স্ফীত হইতে থাকিবে এবং প্রজারা যদি রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদের দেবতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। মনে হয় মানুষ তাহার কর্তব্য না করিলে দেবতাই তাহাকে কর্তব্য-সচেতন করিয়া তুলিবেন —ইহাই এই উক্তির মূললক্ষ্য। হা বিধাতঃ···কাঁদে হাহাকার রবে। —রাজা রাজকর্তব্য অবহেলা করিয়া চলিয়াছেন, ফলে অন্যান্য কর্মচারীও তাহাদের কর্তব্য করিতে অনুৎসাহী। রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া কোন আবেদনই অন্তঃপুরে পৌঁছাইতেছে না। তাই সমগ্র রাজ্যে আজ শ্মশানের অন্তহীন শূন্যতাই আসন পাতিয়াছে। রাজলক্ষ্মী আজ অনাথা। অনাথিনীর মতোই সে বদ্ধ পাষাণপুরীর কক্ষদ্বারে

বলিয়া যেন অশ্রু-আকুল কণ্ঠে রাজাকে প্রার্থনা করিতেছে। চারিদিকে পরিব্যাপ্ত আজ অকল্যাণের অভিশাপ ; অরণ্যে ক্রন্দন……তুষার কঠিন —ধরিত্রীর দীর্ঘশ্বাস পড়িতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ দেবদত্ত হাসিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে রাজা এবং রাজ্য মিলিয়া যেন লুকোচুরি খেলা খেলিতেছে। রাজা লুকাইতেছে আর সমগ্র রাজ্য রাজাকে গোপন স্থান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবদত্তের এ হাসি বিদ্রূপের নহে, বেদনার। মানুষ হৃদয়ে খুব বেশী আঘাত পাইলে অনেক সময় হাসিয়া উঠে, তাহা বুকফাটা কান্না অপেক্ষাও মর্মান্তিক। বেদনার তীব্রতম ঝঙ্কারই সেই হাসির মধ্যে লুকায়িত থাকে। জল তরল পদার্থ, কিন্তু সেই জলই জমিয়া কঠিন তুষাররূপে দেখা দেয়, তেমনি মানুষের বেদনা অশ্রুরূপেই আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু সেই অশ্রুই সময়ে শুকাইয়া শুষ্ক হাসিতে ফাটিয়া পড়ে। মানুষের বেদনার্ত অন্তর খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেবদত্তের অন্তর-বেদনা অতি তীব্র বলিয়াই কান্নার পরিবর্তে শুষ্ক হাসিতে তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছে। রানীর কুটুম্ব যত……সতীদেহ সম—রাজা অন্তঃপুরবাসী। রাজ্যের কোন সংবাদই তিনি রাখেন না। ফলে সমস্ত বিদেশী আত্মীয়েরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে আপন প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। পিতৃগৃহে অপমানিত সতীর মৃত্যু ঘটিলে মহাদেব রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া যখন যাত্রা করেন তখন দেবলোক ভীতত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সকল দেবতা পালক বিষ্ণুকে এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে, বিষ্ণু আপন চক্রের সাহায্যে সতীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সতীদেহের একান্নটি খণ্ড বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। বর্তমানে এই একান্নটি স্থানই হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র। মন্ত্রী বলিতে চাহেন, সতীর দেহের মতোই আজ জালন্ধর রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বহে ঝড়……অকূল পাথারে—আজ চারিদিকে আসন্ন প্রলয়ের ইঙ্গিত। জালন্ধর রূপ রাজ্যতরীর কর্ণধার আজ নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত, তাই তরণীকে পারে লইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ক্ষীণ, ফলে তরণীর অন্তর্গত আরোহীরা অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছে। অর্থাৎ প্রজাদের সুখ ও দুঃখ উপেক্ষা করিয়া রাজা আত্মমগ্ন হইয়া উঠায় সমস্ত রাজ্যে এক নিদারুণ সংকটের আবর্ত

হইয়াছে। রাজা আজ রানী সুমিত্রার প্রেমেই নিমগ্ন থাকিবার আকুল বাসনায় মত্ত। অন্য কোনদিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। ফলে আজ মন্ত্রীকেই সমস্ত রাজকর্তব্য মস্তকে বহন করিতে হইতেছে। **আমি বলি মন্ত্রীবর… রানীর চরণে**—রাজ্যে যখন এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে তখন একমাত্র রানী সুমিত্রার নিকট আবেদন করিলে এই বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিতে পারে, ইহাই ব্রাহ্মণ দেবদত্তের দৃঢ় বিশ্বাস। বহুদিন রাজপরিবারের সহিত থাকিবার ফলেই তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। **আমি পারিব না তাহা …শুনি নাই কভু**—কিন্তু দেবদত্তের এ-কথায় মন্ত্রী আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজাই একচ্ছত্র অধিপতি, সেখানে অন্তঃপুরচারী নারীর কোন স্থান নাই, ইহাই মন্ত্রীর বিশ্বাস। সুতরাং রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য রানীর শরণাপন্ন হওয়া নিরর্থক বলিয়াই মন্ত্রীর ধারণা। **শুধু শাস্ত্রজ্ঞান....পরের বিচার**—দেবদত্ত মন্ত্রীর শাস্ত্রজ্ঞানের সুখ্যাতি করিলেও মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁহার অজ্ঞতার সুখ্যাতি করিতে পারিতেছেন না। দেবদত্ত এই পরিবারের দুইজনকে—রাজা বিক্রমদেব ও রানী সুমিত্রাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। তাই তিনি মন্ত্রীকে বলিতেছেন, নারী প্রয়োজন হইলে আপন আত্মীয়দের আপন হস্তে শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু অন্যের বিচার অনেক সময়েই তাঁহার নিকট অসহ্য। ইহাই নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আজ মন্ত্রী যদি রানী সুমিত্রার আত্মীয়দের, দরিদ্র প্রজাদের উপর অত্যাচারের কথা তাঁহার কর্ণগোচর করেন তবে সম্ভবত রানী নিজেই বিচারের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিবেন।

॥ বিশেষ বক্তব্য ॥

সাধারণত প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই নাটকের বিরোধের রূপটি আভাসিত হইয়া উঠে। এই নাটকের ক্ষেত্রেও একথা আংশিকভাবে সত্য। এই নাটকের বিরোধের একদিকে রাজা বিক্রমদেব, অন্যদিকে রানী সুমিত্রা। নাটকের নামকরণ হইতেই তাহা অনুভবযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। আর বিরোধটির আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে রাজা বিক্রমদেব ও বাল্যসখা দেবদত্তের সংলাপের মধ্যে। তাঁহাদের সংলাপ হইতে এইটুকু বোঝা গেল যে, রাজা বিক্রমদেব রানী সুমিত্রার হৃদয়-রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু

তাহার প্রেমে অবিশ্বাস করিতেও চাহেন নাই, রানীকে বশ করিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেমই অবিশ্বাস জন্মায়—সুতরাং রাজা সেই প্রেম চাহেন না। মনে হয় যেন মহৎ হৃদয়ের বিরাট ব্যাপ্তির দ্বারা তিনি রানীকে চিরবিশ্বাসে স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক। রাজা যে মনোভাবের পরিচয় দিলেন তাহাতে তো কোন দ্বন্দ্বসৃষ্টির কারণ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এই দ্বন্দ্বের আভাসটি তৃতীয় দৃশ্যে স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে।

[আমরা প্রথম দৃশ্যটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া আলোচনার ধারাটি পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছি, কিন্তু ধারানুসারে সমগ্র নাটকটির ব্যাখ্যা করিতে বসিলে গ্রন্থের কলেবর স্ফীত হইয়া উঠিবে। তাই আমরা পরবর্তী পর্যায়ের অংশগুলিই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

রাজকার্যে রাজার অনুপস্থিতিতে বিদেশীরা অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিবার ফলে দেশময় 'সহস্ররাজকতা' দেখা দিয়াছে। নিপীড়িত দরিদ্র প্রজাবর্গ তাই আজ 'শান্তর ছেড়ে অন্তর' ধরিতে উন্মত্ত। প্রজাদের এই বিদ্রোহী মনোভাব শান্ত করিলেন রাজসখা দেবদত্ত। এইভাবেই এই দৃশ্যে রাজা বিক্রমদেবের ব্যক্তিগত কামনাই যে সমস্ত রাজ্যে এক অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

স্থান—রাজপথ। কিনু নাপিত, মনসুখ চাষা, কুঞ্জরলাল কামার, নন্দলাল, শ্রীহরি কলু, হরিদাস কুমোর প্রভৃতি দরিদ্র প্রজারা ক্ষুধার জ্বালায় আজ লুঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে রাজার বিদেশী আত্মীয়দের অত্যাচার তাহাদের বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা ঘর ছাড়িয়া পথে নামিয়াছে। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন এই দরিদ্র প্রজার দল দেবদত্তের মুখে শাস্ত্রবচন শুনিয়াই মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বিস্তৃত ফণা সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছে এবং দেবদত্তের পরামর্শানুসারে রাজার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতে মনস্থ করিয়াছে।

॥ তৃতীয় দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

প্রমোদকাননে আসিয়া যখন রাজা বিক্রমদেব রানী সুমিত্রাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে আকুল আহ্বান জানাইয়াছেন, তখন রানী তাঁহাকে রাজার

কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে রাজা আঘাত পাইয়া অশান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই সময়ে মন্ত্রীর প্রবেশ তাঁহাকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। এবং শেষপর্যন্ত রাণী সুমিত্রা প্রজাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। এই দৃশ্যেই রাজা ও রানীর বিরোধটি, যাহা প্রথম দৃশ্যে সামান্য মাত্র আভাসরূপে দেখা দিয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

স্থান—অন্তঃপুর। প্রমোদকানন। মৌন মুগ্ধ সন্ধ্যায় প্রমোদকাননে প্রতীক্ষারত রাজা বিক্রমদেব। উপস্থিত হইলেন রানী সুমিত্রা। রাজা আকুল আগ্রহে 'অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগরে' তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। রানী বলিলেন, অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই তিনি রাজারই। কিন্তু রাজা একমাত্র অন্তর ব্যতীত অন্য কোথাও রানীকে রাখিতে প্রস্তুত নহেন। তাই রানী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, অন্তরে প্রেয়সী তব বাহিরে মহিষী—রাজা বিক্রমদেব একদিকে রানী সুমিত্রার স্বামী, অন্যদিকে জালন্ধরাধিপতি। কিন্তু রাজা আজ তাঁহার প্রজাপালক রূপটি বিসর্জন দিয়া, মহিষী-প্রেমিক রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রানী সুমিত্রা একদিকে যেমন রাজা বিক্রমদেবের প্রেয়সী তেমনি অন্যদিকে তিনি রাজমহিষী ও প্রজাদিগের জননীও বটে। তিনি স্বামীর মতো একটি পরিচয় বিসর্জন দিয়া আর একটিকেই একান্ত করিয়া তোলেন নাই ; তাই তিনি আত্মবিস্মৃত স্বামীকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আজ যদি স্বামীর মতো তিনিও আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন তবে সমগ্র রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য হইয়া উঠিবে। রাজা, রানী! কে রাজা?…ধূলির মাঝারে—রাজা বিক্রম আজ তাঁহার বিবাহের স্মৃতিচারণা করিতেছেন। তাঁহার মনে পড়িতেছে সেই সুখের দিনের কথা—সেই প্রথম মিলন-রজনী—যে নিশিতে দুইটি কম্পিত হৃদয় আলিঙ্গনাবদ্ধাবস্থায় বিচ্ছেদভাবনায় আকুল হইয়া উঠিত। তখন ছিল না গৃহকাজ, ছিল না সংসার ভাবনা। কিন্তু রানী সুমিত্রা সেই বালকবালিকার জীবনের মিলনের স্মৃতিকে ভুলিয়া যাইতে আগ্রহী, কারণ আজ তাঁহাদের দুইজনের পরিচয় রাজা ও রানী হিসাবে। কিন্তু রাজা বিক্রমদেব রানীর এ বক্তব্য সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ আজ তিনি তাঁহার সেই পরিচয় নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চাহেন এবং তাঁহার একমাত্র কাম্য আজ প্রেয়সীর প্রেম। রাজসিংহাসন, রাজকার্য তাঁহার নিকট মিথ্যা ও

তুচ্ছ। শুনিয়া লজ্জায় মরি···রাজশ্রীর চেয়ে—বাসনা প্রমত্ত রাজার প্রমত্ততা রানী সুমিত্রাকে আঘাত করিয়াছে। রাজা সবার ঊর্ধ্বে আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপন কর্তব্য সাধন করিবেন। কোন তুচ্ছতা, দুর্বলতা ক্ষুদ্রতা তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না, কলঙ্কিত করিবে না। তাঁহার মহিমা দীপ্ত সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। কিন্তু কখনও কখনও মধ্যাহ্নকালের সেই উজ্জ্বল সূর্যও যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ছায়া আচ্ছাদিত হইয়া যায়, আজ কামনাকলুষ প্রেমার্তি তেমনি রাজ অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রেম তো প্রেমিক অন্তরকে মেঘের মতো আচ্ছন্ন করিয়া তোলে না বরং তাহাকে মধ্যাহ্নের রৌদ্রদীপ্ত আকাশের মতো প্রোজ্জ্বল করিয়া তোলে। কিন্তু আজ রাজা বিক্রমদেবের কামনার্ত অন্তরের এই সঙ্কীর্ণতা রানাকে লজ্জায় অভিভূত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন যে, রাজা তাঁহার রাজ্যের অধিপতি। তাঁহার প্রথম কর্তব্য রাজ্যপালন, রাজ্যের শ্রীসাধন করা; তাঁহার দ্বিতীয় পরিচয় তিনি স্বামী। স্ত্রী হিসাবে রানী তাই তাঁহার অনুগত ছায়া মাত্র। যদি কখনও রাজ্যাপেক্ষা রাজপ্রেয়সী বড় হইয়া উঠে তবে তাহা কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করিবে। ইহাতে কাহারও গৌরব নাই।

তোমরা পুরুষ···লতার আশ্রয়—ব্যাখ্যা দেখ।

অধরে অধর···রাখুক রুধিয়া—রানী সুমিত্রার কোন কথাই রাজা বিক্রমদেব শুনিতে আগ্রহী নহেন, কারণ তাঁহার অন্তর এক দুরন্ত কামনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। নারীদেহের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া, তৃষিত অধরের তৃষ্ণা নারী-অধরের সুধাপানে তৃপ্ত না করিতে পারিলে তাঁহার এই কামোন্মত্ততার অবসান ঘটিবে না। তাই তিনি প্রিয়ার অধরে আপন তৃষিত অধর স্থাপন করিয়া সব কথাকে নিস্তব্ধ করিয়া দিতে চাহেন। প্রহরী যেমন সজাগ প্রহরায় দ্বার রক্ষা করে তেমনি তাঁহার অধরও প্রহরীর মতো চপল কথার গতি রুদ্ধ করিয়া দিবে। এই তাঁহার কামনা।

ওরে বৎস···জননী তোদের—মন্ত্রী আসিবার সংবাদ পাইয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখনও তিনি বাসনা-প্রমত্ত। অন্য কোনদিকে মন দিবার অবসর তাঁহার নাই। তাই তখনও তিনি প্রেয়সীকে বুঝাইতে চাহেন রাজ্য স্বাভাবিক ভাবেই চলিতেছে, শুধুমাত্র অতিমাত্রায় সাবধানী অমাত্য

মিথ্যা উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে দূরে নিপীড়িত
ক্ষুব্ধ প্রজাদের আকুল ক্রন্দনধ্বনি আকাশ-বাতাস আলোড়িত করিয়া
তোলে। রাজা প্রজাদের দুঃখে সাড়া দিতেছেন না কিন্তু রানীর অন্তর
কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সন্তানের কান্না শুনিয়া মাতৃহৃদয় যেমন চঞ্চল হইয়া
ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য যেমন তিনি ছুটিয়া
গিয়া সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া লয়েন তেমনি সুমিত্রার মাতৃহৃদয় প্রজাদের আকুল
কান্নায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সাশ্রুনেত্রে তাহাদের উদ্দেশ্যে দ্রুত
বাহির হইয়া গিয়াছেন।

॥ বিশেষ বক্তব্য ॥

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই দৃশ্যেই
নাটকীয় বিরোধ সম্পূর্ণ সুস্পষ্টতা লাভ করিয়াছে। দেবদত্তকে রাজা বলিয়া-
ছিলেন, "রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে?" কিন্তু দেখা গেল রাজা বিক্রমদেব
প্রকৃতপক্ষে সেই রহস্যই উদ্‌ঘাটন করিতে আগ্রহী। "আজো রমণীর মন
পারিনু বুঝিতে"—তাই রানী সুমিত্রাকে না বুঝিয়াই তিনি তাঁহাকে নির্মম,
নিষ্ঠুর বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাজার অন্তরে ছিল প্রেমোদ্ভূত সুখ
অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা। কর্মের বৃহত্তর ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া এই
সুখান্বেষণের চেষ্টা আত্মরতি ছাড়া কিছুই নহে। রাজা কর্মের জগৎ হইতে সরিয়া
থাকাতেই রানীর মন ব্যথাদীর্ণ হইয়াছে। তিনি তো শুধুমাত্র প্রেয়সীই
নহেন, তিনি তো মহিষী—প্রজাদের জননীও। রানী চাহেন, রাজা কর্মের
জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হউন, কারণ তাঁহার প্রতি প্রচণ্ড আসক্তিই তাঁহাকে
কর্মের জগৎ হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। তিনি কেবল প্রেমের বিলাসই
করিয়াছেন, মহৎ প্রেমের মর্ম উপলব্ধি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই;
তাই কর্ম-জগতে প্রত্যাবর্তন করিতে তিনি আগ্রহী নহেন। কিন্তু রানী
সুমিত্রার প্রেম কখনও তাঁহার স্বামীকে আসক্তির ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিয়া
রাখে নাই। এইখানেই নাটকের দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ এই নাটকের দ্বন্দ্ব কাম ও
প্রেমের। কামাসক্ত আত্মবোধ হইল অহং। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই কাম।
এই আত্মবোধ ধীরে ধীরে উচ্চভাব প্রাপ্ত হইলে প্রেমে পরিণতি লাভ করে।
কিন্তু যদি এই অহংবোধ উচ্চভাব প্রাপ্ত না হয় তবে সে সঙ্কীর্ণ অহংবোধ

সমস্ত শুভকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। রাজা বিক্রমদেবের কামনা এইভাবেই সমস্ত শুভকে ধ্বংস করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যকারের মন্তব্যে এই বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে, "এই নাটকের যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা দিয়াছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।" 'দুর্দান্ত ও আত্মঘাতী' প্রেমের অপর নাম—কাম।

বলা চলে, প্রথম অঙ্কের প্রথম তিনটি দৃশ্যেই নাটকের বিরোধটি সুস্পষ্ট হইয়াছে। রাজার মোহমত্ত প্রেম প্রজাদের মনে যে বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। শুধুমাত্র তাহাই নহে, রাজা যে দুইজনকে একান্তভাবে পাইতে চাহিয়াছেন, সেই দুইজন—রানী সুমিত্রা এবং বাল্যবন্ধু দেবদত্ত ক্রমেই তাঁহার মন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন—তাহাও স্পষ্ট।

।। চতুর্থ দৃশ্য : মূল বক্তব্য ।।

অন্তঃপুরে রানী সুমিত্রা স্বামী-সখা দেবদত্তের নিকট রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে জানিতে বসিয়া প্রজা-উৎপীড়কদের সন্ধান পাইয়া লজ্জায় ঘৃণায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কারণ এই উৎপীড়কগণ তাঁহারই পিতৃরাজ্য কাশ্মীরের অধিবাসী, সুতরাং এ কলঙ্ক তাঁহারই। তিনি এ কলঙ্কমোচনে তাই বদ্ধপরিকর হইলেন। সমগ্র নাট্য-পরিকল্পনায় ইহাদের ভূমিকা নগণ্য নহে।

স্থান—অন্তঃপুরের কক্ষ। প্রজাবর্গের ক্রন্দনধ্বনি দেবদত্তের জন্য প্রতীক্ষারতা সুমিত্রাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এই মুহূর্তে দেবদত্ত আসিয়া কাশ্মীরবাসী জয়সেন, যুধাজিৎ, শিলাদিত্য প্রভৃতি উৎপীড়কদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। শুনিয়া রানী লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ ইহারা যে তাঁহারই আত্মীয়। এ কলঙ্ক তো তাঁহারই।

অভাগ্যের দুরদৃষ্ট……এমনি আশ্চর্য—রাজপ্রাসাদের বাহিরের কোলাহল রানী সুমিত্রার নারীহৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে, তাই তিনি কারণ জানিবার জন্য রাজসখা দেবদত্তকে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'ঠাকুর, কিসের কোলাহল?' সরল ব্রাহ্মণসন্তান দেবদত্ত অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে রানীকে জানাইয়াছেন, 'অভদ্র অসভ্য যত বর্বরের দল' ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করিয়া মরিতেছে। ইহার মধ্যে তিনি একটি আশ্চর্য সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। দরিদ্র, নিপীড়িত প্রজাদের ক্ষুধার জ্বালা তো একদিনের সৃষ্টি

হে।" জীর্ণশীর্ণ ক্ষুধিতের দল তো যুগ যুগ ধরিয়া ক্ষুধার এই অগ্ন যন্ত্রণা, দারিদ্র্যের এই অসহনীয় কশাঘাতে জর্জরিত হইতেছে তবু তো আজও ইহা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইল না। দীন প্রজার দল তাই আজও হাহাকার করিয়া মরিতেছে।

আপাতদৃষ্টিতে দেবদত্তের উক্তিতে, দরিদ্র, লাঞ্ছিত প্রজাদের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বেদনা তীব্রতম হইয়া উঠিলে অশ্রুর তারল্যে নহে, শুষ্ক ব্যঙ্গাত্মক হাস্যের কাঠিন্যেই তাহা প্রকাশিত হয়: দেবদত্ত-অন্তর এমনই এক তীব্রতম যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছে বলিয়াই তাঁহার অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়াছে বিদ্রূপের বক্রপথে।

পঞ্চম দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

এই দৃশ্যে আমরা দুইটি অপ্রধান চরিত্রের সহিত পরিচিত হই,—দেবদত্তের পত্নী নারায়ণী এবং শাস্ত্রাচারী অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ত্রিবেদী। এই দৃশ্যটির মূল্য কিঞ্চিৎকর।

ষষ্ঠ দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

রাজকার্যে বিমুখ রাজাকে বৃদ্ধ অমাত্য রাজ্যের অরাজক অবস্থার কথা জানাইলে বিক্রমদেব তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। রানী সুমিত্রা আসিয়া আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে বলিলে রাজা রানীকে ধরা দিতে চাহিয়াছেন কিন্তু রানী রাজার বিমুখতা লক্ষ্য করিয়া মহিষীরূপেই প্রজারক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহাতে এই দৃশ্যে একদিকে রাজার মোহাচ্ছন্নতা, অন্যদিকে রানীর মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে।

স্থান—অন্তঃপুরের পুষ্পোদ্যান। বিশ্রামরত রাজা রাজকার্য-পরিচালনায় আগ্রহী নহেন। তাই বৃদ্ধ অমাত্য রাজ্যের অবস্থা জানাইতে আসিলে—তিনি তাহা 'বিশ্রামের ব্যাঘাত' বলিয়াই মনে করিয়াছেন।' তাই সমগ্র রাজ্য বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই বিশ্বাসের বলেই সবকিছু স্বাভাবিক ভাবেই পরিচালিত হইতে থাকিবে—এই বিশ্বাসে বলিষ্ঠ হইয়াই তিনি অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন। এই মুহূর্তে তাঁহার স্বগতোক্তি লক্ষণীয়। স্বল্প কষ্ট মানব-জীবন......নিষ্ফল আবেগে—পুষ্পোদ্যানে বিশ্রামরত রাজা প্রস্ফুটিত মাধবিকার সহিত নিজেকে তুলনা করিতেছেন। বসন্তের আনন্দমঞ্জরী এই মাধবিকা প্রভাতের আলোর স্পর্শে নীল আকাশের দিকে

পাপড়ি মেলিয়া ধরে, সুগন্ধে মধুপ আকুল হইয়া উঠে, বায়ুহিল্লোলে মাধবিকা সঞ্চালিত হইতে থাকে। তারপর নিশার আগমনে সবার অলক্ষ্যে শ্যাম দূর্বাদলের উপর ঝরিয়া পড়িয়া বিনিঃশেষ হইয়া যায়। কোন তর্ক নাই, সংশয় নাই, নিষ্ফল প্রণয়ের আবেগ নাই। কিন্তু মানুষ আপন জীবনকে নানাভাবে নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাই প্রতি পদেই সে বাধা অনুভব করে। স্বনির্মিত কর্তব্যের রুদ্ধ কারাগারে সে আত্মবন্দী। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে তীব্র যন্ত্রণায় পাখা ঝাপটাইতে থাকে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মাথা খুঁড়িয়া মরে, তেমনি মানুষের প্রাণ-পাখী এমনি করিয়াই আপন সৃষ্ট অধীনতায় অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, তবুও তাহার মুক্তি নাই। এক অন্তহীন আকুলতায় যন্ত্রণাদীর্ণ মানুষ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। কিন্তু মুক্তির সন্ধান খুঁজিয়া পায় না।

কেমনে বুঝাব নাথ……তোমারি প্রেমে।—ব্যাখ্যা দেখ।

॥ সপ্তম দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

ষষ্ঠ দৃশ্যের মূল বক্তব্য সপ্তম দৃশ্যের পক্ষেও প্রযোজ্য। রাজা বিক্রমদেব মন্ত্রীকে ডাকিয়া সেনাপতির সাহায্যে সমস্ত আত্মীয়দের দূর করিয়া দিবার আদেশ দিলে মন্ত্রী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, সেনাপতি নিজেই বিদেশী। তখন হতাশ রাজা ভিক্ষা দিয়া প্রজাদের শান্ত করিতে চাহিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত রাজা অসহায় দুর্বলের ন্যায় আচরণ করিলেন; কিন্তু প্রজাদের জননী রানী সুমিত্রা দেবদত্তকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য এই অন্যায়ের প্রতিকার করা। সুতরাং এই দৃশ্যেও রাজার অগৌরব ও রানীর অপূর্ব গৌরবই ঘোষিত হইয়াছে।

স্থান—মন্ত্রগৃহ। উৎপীড়িত প্রজাদের ক্রন্দন রাজাকেও শেষপর্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি মন্ত্রীকে মন্ত্রগৃহে আহ্বান করিয়া বিদেশী দস্যুদের দূর করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু একদিনের মধ্যে ইহা সম্ভব নয়। কারণ রাজা যে সেনাপতির সাহায্যে এই আদেশ পালন করিতে বলিতেছেন সেই সেনাপতি নিজেই বিদেশী। একথা শুনিয়া রাজা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি নিপীড়িত প্রজাদের শান্ত করিবার জন্য খাদ্য ও অর্থের ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

নির্দেশ প্রবল পরাক্রান্ত বীর্যশালী রাজার নহে—ক্ষমতাহীন দুর্বলের। [illegible] যেখানে দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন রানী সেখানে বীরাঙ্গনার মত হয়েছেন। আদেশ করিয়াছেন কালভৈরবের পূজোৎসবে আমোদ- [illegible] করিবে। সেখানেই বিচার হইবে

অষ্টম দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

কালভৈরবের পূজোৎসবে বিদেশীদের আমন্ত্রণ জানাইবার ভার পড়িয়াছে ব্রাহ্মণ ত্রিবেদীর উপর। মন্ত্রী ত্রিবেদীর কুটিরে আসিয়া তাঁহাকে সেই সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং এই দৃশ্যটির কোন বিশেষ তাৎপর্য নাই।

॥ বিশেষ বক্তব্য ॥

দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আমরা এই দ্বন্দ্বেরই উপস্থাপনা লক্ষ্য করি। রাজা বিক্রমদেব প্রেম হইতে সুখ আহরণ করিতে চাহিয়া আপন প্রেমকে ক্ষুদ্র কামে পর্যবসিত করিয়াছেন, আর রানী সুমিত্রা মহত প্রেমের অধিকারিণী। তাই এই নাটকের দ্বন্দ্ব—রাজা বিক্রমদেবের সহিত রানী সুমিত্রার অর্থাৎ কামের সহিত প্রেমের সংঘাত। পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে এই দ্বন্দ্বেরই ক্রমবিকাশ ও পরিণতি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

ব্রাহ্মণ ত্রিবেদীর উপর ভার অর্পিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ সেই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য সিংহগড়ে জয়সেনের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং এই দৃশ্যটির সূক্ষ্ম তাৎপর্য কিছু নাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

দ্বিতীয় অঙ্কের এই দৃশ্যটির তাৎপর্য অনুধাবন করিতে হইলে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। প্রজাদের দুঃখ দূর করিয়া রানীর নিকুঞ্জে বিশ্রামের সুযোগ লাভ করিতে রাজার কোন অনিচ্ছা ছিল না। প্রধান কথা রানীর প্রেমে বিহ্বল হইয়া থাকা। বিদেশী দস্যুদের বন্দি

সহজে দূর করিয়া দেওয়া যাইত তবে তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু তাহার জন্য প্রবল কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তিনি প্রস্তুত নহেন। গৃহের আরামের জন্য [illegible] সহিতও [illegible] ঘুমিতে ইচ্ছুক। রানীর সহিত রাজার [illegible]ছেদ। এই সংঘর্ষের রূপটি এই দৃশ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

স্থান—অন্তঃপুর। রাজা বিক্রমদেবের উদ্দেশ্যে রানীর আত্মীয় সভাসদেরা চাটুকারী মন্তব্য বর্ষণ করিতেছে। কিন্তু রাজা সেই দিকে কর্ণপাত করিতে মোটেই আগ্রহী নহেন।

রবির উদয়মাত্র……যে পায় সে ধন্য হয়—কালভৈরবের পূজায় নিমন্ত্রিত হইয়াছে রানীর আত্মীয়েরা। তাই তাহাদের সবার হইয়া সভাসদ রাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাহারা রাজার উদ্দেশ্যে অজস্র স্তুতিবাক্য, অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ সভাসদ রাজার এই অকৃপণ বদান্যতাকে সূর্যালোকের সহিত তুলনা করিয়াছে। সূর্য সুদূর আকাশে উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উষর প্রান্তর, ধূসর মরু, শ্যামল বনরাজী, সুনীল সমুদ্র, এককথায় সমস্ত ধরিত্রী আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই আলোকের দাক্ষিণ্য শুধুমাত্র সুন্দর বস্তুকেই স্পর্শ করিতেছে না, তাহা অসুন্দর বস্তুতেও পড়িতেছে। বৃহৎ সূর্যের ইহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। একটি উৎস হইতে উৎসারিত অজস্র আলোকে দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। তেমনি রাজা হইতেছেন রাজ্যের সূর্য-প্রতিম। রাজ্যের সকলের ঊর্ধ্বে তাঁহার আসন পাতা। সেই উচ্চাসনে আরূঢ় রাজা আপন উদারতায় কৃপাবৃষ্টি করিয়া চলেন। কোন বিশেষের প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার এই দাক্ষিণ্য সকলেরই জন্য বর্ষিত হইতেছে। ইহাতে তাঁহার কিছুই আসে যায় না, কিন্তু যাহারা তাহা লাভ করে, তাহারা ধন্য।

রাজার অদৃষ্টে…চরণ ধরিয়া—ব্যাখ্যা দেখ।

॥ তৃতীয় দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

রাজার সাহায্যে বিদেশী দস্যুদিগকে বিতাড়িত করা সম্ভব হইবে না জানিয়াই সুমিত্রা কাশ্মীরী সৈন্যের সহায়তা লাভ করিতে ছদ্মবেশে রাজ্য ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ধারণা তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজার কাণ্ডজ্ঞান

জাগ্রত হইবে—বিষণ্ণা রাজ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইয়া উঠিবেন। কিন্তু এই দৃশ্যেই আমরা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাই। রানীর প্রার্থনার যেন অদৃষ্টের পরিহাস আভাসিত হইল।

স্থান—মন্দির। ছদ্মবেশী রানী সুমিত্রা যাত্রার পূর্বে মন্দিরে আসিয়া কুল-দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। যে কর্তব্য স্বামীর পালন করা প্রয়োজন ছিল, আজ সেই পতিসত্য পালনের জন্য তাঁহাকে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাজ্যত্যাগ করিতে হইতেছে। কিন্তু দেবীর উদ্দেশ্যে মুদিত নেত্রে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার মানসচক্ষের সম্মুখে যে মুখখানি ভাসিয়া উঠিতেছে তাহা তো জগৎ-জননীর নহে—তাহা সতী নারীর পরম আশ্রয় স্বামীর। তাই দুর্বলহৃদয়া নারী দেবীর কাছে শক্তি, সাহস ও সামর্থ্য কামনা করিতেছেন।

দক্ষযজ্ঞে···ও রাঙা চরণ—স্বামী ও সংসার ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশী রানী সুমিত্রা মন্দিরে আসিয়া জগৎ-জননীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু বিদায়মুহূর্তে স্বামীকে ভুলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহার অবস্থা অনেকটা সতীর মতো হইয়াছে। রাজা দক্ষ গৃহে যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন, সে যজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ, শুধু আমন্ত্রিত হন নাই গঞ্জিকাসেবী, ভস্ম-ভূষিত, 'আপনভোলা' মহেশ্বর—সতীর স্বামী। তাই একাকিনী সতী পিতৃগৃহ উদ্দেশে চলিতে চলিতে দ্বিধায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বার বার স্বামিগৃহে, আপন সংসারে ফিরিয়া আসিবার কথা স্মরণে আসিয়াছে কিন্তু শেষপর্যন্ত সে যাত্রাপথে প্রত্যাবর্তন করা আর সম্ভব হয় নাই। আজ স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার কালে রানী সুমিত্রার হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিতেছে। পদক্ষেপ বার বার দ্বিধাগ্রস্ত হইতেছে। মনে সংশয় জাগিতেছে। আর বুঝি ফিরিয়া আসিবার অবকাশ আসিবে না।

॥ চতুর্থ দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

রানী সুমিত্রার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। রাজা ক্ষাত্রধর্ম ও রাজধর্ম ফিরিয়া পাইয়াছেন। সুতরাং রাজা আজ আপন হারানো বীর্য ফিরিয়া রানী তখনও আছেন তাঁহার অন্তর জুড়িয়া। এই শেষ দৃশ্যে

একটি 'Turning point' অর্থাৎ সমস্ত কাহিনীর গতি এখানে মোড় ফিরিয়াছে। তাই দৃশ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

স্থান—প্রাসাদ। রানী সুমিত্রা রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া রাজা বিস্ময়ে হতবাক্। অর্থবল, লোকবল যাহার অসীম সেই রাজা এক ক্ষুদ্র নারীকে বাঁধিয়া রাখিতে অক্ষম। মন্ত্রী যখন এই ঘটনায় রাজার নিন্দার কথা উচ্চারণ করিলেন তখন রাজা তাঁহাকে বলিলেন, ইহাতে রাজ্যের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

পরিপূর্ণ······গগনে আলো—ব্যাখ্যা দেখ।

দেবদত্ত······আলিঙ্গনপাশে—রানী রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। সংবাদটির আকস্মিকতায় রাজা বিমূঢ়, মন্ত্রী উদ্বিগ্ন, রাজসখা দেবদত্ত ব্যথিত। কিন্তু এই ঘটনাই বিমূঢ় রাজাকে ক্ষাত্রধর্মে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিল। সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া রাজা যাহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন আজ সেই আশ্রয়ই হারাইয়া গিয়াছে। ফলে আশ্রয়চ্যুত রাজা আপন স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। যে হৃদয় পুরুষের পৌরুষ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম বিসর্জন দিয়া নারী প্রেমকেই একান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, সেই হৃদয় সেই একান্ত বস্তুটি হারাইয়া আজ জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা-প্রত্যাশী। তাই ম্লানমুখ দেবদত্তকে উত্তপ্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাজা তাঁহাকে আনন্দের বার্তা শুনাইয়াছেন। বলিয়াছেন, যে আপন সত্তাটি তিনি হারাইয়াছিলেন আজ তাহা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। তাই এই দিন আনন্দের দিন—বিষাদের নহে।

॥ প্রথম দৃশ্য ঃ মূল বক্তব্য ॥

রানী সুমিত্রা ছদ্মবেশে জালন্ধর ত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীও জালন্ধর ছাড়িয়া কাশ্মীরে পৌঁছিয়াছে। আমরা এই দৃশ্যে একটি অপ্রধান চরিত্রের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করি—চরিত্রটি বৃদ্ধ শঙ্করের। শঙ্কর, রানী সুমিত্রা ও সুমিত্রা-ভ্রাতা কুমারসেনের পালক-ভৃত্য। এই দৃশ্যেই প্রথম কুমারসেনের নাম উচ্চারিত হইয়াছে।

স্থান—কাশ্মীর। রাজপ্রাসাদের সম্মুখদ্বারে বসিয়া বৃদ্ধ শঙ্কর। তাহার সম্মুখে দুইজন সৈনিক উপস্থিত হইয়াছে। কবে যুবরাজ সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন এ প্রশ্নের উত্তর জানিতে তাহারা সাগ্রহে শঙ্করের নিকট আসিয়াছে, কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর না পাইয়া তাহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল ; এমন সময় ছদ্মবেশী সুমিত্রা আসিয়া বৃদ্ধ শঙ্করকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতে তাহার স্নেহাতুর হৃদয় ছদ্মবেশী সুমিত্রাকে চিনিয়া উঠিতে না পারিলেও এক অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করিয়া আনন্দে বিগলিত হইয়া উঠিয়াছে, শুষ্ক চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিয়াছে।

।। দ্বিতীয় দৃশ্য : মূল বক্তব্য ।।

কাহিনীর গতি শুধুমাত্র কাশ্মীরেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, কাশ্মীর-পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিচূড়েও প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ববর্তী দৃশ্যে আমরা সুমিত্রা-ভ্রাতা কুমারসেনের নামটি উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছি। এই দৃশ্যে আমরা তাহার সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ পাইলাম। শুধু তাহাই নহে, সেইসঙ্গে কুমারপ্রেয়সী ইলারও পরিচয় পাইলাম। বলা চলে, নাট্যকার এই দৃশ্যে মূল কাহিনীর সহিত এক উপকাহিনী সংযোজন করিয়াছেন। এই উপকাহিনী —কুমারসেন-ইলাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আর একটি দিক হইতেও এই দৃশ্যটি বিশিষ্ট। এই দৃশ্যেই নাট্যকার প্রথম সঙ্গীত সংযোজন করিয়াছেন।

স্থান—ত্রিচূড়। ক্রীড়াকাননে ইলা সখীগণকে লইয়া কুমারসেনের সহিত আলাপরত। কুমার প্রজাদের প্রয়োজনে চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু ইলা তাহার ক্ষুদ্র বাহুর বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। কিন্তু বাহু-বন্ধনের তো প্রয়োজন নাই। কুমার এমন এক অদৃশ্য অন্তরবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাহা আর কাটিবার নহে। আজ তাঁহার সমস্ত অস্তিত্বই ইলাময় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইলার স্বস্তি নাই। সে চাহে বিবাহের অচ্ছেদ্য বন্ধনে কুমারকে একান্ত করিয়া লইতে। স্থির হইয়াছে আগামী পূর্ণিমার রাত্রে এই বিবাহোৎসব উদ্‌যাপিত হইবে।

পৃথিবী করিব বশ......অলসের মতো—ত্রিচূড়রাজকন্যা ইলা কুমারসেনের প্রেয়সী। সে তাহার সর্বস্ব দিয়া কুমারকে ভালবাসে। কারণ,

ভালবাসা নারীর পূর্ণ অস্তিত্ব। নারীর ভালবাসায় তাই অন্যকিছুর স্থান নাই; কিন্তু ভালবাসা পুরুষের জীবনের একটি অংশ মাত্র। নারীর ভালবাসা ও প্রেমে পুরুষের পৌরুষ উজ্জীবিত হইয়া উঠে। উদ্দীপ্ত পুরুষ তখন যে অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয় সেই শক্তি তাহাকে বিশ্বজয়ের বলিষ্ঠতা দান করে। ইলার প্রেমের স্পর্শে কুমারসেনের হৃদয় আজ ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন, কর্ম-সম্পাদনের জন্য উন্মুখ। কর্মের সার্থকতায় যে গৌরব অর্জিত হইবে, সেই গৌরবের অধিষ্ঠাত্রীরূপে ইলা হইয়া উঠিবে গৌরবময়ী। কারণ সেইখানেই মহৎপ্রেমের সার্থকতা। যে প্রেম প্রেমিকাকে সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বৃহত্তর কর্মের জগৎ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে, সে প্রেম তো প্রেম নহে, তাহা কাম। বিরলে বসিয়া যে হৃদয় প্রেম-বিলাসী হইয়া আত্মসুখ উপভোগ করে, সে হৃদয় কখনও মহত্তর কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হয় না। কুমার এই পথের পথিক নহেন।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ঃ মূল বক্তব্য ॥

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই দৃশ্যটিতে মূল কাহিনীর নায়িকা সুমিত্রার সহিত উপকাহিনীর নায়ক কুমারসেন পরস্পর মিলিত হইয়াছেন। এই মিলন পরবর্তী নাট্যঘটনাকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এইখানেই এই দৃশ্যের তাৎপর্য।

স্থান—কাশ্মীর। যুবরাজের প্রাসাদে ছদ্মবেশী সুমিত্রা ভ্রাতা কুমারের সহিত মিলিত হইয়া আপন আগমন-উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন। ভগ্নীর উদ্দেশ্য সাধন করিতে ভ্রাতা কুমার অত্যন্ত আগ্রহী। তাই তিনি পিতৃব্যের নিকট সৈন্যসাহায্য লইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু জালন্ধরের রানী তো ভিক্ষা লইবার জন্য আসেন নাই। কুমার ভগ্নার মনোব্যথা বুঝিয়া উপায়ান্তরের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ঃ মূল বক্তব্য ॥

সুমিত্রা রাজ্য ছাড়িয়াছেন রাজ্যের কল্যাণ করিবার জন্য। তাঁহার এই উদ্দেশ্য-সম্পাদনে ভ্রাতা কুমার সঙ্গী। কুমার নিজের দিক হইতে প্রস্তুত হইলেও সে প্রস্তুতি ছিল অসম্পূর্ণ, কারণ সে প্রস্তুতি পিতৃব্যের আদেশের

অপেক্ষা রাখে। •রানী রেবতীর প্ররোচনায় রাজা চন্দ্রসেন কুমারকে যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দিলেন। এই দৃশ্যে উপকাহিনীর নায়ক কুমারসেনের জীবনের গতিপথ বাঁক ফিরিল এবং এই দৃশ্যেই আমরা কাশ্মীররাজ চন্দ্রসেন ও রানী রেবতীর পরিচয় লাভ করিলাম।

স্থান—কাশ্মীর প্রাসাদ। কুমারকে যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য অন্তঃপুরে বসিয়া রানী রেবতী রাজা চন্দ্রসেনকে প্ররোচিত করিতেছেন। কারণ তাহাতে রানীর অন্তরকামনা সিদ্ধ হয়। রাজা চন্দ্রসেন ভ্রাতুষ্পুত্র কুমারকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত স্ত্রীর প্ররোচনায় কুমারকে যুদ্ধযাত্রা করিবার আদেশ দিলেও অক্ষতদেহে বিজয়ীর সম্মান লইয়া ফিরিবার আশীর্বাদ জানাইলেন।

।। পঞ্চম দৃশ্য ঃ মূল বক্তব্য ।।

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে কুমার আসিয়া বিরহিণী প্রিয়া ইলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইতেছেন। ইলা বিদায় দিল তাহার প্রাণ-পুরুষকে, কিন্তু তাহার পরমুহূর্তেই তাহার মনে হইল তাহার জীবনের সুখ বুঝি চিরতরে বিদায় লইল। উপকাহিনীর নায়িকা ইলার ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিতটি এই দৃশ্যে ব্যঞ্জিত।

স্থান—ত্রিচূড়। ক্রীড়াকাননে ইলার সখীগণ আসন্ন বিবাহ-রজনীতে আপন ভূমিকা লইয়া আলোচনারত। এমন সময়ে ইলা কুমারকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল। কুমার ইলার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছেন। ইলা বিদায় দিল। ভালোই করেছ...চিরদিন তরে—ইলা কুমারকে বিদায় দিল আসন্ন মিলনের প্রতীক্ষায়। ইলা জীবনের সর্বস্ব কুমারকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয়টি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়াই আজ এত সহজে তাহার জীবনের পরম আশ্রয়, অন্তর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পুরুষটিকে আপন হাতে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিয়া পাঠাইতে পারিল। সে জানে বিবাহ না হইলেও যে বন্ধন দুইটি হৃদয়কে আবদ্ধ করিয়াছে তাহা কখনও ছিন্ন হইবার নহে। এই বন্ধন অকৃত্রিম; যে বন্ধন কৃত্রিম তাহার সকল সময়েই ছিঁড়িয়া যাইবার ভয় থাকে। ইলা ও কুমারের বন্ধন সাময়িক নহে—চিরন্তন।

বিশেষ বক্তব্য : প্রথম অঙ্কে যে সঙ্কটের সূচনা, দ্বিতীয় অঙ্কের সোপান বাহিয়া তৃতীয় অঙ্কে তাহার শীর্ষারোহণ, আবার চতুর্থ অঙ্কের সোপান বাহিয়া তাহার অবরোহণের পালা। সাধারণত পাশ্চাত্ত্য রীতির পঞ্চাঙ্ক নাটকের ইহাই স্বীকৃত রীতি। রবীন্দ্রনাথ এই রীতিটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই নাটকের সঙ্কট তৃতীয় অঙ্কে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে নাই। আমরা বরং তৃতীয় অঙ্কে সেই সঙ্কটের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিবার প্রস্তুতি দেখিয়াছি। এই নাট্যসঙ্কট শীর্ষারোহণ করিয়াছে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে।

চতুর্থ অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

সুমিত্রার সান্নিধ্য-বঞ্চিত রাজা বিক্রম আজ হিংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এক রক্তলোলুপ জিঘাংসা তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে ; তাঁহার অহং আজ স্ফীত। এই সময়ে সংবাদ আসিল রানী পলাতক দস্যুদের বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। তিনি রাজার দর্শনপ্রার্থিনী। কিন্তু সুমিত্রার নিকট উপস্থিত হইবার শক্তি তাঁহার ছিল না, তাই তিনি শিবিরে মহারানীর শিবিকা প্রবেশ নিষেধ করিলেন। অবধারিত ভাবেই নাটক চরম বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়া পড়িল। যে বিরোধের একমুহূর্তে নিষ্পত্তি হইতে পারিত তাহাই বিপর্যয় ঘটাইয়া দিল। তাই সমগ্র নাট্য-পরিকল্পনায় এই দৃশ্যটির তাৎপর্য অসাধারণ।

স্থান—জালন্ধর। রণক্ষেত্র-শিবিরে সেনাপতি রাজাকে শিলাদিত্য ও উদয় ভাস্করের বন্দী হওয়ার সংবাদ দিয়া জানাইলেন, বিদ্রোহী জয়সেন ও যুধাজিৎ পলাতক। রাজা আজ উদগ্র সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাই তিনি সেনাপতিকে পলাতক, বিদ্রোহী, বিদেশী দস্যুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আদেশ দিলেন !

'মৃত্যুগন্ধবহ...হিংসা স্বাধীনতা—ব্যাখ্যা দেখ।

দ্বিতীয় দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

প্রজার মঙ্গলের জন্য যে যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল—সেই যুদ্ধের উন্মত্ততা প্রজার মঙ্গলকে ছাপাইয়া উঠিল। এই উন্মত্ততার হাত হইতে রাজাকে রক্ষা

করিতে পারেন রানী সুমিত্রা এবং বন্ধু দেবদত্ত। রানী সুমিত্রা রাজার মঙ্গলের জন্যই ঘর ছাড়িয়াছেন। তাহারই প্রতিক্রিয়া—এমন উন্মত্ততা, এই হিংস্রতা। আর যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নাই বলিয়া ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত—তাই এই নিষ্ঠুরতা, যুদ্ধের উন্মাদনা। "রাজাকে সাহস করে দুটো ভাল কথা বলে, এমন বন্ধু কেউ নেই।" তাই মন্ত্রীর আমন্ত্রণে দেবদত্ত রাজদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আসন্ন বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বন্ধু দেবদত্ত যে প্রচেষ্টা করিবেন—এই দৃশ্যে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

স্থান—দেবদত্তের কুটীর; দেবদত্ত-পত্নী নারায়ণী স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে দিতে মনের দিক হইতে প্রস্তুত নহেন, তাই তিনি স্ত্রীসুলভ প্রশ্নে স্বামীর যাইবার প্রকৃত উদ্দেশ্যটি জানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। যখন দেবদত্ত বলিলেন, যুদ্ধোন্মাদ মহারাজা মহারানীকে শিবিরে প্রবেশ করিতে দেন নাই, তখন সতীলক্ষ্মীর অপমানে নারীহৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে এবং আসন্ন বিপদের সম্ভাবনার কথা অনুভব করিয়া সেইমুহূর্তে স্বামীকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

যাহারা পূর্বে বিদ্রোহী ছিল কিন্তু এখন হইয়াছে স্তুতিকারক, রাজা আজ তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাহারাই হিংসোন্মত্ত রাজার অহংবোধের পূর্ণ জাগরণ ঘটাইয়াছে। সুতরাং এই মুহূর্তে তাঁহার জীবনের ধ্বংসকারী প্রলয়ঙ্করী শক্তিকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করিবার জন্য প্রকৃত বন্ধুর প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন সাধন করিতে পারেন বাল্যবন্ধু, প্রকৃত সুহৃদ দেবদত্ত।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ঃ মূল বক্তব্য ॥

সৎবুদ্ধি-ভ্রষ্ট রাজা বিক্রম রানীর শিবিকা শিবিরে প্রবেশ করিতে না দিয়া কুমার ও সুমিত্রাকে অপমান করিয়াছেন। এ অপমান রানীকে যতখানি আঘাত করিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী আঘাত করিয়াছে কুমারকে; কিন্তু কুমার প্রকৃত বীর, তাই ক্ষমাকেই তিনি বীরের ধর্ম বলিয়া জানিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা বৃদ্ধ শঙ্করকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন রাজার নিকট। রাজা এবং সভাসদেরা অপমান করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং অনিবার্য ভাবে কুমারসেনের কাহিনী এই নাটকে স্থান পাইয়াছে। এ দৃশ্যে সেই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত। [নাট্যকার

কুমার ও ইলার কাহিনীকে যে শোচনীয়ভাবে অসঙ্গত করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নহে।]

স্থান—জালন্ধর। প্রত্যাখ্যাত কুমার ও সুমিত্রা জালন্ধরে নিজেদের শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বামী আজ ভ্রাতাকে অপমান করায় রানীর অন্তর আহত। এই অপমানের জন্য তিনি নিজেকেই সর্বাগ্রে দায়ী করিয়া স্বামীর হইয়া ভ্রাতার নকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত বীরের ধর্ম তো অন্যায় প্রতিশোধস্পৃহা নহে—প্রীতি-স্নিগ্ধ ক্ষমা। কুমারসেন প্রকৃত বীর, তাই তিনি প্রার্থনার পূর্বেই ক্ষমা করিয়াছেন। ভ্রাতার এই মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া সুমিত্রা অভিভূতা। তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়া ভ্রাতার এই স্নেহঋণ শোধ করিতে আগ্রহী। আজ তাই নূতন করিয়া শৈশবস্মৃতিচারণার অবকাশ ঘটিয়াছে। দুইজনে তাই অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনে অপূর্ব আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

এমন সময় পালক-ভৃত্য বৃদ্ধ শঙ্কর রাজার নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অপমানিত হওয়ার সংবাদ দিল এবং যুদ্ধ করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইতে বলিল। ন্যায়যুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিশোধ লওয়াই তো বীরের ধর্ম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুমিত্রার আকুল আবেদন ও কুমারের দৃঢ়সঙ্কল্প এক আসন্ন বজ্রগর্ভ মেঘসঞ্চারের আশঙ্কা নির্মূল করিল।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ঃ মূল বক্তব্য ॥

জীবনসঙ্গিনী সুমিত্রা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, এবার জীবন-সখা দেবদত্ত প্রত্যাখ্যাত হইলেন। বিদ্রোহীর দল তাঁহার অহংবোধকে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই এই বিপর্যয় আসন্ন হইয়া উঠিল। নাট্যাকাশে এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিল। এই দৃশ্যে সেই প্রলয়ের আভাস।

স্থান—বিক্রমদেবের শিবির। কুমারসেন ভগ্নী সুমিত্রা, পালক-ভৃত্য বৃদ্ধ শঙ্কর ও সৈন্য লইয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। রাজা পলাতক বলিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু জয়সেন-যুধাজিতের দল নানাভাবে রাজার অন্তরকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। রাজা যুদ্ধযাত্রাই স্থির করিলেন। সেইমুহূর্তে দেবদত্ত আসিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বিচারবুদ্ধিবিলুপ্ত রাজা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত না করিয়া সংশয়ী হইয়া উঠিলেন।

হায় বিপ্র.......রক্তপদ্মসম—একদিন রাজা বিক্রম রাজ্য, রাজকার্য, কর্তব্যকর্ম ভুলিয়া আত্মপ্রেমে মগ্ন ছিলেন, সেদিন সকলেই তাঁহাকে কর্মের জগতে ফিরাইয়া আনিতে আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিল, বিশেষ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন রানী সুমিত্রা ও বাল্যবন্ধু দেবদত্ত। রানী রাজার সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, ইহাতে রাজা সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সুপ্ত পৌরুষ উগ্র পাশবিকতায় আত্মপ্রকাশ করিল। কামমত্ত রাজা যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তখন শান্তির ললিত বাণী নহে—অশান্তির অগ্নি লইয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। নদী যখন দুই কূলের বাঁধন অস্বীকার করে—তখন সে আর কল্যাণদাত্রী থাকে না, ভয়ঙ্করী, সর্বগ্রাসী রাক্ষসী বন্যারূপ লাভ করে। তখন প্রবল জলস্রোত যাহা-কিছু সম্মুখে পায় সব-কিছু ভাসাইয়া লইয়া যায়। মুহূর্তে সব-কিছু বিনষ্ট ও বিলুপ্ত করিয়া দেয়। তখন তাহার মধ্যে থাকে এক প্রচণ্ড গতির উন্মত্ততা। এতদিন রাজা বিক্রম অন্তঃপুরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহার পৌরুষ ছিল সুপ্ত; কিন্তু আজ যখন আহত পৌরুষ জাগ্রত হইয়াছে তখন তাহা কোন বন্ধন স্বীকার করিবে না। প্রচণ্ড প্রমত্ততায় তাহা আপন অহংবোধকে চরিতার্থ করিয়া তবেই শান্ত হইবে। রাজার এই উন্মত্ততাকে প্রশমিত করিবার জন্য আসিয়াছিলেন দেবদত্ত—কিন্তু রাজার এই উন্মাদনা তাঁহার বিচারবুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে বলিয়াই তিনি বাল্যবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান নাই।

পঞ্চম অঙ্ক

।। প্রথম দৃশ্য : মূল বক্তব্য ।।

এই দৃশ্যে আমরা উপকাহিনীর নায়ক কুমারের জীবনে যে ট্র্যাজেডি* আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহারই ইঙ্গিত পাইলাম। এবং সেইসঙ্গে সুমিত্রার জীবনও বিজড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহার জীবনও যে বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারও পরিচয় পাইলাম।

স্থান—কাশ্মীর। কুমারসেন সংবাদ পাঠাইয়াছেন, বিক্রমদেব কাশ্মীর আক্রমণ করিবেন সুতরাং যুদ্ধসজ্জার প্রয়োজন, কারণ কাশ্মীরের বিপদ আসন্ন। কিন্তু রানী রেবতী আপন পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার এই

সুযোগটি গ্রহণ করিলেন। স্বামী চন্দ্রসেনকে যুদ্ধ না করিবার জন্য এবং কুমারকে সৈন্যভার না দিবার জন্য তিনি বারবার প্ররোচিত করিলেন। কুমারসেন সুমিত্রা ও শঙ্করকে লইয়া সৈন্যদলসহ কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি পিতৃব্যের নিকট বিক্রমদেবের আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে সৈন্যভার লইবার প্রার্থনা জানাইলে রানী রেবতী তাঁহাকে পলাতক বলিয়া অপমান করিলেন এবং রাজা চন্দ্রসেন তাঁহার বক্তব্য জানাইতে বিলম্ব করিয়া তাঁহার সমর্থন জানাইলেন। বেদনাহত কুমার সুমিত্রাকে লইয়া গেলেন।

আপন সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য রানী রেবতী রাজা চন্দ্রসেনকে শেষপর্যন্ত আপন ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইলেন। রাজা রানী রেবতীর প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু আহত অন্তরে এক অশুভ অকল্যাণের আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন।

অতি ইচ্ছা...পাষাণ প্রাচীরে—কাশ্মীরের সিংহাসনের অধিকার হইতে কুমারসেনকে বঞ্চিত করিয়া যাহাতে আপন গর্ভের সন্তানকে সেখানে বসানো যায় এই উদ্দেশ্য রানী রেবতী বহুদিন হইতেই সুযোগ সন্ধান করিতেছিলেন। আজ সেই সুযোগ আসায় স্বামী চন্দ্রসেনকে প্রভাবিত করিয়া কুমারকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া রাজ্যছাড়া করিলেন। পিতৃব্য চন্দ্রসেন কুমারের প্রতি স্নেহশীল হইয়াও স্ত্রীর হীন ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। ফলে কুমারকে রাজ্য ছাড়িয়া অরণ্যে আশ্রয় লইতে হইল। এই সময়ে চন্দ্রসেনের হৃদয়ে স্ত্রীর এই ষড়যন্ত্রের এক অশুভ পরিণতিই ছায়াপাত করিয়াছিল। মানবমন নানা ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এই ইচ্ছারও একটি নির্দিষ্ট সীমানা থাকা প্রয়োজন। মানুষকে সেই সীমানার মধ্যে থাকিয়াই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়, যেমন রথচালককে অশ্বের গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। অশ্বের গতি নিয়ন্ত্রিত না হইলে, যেমন মত্ত অশ্ব সমগ্র রথটিকে অনিবার্যভাবে ধ্বংস করিয়া বসে, তেমনই অতি উগ্র ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানুষও আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করিয়া বসে। রানী রেবতী তেমনি এক উৎকট ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন বলিয়াই বিনাশের এক অবশ্যম্ভাবী আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

পিতৃব্য চন্দ্রসেন জালন্ধররাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া যুবরাজ কুমারসেনকে রাজসিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতেছেন—একদিকে এই সংবাদ

এবং অন্যদিকে জালন্ধররাজ বিক্রমদেবের আসন্ন আক্রমণের সংবাদ কাশ্মীরবাসীদের চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা যুবরাজকে সর্বাত্মক সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত। এই দৃশ্যে নাটকের বিরোধটি বৃহত্তর পটভূমিতে উপস্থাপিত হইয়াছে।

॥ তৃতীয় দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

অমরুরাজের বিরোধিতার ফলে কুমার ইলার নিকট শেষ বিদায় লইতে না পারিয়া দুঃসহ বেদনা লইয়া ফিরিয়া গেলেন। ঘটনাচক্রের আবর্তনে কুমার ও ইলার যুগ্মজীবনে যে বিষাদ নামিয়া আসিল—এই দৃশ্যে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উপকাহিনীর নায়ক-নায়িকার জীবনের ধারা এক অনিবার্য পরিণতি লাভ করিতে চলিয়াছে।

স্থান—ত্রিচূড়। রাজপ্রাসাদে বসিয়া আছেন অমরুরাজ, সম্মুখে দাঁড়াইয়া কুমার। তিনি ইলার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু অমরুরাজ কুমারকে মুহূর্তের জন্য আপন রাজ্যে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন, কারণ কুমার আজ গৃহহীন, আশ্রয়হীন, পলাতক। তাঁহাকে আশ্রয় দিলে তাঁহারও বিপদ আসন্ন হইয়া উঠিবে। কুমার আশ্রয় চাহিতে আসেন নাই, ইলার সহিত শেষবারের মতো মিলিত হইতে আসিয়াছেন। অমরুরাজ জানাইলেন মিথ্যা সংবাদ দিয়া তিনি ইলার মন হইতে কুমারের স্মৃতি মুছিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, কুমার আজ সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছে এবং যুদ্ধযাত্রা বিবাহ প্রস্তাব ভাঙিবার ছল ছাড়া কিছুই নহে। অমরুরাজের এই উক্তি কুমারের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিল। এই প্রতারণা হইতে মৃত্যুও শ্রেয়।

এমন সময় শঙ্কর আসিয়া গুপ্তচরের সংবাদ দিল এবং অপেক্ষমান সুমিত্রার কথা বলিল। হতভাগ্য কুমার প্রেয়সী ইলার সহিত দেখা না করিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

প্রেম শুধু সম্পদের নহে—ইলার সহিত শেষবারের মতো দেখা করিতে আসিলে অমরুরাজ কুমারকে তাহার সহিত দেখা করিতে দিতে রাজী হইলেন না। কারণ কুমার আজ গৃহহীন, নিরাশ্রয়, পলাতক মাত্র। তাই তিনি বিপদের খরস্রোতে ভাসা কুমারকে তাঁহার যৌবনবতী সুন্দরী কন্যা ইলার সহিত মিলিত হইতে দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, ইলা কুমারকে তাহার সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। প্রকৃত প্রেমের ইহাই ধর্ম। মহৎ প্রেম শুধুমাত্র আনন্দের দিনের সঙ্গীই নহে, দুঃখের

দিনের আশ্রয় ; শুধু সম্পদের প্রাচুর্যের বিলাসী নহে, বিপদের দিনে পরম সহায়ও বটে। ইলা ও কুমার এই মহৎ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ দুইটি প্রাণ। তাই কুমারের বিপদ আজ শুধুমাত্র কুমারেরই নহে—তাহা ইলারও।

দুর্ভাগ্যের দিনে……আনন্দের দ্বার—অমরুরাজ কুমার ও ইলার শেষবারের মিলনে বাধা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার প্রতারণায়, চরম অবিশ্বাসীর পরিচয় বহন করিয়া ইলার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ না পাইয়া কুমারকে ফিরিয়া যাইতে হইল। এক দুঃসহ বেদনায় ভারাক্রান্ত মন লইয়াই শঙ্করের আহ্বানে কুমারকে ত্রিচূড় পরিত্যাগ করিতে হইল। বিপদ যখন আসে তখন একক হইয়া আসে না। অসংখ্য বিপদের জটিল জাল অক্টোপাশের মতো বিপন্নকে ঘিরিয়া ধরে। তখন তাহার সহায়সম্পদ বলিতে কেহই থাকে না। আনন্দের সঙ্গীতও স্তব্ধ হইয়া যায়। এক শ্বাস-রুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে তাহাকে অসহায় অস্তিত্ব বহন করিয়া চলিতে হয়। কুমারের জীবনে আজ বিপদ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আজ তিনি সকল বন্ধু, সকল সম্পদ হারাইয়া আশা আশ্বাসহীন নিরাশ্রয় পলাতকের জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

[তুলনীয় : দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল,
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।]

॥ চতুর্থ দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

পিতার বিরোধিতায় কুমার ফিরিয়া গিয়াছেন—এ সংবাদ ইলা পায় নাই। দৃশ্যটি ইলার জীবনের পরিণতির পরিচয়-বাহী।

স্থান—ত্রিচূড়। অন্তঃপুরে ইলা কুমার সম্পর্কে সখীদের মনে সঞ্চিত সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহে। সে বিশ্বাস করে কুমার এই পূর্ণিমারাত্রে আসিয়া তাহাকে চিরকালের জন্য হৃদয়ে গ্রহণ করিবে, তাই সে তাহাকে সজ্জিত করিয়া দিবার জন্য সখীদের অনুরোধ করিতেছে। তবে তাহার এই প্রতীক্ষা যদি একান্তই বিফল হয় তবে সে তাহার নিজের ভাগ্যকেই দায়ী করিয়া এই অন্তহীন বেদনার ভার একাই বহন করিবে।

॥ পঞ্চম দৃশ্য : মূল বক্তব্য ॥

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্যে যে যুদ্ধাগ্নির প্রজ্বলন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে সেই আশঙ্কা যেন অনেকখানি দূরীভূত

হইল। রানী রেবতীর মুখে 'আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্তিখানা' দেখিয়া রাজা আপন ভয়ঙ্কর রূপটিকে চিনিতে পারিলেন। এই দৃশ্যটি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

স্থান—কাশ্মীর। শিবিরে বসিয়া রাজা বিক্রম পলাতক কুমারকে বন্দী করিবার জন্য জয়সেন-যুধাজিৎ প্রমুখ ব্যক্তিদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করিতে আদেশ দিতেছেন। পলাতক কুমারকে বন্দী করিতে না পারিলে তাঁহার শান্তি নাই। সকলে যখন পরামর্শরত তখন উপস্থিত হইলেন রাজা চন্দ্রসেন ও রানী রেবতী। সভাসদগণ বিদায় লইল। রাজা বৈবাহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয় চন্দ্রসেন ও রেবতীকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। রাজা চন্দ্রসেন অল্পবুদ্ধি বলিয়া কুমারকে প্রাণদণ্ড ব্যতীত যে-কোন শাস্তি দিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু রানী রেবতী স্বামীর এই মত সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিনি প্রকৃত অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য বিক্রমদেবকে অনুরোধ করিলেন। নারী—রানী রেবতীর এই হিংস্র. বিকৃত কুৎসিত মানসিকতার পরিচয় রাজা বিক্রমদেবের অন্তরে তীব্র আঘাত হানিল। তিনি নূতন পথের পথিক হইলেন।

এ হিংসা আমার… দুর্নিবার—রানী সুমিত্রাকে হারাইয়া, প্রেমবঞ্চিত বিক্রমদেবের অতৃপ্ত অন্তর এক বিধ্বংসী হিংস্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুপ্ত পৌরুষ এক সর্বনাশা, সর্বগ্রাসী উন্মত্ততায় উদ্দাম হইয়া উঠিল। ব্যসনাসক্ত রাজা এক প্রচণ্ডতায় প্রবল আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই ভয়ঙ্কর রূপ কোন ছদ্মবেশের আড়ালে আশ্রয় লইয়া আত্মগোপন করে নাই। কোন গুপ্তলোভ কিংবা বক্ররোষের পথে তিনি তাঁহার দীপ্ত হিংসাতৃষা তৃপ্ত করিতে অগ্রসর হন নাই—তাঁহার চলার পথ গোপন সুড়ঙ্গপথ নহে, প্রকাশ্য রাজপথ। কিন্তু রাজার এই নিষ্ঠুর হৃদয়ও রানী রেবতীর কুটিল, কুৎসিত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কারণ রানী রেবতী নারী। তাঁহার হৃদয় কল্যাণের মাধুর্যে স্নিগ্ধ হইবে ইহাই স্বাভাবিক; কিন্তু সেই নারীর অন্তর আজ 'খুনীর ছুরির মতো বাঁকা বিষমাখা' হইয়া উঠিয়াছে। তাহা চোরের মতো গোপন পথে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিতেছে। তাঁহার লালায়িত লোভ ছদ্মবেশের অন্তরালে থাকিয়া চরিতার্থ হইতে চাহিতেছে—রাজা বিক্রম এই বিকৃত, কুৎসিত নারীমনের সঙ্গী হইতে পারেন না। কারণ তিনি গোপনে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন।

তাঁহার হিংস্রতা সর্বগ্রাসী, উদ্দাম, উন্মত্ত, দুর্নিবার সন্দেহ নাই ; কিন্তু রানী রেবতীর ভীষণ হিংস্রতার মতো ক্রুর, ছদ্মবেশী ও কুৎসিত নহে।

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ঃ মূল বক্তব্য ॥

পলাতক কুমার আর রানী সুমিত্রা আজ আশ্রয়হীন, অরণ্যচারী। এই দৃশ্যে উপকাহিনীর নায়ক ও মূল কাহিনীর নায়িকার জীবনে যে দুর্ভাগ্য নামিয়া আসিয়াছে, তাহাই রূপলাভ করিয়াছে। কিন্তু আর একটি দিক দিয়া এই দৃশ্যটির বিশেষত্ব আছে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের অন্তরে যে গীতিধর্মিতা আত্মগোপন করিয়া ছিল এই দৃশ্যে তাহাই কুমারের উক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

স্থান—অরণ্য। অরণ্যের শুষ্ক পর্ণশয্যায় ঘুমন্ত কুমারের শিয়রে জাগিয়া বসিয়া আছেন স্নেহময়ী ভগ্নী সুমিত্রা। এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি জাগিয়া উঠিয়াছেন। জাগিয়া সুখসুপ্ত ভ্রাতার মুখখানি দেখিয়া তবে আশ্বস্ত হইয়াছেন। ক্রমে ভোরের আলো পত্রপল্লবের অন্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শিয়রে স্নেহময়ী জননীর মতো ভগ্নী সুমিত্রাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, সদ্য-জাগ্রত কুমারের হৃদয় এক অনাবিল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি অরণ্য-জীবনের সকল বেদনা ভুলিয়া অপূর্ব সুখোপলব্ধিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ইলার স্মৃতিও তাঁহার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

সুখে আছি……একান্ত সম্ভোগ—রাজ্যহীন, আশ্রয়হীন, পলাতক কুমার আজ অরণ্যচারী। সঙ্গে স্নেহময়ী ভগ্নী সুমিত্রা আর ভক্ত প্রজাবৃন্দ। রাজসম্পদ বঞ্চিত হইয়া অরণ্যবাসী কুমার নির্জনে আপন জীবনকে একান্ত-ভাবে উপলব্ধি করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। মানুষ বাহিরের নানান কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলে আপন অন্তরের পরিচয়টি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বহিরঙ্গ রূপ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্তরের দিকে ফেলিলে তবেই অন্তরঙ্গ স্বরূপটি ধরা পড়ে ; মানুষ এক অন্তরঙ্গ উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। কুমার এতদিন রাজ্য, রাজকার্য, প্রজাবর্গ প্রভৃতি লইয়া এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, বাহিরের জগৎ হইতে পূর্ণ অবসর লইয়া আপন হৃদয়োপলব্ধির জগতে প্রবেশ করিবার সুযোগ পান নাই। আজ অরণ্যের নির্জনতায় তাঁহার সেই সুযোগ আসিয়াছে। তিনি আত্মমগ্ন হইয়া এক অপরিসীম আনন্দের জগতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছিয়া মানুষ

জীবনের আকর্ষণকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তখন জীবনকে একান্তভাবে ভোগ করিবার প্রবল বাসনায় তাহার অন্তর পরিপ্লুত হইয়া উঠে; কুমারের জীবনেও তেমনি এক তীব্র অনুভূতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

।। সপ্তম দৃশ্য ঃ মূল বক্তব্য ।।

কুমারের প্রতি ইলার 'প্রবল প্রেম' প্রেমস্বর্গচ্যুত রাজা বিক্রমকে স্নিগ্ধস্পর্শে হিংসামুক্ত করিয়া তুলিয়াছে; রাজার দুর্দান্ত হিংস্রতাকে প্রশমিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং রাজার অন্তর পরিবর্তনের দিক হইতে বিচারে এই দৃশ্যটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

স্থান—ত্রিচূড়। প্রমোদবনে অমরুরাজ বিক্রমদেবের হস্তে আপন কন্যা ইলাকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং তাহাকে পাঠাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রস্থান করিলেন। সখীগণ-সমাবৃতা ইলা কাননে প্রবেশ করিলে বিক্রমদেবের তৃষিত অন্তর এক অপরূপ নারীমূর্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। কম্পিত, মৌন, নতশির ইলা ম্লানমুখ তুলিয়া রাজা বিক্রমদেবের নিকট একটি প্রার্থনা জানাইল। রাজা বুঝিলেন,এই যুবতী যুবরাজ কুমারের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছে, আজ আর অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ইলার এই প্রবল প্রেম অন্তরকে প্রবল-ভাবে নাড়া দিয়া আত্মবিস্মৃত রাজাকে আত্মসচেতন করিয়া তুলিল। তিনি ইলাকে তাহার প্রেমিকের হস্তে সঁপিয়া দিবার অঙ্গীকার করিলেন।

লহো তবে এ জীবন……নিয়ে যাও—অমরুরাজের কন্যা ইলা কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারকে হৃদয়মন সঁপিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে রাজা বিক্রমের সঙ্গে সমর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পিতার নির্দেশে সখীদের সঙ্গে লইয়া মৌননতমুখে কম্পিতদেহে প্রমোদকাননে প্রবেশ করিয়াছে ইলা। রাজা বিক্রম এক অপরূপ নারী সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া নতজানু ইলাকে ধূলিশয্যা ত্যাগ করিতে বলিলে, ইলা তাঁহার নিকট ধন, রত্ন সম্পদ নহে—শুধুমাত্র নিজেকে ভিক্ষা চাহিয়াছে। কিন্তু রাজা যখন তাহাকে পাইবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাহার মহৎ প্রেমের গভীরতাই প্রকাশ পাইয়াছে। সে রাজা বিক্রমকে বলিয়াছে যে, রাজারা মৃগয়া করিতে গিয়া যেমন তীক্ষ্ণ তীর দিয়া সুন্দরী বনহরিণীকে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে এবং তাহাকে বহন করিয়া লইয়া আসে, তিনি তাহার হৃদয়কেও

তেমনি ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহার মৃতদেহই গ্রহণ করিতে পারেন। কারণ জীবন থাকিতে ইলা আর কাহাকেও এই হৃদয় ও দেহদান করিতে পারিবে না। এ পৃথিবীতে একজনের জন্য সে সব-কিছু সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। মহৎ প্রেমের ইহাই স্বধর্ম।

এ সংসারে……সম্পদের মতো।—ব্যাখ্যা দেখ।

বসন্ত না আসিতেই….প্রফুল্ল হয়ে ওঠে—সহধর্মিণীর সঙ্গসুখবঞ্চিত, প্রকৃত বন্ধুত্বের অধিকারবঞ্চিত বিক্রমদেবের নিকট এক বিশেষ মুহূর্তে দেবতার আশীর্বাদের মতোই আসিয়া উপস্থিত হইলেন বাল্যবন্ধু দেবদত্ত। কারণ পথভ্রান্ত রাজাকে সত্যপথের সন্ধান দিতে পারেন বন্ধু দেবদত্ত। তাই দেবদত্তকে আজ রাজার অত্যন্ত প্রয়োজন। দুর্লভ মুহূর্তে হারানো বন্ধুকে ফিরিয়া পাইয়া বিক্রমদেব আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার মনে হইতেছে শীত ঋতুর শীতলতায় রিক্ত ধরিত্রীর বুকে প্রবাহিত দক্ষিণ পবন যেমন প্রাচুর্যের অধিরাজ বসন্তের আগমনবার্তা ঘোষণা করে, রাজার রিক্ত অন্তরে তেমনি আগামী দিনের প্রশান্তির আশ্বাস আনিয়াছেন বন্ধু দেবদত্ত। বসন্তের দাক্ষিণ্যে যেমন রিক্ত ধরিত্রী আবার ফলে ফুলে অপূর্ব শ্রী ধারণ করে, তেমনি বিক্রমদেবের হিংসার স্পর্শে হতশ্রী জীবনও তাহার লুপ্ত শ্রী ফিরিয়া পাইয়া স্বভাব-সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে।

॥ অষ্টম দৃশ্য ঃ মূল বক্তব্য ॥

কুমারের জন্য প্রজাদের জীবন আজ দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই পলাতক জীবনের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা দেখা দিয়াছে। কুমার তাই সঙ্কল্প করিলেন, সুমিত্রার হাতে আপন ছিন্নমুণ্ড পাঠাইয়া তিনি বিক্রমদেবকে আতিথ্যের অর্ঘ্য দিবেন। নিজের কোনো অপরাধ নহে, বাহুশক্তির প্রতিকূলতার ফলে—কুমারের জীবনে নামিয়া আসিল এক বিষাদময় পরিণতি। এই দৃশ্য সেই 'প্যাথেটিক' পরিণতিরই পরিচয়বাহী।

স্থান—অরণ্য। অনুচরেরা যুবরাজের ভবিষ্যৎ লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। আর একজন অনুচর রামচরণ আসিয়া সংবাদ দিল, এক ব্রাহ্মণ বনের ধারে ঘুরিয়া যুবরাজের সন্ধান নিতেছে। তাহাকে গুপ্তচর মনে করিয়া মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। এমন সময় চর আসিয়া আরও অগ্নিসংযোগ ও

॥ রাজা ও রানী ঃ গঠনগত আলোচনা ॥

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই ; এই বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে নাটক আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই অন্যান্য শিল্প-রীতি হইতে নাট্য-শিল্প সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; এবং এই স্বতন্ত্র শিল্পরীতি-সৃষ্টির পক্ষে তাই বিশিষ্ট শিল্প-প্রতিভার প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আমরা নাট্যশিল্প-সৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিভার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করিতে পারি। নাটকের মূল রহস্য এই যে, নাট্যকারকে একই সঙ্গে নাটকের পাত্রপাত্রীর মনের গভীরতার মধ্যে তলাইয়া যাইতে হইবে, আবার সেইসঙ্গে সমস্ত ঘটনাটিকে অনিবার্য পরিণামের দিকে দুর্নিবার বেগে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। গতির এই দ্বিত্ব, গভীরতামুখী ও পরিণামমুখী বেগ শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণ। এই মানদণ্ডে বিচার করিলে, বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ কখনও বিশুদ্ধ নাটকীয় কৌশল আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার বিশ্বজয়ী গীতি-প্রতিভাই এই পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ গীতি-প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা পাত্রপাত্রীর অন্তরলোকে প্রবেশ করা, তাহাদের মনের গভীরতার পরিমাপ করা। নাটকীয় পরিণামমুখী সক্রিয় সরলতার প্রতি এই প্রতিভার একটা অবহেলার ভাব থাকে বলিয়াই মিশ্র-গীতির রচনাই এই প্রতিভার সার্থক বাহন। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভার সার্থক বাহন তাই মিশ্র-রীতির কাব্যনাট্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন, "রাজা ও রানী বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ নাটক।"

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৃষ্টির প্রথম স্তরে, 'বাৎসল্যের ও প্রেমের আলোকে আত্মনিপীড়নরূপ হৃদয়ারণ্য' হইতে রবীন্দ্র-প্রতিভার নিষ্ক্রমণ। দ্বিতীয় স্তরে 'কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের, রূপের সঙ্গে রসের, সংসারের সঙ্গে সত্যের সংঘর্ষ'। এই স্তরে যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, 'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী' নাটকের আত্ম-বিসর্জনের মাধ্যমে তাহার অবসান ঘটানো হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'রাজা ও রানী' নাটকের নাট্যরস জমিয়াছে অসংযত কামের সহিত মহৎ —ম্বর সংঘর্ষে এবং তাহার নাটকীয় পরিণতিতে।

নাটক বিচার করিতে বসিলে প্রাথমিক ভাবে ত্রি-ঐক্যের কথা উঠে।

ত্রি-ঐক্য বলিতে স্থানগত, কালগত ও ভাবগত ঐক্য বোঝায়। গ্রীক নাট্য-সাহিত্যেই প্রথম এই ঐক্যের কথা তোলা হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী কালের নাট্য-রচনায় এই ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। অমর নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রও সর্বক্ষেত্রে এই ঐক্য রক্ষা করিয়া নাটক রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে এই ঐক্য বজায় রাখেন নাই।

'রাজা ও রানী' নাটকটি জালন্ধর হইতে কাশ্মীর ও ত্রিচূড় পর্যন্ত বিস্তৃত। হয়তো কোথাও কোন ইতিহাসের কিংবা কিংবদন্তীর স্পর্শ এই নাটকে আছে কিন্তু তাহা সুস্পষ্ট নহে। নাটকটির ব্যাপ্তি পঞ্চমাঙ্ক নাটকের পটভূমি হিসাবে সার্থকতা অর্জন করিয়াছে। প্রথম অঙ্কের সমস্ত ঘটনাই জালন্ধরে সংঘটিত, শুধুমাত্র প্রথম দৃশ্যটি জালন্ধর সীমান্ত-সংলগ্ন সিংহগড়ে অনুষ্ঠিত। একই অঙ্কে জালন্ধর ও সিংহগড়ের অবস্থান ঔচিত্যবোধের দিক দিয়া সার্থক নহে। তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্যগুলি কাশ্মীর ও ত্রিচূড়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুইটি রাজ্যের দূরত্ব সামান্য হইলেও ভাবের দিক দিয়া তাহা কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না বলিয়াই তাহা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। 'রাজা ও রানী' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা কাশ্মীর ও ত্রিচূড় রাজ্যে বিভক্ত ভাবে ঘটিলেও তাহা ভাবের জগতে কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করে না। দুইটি রাজ্যে সংঘটিত হইলেও স্থানের ব্যবধান, ভাব ও কাহিনীর ঐক্য একই অঙ্কে সার্থকভাবেই সমন্বিত হইয়াছে। পঞ্চমাঙ্কে অনেকগুলি দৃশ্যের একত্র সমাবেশ ঘটিলেও কাহিনী ও ভাবগত ঐক্যে এই অঙ্কটিও স্থানের ব্যবধান ভুলাইয়া দেয়।

প্রসঙ্গত আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনার কথা আলোচনাযোগ্য। এই নাটকের কাহিনী (কাহিনী-বিশ্লেষণ দেখ) ইতিহাসের সম্পর্কচ্যুত—রোমান্টিক। পরবর্তী নাটক, 'বিসর্জন'-এর ন্যায় সুবিন্যস্ত না হইলেও এই নাটকের কাহিনী গীতি-প্রাচুর্য-বর্জিত এবং নিঃসন্দেহে নাটকীয়। ঘটনা-বিন্যাসে এই নাটকের প্রধান ত্রুটি হইল প্রথমাংশের আড়ষ্টতা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করিয়াছেন, "এই প্রথম অংশের মধ্যে তখনও নাট্যকার তাঁহার পূর্ববর্তী গীতি-নাট্যগুলির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই; কিন্তু ইহারই শেষাংশে নাটকীয় ঘটনা আকস্মিকভাবে যেন এক অনির্দিষ্ট পরিণতির আকর্ষণে দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণতি অতিমাত্রায় অতি-নাটকীয়,

অথচ ভাবে কিংবা ক্রিয়ায় ইহার এই অতি-নাট্যিক পরিণতির কোন ইঙ্গিত ইহার অপেক্ষাকৃত গীতিভাব-প্রভাবিত প্রথমাংশে অনুভব করিতে পারা যায় না। এতদ্ব্যতীত ইহার কাহিনীর আর একটি ত্রুটি এই যে, ইহার কোন অংশ যেমন অস্পষ্ট, তেমনই আবার অপর এক অংশ মূল নাট্য-কাহিনীর মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক।" স্বয়ং নাট্যকার পরবর্তী জীবনে পূর্ববর্তী রচনার সমালোচনা করিতে বসিয়া 'রাজা ও রানী' নাটকের গঠনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে, "এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা ও কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে অসংগত।" এখন বিচার্য, নাট্যকারের এই মত গ্রহণীয় কিনা ?

নাট্যকার লিরিক্-ধর্মিতা সম্পর্কে অভিযোগ তুলিয়াছেন। কিন্তু নাটকে লিরিকের লক্ষণ থাকিলেই নাটক যে অপাংক্তেয় হইয়া যায় না তাহার অসংখ্য প্রমাণ বিশ্বের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ নাটক। জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্য রচনা হইতে ইহা দেখানো কঠিন নহে যে, লিরিক-ধর্মিতা অনেক ক্ষেত্রেই নাট্যরসকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু একথা সত্য যে লিরিকের আতিশয্য নাট্যধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন রচনায় এইজাতীয় আতিশয্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'রাজা ও রানী' নাটক সম্পর্কে এই উক্তি সত্য। ইহার কারণ সম্ভবত নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে এই নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই সময় বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ তাঁহার হৃদয়কে কানায় কানায় ভাবাবেগে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তখন যাহা-কিছু এই হৃদয় উৎস হইতে নির্গত হইতেছিল তাহাতেই লিরিকের শত সুর রণিত হইতেছিল।" প্রকৃত নাটকের মধ্যে লিরিকের মন্ময়তা ও নাটকের তন্ময়তা এক অপূর্ব একাত্মতা লাভ করে, যেখানে তাহা ঘটে না সেইখানেই সৃষ্টি-দুর্বল হইয়া উঠে। 'রাজা ও রানী' নাটকে সঙ্গীতের সুরমূর্ছনায় এক সকরুণ ব্যর্থ প্রেম ভাঙিয়া পড়িয়াছে, সে প্রেম রোমান্টিক বিষাদ-সুন্দর রসে পারিস্নাত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা সত্য হইলেও কবির কল্পনা বিলাস যে স্থানে স্থানে সীমা অতিক্রম করিয়া নাটকের ধর্মকে বিঘ্নিত করিয়াছে—এ সত্য অনস্বীকার্য।

এই লিরিকের টানেই নাটকের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে 'ইলা ও কুমারের উপসর্গ'। নাট্যকারের এই অভিযোগ কতখানি বিচারসহ তাহাও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। নাটকের মূল কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনী সংযোজন অসঙ্গত নহে। সাধারণত ঘটনা-সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্য দ্বারা মূল কাহিনীকে রসঘন ও আবেগচঞ্চল করিয়া তোলাই এই সংযোজনার উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন সময়ে উপকাহিনী মূল কাহিনীকে অতিক্রম করিয়া অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করিয়া বসিলেই তাহা 'উপসর্গ' হইয়া দেখা দিবে। 'রাজা ও রানী' নাটকে ইলা ও কুমারের উপকাহিনী বিচার প্রসঙ্গেই আমরা এই বক্তব্যের যাথার্থ্য যাচাই করিতে পারিব।

কুমার ও ইলার উপকাহিনী এই নাটকে ভাব ও আদর্শের বৈসাদৃশ্য দ্বারা বিক্রম ও সুমিত্রার কাহিনীকে সুস্পষ্ট ও সুউজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। রাজা বিক্রম ও রানী সুমিত্রার প্রেমের মধ্যে রহিয়াছে অন্তর্বিরোধ আর কুমার ও ইলার প্রেমে রহিয়াছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আনুগত্য, যদিও দুই প্রেমেরই পরিণতি ঘটিয়াছে, বিষাদ ও ব্যর্থতায়; চরিত্র-সৃষ্টিতেও বিক্রম ও কুমার, সুমিত্রা ও ইলা চরিত্রের বৈপরীত্য লক্ষণীয়। সুতরাং বলা চলে, দুই কাহিনীর মধ্যে ভাব ও চরিত্রগত বৈপরীত্য দ্বারা নাটকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ইলার প্রবল ও অচঞ্চল প্রেম স্বর্গচ্যুত হতভাগ্য রাজার হৃদয়ে ঊষর প্রতিহিংসা-জ্বালা নির্বাপিত করিয়া ক্ষমা-সুন্দর স্নেহের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া আরও একটি প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কুমার ও ইলার কাহিনী গীতিসুরের প্রাচুর্য সৃষ্টি ব্যতীতও মূল কাহিনীকে অপ্রধান করিয়া দিয়া নিজেই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই নাট্যকার মন্তব্য করিয়াছেন, 'কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত।' এবং কুমারের জীবনের অতি-নাট্যিক পরিণতিও তাই আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম হইয়া উঠিতে পারে নাই। এইখানেই উপকাহিনী উপসর্গ হইয়া দেখা দিয়াছে। তবে একথা সত্য, কবি এই ত্রুটি সংশোধন করিতে বসিয়া 'তপতী' নাটক রচনা করিলেও 'নরেশ ও বিপাশা' কাহিনী সেখানে 'কুমার ও ইলার' কাহিনীর মতোই উপসর্গ হইয়া দেখা

দিয়াছে। এই প্রসঙ্গেই আমরা 'রাজা ও রানী'র অস্পষ্টতার দিকটি লক্ষ্য করিতে পারি।

রাজা বিক্রমের প্রেম প্রতিহত হইয়া প্রবল হিংসার রূপ লইল। হিংস্রতার প্রাবল্য দেখাইতে গিয়া নাট্যকার কুমারসেনের বিরুদ্ধে বিক্রমকে অস্ত্র ধারণ করাইয়াছেন; কিন্তু মুখ্যতঃ ইহার যে কারণ দেখানো হইয়াছে তাহা দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট। কুমার বিক্রমের উপকারের উদ্দেশ্যেই অগ্রসর হইয়াছিলেন, অথচ সেই বিক্রমই যখন তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন তখন তাহার যথেষ্ট কারণ থাকা বাঞ্ছনীয়। কুমার বিদেশী, তিনি তাঁহার রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আসিয়াছেন—এই অপরাধই যথেষ্ট নয় বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং বিক্রমের এই শত্রুতার কারণ অস্পষ্ট থাকিয়া নাট্য-রচনায় দুর্বলতা সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যসাধনায় 'প্রেম' একটি বিশিষ্ট চেতনা। প্রেমের পতাকা লইয়াই রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভার জয়যাত্রা। হিংসা ও বিদ্বেষ নহে, কবি-প্রতিভা প্রেমের আলোকেই জীবনের দুঃসহ, দুর্গম পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই আলোকের অপূর্ব বিচ্ছুরণে তাঁহার হৃদয়াবেগ বর্ণরাগমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। বলা চলে, কবি-প্রকৃতির এক অভিন্ন অঙ্গ এই প্রেম রবীন্দ্র জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অনুভূতি। কবি-প্রকৃতির সহিত ইহার যোগ শাশ্বত। জীবনব্যাপী এই প্রেমসাধনার অন্যতম প্রকাশভূমি—'রাজা ও রানী'। প্রেম উপলব্ধ হইবে বৃহত্তম কল্যাণের ক্ষেত্রে—একান্ত আসক্তির মধ্যে নহে—তবেই প্রেমের সার্থকতা। প্রকৃত প্রেম ত্যাগ ও স্বার্থ-বিসর্জনের দ্বারা সার্থক। কামনার জয়েই প্রেমের প্রতিষ্ঠা—ইহাই 'রাজা ও রানী'র মূল বক্তব্য। কিন্তু এই প্রকাশ-পদ্ধতি যে কিছুটা পরিমাণে কাব্যোচিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা আমরা পূর্ববর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। গীতিকাব্যের প্রতি অপরিসীম মোহ ছিল বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে।

'রাজা ও রানী' নাটকে মূল বক্তব্যটিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য নানা ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। ঘটনার সহিত ঘটনার, চরিত্রের সহিত চরিত্রের এবং ঘটনার সহিত চরিত্রের যে বিভিন্ন সংঘাত ও বিরোধ নাটকের মূল কথা, এই নাটকে তাহা কোথাও সাধারণ কোথাও অসাধারণ তাৎপর্য লাভ করিয়াছে; এবং এই বিরোধের জটিলতা নাটক-

খানিকে অনেক স্থানেই শিল্পবিচারে উপভোগ্য ও সার্থক করিয়া তুলিয়াছে—ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু একটি সার্থক ট্র্যাজেডির পরিকল্পনায় যে সমুন্নত চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়োজন রাজা বিক্রমদেবের চরিত্র-সৃষ্টিতে তাহা অনুপস্থিত। তাঁহার আসক্তিও যেমন সঙ্কীর্ণ তাঁহার হিংস্রতাও তেমনি ভয়ঙ্কর, ফলে তাঁহার সত্যোপলব্ধির মধ্যে যে নাট্য-কাহিনীর সমাপ্তি নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা নাটকীয় গুণসমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই; ইহা এই নাটকের একটি ত্রুটি। অর্থাৎ সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে যে বিরোধটি ছিল, রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই।'—নাট্যকারের এই মন্তব্য যুক্তিসহ। বিশেষত নাটকের শেষাংশে পর পর কয়েকটি মৃত্যু ও মূর্ছার দৃশ্য একটি মহৎ ট্র্যাজেডির সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করিয়া নাটকটিকে অনেকখানি মেলোড্রামাটিক করিয়া তুলিয়া আগ্রহী পাঠকদের অন্তরে অতৃপ্তি সঞ্চার করিয়াছে।

॥ গঠনগত দুর্বলতা ॥

আমরা নাট্যতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি—নাটকের কায়াগঠন অত্যন্ত কঠিন কাজ। কায়া-নির্মাণে নাট্যকার যদি সতর্ক না হন তবে অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক, যুক্তিহীন, ঔচিত্যবিরোধী নানা বস্তু আসিয়া নাট্যাবয়বকে দুর্বল করিয়া তুলিবে। সুতরাং নাটকীয় কাহিনীকে হইতে হইবে সংহত, ঘটনাকে হইতে হইবে সুবিন্যস্ত, নাটকীয় দ্বন্দ্ব হইবে কৃত্রিমতা-মুক্ত, চরিত্র-সৃষ্টি হইবে সুপরিকল্পিত, সংলাপ হইবে চরিত্রের উপযোগী ও সুমিত এবং সঙ্গীতকে হইতে হইবে সুপ্রযুক্ত। যেখানে ইহার ব্যত্যয় ঘটিবে সেখানে নাট্যপ্রয়াস দুর্বল হইয়া পড়িবে। 'রাজা ও রানী' নাটকে নাট্যকার কোন কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত সতর্কতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া এই নাটকের অবয়ব-গঠনে কিছু কিছু দুর্বলতা অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথমদৃশ্যে নাট্যকার রাজা বিক্রম ও বাল্যসখা দেবদত্তকে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের সংলাপ হইতে ইহা স্পষ্ট যে, রাজা বিক্রম ব্রাহ্মণ ত্রিবেদীকে সরাইয়া বাল্যবন্ধু দেবদত্তকে রাজ-পুরোহিত পদে বরণ করিতে চাহেন। কিন্তু কেন? তাহার কোন যোগ্য উত্তর আমরা পাই না। সরল, নির্বোধ ব্রাহ্মণ ত্রিবেদী যেমন শাস্ত্রহীন—দেবদত্তও তেমনি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারবিহীন। তাঁহার 'স্কন্ধে ঝুলে পড়ে

ট্র্যাজিক নায়ক হইবার যতখানি চরিত্রগৌরব রাজা বিক্রমের থাকা উচিত ছিল ততখানি নাই।

এমন দুর্বলতা রানী সুমিত্রার চরিত্রেও অনুপ্রবেশ করিয়াছে। রানী সুমিত্রার জালন্ধর রাজ্য ত্যাগ করিবার পূর্ববর্তী রূপ ও আচরণের সহিত রাজ্যত্যাগ করিবার পরবর্তী রূপ ও আচরণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। কারণ প্রথমাংশে তিনি শুধু বিক্রম-প্রেয়সীই নহেন, প্রজা-জননীও; কিন্তু শেষাংশে তিনি শুধুমাত্র কুমারসেনের ভগ্নী। এবং যে নারী একদিন পতি-সত্যপালনের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি খুল্লতাতপত্নী রেবতীকে রাজকার্যে হস্তক্ষেপ না করিবার পরামর্শ দিয়া স্ববিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা চরিত্রচিত্রণের দুর্বলতা। সম্ভবত, নাট্য-উপস্থাপনরীতি ভাবতান্ত্রিক (Subjective) হওয়ায় এবং চরিত্রগুলি অনেকখানি পরিমাণে ভাবের বাহক হওয়ায় এই ত্রুটি দেখা দিয়াছে। ইহার ফলেই আত্মসুখসর্বস্ব রাজা বিক্রম এবং অতিআদর্শান্বিত প্রজাজননী সুমিত্রা স্বাভাবিকতার সীমাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের বাস্তব বিশ্বাসকে বিচলিত করিয়াছে।

আবেগের অতি-প্রাধান্যের ফলে কতকগুলি ঘটনা বেশ খানিকটা পরিমাণে মেলোড্রামাটিক হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের শেষ দৃশ্যে স্বর্ণপাত্রে কুমারসেনের কর্তিত মুণ্ড বহন করিয়া সুমিত্রার প্রবেশ ও মৃত্যু এবং ইলার আকস্মিক আবির্ভাব ও মূর্চ্ছা নাট্যকৌশলের দিক হইতে ত্রুটিযুক্ত।

গঠনগত দুর্বলতা আলোচনার শেষ পর্যায়ে সংলাপ ও সঙ্গীত প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনা করিতে বসিয়া মাঝে মাঝে বর্ণনারীতিকে অনেকখানি পরিমাণে কাব্যধর্মী করিয়া তুলিয়াছেন, এবং সংলাপেও দেখা দিয়াছে ভাবোচ্ছ্বাস। কিন্তু মনে রাখা দরকার, নাটকে কাব্যত্ব বা সঙ্গীত ততক্ষণ গ্রহণীয় যতক্ষণ তাহা নাটকীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই নাটকে অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যত্ব নাট্যধর্মকে অতিক্রম করিয়া এবং সঙ্গীত প্রয়োজনবিহীন হইয়া নাট্য নির্মিতির ত্রুটি ঘটাইয়াছে।

মোট কথা, অপরিণত প্রতিভা লইয়া আত্মপ্রকাশ করায় নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ একটি সঙ্গত ভাবসত্যকে রূপদান করিতে বসিয়া রূপায়ণগত ত্রুটি অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

॥ চরিত্র-বিচার : মুখ্য চরিত্র ॥

বিক্রমদেব : 'রাজা ও রানী' নাটকের নায়ক রাজা বিক্রমদেব—জালন্ধরের রাজা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রেমময়ী সুমিত্রার স্বামী, ব্রাহ্মণ-তনয় দেবদত্তের বাল্যবন্ধু এবং বৃহত্তর জীবনে তিনি অসংখ্য প্রজার পালক-প্রভু। তাই তাঁহার কর্তব্যপালনের ক্ষেত্র শুধুমাত্র পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—তাহা রাজ্য-পরিচালনার বৃহত্তর ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। তিনি শুধু স্বামীই নহেন; তিনি ভূস্বামী। কিন্তু ভূস্বামী বিক্রমদেব আজ আপন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিয়া গণ্ডীবদ্ধ গৃহজীবনের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে আত্মবন্দী। তাঁহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জুড়িয়া আছেন রানী সুমিত্রা। এক উদগ্র কামনায় উত্তপ্ত-হৃদয় বিক্রমদেব রাজ্য, রাজ-কর্তব্য ভুলিয়া অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন। রাজপ্রাসাদের প্রস্তর প্রাচীর রাজা ও প্রজাদের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছে এক দুস্তর ব্যবধান। মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদ ও প্রজাপুঞ্জের আহ্বান সেখানে গিয়া পৌঁছায় না। সমস্ত রাজ্য জুড়িয়া তাই এক অরাজক বিশৃঙ্খলা। কিন্তু অন্তঃপুরবাসী রাজার সেদিকে দৃষ্টি নাই—তাঁহার দৃষ্টি জুড়িয়া আছেন সুন্দরী নারী—সুমিত্রা, তাঁহার প্রেয়সী। 'এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগরে' কনকচরণে নামিয়া আসিবার জন্য তিনি নিরন্তর আহ্বান জানাইতেছেন রানী সুমিত্রাকে। তিনি শুধুমাত্র 'ওই হাসি, ওই রূপ, ওই জ্যোতি' পান করিতে প্রয়াসী। তাই তিনি রানীকে বলেন,

"অধরে অধর রাখি প্রহরীর মতো
চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিয়া।"

নারীর অধর সুধা পান করিবার জন্য তিনি উন্মুখ। প্রবল হৃদয়বান পুরুষ বিক্রমদেবের হৃদয়ে অনন্ত ক্ষুধা। এই অপরিমিত ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্যই তাঁহার প্রেমদীর্ণ হৃদয় বার বার অনুনয়ে সুমিত্রার নিকট লুটাইয়া পড়ে। তিনি রানী সুমিত্রাকে বলেন,—

"জান নাকি প্রিয়ে,
সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর!
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য!" এই সীমাবদ্ধ নারীপ্রেমই

তাঁহাকে বৃহত্তর কল্যাণের ক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। এক দুর্বার

অন্তঃপ্রবৃত্তির দুষ্প্রতিরোধ্য তাড়নায় তিনি সুমিত্রাকে সকল কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্ত আপনার করিয়া ভুলিতে চাহিয়াছেন। তাই রানী তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে বলিলে, তিনি বলিয়াছেন,—

"ভালো, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু তার আগে
তুমি মানো অধীনতা, তুমি দাও ধরা।
ধর্মাধর্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ
সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল।
তবেই ফুরাবে কাজ—তৃপ্ত মন হয়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে।
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতদিন তুমি।
তোমার অদৃষ্ট-সম রব তব সাথে।"

কামনার্ত রাজা অতৃপ্ত অন্তরে বারবার রানী সুমিত্রার উষ্ণ-সান্নিধ্য চাহিয়া যত ব্যর্থ হইয়াছেন, ততই উন্মত্ত উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছেন। 'মহাসিন্ধু তাঁহার ঘরে, তবু তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক, সেই শুষ্কতা তাঁহার শিরা-উপশিরায় শত প্রদাহের' সৃষ্টি করিয়াছে।

এই রূপজ মোহমত্ততারই অপর নাম কাম। কামের মধ্যে জড়াইয়া থাকে আত্মবোধ—অহং। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই তো কাম। কাম জয় করিয়াই প্রেমের প্রতিষ্ঠা। কারণ ভোগের দিকটাই প্রেমের পরিচয় হইতে পারে না। প্রকৃত প্রেম ত্যাগ ও স্বার্থ বিসর্জনের দ্বারা সার্থক। ইন্দ্রিয়জ রূপাসক্ত রাজা বিক্রম প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি কামের মধ্যেই প্রেমের সন্ধান করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

যখন রাজা রানীকে বলিয়াছেন,—

"প্রিয়তমে
উঠ উঠ, এসো বুকে স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে
এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্বাণ।"

কারণ প্রিয়তমার অশ্রুজলে আছে সুধা, আছে ক্ষমা। তখন রানী রাজ্য, প্রজা ও আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া বিদায় লইয়াছেন। রানীর এই প্রত্যাখ্যান রাজার অন্তরে এক প্রলয়-বহ্নি জ্বালিয়া তুলিয়াছে। আজ রাজার মনে হইয়াছে ভালবাসাই অপরাধ, তাই তিনি অন্তর্যামী দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন,

"অন্তর্যামী দেব,
জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালোবাসা। পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়—অবশেষে সেও চলে গেল।
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর।"

রাজা তাঁহার এই সুপ্ত ক্ষাত্রধর্ম ফিরিয়া পান—ইহা সকলেরই কাম্য ছিল, কারণ স্বয়ং রাজা, রানী ও প্রজাবর্গের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই তাহা একান্ত প্রয়োজন। মোহমুক্ত রাজা মন্ত্রীকে জানান,

"স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া ?
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত; যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ।"

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাজার যুদ্ধযাত্রা ছিল সকলের একান্ত কাম্য, কাম্য ছিল না যুদ্ধের নামে এক প্রচণ্ড উন্মত্ততা, শুভবুদ্ধির বিনাশ। কিন্তু যাহা কাম্য নহে—তাহাই সংঘটিত হইল। যে যুদ্ধ প্রজা সাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন ছিল, সেই যুদ্ধ সকলের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিল।

কামনার রূপ অতি কদর্য। যখন একান্ত আসক্তির মধ্য দিয়া ইহার অভিব্যক্তি ঘটে তখন যেমন ইহা নির্লজ্জ স্বার্থপরতার দ্বারা সীমিত ও সঙ্কীর্ণ, তেমনি যখন ইহার অসংযত রূপ দারুণ হিংস্রতার মধ্যে দুর্বার হইয়া উঠে, তখনও ইহা তেমনি ভয়ঙ্কর। রাজা বিক্রমদেবের অন্তরের যে দাবানল ভিতরে জ্বলিতেছিল, তাহা প্রতিহিংসার লেলিহান সহস্র শিখারূপে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত শুভকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইল। তাই নাট্যকার লিখিয়াছেন, "বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"

এই সর্বগ্রাসী, বিধ্বংসী অগ্নি নির্বাপিত করিতে পারেন রানী সুমিত্রা তাঁহার অন্তরসঞ্চিত প্রেমবারি সিঞ্চনে এবং বন্ধু দেবদত্ত তাঁহার বন্ধুত্বের স্নিগ্ধ-স্পর্শে, কিন্তু রানী দূরে সরিয়া গিয়া রাজার কল্যাণ চাহিয়া সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং বন্ধু দেবদত্ত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়াও রাজার শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে সমর্থ হন নাই এবং তাহা ব্যতীত কুচক্রীদের চক্রান্তে

রাজা তাঁহার পরম সুহৃদের উষ্ণ-সান্নিধ্য হারাইয়াছেন। ফলে বিপর্যয়ও অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এই অপ্রতিহত উন্মত্ততা প্রথম প্রতিহত হইল রানী রেবতীর কুটিল অভিলাষের স্বরূপদর্শনে। রানী রেবতী কাশ্মীর সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী কুমারকে বঞ্চিত করিবার জন্য এক হীন ষড়যন্ত্র করিয়াছেন এবং রাজা বিক্রমের সাহায্যে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন করিতে অত্যুৎসাহী। তাই তিনি রাজা বিক্রমকে বলিয়াছেন,—

"প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে; আগুন জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো
ছারখার। ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ;"

কল্যাণময়ী নারীর কুটিল কলুষ হিংস্র অন্তরের এই পরিচয় মোহমত্ত রাজ-অন্তরের মোহাচ্ছন্নতার মসীকৃষ্ণ আবরণ উন্মোচন করিয়া দিল; শিহরিত রাজা মনে মনে উচ্চারণ করিলেন,—

"এতদিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্তিখানা
দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে।"

গুপ্তলোভ, বক্ররোষ ও দীপ্ত হিংসাতৃষাদীর্ণ নারীর নারকীয় ও কুৎসিত রূপ রাজার আপন অন্তঃস্বরূপকে তাঁহার নিজের নিকট তুলিয়া ধরিল। অভ্রভেদী, সর্বগ্রাসী, উদ্দাম, উন্মাদ, দুর্নিবার হিংসার অন্তরাল হইতে রাজার প্রেমিক আত্মা কাঁদিয়া উঠিল। অন্যায় ও হিংসার পথ চলা থামিল। তারপর কুমার-প্রেয়সী ইলার ত্যাগনিষ্ঠ প্রেমের পুণ্যজ্যোতি-স্পর্শে প্রেমস্বর্গচ্যুত বিভ্রান্ত রাজা বিক্রম প্রেমস্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজা বিক্রম প্রেমময়ী ইলার প্রবল প্রেম দেখিয়া বিমুগ্ধচিত্তে বলিয়া উঠিলেন :

"প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই। দেবী, চাহিনে তোমার প্রেম।
শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হতে
ফুল ছিঁড়ে দিয়ে তারে কেমনে সাজাব!
আমারে বিশ্বাস করো—আমি বন্ধু তব।

চলো মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব ;
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে, তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী।"

তাঁহার অন্তর হইতে লোভ ও হিংসার কুৎসিত আবরণ খসিয়া পড়িল, স্নিগ্ধ ক্ষমা ও করুণায় সিক্ত হইয়া তাঁহার তৃষিত আত্মা এক নবজন্ম লাভ করিল। বিক্রমদেবের প্রকৃত পরিবর্তন এখানেই।

বিক্রমদেবের এই পরিবর্তনের কথা কুমার জানিতেন না বলিয়াই তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন এবং রানী সুমিত্রা সেই ছিন্ন মস্তক বহন করিয়া আনিয়া শোকাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পূর্বে যে প্রতিহিংসাময় রাজা বিক্রম মনুষ্যত্বের নবদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা রানীর অজানা ছিল। তাই এক নিদারুণ দুঃখ-পরিণতি নামিয়া আসিল। চরিত্রগত ভ্রান্তি ও মোহের ফলেই বিক্রমদেবের চরিত্র ট্র্যাজিক হইয়া উঠিল। এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক সমালোচকের মন্তব্য গ্রহণ করা চলে : "রাজা বিক্রমদেবের ট্র্যাজেডি শেক্‌সপীয়রীয় রীতিতে রচিত। শেক্‌সপীয়র 'tragic flaw' স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন এই ত্রুটি মানুষের অন্তরেই সৃষ্ট হয়। ঈর্ষা-বিদ্বেষ-দম্ভ প্রভৃতি মানুষের যে রিপুগুলি আছে তাহাদের কেন্দ্র করিয়াই নায়কের জীবনে ত্রুটি দেখা যায়। ওথেলোর অসূয়া সেই নাটকের ট্র্যাজেডি ঘটাইয়াছে। সেইরূপ 'রাজা ও রানা'তে রাজা বিক্রমদেবের সর্বগ্রাসী কাম এই নাটকে ট্র্যাজেডি-সৃষ্টির মূলে।" এই চরিত্রটির ট্র্যাজেডি তাই Tragedy of character।

প্রাণহীন সুমিত্রার নিস্পন্দ দেহের পার্শ্বে নতজানু, অনুতপ্ত রাজার অশ্রুজলসিক্ত হৃদয়ের সকরুণ ক্ষমা-প্রার্থনা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সমবেদনায় বেদনার্ত ও সহানুভূতিতে অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।

সুমিত্রা : জালন্ধর-রাজ বিক্রমদেবের সহধর্মিণী সুমিত্রা—কাশ্মীরের কন্যা, 'রাজা ও রানী' নাটকের নায়িকা। রাজা বিক্রমদেবের অন্তঃপুরের সর্বময়ী কর্ত্রী তিনি। তাঁহার অন্তরে আছে স্বামীর জন্য অনন্ত প্রেম, এবং প্রজাপুঞ্জের জন্য অপার দয়া। কর্তব্য সচেতন রানী আপন অন্তর-মাধুর্যে শুধুমাত্র স্বামীর হৃদয়েশ্বরীই নহেন, সমগ্র রাজ্যের তিনি রাজ্যেশ্বরী। তিনি শুধু প্রেয়সীই নহেন—তিনি মহৎী, রাজ-রানীই নহেন—প্রজা-জননীও।

রাজা বিক্রম স্বামীর সহজ অধিকার লইয়াই তাঁহার নিকট আসিলে যে সম্পর্ক অনন্ত মাধুর্যে ভরিয়া উঠিতে পারিত, কামনার্ত হৃদয়ের অপরিসীম আর্তি লইয়া আসায় সেই সম্পর্কে দেখা দিয়াছে বিরোধ। রাজা রানী সুমিত্রাকে একান্ত আপনার করিয়া চাহেন ; কিন্তু রানী তো শুধুমাত্র প্রেয়সী হইয়া থাকিতে চাহেন না, তিনি মহিষী, প্রজা-জননী হইয়া উঠিতে চাহেন। শুধুমাত্র রাজার মঙ্গলই নহে, রাজ্যের মঙ্গলও তাঁহার কাম্য। কারণ রাজা ও রাজ্যকে পৃথক করিয়া দেখিলে রাজ্যে অমঙ্গলই দেখা দিবে, দেখা দিবে বিপর্যয়। রানী অনিবার্য বিপর্যয়ের হাত হইতে রাজা ও রাজ্যকে রক্ষা করিতে একান্ত প্রয়াসী।

(রানীর প্রতি প্রচণ্ড আসক্তিই রাজাকে বৃহত্তর কর্মের জগৎ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়াছে। তিনি কেবল প্রেমের বিলাসই দেখিয়াছেন, বুঝিতে পারেন নাই মহৎ প্রেম মানুষকে কর্মক্ষেত্রে আহ্বান জানায়। রাজা বিক্রমের প্রেম যদি সত্যকার প্রেম হইত তবে তিনি তাঁহার প্রেয়সীর মনস্তুষ্টির জন্যই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় হইয়া উঠিতেন, কিন্তু তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই সুমিত্রাকে আকুল অন্তরে আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন—

"থাক গৃহ, গৃহকাজ।
সংসারের কেহ নহ অন্তরের তুমি।
অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ।" কিন্তু রানী সুমিত্রা স্বামীর এই কামাসক্ত হৃদয়ার্তিকে আনন্দিত-চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি স্বামীকে জানাইয়াছেন—

"কেবল অন্তরে তব ! নহে নাথ, নহে—
রাজন্, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে।
অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী।" এইখানেই বাধিয়াছে বিরোধ। বিরোধ বাধিয়াছে প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে। রানী প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, পারেন নাই রাজা বিক্রম।)

"যে প্রেম কামনার সুড়ঙ্গপথে চলে, ত্যাগ ও নিষ্ঠার রাজপথে বিচরণ করে না ; সংসারের অশেষ প্রকার কর্তব্য নিয়ত 'অয়ং অহং ভো' বলিয়া আহ্বান

জানাইতেছে, যে প্রেম তাহা শুনিতে পায় না, সেই প্রেম শুভ, মঙ্গলদায়ক নহে, অশান্তি ও অতৃপ্তি তাহার একমাত্র পরিণাম।" রাজা বিক্রম ও রানী সুমিত্রার প্রেমও এই অশুভ পরিণতি লাভ করিতে চলিয়াছে।)

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছার অপর নাম কাম। রাজা সেই কামনাকেই প্রকৃত প্রেম বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাই তিনি রানীকে প্রশ্ন করিয়াছেন, "চাহ না আমার প্রেম?" নারীহৃদয় সহজেই স্বামীর এই প্রশ্নে সাড়া দিয়াছে, রানী বলিয়াছেন—

"কিছু চাই নাথ,
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।" ...কারণ রানী সুমিত্রা

জানেন, রাজা তাঁহার অন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম ভুলিয়া যদি শুধুমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করেন, তবে তাহা প্রকৃত প্রেমের পরিচয় হইয়া উঠিবে না, প্রচণ্ড আসক্তির কদর্যতায় পর্যবসিত হইবে।) হৃদয়েশ্বরের এই অবাঞ্ছিত পরাজয় তিনি দেখিতে চাহেন না; তাই যখন বাহিরের বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বান আসিয়াছে, তখনই তিনি স্বামীকে অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যাইবার প্রেরণা দিয়াছেন। মন্ত্রী আসিয়া রাজাকে রাজ্যের বিশৃঙ্খলার কথা বলিলে তিনি স্বামীকে বলিয়াছেন—"যাও নাথ, যাও!" কিন্তু রাজা ইহাতে অন্তরবাসিনী প্রেয়সীর নির্মম নিষ্ঠুর রূপটিই উদ্ঘাটিত হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহার অন্তরের প্রকৃত প্রেমের স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। (রানী যতই রাজাকে মহৎ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করাইতে চাহেন, ততই তাঁহারা দুইজন দুইজন হইতে যোজন দূরে সরিয়া গিয়াছেন।)

রাজার অন্তরে ছিল প্রেম হইতে সুখ আহরণের প্রচেষ্টা—তাই তিনি নারীর রূপপাদমূলে রাজ্যশ্রীকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন—

"রাজা রানী! কে রাজা? কে রানী?
নহি আমি রাজা। শূন্যে সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্য রাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।"

(প্রেম-উদগ্র কামনা সমস্ত রাজ্যকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে, ইহাতেও রাজার

খেয়াল নাই ; কিন্তু রানী রাজার কর্তব্য বিস্মরণে লজ্জায় অভিভূতা। তিনি স্বামীর এই কামনার্ত রূপ দেখিয়া সংক্ষুব্ধচিত্তে বলিয়াছেন—

"শুনিয়া লজ্জায় মরি। ছি ছি মহারাজ,
এ কি ভালবাসা ?" ...ইহা যে প্রকৃত ভালবাসা নহে

—রানী এই সত্যই রাজার অন্তরে জাগ্রত করিতে চাহেন, তাই তিনি স্বামীকে বলেন,—

"শোন প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশী নই। আমারে দিয়ো না লাজ,
আমারে বেসো না ভাল রাজশ্রীর চেয়ে।"...এইখানেই দেখা

দিয়াছে দ্বন্দ্ব। রানীর হৃদয়-উপলব্ধ সত্য রাজ-অন্তরে সঞ্চারিত হয় নাই, সৃষ্টি করিয়াছে বিরোধ। 'রাজা ও রানী' নাটকের মূলে এই বিরোধই সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।)

রাজা রানীকে যতই আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিয়াছেন, রানীর মন ততই বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে—

"ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা !
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রানী !"

তাই রাজা হইয়া বিক্রমদেব যে কর্তব্য পালন করিতে পারেন নাই, সহধর্মিণী হইয়া রানী সুমিত্রা স্বামীর সেই অসম্পূর্ণ কর্ম-সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলে তিনি রাজাকে তাঁহার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে পারিবেন। তাঁহার অন্তরের ক্ষাত্রধর্মকে আবার জাগ্রত করিতে পারিবেন। একদিকে কাশ্মীরাগত বিদেশীদের অত্যাচারে নিপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট প্রজাদের আকুল ক্রন্দন, অন্যদিকে রাজার কর্তব্যকর্ম বিস্মরণ—রানীকে রাজপ্রাসাদের বাহিরে আনিয়া দাঁড় করাইল। এই কার্যে সঙ্গী হইলেন স্বামী-সখা দেবদত্ত। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি পরিবার পরিবেশের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন সেই মুহূর্তেই যেন নিষ্ঠুর নিয়তির ক্রূর পরিহাসে তাঁহার জীবনের পরিণতি নির্দিষ্ট হইয়া গেল। প্রার্থনারত রানীর মুখে কবি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়াছেন—

"দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি সতী,
প্রতি পদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলে নি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ-পানে!
সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না
ও রাঙা চরণ।"...শিবানী সতী কৈলাসে ফিরিয়া আসেন নাই, সুমিত্রারও জালন্ধরে আর ফিরিয়া আসা হইবে না—তাঁহার প্রার্থনায় অদৃষ্টের পরিহাস আভাসিত। অর্থাৎ অন্ধ প্রণয়াস্পদকে মহৎ-প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করাইতেগিয়া রানী সুমিত্রাকে শেষপর্যন্ত আত্মবিসর্জন করিতে হইল।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থে 'নরনারী' প্রবন্ধে ব্যোম বলিয়াছেন, "রমণী যদি একবার বহির্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূ ধূ করিয়া উঠে।" এই নাটকেও সুমিত্রা বলিয়াছেন—

"হায় তাত, মোরে কিছু কোরো না জিজ্ঞাসা।
আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম
অন্তঃপুর ছাড়ি! কোথা লুকাইয়া ছিল
এত অকল্যাণ!"...যে অগ্নি তুলসীতলায় পবিত্র সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইতে পারিত সেই অগ্নি সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখা লইয়া সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিতে বসিল। এই বিধ্বংসী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন সুমিত্রা ও সুমিত্রা-ভ্রাতা কুমার। ইহাই সুমিত্রা-জীবনের ট্র্যাজেডি।)

প্রসঙ্গত একথা উল্লেখযোগ্য যে, নাটকের প্রথমাংশে স্বামীর প্রতি অপরিসীম প্রেমে, পরদুঃখ অনুভবের মহত্ত্বে, মহান্ দুঃখ বরণ করিয়া লওয়ার গৌরবে ও মহত্তর আত্মবিসর্জনের প্রেরণায় রানী সুমিত্রার চরিত্রটি সুউজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও নাটকের শেষাংশে তাহা অন্যান্য ঘটনার আড়ালে পড়িয়া আমাদের সহানুভূতিলাভে খানিকটা পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে।

॥ গৌণ চরিত্র ॥

কুমারসেন : মূল কাহিনীর সমান্তরাল হইয়া যে উপকাহিনী—'রাজা ও রানী' নাটকে গড়িয়া উঠিয়াছে, কুমারসেন সেই উপকাহিনীর নায়ক। কুমারসেন কাশ্মীররাজ চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র, সুমিত্রার ভ্রাতা এবং ত্রিচূড়-রাজ অমরুরাজের কন্যা ইলার প্রণয়ী।

কাশ্মীর-রাজবংশের সন্তান কুমার শৈশবেই মাতৃপিতৃস্নেহবঞ্চিত। নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহার মাতাপিতাকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। তখন আপন উষ্ণ বক্ষে তুলিয়া লইয়া কুমার ও সুমিত্রা,—দুই ভ্রাতাভগ্নীকে বৃদ্ধ ভৃত্য শঙ্কর রক্ষা ও লালনপালন করিয়াছে। ইহাতে কুমারের জীবনের অভিশাপ চিরতরে দূরীভূত হয় নাই। কারণ ন্যায়ত সিংহাসনের অধিকারী হইয়াও তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত। কিন্তু কুমার কখনও পিতৃব্য ও তাঁহার সহধর্মিণীর বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন নাই—প্রকাশও করেন নাই। ইহা তাঁহার চারিত্রিক উদারতারই পরিচয় বহন করে।

তাঁহার এই অপরিসীম উদার, পরদুঃখকাতর, স্নেহশীল চিত্ত যেমন অসংখ্য প্রজার শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছে, অন্যদিকে তাঁহার অসামান্য প্রেম অমরুরাজের কন্যা ইলার নারীহৃদয়কে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই নাটকের নায়ক বিক্রমদেবের চরিত্র, কুমারের চরিত্রের বিপরীতরূপে, চিত্রিত। ফলে তাঁহাদের প্রেমের স্বরূপও বিপরীতধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। কুমার ইলাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, মুহূর্তের অদর্শনও প্রায় তাঁহার নিকট অসহনীয়। তাই তিনি ইলার উদ্দেশ্যে বলেন—

"আমাদের কী করেছিস, অয়ি কুহকিনী !
নির্বাপিত আমি। সমস্ত জীবন মন
নয়ন বচন ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হয়ে। যেন আমি
আমারে ভাঙিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাব
তোমার মাঝারে প্রিয় ! যেন মিশে রব
সুখস্বপ্ন হয়ে ওই নয়ন পল্লবে।
হাসি হয়ে ভাসিব অধরে। বাহু দুটি

ললিত লাবণ্যসম রহিব বেড়িয়া,
মিলন সুখের মতো কোমল হৃদয়ে
রহিব মিলায়ে।" ...সমস্ত 'জীবন মন নয়ন বচন'

লইয়াই এই প্রেম আপনাকে প্রণয়িনীর মধ্যে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে; কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও আসক্তির প্রবল স্রোতে দেহ ভাসাইয়া অসংযত হইতে উন্মুখ হয় নাই। এইখানেই কুমার ও বিক্রমের প্রেমের ভিন্ন রূপ। বিক্রম আপন কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছেন, কামনাক্ত, আসক্তি-সিক্ত প্রেম বিক্রমকে কর্তব্যাকর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে; কিন্তু কামনাশূন্য মহৎ প্রেম কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য কুমার-অন্তরকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। তাই কর্মের আহ্বানে আগত বিবাহ-উৎসব বন্ধ করিয়া কুমার ইলার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন্। দুইজনের প্রেমে পরিপূর্ণ বিশ্বাস। বিদায়ের বিষণ্ণ লগ্নে ইলা তাহার সমর্পিত, বিশ্বাসী অন্তরের পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত করিয়া তুলিলে কুমার বলিয়াছেন,—

"এমন বিশ্বাস
মোর 'পরে রেখো চিরদিন। মন দিয়ে
মন বোঝা যায়, গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরবে প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে।"

যেখানে প্রেমে আসক্তি, সেখানে প্রেম উচ্ছ্বাসময়, অসংহত। কিন্তু যেখানে প্রেমের গভীরতা, সেখানে প্রেমের প্রশান্তি, প্রেমের সংযম। কুমার ও ইলার প্রেম—আবেগ-নিয়ন্ত্রিত, অসংযত উদ্দাম নহে; বিশ্বাসের গভীরতায় অপূর্ব মহিমাময়। কামনাজয়েই যে প্রেমের সার্থক প্রতিষ্ঠা—এই সত্য উপলব্ধির স্বর্গে বিক্রম পৌঁছাইতে পারেন নাই, পারিয়াছেন কুমার।

কুমারের জীবনের পরিধি মূলত কাশ্মীর ও ত্রিচূড়রাজ্যের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ; কিন্তু ভগ্নী সুমিত্রা যেদিন আপন স্বামিগৃহ ছাড়িয়া ভ্রাতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেইদিন তাঁহার জীবনপরিধি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রসন্নচিত্তে প্রণয়িনীর প্রণয়-উপভোগী প্রশান্ত জীবন এক জটিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ত্রিচূড়ের ক্রীড়াকানন হইতে বিদায় লইলেন কুমার; আশ্রয়প্রার্থিনী ভগ্নী সুমিত্রার আহ্বানে তাঁহাকে কাশ্মীরে আসিতে হইল। দুইটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় সাময়িকভাবে বিরহী হইয়া উঠিলেও, ইহা আস—

মিলনের আশ্বাস বহন করিতেছে। ধ্রুব সত্য জানিয়াই কুমার আসিলেন কাশ্মীরে এবং পিতৃব্যের আদেশ ও আশীর্বাদ লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিদ্রোহীদের দমন করিয়া এবং বন্দী করিয়া তিনি ও সুমিত্রা রাজা বিক্রমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, রাজা শিবিরের দ্বার রুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া তাঁহাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। স্বামীর আচরণে অপমানিতা রানী ভ্রাতার নিকট মার্জনা প্রার্থনা করিলেন। প্রেমের জন্য অপমান বরণ তো ললাটের রাজটিকার ন্যায় গৌরবময়। তাই তিনি ভগ্নীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন— "জানিস তো বোন,

যুদ্ধ বীরধর্ম বটে—ক্ষমা তার চেয়ে
বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া ?"

…অন্তরের প্রেমের বলে বলীয়ান্ কুমার আপন অপমান বরণ করিয়া কাশ্মীরে ফিরিয়া গেলেন— আর বিক্রম প্রেমের সহিত অহঙ্কার যুক্ত করিয়া অস্ত্রসজ্জিত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

এইবার কুমারকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল। ব্যক্তিগত অপমান বরণ করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু দেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করা তো ক্ষাত্রধর্ম। স্বদেশ-আক্রমণকারী শত্রু ক্ষমার অযোগ্য। পিতৃব্য চন্দ্রসেনকে সেই কথা জানাইয়া তিনি সৈন্য প্রার্থনা করিয়াছেন—

"মহারাজ,
আমাদের শত্রু নহে জালন্ধরপতি,
নিতান্তই আপনার জন। কাশ্মীরের
শত্রু তিনি, আসিছেন শত্রুভাব ধরি।
অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান,
কেমনে উপেক্ষা করি রাজ্যের বিপদ ?"

….ইহাই তো ক্ষাত্রধর্মে উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমিকের সত্য পরিচয়।

কুমারসেনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, তাই ভগ্নী সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে অরণ্যে আশ্রয় লইতে হইল। এই বিপদের দিনে কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁহাদের আশ্রয় দিল। শত অত্যাচারেও বিক্রমদেব তাঁহাদের সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। মহৎপ্রাণ কোমলহৃদয় কুমার একদিকে রাজমহিষী

সুমিত্রার দুঃখ অন্যদিকে শত শত অনুগত বিশ্বাসী প্রজার উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আত্মবিসর্জন করিয়া সেই দুঃখের অবসান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ভ্রাতার এই সঙ্কল্প সুমিত্রার নারী-অন্তরকে নিদারুণ আঘাত হানিলেও শেষপর্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তিনি 'অভাগিনী ইলা'র কথা বলিলে কুমার যে উত্তর করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক প্রেমের সত্যই মহনীয় রূপ লইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। গভীর বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত কুমার বলিয়াছেন,—

'তারে কি জানি নে আমি?
হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত! সে আমার ধ্রুবতারা,
মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।"... হৃদয়ের গভীর প্রশান্তি ও অকুণ্ঠ আত্মবিশ্বাস হইতেই এই কথাগুলি উৎসারিত হইয়াছে। মৃত্যুর মহান তীর্থে এই প্রেম সার্থক হইয়াছে।

এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ—কুমার। রাজপুত্র হইয়াও আশৈশব মাতৃপিতৃক্রোড়বঞ্চিত ও ভৃত্যের ক্রোড়ে পালিত, ন্যায়ত সিংহাসনের অধিকারী হইয়াও সিংহাসন হইতে বঞ্চিত, প্রজাবর্গের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াও অগণিত প্রজার দুঃখের কারণ, ভগ্নীর স্নেহ ও ভক্তির পাত্র হইয়াও তাঁহার মর্যাদারক্ষায় অক্ষম, ইলার প্রেমের অধিকারী হইয়াও তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিতে অসমর্থ। রাজ্যের ঐশ্বর্য, প্রজার শ্রদ্ধা, ভগিনীর স্নেহ, প্রণয়িনীর প্রেম, সবকিছুর অধিকারী হইয়াও নিয়তির নির্মম নিষ্পেষণে তিনি অপরিণত যৌবনে তাঁহার জীবন জলাঞ্জলি দিলেন। এমনি করিয়া ভাগ্যহত কুমার ট্র্যাজিক মহিমা লাভ করিয়াছেন। উপকাহিনীর নায়ক হইয়াও কুমার নাটকে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন।

ইলা: ত্রিচূড়ের রাজা অমরুরাজের যুবতী কন্যা ইলা, কাশ্মীর-কুমার কুমারসেনের প্রণয়িনী। কুমার-ইলা উপকাহিনীর নায়িকা হইলেও, ইলা-চরিত্রটি নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিশিষ্ট চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। কুমার ও ইলার কাহিনী কিছু অতিরিক্ত স্থান গ্রহণ করিলেও এই উভয়ের প্রেম বিক্রম ও সুমিত্রার প্রেমের বিপরীত। বিক্রম ও সুমিত্রার প্রেমের মধ্যে

রহিয়াছে অন্তর্বিরোধ আর কুমার ও ইলার প্রেমে রহিয়াছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আনুগত্য।

প্রেম—ইলার জীবনের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়িয়া রহিয়াছে। পল্লবিনী লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে ইলাও তেমনি কুমারকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। কুমারের মুহূর্তের অনুপস্থিতিও তাই তাহাকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া দেয়। প্রজার আহ্বানে কুমার যাইতে উদ্যত হইলে, ম্রিয়মাণা ইলা কাতর কণ্ঠে বলে,—

"রাজ্যে তুমি চলে গেলে
মনে হয়, আর আমি নেই। যতক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি।"

ইলা যেন একটি অনতিমুকুলিত কুন্দপুষ্প। কুমারের প্রেমের উষ্ণস্পর্শে সেই অনতিমুকুলিত পুষ্প মুকুলিত হইয়া উঠিতে উন্মুখ। কুমার হৃদয়ও একান্ত আগ্রহী। দুইজনে তাই 'বাহুতে বাহুতে, চোখে চোখে, মর্মে মর্মে, জীবনে জীবনে' এক হইয়া যাইতে চাহে। প্রকৃত প্রেমের ইহাই ধর্ম। অন্তরের অন্তরতম স্থানে আশ্রয় লইয়াও 'দুহুঁ ক্রোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' ইলা এই বিরহের অবসান চাহে, কারণ সে প্রিয়তম কুমারকে বলিয়াছে,—

"কখন তোমারে পাব, কখন পাব না,
তাই সদা মনে হয়—কখন হারাব।" ...প্রণয়াস্পদকে

হারাইবার ভয়ে ভীত হইলেও ইলা প্রেমের সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। রাজা বিক্রমদেবের ন্যায় সে কেবল সামান্য সুখের কথাই চিন্তা করে নাই। সুখ তো প্রতিদিনের সামগ্রী—আনন্দ প্রতিদিনের উর্ধ্বে; প্রেমের রাজ্য সেই অনাবিল আনন্দের রাজ্য। বিক্রমদেব প্রেমের ভিতরে সুখকে আহরণ করিতে চাহিয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন, প্রেমস্বর্গচ্যুত হইয়াছেন; কিন্তু ইলা প্রেমের মধ্যেই দুঃখ-উপলব্ধি সত্য বলিয়া জানিয়াছে। মহৎ প্রেমের গভীরতা বালিকার হৃদয়কে বিকশিত করিয়া দিল। সে কুমারসেনকে বলিয়াছে—

"শোনায় গভীর সুখ দুঃখের মতন
উদার উদাস।" ...মহৎ প্রেমের এই সত্যোপলব্ধি

ইলার অন্তরে আত্মবিসর্জনের প্রেরণা জাগাইয়াছে। পিতা অমরুরাজ প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়া কুমারকে বিদায় দিলেন এবং কন্যাকে রাজা বিক্রমের হাতে সমর্পণ করিবার মানসে তাহাকে রাজার সম্মুখে পাঠাইয়া দিলেন। ইলার অপরূপ মূর্তি দেখিয়া রাজা চঞ্চল হইয়া উঠিলে, নতজানু ইলা তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছে,—

"মহারাজ,
পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে;
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে।" কিন্তু অতৃপ্ত-হৃদয় বিক্রম তাহাকে

গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, ইলা বলিয়াছে,—

"লহো তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন করে বনের হরিণী
নিয়ে যাও বুকে তার তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে
নিয়ে যাও।" ...ইহা দুর্বল নারীহৃদয়ের অর্থহীন

প্রলাপ নহে, ইহা মহৎ প্রেমের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ অন্তরের মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃত প্রেম মৃত্যুর মধ্য দিয়াই অমরত্ব লাভ করে। ইলা মহৎ প্রেমের অধিকারিণী। এই প্রেমে দ্বিধা নাই, আশঙ্কা নাই, অবিশ্বাস নাই, কিন্তু অভিশাপ আছে।

ইলার এই 'প্রবল প্রেম' দেখিয়া যদিও বিক্রম বলিয়াছেন, "সাবধান, অতি প্রেম সহে না বিধির" তাহা সত্ত্বেও কুমারী ইলার প্রেমকে তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন,—

"রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টি-সম; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মতো।" ...কুমারী ইলার 'হৃদয়ের মাঝে

প্রস্ফুটিত শুভ্র প্রেম' অভিশপ্ত, হিংসাতপ্ত, প্রেমস্বর্গচ্যুত রাজা বিক্রমকে আবার

কিন্তু শুধুমাত্র রানীর উপরই তিনি সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন নাই, নিজেও এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রজারা যখন 'শাস্ত্র ছেড়ে অস্ত্র' ধরিবার সঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া উঠিয়া রাজ্যব্যাপী আন্দোলন করিবার জন্য প্রস্তুত, তখন সেই প্রজাবিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি বন্ধুত্বের মর্যাদাই রক্ষা করিয়াছেন, কারণ দেবদত্ত রাজার হিতৈষী বন্ধু, স্বার্থান্বেষী চাটুকার নহেন। তিনি বন্ধুত্বের বলিষ্ঠ বিশ্বাস লইয়াই বাল্যসখাকে বলেন,

"সখা, এ হৃদয় মোর জানিয়ো তোমার।
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
সেও আমি সব অকাতরে, রোষানল
লব বক্ষ পাতি—যেমন অগাধ সিন্ধু
আকাশের বজ্র লয় বুকে"

বাল্যসখার অধিকার লইয়া তিনি রাজঅন্তঃপুরেও অবাধে যাতায়াত করিতে পারিতেন, রানী সুমিত্রার সহিত তাই গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার মধুর সম্পর্ক। রানী তাঁহার নিকট হইতে বহু সংবাদই সংগ্রহ করিতেন। যখন অত্যাচারিত ক্ষুধার্ত প্রজাদের কোলাহলে চারিদিক মুখরিত, তখন আগ্রহী সুমিত্রাকে দেবদত্ত সহজ রসিকতার সুরে জানাইয়াছেন,

"অভাগোর দুরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য।" ...এই প্রচ্ছন্ন রসিকতার মধ্য দিয়া

আমরা এ'টি সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন, স্নেহকোমল ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ের পরিচয়ই শুধু লাভ করি না, সেই সঙ্গে সত্যভাষণে দৃপ্ত অন্তরেরও পরিচয় পাই। রানীর প্রশ্নের উত্তরে অত্যাচারী বিদেশীদের পরিচয় দিয়া তিনি বলেন,

"রানীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমি।"

দেবদত্ত সর্বদাই ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিতেও বিধাগ্রস্ত হন নাই। যেদিন রাজা মহিষীকে রাজ্যের সংবাদ দিবার জন্য অনুযোগ করিলেন সেদিন তিনি রাজাকে স্পষ্টকণ্ঠে বলিয়াছেন,

"রাজ্যের সংবাদ রাজা আপনি দিয়েছেন
ঊর্ধ্বস্বরে কেঁদে সহস্র রাজ্য উৎপীড়িত
নিতান্ত প্রাণের দায়ে—সে কি ভাবে কভু
পাছে তব বিশ্রামের হয় কোন ক্ষতি ?" ...রাজা তাঁহার

বাল্যসখা বলিয়াই রাজার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোন সম্পর্কের বন্ধন তিনি একান্তভাবে স্বীকার করেন নাই—রাজার উপরও তিনি রাজ্যকে দেখিয়াছেন। রাজ্যের ও শত শত প্রজার কল্যাণকামনায় তিনি অত্যাচারী স্বার্থান্বেষী চক্রান্তকারী, রাজ-আত্মীয়দের নিকট শত্রুরূপেই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। রাজার মঙ্গল-কামনায় তিনি আপন সংসারের সমস্ত ভার স্ত্রী নারায়ণীর উপর অর্পণ করিয়া যুদ্ধোন্মাদ রাজাকে সত্যপথে আহ্বান করিবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া আসিলেন। বিপদের সময়, বিভ্রান্তির সময় যে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায় সেই তো প্রকৃত বন্ধু। তাই তিনি বিদায়মুহূর্তে সহধর্মিণী নারায়ণীকে বলিয়াছেন, "রাজাকে সাহস করে ছুটো ভাল কথা বলে. এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি তো আর থাকতে পারছিনে—আমি চললুম।" মঙ্গলকামনায় আসিয়া শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন দেবদত্ত, কিন্তু মোহগ্রস্ত রাজা পরমহিতৈষী বন্ধুর মূল্য দিতে পারিলেন না। প্রত্যাখ্যান করিলেন। শত্রুরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করিল। কিন্তু মহৎ-হৃদয় দেবদত্ত ইহাতে একমুহূর্তের জন্যও বাল্যবন্ধু বিক্রমের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠেন নাই, বরং সর্বদাই তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়াছেন, তাই কৌশলে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অধিকার লইয়া মোহগ্রস্ত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এবং রাজা বিক্রমও তাঁহাকে 'বন্ধুরত্ন' বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। "মোহান্ধ রাজার পার্শ্বে যেন এই চরিত্রটি একটুখানি সত্যের আলো—তাহা অন্ধ রাজাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পথের আভাস ব্যক্ত করিয়াছে।"

দেবদত্তের চরিত্রে বুদ্ধি-বিবেচনা, ন্যায়পরায়ণতা, ভক্তি-রসিকতা ও গাম্ভীর্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটায় তাঁহার চরিত্রটি সাধারণ হইলেও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

শঙ্কর : কাশ্মীররাজ পরিবারের পুরাতন ভৃত্য শঙ্কর। বহুদিনের কর্মের

মধ্য দিয়া এই পরিবারের সহিত তাহার সম্পর্ক ভৃত্য-পরিচয়ের দীনতা অতিক্রম করিয়া আত্মীয়-পরিচয়ের স্নিগ্ধতা অর্জন করিয়াছে। সে পিতৃ-মাতৃহীন রাজকুমার কুমারসেন ও রাজকুমারী সুমিত্রাকে আপন স্নেহকোমল উষ্ণবক্ষে তুলিয়া লইয়া লালনপালন করিয়াছে। কুমার ও সুমিত্রার নিকট শঙ্কর শুধুমাত্র ভৃত্যই নহে, পালকও। তাই তাঁহারা শঙ্করকে—'শঙ্করদাদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছেন।

বৃদ্ধ শঙ্কর পুরাতন রাজভৃত্য, দীর্ঘদিন রাজপরিবারের সহিত কাটাইবার ফলে রাজমর্যাদা, রাজসম্মান প্রভৃতির সম্বন্ধে তাহার সুদৃঢ় কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে। শৈশব হইতে লালনপালন করিবার ফলে কুমার ও সুমিত্রার প্রতি সে স্বভাবতই অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, কিন্তু এই স্নেহ কোন সময়েই অন্ধতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। অভিজাত রাজপরিবারের সহিত দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যের ফলে তাহার চরিত্রে এক অভিজাত-বুদ্ধি সংস্কারের মতো আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তাহার আচার-আচরণে এই পরিচয় স্পষ্ট।

বার্ধক্য-ভার-জর্জর শঙ্করের আকাঙ্ক্ষা—স্নেহলালিত কুমার সিংহাসনের অধিকারী হোক। কিন্তু পিতৃব্য চন্দ্রসেন ও তাঁহার সহধর্মিণীর ষড়যন্ত্রের ফলে কুমার আজও সিংহাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত। ইহা শঙ্করের অন্তরকে ব্যথাতুর করিয়া তোলে। এই চিন্তাই তাহাকে সদাসর্বদা বিমর্ষ রাখিয়াছে। কিন্তু দুইজন সাধারণ সৈনিক আসিয়া যখন তাহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে তখন তাহার আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগিয়াছে, তাই সে বলিয়াছে, "যা যা, আর বকিস নে, যা। এসকল কথা তোদের মুখে ভালো শোনায় না।" আবার যেদিন সে কুমারের দূত হইয়া রাজা বিক্রমের শিবিরে উপস্থিত হইয়া কুমারের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রাজাকে বলিয়াছিল,

"কলহেরে জান তুমি বীরত্ব বলিয়া,
নারী তুমি নহ ক্ষত্রবীর। সেই খেদে
মোর রাজা শেষে লয়ে কোষরুদ্ধ অসি
ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইনু সবে।"

...সেদিনও তাহার মর্যাদাবোধদীপ্ত অন্তরের পরিচয় শুধু রাজা বিক্রমকেই বিস্মিত করে

নাই আমাদেরও বিমুগ্ধ করিয়াছে এবং রানী সুমিত্রা ক্ষমার কথা বলিলে সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছে,

"এই কি উচিত তব। কাশ্মীরতনয়া
তুমি, ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমান কথা? বীরের স্বধর্ম হতে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে।"...ইহাতে রাজ-

পরিবার ও রাজ্যের প্রতি তাহার অকৃত্রিম আনুগত্যই প্রকাশ পাইয়াছে।

পালক শঙ্কর তাহার স্নেহলালিত কুমারকে বীররূপেই দেখিতে চাহে, ভীরু পলাতকরূপে নহে—তাই তাহার 'এ মিনতি'। ইহাতে আমরা একটি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' অন্তরের পরিচয় পাই।

কাশ্মীর-রাজপুত্রের সম্মানরক্ষার জন্য সে নিঃশব্দে নির্বিবাদে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করিয়াছে। সন্তানতুল্য কুমারের জন্য তাহার অন্তর গৌরব বোধ করিয়াছে বলিয়াই সে শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছে। তাই যেদিন সে শুনিল কুমার আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার জন্য রাজা বিক্রমের দরবারে উপস্থিত হইতে আসিতেছেন সেদিন তাহার অন্তর এই সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে রাজী হয় নাই, কিন্তু যখন রাজা চন্দ্রসেন বলিয়াছেন এ সংবাদ সত্য, তখন অপমানাহত, ক্ষুব্ধ অন্তরে সে বলিয়া উঠিয়াছে,—

"ধিক্,
সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্।
হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব—
সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি
চূর্ণ হয়ে গেল, মূকসম রহিলাম
তবু, সে কি এরি তরে। অবশেষে তুমি
আপনি ধরিলে বন্দীবেশ, কাশ্মীরের
রাজপথ দিয়ে চলে এলে নতশিরে
বন্দীশালা মাঝে। * * *

চিরভৃত্য তব

আজ হৃাদনের আগে মরিল না কেন!"…কিন্তু যখন স্বামী সুমিত্রা ভ্রাতা কুমারের ছিন্নমুণ্ড স্বর্ণথালিতে বহন করিয়া আনিয়া রাজা বিক্রমকে 'আতিথ্যের উপহার' দিলেন, তখন বৃদ্ধ শঙ্কর পরম স্নেহাস্পদ রাজপুত্রকে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য মৃত্যুবরণ করিতে দেখিয়াও প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছে,

"প্রভু, স্বামী,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভালো এই ভালো! মুকুট পরেছ
তুমি, এসেছ রাজার মতো আপনার
সিংহাসনে। মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল।"

…মৃত্যু কুমারের জীবনকে উজ্জ্বল করিয়াছে আর সেই উজ্জ্বলতায় কুমারের পালকভৃত্য শঙ্করের চরিত্রও সেই সঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রসেন: কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রসেন কুমার ও সুমিত্রার পিতৃব্য। কাশ্মীর সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী কুমারকে বঞ্চিত করিয়া তিনি সিংহাসনের অধিকারী। কুমারের প্রতি তাঁহার এক স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতা ছিল; কিন্তু স্ত্রী রেবতীর প্ররোচনায় তাঁহার অন্তরে এক কুটিল স্বার্থবোধ জাগ্রত হইয়া সেই স্নেহপ্রকাশের পথটিকে করিয়াছে অবরুদ্ধ; তাই তাঁহার অন্তরে দেখা দিয়াছে এক দ্বন্দ্ব।

কাশ্মীর-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কুমারকে যেভাবেই হোক বঞ্চিত করিয়া রেবতী চাহেন সিংহাসনে স্বামীর অধিকার নিষ্কণ্টক করিতে, তাই তিনি কুমারকে যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য প্ররোচিত করিতে থাকেন। চন্দ্রসেন সহজে এই পথ গ্রহণ করিতে রাজী না হইলেও, ব্যক্তিত্বের অভাবের ফলেই শেষপর্যন্ত কুমারকে যুদ্ধে যাইবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু তখনও তাঁহার স্নেহার্দ্র চিত্ত কুমারের মঙ্গল প্রার্থনাই করিয়াছে,—

"যাও তবে। দেখো বৎস,
থেকো সাবধানে। দর্পমদে ইচ্ছা করে
বিপদে দিয়োনা ঝাঁপ। আশীর্বাদ করি

ফিরে এসো জয়গর্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃসিংহাসন-'পরে।"

ভ্রাতুষ্পুত্র কুমারের প্রতি পিতৃহৃদয়ের আন্তরিকতাই তাঁহার এই আশীর্বচনের মধ্যে ব্যক্ত হইতেছে।

শত্রুসৈন্য কাশ্মীর আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি যুদ্ধসজ্জার কথা ভাবিলে স্ত্রী যখন তাঁহাকে সেই কর্তব্যকর্ম হইতে বিরত করিতে সচেষ্ট হইয়া 'কৌশলে উদ্দেশ্যসাধনের' কথা বলিয়াছে, তখন তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—

"ছি ছি রানী, এ সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার 'পরে।
মনে হয়, সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি। আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে
সন্দেহ জনমে। কর্তব্যের পথ হতে
ফিরায়ো না মোরে।"

...এই উক্তির মধ্য দিয়া আমরা রাজার অন্তরের প্রকৃত রূপটি উদ্ঘাটিত হইতে দেখি। বস্তুত রাজা কোন হীন, নীচ, কুটিল পথের পথিক হইতে রাজী নহেন, তাঁহার 'পাষণ্ড' পরিচয়ও তাঁহার কাম্য নহে। কিন্তু তাঁহার অন্তরের এ কামনা পূর্ণ হয় নাই। চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব ছিল বলিয়াই তিনি শেষপর্যন্ত আপন কর্তব্যে অবিচলিত থাকিতে পারেন নাই। তাই কপট অভিমানে রানী রেবতী যখন আপন সন্তানকে হত্যা করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে তখনই তিনি তাঁহার কর্তব্য ভুলিয়া রানীর নির্দেশমত কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু বিষণ্ণ কুমার ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কোমল অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তিনি রানীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

"তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
কুমারের 'পরে ; প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে বেঁধে তারে রাখি বক্ষ-মাঝে,
স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাত বেদনা।"

একদিকে এই স্নেহপ্রবণতা অন্যদিকে এক স্বার্থবোধ বার বার তাঁহার অন্তরে জাগাইয়াছে দ্বন্দ্ব। রাজা বিক্রম যখন পলাতক কুমারকে বন্দী

করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তখন চন্দ্রসেন তাঁহার নিকট 'অল্পবুদ্ধি বালক' কুমারকে 'গুরুদণ্ড' না দিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন এবং যখন রানী রেবতী নির্দয় অত্যাচারের মাধ্যমে তাহাকে খুঁজিয়া আনিয়া শাস্তি দিবার কথা বলিয়াছে, তখন সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা চন্দ্রসেন ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন, "চুপ করো, চুপ করো, রানী।" এমনি করিয়াই ভ্রাতুষ্পুত্র কুমারের প্রতি তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন স্নেহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি স্বার্থবোধ দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহবোধ কোনদিনই জয় করিতে পারেন নাই—নাটকের শেষ দৃশ্যে এই পরিচয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বলা চলে স্নেহ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ, ব্যক্তিত্বহীন পুরুষচরিত্র হিসাবে রাজা চন্দ্রসেনের চরিত্রটি সুস্পষ্টতা লাভ করিয়াছে।

রেবতী: কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রসেনের পত্নী রানী রেবতীর চরিত্র-পরিকল্পনা এই নাটকের অন্যান্য চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রেবতী নারী হইলেও এই নাটকের একমাত্র খল-চরিত্র।

কাশ্মীর-সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী রাজকুমার কুমারসেনের জীবনে যে বিষাদাত্মক পরিণতি নামিয়া আসিল, তাহার জন্য অনেকখানি দায়ী এই নারী। কুমার কাশ্মীর-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, কুমারের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই। যে-কোন উপায়ে কুমারকে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিয়া সিংহাসনে স্বামীর অধিকার নিষ্কণ্টক করাই তাহার জীবনের লক্ষ্য। তাই কুমারের প্রতি তাহার হিংস্রবুদ্ধি এত তীব্র, এত প্রত্যক্ষ। তাহার হিংস্র-বুদ্ধির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। যখন কুমারকে যুদ্ধে পাঠাইতে রাজা চন্দ্রসেন দ্বিধাগ্রস্ত, তখন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া রানী রেবতী রাজার উদ্দেশে বলে,

"যেতে দাও মহারাজ। কী ভাবিছ বসি?
ভাবিছ কী লাগি? যাক যুদ্ধে—তার পরে
দেবতা-কৃপায়, আর যেন নাহি আসে
ফিরে।" ···নারী হইলেও স্নেহ নহে—এক

কুটিল বাসনায় তাহার অন্তর পরিপূর্ণ। তাই যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে, পিতৃব্য চন্দ্রসেন কুমারকে বলিয়াছেন,

"আশীর্বাদ করি

ফিরে এসো জয়গর্বে অক্ষত শরীরে

পিতৃসিংহাসন-'পরে।" ...কিন্তু রানী রেবতী জননীস্বরূপা হইয়াও প্রাণঢালা আশীর্বাদ করিতে পারে নাই, বলিয়াছে,

"কি হইবে মিথ্যা আশীর্বাদে!

আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু।"

কখনও নেপথ্যে থাকিয়া, কখনও প্রকাশ্যে আসিয়া রাজা চন্দ্রসেনের সমস্ত কার্য পরিচালনা করিয়াছে এই নারী এবং আপন উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যস্বামী চন্দ্রসেনকে আপন ষড়যন্ত্রের অংশীদার করিয়া তুলিয়াছে। ব্যক্তিত্বহীন রাজা চন্দ্রসেন তাহার হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছেন।

সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া সশৈন্য কুমার ফিরিয়া আসিয়া পিতৃব্য চন্দ্রসেনকে রাজা বিক্রমকর্তৃক কাশ্মীর রাজ্য আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনার কথা জানাইয়া যুদ্ধসজ্জার কথা বলিলে, চন্দ্রসেন আসন্ন বিপদের হাত হইতে মুক্তির জন্য যুদ্ধ-সজ্জার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রানী রেবতী এই আশঙ্কাকে তাহার ষড়যন্ত্রকে সুফল করিবার কাজে লাগাইতে চাহে, তাই সে স্বামীকে বলিয়াছে,

"যুদ্ধসজ্জা? কেন যুদ্ধসজ্জা। শত্রু কোথা।

মিত্র আসিতেছে। সমাদরে ডেকে আনো

তারে। করুক সে অধিকার কাশ্মীরের

সিংহাসন।" ...কারণ তাহাতেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কিন্তু রাজা চন্দ্রসেন স্ত্রীর এই বক্তব্য গ্রহণে রাজী নহেন। কুটিল-মনা নারী তাহার পৌরুষহীন, বীর্যহীন, ব্যক্তিত্বহীন স্বামীর দুর্বলতার কথা জানে বলিয়াই এক কপট অভিমানে বলিয়া উঠে,

"আমিও পালিব তবে

কর্তব্য আপন। বিশ্বাস করিয়া রোধ

বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন।

রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে

রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের

বংশ? * * *

* * * আমি তারে
দিয়েছি জনম ; আমি তারে সিংহাসন
দিব—নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব
তারে…।" …স্ত্রীর এই ছদ্ম অভিমান রাজার

সকল সঙ্কল্প ভুলাইয়া দিল। বুদ্ধির বিচারে রাজা চন্দ্রসেন যে স্ত্রী রেবতীর নিকট 'শিশু'—রানী রেবতীর উক্তিতেই তাহা স্পষ্ট।

"শিশু তুমি। মনে কর আঘাত না ক'রে
আপনি ভাঙিবে বাধা ? পুরুষের মতো
যদি তুমি কার্যে দিতে হাত, আমি তবে
দয়া মায়া করিতাম ঘরে বসে বসে
অবসর বুঝে।" …সুতরাং অপরিমিত আত্মবিশ্বাস,

কুটিল বুদ্ধি ও বিষাক্ত হিংস্রতা লইয়াই সে রাজা বিক্রমদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কুমারকে বন্দী করিবার জন্য বলিয়াছে,

"প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে ; আগুন জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো
ছারখার। ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির।" …আপন হীন

উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য যে-কোন হিংস্র পন্থা অবলম্বন করিতে রানী প্রস্তুত। এক সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিই তাহার সমস্ত কার্যের নিয়ন্তা।

এই চরিত্রটি পরিকল্পনায় বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রের অমর নাটক 'ম্যাকবেথ'-এর কুটিল নারীচরিত্র লেডী ম্যাকবেথের ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তবে এইপ্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। একজন ইংরেজ সমালোচক 'ম্যাকবেথ' আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "The reader who looks unwillingly at Iago gazes at Lady Macbeth in awe, because though she is dreadful she is also sublime." কিন্তু রানী রেবতীর চরিত্র কোথাও 'sublime' নহে।

নারীচরিত্রে পাশ্চাত্য নাটকসুলভ হিংস্রতার পরিকল্পনা বাংলা নাটকে

একেবারে নূতন না হইলেও, রবীন্দ্রনাথের এই চরিত্রটি বিশেষত্বপূর্ণ। নাটকের অনতিপরিসর ক্ষেত্রে এই চরিত্রটি অঙ্কিত হইলেও পরিমিত ভাষণে, অপরিসীম আত্মবিশ্বাসে এবং সদা-অনাবৃত হিংস্র মনটির পরিপ্রকাশে—এই চরিত্রটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

• **জনতা :** ব্যক্তিগতভাবে বিচার করিলে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেই ব্যক্তি-মানুষ যখন সমষ্টিবদ্ধ হয় তখন নিজের বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু প্রকাশিত হইলেও একটি সাধারণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে—তাহাকে বলে 'জনতা'-চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' নাটকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে সার্থকভাবে মাত্র তিনটি দৃশ্যে এই জনতার চিত্র আঁকিয়াছেন।

জালন্ধর-রাজ বিক্রমদেবের প্রজারা চিরকাল রাজার অনুগত। সাধারণ সহজ জীবনে তাহারা শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলিতেই অভ্যস্ত। রাজনীতিতে তাহাদের কোন আকর্ষণ নাই। পেট ভরিয়া খাইয়া সহজ জীবন যাপন করিতেই তাহারা আগ্রহী। প্রচলিত প্রথায় তাহাদের অগাধ বিশ্বাস। লৌকিক স্বার্থ-বুদ্ধি দ্বারা তাহারা পরিচালিত।

কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা যখন তাহাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলে তখন তাহাদের শান্ত সরল জীবনে দেখা দেয় চাঞ্চল্য। রাজা বিক্রমদেব কামোন্মত্ত হইয়া রাজ্যের শাসন-পরিচালনায় অবহেলা করায় বিদেশী রাজাত্মীয়ের দল রাজ্যমধ্যে এমন এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে যাহাতে সাধারণ সরলপ্রাণ প্রজাবৃন্দ ঘর ছাড়িয়া পথে নামিতে বাধ্য হইয়াছে। তাই কিনু নাপিত, মনসুখ চাষা, কুঞ্জরলাল কামার, নন্দলাল, শ্রীহরি কলু, হরিদীন কুমোর সকলেই আপন আপন কাজকর্ম ছাড়িয়া ক্ষুধার অন্নসংস্থানের আশায় অত্যাচারী বিদেশীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে। 'চাষাভূষোর' দল আজ 'শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব' বলিয়া দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহাদের অনাড়ম্বর জীবন-যাপন আজ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই দেবদত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে, কিনু নাপিত বলিয়া উঠে, "তোমার কী ঠাকুর? তুমি তো রাজবাড়ীর সিধে খেয়ে খেয়ে ফুলছ—আমাদের পেটে নাড়ীগুলো জ্বলে জ্বলে ম'ল—আমরা কি বড়ো সুখে চেঁচাচ্ছি।"

ইহারা সহজে উত্তেজিত হয় না। ইহাদের চরিত্র তরল পদার্থের সহিত তুলনীয়। তরল পদার্থ যখন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে, জনতা-চরিত্রও সেইরূপ। একবার যে বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, শত যুক্তির দ্বারা বুঝাইলেও সহজে তাহার পরিবর্তন ঘটে না, আবার কখনও বা অতি সামান্য কারণে তাহার এমন পরিবর্তন ঘটে যাহা অভাবনীয়। এই অস্থিরমতিত্বই জনতা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

জালন্ধরের সাধারণ প্রজাবৃন্দ এক প্রচণ্ড বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইতে উন্মুখ হইয়া উঠিলে মনে হইয়াছে সমগ্র রাজ্য এক বিদ্রোহের লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া সব-কিছুকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে; এই বিধ্বংসী অগ্নির হাত হইতে রাজ্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু রাজসখা দেবদত্ত আসিয়া যখন তাহাদের নিকট অর্থহীন শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করিলেন, তখন এক নিমেষেই যেন সেই অগ্নিতে বারি নিক্ষিপ্ত হইল। এতক্ষণ যে প্রজার দল মহা উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িতেছিল তাহারাই একমুহূর্তে একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিয়া ব্রাহ্মণের বাক্যকে মাথা পাতিয়া লইতে উৎসুক হইয়া উঠিল এবং সকলে মিলিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, আমাদের মাপ করো, মাপ করো—" এবং রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। মিথ্যা আত্মগৌরব, অনুচিত আত্মপ্রসাদ লাভ করাই ইহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অক্ষম আস্ফালনে উন্মত্ত হওয়াই ইহাদের স্বভাব-ধর্ম।

ইহাদের মধ্যে মূর্খতা আছে, দীনতা আছে। ইহারা স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই অনেক কার্য সমাধা করিয়া থাকে কিন্তু অনেক অনৈক্যের মধ্যেও একটি ঐক্যবন্ধনে ইহারা আবদ্ধ। ইহারা সরল। ইহাদের সরল ধর্মবিশ্বাস সরলতা-নির্ভর। সরল বলিয়াই কূটবুদ্ধি ব্যক্তিদের দ্বারা ইহারা প্রতারিত ও প্রভাবিত হয়। তাই ব্রাহ্মণতনয় দেবদত্ত সহজেই ভুল শাস্ত্রব্যাখ্যার দ্বারা তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার অন্যদিকে ভিন্ন চিত্রও দুর্লভ নয়। কাশ্মীরের সাধারণ প্রজার দল তাহাদের সরল মনের আন্তরিকতা লইয়াই রাজকুমার কুমারসেনকে রক্ষা করিবার কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। শত অত্যাচারেও তাহাদের নিকট হইতে রাজা বিক্রম তাঁহার শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহা তাহাদের অন্তরের গভীর প্রীতিরই পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ এই জনতা-চিত্রের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করিয়া নাট্যকার হিসাবে গভীর বাস্তববোধের পরিচয় দিয়াছেন।

॥ 'রাজা ও রানী'র রূপান্তর ঃ তপতী ॥

বৈচিত্র্য-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্তী জীবনে পূর্বতন অনেক কই প্রশংসা করিতে পারেন নাই—'রাজা ও রানী' নাটককেও নহে। কবি নিজেই প্রায় ৪০ বৎসর পর লিখিত 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "অনেকদিন ধরে 'রাজা ও রানী'র ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে।" কবি-নাট্যকার এই পীড়ার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই রচনাটিকে পরিবর্তিত করিতে বসেন, কিন্তু লিখিবার সময় অন্তরে প্রেরণার অভাব বোধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "১২ই জুলাই শান্তিনিকেতন হইতে রানী দেবীকে লিখিতেছেন (২৮ আষাঢ় ১৩৩৬), 'ঘোর বর্ষা নেমেছে। এমনতরো বাদলে আমার মনের শিখরদেশে প্রায়ই সুরের মেঘ ঘনিয়ে আসে···কিন্তু এবারে কী হল, এখনো আষাঢ়ের আহ্বানে আমার অন্তর সাড়া দিল না। হয়তো ছবি আঁকতে যদি বসি তা'হলে কলম সরবে কিন্তু কাব্যভাবনার স্পর্শে তাকে চঞ্চল করতে পারছে না।" মনের এইরূপ অবস্থাতেই নূতন রচনা সহজসাধ্য হয় না ; পুরাতনকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়াই বোধহয় এই সময়ে সহজ হইয়া উঠে। ইহা ব্যতীত 'তপতী' নাটক লিখিবার আরও একটি কারণ ছিল। ঠাকুর পরিবারে গগনেন্দ্রনাথ তখন 'রাজা ও রানী' অভিনয়ের আয়োজন করিতেছিলেন। 'রাজা ও রানী'র লিরিক্ধর্মিতা কবির মনে এই নাটকের অভিনয়-উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ সঞ্চারিত করিয়াছিল। তিনি তাই ইহাকে নূতন করিয়া গড়িতে প্রয়াসী হন। নূতন রূপে প্রকাশিত নাটকটির নাম হইল—'ভৈরবের বলি'। কিন্তু এই নবসৃষ্টিও কবিকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। তিনি এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম, এ নাটক আগাগোড়া নূতন করে না লিখলে এর সদ্গতি হতে পারে না।" ইহারই ফলে প্রায় ৪০ বৎসর পরে লিখিত হয় 'তপতী'। আদ্যোপান্ত গদ্যে লিখিত এই নাটকটির ভূমিকায় নাট্যকার

লিখিয়াছেন, "এই নূতন নাটকখানি লিখে এই বইটার (রাজা ও রানী) সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শোধ করেছি।" কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, কবির এই 'দায়িত্ব-শোধ' কতখানি সার্থক হইয়াছে।

'রাজা ও রানী'র সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিরোধ ছিল, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট; নাট্যকার 'তপতী' নাটকে সেই বিরোধের ভাবটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এই বিরোধের বাহ্য কারণ নির্দেশ করিয়া নাট্যকার দেখাইলেন, সুমিত্রাকে বিক্রম জোর করিয়া তাঁহার পিতৃরাজ্য হইতে ধরিয়া আনিয়াছেন বলিয়াই যেন তাঁহাদের মিলনের মধ্যে একটা বিরোধ ছিল। অর্থাৎ রাজা ও রানীতে যে বিরোধ ছিল একমাত্র অন্তরের, এখানে এই বাহিরের বিরোধের উপর অন্তরের বিরোধকে আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। এই নাটকে আর একটি ত্রুটিও দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রাজা ও রানীতে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বিক্রমের অভিযানের কারণ সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু এই নাটকে পলাতক সুমিত্রাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিবার জন্যই বিক্রমের অভিযানের বর্ণনা করা হইয়াছে।

'রাজা ও রানী' নাটকে ইলা ও কুমারের কাহিনীকে নাট্যকার 'উপসর্গ' বলিয়াছেন এবং এই উপসর্গ দূর করিবার জন্যই 'তপতী' নাটকে তাহা পরিত্যক্ত হইয়া 'নরেশ' ও 'বিপাশা'র কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে। মূল নাট্যকাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর যোগ হয়তো একটু নিবিড় হইয়াছে এবং ইহা মূল কাহিনীর প্রাধান্যও খর্ব করে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা 'রাজা ও রানী' নাটকের ইলা ও কুমারের উপকাহিনীরই মতো উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ 'রাজা ও রানী' নাটকের যে লিরিক্-ধর্মিতা কবিকে রূপ-পরিবর্তনে আগ্রহী করিয়া তুলিয়াছিল এই নাটকে 'নরেশ' ও 'বিপাশা'র ঘর-ছাড়া পথচারী জীবনের কথায় ও গানে সেই লিরিক্-ধর্মিতার প্লাবন দেখা দিয়াছে।

'রাজা ও রানী' নাটকের কয়েকটি গৌণ চরিত্র যেরূপ সজীব ও সংঘাত-শীল ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছিল, 'তপতী'তে সেই চরিত্রগুলিরই বৈশিষ্ট্য অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে।

'রাজা ও রানী' নাটকে যদি হৃদয়ের আতিশয্য বিসদৃশ হইয়া থাকে, তবে 'তপতী' নাটকে বক্তৃতার প্রাচুর্য বিগর্হিত হইয়াছে।

'রাজা ও রানী' কিংবা 'তপতী'র ভাষা প্রকৃত নাট্যোপযোগী না হইলেও একথা সত্য যে 'রাজা ও রানী'র ভাষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক। অবশ্য 'রাজা ও রানী'র ভাষা একমাত্র 'চিত্রাঙ্গদা' ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের যে-কোন নাট্য কাব্য এমনকি 'বিসর্জন' হইতেও উৎকৃষ্ট। 'তপতী'র ভাষা গদ্য হিসাবেও দুর্বল, প্রকাশভঙ্গির প্রত্যক্ষতা প্রায় সর্বত্রই ইহার ক্ষুণ্ন হইয়াছে বলিয়া ইহা গদ্য হইয়াও কাব্যধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। এই গদ্য অপেক্ষা কাব্যের আকর্ষণীয় গুণ অধিক।

'তপতী' নাটকে একমাত্র রানী সুমিত্রার চরিত্রাঙ্কনে উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। কারণ এই নাটকের নায়িকা সুমিত্রার চরিত্র ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া এক ত্যাগসিদ্ধ অগ্নিতপ্ত মহিমা লাভ করিয়াছে।

সুতরাং একথা বলা অসঙ্গত নহে যে, নায়িকা সুমিত্রার চরিত্রের উন্নতি সাধন করিয়া এবং অঙ্কবিভাগ বর্জন করিয়া 'রাজা ও রানী' নাটক অপেক্ষা 'তপতী' নাটকে কিছু উন্নতি সাধিত হইলেও, অন্যান্য দিকের বিচারে 'রাজা ও রানী' উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি।

॥ মন্তব্য-সংগ্রহ ॥

সাহিত্য বিচার করিতে বসিয়া কোন সমালোচকই শেষ কথা উচ্চারণ করেন নাই, করা সম্ভবও নহে। সাহিত্য-বিচারে তাই নানা সমালোচক নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। চিন্তার স্বাধীনতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্যই সাহিত্য-বিচারে বিভিন্নতা দেখা দেয়। সুতরাং সামগ্রিক রসবোধের ক্ষেত্রে এই ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্যগুলির মূল্য অনস্বীকার্য, তাই আমরা কয়েকজন প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচকের মন্তব্য সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

॥ ১ ॥

মানসী কবিতা-গুচ্ছের একটিমাত্র কবিতা 'প্রকাশ বেদনা' (৬ই বৈশাখ, ১২৯৬) তথায় রচিত। এই কবিতাটির মধ্যে যে অস্ফুট হৃদয়বেদনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যেন 'রাজা ও রানী'র অন্তর্গত লিরিক্-ধর্মী রূপটিরই কথা, এ যেন বিক্রমদেবের অন্তরের অনন্ত প্রেমতৃষ্ণার ভাষা।

"আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে ক্রন্দনহারা দুখে—
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন ধ্বনিয়া উঠে না বুকে ?…" এই তীব্র আকাঙ্ক্ষারই একটি রূপ বিক্রমের মধ্যে ফুটিয়াছে। 'রাজা ও রানী' রচনা শেষ করিয়া খিড়কিতে যখন বাস করিতেছিলেন তখনও দেখি দুঃখবাদ কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ; যে অকারণ বেদনা রাজা বিক্রমদেবকে, যে দুর্জয় অভিমান সুমিত্রাকে, যে ব্যর্থ প্রেম কুমার ও ইলাকে শান্তিদান করিতে পারে নাই, সেই মায়া ও মরীচিকা দুঃখের রূপ 'মায়া' কবিতায় ভাষা পাইয়াছে।

বৃথা এ বিড়ম্বনা !
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ,
কেন এত যন্ত্রণা !
ছায়ার মত ভেসে চলে যায়,
দরশন পরশন—
এই যদি পাই এই ভুলে যাই
তৃপ্তি না মানে মন !

এত সুখ দুখ তীব্র কামনা
জাগরণ হাহুতাশ
যে রূপ জ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে
কোথা তার ইতিহাস ?

মায়ার বিষাদ সুর বিক্রমের উক্তিতে 'রাজা ও রানী'র মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। 'হায় প্রিয়ে, আজ কেন মনে হয় সে সুখের দিন।' অপর দুটি কবিতার মধ্যেও এই হতাশ ভাবের প্রতিধ্বনি বর্ষার দিনের বিরহী চঞ্চল মনের ব্যথায় নিবিড়। মানসী কাব্যের শুরুতে যে বিষাদ সুর আরম্ভ হয়, তাহা এখানে সমে আসিয়া স্তব্ধ হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

'রাজা ও রানী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক বলা যাইতে পারে; ইতিপূর্বে যাহা নাটকাকারে লিখিয়াছেন, তাহাকে যথার্থ নাটক আখ্যা দান করা

যায় না। বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা—গীতিনাট্য ; নলিনী অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটক। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-কে নাটক বলা চলে না। উহা নাট্যকারের প্রথম পরীক্ষা, উহাতে তত্ত্ব আছে, নাট্যিক বিষয় কমই। 'রাজা ও রানী'তে হৃদয়াবেগ প্রবল হইলেও কল্পনার ক্ষেত্র বেশ প্রশস্তই, আখ্যানাংশে বিষয়বস্তু প্রচুর ও ঘটনাবৈচিত্র্য যথেষ্ট, বরং একখানি নাটকের পক্ষে বিষয়বস্তু বেশী বলিয়া মনে হয়। ইহাতে সৃষ্টিস্থাপত্য দৃঢ়তর হইয়াছে। সংসারের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আভাস পাই।

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

'রাজা ও রানী' (২৫শে শ্রাবণ, ১২৯৬) পঞ্চাঙ্ক ট্রাজিক নাটক। অধিকাংশই পদ্যে। গদ্যাংশ অল্প ; ইহা শুধু নাট্য-কাহিনীতে সরসতার সঞ্চার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হইয়াছে। হৃদয়ের ধনকে দেহের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিবার নিষ্ফল কামনা 'রাজা ও রানী'র ট্রাজেডি ; মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় নাটকটির বীজ নিহিত আছে। নায়ক বিক্রমদেবের অবুঝ প্রেমাবেগ আত্মপর নিপীড়নের কারণ হইয়াছে। সুমিত্রার প্রেম শান্ত, সংযত, কর্তব্যপরায়ণ।

* * * *

স্বামীর কর্তব্যের ত্রুটি সংশোধনের ভার নিজহাতে লইয়া সুমিত্রা ট্রাজেডির জট ভালো করিয়া পাকাইয়া দিল। স্বামীগৃহ পরিত্যাগ না করিলে বিক্রমের মোহজাল দূর হইবে না ভাবিয়া রানী পিতৃগৃহের উদ্দেশে চলিল। বিক্রমের ঘোর ভাঙিল বটে কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইল গুরুতর। প্রেমের উচ্ছ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া হিংসার তাণ্ডবে পরিণত হইল।

* * * *

উপসংহার একটু চমকপ্রদ হইলেও 'রাজা ও রানী'র প্লটের নাটকীয়তা অসামান্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনা ও পরিণতি নাট্যোচিত এবং সুসঙ্গত। প্রধান চরিত্রগুলি পরিস্ফুট। রাজা ও রানী বাঙলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ নাটক।—ডঃ সুকুমার সেন

[illegible]

রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন' এই দুইখানিই সেক্স্পীয়রীয় রীতিতে রচিত খাঁটি রোমান্টিক নাটক। এই দুইখানি নাটকের মধ্যেই পাঁচটি অঙ্ক এবং প্রতিটি অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যবৈচিত্র্য রহিয়াছে। 'রাজা ও রানী'র মধ্যে বিক্রম-সুমিত্রার কাহিনীর সহিত কুমার-ইলার উপকাহিনীটি অত্যন্ত সার্থকভাবে মিলিত হইয়াছে এবং 'বিসর্জনে' গোবিন্দমাণিক্য-গুণবতীর কাহিনীর সহিত রঘুপতি-জয়সিংহের কাহিনীটি সুকৌশলে যুক্ত হইয়াছে। ঘটনার তীব্র গতি, হৃদয়াবেগের প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত এবং হৃদয়বিদারী ট্রাজিক বেদনার অভিব্যক্তিতে এই দুইখানি রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এই দুইখানি নাটকের মধ্যে কাব্য আছে, গদ্যকথা আছে, গান আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে নাটকীয়তা। ইউরোপীয় রীতিতে বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জার পরিপূর্ণ সুযোগ নেওয়া হইয়াছে ইহাদের মধ্যে এবং তখন রবীন্দ্রনাথ যে প্রবল ভাবাবেগপূর্ণ অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যেন চরিত্রগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে। —ডঃ অজিত ঘোষ

॥ ৫ ॥

'রাজা ও রানী'ই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম পূর্ণাবয়ব নাটক। ইহার ঘটনা-বিকাশ ও চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে নাট্যিক প্রতিভার যে সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার ইতিপূর্বে রচিত আর কোন নাটকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এই নাটকের রচনায় যদিও অপরিণত প্রতিভার ও প্রথম প্রয়াসের কতকগুলি ত্রুটি বর্তমান, তথাপি ইহার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম নাটকের নিতান্ত গীতিধর্মী বৈচিত্র্যহীন উপকরণের পরিবর্তে নাট্যিক উপাদানের সন্ধান লাভ করিলেন।

—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

॥ ৬ ॥

নাটকখানির মধ্যে এইরূপ বিভিন্ন ঘটনাধারা থাকিলেও বহির্ঘটনার দ্বন্দ্ব অপেক্ষা ভাবের দ্বন্দ্ব দেখানোই নাটকখানির উদ্দেশ্য, একদেশদর্শী কর্তব্য-বিরহিত প্রেমের ব্যর্থতা প্রদর্শনই নাটকখানির মূলকথা।

'রাজা ও রানী'তে সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে একটি বিরোধ। সে বিরোধ প্রেমের আদর্শ-সম্পর্কিত বিরোধ।

রাজা বিক্রমদেব তাঁহার মানসী প্রেমমূর্তিকে দেহের মধ্যে খুঁজিয়াছেন। ভোগে নিমজ্জনস্পৃহা তাঁহার প্রবল, দেহসৌন্দর্যই তাঁহাকে মুগ্ধ আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে—তাঁহার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রবল আসক্তির বশবর্তী হইয়া তিনি সুমিত্রাকে পাইতে চাহিয়াছেন। রূপমোহ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। রাজা বিক্রমের প্রেমে ছিল ভোগাকাঙ্ক্ষা, সুমিত্রার প্রেমে ছিল ত্যাগের সাধনা। একজনের অন্তর আসক্তির তৃষ্ণায় উদ্দাম, অন্যজনের চিত্ত ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। রাজা চাহিয়াছেন সুধাময়ী রমণীকে—মহিষীকে নয়। রানী চাহিয়াছেন রূপমোহগ্রস্ত কর্তব্যবিরহিত পুরুষকে নয়, রাজ্যেশ্বর রাজাকে। এইখানে উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে মিলনের অন্তরায়, উভয়ের মধ্যে জাগিয়াছে বিরোধ। চিত্তের অসীম দূরত্বের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব। বিক্রমের প্রেম ঐহিক, তাঁহার প্রেম আসক্তিমূলক। তাহা যেমন সকাম, তেমনি প্রচণ্ড। কিন্তু সুমিত্রার জীবনাদর্শ, তাঁহার প্রেম ভিন্নরূপ। এ প্রেম অতীন্দ্রিয়। সে প্রেম ভোগস্পৃহা-বর্জিত। তাহাতে আসক্তি নাই, আছে আহুতি। সুমিত্রা কল্যাণী। যে প্রেম আপনার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সহস্রের মধ্যে বিকিরিত হইতে চাহে, সুমিত্রার প্রেম সেই শ্রেণীর। তাঁহার প্রেম আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল, সে প্রেম যেমন গভীর, তেমনই শান্ত কিন্তু বিক্রমের প্রেমে ছিল আত্মবিস্মৃতি। তাঁহার আত্মসর্বস্ব প্রেম সুমিত্রাকে পাইবার প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল। বিক্রমের কামনা তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত পদ্মটিকে দূরে সরাইয়া দিয়াছিল। মোহাবিষ্ট বিক্রমদেব দেহভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রেমের চরিতার্থতা খুঁজিয়াছিলেন। ইহারই পরিণতি হইয়াছিল ট্রাজেডি। হৃদয়ের ধনকে দেহের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার নিষ্ফল কামনাই 'রাজা ও রানী'র ট্রাজেডি।

—কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ৭ ॥

....'রাজা ও রানী'তে দ্বন্দ্ব প্রেমের দুই রূপের মধ্যে—বাসনাপ্রমত্ত সঙ্কীর্ণ অন্ধ প্রেমের সঙ্গে কল্যাণধর্মী সর্বব্যাপী মুক্ত প্রেমের দ্বন্দ্ব নাটকটিতে মুখর।

রাজা বিক্রমদেবের প্রেম সুমিত্রাকে একান্ত নিজের মধ্যে [illegible] করে—রাজ্যের প্রজার কর্ত-ব্যের থেকে তাঁকে সরিয়ে এনে, প্রজাদের কল্যাণকামনাকে উপেক্ষা করে। কিন্তু রাণী সুমিত্রা তাঁর পতিপ্রেমকে ব্যক্তিগত ভোগের সীমায় বাঁধতে চাননি—প্রজার কল্যাণকামনার ভেতর দিয়ে নিজের প্রেমকে করতে চেয়েছেন বৃহৎ ও মহৎ। সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধান। বিক্রমের মধ্যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শক্তির মধ্যে সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো।

—জীবেন্দ্র সিংহরায়

'অন্ত্যপর্ব

॥ প্রশ্নোত্তর ও ব্যাখ্যা ॥

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ "সিরিয়স [illegible] করেছে হল। এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত।" 'রাজা ও রানী' নাটকের ভূমিকায় উপকাহিনী সম্পর্কে স্বয়ং নাট্যকারের এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

উত্তর ॥ উপন্যাস কিংবা নাটকরচনার ক্ষেত্রে মূল কাহিনীর সহিত উপ-কাহিনী সংযোজন করার রীতি বহুপ্রচলিত। এই রীতিটি সম্পর্কে আলোচনারও অন্ত নাই। গ্রীক নাট্যশাস্ত্রকার অ্যারিস্টটল্ নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ঐক্যের হানি ঘটায় বলিয়া উপকাহিনীর উপযোগিতাকে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই মত যে সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রমাণ অসংখ্য কারণ বহু সাহিত্যস্রষ্টাই ভিন্নদৃষ্টিতে দেখিয়া অনেক ক্ষেত্রেই উপকাহিনীর উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অনেক ক্ষেত্রেই উপকাহিনী সংযোজিত হইয়া কখনও মূল কাহিনীর ভাবরসের সহিত যুক্ত হইয়া আস্বাদনে বৈচিত্র্য আনে, কোথাও মূল কাহিনীর সহিত জীবনজিজ্ঞাসাগত একটি তুলনার অবকাশ সৃষ্টি করে; কোথাও পারিবারিক জীবনযাত্রার উপর ইতিহাসের ছায়া বিস্মৃতি ঘটায়; কোথাও বা ইতিহাসের ঘটনারাশি হৃদয়শোণিত রক্তাক্ত করিয়া তোলে। সুতরাং নাটকে উপকাহিনীর সংযোজনা রীতিবিরুদ্ধ নহে, অবশ্য, তাহা যদি মূল কাহিনীর গতিকে ব্যাহত না করে।

'রাজা ও রানী' নাটকের ক্ষেত্রে রাজা বিক্রমদেব ও রানী সুমিত্রাকে কেন্দ্র করিয়া যে মূল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই পাশাপাশি আমরা কুমার ও ইলার কাহিনী গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছি। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র নাটকের মধ্যে এই কাহিনীকে অনেকখানি স্থান করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তিনিই আবার ভূমিকা লিখিবার সময় ভিন্নদৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই কাহিনীকে 'উপসর্গ' এবং "অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এখন প্রশ্ন, নাট্যকারের এই বক্তব্য কতখানি

গ্রহণীয়। এই জাতীয় বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে দেখা প্রয়োজন—উপকাহিনী মূল কাহিনীর সহিত ঘটনাগত ও ভাবগত যোগসূত্রের দ্বারা আবদ্ধ কিনা।

'রাজা ও রানী' নাটকের নাট্যদ্বন্দ্ব বহিরঙ্গে নহে, অন্তরঙ্গে। কামনার্ত রাজা বিক্রমকে পরিত্যাগ করিয়া রানী সুমিত্রা তাঁহার মঙ্গলকামনায় কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতা কুমারসেনের সাহায্য কামনা করিয়াছেন। রানীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া রাজা উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার 'দুর্দান্ত প্রেম' প্রতিহত হইয়া 'দুর্দান্তহিংস্রতায়' পরিণত হইয়াছে। তাঁহার 'আত্মঘাতী প্রেম' হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বঘাতী। আহত অন্তরে রাজা বলিয়া উঠিয়াছেন—

"পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল ;
রাজ্য যায়—অবশেষে সেও চলে গেল।
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর ;
রাজধর্ম ফিরে দাও ;"

প্রশ্ন ॥২॥ "রাজা ও রানী নাটকে ইলা এবং কুমারসেন অংশটিকে কি 'অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসঙ্গত' বলিয়া মনে হয় অথবা এই পার্শ্ব-কাহিনীটির বিশিষ্ট নাটকীয় তাৎপর্য বিদ্যমান? তোমার অভিমত উপস্থিত কর। (ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৭)

উত্তর ॥ রানী সুমিত্রা শত চেষ্টা করিয়াও রাজাকে কর্তব্য সচেতন করিয়া তুলিতে পারেন নাই। অবশেষে পতিসত্য পালনের জন্য সুমিত্রা জালন্ধর রাজ্য ত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে ভ্রাতা কুমারসেনের নিকট আসিলেন। রাজার কর্তব্যে অবহেলায় সুযোগ লইয়া যে অমাত্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে তাহাদের দমন করিবার জন্য কুমারসেনের সাহায্য চাহিলেন। কুমারসেন ও তাহার সৈন্যদলের সাহায্যে পলাতক বিদ্রোহীরা বন্দী হইয়াছে। বিক্রমদেব সুমিত্রার সাহায্যকারী, ইলার প্রণয়ী, কুমারসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অতএব যে দ্বন্দ্ব রাজ-অন্তঃপুরে আবদ্ধ ছিল, তাহা বহিরঙ্গে দুই প্রতিকূল শক্তির দ্বন্দ্বে পরিণত হইল। কুমারসেন না আসিলে এই বহিরঙ্গের দ্বন্দ্ব নাটকীয় তীব্রতা লাভ করিতে পারিত না। এই কুমারের জন্যই ইলার প্রসঙ্গ আসিয়াছে।

ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সুমিত্রার মধ্যদিয়া যে প্রেমাদর্শের চিত্র জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন তাহাকে আরও গভীরতর করিয়া তুলিবার জন্য বিক্রমের প্রেমাদর্শের বিপরীত আর একটি পটভূমিকার নাট্যগত প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনের জন্যই কুমার ও ইলার আদর্শ প্রেমের কাহিনী এই উপকাহিনীর প্রসঙ্গে আসিয়াছে। সুমিত্রার প্রতিহত প্রেমে বিক্রমদেবের প্রচণ্ড হিংসার আগুন যখন কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তখন ইলার গভীর প্রেমাকুতি বিক্রমদেবকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম করিয়াছে। তাঁহাকে প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছে। ইলার এই প্রেম ভোগবাসনা প্রমত্ত নহে, ত্যাগে পূত এবং আত্মবিসর্জনে সিদ্ধ। এই প্রেম মরণের পথে জীবনকে জয়টিকা পরাইয়া দেয়। অতএব নায়কের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য এবং তাহার শোচনীয় ট্র্যাজেডিকে তীব্রতর করিয়া তুলিবার জন্য কুমার-ইলার উপকাহিনীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাহা ছাড়া দুই কাহিনীর মধ্যে ভাব ও চরিত্রগত বৈপরীত্য দ্বারা নাটকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একজন নাট্য সমালোচকের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে : "রাজা ও রানী" নাটকের যে ভাবকল্প তাতে কুমারসেন-ইলার কাহিনীকে একেবারে অনাবশ্যক বলা চলে না। ইলার ঐকান্তিক প্রেমের সঙ্গে প্রেমস্বর্গচ্যুত হিংসোন্মত্ত রাজার সংঘর্ষ নাটকের বর্তমান উপসংহারের জন্য আবশ্যক কিনা অবশ্যই বিচার করে দেখা দরকার। আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার—ইলা বা কুমারসেনের উক্তির মধ্যে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে, পরিস্থিতির সঙ্গে তার বিশেষ আপত্তিকর অসঙ্গতি ঘটেনি। তারপর ভাবগত সঙ্গতির দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, রাজা যে রানীর সঙ্গে দেখা করেননি বা কুমারসেনের মাথা নত করার জন্যে তার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন, এগুলি একেবারে অমনস্ত[illegible] নয়। আগেই বলেছি, রাজা সব বিষয়েই অসাধারণ ঐকা[illegible] যেমন অনুরাগে ঐকান্তিক, তেমনি বিরাগেও ঐকান্তিক। বড় [illegible] তাঁর কাম-মোহ, তত প্রচণ্ড তাঁর অভিমানক্ষুব্ধ অহমিকার উৎক্ষেপ [illegible]।"

তবে এই নাটকে কুমার ও ইলার প্রসঙ্গটি যে অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য হইতে

পঞ্চম অঙ্কের সর্বশেষদৃশ্য পর্যন্ত ইহার ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়াছে। নাটকের এই বিরাট অংশে কুমারসেন যে বিক্রমদেব হইতেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—তাহা নিশ্চয় সংগত হয় নাই। তৃতীয় অঙ্কের পর হইতেই কাহিনীটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে মূল কাহিনীর প্রাধান্য খর্ব হইয়াছে। আর কুমারসেনের বিরুদ্ধে বিক্রমদেবের বিরোধিতার সুস্পষ্ট কোন কারণও দেখানো হয় নাই। রাজা বিক্রমদেব কেবলমাত্র নিজের মহাশূন্যতাকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য অকারণে কার্যস্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। নাট্যবিরোধের দিক হইতে এই অজুহাতটি দুর্বল, বরং রেবতী চন্দ্রসেনের কুমার বিরোধিতা করিবার সুস্পষ্ট কারণ রহিয়াছে। নাটকের শেষ দিকে বিক্রমদেব, রেবতী, চন্দ্রসেন এবং অমরুরাজের নিষ্ঠুর প্রতিকূলতা এবং ইলা ও কাশ্মীরী প্রজাগণের ঐকান্তিক প্রীতি কুমারসেনের চরিত্রকে যথার্থ মাহাত্ম্য দান করিয়াছে।

রাজা বিক্রমদেবের বিরোধী চরিত্ররূপে আর কোন চরিত্র না থাকায় কুমারসেন এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নাটকের প্রথম দিকে সুমিত্রাকেই আমরা বিক্রমদেবের বিপরীত চরিত্ররূপে দেখিতে পাই। তাঁহার প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং প্রচণ্ড তেজস্বিতা নাট্যদ্বন্দ্বে প্রথম বহিরঙ্গ রূপ লাভ করিয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের পর হইতে সুমিত্রা কুমারসেনের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন। এমন কি শেষ দিকে জালন্ধর ত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য সুমিত্রার মধ্যে অনুশোচনা দেখা দিয়াছে। সুমিত্রা রেবতীকে রাজকার্যে হস্তক্ষেপ না করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

অতএব রাজা ও রানী নাটকে ইলা ও কুমারসেনের উপকাহিনীটি অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসঙ্গত বলিয়া অভিহিত করা সঠিক বিচারসম্মত হইবে না। ভাবগত সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কাহিনীর নাটকীয় তাৎপর্য বিদ্যমান বলিয়া ইহাকে সঙ্গত বলাই সমীচিন হইবে।

ইহা সত্ত্বেও আর একটি দিক আলোচনা না করিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কুমার ও ইলার কাহিনী এইনাটকে লিরিকের সৃষ্টি করিয়াছে। লিরিক্ বা গীতিধর্মিতা নাটকের পক্ষে তখনই ক্ষতিকর যখন তাহা প্রাচুর্য সৃষ্টি করে। এই উপকাহিনী শুধুমাত্র গীতিপ্রাচুর্যই সৃষ্টি করে নাই, মূল কাহিনীকে অপ্রধান করিয়া দিয়া নিজেই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই

নাট্যকার মন্তব্য করিয়াছেন, 'কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অঙ্কে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত।' এবং কুমারের জীবনের অতিনাট্যিক পরিণতিও তাই আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম হইয়া উঠিতে পারে নাই। এইখানেই উপকাহিনী 'উপসর্গ' হইয়া দেখা দিয়াছে। তবে একথা সত্য, কবি এই ত্রুটি সংশোধন করিতে বসিয়া 'তপতী' নাটক রচনা করিলেও 'নরেশ ও বিপাশা'র কাহিনী সেখানে 'কুমার ও ইলা'র কাহিনীর মতোই উপসর্গ হইয়া দেখা দিয়াছে।

প্রশ্ন॥ ৩॥ 'রাজা ও রানী' নাটকের দ্বন্দ্ব কোথায়—মূল কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া তাহা পরিস্ফুট কর।

উত্তর॥ সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তহীন বিচিত্রতা। এই বিচিত্র অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নাটক আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই অন্যান্য শিল্প-রীতি হইতে নাট্যশিল্প সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে যে কারণে নাটক শিল্প-রীতিরূপে স্বতন্ত্র, সেইগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব (conflict) প্রধান। দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ। অধ্যাপক নিকলে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "Conflict is a prime force in all drama……" এই দ্বন্দ্ব কখনও কখনও বহির্দ্বন্দ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ধরনের নাটক রচনা করিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নানা সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেও, অনেকেই রবীন্দ্র-নাট্যরচনার প্রধান দিকটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 'ঘটনার সংঘাত নয় আদর্শের সংঘাত এবং ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বই রবীন্দ্র-নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নাটকে দ্বন্দ্বের ভিত্তি যতটা মনোজগতে, ততটা বহির্জগতে নহে। সুতরাং, এই বক্তব্যের আলোকে আমরা 'রাজা ও রানী' নাটকের দ্বন্দ্বটি কোথায়—তাহা বিচার করিয়া দেখিতে পারি।

'রাজা ও রানী' নাটকের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব রাজা বিক্রমদেব ও রানী সুমিত্রাকে লইয়া। এই বিরোধের একদিকে রাজা বিক্রম ও অন্যদিকে রানী সুমিত্রা। নাটকটির নামকরণ এই সত্যের প্রতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে এবং নাটকের প্রথম দৃশ্যেই রাজা বিক্রমদেব ও বাল্যসখা দেবদত্তের সংলাপে এই বিরোধের আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই সংলাপ হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, (রাজা বিক্রম রানী সুমিত্রার হৃদয়-রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রেমে অবিশ্বাস করিতেও চাহেন নাই। কারণ ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেমই অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। রাজা এইরূপ প্রেমের প্রত্যাশী নহেন। মনে হয় মহৎ হৃদয়ের বিরাট ব্যাপ্তির দ্বারা তিনি রানী সুমিত্রাকে স্পর্শ করিতে আগ্রহী। সুতরাং রাজা যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে কোন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অবকাশ নাই।) কিন্তু এই বিরোধের চিত্রটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে তৃতীয় দৃশ্যে। বিক্রমদেব বলেন,

("রাজা রানী! কে রাজা? কে রানী?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।"

রাজা বিক্রমের এই উক্তি রানীকে লজ্জারুণ করিয়া তোলে। তিনি বলেন,

"শুনিয়া লজ্জায় মরি। ছি ছি মহারাজ
একি ভালোবাসা?"

এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া যখন রাজা বিক্রম পুনরায় প্রশ্ন করেন 'চাহ না আমার প্রেম?' তখন রানীর উত্তর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

"কিছু চাহি নাথ,
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।"

রাজা বিক্রম রানীর এই উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই এবং এই অপ্রত্যাশিত উত্তরের মধ্যে নারীহৃদয়ের যে রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়া ব্যথিতচিত্তে বলিয়া উঠিয়াছেন, 'আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে।'

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কর্ম হইতে দূরে সরিয়া গিয়া রাজার অন্তর প্রেম হইতে সুখ আহরণ করিতে আগ্রহী ছিল বলিয়াই প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার

করিতে সমর্থ হয় নাই। কর্মের জগৎ হইতে রাজাকে বিদায় করিতে দেখিয়া রানীর অন্তর বেদনার্ত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ তিনি তো শুধু রাজার প্রেয়সীই নহেন, অসংখ্য প্রজার জননীও। সকলের কল্যাণের জন্যই তিনি রাজাকে কর্মের জগতে টানিয়া আনিতে চাহেন।

রানী সুমিত্রার প্রতি প্রচণ্ড আসক্তিই রাজা বিক্রমকে কর্মের জগৎ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি কেবল প্রেমের বিলাসই দেখিয়াছেন, বুঝিতে পারেন নাই যে মহৎ প্রেম মানুষকে মহৎ কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করে। ভোগের মধ্যে প্রেমের সার্থক পরিচয় নিহিত নাই। প্রকৃত প্রেম ত্যাগ ও বিসর্জনের দ্বারা সার্থক। কামনা জয় করিয়াই প্রেমের প্রতিষ্ঠা। অসংযত কামনার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র প্রেমের বিকৃত রূপের পরিচয় প্রকাশ পায়। রাজা বিক্রম এই কামনার মোহান্ধকারের কারা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার প্রেম একটি স্থানেই জড়াইয়া রহিল। ইহা প্রেম নহে—কাম। • কামনার রূপ অতি বীভৎস—যখন একান্ত আসক্তির মাধ্যমে ইহার প্রকাশ, তখন যেমন ইহার পরিচয় নির্লজ্জ স্বার্থপরতার দ্বারা সঙ্কীর্ণ, তেমনই যখন ইহার অসংযত বৃত্তি হিংস্রতার মধ্যে দুর্বার ও দুর্নিবার হইয়া উঠে, তখনও ইহার রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইহাই রাজা বিক্রমের মোহগ্রস্ত প্রেমের স্বরূপ। কিন্তু রানী সুমিত্রার প্রেমই যথার্থ প্রেম। কারণ তাঁহার প্রেম কোন সময়েই রাজাকে আবদ্ধ করিতে কিংবা ছোট করিতে চাহে নাই। সেজন্য তিনি স্বামী বিক্রমকে বলিয়াছেন,

> "নিতান্ত তোমারি আমি
> সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
> গৃহকাজে, জেনো নাথ, তোমারি সে গৃহ,
> তোমারি সে কাজ।"

সুতরাং কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্বই এই নাটকের দ্বন্দ্ব। কামের সহিত বিজড়িত আত্মবোধ—অহং। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছাই তো কাম।" এই আত্মবোধ ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণতামুক্ত হইয়া উচ্চ ভাবযুক্ত হইয়া প্রকৃত প্রেমে পরিণতি লাভ করে। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম, সেখানে জাগ্রত অহং সমস্ত 'শুভ', সমগ্র কল্যাণকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলে। রাজা বিক্রম তাহাই করিয়াছিলেন। এইজন্যই স্বয়ং নাট্যকার তাঁহার নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই

যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।" ('দুর্দান্ত প্রেম' এবং 'আত্মঘাতী প্রেম'—প্রেম নহে, কাম)

প্রশ্ন ।। ৪ ।। "এই নাটকে যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।" নাট্যকারের এই উক্তির মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্বের মূল বীজ নিহিত থাকিলেও মন্তব্যটি যথার্থ কিনা আলোচনা কর।

উত্তর ।। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাজা ও রানী' নাটকের ভূমিকায় এই মন্তব্য করিয়া নাটকের মূল দ্বন্দ্বের স্বরূপটি আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেও এই মন্তব্যটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব নহে, কারণ নাট্যকার নাটকের মধ্যবর্তী স্তরকে নাটকের পরিণতি বলিয়া চিহ্নিত করায় — নাটক-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিয়াছে। কিন্তু কেন? ঐ প্রশ্নের উত্তর পাইলেই বিরোধের অবসান হইবে।

পঞ্চাঙ্ক-সম্বলিত 'রাজা ও রানী' নাটকের পঞ্চ সন্ধি আপন আপন তাৎপর্য লইয়াই নাটকে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং নাট্যকার বর্ণিত নাট্য-পরিণতি এই নাটকের নাট্যদ্বন্দ্বের তুঙ্গতায় পৌঁছিয়াছে। ইংরেজী নাটকীয় পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় Climax বা Turning Point. অর্থাৎ দ্বন্দ্বগর্ভ নাট্যিক ঘটনার ইহাই চরমতম বা ঊর্ধ্বতম সীমা। কেননা বিকাশধর্মী যে কেন্দ্রীয় চরিত্রটির প্রকাশ—এই নাটকের কাহিনীর গতির সহিত অগ্রসৃত এবং বিবর্তিত হইয়াছে, সেই কেন্দ্রীয় পুরুষ বিক্রমের চরিত্র-বিবর্তনের ধারার মধ্যস্তরে তাঁহার আত্মঘাতী প্রেম 'বিশ্বঘাতী' হইয়া উঠিয়াছে। অন্যভাবে বলা চলে, যে আসক্তিপূর্ণ প্রেম রাজার আত্মজীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, তাহা হিংস্ররূপ ধারণ করিয়া এক ব্যাপক, রক্তলাঞ্ছিত হত্যাকাণ্ডে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাই বিক্রমচরিত্রের চরমতম:ও শেষতম পরিচয় নহে, কারণ রাজা বিক্রম দীর্ঘকাল ধরিয়া অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কালযাপন করেন নাই, তাঁহার অস্থির চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে, তাঁহার উন্মত্ততা প্রশমিত হইয়াছে, তীব্র বিরোধের সুতীব্র গতি আপন বেগ হারাইয়া বাঁক ফিরিয়াছে। গতি হইয়াছে তখন শান্তির অভিমুখী।

কিন্তু হতভাগ্য হিংসায় উন্মত্ত বিক্রম আপন হস্তে যে বাণ কুমারসেনকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা কুমারের মৃত্যু ঘটাইল বটে, কিন্তু রাজা নিজেও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। আঘাত প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাজার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিল। শান্তি বিনষ্ট হইল। দেখা দিল শোচনীয় পরিণাম। দুরন্ত ঝঞ্ঝার প্রমত্ততা যেমন শুধু বিশ্ব-প্রকৃতিকে বিধ্বস্ত করে না, আপনার অবশ্যম্ভাবী বিনাশেরও কারণ হইয়া বসে তেমনি ক্রোধান্ধ, হিংসায় উন্মত্ত রাজা নিজের হাতেই নিজের জীবনের করুণতম ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। ইহাই তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, বিকাশধর্মী বিক্রমচরিত্রের যে তিনটি স্তর এই নাটকে সুনিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে—এবং চরিত্রটি যে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিয়াছে—সেই তিনটি স্তরের মধ্যবর্তী স্তর—এই রক্তপ্লাবী হিংস্রতা—স্বাভাবিক পরিণতির পথে ইহা এক অনিবার্য অঙ্গ। বলা-বাহুল্য ইহা প্রকৃত পরিণতি নহে। প্রকৃত পরিণতি দেখা দিয়াছে তখন, যখন রাজা বিক্রম হিংস্রতায় অন্ধ হইয়া অন্যান্যদের হনন করিতে গিয়া শেষপর্যন্ত আত্মহনন করিয়া বসিয়াছেন, অন্যকে আঘাত করিতে বসিয়া নিজের মর্ম বিদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজা বিক্রমের আত্মঘাতী প্রেম এই নাটকের মধ্যান্তরে প্রতিহত হইয়া 'দুর্দান্ত বিশ্বঘাতী প্রেমে' পরিণত হইয়াছে; এবং স্বয়ং নাট্যকার এই নাটকের মধ্যবর্তী স্তরকে নাট্য-পরিণতি বলিয়া বিবেচনা করিয়া নাটকের শেষাংশকে—অর্থাৎ কুমার ও ইলার কাহিনীকে বাহুল্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। এখানে কবির মতের ও আমাদের পথের ভিন্নতা।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ "প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে।" দুইটি নাটকের বক্তব্যের সাদৃশ্য দেখাইয়া নাট্যকারের মনোধর্মের পরিচয় দাও।

উত্তর ॥ বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগই রবীন্দ্র-প্রতিভা-স্পর্শে ধন্য। কবি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন নিরলস সাহিত্যসাধনায় বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে যে বিভিন্ন বিচিত্র রচনাসম্ভার দান করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার নাট্যসাহিত্য অন্যতম। এই নাট্যরচনা তাঁহার কাব্য-টির অঙ্গ হইলেও তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। "রবীন্দ্রনাথের কাব্য-

সৃষ্টি যেমন আত্যন্তিকভাবে individualistic বা বৈজ্ঞানিক, নাট্যরচনা তেমনি বিশেষভাবে idealistic বা আদর্শিক।" বলা চলে, একই আদর্শ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁহার নাট্যরচনাগুলির মধ্যে একক উপলব্ধির অভিপ্রকাশ স্বচ্ছন্দ রূপ লাভ করিয়াছে। তাঁহার নাট্যকাব্যগুলির অন্যতম বিষয়—প্রেম। যে প্রেম কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ স্বীকার করে না, সেই প্রেম ব্যর্থ। কবির প্রেম-বিষয়ক যে দৃষ্টি গীতিনাট্যগুলির মধ্যে কেবলমাত্র স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণতায় বদ্ধ হইয়াছিল, নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে তাহাই সহস্র ধারায় যেন বিশ্ব-কল্যাণের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিল। সুতরাং একই উপলব্ধি, একই চেতনা প্রকাশিত হইয়া বিভিন্ন নাট্যপর্বের যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকটিতে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যের প্রথম পর্বের সমাপ্তি; কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রথম নাটক—'রাজা ও রানী'তে কবির প্রথম স্তরের বিশিষ্ট উপলব্ধিই প্রকাশিত। এইখানেই দুইটি নাটকের ভাব-সাদৃশ্য।)

রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম fundamental নাট্যকাব্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে এক আত্মকেন্দ্রিক সন্ন্যাসীকে লইয়া। প্রকৃতির মায়াজাল ছিন্ন করিয়া তপোমগ্ন সন্ন্যাসী আত্মকেন্দ্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অন্তর অনির্বচনীয় আনন্দলাভে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহার এই উপলব্ধির মধ্যে আকস্মিক আলোড়ন সৃষ্টি করিল এক অনাথ বালিকা। বালিকার দ্বারা, 'পিতা' সম্বোধনে সম্বোধিত হওয়ায় তাঁহার রুদ্ধ স্নেহ-প্রবৃত্তি উন্মুক্ত হইয়া গেল। মায়াজালে বদ্ধ হইবার ভয়ে ভীত সন্ন্যাসী সেই অনাথা বালিকাকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াও মুক্তি পাইলেন না; ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তখন অনাথা বালিকার প্রাণহীন দেহ তাঁহারই সম্মুখে ধুলায় লুটাইতেছে। যে সংসার-প্রকৃতিকে মিথ্যা মায়া বলিয়া মনে করিয়া সন্ন্যাসী তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন, তাহাই আজ তাঁহার নিকট পরম সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইল।) ডঃ সুকুমার সেন এই পর্বের মূল তত্ত্বটি আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "...অজ্ঞান মূঢ়তার দ্বারা রুদ্ধ বাৎসল্য-প্রস্রবণের উদ্ভেদ ও প্রেমের আবির্ভাবেতে চিত্তে প্রশান্তি লাভ এবং প্রেম ও কর্তব্যের সামঞ্জস্যে মানবজীবনের চরিতার্থতা। হৃদয়বৃত্তির নিরোধের দ্বারা দুঃখকে এড়াইয়া, সংসার হইতে দূরে থাকিয়া নহে, দুঃখ সুখকে সমানভাবে দেখিয়া.

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতিকে মিলাইয়া লইলেই তবে মানুষ জীবন্মুক্তির অধিকারী হয়।" কবির এই বিশিষ্ট উপলব্ধিই পরবর্তী কয়েকটি নাট্য-রচনারও উপজীব্য।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ অনাথা বালিকা যেমন করিয়া আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া সন্ন্যাসীকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেল, তাঁহার পরবর্তী নাটক 'রাজা ও রানী'তেও কুমার ও সুমিত্রার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া কাম-মোহগ্রস্ত, প্রেমস্বর্গচ্যুত রাজা বিক্রম সত্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যে রাজা 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা' কামকেই প্রকৃত প্রেম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই রাজাই নাটকের শেষ দৃশ্যে রানী সুমিত্রার প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহপার্শ্বে বসিয়া অনুশোচনার অশ্রুজলে ক্ষমাভিক্ষা করিয়া সেই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার পরবর্তী 'বিসর্জন' নাটকেও রঘুপতি শিষ্য জয়সিংহের মৃত্যুর মধ্য দিয়া সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কাব্যের যে সুর সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার পরবর্তী অন্যান্য রচনার মধ্যে অনুসৃত হইয়াছে বলিয়াই দুইটি নাটকের মধ্যে মিল সৃষ্ট হইয়াছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ যেমন অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সত্যভ্রষ্ট হইয়াছেন, 'রাজা ও রানী' নাটকেও তেমনি রাজা বিক্রম প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করিতে গিয়া সত্যকে হারাইয়াছেন। হৃদয়ের ধনকে দেহের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিবার কামনা—নিষ্ফল কামনা। ইহাই 'রাজা ও রানী' নাটকের ট্র্যাজেডি।

এই তত্ত্বটিকে হয়তো সজ্ঞানে লক্ষ্য রাখিয়া কবি তাঁহার এই নাটকটি রচনা করেন নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে কথাটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেকগুলি নাটকের ক্ষেত্রেই সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে। কবি লিখিয়াছেন, "সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না
শুধু সুখ চলে যায়—
এমনি মায়ার ছলনা॥"

দুইটি নাটকের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় কবির মনোধর্মের পরিচয়টি নিঃসন্দেহে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ "অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে।" 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকার সহিত 'রাজা ও রানী' নাটকের তত্ত্বগত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ॥ 'রাজা ও রানী' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ভাবসাদৃশ্য অংশ দেখ।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ "সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।" 'রাজা ও রানী' নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া এই বক্তব্যকে পরিস্ফুট কর।

উত্তর ॥ পূর্ববর্তী ৪নং প্রশ্নোত্তর ও 'কাহিনী-বিশ্লেষণ' অংশের সাহায্য লইয়া এই উত্তরটি রচনা কর।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ "সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়।" 'রাজা ও রানী' নাটকে কাহিনী কিরূপ নাট্য সংঘাতের মধ্য দিয়া পরিণতিলাভ করিয়াছে তাহা দেখাও।

(ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৬)

উত্তর ॥ 'রাজা ও রানী' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিক্রমদেব এবং রানী সুমিত্রা নায়িকা। রাজা বিক্রমদেব ও রানী সুমিত্রার প্রেমাদর্শের দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করিয়াই এই নাটকের মূল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাহা সুমিত্রার মৃত্যুতে সমাধা হয়। এই বিরোধ প্রেম সম্বন্ধীয়। রাজা বিক্রমদেব রানী সুমিত্রার প্রতি প্রচণ্ড আসক্তিতে মোহগ্রস্ত। রাজা এই মোহ-

[বিশেষ বক্তব্য : এই উত্তরের পাশাপাশি "রাজা ও রানী" ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' : ভাবসাদৃশ্য—অংশ দেখ।

প্রস্ত, কামাসক্ত প্রেমকেই প্রকৃত প্রেম বলিয়া মনে করিয়াছেন। বস্তুতঃ জৈব কামনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহার প্রেম সীমাবদ্ধ। রাজকর্তব্য তাঁহার কাছে তুচ্ছ। তিনি আত্মবিস্মৃত। সংসারের সকল কাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুমিত্রাকে কেবল ভোগ-সর্বস্বতার মধ্যেই তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন। রানী সুমিত্রার চিন্তা স্বতন্ত্র। তাঁহার প্রেম এই বৃহৎ কর্মময় জগতেরই একটি অংশ। তাহা মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক। আত্মসুখ-সর্বস্ব ভোগবাসনা প্রমত্ততার মধ্যে তাহা আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। অন্তরে সুমিত্রা যেমন রাজার প্রেয়সী, বাহিরে তেমনি রাজার মহিষী। অতএব অন্তঃপুরের নর্মসহচরীরূপে তাহার প্রেম সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এই বিপরীত-ধর্মী প্রেমাদর্শের মধ্যেই সুমিত্রা এবং বিক্রমের বিরোধ।

'রাজা ও রানী'—পঞ্চমাঙ্ক এই নাটকের মধ্যে উল্লিখিত নাট্যবিরোধ নানা ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত সুমিত্রার মৃত্যুতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। নাটকের প্রথম অঙ্কেই এই দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা করা হইয়াছে। আটটি দৃশ্যে বিভক্ত এই অঙ্কের মধ্যে নায়ক বিক্রমদেবের চরিত্রের চরম ভ্রান্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ভ্রান্তির অতিশয়তায় প্রতিকূল নানা বহিরঙ্গ ঘটনা দেখা দিয়াছে, যাহা সেই চরিত্রকে ক্রমশঃ বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে অনিবার্য ভাবে অগ্রসর করিয়াছে। রাজার বাল্যসখা দেবদত্তের উক্তির মধ্যেই মোহাচ্ছন্ন বিক্রমদেবের ভ্রান্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকার্যে অবহেলা করিয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রেমচর্চায় কালযাপন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বিদেশী আমাত্যগণ রাজ্যশাসনের নামে নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাইতেছে। জালন্ধর রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। নিপীড়িত প্রজাদের আর্ত ক্রন্দনে সমস্ত রাজ্য বিষণ্ণ। তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। রাজার তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি শুধু আপন হৃদয় বিস্তার করিয়া রানীর অপূর্ব রূপ-সুধা পান করিতে চাহেন। রানী সুমিত্রার কিন্তু তাহাতে সম্মতি নাই। তিনি কেবল রাজার অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিতে চাহেন না। ঘরে বাহিরে রাজার প্রেমের অংশভাগিনী হইতে চাহেন। তিনি রাজার 'অন্তরে প্রেয়সী', এবং 'বাহিরে মহিষী'। বিক্রমদেবের আত্মসুখপরায়ণতা সুমিত্রার চিত্তকে ব্যথিত করে। রাজার আত্মবিস্মৃত ভালোবাসায় তিনি ধিক্কার জানান।

তাঁহার মোহ দূর করিবার অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করেন। বাহিরে প্রজাদের কাতর ক্রন্দন তাঁহার জননী সত্তাকে জাগ্রত করে। রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হন, ফলে রাজা বিক্রমদেবের চেতনা ক্ষণিকের জন্য জাগ্রত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের অবহেলায় আপনার সৃষ্ট অত্যাচারী অমাত্যদের শাস্তি দেওয়া বিড়ম্বনা মনে করিয়া তিনি প্রস্থান করেন। রাজ্যের কল্যাণ চিন্তা হইতে গৃহের আরামবিলাসই তাঁহার নিকট শ্রেয় মনে হইল। কিন্তু সুমিত্রা অন্তঃপুর ছাড়িয়া মন্ত্রগৃহে রাজার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। অত্যাচারী অমাত্যদের শাস্তি দিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। এইরূপে রাজা ও রানীর বিরোধের সূত্রপাত প্রথম অঙ্কেই স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত করা হইল।

রাজা ও রানীর এই দ্বন্দ্ব তীব্রতা লাভ করিয়াছে দ্বিতীয় অঙ্কে। সুমিত্রার অত্যাচারী অমাত্যদের শাস্তিদানের পরিকল্পনা ত্রিবেদী ঠাকুরের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ব্যর্থ হইল। অমাত্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। রাজা তথাপি অবিচল। তিনি বিদ্রোহীদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়া তাঁহার অন্ধ প্রেমকে অব্যাহত রাখিতে চাহিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সুমিত্রা 'পতি সত্য' পালনের জন্য জালন্ধর ত্যাগ করিলেন। সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বিক্রমদেব ক্ষোভে, রোষে, আত্মাভিমানে অস্থিরচিত্ত হইয়া উঠিলেন। সুমিত্রা ভাবিয়াছিলেন রাজার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে রাজা কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। এখানে সুমিত্রার ভ্রম। রাজা অবশ্য জাগিয়া উঠিলেন, তবে কর্তব্যনিষ্ঠায় নহে, প্রচণ্ড হিংসোন্মাদনায়। নাট্য-সংঘাতের ঊর্ধ্বগতিতে রাজা ও রানীর বিরোধ তীব্রতা লাভ করিল।

তৃতীয় অঙ্কে সুমিত্রা কাশ্মীরে গিয়া ভ্রাতা কুমারসেনের নিকট জালন্ধরের অবস্থা জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কুমারসেন সৈন্য লইয়া বিক্রমদেবের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করিতে জালন্ধরের অভিমুখে রওনা হইলেন। বিক্রম-সুমিত্রার দ্বন্দ্ব কুমার-ইলার উপকাহিনীর সহিত সংযুক্ত হইয়া বহিরঙ্গে জটিলতা বৃদ্ধি করিল।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই বিক্রম-সুমিত্রার বিরোধ তুঙ্গ সীমায় পৌঁছিল। পলাতক বিদ্রোহী অমাত্যদের বন্দী করিয়া কুমারসেন এবং সুমিত্রা বিক্রমদেবের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অত্যুগ্র অস্থিরচিত্ত রাজা

তাঁহার শিবির দুয়ার হইতে কুমার এবং সুমিত্রাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ পর্যন্ত করিতে অস্বীকার করিলেন। এখানে তাঁহার ভ্রান্তি চরম আকার ধারণ করিয়া ট্র্যাজেডিকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে। একদা বিদ্রোহী অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় রাজা কুমারসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য রাজা হিংসার প্রচণ্ডতায় মাতিয়া উঠিলেন। কুমারসেন রাজার নিকট শান্তির প্রস্তাব পাঠাইয়া কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিলেন। বিক্রমদেব সেই শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। কাশ্মীর রাজ-সিংহাসনে কলঙ্কের ছাপ দিয়া আসিবার জন্য তিনি কুমারসেনের সন্ধানে কাশ্মীর আক্রমণ করিলেন। চতুর্থ অঙ্কের falling action বা ঘটনার নিম্নগতিতে কুমার এবং সুমিত্রার জীবনে যে বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিতেছে তাহার আভাস পাওয়া গেল। যুদ্ধোন্মাদ বিক্রমদেবের নিকট শান্তির প্রস্তাব পাঠাইয়া কুমার ও সুমিত্রা ভাবিয়াছিলেন, বিক্রমদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু এখানেও তাঁহাদের ভুল হইল। সেই ভুলের মাশুল দিবার জন্য তাঁহাদের চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

পঞ্চম অঙ্কে এই বিরোধ চরম বিপর্যয়ে পরিণতি লাভ করিল। সুমিত্রা অবশ্য চতুর্থ অঙ্ক হইতেই কুমারের চরিত্রের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বেকার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতা আর দেখা যায় না। বিক্রম-সুমিত্রার দ্বন্দ্ব বহিরঙ্গে বিক্রম-কুমারের দ্বন্দ্বে পরিণতি লাভ করিল। খুল্লতাত চন্দ্রসেন এবং তাহার পত্নীর চরম নিষ্ঠুরতায় কুমারসেনকে শেষ পর্যন্ত অরণ্যে পলাতকের জীবন গ্রহণ করিতে হইল। বিক্রমদেবের অমাত্য কুমারকে জীবিত বা মৃত ধরিয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিল। বিক্রমদেবের লোকজন কুমারসেনের সন্ধানে একের পর এক গ্রাম জ্বালাইয়া হিংসার বিভীষিকা সৃষ্টি করিল। প্রেমের দ্বন্দ্ব এখন মানবিকতা ও পাশবিকতার দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হইল। কুমাসেনের সহিত হিংসোন্মত্ত বিক্রমদেবের দানবীয় শক্তির বিরোধ দেখা দিল। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের পূর্ব পর্যন্ত সুমিত্রার চরিত্র কুমারসেনের নিকট অপ্রধান হইয়া রহিল। প্রকৃতপক্ষে কুমারের চরিত্রের সহিত সুমিত্রার চরিত্র একান্তভাবে মিশিয়া রহিল। কুমারের আত্মবলিদানে ও সুমিত্রার মৃত্যুতে বিক্রমদেবের সহিত তাঁহাদের সকল বিরোধের অবসান ঘটিল। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর

মধ্যে সুমিত্রার চরিত্র মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে। সুমিত্রার মৃতদেহের পার্শ্বে নতজানু বিক্রমদেবের আত্মগ্লা'নর মধ্যেই নাট্য-দ্বন্দ্ব করুণ পরিণতি লাভ করিল।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ নায়ক বিক্রমদেবের জীবনের দুই ভিন্নমুখী পরিবর্তনের পরিচয় দিয়া, ইহার কারণ বিশ্লেষণ কর।

অথবা,

"'রাজা ও রানী' নাটকের সবগুলি চরিত্রের মধ্যে রাজা বিক্রমের চরিত্রেই সর্বাধিক বিকাশধর্মী"—আলোচনা কর।

উত্তর ॥ যে চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া নাটকীয় ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়, সেই চরিত্রই মুখ্য চরিত্র। সেই চরিত্রই নায়কের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। 'রাজা ও রানী' নাটকের ঘটনাসমূহ যে চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত ও আবর্তিত হইয়াছে, সেই চরিত্র—রাজা বিক্রমদেব। তাঁহার জীবনের ভিন্নমুখী পরিবর্তনের ফলেই নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ও সমাপ্তি।

জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব। রানী সুমিত্রা, বাল্যবন্ধু দেবদত্ত, মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদ এবং অসংখ্য প্রজা লইয়া তাঁহার সমগ্র রাজ্যের তিনি অধীশ্বর। সুতরাং এক বিরোধহীন স্বচ্ছন্দ জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ তো তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা হইল না। অন্তরের এক অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে তাঁহার সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবনভোগে অস্থির করিয়া তুলিল। এক প্রমত্ত বাসনা রাজার জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল।

(রাজা বিক্রম এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়, এক প্রচণ্ড প্রমত্ত বাসনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন, কর্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। তিনি আজ সমস্তকিছু ভুলিয়া রানী সুমিত্রাকে জীবনের সর্বস্ব করিয়া তুলিয়াছেন। আসঙ্গ-লিপ্সায় তিনি আজ উন্মাদ। তিনি কেবলমাত্র রানী সুমিত্রাকে একান্ত করিয়া পাইতে চাহেন—অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। রাজা তাঁহার এই বাসনা-প্রমত্ত ভালোবাসাকে প্রকৃত 'প্রেম' বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু রানী সুমিত্রা চাহেন রাজাকে মহৎ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করাইতে। তাই তিনি তাঁহার প্রতি আসক্ত রাজাকে কর্মজগতে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে দুইজনের ইচ্ছায় বিরোধ বাধিয়াছে। দেখা দিয়াছে দ্বন্দ্ব।

এই বিরোধ চূড়ান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিল, যখন আত্মবিস্মৃত রাজার চেতনা জাগ্রত করিবার জন্য রানী সুমিত্রা রাজাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। এই ঘটনাই রাজার 'দুর্দান্ত প্রেম'কে 'দুর্দান্ত হিংস্রতায়', 'আত্মঘাতী প্রেম'কে —'বিশ্বঘাতী প্রেমে' পরিণত করিয়া দিল। রাজার জীবনে দেখা দিল অনিবার্য বিপর্যয়, এক প্রচণ্ড পরিবর্তন।

আত্মবিস্মৃত, আত্মমগ্ন রাজা অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আর তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল কাশ্মীরাগত বিদেশী আত্মীয় চাটুকারের দল। তাহারাই রাজার অহংবোধকে জাগ্রত করিয়া তুলিল, তাহারাই তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিল। রাজা হিতাহিত ভুলিয়া সহধর্মিণীর আশ্রয়দাতা ভ্রাতা, যুবরাজ কুমারসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন। রাজার অন্তরের পরিবর্তন ছিল রানীর কাম্য; এই পরিবর্তন প্রজা ও রাজ্যের কল্যাণের জন্য ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু সেই পরিবর্তন যে এমন ভয়ঙ্কর রূপ লইয়া দেখা দিবে—রানী সুমিত্রা তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। রাজার অন্তরের এই পরিবর্তন আজ রাজ্যের কল্যাণ সাধন না করিয়া অকল্যাণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই বীভৎস হিংস্রতার হাত হইতে রাজাকে মুক্তি দিতে পারেন রানী সুমিত্রা এবং বাল্যবন্ধু দেবদত্ত। কিন্তু অত্যাচারী, বিদেশী চাটুকারদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এবং অশুভ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়ায় রাজার নিকট তাঁহারা পৌঁছিবার অবকাশ পাইলেন না, ফলে বিপর্যয় অনিবার্য হইয়া উঠিল। কিন্তু এইসময় দুইটি নারীচরিত্র তাঁহার অন্তরের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে।

কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রসেনের সহধর্মিণী রানী রেবতী তাঁহার অন্তরলালিত সংকীর্ণ কামনাকে চরিতার্থ করিতে বৈবাহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত রাজা বিক্রম দেবের সাহায্য কামনা করিলেন। এবং তাঁহার সংকীর্ণ-স্বার্থ-প্রণোদিত, কামনা-কলুষ, কুটিল অন্তরের বীভৎস রূপের দর্পণে রাজা আপন বিকৃত অন্তরের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া আতঙ্কিত হইলেন, জাগ্রত হইলেন। কল্যাণময়ী নারীর অন্তরকে দেখিলেন 'ছুরীর মতো বাঁকা বিষমাখা'। গুরুলোভ, বক্ররোষ, হিংসা-তৃষাদীপ্ত, ভীষণ নিষ্ঠুর ও কুৎসিত নারী-অন্তর তাঁহাকে আঘাত করিয়া সচেতন করিয়া তুলিল। ইহার ফলে তাঁহার জীবনের ধ্বংসকারী দুর্বার গতি কিছুটা পরিমাণে রুদ্ধ হইল। যে বিপর্যয় আসন্ন হইয়া

উঠিয়াছিল, তাহা যেন খানিকটা পরিমাণে নির্বাপিত হইল। এই ঘটনার পর প্রেমস্বর্গচ্যুত রাজাকে প্রেমের স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করিল কুমার-প্রণয়িনী ইলা। ইলার 'প্রবল প্রেম' কামনা-প্রমত্ত রাজাকে নূতন করিয়া সত্য উপলব্ধির জগতে আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা আবিষ্কার করিলেন প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ। রানী রেবতীর কুটিল অন্তরের পরিচয় আত্মবিস্মৃত রাজাকে আংশিকভাবে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, কুমারী ইলা তাহাই সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল। (আত্মমগ্ন, দুর্দান্ত হিংস্রতায় সাময়িকভাবে অন্ধ রাজা নূতন করিয়া জীবনের সহজ, সুন্দর রূপকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন) (কিন্তু হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে এই জীবনে প্রবেশ করা সম্ভব হইল না, কারণ পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত রাজাকে মার্জনা ভিক্ষার অবকাশ না দিয়াই রানী সুমিত্রা মৃত্যুর বুকে আশ্রয় লইলেন। স্বামীর পরিবর্তিত অন্তরের পরিচয় না পাইয়াই তিনি বিদায় লইয়া গেলেন। রাজাকে করিয়া গেলেন চির অপরাধী। এই অনুশোচনার অগ্নিতে রাজাকে দগ্ধ হইতে হইবে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত।)

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ রাজা বিক্রমদেবের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ॥ "চরিত্র বিচার : বিক্রমদেব" দেখ।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ রানী সুমিত্রা 'রাজা ও রানী' নাটকের মুখ্য নারী চরিত্র। নাটকের কাহিনী অনুসরণ করিয়া তাঁহার চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অঙ্কিত কর।

উত্তর ॥ "চরিত্র-বিচার : সুমিত্রা" দেখ।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ এই নাটকের গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে দেবদত্ত, কুমারসেন ও ইলার চরিত্র বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।—আলোচনা কর।

উত্তর ॥ "চরিত্র-বিচার" অংশে এই চরিত্রগুলির আলোচনা দেখ।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ রানী রেবতীর চরিত্রে বিদেশী নারী চরিত্রের ছায়াপাত ঘটিলেও তাহা আপন স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট।—আলোচনা কর।

উত্তর ॥ "চরিত্র-বিচার : রেবতী" দেখ।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ "দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক

আগাগোড়া নূতন করে না লিখলে এর সদ্গতি হ'তে পারে না।" 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় লিখিত কবির এই বক্তব্যের আলোকে 'রাজা ও রানী' নাটকের পরিবর্তিত রূপের পরিচয় দাও এবং এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

উত্তর ॥ "রাজা ও রানীর রূপান্তর : তপতী" অংশের সাহায্যে উত্তর রচনা কর।

প্রশ্ন ।। ১৫ ।। "নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত।" এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

উত্তর ॥ একটি মুখ্য কাহিনী ও একটি উপকাহিনীর যুগ্ম বেণী রচনা করিয়া নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাজা ও রানী' নাটক গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই দুইটি কাহিনীর ধারা একই সঙ্গে প্রবাহিত হইলেও শেষপর্যন্ত উপকাহিনীর শীর্ণ ধারা স্ফীত হইয়া মুখ্য কাহিনীর ধারাকে বিশুষ্ক করিয়া তুলিয়া আপন প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া নাটকের শেষ অংশটি ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, শুধু তাহাই নহে—ইহা বেশ খানিকটা পরিমাণে দ্বিধাবিভক্তও হইয়া পড়িয়াছে। এই মন্তব্য অযথার্থ নহে।

নাট্যকার নাটকে প্রয়োজনানুযায়ী মূল কাহিনীর পাশে উপকাহিনীর স্থান করিয়া দেন। এই নাটকেও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ রাজা বিক্রম ও রানী সুমিত্রাকে লইয়া যে মূল কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন, প্রয়োজনে তাহারই পাশে কুমার ও ইলাকে লইয়া গড়িয়া-উঠা উপকাহিনীর স্থান করিয়া দিয়াছেন—ইহা সত্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাট্যকার অনাবশ্যকভাবে কুমার ও ইলার প্রেমজীবনকে দৃশ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি ইহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থান জুড়িয়া বসিবার অধিকার দিয়াছেন।

কুমার ও ইলার প্রেম জীবনের অত্যুজ্জ্বলতাকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করিতে গিয়া নাট্যকার নাটকীয় বস্তুকে ব্যাপকতা দান করায় নাটকের ঘটনা বিন্যাস দৃঢ়-পিনদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। কাহিনীবৃত্তে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়াছে, নাটকীয় গতিবেগ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ কাহিনী ব্যাপক আয়তনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ায় মূল কাহিনীর কেন্দ্রিকতা নষ্ট হইয়াছে। নাটকের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়া উপকাহিনী প্রাধান্য

স্থান করিয়া বসিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে ত্রুটি। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের পর এই ত্রুটি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং মূল কাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তবে এই প্রসঙ্গে কেন এই উপকাহিনীর অবতারণা, তাহার আলোচনা আসিয়া পড়ে। রাজা বিক্রমের মোহান্ধ অন্তরে প্রেমের আলোকশিখাটি প্রজ্বলিত করিতেই নাট্যকারকে কুমার-ইলার প্রেম-জীবনের চিত্রটি এমন প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইয়াছে। ইহা না হইলে দুর্বল প্রণয়ী বিক্রমদেবের আসক্তিপূর্ণ অন্তরে সত্যের উন্মেষ ঘটিত না। ইলা যদি প্রবল প্রেমের অধিকারিণী না হইত তবে সে হয়তো জালন্ধররাজ বিক্রমের সাময়িক আকর্ষণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিত। কিন্তু ইলার প্রবল প্রেম একদিকে যেমন আত্মসমর্পণের লজ্জা হইতে ইলাকে রক্ষা করিয়াছে, তেমনি সেই প্রবল প্রেমের সত্যরূপ দেখিয়া দুর্বল প্রণয়ী বিক্রমের মোহান্ধ অন্তর মোহমুক্ত হইয়াছে। হইয়াছে বলিয়াই, রাজা বিশ্বস্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন: 'রমণীর অনিমেষ প্রেম দেবতার ধ্রুবদৃষ্টি সম।' এবং প্রেমস্বর্গচ্যুত রাজা ত্রিচূড়-রাজকন্যার জ্বলন্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন।

আলোচনার এই স্তরে আসিয়াও একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। প্রশ্নটি হইল —প্রকৃতই কি উপকাহিনী সংযোজন এই নাটককে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে? না অন্য কোথাও এই দুর্বলতার বীজটি নিহিত? নাটকীয় কাহিনীর গভীরে প্রবেশ করিলে আমরা এই প্রশ্ন দুটির একটি উত্তর আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই।

উপকাহিনী সংযোজন—নাটকীয় কাহিনার পক্ষে ততখানিই প্রয়োজন, যতখানি তাহা মূল কাহিনীর সহযোগী। কিন্তু মূল কাহিনীকে অতিক্রম করিয়া যদি উপকাহিনী প্রধানের ভূমিকা লইয়া বসে তবে তাহা নিশ্চিতভাবে নাট্য-দুর্বলতা। কিন্তু কখন এই দুর্বলতা দেখা দেয়? দেখা দেয় তখন, যখন নাটকের গঠনে থাকে ত্রুটি। 'রাজা ও রানী' নাটকের গঠনগত ত্রুটি আছে বলিয়াই উপকাহিনী শেষপর্যন্ত প্রাধান্য পাইয়া বসিয়াছে। এখানে রানী সুমিত্রার চরিত্রগঠনগত ত্রুটি সেই দুর্বলতার মূলে নিহিত।

রানী সুমিত্রা শুধুমাত্র বিক্রম-প্রেয়সীই নন—প্রজা-জননীও। তাই রাজা বিক্রম যখন তাঁহার কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন তখন পতিসত্তা-

পালনের জন্য রানী সুমিত্রা প্রস্তুত হইয়াছেন। নাটকের প্রথমাংশে তাই রানী সুমিত্রার চরিত্রটি উজ্জ্বল ; তেজোদৃপ্তা, দৃঢ়চেতা ও ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠ। কিন্তু আপন সঙ্কল্পকে সত্যে পরিণত করিতে গিয়া যে মুহূর্তে তিনি কাশ্মীরে উপনীত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত হইতে তিনি ব্যক্তিত্ব হারাইয়া যেন আপন ভ্রাতা কুমারের পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া স্তিমিত জ্যোতি হইয়া পড়িয়াছেন। আক্ষেপরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিয়াছেন :

"আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম
অন্তঃপুর ছাড়ি ! * * *
* * * মোরে কিছু শুধায়ো না,
বুদ্ধিহীনা আমি।"

আমাদের হৃদয়ে যে নারী আপন ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রভায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিলেন, তিনি যেন আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গিয়াছেন। তখন আমাদের দৃষ্টি জুড়িয়া বসিয়াছেন কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারসেন।

কিন্তু ক্ষাত্রতেজোদ্দীপ্ত, ব্যক্তিত্বময়ী রাজমহিষী সুমিত্রার কণ্ঠে এই আক্ষেপ কি প্রত্যাশিত ? মোটেই নহে। প্রকৃত সত্য হইল এই, নাট্যকার এই চরিত্রটি অঙ্কনে উপযুক্ত সঙ্গতি বজায় রাখিতে সমর্থ হন নাই বলিয়াই সুমিত্রা অপ্রধান হইয়া 'মৌন ছায়া'য় পরিণত হইয়াছেন এবং জ্ঞানী, বীর কুমারসেন আপন বলিষ্ঠতা ও ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন—হইয়া উঠিয়াছেন প্রধান। সুতরাং চরিত্র-পরিকল্পনাগত ত্রুটিই নাটকের শেষাংশের ভারগ্রস্ততা ও দ্বিধা-বিভক্ততার কারণ।

প্রশ্ন ।। ১৬ ।। রবীন্দ্র-নাটকের অনেকগুলির মধ্যেই এক একটি তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। 'রাজা ও রানী' নাটকে কোন তত্ত্ব নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে কিনা—আলোচনা কর।

অথবা

'রাজা ও রানী' নাটকের মূল ভাবসত্য কি ? মূল নাট্য-কাহিনী অবলম্বনে তাহা পরিস্ফুট কর।

উত্তর ।। "রাজা ও রানী : ভাবসত্য" অংশ দেখ।

প্রশ্ন ।। ১৭ ।। ট্র্যাজিক নাটকের স্বরূপ কি ? 'রাজা ও রানী' নাটক ট্র্যাজেডি হিসাবে কতখানি সার্থক সৃষ্টি ?

উত্তর ॥ আদিপর্বের 'তত্ত্বালোচনা' ও মধ্যপর্বের 'শ্রেণীবিন্যাস' অংশের সাহায্যে উত্তর রচনা কর।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ "রাজা ও রানী নাটকে রবীন্দ্রনাথের অপরিণত নাট্যপ্রতিভার চিহ্ন সুপ্রকট।"—এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

উত্তর ॥ 'গঠনগত দুর্বলতা' অংশ দেখ।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে স্পষ্ট 'রাজা ও রানী' নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতির রূপটি পরিস্ফুট কর।

উত্তর ॥ নাটক বর্ণনাত্মক নহে, ক্রিয়াত্মক। Drama is action, action, action, Sir, not confounded philosophy ; সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, নাটকের মূল হইল 'action'; বাহিরের ঘটনাসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাত্রপাত্রীর অন্তরের নানা প্রকার ভাব-বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত থাকে এই নাট্যিক ক্রিয়ার প্রকৃতি। অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় যে ঘটনাবর্ত সৃষ্ট হয়, মানবজীবন সেই ঘটনাবর্তের মধ্যেই দ্রুত আবর্তিত হইতে থাকে—নাট্যকার এই গতিশীল মানবজীবনের রূপটি তাঁহার সৃষ্ট নাটকে ফুটাইয়া তোলেন। তাহারই ফলে আমরা নাটকে মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গদোলায় দোলায়িত বৈচিত্র্য-মুখর আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করি। পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহ ক্রমে ক্রমে মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করার ফলে মানবের অন্তরস্থিত স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তিগুলির সহিত বহিরাগত ঘটনাসমূহের যে সংঘাত সৃষ্ট হয় তাহাতেই মানুষের অন্তরে নানারূপ বিরুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয় ; মানবমন জটিল হইয়া পড়ে। কখনও কখনও খুব বড় রকমের কোন আঘাত না করিয়াও অত্যন্ত সহজ সুরে এই বিরোধের অবসান ঘটে, জটিলতার সমাধান ঘটে, তখন সেই পরিণতি হয় মিলনান্তক, আনন্দসুন্দর। কিন্তু কখনও কখনও এই জটিল বিরোধিতার অবসান ঘটাইতে গিয়া ক্রমাগত নূতন নূতন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতে থাকে, নানা ভুলভ্রান্তি স্তূপীকৃত হইয়া উঠে ; সেইসব ক্ষেত্রে সমন্বয় প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত এক প্রচণ্ড আলোড়নে সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। [illegible] ট্র্যাজিক।

'রাজা ও রানী' নাটকে যে বিরোধ চিত্রিত হইয়াছে, শেষপর্যন্ত সেই বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে এক ব্যথা-করুণ ট্র্যাজিক পরিণতিতে। প্রধানত দুইটি ভাবের সংঘাতেই 'রাজা ও রানী' নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রীর বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। রাজা বিক্রমদেব চাহেন তাঁহার কামনার্তিকে তৃপ্ত করিতে, কারণ তিনি তাঁহার এই 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা' কামকেই জীবনের সর্বস্ব করিয়া তুলিয়াছেন। ফলে তিনি তাঁহার কর্মের জগৎ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। অন্যদিকে তাঁহার সহধর্মিণী রানী সুমিত্রা চাহেন প্রকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা। তিনি তাই কামাসক্ত রাজাকে প্রকৃত প্রেমের জগতে টানিয়া আনিতে চাহেন, কারণ তিনি জানেন—প্রকৃত প্রেম বা মহৎ প্রেম কখনও মানুষকে কর্মের জগৎ হইতে দূরে সরাইয়া দেয় না বরং কর্মের জগতে প্রতিষ্ঠা দান করে। পরস্পর বিরোধী এই দুইটি ইচ্ছার সংঘাতময়তার মধ্যে 'রাজা ও রানী' নাটকের জন্ম।

রাজা বিক্রমদেব যখন আপন কামনাকে চরিতার্থ করিতে গিয়া রাজ্য, রাজকর্তব্য, সমস্ত-কিছু ভুলিয়া শুধুমাত্র রানী সুমিত্রাকেই আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য বহির্জগৎ হইতে অন্তঃপুরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন সমস্ত রাজ্যে দেখা দিল এক চরম বিশৃঙ্খলা। রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বিদেশী অত্যাচারীর দল অসহায়, দুর্বল, দরিদ্র প্রজাদের উপর উৎপীড়ন চালাইতে লাগিল। অসহায় প্রজাদের করুণ ক্রন্দন রাজার অন্তরকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না, কিন্তু রানী সুমিত্রা তো শুধুমাত্র রাজা বিক্রমদেবের প্রেয়সীই নহেন, তিনি প্রজাদের জননীও। তাই যে কর্তব্য রাজা পালন করিলেন না, সেই কর্তব্য পালন করিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার এই উদ্যোগে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিলেন বিক্রমদেবের বাল্যবন্ধু দেবদত্ত। এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য রানী রাজ্যত্যাগ করিয়া ভ্রাতা কুমারসেনের সাহায্যাশায় কাশ্মীরে যাত্রা করিলেন। ইহাতে রাজার 'দুর্দান্ত প্রেম' প্রতিহত হইয়া 'দুর্দান্ত হিংস্রতায়' পরিণত হইল। দেখা দিল এক চরম বিরোধ, চরমতম বিপর্যয়, যাহা শেষপর্যন্ত এক বিষাদকরুণ পরিণতির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ট্র্যাজিক নাটক বলিতে কি বুঝায়, সেই সম্পর্কে দুই-একটি কথা আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। দ্বন্দ্বসংকুল মানবজীবনলীলায় বিষাদঘন

নাট্যরূপই হইল ট্র্যাজেডি।) এই ট্র্যাজেডি কল্পনা বহুদিন হইতে প্রচলিত। গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টট্ল ট্র্যাজেডির কথায় 'ভ্রান্তি'র উল্লেখ করিয়াছেন। অ্যারিস্টটল ইহাকেই 'hamartia' বা 'fatal flaw' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা 'রাজা ও রানী' নাটকের নায়ক রাজা বিক্রমদেব ও নায়িকা রানী সুমিত্রার কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া ইহার পরিচয় পাই।

[একদিকে রূপের আকর্ষণ রাজাকে কর্তব্যচ্যুত করিয়াছে। ইহা একপ্রকার ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি অনেকখানি পরিমাণে শেক্‌সপিয়রীয় ট্র্যাজিক রীতির অনুসারী। আবার রানী সৎউদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ভ্রাতা কুমারসেনের সাহায্যে কাশ্মীর-কলঙ্ক যুধাজিৎ এবং জয়সেনকে বন্দী করিয়া বিক্রমদেবের অহঙ্কারকে উদ্দীপ্ত করিলেন। ইহা গ্রীক ট্র্যাজেডির রূপ। সুতরাং বলা চলে 'রাজা ও রানী' নাটকে গ্রীক ও শেক্‌সপিয়রীয় ট্র্যাজেডির রচনা-রীতির সমন্বয় ঘটিয়াছে।

এই বিরোধের অবসান ঘটিল সাহসী কুমারসেন ও প্রেমময় সুমিত্রার মৃত্যু ও রাজা বিক্রমদেবের বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে, 'রাজা ও রানী' নাটকের পরিণতি ট্র্যাজিক। কিন্তু সার্থক ট্র্যাজিক পরিণতিও যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হইয়া আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তাহা শেষপর্যন্ত সার্থক ট্র্যাজিকে পরিণতি লাভ না করিয়া অতিনাটকীয় পরিণতি লাভ করিয়া বসে। 'রাজা ও রানী' নাটকে যে সম্ভাবনা ছিল আয়ত্তাধীন, পর পর কয়েকটি মৃত্যু ও মূর্ছার মধ্যে যেন সেই সম্ভাবনা হারাইয়া গেল। ফলে এই নাটকের পরিণতির মধ্যে অতিনাটকীয় আবেগ প্রাধান্য লাভ করিয়া বসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।)

প্রশ্ন ।। ২০ ।। নাটকীয় গঠন কৌশলের দিক হইতে 'রাজা ও রানী' নাটকের শেষ দৃশ্যটির সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

উত্তর ।। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাটকের গঠন-কৌশল লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নাটকের সূচনায় কাহিনীর যে সূত্রপাত ও বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত—নাটকের সমাপ্তিতে তাহারই একটি পরিণত রূপ। 'রাজা ও রানী' নাটকেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ রচিত এই নাটকটির সূচনায় রাজা বিক্রম ও রানী সুমিত্রার মধ্যে যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব দেখা যায়;

এই নাটকের শেষ দৃশ্যে রানী সুমিত্রার মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহার পরিণতি বা অবসান ঘটিল। কাজেই বলা চলে, এই দৃশ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই দৃশ্যে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নাটকীয় গঠন-কৌশলের দিক হইতে কতখানি সার্থক। এই দৃশ্যের বিশ্লেষণ করিলে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে, রাজা বিক্রমদেব কাশ্মীর রাজ্য জয় করিয়াছেন। তিনি সংবাদ পাইয়াছেন যে, কুমারসেন শিবিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। এমন সময় রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল দেবদত্ত এবং শঙ্কর। শঙ্কর কুমারকে শৈশবকাল হইতে কোলে পিঠে করিয়া লালন পালন করিয়াছে; সে কুমারকে জানে। তাই সে বিশ্বাস করিতে পারে না যে, সত্যই কুমারসেন অপমানের বোঝা মাথায় বহন করিয়া ধরা দিতে আসিতেছে! কিন্তু সেই সময়েই বাহিরে হুলুধ্বনি ও বাদ্য বাজিয়া উঠিল, রাজদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল রুদ্ধ শিবিকা। রাজা বিক্রম অধীর আগ্রহে কুমারকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দ্বার খুলিয়া নামিয়া আসিলেন রানী সুমিত্রা, হস্তে তাঁহার ছিন্নমুণ্ড সমেত স্বর্ণপাত্র। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত; শুধু বিচলিত হইল না শঙ্কর। মুহূর্তকাল পরে সুমিত্রাও মূর্ছিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। এমনই এক দৃশ্যের যখন অবতারণা হইয়াছে, সেই সময় দ্রুত প্রবেশ করিল কুমারী ইলা—কুমারসেনের প্রণয়িনী এবং স্বর্ণপাত্রে প্রিয় কুমারের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। চন্দ্রসেন ধিক্কার দিয়া আপন মস্তকের মুকুটটি নিক্ষেপ করিলেন এবং রেবতীকে ভর্ৎসনা করিলেন। ভর্ৎসনার প্রত্যুত্তরে রেবতী বলিয়া গেলেন যে ঐ রোষ চিরস্থায়ী নহে। সর্বশেষে বিক্রম নতজানু হইয়া সহধর্মিণী সুমিত্রার পদ-প্রান্তে বসিয়া অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

'দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী ক'রে? ইহ জন্ম
নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ!

দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর—
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।' —এমনি করিয়াই অনুশোচনার অগ্নিতে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

এমনি করিয়া এক করুণ মুহূর্তে নাটকটির সমাপ্তি ঘটিয়াছে। এখন, গঠন-কৌশলের দিক হইতে এই ঘটনার বিচার করিলে প্রথমেই বলিতে হয়, কুমারসেনের জন্য আকুল আগ্রহে রাজা বিক্রমদেবের প্রতীক্ষা এবং রানী সুমিত্রার আবির্ভাব নাটকীয়তার দিক হইতে প্রকৃতই অনবদ্য। রানী সুমিত্রার ঐরূপ আবির্ভাবের জন্য আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ সত্যই এক বিস্ময়কর নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। রানী সুমিত্রার এই আবির্ভাব হয়ত অনেকের নিকট ছিল অপ্রত্যাশিত, কিন্তু ইহাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না। কারণ পূর্ববর্তী দৃশ্যে ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। কাজেই পূর্বাপর সূত্র বিচার করিলে সুমিত্রার আবির্ভাব ও মৃত্যুকে একান্ত-ভাবে অসঙ্গত বলা চলে না। সুমিত্রার মৃত্যু নাট্যধর্মের দিক দিয়াও অসার্থক নহে এবং ইহা উদ্দেশ্যমূলক। কেননা তাঁহার মৃত্যুর মধ্য দিয়াই বিক্রমের প্রায়শ্চিত্ত ঘটিয়াছে। শেক্সপীয়রের নাটকে পাপীকে সাধারণত তাহার স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, কিন্তু রবীন্দ্র নাট্যে পাপীর চেতনাকে উজ্জীবিত করিবার জন্য একজন নিষ্পাপকে আত্মাহুতি দিতে হয়। আলোচ্য নাটকে রানী সুমিত্রার মৃত্যু অনুরূপ তাৎপর্য বহন করিতেছে।

নাটকীয় গঠন-কৌশলের চমৎকারিত্ব আরও দুইটি ঘটনায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমত, রানী রেবতীর প্রবেশ ও প্রস্থান এবং দ্বিতীয়ত, অনুতপ্ত রাজা বিক্রমের মার্জনাভিক্ষার মধ্য দিয়া নাটকের সমাপ্তি। নাট্যরসের বিচারে এই দুইটি ঘটনাই অনন্য। রানী রেবতীর চরিত্রে যে ক্রূরতা আমরা দেখিয়াছি ঐরূপ ভাবে প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া আমরা সেই ক্রূরতারই অপরিবর্তিত পরিচয়টি আবার পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে দেখিয়াছি, তাই ক্রূর হইলেও নাটকীয় চরিত্র হিসাবে চরিত্রটি বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়ত, নাটকের যবনিকাপাত হইয়াছে অনুতাপী রাজা বিক্রমের মার্জনাভিক্ষার মাধ্যমে। রোমান্টিক ট্র্যাজেডির বিচারে এই পরিণতি অসার্থক নহে।

যদিও 'রাজা ও রানী' নাটকের কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রখ্যাত নাট্যকার

শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তবুও একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই নাটকের শেষ দৃশ্যে শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতিতে তাঁহার নায়ক বিক্রমের মৃত্যু দৃশ্য রচনা করেন নাই, বরং মৃত্যু না ঘটাইয়া অসাধারণ শিল্প কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ, বিক্রমদেবকে এক অতৃপ্ত প্রেম ও অনুশোচনার অনির্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। নিঃসন্দেহে ইহা ট্র্যাজেডির রসকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে।

এই দৃশ্যে কুমার-প্রণয়িনী ইলার প্রবেশ ও মূর্ছা একটু মেলোড্রামাটিক বলিয়া মনে হয়। এই অংশটুকু এমনই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে, মূল ঘটনার সহিত ইহা যোগসূত্র রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু বিচার এইখানেই সমাপ্ত নহে, আরও একটি দিক আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। আমরা বিচার-বিশ্লেষণে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, এই দৃশ্যেই নাটকের মূল চরিত্রগুলির পরিণতি ঘটিয়াছে, সকল চরিত্রই স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একদিকে যেমন রানী সুমিত্রার ত্যাগনিষ্ঠ প্রেমের পরিণতি দেখা গেল, অন্যদিকে তেমনি রাজা বিক্রম চরিত্রের মাহাত্ম্যও উদ্‌ঘাটিত হইল। রাজা বিক্রমের চরিত্র হীন বা নীচ নহে, তিনি ভ্রান্ত। ভ্রান্তি বশত তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা নীচতা বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। বস্তুত, এক ক্ষুব্ধ অভিমানবশত বিক্রমদেব আগাইয়া গিয়াছেন আত্মহননের পথে—সর্বনাশের উন্মত্ততায়। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে হইয়াছে। কুমারী ইলার প্রেমের নিষ্ঠায় পরিচয় পাইয়া প্রেমের যথার্থ স্বরূপ তিনি অনুভব করিয়াছেন। ট্র্যাজেডি এই যে, যখন তিনি অগ্নিশুদ্ধ হইয়া কুমার ও সুমিত্রার জন্য আকুল প্রতীক্ষায় রত, সেই সময়ে আসিল নিদারুণ আঘাত—সহধর্মিণী সুমিত্রাকে পাইয়াও তাঁহাকে চিরতরে হারাইলেন।

বাল্যবন্ধু দেবদত্ত রাজা বিক্রমদেবের প্রকৃত সুহৃদ। আমরা তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত রাজার পার্শ্বে তাঁহার চরম দুঃখের দিনে দণ্ডায়মান দেখিলাম। ভৃত্য শঙ্করের আনুগত্য শেষ পর্যন্ত অবিচলিত থাকিতে দেখা গেল। রাজা চন্দ্রসেন অনুতপ্ত হইলেন। এইভাবে নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির সার্থক পরিণতি ঘটিল এই দৃশ্যে। তাই আঙ্গিকের বিচারে বলিতে হয় এই নাটকের শেষ দৃশ্যটিতে মেলোড্রামাটিক স্পর্শ থাকিলেও এই দৃশ্যটি সমগ্র নাটকের

স্বাভাবিক পরিণতির দায়িত্ব বহনে সমর্থ হইয়াছে। তাই সামগ্রিক বিচারে এই দৃশ্যটিতে আমরা নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর সৃষ্টি প্রতিভার পরিচয় লাভ করি।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ 'রাজা ও রানী' নাটকের জনতার দৃশ্যগুলির নাটকীয় তাৎপর্য এবং তাহাদের চিত্র ও চরিত্রের সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

উত্তর ॥ রবীন্দ্রনাথ রচিত কয়েকটি নাটকের মধ্যে আমরা জনতার দৃশ্য দেখি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজা ও রানী, বিসর্জন, মুক্তধারা প্রভৃতি নাটকের উল্লেখ করা চলে। রাজা ও রানী, বিসর্জন প্রভৃতি নাটকে যে জনতার দৃশ্য রহিয়াছে তাহার ভূমিকা অপ্রধান হইলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিলে লক্ষ্য করা যায়—তাহার মধ্য দিয়া এক বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে। ঐ দৃশ্যগুলি এক দিক দিয়া যেমন উদ্দেশ্যমূলক তেমনই মর্মতত্ত্ব-ধর্মী। নাটকে নায়ক নায়িকার চরিত্র-চিত্রণ ব্যতীত সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য রচনার ক্ষেত্রেও যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ—এই দৃশ্যগুলি তাহারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

'রাজা ও রানী' নাটকে একাধিক জনতার দৃশ্য রহিয়াছে। যেমন প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য; তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য, পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় ও অষ্টম দৃশ্য। এই জনতার দৃশ্যগুলি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এক, জালন্ধরের প্রজাবৃন্দ ও দুই, কাশ্মীরের প্রজাবৃন্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের দুই দৃশ্য জালন্ধরের জনতা লইয়া রচিত এবং বাকী দৃশ্যগুলি কাশ্মীরের প্রজাদের লইয়া সৃষ্ট।

জালন্ধরের পটভূমিকায় যে দুইটি জনতার দৃশ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাদের চিত্র ও চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব রাজকার্যে অমনোযোগী। তাঁহার অবহেলার ফলে বিদেশী কাশ্মীরী নায়কবৃন্দ জালন্ধর রাজ্যে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রাজ্যে তাহাদের অত্যাচারের ফলে যে কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে—প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে জনতার উপস্থাপনের মাধ্যমে তাহা লক্ষ্য করা যায়।

নিরীহ, সাধারণ প্রজারা এমনই উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত যে, তাহারা সহ্যের সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

"কিনু নাপিত। ওরে ভাই, কান্নার দিন নয়। অনেক কেঁদেছি, তাতে কিছু হল কি?"

• স্পষ্টই বোঝা যায়, তাহারা রাজার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিতে উন্মুখ।

"হরিদীন। সব বুঝলাম, কিন্তু যে রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে?" এবং—

"অনেকে (উচ্চৈঃস্বরে)। তবে শাস্তর চুলোয় যাক্—অস্তর ধরো।"

কিন্তু আসলে ইহারা দুর্বল, অসহায়। নাট্যকার অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব রূপায়িত করিয়াছেন। রাজসখা দেবদত্ত যে মুহূর্তে তাহাদের জানাইল যে, রাজার কানে তাহাদের বিদ্রোহের কথা পৌঁছিবে, তখনই তাহারা ভীত হইয়া পড়িল।

"অন্য সকলে। ঠাকুর, আমাদের মাপ করো, ঠাকুর, মাপ করো—"

প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের চিত্রগুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাজা ও রানী সম্পর্কে প্রজাদের ধারণা সুস্পষ্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"স্ত্রী। ওগো, রানীই তো রাজাকে জাদু করে রেখেছে। আমাদের রাজা ভালো, রাজার দোষ নেই, ঐ বিদেশ থেকে এক রানী এসেছে—যে আপন কুটুম্বদের রাজ্যজুড়ে বসিয়েছে। প্রজার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে গো।"

—বলা বাহুল্য, নাটকীয় উপজীব্যের দিক হইতে এই দৃশ্যটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে, কেননা, রানীর রাজ্যত্যাগে এই দৃশ্যটি প্রচুর সহায়তা করিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি কাশ্মীরের প্রাসাদ সম্মুখস্থ রাজপথে সংঘটিত হইয়াছে। একদল সৈনিক নিজেদের মধ্যে দেশের কথা আলোচনা করিতেছে। তাহাদের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা যুবরাজ কুমারসেনকে সিংহাসনারূঢ় দেখিতে আগ্রহী। এইভাবে, তাহাদের কথা-বার্তার মধ্য দিয়া কুমারের রাজ্যব্যাপী জনপ্রিয়তা ও তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে—

"প্রথম সৈনিক। খুড়ো-মহারাজকে গিয়ে বলবে, তুমি নেমে এসো। আমরা রাজপুত্তুরকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ করতে চাই।"

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজা বিক্রমদেব কাশ্মীর জয় করিতে আসিতেছেন শুনিয়া কাশ্মীর-প্রজাদের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া কীভাবে দেখা দিল, এই দৃশ্যে তাহাই উদ্‌ঘাটিত—

"দ্বিতীয়। না বেচলে কি আর রক্ষে আছে? এদিকে জালন্ধরের সৈন্য এল বলে। সমস্ত লুটে নেবে।......"

কিন্তু ইহাতে তাহারা ভয়-পীড়িত নহে—তাহারা শত্রু-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আগ্রহে আনন্দোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।—

"দ্বিতীয়। তোরা যা ভাই। আমি তামাসা দেখে আসি। সার বেঁধে খোলা তলোয়ার হাতে যখন সৈন্য আসে আমার দেখতে বড়ো মজা লাগে।"

ইহারাও কুমারসেনকে সিংহাসনে বসাইতে ব্যাকুল। কুমার যে এই সকল প্রজার অন্তর জয় করিয়াছে—এই দৃশ্যে তাহারই পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যটি ঠিক জনতা-দৃশ্য নহে, তবে অনুরূপ।* যুবরাজ কুমারসেনের দুইজন অনুচরের কথোপকথনের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন বিক্রমের অত্যাচারের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি কুমার-সুমিত্রার প্রতি তাহাদের অপরিসীম আনুগত্যের চিত্রটিও ফুটিয়া উঠে।

বস্তুতঃ, অপ্রধান হইলেও এই দৃশ্যগুলি মূল আখ্যানের সহিত ওতোপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত থাকিয়া এক বৃহত্তর সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্র রচনা করিয়াছে। এইসব সাধারণ মানুষের জীবন-সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনুগত্য, দুর্বলতা, স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিহাস-প্রিয়তার চিত্রাদি ও চরিত্র এই দৃশ্যগুলির মাধ্যমে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এবং এইসব দৃশ্যের উপস্থাপনার মধ্যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতার দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সামগ্রিক বিচারে, নাটকটির সাফল্য সৃষ্টিতে এই অপ্রধান জনতা-চিত্র ও চরিত্রগুলি এক অসামান্য ভূমিকা লইয়াছে—ইহা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ।। ২২ ।। মূল কাহিনীর নায়ক বিক্রমদেব ও উপকাহিনীর নায়ক কুমারসেন এই দুইটি চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর-সংকেত ।। ['চরিত্র বিচার : মুখ্য চরিত্র' ও 'চরিত্র বিচার : গৌণ চরিত্র' অংশে আলোচিত অংশের সহিত নিম্নলিখিত আলোচনা মিলাইয়া উত্তর রচনা কর।]

মুখ্য কাহিনীর নায়ক রাজা বিক্রমদেব জালন্ধরের রাজা, উপকাহিনীর নায়ক কুমারসেন কাশ্মীরের যুবরাজ। উভয়ের মধ্যে আছে গভীর আত্মীয়তা। তাঁহাদের এই সম্পর্ক নিঃসন্দেহে মধুর। অথচ, ঘটনার আবর্তে উভয়ের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তীব্র বিরোধ। এবং শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জন করিতে হইয়াছে কুমারকে।

বিক্রমদেব নায়ক, তাঁহার চরিত্রে নায়কোচিত গুণের অভাব নাই। কুমার প্রতিনায়ক। বয়সে তরুণ—বিক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী। সুমিত্রাকে লইয়া দেখা দিয়াছে বিরোধ। বাধিয়াছে সংঘাত। সুমিত্রাকে রক্ষা করার জন্যই কুমারসেন সুমিত্রার সাহায্যে আগাইয়া আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে এবং ফলে শেষ পর্যন্ত তাহার উপর পড়িয়াছে বিক্রমের রোষ-দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি-অগ্নিতে কুমার হইয়াছে দগ্ধ।

এ-কথা বলা হয়ত অসঙ্গত নহে যে, কুমারের চরিত্রে বাহ্যতঃ প্রখরতা, প্রচণ্ডা বা বলিষ্ঠতা নাই। তথাপি, তাহার মধ্যে রহিয়াছে এক গভীর ও প্রবল সত্যনিষ্ঠা। এই সত্যনিষ্ঠার পার্শ্বে দাঁড়াইবার মত ক্ষমতা বিক্রমদেবের নাই। এবং সত্যনিষ্ঠার জন্য আত্মত্যাগের মাধ্যমে কুমারসেন মহত্ত্ব অর্জন করিয়াছে। তাহার চরিত্রের এই গুণের জন্যই কাশ্মীরের প্রজাবৃন্দ তাহাকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করিয়াছে; অন্তর হইতে তাহাকে ভালবাসিয়াছে এবং এই সত্যনিষ্ঠার জন্যই কুমার সমস্ত দুঃখকে বরণ করিয়া শেষে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

অন্যদিকে, বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও রাজা বিক্রমদেবের চরিত্রের কোথাও এই মাধুর্য পরিলক্ষিত হয় না। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে অবশ্য অনুতপ্ত-চিত্তে বিক্রমদেব কুমারকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা

করিয়াছেন কিন্তু কুমার চরিত্রে যে স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা আছে, তাহা বিক্রমের মধ্যে নাই।

রাজা বিক্রম ও যুবরাজ কুমারসেন—উভয়েই প্রেমিক, কিন্তু পার্থক্য আছে। বিক্রমদেবের প্রেম ভোগনিষ্ঠ, কামার্ত বলিয়া রানী সুমিত্রাকে বন্ধনের মধ্য দিয়া জয় করিতে চাহিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সেই প্রেম আত্মঘাতী এবং বিশ্বঘাতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কুমারসেনের প্রেম মুক্তির মধ্য দিয়া কুমারী ইলাকে লাভ করিতে আগ্রহী বলিয়াই সে ইলাকে নিবিড় ভাবে লাভ করিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, এই দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রেমের যে দুইটি দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—সেইখানেই চরিত্রদুইটির তাৎপর্য ও সার্থকতা।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ 'রাজা ও রানী' নাটকের সুমিত্রা ও 'তপতী' নাটকের সুমিত্রা চরিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কি? আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ॥ ['চরিত্র-বিচার: মুখ্য চরিত্র' অংশের সহিত নিম্নলিখিত অংশ যোগ করিয়া উত্তর রচনা কর।]

আলোচ্য দুইটি নাটকেরই নায়িকা—সুমিত্রা। 'তপতী' রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়-প্রতিভার সৃষ্টি। ইহা 'রাজা ও রানী'র রূপান্তরিত রূপ। রূপান্তর ঘটাইতে গিয়া যে সব পরিবর্তন আসিয়াছে—তাহার মধ্যে সুমিত্রা চরিত্র অন্যতম। আপাতদৃষ্টিতে বিচার করিলে 'তপতী' নাটকের সুমিত্রা চরিত্রের সঙ্গে মূল নাটক 'রাজা ও রানী'র কোন বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে না; কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, মূল নাটকের সুমিত্রার সহিত বেশ পার্থক্য রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, মূল নাটকে সুমিত্রার প্রতি নাট্যকারের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই, পক্ষান্তরে 'তপতী' নাটকে সুমিত্রার প্রতি নাট্যকারের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, মূল নাটকে রানী সুমিত্রার ত্যাগনিষ্ঠ ও মাতৃরূপ ফুটিয়া উঠিলেও তাহাই প্রধান হইয়া উঠে নাই কিন্তু রূপান্তরিত 'তপতী' নাটকে সুমিত্রাকে সূচনা হইতেই সেইভাবে নাট্যকার চিত্রিত করিয়াছেন। সুমিত্রার অগ্নিশুদ্ধ উৎসর্গীকৃত 'তপতী' রূপ অঙ্কিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় এবং সেইজন্যই নাটকের নামকরণ করা হইয়াছে—'তপতী'।

তৃতীয়তঃ, রাজা ও রানী নাটকে নায়িকা চরিত্র সুমিত্রার মধ্যে যুগপৎ প্রিয়া ও জননী রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে 'তপতী'র মধ্যে জননী রূপই বা তপতী রূপই চিত্রিত হইয়াছে। আগাগোড়া এই চরিত্রটি সেই আলোকেই রচিত। সেইজন্যই কেহ কেহ 'তপতী' নাটকের সুমিত্রা চরিত্রকে টাইপ চরিত্র বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, মূল নাটকের সুমিত্রার মধ্যে প্রবল ব্যক্তিত্বের অভাব রহিয়াছে, যেমন লক্ষ্য করা যায় রূপান্তরিত নাট্যরূপ তপতীর মধ্যে।

বস্তুতঃ, এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে উভয় নাটকেই সুমিত্রার যে রূপ দেখা যায় তাহা আপাতদৃষ্টিতে অভিন্ন হইলেও মনোধর্ম বা প্রকৃতির দিক দিয়া অভিন্ন নহে বলিয়াই প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ 'তপতী' নাটকের সুমিত্রাকে সামগ্রিক বিচারে নবরূপেই রূপায়িত বলা সঙ্গত।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ রানী সুমিত্রা ও কুমারী ইলার চরিত্রদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর ॥ 'রাজা ও রানী' নাটকের মূল কাহিনীর নায়িকা কাশ্মীররাজ-দুহিতা রানী সুমিত্রা—রাজা বিক্রমদেবের প্রেয়সী। একদিকে মহিমময়ী অত্যুজ্জ্বল সুমিত্রা-চরিত্র, আর একদিকে উপকাহিনীর নায়িকা ত্রিচূড়রাজ্যের অসামান্যা রূপবতী কন্যা ইলা, কাশ্মীররাজপুত্র কুমারসেনের প্রেয়সী। এই দুই নারী-চরিত্রের প্রেমময়ী রূপ এই নাটকের ট্র্যাজিক পরিবেশে আপন আপন মাধুর্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রেমাদর্শ এই দুইটি নারী-চরিত্রের মধ্যদিয়া প্রকাশিত হইলেও এই নাটকে এই প্রেমাদর্শের সর্বাধিক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে রানী সুমিত্রার কল্যাণ-সুন্দর জীবনে। কর্তব্যবোধের সহিত দেহজ কামনার ঊর্ধ্বচারী প্রেমানুভূতি, মাধুর্যের সহিত মঙ্গলভাবনার যোগে সুমিত্রা-চরিত্র অপূর্বতা লাভ করিয়াছে। তিনি কর্তব্যপরায়ণা মহিষী, মাধুর্যময়ী প্রেয়সী, মর্যাদাবোধসম্পন্না রাজদুহিতা, স্নেহময়ী ভগ্নী এবং মমতাময়ী সহানুভূতিশীলা প্রজাজননী।

বিক্রম-সহধর্মিণী সুমিত্রা বিপরীত কোটিতে অবস্থিত স্বামীর অসংযত, উদ্দাম ও উচ্ছল প্রেমকে আপন প্রশান্ত, স্নিগ্ধ ও সংবৃত প্রেমের স্পর্শে সঞ্জীবিত

করিতে চাহিয়াছেন ; আত্মবিস্মৃত, সংসার পলাতক, কর্তব্যচ্যুত রাজাকে মোহকলুষতা হইতে মুক্তি দিবারজন্য ধর্মবোধ-প্রণোদিত, সংসারমুখী, মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত, নির্বিশেষের অভিমুখে ধাবিত রানী মোহবাসনামুক্ত প্রেমের মূর্তিমতী বিগ্রহরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু দুইটি চরিত্রের এই বিপরীতমুখিতা তাঁহাদের মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

তরঙ্গিত বাসনার আবেগোদ্বেলতাশূন্য ভালোবাসার গভীরতাই সহধর্মিণী সুমিত্রার ভালোবাসার স্বরূপ। ইহাই যথার্থ প্রেম। কারণ রানী সুমিত্রা স্বামীর ন্যায় জৈব প্রকৃতির ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ পরিধিতে আপন প্রেমকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলেন নাই। বহুর সহিত কল্যাণ-যোগে যুক্ত থাকিয়া আপন মানবিক সত্তাকে চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন। সংসারের অশেষবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনেই যাঁহার তৃপ্তি ও আনন্দ, তাঁহার পক্ষে স্বামীর ভোগসর্বস্বতাকে সাগ্রহে স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়াই রাজার সহিত রানীর বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এ বিরোধ ভোগসর্বস্বতার সহিত উচ্চতরভাবাদর্শের।

রানী সুমিত্রা স্বামীগৃহে শত কর্মে ব্যস্ত। স্বামীকে ভালোবাসিয়া সুমিত্রা বৃহত্তর সংসারকে ভালোবাসিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত মঙ্গলকর্ম স্বামী-প্রেমের মধ্যে মুক্তিরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাই মহৎ প্রেম, ইহাই অখণ্ড প্রেম। মহৎ প্রেম অখণ্ড ঐক্যের ক্ষেত্রে মানুষকে টানিয়া আনে। তাহাকে শুচিশুভ্র আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। (রানী সুমিত্রা এই আনন্দলোক-বাসিনী ; এই আনন্দস্বর্গে অধিষ্ঠিতা দেবী। প্রেমস্বর্গে অধিষ্ঠিতা দেবী সুমিত্রা কোমলতা-বিজড়িত তেজস্বিতা. অপরিসীম ব্যক্তিত্ব ও আত্মস্বার্থ-ত্যাগ এবং শেষপর্যন্ত আত্মোৎসর্জনের মহত্ত্বতায় আমাদের অপরিসীম শ্রদ্ধার অধিকারিণী হইয়া উঠিয়াছেন। একটি মহৎ জীবনের দুঃখ-দুর্ভোগ এবং শেষ পরিণতি—মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদের আহত করিয়াছে)

(রানী সুমিত্রার মত কুমারী ইলাও প্রেমময়ী। ইলা প্রেম-জীবিতা। কুমারী ইলার অণুতে অণুতে মিশিয়া আছেন কুমার। তাহার চিত্ত কুমার-ধ্যানে মগ্ন। সূর্যের অভাবে নতমুখী সূর্যমুখীর মতোই কুমার-হীন ইলা অশ্রু-মুখী। ইলা তাহার নারীহৃদয়কে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে প্রিয়তমের নিকট।) বলিয়াছে—'একাকিনী কেহ নহি আমি।' কুমার-গত-প্রাণ ইলার জীবনমন হরণ করিয়া লইয়াছে প্রণয়ী কুমারসেন। তাহাদের

এই ভালোবাসার গভীরতা অন্তহীন। প্রেমানুভূতি এত গভীর, এত তীব্র, এত প্রবল বলিয়াই ক্ষণিকের বিচ্ছেদও সহনীয় নহে। কেবলই দুইটি প্রাণে জাগে বিচ্ছেদের ব্যথা। এইখানেই প্রেমের রহস্য। সংশয়হীন প্রাপ্তির মধ্যেও অপ্রাপ্তির করুণ বেদনা। ইলা অন্তরে এই বেদনাই অনুভব করে। তাই বার বার প্রণয়াস্পদকে প্রশ্ন করে—এই "মিলনপাশ কখন বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে, চোখে চোখে, মর্মে মর্মে, জীবনে জীবনে?" স্বপ্নমগ্না ইলা প্রিয়তমের উষ্ণসান্নিধ্যে আসিয়া সুগভীর সুখ-সমুদ্রে ডুব দেয়। এক নিবিড় অনুভূতিতে সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই গভীর অনুভবের সুখস্পর্শে কুমার ও ইলা বাস্তব জগতের রূঢ়তা হইতে অবাস্তব জগতের স্বপ্নলোকে যাত্রা করে। দুইটি প্রাণে জাগে রোমান্টিক ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুল বাসনা বেদনা-বিজড়িত।

[কুমারী ইলা প্রেমে দুর্বল। কিন্তু এই ইলাই প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিতা। ইলার প্রেমে মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃতি ঘটায় না; আত্মবিসর্জনের অনুপ্রেরণা দেয়। এ প্রেম চির-অপরাজিত। তাই অসহ্য বিরহবেদনা ও আত্মসমর্পণের দুঃসহ লজ্জা বহন করিয়াও এই প্রেম বিচলিত হয় নাই, সত্যভ্রষ্ট হয় নাই।

রাণী সুমিত্রার মতো বিদ্রোহিনী হইবার শক্তি ইলার নাই। এমনকি পিতার লজ্জাজনক প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিবার মতো তেজস্বিতাও তাহার নাই; কিন্তু অকলঙ্ক প্রেমের জন্য মৃত্যুবরণ করিবার আত্মবিশ্বাস তাহার আছে। তাই নবপ্রেমতৃষ্ণাকাতর রাজা বিক্রমের নিকট লজ্জা-ভীরু, রূপসী ইলা শেষ-পর্যন্ত দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলিয়াছে,

"লহ তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন করে বনের হরিণী
নিয়ে যাও বুকে তার তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে;" —প্রেমের এই

ঐকান্তিকতায় ইলা চির-বিজয়িনী। কিন্তু মর্তের মানবমানবীর প্রেম বোধহয় চির অভিশপ্ত। তাই বিশ্বাসবলিষ্ঠ প্রবল প্রেমের অধিকারিণী হইয়াও ইলা শেষপর্যন্ত তাহার প্রণয়াস্পদকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

বিক্রমপ্রেয়সী রাণী সুমিত্রা প্রেমে অবিচলিতা—কুমারপ্রেয়সী ইলাও। কিন্তু দুইটি নারী-হৃদয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। রাণী সুমিত্রা আপন ব্যক্তিত্বে সুদীপ্তা, স্বেচ্ছায় ত্যাগবরণে মহিমান্বিতা; ইলার সে ব্যক্তিত্ব নাই সত্য, কিন্তু

প্রয়োজন হইলে আত্মসমর্পণ নহে, প্রাণবিসর্জনের সঙ্কল্পে সে দৃপ্তা। সুমিত্রা আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিতা, আর ইলা আমাদের অন্তরের প্রীতি-ধন্যা।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ 'রাজা ও রানী' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর ॥ যে-কোন গ্রন্থের নামকরণ বিচার—সাহিত্য সমালোচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচয়িতার সজ্ঞান অভিপ্রায়ের অভিচিহ্নধারণেই নামকরণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। নাটক, উপন্যাস, রোমান্স—সাহিত্যের নানান ক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থানেই লক্ষ্য করা যায়, কাহিনী-বিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে স্রষ্টার কোন বিশিষ্ট বক্তব্য প্রকাশের সহিত রচিত গ্রন্থের নামকরণটি সম্পর্কিত। ফলে নামকরণের ক্ষেত্রে নানান রীতির প্রচলন হইয়াছে। কোথাও বা লেখকের মূল বক্তব্যের একটি সুসংহত প্রতীক আবার কোথাও বা পাত্রপাত্রীর মধ্যে কাহারও নাম অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের নামকরণ করার রীতি প্রচলিত। নায়ক কিংবা নায়িকার নামাঙ্কে নাটক-উপন্যাসের নামকরণই সর্বাধিক প্রাচীন ও প্রচলিত রীতি। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রথম অধ্যায়ে উপন্যাসগুলির অধিকাংশই এই রীতিতে নামাঙ্কিত।

বর্তমান আলোচ্য নাটকটির নাম—'রাজা ও রানী'। আঠার শতকের ইংরেজী 'Heroic Drama'র আদর্শে রচিত এই নাটকটি একখানি রোমান্টিক ট্র্যাজেডি।

এই রোমান্টিক ট্র্যাজেডির নায়ক জালন্ধরের অধিপতি রাজা বিক্রমদেব এবং নায়িকা জালন্ধররাজ বিক্রমদেবের মহিষী রানী সুমিত্রা। মূলতঃ এই দুইটি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে 'রাজা ও রানী' নাটকের মূল কাহিনী। এই মূল কাহিনী-ধারার পাশেই প্রবাহিত হইয়াছে আর একটি উপকাহিনী ধারা। এই উপকাহিনীর নায়ক ও নায়িকা—কুমারসেন ও ইলা।

'রাজা ও রানী' নাটকটির কাহিনী-বৃত্তটি অনুধাবন করিলে লক্ষ্য করা যায়, ইহাতে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে একটি তত্ত্ব। ভাববাদী কবি-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ একটি তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া এই নাটক রচনা করিয়াছেন। শিল্পকর্ম হিসাবে এই নাট্যরূপ নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। নাট্যকার প্রদত্ত এই

তত্ত্বকে এক এক কথায় বলা চলে—প্রেমতত্ত্ব। প্রেমজীবনের সত্য ও রহস্য আলোকিত হইয়াছে এই নাটকে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন—কামনা-কলুষিত, দেহাশ্রয়ী অতৃপ্ত প্রেম-কামনা কিভাবে মানব-মানবীর জীবনে শোচনীয় পরিণতি লাভ করে।

প্রেম সর্বকালিক ও সর্বজনীন মানবমনের সূক্ষ্ম সুকুমার একটি বৃত্তি—যাহা সহজাত, স্বাভাবিক। ইহা আত্মার জ্যোতির্ময়ী শিখা। বিশুদ্ধাবস্থায় এই প্রেম প্রাণদ, শক্তির উৎস ও কল্যাণ-বিভাসিত। এইরূপ কল্যাণসুন্দর প্রেম ভোগতৃপ্তির পথে চলে না, আত্মতৃপ্তির মোহে বিচলিত হয় না, মানবীসত্তার সামঞ্জস্যকে বিনষ্ট করে না, বিশ্বনীতিকে আহত করে না। ইহা শাসন-সংযম নিয়ন্ত্রিত; স্বাধিকার প্রমত্ত নহে।

এই প্রেম শান্ত, সুন্দর, সংযত ও কল্যাণ-বিভাসিত। প্রেমজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন বলিয়া ইহা সত্য-সুন্দর এবং মাধুর্যময়। সর্বপ্রকার দুঃখ-বিপদ্, ক্ষয়-ক্ষতি এমনকি মৃত্যুকে বরণ করিতেও এই প্রেম সর্বদাই প্রস্তুত। ইহা সকল বিরোধের ঊর্ধ্বচারী। তাই বিশ্ব নিখিল ইহার অনুকূলে। কেহ ইহাকে আঘাত করে না, করিলেও বীর্যদীপ্ত প্রেম কখনও বিচলিত হয় না। প্রেমের বৈশিষ্ট্য—ভোগচঞ্চলতা নহে, ভোগ-বৈরাগ্য। দেহাতীত আনন্দরস, নিরবয়ব মানস উপলব্ধি বলিয়াই এই প্রেম দেহমিলনের বাসনায় বিকশিত নহে। ইন্দ্রিয়জ কামনা-স্পর্শে চরিতার্থ নহে। প্রকৃত প্রেমের সাধনা—ত্যাগের ও বৈরাগ্যের সাধনা। আনন্দ-চৈতন্যলোকে ইহার সার্থক উত্তরণ।

'রাজা ও রানী' নাটকের নায়ক রাজা বিক্রমদেব প্রকৃত প্রেমের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। জালন্ধররাজ বিক্রমদেবের প্রেম ছিল স্থূল কামনা কলুষিত। মহিষী সুমিত্রাকে তিনি শুধুমাত্র ভোগের বস্তু বলিয়াই জানিয়াছেন। রানী সুমিত্রা তাঁহার নিজের শ্রেয়সী সত্তাকে মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পারেন নাই বলিয়াই রাজার জৈবপ্রবৃত্তির উদ্দাম উন্মত্ততার নিকট তিনি বাঁধা পড়েন নাই। স্বামী বিক্রমদেবকে তিনি বার বার রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিয়াছেন। লোকজননী রানী সুমিত্রা চাহিয়াছিলেন শ্রেয়োমঙ্গলকে প্রেয়োভোগস্পৃহার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে। মোহান্ধ রাজা বিক্রম পারেন নাই বিবেকের দীপ্ত, পূর্ণালোকে

মত্ততার আত্মবিস্মৃতির অবস্থায় হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। রানী সুমিত্রার দৃঢ়সংকল্প—তিনি স্বামীর অন্তরে সত্যবোধ জাগ্রত করিবেন, তাই নিজেকে রাজার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া তিনি এই সংকল্পকে বাস্তবায়িত করিতে অগ্রসর হইলেন। এইভাবে ভোগকেন্দ্রচ্যুত হইয়া রাজা বিক্রমদেবের অন্ধপ্রেম প্রচণ্ড হিংস্রতার রূপ লইল। ইহার আত্মপ্রকাশ ঘটিল বীভৎসতায়। মহৎ প্রেমের যে সুউচ্চ ভূমিতে রানী সুমিত্রার অধিষ্ঠান, রাজা বিক্রম সেই সুউচ্চ ভূমিতে নিজেকে তুলিয়া আনিতে পারেন নাই, তাই নিকটে পাইয়াও তিনি রানী সুমিত্রার নিকট হইতে দূরেই রহিয়া গিয়াছেন। যেদিন রাজা তাঁহার অন্তরে রানীর সত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেন, সেইদিন রানী সকল বন্ধনমুক্ত হইয়া চিরকালের জন্য দূরে চলিয়া গিয়াছেন। একান্ত বাঞ্ছিত সুমিত্রাকে পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াও রাজা বিক্রম চিরকালের জন্য তাঁহাকে হারাইলেন। চির অপরাধের দুঃসহ অনুতাপজ্বালায় তাঁহার অন্তর জর্জরিত হইয়া উঠিল। নিঃসীম বেদনার্ত হৃদয়ে হৃদয়-শোণিতসিক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন :

"দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে? ইহজন্ম
নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহাতে দিলে না অবকাশ।
দেবতার মতো তুমি নিশ্চয় নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।"

প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারায় রাজা বিক্রমদেব একদিকে প্রেমে ব্যর্থ হইয়াছেন আর একদিকে চিরবাঞ্ছিত রানী সুমিত্রাকে নিকটে পাইয়াও শেষপর্যন্ত চিরকালের জন্য হারাইতে বাধ্য হইলেন। ফলে চিরবাঞ্ছিতার মৃত্যুর মধ্যদিয়া তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিয়াছে অনিবার্য নিদারুণ ট্র্যাজেডি। রাজা বিক্রম ও রানী সুমিত্রার জীবনের এই ট্র্যাজেডি বর্তমান নাটকখানির উপজীব্য। শুধুমাত্র রাজা বিক্রম কিংবা শুধুমাত্র রানী সুমিত্রার নামে সমগ্র নাটকখানিকে চিহ্নিত না করিয়া নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিতধর্মী নামকরণের মাধ্যমে তাঁহার বক্তব্যকে তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং বলা চলে 'রাজা ও রানী' নামকরণ সুপ্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন ॥ কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী নাটকের উপর বিখ্যাত ইউরোপীয় নাট্যকার ইবসেন রচিত 'A Doll's House' নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন—এ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ বহুদর্শী স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যে বিদেশী সাহিত্যের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাহা তাঁহার বহু রচনাতেই সুপরিস্ফুট। নাট্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁহার উপর গ্রীক ও শেক্স্পিয়রীয় প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নহে। 'রাজা ও রানী' নাটক সম্পর্কেও একথা সত্য বলিয়াই অনেক মনে করেন, তাই কোন কোন সমালোচক এই নাটকের মূল ট্র্যাজিক পরিকল্পনাতে গ্রীক্ ও শেকস্পীয়রীয় ট্র্যাজিক পরিকল্পনার প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন; কেহ কেহ রানী রেবতী-চরিত্রের উপর শেকস্পিয়রের চিরজীবী সৃষ্টি লেডী ম্যাকবেথের চরিত্রের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ সমালোচক এডওয়ার্ড টমসন ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত 'রাজা ও রানী' নাটকের সমালোচনা করিতে বসিয়া অনুরূপ বিদেশী প্রভাবের কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "Ibsen's influence has been considerable on the younger School of Bengali writers; I cannot say if Rabindranath, in these earlier days, had read 'A Doll's House'; but the resmblance between Nora and Sumitra is striking and···not accidental." সুতরাং লক্ষ্য করা গেল, 'রাজা ও রানী' নাটকের উপর ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত ইবসেন রচিত 'পুতুলের সংসার' (A Doll's House) নাটকের প্রভাব যে আকস্মিক নহে, ডঃ টমসন এই বিশ্বাসই পোষণ করেন। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও তাঁহার আলোচনায় অনুরূপ প্রভাবের কথা বলিয়াছেন—"It is not difficult to trace Ibsenist influence in the portraiture of the queen Sumitra···" এই প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে ইবসেনকৃত 'A Doll's House' নাটকের বিষয়বস্তুর সহিত আমাদের পরিচিত হইতে হইবে।

'A Doll's House' শক্তিমান নাট্যকার ইবসেনের সামাজিক সমস্যামূলক এক যুগান্তকারী নাটক। যুগান্তকারী নাট্যকার ইবসেন তাঁহার এই নাটকে পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজে যে নারীসত্তার স্বাধীন বিকাশের, তাহার ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত স্ফুরণের অবকাশ নাই তাহাই উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুরুষের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর মানবিক অধিকার স্বীকৃত নহে, অথচ নারী চাহে—এই সমাজে তাহার ব্যক্তিত্বের স্বাধীন প্রতিষ্ঠা—চাহে স্বাধিকার। পুরুষ যদি নারীর এই অধিকারকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হয় তবে সমাজে কিংবা দাম্পত্য-জীবনে দেখা দিবে বিরোধ। দ্বন্দ্ব-সংঘাত হইয়া উঠিবে অনিবার্য। সুতরাং কাল উপস্থিত, যখন এই সমাজকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে নারীও মানুষ। সে প্রাণহীন পুতুল নহে। সে পুরুষের খেলিবার সামগ্রী নহে। নারীর মানবিক অধিকার স্বীকৃত হইলে তবে দাম্পত্য জীবনে আসিবে স্থায়ী সুখশান্তি, অন্যথায় নহে। নাট্যকার ইবসেনের ভাষায়: 'A woman cannot be herself in the society of the present day, which is an exclusively masculine society with laws framed by men and with a judicial system that judges feminine conduct from a masculine point of view." প্রখ্যাত নাট্যকার ইবসেন এই বক্তব্যের উপরই দাঁড় করাইয়াছেন তাঁহার অমর নাটক 'A Doll's House'।

এই নাটকটি গড়িয়া উঠিয়াছে নায়িকা নোরাকে লইয়া। নায়িকা নোরা প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসেন তাঁহার স্বামীকে। তাই তাঁহার স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য একবার উপায়হীনা হইয়া অন্যের সহি জাল করিয়া, হ্যাণ্ডনোটে তিনি এক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু অর্থ ঋণ করেন এবং নিজে নকল নবিশির কাজ করিয়া উপার্জিত অর্থ হইতে ঋণের বেশ কিছু অংশ পরিশোধও করিয়া দেন। তিনি যে নিজেকে ঋণের জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন—এ সংবাদ স্বামী জানিতেন না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই সংবাদ স্বামীর কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার কথা স্ত্রী নোরাকে জানান। এমনকি তিনি স্ত্রীকে অপমানজনক কথাও বলেন। এতদিন যে নোরা স্বামীকে আদর্শ পুরুষরূপে এবং নিজেকে আদর্শ স্ত্রী ও জননী বলিয়া মনে করিয়াছেন, আজ সেই নোরার জীবনের বলিষ্ঠ বিশ্বাস হইল বিচলিত। 'তিনি আদর্শ পুরুষের

প্রকৃত স্বরূপটি আবিষ্কার করিলেন। এতদিন যে গার্হস্থ্য জীবনের মনোরম চিত্র তিনি মনে মনে আঁকিয়াছিলেন তাহা অবলুপ্ত হইয়া গেল। জাল করা সমাজের চোখে নিন্দনীয় এবং আইনের চোখে দণ্ডনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু নোরা মানসিক কোন্ অবস্থায় এই কাণ্ড করিয়াছেন, নোরার স্বামী সেই অবস্থার কথা একবারও চিন্তা করেন নাই। পুরুষবুদ্ধি নারীর হৃদয়-নির্দেশিত আচরণের বিচার করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই দেখা দিয়াছে দ্বন্দ্ব। নোরার মন হইয়াছে ক্ষতবিক্ষত। স্বামীর দৃষ্টিতে এখন তিনি আদর্শহীনা জায়া ও জননী। তাই এতদিন ধরিয়া স্বপ্নে গড়া আদর্শ সংসার আজ নোরার নিকট পুতুলের সংসারের মতোই অলীক ও অসত্য হইয়া পড়িয়াছে। নিজের সংসারে পুতুলের মতোই তিনি খেলার সামগ্রীর ন্যায় মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এই বেদনা বহন করিয়া নোরা স্বামী ও সন্তানদের পিছনে ফেলিয়াই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আসন্ন বিপর্যয়ের হাত হইতে সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য স্বামীর শেষ মুহূর্তের সম্মানজনক প্রস্তাবের উত্তরে নোরা শুধু জানাইয়া গেলেন—আদর্শ নারী হইতে পারিলে তবেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

নোরার স্বপ্নের সংসার ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল।

ইহা সুস্পষ্ট যে, এক তীব্র সামাজিক সমস্যাই 'পুতুলের সংসার' নাটকে পায়িত। সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথাই এই নাটকের উপজীব্য। কিন্তু 'রাজা ও রানী নাটকেও এই সমস্যার কেন্দ্রে নারী সুমিত্রা উপস্থিত, কিন্তু সে সমস্যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নহে, তাহা প্রেম ও কর্তব্যের বিরোধ-জনিত সমস্যা।

মহারাজ বিক্রমদেব অন্ধ দেহজ প্রেমের আবেগে আত্মবিস্মৃত, রাজধর্ম-বিচ্যুত। রানী সুমিত্রা এই কর্তব্যবিমুখতাকে মনুষ্যত্ববিরোধী বলিয়াই জানেন, জানেন ইহার পরিণাম অশুভ। তাই তিনি বার বার কর্তব্য ও সত্যভ্রষ্ট আত্মবিস্মৃত স্বামীকে সত্যবোধে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি রাজা বিক্রমকে প্রণয়ী-সত্তার উপর রাজ-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন, 'অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী…আমারে দিও না লাজ, আমারে বেসোনা ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।' কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, ফলে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

'পুতুলের সংসার' নাটকের নায়িকা নোরা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন' এবং 'রাজা ও রানী' নাটকের নায়িকা সুমিত্রাও গৃহত্যাগ করিয়াছেন। এইখানে দুইটি নায়িকা-চরিত্রের আচরণে সাদৃশ্য আছে সন্দেহ না। কিন্তু ইঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। রানী সুমিত্রা স্বাধিকার লাভের প্রেরণায় নহে, এমনকি স্বাধীন ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায়ও নহে, রাজা ও প্রজাদের কল্যাণ-কামনায়, শ্রেয়ো-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াই গৃহত্যাগ করিয়াছেন। 'পতিসত্য' পালনের উদ্দেশ্যেই তিনি স্বামীর প্রেমেই স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। রানী সুমিত্রার মহিমা—আদর্শান্বিত আত্মোৎসর্জনে, নায়িকা নোরার সুদীপ্ত—আকাঙ্ক্ষিত আত্মপ্রতিষ্ঠায়।

সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে দুই নাট্যকার তাঁহাদের নায়িকা চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং একটি চরিত্রের দ্বারা আর একটি চরিত্র প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন—তাঁহাদের বক্তব্য শুধু কষ্টকল্পিতই নহে—যুক্তিহীনও।

প্রশ্ন ॥ ৩৮ ॥ আপাত দৃষ্টিতে দেবদত্ত চরিত্রে লঘুতা থাকিলেও বস্তুতঃ ইহা ভাবগম্ভীর এবং প্রভাসমুজ্জ্বল। এই মন্তব্যটি আশ্রয় করিয়া দেবদত্ত চরিত্রের বিশ্লেষণ কর ও তাহার নাটকীয় ভূমিকাটি সুস্পষ্ট কর।

(ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৭).

উত্তর ॥ দেবদত্ত জালন্ধররাজ বিক্রমদেবের বাল্যসখা—ব্রাহ্মণতনয়। পরিণত বয়সেও তাঁহাদের শৈশবের বন্ধুত্ব শিথিল হয় নাই, বরং তাহা আরও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি রাজার বিশ্বস্ত অনুচর। দেবদত্ত 'রাজা ও রানী' নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাঁহাকে দিয়া এই নাটকের আরম্ভ। নাটকের শেষ পর্যন্ত এই চরিত্রটি বর্তমান।

দেবদত্ত ব্রাহ্মণতনয়, কিন্তু অর্থহীন অন্ধ সংস্কারের দাস নহেন। সাধারণ ব্রাহ্মণের মত আচার-সর্বস্ব তিনি নহেন। অনুস্বার-বিসর্গের ঘটাও তাঁহার বিশেষ নাই। তাঁহার—

স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা
তেজোহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস।

(তাঁহার এই শাস্ত্রের বালাই এবং মন্ত্রের বালাই নাই বলিয়াই বিক্রমদেব তাঁহাকে 'রাজপুরোহিত' করিয়াছেন।) দেবদত্তকে তিনি পরিহাস করিয়া বলেন, 'নখদন্ত ভাঙা এক পোষা পুরোহিত!' তাঁহার চরিত্রে স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে সহজ রসিকতা। তিনি অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতেই রাজাকে অনুযোগ করেন—

"তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজ্ঞ বিধি। আমি পুরোহিত!
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে।
এক বই পিতা নয়; তাঁরি নাম ভুলি—
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে।"

অবশ্য দেবদত্তের মধ্যে সাধারণ পুরোহিতের মত ক্রিয়া কার্যের বাড়াবাড়ি না থাকিলেও যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান আছে। সেজন্যই তাঁহার মধ্যে শাস্ত্রের উপদ্রব দেখা যায় না।

(তিনি রাজা বিক্রমদেবের কাব্য আলোচনার সঙ্গী। এই আলোচনার সময় তাঁহার জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুগভীর জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত রাজসভায় দীর্ঘকাল কাটাইবার ফলে রাজার চরিত্রের জটিলতা সম্পর্কেও তাঁহার ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাজাকে সত্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সর্বদাই তিনি সচেষ্ট ছিলেন।) কখনো তিনি প্রত্যক্ষভাবে সত্যভাষণের দ্বারা রাজাকে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, কখনও বা প্রচ্ছন্ন রসিকতায় সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে আগ্রহী হইয়াছেন। রাজ্যের নানা দুঃসংবাদ লইয়া মন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া রাজা অন্তঃপুরের দিকে পলায়ন করিবার উদ্যোগী হইলে দেবদত্ত সহজ সুরে বলিয়া উঠিলেন,—

"রাণীর রাজত্বে তুমি লও গে আশ্রয়।
যাও অন্তঃপুরে। অসম্পূর্ণ রাজকার্য
দ্বার-বাহিরে পড়ে থাক, স্ফীত হোক
যত যায় দিন। তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে ঊর্ধ্ব দিকে, দেবতার
বিচার আসন পাশে।"

(দেবদত্তের কথাবার্তা আপাতলঘু হইলেও গভীর অর্থবহ। তাঁহার সংলাপে যেন একটা হেঁয়ালি আছে। কিন্তু তাহার যথার্থস্বরূপ সেখানে নহে, আরও গভীরে। সেখানে তাঁহার চরিত্র হাস্যোদ্দীপক নহে, 'সিরীয়াস') মন্ত্রী তাহা বুঝিতে পারেন না। রাজাকে না পাইয়া মন্ত্রী যখন আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন দেবদত্ত হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, 'রাজা ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা চলিতেছে। মন্ত্রী দেবদত্তের এই হাসিতে বিরক্ত হইলেন। আসলে রাজার কর্তব্যবিমুখ রূপমোহগ্রস্ততা তাঁহার অন্তরে কঠিন আঘাত হানিয়াছে। বেদনা তীব্র হইলে অনেক সময়ে তাহা শুষ্ক হাসিতে ফাটিয়া পড়ে। দেবদত্তের উক্তিতেও সেই সত্য উদ্ঘাটিত,—

"অরণ্যে ক্রন্দন
সে তো বালকের কাজ। দিবস রজনী
বিলাপ না হয় সহ্য, তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মতো তুষার কঠিন।"

(দেবদত্ত কৌতুকপ্রিয় হইলেও যথার্থ বুদ্ধিমান। মানুষ চিনিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ।) রাজার 'শূন্য সিংহাসন পার্শ্বে' 'নতশির' বিদীর্ণহৃদয় মন্ত্রীকে তিনি প্রতিকারের জন্য রাণীর নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। রানীর আত্মীয়েরাই যেখানে রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে, সেখানে রানী কী তাহাদের বিচার করিবেন, মন্ত্রী এই সন্দেহ জানাইলে দেবদত্ত তাঁহাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা সুবিবেচকেরই উক্তি :

"শুধু শাস্ত্র জান মন্ত্রী, চেন না মানুষ।
বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী, পারে না সহিতে
পরের বিচার।"

মানবচরিত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকিলে তাঁহার পক্ষে এ জাতীয় পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হইত না।

তাহা ছাড়া (অরাজক রাজ্যে প্রজারা যখন বিদ্রোহ করিল, তখন দেবদত্তই তাঁহার নিপুণ বাক্যবাণে তাহাদের শান্ত করিলেন। যাহারা শাস্তি

ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিতে চাহিয়াছিল, তাহারা পরে দেবদত্তের নিকট ধীর স্থির হইয়া গেল। এমনই তাঁহার বুদ্ধিদীপ্তি এবং বাক্‌নৈপুণ্য।

শ্লেষ বক্রোক্তি প্রয়োগেও দেবদত্ত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। রাজ অন্তঃপুরে রানী সুমিত্রার সহিত তাঁহার কথোপকথন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাহিরের প্রজাদের আর্তক্রন্দনে লোকমাতা সুমিত্রা ব্যাকুল। তিনি উহার প্রকৃত কারণ জানিতে চাহিলে দেবদত্ত তাঁহার স্বভাবসুলভ সরোষ বাচন ভঙ্গীর দ্বারা সুমিত্রাকে 'জীর্ণচীর, ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহলে'র কথা জানাইলেন। তাঁহার এই উত্তরের মধ্যে তাঁহার বাচন-ভঙ্গীর সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। দেবদত্ত বলিলেন—

"কিছু না, কিছু না।
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র অসভ্য যত বর্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়। রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাপিয়া যত।"

বিক্রমদেব সুমিত্রাকে বলিয়াছিলেন, 'ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা'; প্রজাদের কোন অভাব নাই। তথাপি প্রজারা কেন কাঁদে, সুমিত্রা তাহা বুঝিতে পারেন না। তাহার উত্তরে দেবদত্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা নিপীড়িত ভাগ্যহত দরিদ্র মানুষের চিরকালীন দুরবস্থার কথা, ধনীর নির্মম শোষণে দরিদ্রের জীবন ঘৃণ্য কুকুরের মত কোনক্রমে মরিবার জন্য টিকিয়া থাকে। দেবদত্ত বলিয়াছেন:

"ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুকুরের মতো লোল জিহ্বা
এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যদি উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে তো কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।"

এই নাটকে দেবদত্তই একমাত্র শুভবুদ্ধির প্রতীক। রাজা কর্তব্যবিমুখ। হতভাগ্য প্রজাদের দারুণ দুরবস্থা। দেবদত্তের ভাষায় দেশ তখন

উত্তর ॥ 'মানসী'র যুগে রচিত 'রাজা ও রানী' নাটক প্রধানত পদ্যছন্দে রচিত। কিন্তু অনেকগুলি দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ সংলাপে গদ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। একই নাটকের মধ্যে দুই প্রকার ভাষা রীতির ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিচার করিবার পূর্বে নাটকের Diction বা সংলাপ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করিয়া লওয়া শ্রেয়।

নাট্যকার তাঁহার নাটকে জীবনের ঘনিষ্ঠ রূপটিকে ফুটাইয়া তোলেন বলিয়া নাট্যতত্ত্ববিদ্ তাহাকে 'imitation of action' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন আর এই 'action'-এর ধারক ও বাহক হইল মানবজীবন। আর মানবজীবনের সমস্ত কিছুই অর্থপূর্ণ ভাষার মাধ্যমে অনুকরণ করিতে হয়। আবার নাট্যরচনায় পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন বা সংলাপ শুধুমাত্র নাট্য চরিত্রের কথা নয়, সংলাপ নাট্যকারের রসসৃষ্টি ও তত্ত্বপ্রচারেরও প্রধান বাহন।

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত নাটকে নাট্যকারের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সম্ভব নহে। তাঁহাকে নাটকের নেপথ্যে থাকিয়া নাটকের গতি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে স্বইচ্ছায় সংঘটিত হইতে দিতে হইবে। সুতরাং নিজে নেপথ্যচারী হইয়া যদি নাট্যকারকে এ দায়িত্ব পালন করিতে হয় তাহা হইলে তাহার একমাত্র উপায় পাত্রপাত্রীকে সংলাপমুখর করিয়া আপন উদ্দেশ্য সফল করা। এই সংলাপের মাধ্যমেই একদিকে ঘটনা যেমন গতিশীল ও প্রাণময় হইয়া উঠে, অন্যদিকে তেমনি চরিত্রগুলি বিকশিত হইয়া উঠে।

অতএব নাটকীয় কাহিনীকে গতিশীল করিয়া তুলিতে, চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে, সমগ্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে এবং সর্বোপরি সমগ্র নাটকটির ধারাকে পরিণতির মোহানায় পৌঁছাইয়া দিতে সংলাপকে হইতে হইবে যথোপযুক্ত শক্তিশালী, সঙ্গত ও ঔচিত্যবোধ-সঞ্জাত। সংলাপ সার্থকতা লাভ করে যখন তাহা পরিবেশ, পরিস্থিতি ও চরিত্রের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি বজায় রাখিতে সমর্থ। পরিবেশ বা দৃশ্য দেখিয়া এবং চরিত্রের রূপসজ্জা দেখিয়া এবং তাহার পরিচয় পাইয়া দর্শকের মনে সংলাপের যে ভাষা প্রত্যাশিত হইয়া ওঠে তাহা চরিত্রের মুখে যদি শোনা না যায় তবে তাহাদের প্রত্যাশা রূঢ়ভাবে খণ্ডিত হয় এবং চরিত্রগুলির সহিত দর্শকের সহমর্মিতা গড়িয়া উঠিতে পারে না। ঘটনা পরিস্থিতি চরিত্রের সহিত সঙ্গতিহীন ঔচিত্যবিরোধী সংলাপ নাটকের পক্ষে দুর্বলতা স্বরূপ।

সংলাপ যেখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা নহে, সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি হইয়া ওঠে, সেখানেই সংলাপ সার্থক। আর সংলাপ যেখানে শুধু ভাষার অহেতুক আড়ম্বর মাত্র, স্থান, কাল, পাত্রের সহিত সঙ্গতিবিহীন, সেখানে তাহা চরিত্রকে যান্ত্রিক করিয়া তোলে মাত্র, প্রাণবান, সজীব মানুষে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে না। অর্থাৎ যে সংলাপ আবেগচঞ্চল, দ্বন্দ্ব উৎকণ্ঠায় স্পন্দিত, যে সংলাপ যত স্বাভাবিক, সেই সংলাপ তত সার্থক। স্বাভাবিকতা সংলাপের এক বিশিষ্ট গুণ। সূক্ষ্ম-মার্জিতরুচি-সম্পন্ন ব্যক্তির মুখে স্থূল বক্তব্য ও অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তির মুখে সূক্ষ্ম-তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি বাস্তব এবং স্বাভাবিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ভাষার মধ্যে বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি, শব্দপ্রয়োগ বৈচিত্র্য, আঞ্চলিকতা, চিত্রকল্প প্রয়োগ ইত্যাদির দ্বারা চরিত্র-রূপ অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। বৈচিত্র্যহীন ভাষা নাটকীয় উৎকর্ষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম।

রাজা ও রানী নাটকের ভাষা মূলত পদ্যবদ্ধ। কারণ, সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব, সুতীক্ষ্ণ ভাবাবেগ, সুগভীর হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করিতে এই পদ্যবদ্ধ ভাষা যতখানি উপযোগী, গদ্যভাষা সম্ভবত ততখানি নহে। সেজন্য প্রেমতত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য, বিক্রম-সুমিত্রার বিরোধ ও তাহাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিবার জন্য সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ পদ্যছন্দ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

রাজা ও রানী নাটকের মূল দ্বন্দ্বকে বিকাশ ও পরিণতি দান করিবার জন্য বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আছে অত্যাচার উৎপীড়িত, ক্ষুধার জ্বালায় কাতর বিচিত্র মানুষের কোলাহল, রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণতনয় দেবদত্ত ও তাঁহার স্ত্রী নারায়ণী, আচার-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ ত্রিবেদী প্রমুখ বহু চরিত্র। ইহাদের মধ্যে জনতা কেবলমাত্র গদ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে আর দেবদত্ত, সুমিত্রা, মন্ত্রী প্রয়োজনবোধে উভয় ভাষায় সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন।

এই গদ্য ভাষা প্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী ভাষার স্বাভাবিকতা রক্ষণ। এই উদ্দেশ্য সাধনে যে রবীন্দ্রনাথ সফল হইয়াছেন—জনতা চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কিনু নাপিত, মন্সুখ চাষা, কুঞ্জরলাল কামার, শ্রীহরি কলু, মনুরায় কায়স্থ, জওহর তাঁতি এবং নন্দলাল জনতার বিচিত্র চরিত্র।

তাহাদের বাগ্‌ভঙ্গি, উচ্চারণরীতি স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া তাহারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। সেই বিদ্রোহের কোলাহলে তাহাদের আলোচনা সুন্দররূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই গ্রাম্য মানুষগুলির সঙ্গে যখন শাস্ত্রজ্ঞ, রাজার কাব্য আলোচনার সঙ্গী, বুদ্ধিদীপ্ত দেবদত্ত কথা বলিয়াছেন তখন তাঁহার ভাষাও গদ্যময়। নাটকের অন্যান্য অংশে আমরা পদ্যছন্দে দেবদত্তের বাক্‌চাতুর্য দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি যখন গদ্যময় ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তখন তাহা গ্রাম্য মানুষদের সহিত চমৎকার সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার বুদ্ধিবলে এবং নিপুণ ভাষা প্রয়োগে বিদ্রোহী প্রজাগণ শান্ত হইয়াছে। অস্ত্র ছাড়িয়া কান্নাকাটির পথ ধরিয়াছে। কূটবুদ্ধি ত্রিবেদী ঠাকুরের গদ্য সংলাপ আবার একটু ভিন্ন। তাহার চরিত্র প্রকাশে পদ্য হইতে এই গদ্য ব্যবহার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। মন্ত্রী, জয়সেন, মিহিরগুপ্ত এবং সুমিত্রাও গদ্যভাষায় কথোপকথন করিয়াছে। ইহারা ছাড়াও আছে কাশ্মীরের হাটে সাধারণ লোকজনের আলাপ আলোচনা।

এই গদ্য সংলাপের আর একটি উদ্দেশ্য হইল সংবাদ পরিবেশন। এই জনতার মুখেই কর্তব্যভ্রষ্ট রাজার অনুপস্থিতিতে রাজ্যে বিদেশী অমাত্যদের শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী জানিতে পারা যায়। এই জনতাই বলে, "আমরা রাজার কাছে দুঃখ জানাতে গিয়েছিলেম, রাজ-দর্শন পেলেম না। ফিরে এসে দেখি আমাদের ঘর দোর জালিয়ে দিয়েছে, আমাদের ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।" কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ সৈন্যদের মুখেই আমরা জানিতে পারি যুবরাজ কুমারসেন তাহাদের কত প্রিয়। কাশ্মীরের রাজসিংহাসন লইয়া চক্রান্তের কথাও আমরা তাহাদের কথোপকথন হইতে জানিতে পারি। সেজন্য নাটকীয় প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে এই বিচিত্র মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। 'রাজা ও রানী' নাটকের রোমান্টিক নাট্যকাহিনীর অতি-কল্পনার মধ্যে মাটির কাছাকাছি এই রক্তমাংসের বিচিত্র জনতার মধ্যে যে বাস্তবতার স্পর্শ পাওয়া যায়, গদ্যময় ভাষার সার্থক প্রয়োগে তাহা সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টিরও একটি সার্থক নিদর্শন এই সংলাপ।

॥ ব্যাখ্যা ॥

১ ॥ বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে……পরের বিচার।

(ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৬)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অন্তর্গত। এই উক্তির মাধ্যমে জালন্ধররাজ বিক্রমাদিত্যের বাল্যসখা ব্রাহ্মণতনয় দেবদত্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন্ত্রীকে একটি উপায়ের পরামর্শ দিয়াছেন।

রাজার কর্তব্যভ্রষ্টতায় জালন্ধর রাজ্যে এখন চরম বিশৃঙ্খলা। বিদেশী অমাত্যেরা প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার করিতেছে। অসহায় প্রজাগণ রাজদরবারে বিচার প্রত্যাশী হইয়াও ব্যর্থকাম। প্রজাদের কাতর ক্রন্দনে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত। তাহারা বিদ্রোহ করিয়াছে। রাজপথে কোলাহল শুরু করিয়াছে। জালন্ধর রাজ্যের বর্তমান অবস্থা সমুদ্রের ঝড়ে অগণিত যাত্রীসহ একটি তরীর মত। রাজ্যের কর্ণধার মন্ত্রী। রাজা তাঁহার দাঁড়। মাঝি ঝড়ের মধ্যে শক্ত হাতে দাঁড় ধরিয়া তরীকে বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করে। জালন্ধর রাজ্যরূপ তরীর মাঝি আছে, কিন্তু তাহার হাতে দাঁড় নাই। যে রাজার সাহায্যে মন্ত্রী এই বিপদের হাত হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিতেন সেই রাজা এখন রানীর আয়ত্তে। রাজা অন্তঃপুরে রানীর প্রেমবিলাসে মত্ত। মাঝিরূপ মন্ত্রী অতুল সমুদ্রে অগণিত অসহায় যাত্রীরূপ প্রজাসাধারণকে লইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। তিনি অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

দেবদত্ত মন্ত্রীকে রানীর নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু নারী কখনো আপন জনের অন্যায় দেখিবে না এবং বিচার করিবে না ভাবিয়া দেবদত্তের পরামর্শের প্রতি মন্ত্রী আস্থা রাখিতে পারেন নাই। তখন দেবদত্ত বলিলেন, মন্ত্রী রাজকার্য পরিচালনার নিয়মকানুনের সহিত পরিচিত, মনুষ্যহৃদয় আলোচনা করিবার সময় বা সুযোগ তাঁহার নাই। দেবদত্ত পুরোহিত হইয়াও মনুষ্য-হৃদয় এবং কাব্যচর্চায় পারদর্শী। রাজা ও রানীর সম্বন্ধে তাঁহার মত জ্ঞান মন্ত্রীর নাই। দেবদত্ত জানেন রানী সুমিত্রা প্রজাবৎসলা। তিনি রাজার মত প্রেমের স্রোতে আপন কর্তব্য বিস্মৃত হন নাই। সুমিত্রা তাঁহার রানীত্ব সম্বন্ধে সচেতন। সেজন্য প্রয়োজন হইলে আপনার প্রজাপীড়নের প্রতিকার ক্রোধে সুমিত্রা নিজেই তাঁহার আত্মীয়দের শাস্তি বিধান করিবেন।

দেবদত্তের মতে ইহাই নারীর বৈশিষ্ট্য। পর তাহার আত্মীয়-স্বজনের বিচার বা সমালোচনা করিয়ে ইহা সে সহ্য করিতে পারে না; বরং প্রয়োজন হইলে ঐ নারীই আপনার হাতে আপনার আত্মীয়স্বজনের বিচার করিয়া উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারে।

২॥ তোমরা পুরুষ দৃঢ় তরুর মতন……লতার আশ্রয়

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত। রানী সুমিত্রা মোহগ্রস্ত রাজা বিক্রমদেবকে তাঁহার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবার প্রয়াসে এই উক্তি করিয়াছেন।

নারীর দৃষ্টিতে পুরুষের যে রূপ কাম্য এখানে রানী সুমিত্রার মুখে আমরা সেই কাম্য রূপেরই পরিচয়টি প্রকাশিত হইতে দেখিতেছি। অরণ্যমধ্যে বৃহৎ বনস্পতি আপন স্বাতন্ত্র্যে যেমন বিশিষ্ট, সংসারমধ্যে পুরুষও হইবে তেমনই উন্নত, বিশিষ্ট। বীর্যবান পুরুষমাত্রেই আপন শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান হইয়া সমগ্র সংসারকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে—ইহাই স্বাভাবিক। সংসারের প্রতি তাহাদের একদিকে থাকিবে স্নেহাকর্ষণ অন্যদিকে উদাসীনতা; তাহারা কখনও মুক্ত, কখনও বদ্ধ। এইরূপ উন্নতশীর্ষ অটল তরুকে আশ্রয় করিয়াই লতা বাঁচিয়া থাকে, পাখীরা নীড় রচনা করিয়া আশ্রয় লয়, পথশ্রান্ত পথিক বিশ্রামের অবকাশ পায়, উত্তপ্ত ধরিত্রী স্নিগ্ধ ছায়ায় শীতল হয়। এই বৃহৎ বৃক্ষের আহ্বানেই আকর্ষিত প্রকৃতি বৃষ্টি দান করিয়া শুষ্ক ধরণীকে সরস করিয়া তোলে; আবার প্রচণ্ড প্রলয়রূপী ঝটিকার হাত হইতে আশ্রিতকে রক্ষা করিতে এই বৃহত্তর শক্তিরই প্রয়োজন হয়। এককথায় পুরুষ হইবে সংসারের সকলের পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়। কিন্তু সেই পুরুষ যদি আপন কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হয় তবে তাহা সমগ্র সংসারের অনিবার্য বিপর্যয়কেই আসন্ন করিয়া তোলে।

৩॥ শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা……কোকিল পাপিয়া যত। (ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৭)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের অন্তর্গত। বাহিরে প্রজার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া উৎকণ্ঠিত প্রজাবৎসল রানী সুমিত্রা ব্যগ্রভাবে প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাহিলে দেবদত্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে এই উত্তর দিয়াছিলেন।

কর্তব্যবিমুখ, রানীর একান্ত প্রেমকামনায় কাতর রাজা বিক্রমাদিত্যের অবহেলায় প্রজাসাধারণের শোচনীয় দুর্দশার অন্ত নাই। ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। রানীর আত্মীয় অত্যাচারী প্রজাপীড়ক কাশ্মীরী অমাত্যদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহায় প্রজাদের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। জয়সেন, শিলাদিত্য, যুধাজিৎ প্রভৃতি রানীর আত্মীয় অমাত্যগণ অতি সুকৌশলে রাজ্যশাসনের নামে দেশের ধনসম্পদ শোষণ করিতেছে। অথচ রাজা বলিয়াছেন 'ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা'। কিন্তু দরিদ্র প্রজাসাধারণ অবহেলিত। তাহারা দরিদ্র। এই বসুন্ধরা তাহাদের নহে। তাহাদের ন্যায্য অংশ হইতে তাহারা বঞ্চিত। সেজন্য তাহারা ক্ষুধায় কাতর। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা বিদ্রোহ করিয়াছে। রাজপথে সেই প্রজাপুঞ্জের কোলাহল শুরু হইয়াছে।

কিন্তু রানী সুমিত্রার প্রশ্নের উত্তরে দেবদত্ত তাহাকে প্রথমে স্বীকার করিতে চাহেন নাই। 'কিছু না' বলিয়া দেবদত্ত রানীর নিকট হইতে রাজ্যের প্রজাদের অনশনক্লিষ্ট কাতর ক্রন্দনকে গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই রাজ্যের বর্তমানে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে তিনি 'অভদ্র অসভ্য যত বর্বরের' চীৎকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বস্তুত জালন্ধর রাজ্যের বাস্তব ঘটনা হইল, প্রজাসাধারণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির। তাহাদের আর্ত হাহাকারে রাজ্যের আকাশ বিদীর্ণ হইতেছে। তাহাদের ক্রন্দনে আজ কোকিল পাপিয়া পর্যন্ত নীরব। রাজসভার সকলেই এই অপ্রীতিকর অবস্থায় স্তব্ধ। অথচ রাজার সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অন্তঃপুরে প্রেম বিলাসে মত্ত।

এখানে দেবদত্তের ব্যঙ্গাশ্রিত কটাক্ষপূর্ণ নিপুণ বাচনভঙ্গি লক্ষণীয়।

৪॥ কেমনে বুঝাব নাথ……তোমারি প্রেমে।

'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যের এই অংশে রানী সুমিত্রা স্বামীর নিকট আপন অন্তরের সত্য পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়াসে এই উক্তি করিয়াছেন।

রাজা বিক্রমদেব কর্মের বৃহত্তর ক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিয়া পুষ্পোদ্যানে রানীর প্রতীক্ষারত। এমন সময় রানী সুমিত্রা প্রবেশ করিলেন। অপেক্ষমান চঞ্চল রাজা সকল কর্তব্য বিসর্জন দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট সকল কর্তব্য অপেক্ষা প্রেমই একমাত্র স্বাধীন কর্তব্য। তাই রানীর প্রতীক্ষারত

রাজা রানীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অভিমানাহত কণ্ঠে তাঁহাকে 'পাষাণী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু রাজা যে প্রেমে বিশ্বাসী তাহা তো রানীর কাম্য নহে। রাজা আজ রাজকর্তব্য ভুলিয়া রানী সুমিত্রাকেই একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ইহা তো মহৎ প্রেমের স্বরূপ নহে। যে প্রেম বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে মানুষকে মুক্তি না দিয়া, আত্মবিলাসের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে প্রেম তো কামেরই নামান্তর। রানী চাহেন এই ক্ষুদ্রতা, স্থূল সঙ্কীর্ণতার হাত হইতে রাজাকে মুক্ত করিতে, কামনার কলুষ হইতে তাঁহাকে উত্তীর্ণ করিতে, তাই তিনি রাজাকে দূরে সরাইয়া রাখেন। এইভাবে দূরে থাকিয়া তিনি মোহমত্ত স্বামীর মোহমুক্তি প্রত্যাশা করেন, কামনা করেন কর্তব্যক্ষেত্রে তাঁহার অব্যয় প্রতিষ্ঠা, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক রাজা এ সত্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ বলিয়া বার বার প্রেয়সীকে নানা কঠিন কথায় আহত করেন। রানীর অন্তরে তাহা দারুণ ব্যথা হইয়াই বাজে।

৫। রাজার অদৃষ্টে বিধি......সেও হৃদয়ের তরে কাঁদে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'রাজা ও রানী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বিক্রমদেব বাল্যবন্ধু দেবদত্তকে উদ্দেশ্য করিয়া রাজা হইয়া তাঁহার জীবনের যে বেদনা তাঁহাকে বহন করিতে হইতেছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।

বাল্যবন্ধু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবদত্ত সংবাদ আনিয়াছেন বিদেশাগত রাজাত্মীয়েরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। শুনিয়া রানী সুমিত্রা স্বামীকে সেই মুহূর্তে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন রাজা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি সন্ধিপত্র পাঠাইতে আগ্রহী। রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া রানী ক্রোধে ও ক্ষোভে অপমানে রাজা ও নিজের সম্পর্কে ধিক্কারধ্বনি দিয়া স্থানত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অসহায় রাজা করুণনেত্রে তাহা দেখিয়াছেন। যে রানীকে তিনি আপন বক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন, সেই রানী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যে বাল্যবন্ধুকে তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন, আজ সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়াছে। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? পরাক্রমশালী রাজা আজ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া আপন অসহায়তাই প্রকাশ করিতেছেন। আজ তাঁহার

দগ্ধ ভাগ্য লইয়া তিনি যন্ত্রণা-জর্জরিত। এই বেদনার অংশীদার কেহ নাই। বিরাট ছায়াহীন সঙ্গিহীন পর্বত সবার উচ্চে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পর্বতের শীর্ষদেশে প্রভাত-সূর্যোদয়ে, মনে হয় রক্তনেত্রে ক্রুদ্ধ দেবতা তাকাইয়া আছেন; মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে সে দগ্ধ হইতেছে; দুরন্ত প্রলয়ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড আক্রমণ তাহাকে মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে হয়; বজ্রের আঘাত তাহাকে বুক পাতিয়া লইতে হয়; একমাত্র শ্যামল ধরণী তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকে, কিন্তু বক্ষে স্থানলাভের অধিকার পায় না; ফলে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া তাহাকে এক নিদারুণ নিঃসঙ্গতায় প্রেমহীন অস্তিত্ব বহন করিয়াই চলিতে হয়। এই নিঃসঙ্গতার বুঝি শেষ নাই। তেমনি রাজা বুঝি নির্মম নিয়তির অঙ্গুলিসঙ্কেতে এমনই প্রেমহীন, নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিবার জন্যই ধরার বুকে আপন অস্তিত্ব লইয়া অবতীর্ণ। উচ্চ সিংহাসনে বসিয়াছেন বলিয়াই সকলের নিকট হইতে তিনি দূরে। সাধারণের প্রণাম তাঁহার চরণ স্পর্শ করে বটে, সাধারণের প্রীতি তো তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না; তাই তাঁহাকে নিঃসঙ্গই থাকিতে হয়। কিন্তু রাজা তো প্রাণহীন চেতনাহীন জড়বস্তু নহেন; তাঁহার হৃদয় অন্যের জন্য আকুল হয়; তাঁহার অন্তর প্রেমের কাঙ্গাল। এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়াই রাজ বিক্রম আজ রাজকীয় দম্ভের উচ্চাসন হইতে একেবারে ধরার সমতলে সকলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে আগ্রহী। আজ তাঁহার হৃদয় সকলকে লাভ করিবার জন্যই অশান্ত, আকুল।

৬॥ যে সত্যে আছেন বাঁধা……নারীর তরে ব্যর্থ হইবে না।

(ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৬)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত। আত্মবিস্মৃত জালন্ধর রাজার সুপ্তি সুমিত্রা বার বার আঘাত করিয়াও ভাঙ্গিতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি এক চরম পথ গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজ্য ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া রাজ্য ত্যাগের পূর্বে কুলদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। যাত্রার পূর্বে এই উক্তির মধ্যে সুমিত্রার স্থির সংকল্পের কথাই ঘোষিত হইয়াছে।

রাণী স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, রাজার সম্মুখে থাকিয়া রাজার মোহ দূর করা সম্ভব নহে। সেজন্য রাত্রির অন্ধকারে পুরুষের ছদ্মবেশে সুমিত্রা জালন্ধর

ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। যাত্রার পূর্বে গোপনে দেবীকে প্রণাম জানাইবার জন্য তিনি মন্দিরে আসিয়াছেন। দেবীর নিকট আত্মনিবেদনের মধ্যে সুমিত্রার প্রেমপূর্ণ নারীচিত্তের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব সুন্দররূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। স্বামীর প্রেমপূর্ণ চক্ষু দু'টির স্মৃতি তাঁহাকে যেন বারে বারে আহ্বান করিতেছে। অন্যদিকে সত্যপালনের প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে দুঃসাহসের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে।

সুমিত্রার পৌরাণিক কাহিনীর কথা মনে পড়িয়াছে। কৈকেয়ী রাজা দশরথের নিকট হইতে দুইটি বর আদায় করিয়াছিলেন—ভরত রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবেন এবং রামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাইবেন। রামচন্দ্র এই পিতৃসত্য পালনের জন্য স্বেচ্ছায় রাজ-সিংহাসন ত্যাগে বনবাসের দুঃসহ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। রানী সুমিত্রাও আজ স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহের রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া দুঃসহ জীবনযাপন করিতে যাইতেছেন। স্বামীর কল্যাণের জন্যই তিনি এই আত্ম-নিগ্রহের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ হইতেও কর্তব্য বড়। রাজলক্ষ্মীর নিকট রাজা সত্যবদ্ধ। কিন্তু রাজা বিক্রমদেব রানীর প্রতি অন্ধপ্রেমে রাজ্যের সকল কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণচিন্তা হইতে আত্মসুখ চিন্তাই তাঁহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মী সেজন্য চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন।

সুমিত্রা রাজার সমস্ত কর্তব্য কর্মের মধ্যেই স্বীয় প্রেমের ব্যাপ্তি দেখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজাকে এই মদন মোহ হইতে তিনি উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা, নিজেকে দূরে সরাইয়া না রাখিলে রাজার মোহ ভঙ্গ হইবে না। স্বামীর সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিবার জন্যই সুমিত্রা স্বেচ্ছায় এই নির্বাসনের পথ গ্রহণ করিয়াছেন।

৭॥ পরিপূর্ণ সূর্য পানে……দেখে গগনের আলো।

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথ রচিত "রাজা ও রানী" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রী আসিয়া রাজা বিক্রমদেবকে লোকনিন্দার কথা বলিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া সামান্যতম বিচলিত হইলেন না। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন বাল্যবন্ধু দেবদত্ত। তিনি মন্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া রাজা বিক্রমদেবের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই উক্তি করিয়াছেন।

রাজার আসন সবার ঊর্ধ্বে, সাধারণ মানুষের নাগালের বহু দূরে। তাই সাধারণ লোকের অবিশ্রান্ত নিন্দাতেও রাজার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইহাতে তাঁহার মহিমা এতটুকু কলঙ্কিত হয় না, এই সত্যই বুঝাইবার জন্য রাজসখা দেবদত্ত মন্ত্রীকে বলিতেছেন, সুদূর সুনীল আকাশে যখন দীপ্ত সূর্য আলোক বিচ্ছুরিত করিতে থাকে তখন কেহই সেই উজ্জ্বল সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হয় না। কারণ সূর্যের সেই অগ্নিতপ্ত রশ্মি মানব-চক্ষুতে সহ্যের অতীত, কিন্তু পূর্ণগ্রহণের সময় সেই উজ্জ্বল, সুদীপ্ত সূর্য যখন রাহুগ্রস্ত হইয়া ম্লান হইয়া আসে তখন ক্ষুদ্র মানুষ কৃষ্ণবর্ণ কাচখণ্ডের সাহায্য লইয়া সেই রাহুগ্রস্ত সূর্যকে অবলোকন করে। মসীলিপ্ত কাচখণ্ডের সাহায্যে সমগ্র আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখায় এবং তাহারই মধ্যে অনুজ্জ্বল সূর্য মানবদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া কি সূর্যের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়? তেমনি আজ রাজার রাহুগ্রস্ত অবস্থার সুযোগ লইয়া যদি সাধারণ মানুষ রাজ-নিন্দায় মগ্ন হয় তাহাতে সাধারণ মানুষের দীনতাই প্রকাশ পায়, রাজমহিমা কলঙ্কিত হয় না।

৮। মৃত্যুগন্ধবহ……হিংসা স্বাধীনতা।

'রাজা ও রাণী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের এই আলোচ্য অংশটিতে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব উপমার সাহায্যে নায়ক রাজা বিক্রমদেবের অন্তরে যে আকস্মিক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজা বিক্রম এতদিন সমস্ত কর্তব্যকর্ম ভুলিয়া বহির্বিশ্বের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অন্তঃপুরবাসী হইয়া ছিলেন। তাঁহার মানস জগতের একমাত্র অধিবাসিনী ছিলেন সুন্দরী সুমিত্রা। এই নারীই ছিলেন তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, সর্বস্ব। সমস্ত বিশ্বকে বিস্মৃত হইয়া তিনি কামনার কঠিন পাষাণপুরীতে আবদ্ধ ছিলেন। রাজ্য, রাজকর্ম, প্রজা সব-কিছু ভুলিয়া আত্মরতি-বিলাসী রাজার উদাস হৃদয় কেবলই অপ্রশান্ত অন্ধকারের গভীরতায় প্রবেশ করিতেছিল। গুটিকোষকের মধ্যে কীট যেমন আবদ্ধ থাকে, রাজাও তেমনি আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি আজ আকস্মিক ভাবে মুক্তি পাইয়া জাগ্রত হইয়াছেন। রাজা উপলব্ধি করিয়াছেন জগতের বৃহত্তর জীবনপ্রবাহ

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া তিনি কেবলই অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাই সবার নিকট কেবলই দীন, কাপুরুষ নারী-বিলাসী বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং এই অপমান ও কলঙ্কের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে রাজা বদ্ধপরিকর এবং উগ্র হিংসার স্রোতে অবগাহন করিলে তবেই তাহা সম্ভব হইবে। এতদিন যে বায়ু মৃদুগন্ধবহ ছিল আজ তাহা প্রলয়বাহী ঝঞ্ঝারূপেই দেখা দিবে, কারণ ঝড়ের প্রচণ্ড উন্মত্ততাতেই বিধাতার চরম শক্তির প্রকাশ, তাহাতেই বিধাতার চরম আনন্দ, তাহাতেই বন্ধনমুক্তির পরম সুখ। কোন বাধা মানে না বলিয়াই তো উন্মত্ত ঝঞ্ঝা স্বাধীনতার প্রতীক। বদ্ধ হৃদকোরক হইতে মুক্তি পাইয়া রাজা জাগিয়া উঠিয়াছেন। আজ তাঁহার অহংবোধ জাগ্রত হইয়াছে। তাঁহার এই জাগ্রত অহংবোধ উগ্র প্রচণ্ড হিংসার মধ্যেই আপন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইবে।

॥ অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ॥

(১) শুনিয়া লজ্জায় মরি........রাজশ্রীর চেয়ে।
(২) অভাগোর দুরদৃষ্ট······এমনি আশ্চর্য।
(৩) রবির উদয় মাত্র······সে ধন্য হয়।
(৪) দক্ষযজ্ঞে······ও রাঙা চরণ।
(৫) পৃথিবী কবির কথা······অলসের মতো।
(৬) হায় বিপ্র······রক্তপদ্মসম।
(৭) অতি ইচ্ছা······পাষাণ প্রাচীরে।
(৮) এ হিংসা আমার······দুর্নিবার।
(৯) সুখে আছি···একান্ত সম্ভোগ।
(১০) বসন্ত না আসিতেই······প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।
(১১) এ সংসারে······সম্পদের মতো।
(১২) দেবি যোগ্য নহি আমি······কঠিন বিধান।

[এই ব্যাখ্যাগুলির জন্য দৃশ্য-পরিচিতি ও তাৎপর্য-বিচার অংশ দেখ।]

ভাবসম্প্রসারণ

[১] ভাবসম্প্রসারণ কর :

"রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা।"

উত্তর : যখন যেটি পাওয়া যায় তাহাকে আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করাই উচিত। যাহা অসম্ভব ও অপ্রাপণীয় তাহার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলে তাহাকে পাওয়া যায় না—উপরন্তু যাহা সহজে পাওয়া যাইত, তাহাও বিনষ্ট হয়। রাত্রিকালের তারকার শোভা অতুলনীয়, মনোমুগ্ধকর। সেই শোভা দেখিয়া কবি ও মানুষ আনন্দ-বিহ্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে—যাহারা রাত্রিকালের সেই অনবদ্য শোভা দেখিতে ভুলিয়া গিয়া সূর্যালোকের জন্য অধীর হইয়া অশ্রু বিসর্জন করে। সূর্যালোকেরও দীপ্ত-সৌন্দর্য আছে—কিন্তু তাহার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তাহার জন্য আকুলতা প্রকাশ করিয়া লাভ নাই বরং ইহাতে রাত্রিকালের নক্ষত্রের সৌন্দর্যকে দেখিবার সুযোগ নষ্ট হয়। সাংসারিক জীবনে মানুষের এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। যাহা অনায়াসলভ্য মানুষ তাহার সৌন্দর্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে। সে ছুটিতে চায় অসম্ভবের দিকে। সে অপ্রাপণীয়কে পাইবার নিষ্ফল আশায় উন্মাদ হইয়া সহজলভ্যকে পরিত্যাগ করে। ফলে সে সেই অসম্ভবকেও লাভ করিতে পারে না—আবার সহজলভ্যও তাহার হাত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়। তাহার জীবনে নামিয়া আসে ব্যর্থতা ও বঞ্চনার অভিশাপ। যাহা নিশ্চিত তাহাকে ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের প্রতি ধাবমান হওয়া মূঢ়তা মাত্র—তাহাতে কোন লাভ হয় না।

[২] ভাবসম্প্রসারণ কর :

"অত্যাচারীর বিজয় তোরণ
ভেঙেছে ধূলার 'পর,
শিশুরা তাহারই পাথরে আপন
গড়িছে খেলার ঘর।"

উত্তর : মানুষের জীবন একান্তভাবে সীমায়িত। অনন্ত কালের প্রভাবে মানুষের জীবন একটি ক্ষণিক বিন্দু। কিন্তু মানুষ অহেতুক অহংবোধে গর্বিত হইয়া কলকোলাহলে জীবনকে ভরিয়া তুলিয়া মনে করে সে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অত্যাচারীর দম্ভে ও দাপটে সমস্ত বিশ্ব প্রকম্পিত হইতে থাকে। সে শাসনের জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া ভাবে বোধহয় সে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিতেছে। তাহার বিজয় তোরণের চূড়ার ন্যায় তাহার অহংকার উচ্চ হইয়া আপনাকে একান্তভাবে স্থায়ী বলিয়া মনে করে। কিন্তু কালের আবর্তনে তাহা কোথায় লুপ্ত হইয়া যায়। যাহা আজ অক্ষয় বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা কোথায় মিলাইয়া যাইবে। বিজয় তোরণের অভ্রভেদী চূড়া কালের আঘাতে ধূলিচুম্বন করিবে। কিন্তু মানুষের জীবন চির-প্রবাহিত। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখভরা জীবন নিজের ছন্দে বিরামহীনভাবে বহিয়া যায়—তাহার কোন ছেদ নাই, তাহার ক্লান্তি নাই, তাহার অবসান নাই। সেখানে মানুষ কাজ করে, শিশুরা খেলা করে। আবার হয়ত খেলাচ্ছলে শিশুরা বিজয় তোরণের ভগ্ন প্রস্তরে খেলাঘর পাতিয়া বসে। কালের নির্মম পরিহাসে অত্যাচারীর অভ্রভেদী চূড়া চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং যাহার রক্তচক্ষুতে সকলে তটস্থ হইত তাহারই ভগ্ন বিজয়স্মৃতিস্তম্ভে শিশুরা অনায়াসে আপন খেলাঘর পাতিয়া বসে।

[৩] **ভাবসম্প্রসারণ কর :**

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে;
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।"

উত্তর : নদীর উভয় পারই সরস শ্যামল। নদীর অনুরূপ প্রবাহের সরসতায় নদীর পার সবুজ ও শ্যামল হইয়া উঠে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার কোন সীমা নাই। বিশেষ করিয়া ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে অপরের সৌভাগ্যকে সর্বদাই অধিক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। তাই নদীর একটি দিক অপর দিক হইতে নিজেকে কম সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করে। নিজের দিকের নূতন শ্যামলতার কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করিতে থাকে যে, বোধহয় অপর

পার অধিকতর সবুজ—অধিকতর সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী। মানুষের জীবনেও এইরূপ দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষই, যে যাহার ভাগ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না। সে আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাড়িত হয়। সে ভাবিতে থাকে বোধ হয় সকলে তাহার অপেক্ষা অনেক সৌভাগ্য লাভ করিয়া সুখে আছে এবং অপরের তুলনায় নিজের মন্দভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতে থাকে; আসলে মানুষ নিজের ভাগ্য ও নিজের সম্পদ লইয়া তুষ্ট থাকিতে জানে না। প্রতিনিয়ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় সে পীড়িত। পরশ্রীকাতরতায় তাহার মন ক্লিষ্ট। তাই সে সর্বদাই অপরের তুলনায় নিজের সম্পদ কম করিয়া দেখে এবং আপন ভাগ্যকে নিন্দা করিতে থাকে। নদীর উভয় পারই সমান। তবু একটি পার অপর পারটিকে বেশী সম্পদের অধিকারী ভাবিয়া বেদনা বোধ করিতে থাকে। মানুষের জীবনেও এই সত্যটি সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। মানবের স্বভাবেই রহিয়াছে চির-অতৃপ্তি।

[৪] ভাবসম্প্রসারণ কর :

"টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি :
'হাত-পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারি।'
হাত-পা কহিল হাসি : 'হে অভ্রান্ত চুল।
কাজ করি আমরা যে, তাই করি ভুল।'"

উত্তর : যে কাজ করে তাহার কাজে ভুলভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক। একান্ত নির্ভুলভাবে কাজ করিয়া যাওয়ার ক্ষমতা কাহারও নাই। তাই ভুলভ্রান্তি থাকিলেও কর্মী-মানুষকেই সকলে শ্রদ্ধা জানাইয়া থাকে। কিন্তু পরাশ্রয়ী মানুষ—যে কোন কাজ করে না—স্বাভাবিকভাবেই, তাহার কোন ভুল হইবার সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে কেহই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেয় না। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে হাত-পা কাজ করে। তাহারা কাজ করে বলিয়াই তাহাদের ভুলও হয়, ধুলাও লাগে কিন্তু কাজ করে বলিয়াই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বও অবিসংবাদিত। টিকি দেহের উচ্চতম আসনে বসিয়া থাকে। তাহার কোন কাজ নাই—সে কেবল শরীরের অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে নিজেকে সঞ্চালিত করিয়াই খালাস। তাই বাক্-সর্বস্ব সমালোচকের ভূমিকা সে গ্রহণ করিয়া থাকে। সে হাতপায়ের কাজে

ভুলের আধিক্য দেখায় এবং আপন নির্ভুলতার মূঢ়-গর্বে পূর্ণ হইয়া বসিয়া থাকে। সমাজের পরাশ্রয়ী ব্যক্তিদের আমরা এই মূঢ় আত্ম-অভিমান লক্ষ্য করি। কিন্তু কোন কাজ না করিয়া যে নির্ভুলতা তাহা তো অর্থহীন—তাহা কোনদিন মানুষের সম্মান পায় না। সত্যকার কর্মী পুরুষ যাঁহারা কর্তব্যকর্মে নিজেদের জীবনকে সার্থক, ধন্য করিয়াছেন—তাঁহাদেরই মানুষ শ্রদ্ধা ও সম্মান জানায়। এমনকি তাঁহাদের কর্মে ভুলভ্রান্তি থাকিলেও লোকে তাঁহাদের সম্মান জানাইতে কুণ্ঠিত হয় না—কারণ কাজ করিলেই ভুল থাকিতে পারে।

[৫] ভাবসম্প্রসারণ কর :

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
অজস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ-লোকাচার।"

উত্তর : দুর্গম গিরি পর্বত পার হইয়া, সহস্রবাধা অতিক্রম করিয়া দুরন্ত দুর্বার গতিতে আগাইয়া চলাই নদীর কাজ। মহাসাগরের বুকে লীন হইবার পূর্বে সে চলে বহু দেশের মধ্য দিয়া, দুইপারের ভূমিকে শ্যামল সরস করিয়া। এই অবিরাম চলার বেগই নদীর জীবন। কিন্তু যদি কোথাও এই গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অকস্মাৎ তাহার প্রাণশক্তিতে টান পড়ে। যে দুরন্ত গতি নদীকে উজ্জীবিত রাখে তাহা চলিয়া গেলে নদী প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া ক্রমশঃ বুজিয়া আসে। তখন আর তাহাতে পূর্বের সেই উদ্দাম লীলাচাঞ্চল্য থাকে না—থাকে না তাহাতে তরঙ্গের বিচিত্র লীলা। তখন তাহার বুকে বাসা বাঁধে শৈবালদাম এবং নদীর জলকে ক্রমশঃ ময়লা ও নোংরা জঞ্জালের স্তূপে পরিণত করিয়া দেয়। জাতির জীবনেও এই গতির মূল্য বুঝিতে পারা যায়। জাতির জীবনেও গতিই চরম মূল্যবান। এই গতির অভাব ঘটিলেই জাতির প্রাণশক্তি ক্রমশঃ স্তব্ধ হইয়া যায়। প্রাণের চলার বেগে জীবনের নিত্যনূতন বিকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু স্রোত-হারা কুণ্ঠিত জীবনে এই প্রাণচাঞ্চল্য থাকে না। তখন জাতির জীবনে নামিয়া আসে লোকাচারের শাসন, জীর্ণ-আচারসর্বস্বতা। জাতি তখন

আর বিকাশলাভ করিতে পারে না। তাহার প্রাণ-সম্পদের নূতন নূতন দিক আর উন্মোচিত হয় না। তাহার বদলে নামিয়া আসে অর্থহীন লোকাচারের বন্ধন। আমাদের শাস্ত্রেও 'চরৈবেতি' মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। এই সংস্কারমুক্ত, দ্বিধাহীন, অবারণ চলাই জীবন এবং ইহার অভাবই মৃত্যু।

[৬] **ভাবসম্প্রসারণ কর :**

"যার খুশি রুদ্ধ করি করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা মিথ্যা লভো সেই জ্ঞান।
আমি ভূতক্ষণে বসি নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।"

[ক. বি. ১৯৬৪ ও '৬৫]

উত্তর : এ পৃথিবীতে এমন অনেক দার্শনিক ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু আছেন যাঁহারা এই পৃথিবীর অপরিসীম রূপলাবণ্যের দিকে ফিরিয়া চাহেন না। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়ী পৃথিবীর অপরূপ শোভা তাঁহারা দেখিতে চাহেন না। তাঁহারা চক্ষু মুদিয়া এই অসার বস্তুর অন্তরালে যে সারবান বস্তু আছে—তাহারই সন্ধান করিতে থাকেন। সত্যই তো পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাই তাঁহারা এই অনিত্য সংসার-সৌন্দর্যের পিছনে বৃথা মনকে ব্যয়িত না করিয়া নিত্য-সৌন্দর্যের সন্ধানে চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতে থাকেন।

কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, সেই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা পুরুষ অতীন্দ্রিয় বস্তুতেই নাই—এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপও তাঁহারই বিভূতি। রূপসমুদ্র পার হইয়াই তো অরূপসাগর। তাই বলিয়া অরূপ রূপসাগর বাদ দিয়া নহে—যাঁহার ইঙ্গিতে এই বিশ্বসংসার প্রতিমুহূর্তে নিত্যনূতন রূপ ধারণ করিতেছে, তাঁহাকে পাইতে হইলে এই ক্ষণিক সৌন্দর্যকে বাদ দিয়া গেলে চলিবে না। সসীমের মধ্যেই যে সেই অসীমের প্রতিচ্ছবি তাহা ভুলিলে চলিবে না। বিশ্বনিখিলের এই নিগূঢ় মর্মার্থ জীবনরসিক বুঝিতে পারেন। তিনি জানেন যে, এই বিশ্বপৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া, ইহার প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালবাসিয়া সেই পরমপুরুষের নিগূঢ় সত্তার অনুভূতি লাভ করিয়া ধন্য হওয়া যাইবে। তাই মর্তের মৃত্তিকার সৌন্দর্য দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইতে হইবে।

[৭] ভাবসম্প্রসারণ কর :

"দিবসে চক্ষুর দম্ভ দৃষ্টিশক্তি লয়ে,
রাত্রি যেই হল সেই অশ্রু যায় বয়ে।
আলোরে কহিল—আজ বুঝিয়াছি ঠেকি
তোমারি প্রসাদবলে তোমারেই দেখি।"

উত্তর : মানুষ যতক্ষণ ক্ষমতার গর্বে অন্ধ থাকে ততক্ষণ সে নিজের ক্ষমতার সীমা বুঝিতে পারে না। সে নিজেকে বিরাট বলিয়া মনে করে। যখন সে আঘাত পায়, তখন তাহার ক্ষমতার দর্প চূর্ণ হইয়া যায় এবং সে নিজের স্বরূপ চিনিতে পারে। দিনের আলোক সমস্ত বস্তুকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। তাহাই আবার চক্ষুতে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে দৃষ্টিদান করে। বস্তুতে প্রতিহত আলোক চক্ষুতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আবার আলোকিত বস্তু দেখিতে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে ইহা আলোরই লীলা। কিন্তু চক্ষু আপন ক্ষমতাগর্বে উদ্ধত হইয়া উঠে। সে ভাবে সে নিজেরই শক্তিতে সব কিছু দেখিতে পাইতেছে। এই মূঢ় আত্ম-অভিমান তাহার ভাঙিয়া যায় রাত্রিবেলা। রাত্রির অন্ধকার যখন নামিয়া আসিয়া দিবসের আলোককে মুছিয়া নেয়, তখন আলোর অভাবে চক্ষু আর দেখিতে পায় না। চক্ষু বুঝিতে পারে যে, তাহার শক্তির প্রকৃত উৎসভূমি কোন্‌টি—কাহার প্রসাদে সে দৃষ্টিলাভ করিয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বৃথা ক্ষমতাগর্বে সে অন্ধ হইয়া ছিল। প্রথম আঘাতের বেদনায় সে এই সত্য বুঝিতে পারিয়াছে। সমাজ-সংসারেও আমরা এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি। ভগবানের অসীম দানকে অনায়াসে ভুলিয়া গিয়া আমরা স্বীয় ঐশ্বর্যের মিথ্যা অভিমানে পূর্ণ হইয়া থাকি। আমরা এতদূর ক্ষমতাগর্বী হইয়া পড়ি যে, আমরা নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া যাই এবং আমাদের শক্তির প্রকৃত উৎসকে ভুলিয়া যাই। তারপর যখন নামিয়া আসে প্রচণ্ড আঘাত, তখন বেদনার আঘাতে আমরা সচেতন হই এবং যাঁহার কৃপায় আমরা শক্তিমান তাঁহাকে চিনিতে পারি।

[৮] ভাবসম্প্রসারণ কর :

"বক্তা ও লেখক এক জাতীয় জীব নন। ইঁহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন;

অপরপক্ষে লেখক পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না, লেখক পাঠকের অবসরের সাথী।"

উত্তর: আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে বক্তা ও লেখককে একই প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ বক্তা ও লেখকের মূল উদ্দেশ্য একই—তাঁহারা উভয়েই পাঠক তথা শ্রোতার মনকে অভিভূত করিতে চাহেন। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বক্তা ও লেখকের মধ্যে মিল অপেক্ষা অমিলই বেশী। প্রকৃতিগত দিক হইতে বক্তা ও লেখক পৃথক শ্রেণীর লোক। তাঁহাদের উভয়ের উদ্দেশ্য শ্রোতা বা পাঠকের মন জয় করা হইলেও তাঁহাদের পদ্ধতিতে কিছু মাত্র মিল নাই। কারণ যিনি বক্তা তিনি শ্রোতার মনকে তৎক্ষণাৎ জয় করিতে চাহিবেন। তিনি যদি শ্রোতার মনকে আপনার দিকে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার বক্তব্যের উপস্থাপনা সম্ভবই হইবে না। অতএব তাঁহাকে অনর্গল বাগ্‌বিন্যাস করিয়া নানান কৌশলে শ্রোতাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে হয়। এইজন্য বক্তার সমগ্র ব্যাপারেই একটি আত্যন্তিক ভাব থাকে। তিনি যেন শ্রোতাকে ভাবিবার সময় দিতে চাহেন না, বরং তাহার মনকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া ভাষণের তীব্র স্রোতের মধ্যে ভাসাইয়া লইতে চাহেন। কিন্তু লেখক এইরূপ পদ্ধতি চাহেন না। যদিও তিনি পাঠকের মনকে অধিকার করিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি পাঠকের সহকর্মী হইতে চাহেন, ফলে তাঁহার বক্তব্য পাঠকের নিকট ধীরে ধীরে মেলিয়া ধরেন—সমস্ত ব্যস্ততার ভাব পরিহার করিয়া একের পর এক গ্রন্থি খুলিয়া তিনি পাঠকের সামনে মেলিয়া ধরেন এবং ইহারই মধ্যে যেমন পাঠক ও লেখকের মধ্যে একটি অনুচ্চারিত সহমর্মিতার ভাব গড়িয়া উঠে তেমনি তিনি পাঠকের মনের মধ্যে একটি প্রভাবও বিস্তার করিতে পারেন। বক্তার ন্যায় তাঁহার নগদ-বিদায়ের পালা নহে—ফলে তিনি অবসর লইয়া বলিতে পারেন। তাহার জন্য তিনি পাঠকের ব্যস্ততার মধ্যে আসিতে চাহেন না এবং পাঠকের অবকাশের ক্ষণেই তাঁহার আগমন। এইজন্য বক্তা ও লেখক ভিন্নভাবে ভিন্ন যোগে শ্রোতা ও পাঠকের মন অধিকার করেন।

[৯] ভাবসম্প্রসারণ কর :

"অক্ষমতাই মহত্ত্বের উপর বিরক্তির প্রধান কারণ। আলস্য পরিহার করিয়া কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নির্ভয়ে খাটিয়া যাওয়া অনেকের পোষায় না। তাহারাই আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় মহত্ত্বের নিন্দা রটাইয়া বেড়ায়।"

উত্তর : যিনি মহৎ তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে, সম্মান জানায়। কিন্তু এ পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু লোক আছে যাহারা মহত্ত্বকে সহ্য করিতে পারে না। তাহারা যে কোন অছিলায় মহত্ত্বের নিন্দা করিতে থাকে। যে মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা সর্বজন-শ্রদ্ধেয় মহৎ ব্যক্তির নিন্দা করিতে থাকে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, আপনাকে প্রকাশ করিবার বাসনায়ই তাহারা নিন্দামুখর হইয়া উঠে। কারণ আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা—সর্বজনীন ইচ্ছা। প্রত্যেকেই চায় নিজেকে এমন বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করিয়া সকলের সামনে মেলিয়া ধরিতে যাহাতে সকলেই তাহাকে অপর সকল হইতে পৃথক করিয়া চিনিতে পারে। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন অতন্দ্র সাধনার। নিজের জীবনকে কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়া আপনাকে সর্বতোভাবে সেই দিকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এই পথে আসিবে বাধা, জুটিবে উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য। এমনকি সফলতা হয়ত দূর হইতে হাতছানি দিলেও সহজলভ্য হইবে না। এইজন্য নির্ভীকভাবে, কোন দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া একাগ্র সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে যেদিন সাফল্য আসিবে সেদিন একদিকে অন্তরের তৃপ্তি, অপরদিকে সকলের সম্মুখে নিজেকে মেলিয়া ধরায় একটি বিচিত্র পুলক অনুভব করা যায়। কিন্তু যাহারা অক্ষম, যাহাদের অতন্দ্র সাধনার ক্ষমতা নাই, যাহারা কঠোর শ্রমকে ভয় পায়, তাহারা লোকসমাজে নিজেকে পরিচিত করিবার ব্যাকুল তৃষ্ণায় পথহারা হইয়া একটি অতি সহজ পথ বাছিয়া লয়। তাহারা মহৎ ব্যক্তির নিন্দা রটাইয়া নিজেকে মূল্যবান প্রমাণ করিতে চাহে। ঈর্ষাকাতর চিত্তের এই পরোক্ষ তৃপ্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষাই মহৎ ব্যক্তির অযথা কুৎসা রটাইবার প্রেরণা যোগাইয়া থাকে।

[১০] ভাবসম্প্রসারণ কর :

"লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী লাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহের, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে।"

উত্তর : আমাদের দেশে লক্ষ্মী ধন ও সমৃদ্ধির দেবী। তাঁহার প্রসাদে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়। আবার কুবের ধনপতি। পৃথিবীর সমগ্র ধনসম্পদ তাঁহার করায়ত্ত। তাঁহারই প্রসাদে ধনবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এই দুই দেবতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। লক্ষ্মীর ধনবৃদ্ধির সহিত সামগ্রিকভাবে কল্যাণধর্মটি নিহিত থাকে। সুতরাং যেখানে লক্ষ্মীদেবীর পাদপদ্ম বিরাজিত, সেখানে শুধু ধনসম্পদ উথলিয়া উঠে না, সেখানে ধনসম্পদ একটি পরম কমনীয় কল্যাণশ্রী লাভ করিয়া সার্থকতা লাভ করে। সেই কল্যাণশ্রী ধনসম্পদের অন্তরস্থিত কালিমাকে ধৌত করিয়া নূতন তাৎপর্য দান করে। কিন্তু কুবের কেবল ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিতে জানেন। সেখানে শুধু কঠোর সঞ্চয়ের দ্বারা বৃদ্ধি। সেখানে কল্যাণধর্মের কোন স্পর্শ নাই। ফলে অর্থের যে মালিন্য তাহা ঘুচিয়া যায় না—অর্থের জড়ত্ব কালিমা পাষাণস্তূপের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া থাকে।

এই কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য আমরা এই পৃথিবীতে অহরহঃ দেখিতে পাই। এখানে অনেকে ধনসঞ্চয় করেন—কিন্তু তাহাতে কোন শ্রী নাই। কৃপণের ধন-সঞ্চয় কোন কল্যাণ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় না—তাহা কেবল সঞ্চয়ের নিষ্ফল বোঝাই বাড়াইতে থাকে। এইরূপ ধনীরা কুবের দেবতার উপাসক। ধন-সঞ্চয়ে তাহাদের আত্মসুখসর্বস্বতার নগ্নরূপটি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-চেতনা ধনসম্পদের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। সে ধন-সম্পদ কেবল ক্রমশঃ বহুলত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগতের মহত্তর কল্যাণধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া তাহা তাহার জড়-প্রকৃতি কাটাইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু যে ধনসম্পদ বিশ্বমানবতার মহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত তাহাই সার্থক। তাহা ঐশ্বর্যের কলঙ্ককে ঘুচাইয়া এমন এক কল্যাণশ্রী আনিয়া দেয় যাহা লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্য সুধার সহিত তুলনীয়। মানুষের মূল ধর্মই হইতেছে অপরের কল্যাণ। এই

যৌথ মানব-কল্যাণের আদর্শের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়া অর্থ যখন এক নূতন সার্থকতার দীপ্তি আহরণ করে; ব্যক্তিস্বার্থের অন্ধকূপ হইতে মুক্ত হইয়া অর্থ যখন বৃহত্তর মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত হয়, তখন অর্থের নূতন ও পরিপূর্ণ গৌরব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

[১১] ভাবসম্প্রসারণ কর :

"রাখালকে কেউ ভুলেও রাজসিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না। এইজন্যেই বটতলায় সে বাঁশি বাজাইবার সময় পায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি কেউ করে বসে, তাহলে পাঁচনিকে রাজদণ্ডের কাজে লাগাতে গিয়ে রাখালি এবং রাজত্ব দুয়েরই বিঘ্ন ঘটে।"

উত্তর : যে রাখাল সে আপন মনে মাঠে মাঠে গোরু চরাইয়া বেড়ায়। জগতে যে সমস্ত গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া যাইতেছে সেগুলি তাহার সহজ জীবনযাত্রার ছন্দকে ব্যাহত করে না। রাজদরবারের কঠিন সমস্যা ও গুরুতর বিপর্যয় তাহার জীবনে কোনরূপ ছায়াপাত করে না এবং করে না বলিয়াই তাহার সহজ জীবনে যে নিশ্চিন্ত অবসর আছে তাহাকে সে ভরিয়া তোলে বাঁশির বিচিত্র সুরে। তাহার চিন্তাশূন্য, সমস্যাশূন্য জীবনযাত্রার প্রতিধ্বনি আমরা তাহার বাঁশির মিষ্টি সুরে শুনিতে পাই। কিন্তু অকস্মাৎ যদি তাহাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহার পাঁচনিকে রাজদণ্ডরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত দিকে গুরুতর বিপর্যয় দেখা দিবে। সে যে শুধুমাত্র রাজকার্যে অক্ষম হইয়া সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে তাহাই নহে, তাহার নিশ্চিন্ত সহজ জীবনযাত্রাও বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে—সেখানেও সে প্রশান্ত সুর আর শোনা যাইবে না।

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে। পৃথিবী বিশাল এবং তাহার কর্মক্ষেত্রও বিরাট বিচিত্র। এই বিপুল কর্মকাণ্ডে মানুষকে যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইতে হইবে। কারণ সমস্ত মানুষের বোধ-শক্তি কর্মশক্তি সমান নহে। এইভাবে সকল মানুষের সম্মিলিত ও সমন্বিত কর্মপ্রবাহেই বিশ্বপৃথিবীর বিশাল কর্মচক্র সুষ্ঠুভাবে ও অবিরত ঘুরিতেছে। কিন্তু মানুষ যদি তাহার যথাযোগ্য ভূমিকা না লইয়া এলোমেলোভাবে যেখানে যাহার খুশি কাজ করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে বিষম বিপর্যয়

দেখা দিতে বাধ্য। আমাদের নিজেদের কর্মশক্তির [illegible] সীমাকে চিনিয়া লইয়া তদনুযায়ী নিজেকে নিযুক্ত করাই প্রধানতম সমস্যা। তাহা না হইলে রাজসিংহাসনে স্থাপিত রাখালের ন্যায় আমাদের জীবনে বিপর্যয় ঘটিতে বাধ্য। অবশ্য সমাজবাদে বিশ্বাসীরা ইহাতে প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, মানুষ সকলেই সমান। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ সকলেই সমান, কিন্তু মানুষের আকৃতিতে যেমন পার্থক্য আছে, তাহার প্রকৃতিতেও পার্থক্য বিদ্যমান। এই মূল সত্যটিকে স্বীকার করিয়া লইয়া সব শ্রম সমান—এই নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

•

[১২] ভাবসম্প্রসারণ কর :

"মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন, তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।"

উত্তর : বিধাতা পৃথিবীতে বহু জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, বোধহয় মানুষই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিধাতার করুণা-দৃষ্টি-বঞ্চিত। কারণ তিনি মানুষের জন্য যত কঠোর দুঃখ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন অন্যান্য জীবজন্তুদের বেলায় তাহা করেন নাই। অন্যান্য জীবজন্তুদের আত্মরক্ষার প্রকৃতিগত কতকগুলি অস্ত্র আছে—কাহারও নখ, কাহারও দন্ত, কাহারও বা কর্কশ গাত্রচর্ম, কিন্তু মানুষের অনাবরণ ত্বককে রক্ষা করিবার কোন বর্ম নাই। নখে ও দন্তে কোনও প্রতিরোধ্য শক্তি নাই। তাহার উপর মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা একটি কঠিন ব্যাপার। তাহাকে বহু পরিশ্রম করিয়া, অনেক বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করিয়া তবে নিজের প্রয়োজন মিটাইতে হয়। ইহার উপর আরেকটি কঠিন সমস্যা আছে। মানুষের ন্যায় কোন জীবজন্তুকেই স্বাবলম্বী হইবার জন্য এত দীর্ঘকাল অপরের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হয় না। এত কঠিন, এত কঠোর, এত বিপদসংকুল জীবনযাত্রা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া বিধাতা তাহাকে সম্বল হিসাবে দিয়াছেন দুইটি হাত, দুইটি পা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

কিন্তু ইহাতে মানুষের কোন অপকার তো হয়ই নাই, বরং তাহার গৌরব বাড়িয়াছে। মানুষ বুদ্ধিবলে জীবশ্রেষ্ঠ। সে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ;

। বিধাতার জয়তিলক বুদ্ধি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে। তাই বিধাতাও াহিয়াছেন যে, মানুষ তাহার শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিয়া আত্মশক্তিকে চিনিতে শিখুক। ইহাতে মানুষের গৌরব বাড়িয়াছে। মানুষ যদি কেবলমাত্র বিধাতার বিধানে পৃথিবীর রাজা হইয়া বসিত, তাহা হইলে আত্মশক্তিতে ীপ্ত মহাবীর্যবান এই মনুষ্যগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ আমরা পাইতাম না। মানুষ যদিন পৃথিবীতে আসিয়াছিল, সেদিন দুন্দুভিনাদে তাহাকে রাজমুকুট রাইয়া সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই। তাহাকে অনবরত হিংস্র শ্বাপদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রকৃতির নিষ্ঠুর বৈরিতার ামুখীন হইতে হইয়াছে; তবে পৃথিবীর বুকে তাহার স্থান মিলিয়াছে। কিন্তু হাতে মানুষের অন্তরস্থিত সমস্ত ক্ষমতার পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটিয়া গিয়াছে— ঃখজয়ের সংগ্রামে মানুষ গৌরবান্বিত হইয়াছে এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা, ানুষ দুঃখের অনলে পুড়িয়া আপন হৃদয়ের মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন ঘটাইয়া ানুষ নামের সার্থকতা অর্জন করিয়াছে। বিধাতা-নির্দিষ্ট আরাম যে আমরা াই নাই ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য নহে, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। ঃখের সিংহবাহনে যে আমাদের প্রভাত আসিয়াছিল ইহাতে আমাদের ার্থকতা লাভের পথ আরও প্রশস্ত হইয়াছে।

[১৩] ভাবসম্প্রসারণ কর:

"আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেকস্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা জনসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে ড় এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার জন্যই উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমনস্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।"

উত্তর: লোকহিত করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মহত্তম কামনাগুলির মধ্যে একটি। মানুষ যখন নিজেকে একান্তভাবে অপরের মধ্যে বিলাইয়া দিতে পারে, যখন তাহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তার বিলোপ ঘটিয়া গিয়া বৃহত্তর লোক-সমষ্টির সত্তার সহিত সে মিশিয়া যায়, তখন লোকহিতসাধন তাহার নিকট মহত্তম ব্রত বলিয়াই বোধ হইতে থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে এই লোকহিত-সাধনের মধ্যে একটি সুপ্ত আত্মাভিমান থাকিয়া যায়। পরোপকার করিবার নেশার মধ্যে এই আত্মাভিমান বা অহংবোধ অতিশয় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়।

অনেক সময়েই দেখা যায় যে, আমরা সাধারণ লোক অপেক্ষা সর্ববিষয়ে বড় এবং তাহাদের কৃপা করিতেছি—এইরূপ একটি অহংবোধ আমাদের লোকহিত করিবার মানসিকতার অন্তরালে থাকে। মানুষ যদি তাহার নিজস্ব সত্তার সীমিত বোধ হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারে তাহা হইলে পরোপকার করিবার সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ। কারণ লোকহিতের মূল কথা হইল অপরের কল্যাণ। কিন্তু যেখানে দান স্বতোৎসারিত ঝর্ণাধারার মত নামিয়া আসে না—যেখানে দান করা হয় কেবলমাত্র দাতার অহংবোধকে তৃপ্ত করিবার জন্য, সেখানে গ্রহীতা মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া দান গ্রহণ করেন। তাহাতে তাহার সামাজিক বা আত্মিক কোন কল্যাণই হয় না। আবার এই অহং বোধের প্রচ্ছন্ন রূপ লইয়া যে লোকহিত সাধনের ব্রত তাহাতে দাতারও কল্যাণ হয় না। কারণ দান যদি সমগ্র অন্তর হইতে না আসে তাহা হইলে দাতার আত্মিক উন্নতি হয় না। আত্মাভিমান তৃপ্ত করিবার জন্য যে দান তাহা আত্মার প্রসার না ঘটাইয়া আত্মাকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। এই সঙ্কুচিত আত্মা লইয়া কোন মঙ্গল সাধন করা যায় না। কখনও কখনও লোক-হিতসাধনের নেশার মধ্যে বিরাট আয়োজনের আড়ম্বর থাকে, কিন্তু তাহাতে সত্যকার কল্যাণ দাতা বা গ্রহীতা কাহারও হয় না।

[১৪] ভাবসম্প্রসারণ কর :

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

উত্তর : সৌন্দর্য-তৃষ্ণা মানবজীবনের স্বাভাবিক বৃত্তি। মানুষের এই সৌন্দর্য-তৃষ্ণা আছে বলিয়াই সে মানুষ। সুন্দরকে লাভ করিবার এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়া নিখিল বিশ্বে মানুষ স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সক্ষম হইয়াছে।

সৌন্দর্য সন্ধানী মানুষ সুন্দরের আকর্ষণে যুগ যুগ ধরিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়া, পর্বতে, অরণ্যে, সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে; ছুটিয়া বেড়াইয়াছে জানা হইতে অজানায়। কিন্তু অতি পরিচিত পল্লীর গৃহপার্শ্বে সামান্য একটি ধানের শিষের উপর একবিন্দু শিশির যখন ঝলমল করিয়া উঠে, তখন যে অসামান্য রূপের মাধ্যমে সুন্দর আত্মপ্রকাশ করে, তাহা মানুষ কখনও দুচোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে না। কারণ, মানুষের ধারণা দূরে যে সুন্দরের অবস্থান—তাহাই একমাত্র সুন্দর, কাছের জিনিসে, পরিচিত পরিবেশে সুন্দর অনুপস্থিত।

দূরের ও নিকটের সৌন্দর্য—উভয়েই আমাদের নিকট মূল্যবান। দূরের সুন্দর নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। কিন্তু আমাদের গৃহের পার্শ্বে উদ্যানে প্রস্ফুটিত গোলাপের পাপড়ি-ঝরা সন্ধ্যাবেলার মতো, প্রত্যূষের ঘুম-ভাঙানো পাখীর কলকাকলির মতো একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দুও অনন্ত সৌন্দর্যকে আপন বুকের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে, তাহা আমাদের অজানাই থাকিয়া যায়। তাই আমরা শুনিতে চাই সমুদ্রের সঙ্গীত কিন্তু ঘরের মধ্যে, সংরক্ষিত শঙ্খের বুকেও যে সমুদ্রের সঙ্গীত নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, তাহা শুনিবার জন্য আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। তাই আমরা দেশের সৌন্দর্য পরিত্যাগ করিয়া বিদেশের সৌন্দর্যের হাতছানিতে উতলা হইয়া উঠি। নিকট প্রতিনিয়ত যে সুরে বংশীধ্বনি করিতেছে তাহা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। তাহা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে, নিখিল বিশ্বে সবখানি ব্যাপিয়া সুন্দরের অবস্থান। সৌন্দর্য-সন্ধানী দৃষ্টি থাকিলে দূরের বুকে সুন্দরের সন্ধান করিয়া আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির প্রয়োজন নাই। গৃহদ্বার হইতে দুই পা গিয়াই ধানের শিষের উপর সঞ্চিত শিশির বিন্দুতেই আমরা আমাদের সৌন্দর্য রসপিপাসু মনকে পরিতৃপ্ত করিবার অবকাশ পাইব। সকল কিছুর মধ্যে সৌন্দর্যের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করাই প্রকৃত রসিকের দৃষ্টি। এই দৃষ্টি যাহার আছে সে দূরে বা নিকটে সর্বত্রই সুন্দরের সন্ধান পায়।

[১৫] ভাবসম্প্রসারণ কর:

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর,
ভাবের স্বাধীন লোকে।

উত্তর : মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষা ও তাহারই সৃষ্ট কাব্যের ভাষায় যে পার্থক্য—তাহাকে জানিতে হইবে। মানুষের ভাষা একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ। এই অর্থের দ্বারা সেই ভাষা সীমাবদ্ধ। প্রতি-দিনকার প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া এই ভাষা ক্রমশঃই জীর্ণ ও পুরাতন হইয়া পড়িতেছে। তাহার শক্তি হইতেছে অবক্ষয়িত। অথচ বিপরীত পক্ষে, কাব্যের ভাষা সুনির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। কাব্যের ধর্মই এই যে, তাহা কোনো সুস্পষ্ট অর্থ নির্দেশ করে না, তাহা হৃদয়কে ভাবের স্বাধীনলোকে, সাহিত্যের স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। অর্থের সীমা অতিক্রম করিতে না পারিলে ভাষা ধ্বনিময় কাব্যরাজ্যে সমুত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ। এইজন্য ভাষার সহিত ছন্দ বা সুরের মিশ্রণের একান্ত প্রয়োজন। ছন্দের সহিত যুক্ত হইলে ভাষা পক্ষীরাজের ন্যায় কল্পলোকে অনায়াসে ধাবমান হইতে পারে। ছন্দের সাহায্যে ভাষা নব শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিয়া কাব্যের জগতে প্রবেশের অধিকারী হইয়া উঠে। ভাবলোকে উত্তীর্ণ কাব্যের অর্থ সর্বদা প্রসারিত হইতে থাকে।

[১৬] ভাবসম্প্রসারণ কর :

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

উত্তর : দুঃখ ও বিপদ, সংঘাত ও সংঘর্ষ মানুষের জীবনকে সার্থকতা ও পূর্ণতার পথে পরিচালিত করে। দুঃখ-বিপদ মানব জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত—এবং বিপদ ও দুঃখের সহিত ভয়শূন্য চিত্তে সংগ্রাম করিয়া বিজয়ী হওয়ার মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের মনুষ্যত্ব। যে মানব বাধা বিপত্তিকে দেখিয়া ভীত হয়, বিপদ বিঘ্নকে দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠে, দুঃখ-বেদনায় যে মানুষ আপন আত্মবিশ্বাস হারাইয়া সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়ে, সে মানুষ তাহার মানবতাকে অপমান করিয়া থাকে। বিপদের মুখোমুখি হইয়া ভীরু কাপুরুষের ন্যায় সেই দুঃখের হাত হইতে মুক্তি পাইবার আশায় ভগবানের নিকট করুণ প্রার্থনা করার মধ্যে আত্মার দীনতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে মানুষ দুঃখ-বিপদ সকুল এই পৃথিবীতে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া বসেন, তিনি মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু আত্মশক্তিতে বলীয়ান হইয়া যিনি জীবন পথে অগ্রসর হন, তিনি কেবল মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করিবার যোগ্য। কারণ, দুঃখকে আত্মসাৎ করার মধ্যেই কল্যাণ—বর্জনে নহে। দুঃখের আগুনে দগ্ধ না হইলে মানুষের মহিমার উজ্জ্বলতা প্রকাশলাভ করে না।

[১৭] ভাবসম্প্রসারণ কর :

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন
নিশীথে বিলীন,
দূরে পথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।—রবীন্দ্রনাথ

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]

উত্তর : প্রেমের মধ্যেই জীবনের সত্যকার অর্থ ও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনের কোলাহলে ও কর্মচাঞ্চল্যে আমরা প্রতিনিয়ত প্রেমকে হারাইতেছি।

প্রেম-ই হইতেছে প্রাণের পরিচয় বহনকারী ও প্রাণের সহিত প্রাণের সংযোগ সাধনকারী। পঞ্চেন্দ্রিয়ে আমাদের জীবন-চাঞ্চল্য। কিন্তু প্রাণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত বিশ্বেন্দ্রিয়ের দূত। বিশ্বেন্দ্রিয় গোপনে নিঃশব্দে বিশ্বানুভূতির সঞ্চার করিতে চাহে। তাই প্রেম গোপনচারী ও কখন সে দেখা দেয় কর্মকোলাহলে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাহাকে পাইবার জন্যও প্রাণের গভীরে আমাদের ব্যাকুলতার অন্ত থাকে না। কর্মকোলাহল ও জীবন চাঞ্চল্য যখন একটু স্তিমিত হয়, তখনই সেই ব্যাকুলতা মন-প্রাণের উপরিতলকে ছাপাইয়া ফেলে। কিন্তু তখন অনাদরে প্রেম চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে আর ফেরানো যায় না।

প্রেম অনন্ত—অসীম। তাহার স্পর্শে অসীমের অনুভূতি জাগে প্রাণে। অসীম বলিয়াই সীমার রূপ-বন্ধে তাহাকে পাওয়া যায় না। অসীমের অনুভূতি দানকারী প্রেমকে সীমা-সর্বস্ব চঞ্চল জীবনে ধরা যায় না। সে পার্থিব জীবনে হৃদয়ের আলেয়া হইয়াই রহিয়া যায়।

ভাবার্থ, ভাবসংক্ষেপ ও মর্মার্থ

[১] ভাবার্থ লিখ :

"সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।
আমি চলে যাব বলে
চালতা ফুল কি আর ভিজবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে ?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে না কি তার লক্ষ্মীটির তরে ?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর সরে ;
চারিদিকে শান্ত রাত্রি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব ;
খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল ;
এশিয়ার ধুলো আজ বেবিলন ছাই হয়ে আছে"।

—জীবনানন্দ দাশ

উত্তর : পৃথিবীতে কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। কালের স্রোতে সবই একদিন পৃথিবীর তটে ভাসিয়া আসে, আবার কালস্রোতেই তাহা একদিন ভাসিয়া যায়। এই অবিরাম আসা আর যাওয়া পৃথিবীতে ঘটিতেছে। অথচ ইহারই মধ্যে মানুষ ঘর বাঁধে, স্বপ্ন দেখে, আশা-নিরাশায় ভরা দিনগুলি হাসিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়া দেয়। আবার বিদায় লইবার কালে তাহার শূন্যস্থানে আসে নূতন মানুষ, সেও ঘর বাঁধে, সোনার স্বপ্নের জাল বোনে। আজিকার একটি মানুষ যেদিন এই পৃথিবী হইতে হারাইয়া যাইবে সেদিনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়াকর্মে গুঞ্জরিত, বিচিত্র জীবজন্তু, বিচিত্র গাছপালা লইয়া গঠিত এই পৃথিবী অনায়াস ছন্দে যথারীতি চলিবে—কোথাও এই স্বাভাবিক ছন্দের ব্যাঘাত ঘটিবে না। মানুষের তথাকথিত নীতির বাহ্য বিরাটত্ব ও তথাকথিত সুগঠিত সৌন্দর্য অক্ষয় বলিয়া

মনে হইলেও কালের নির্মম চক্রের আবর্তনে তাহা ধূলিতলে মিশিয়া যায়। ইতিহাস-খ্যাত এশিরিয়া, বেবিলন কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যেও চিরনবীন এই পৃথিবীর ছোট ছোট গল্পগুলি কোনদিনই মুছিয়া যাইবে না।

[২] **ভাবার্থ লিখ :**

"কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে।
অশেষ হয়ে সেই ত আছে এই ভুবনে॥
তারি বাণী দু হাত বাড়ায় শিশুর বেশে
আধো ভাষায় ডাকে তোমার বুকে এসে,
তারি ছোঁওয়া লেগেছে ওই কুসুম বনে॥
কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে—
পার হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা যে সকল ঘরের বাহির-দ্বারে,
তার আলো যে সকল পথের ধারে ধারে,
তাহারি রূপ গোপন রূপে জনে জনে॥"

—রবীন্দ্রনাথ

উত্তর : নিখিল বিশ্ব ভগবানের বিচিত্র লীলার স্থল। ইহারই নানা অংশে ভগবান নানারূপে বিরাজিত। কিন্তু সেই নিখিলের উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য প্রেমকে অবহেলা করিয়া অনেকে ছুটিয়া চলেন সেই অশেষকে ধরিবার জন্য। এই সমস্ত দার্শনিক ভুলিয়া যান যে, একান্ত শেষ বলিয়া ত কিছু নাই— ভগবানের ত শেষ নাই, তিনি অশেষ ও অনন্ত। তাই নিখিলবিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে সেই অশেষের প্রকাশ। তাহাকে ঘরের লোক বলিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না। তাহার রূপ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। সে ত সকল রূপে প্রতি জনের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

[৩] **মর্মার্থ লিখ :**

"তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল হীনতা মোর করহ ছেদন
দৃঢ়বলে অন্তরের অন্তর হইতে,
প্রভু মোর! বীর্য দেহ সুখেরে সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি, বীর্য দেহ দুঃখে,

যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিতে বীর্য দেহ,
কর্মে যাহে হয় যে সফল ; প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে উঠে ফুটি, বীর্য দেহ ক্ষুদ্রজনে
না করিতে হীনজ্ঞান,—বলের চরণে
না লুটিতে, বীর্য দেহ চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহ তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।"

—রবীন্দ্রনাথ

উত্তর ঃ ভগবানের শক্তিতে তুচ্ছতা হীনতা হইতে মুক্ত হইয়া এক মহান বীর্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। আমাদের অন্তরের সেই দীপ্ত শক্তি সুখের উচ্ছ্বাসে আমাদিগকে ভাসিয়া যাইতে দিবে না—আবার দুঃখবেদনাকে পরম শান্তস্মিতভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি আনিয়া দিবে। দুঃখ উপেক্ষা করিবার শক্তি আমাদের অন্তরে সঞ্চিত হইবে। আবার এই বীর্য এমন একটি পূত আগ্রহ সৃষ্টি করিবে যাহার দ্বারা আমরা অনায়াসে সর্বকর্মে সফল হইব। এই বীর্যলাভের ফলে কাহাকেও হীন ভাবিব না, সকলের প্রতি একটি অকুণ্ঠ ভালবাসা অনুভব করিব। আমরা ক্ষুদ্রকে হীন ভাবিব না অথবা প্রবলের প্রসাদলাভে তাহার চরণে মাথা লুটাইব না। এই বীর্য আমাদের অন্তরে এমন এক শান্ত সমাহিত অথচ মহিমান্বিত শক্তি আনিয়া দিবে যে, আমরা প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া আমাদের জীবনকে তুচ্ছতার গ্লানি হইতে মুক্ত রাখিতে পারিব।

আমরা যে মহান মনুষ্যজীবন লাভ করিয়াছি তাহার দায়িত্ব ও মূল্য বিরাট। কিন্তু নিজের অন্তরকে মনুষ্যোচিত উচ্চ রাখিবার সাধনা বিস্মৃত হইয়া আমরা পশুজীবনের পঙ্কে নিমজ্জিত থাকি। তাই ভগবানের উপর আমাদের অন্তরে মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধনের জন্য সমস্ত গ্লানি দূর করিবার জন্য মঙ্গলময়ের প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ শক্তির জন্য নির্ভর করিতে হইবে।

[৪] ভাবার্থ লিখ ঃ

আজি এই প্রভাতের আশীর্বাদখানি

লও তব মাথে
হে নগরী।
লও তব ধূলি-ধূম-ধূম্রজটা-বিভূষিত শিরে,
তব লৌহ-কাষ্ঠ-শিলা কারাগার হতে,
রক্তমসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জরিত তব
কর দুটি জুড়ি
আজি এই প্রভাতেরে করো নমস্কার।
মোহের দুঃস্বপ্নজাল বারেক ছিঁড়িয়া দুই হাতে
উর্ধ্বে চাহ অভিশপ্তা
ওই নীল আকাশের পানে
পূরব সীমান্তে যেথা দিবসের মাঙ্গলিক বাজে
আলোকের সুরে।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

উত্তর : বিজ্ঞানের দানে নগর-জীবন আজ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের পীঠভূমি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার কেন্দ্রভূমি নগর আজ লৌহ-কাষ্ঠ-শিলার কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শতলক্ষ কল-কারখানা আর তাহার ধুলা ও ধুমের আবরণে মানুষের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতার অবারিত প্রসন্নতা মাঠে মাঠে ছড়াইয়া পড়ে, রৌদ্রকিরণে সবুজ প্রান্তর ঝলমল করিয়া উঠে, প্রভাত-সূর্যের সোনালী স্পর্শে মালিন্য ও জড়তা কাটিয়া যায়। কিন্তু যন্ত্র-কণ্টকিত নগরী যেন কোন এক অভিশপ্তা নগরীর ন্যায় এ সমস্ত কিছু হইতে বঞ্চিত হইয়া রুক্ষ বীভৎসতার অন্তরালে এক দুর্বহ জীবন যাপন করিতেছে। তাই এই দুঃস্বপ্নের মোহজালকে কঠিন হস্তে ছিন্ন করিয়া প্রভাত আলোকের কল্যাণধারাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সমস্ত অস্বাভাবিকতা দূর করিয়া অকৃপণ অবারণ বিশ্ববিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ প্রভাত-সূর্যের মঙ্গলস্পর্শকে নিজের অঙ্গে লাগাইতে হইবে। নীল আকাশে আলোকের সুরে যে মাঙ্গলিক বাজিতেছে তাহা দ্বারা এই অভিশপ্ত জীবনকে পরাহত করিয়া দিতে হইবে।

[·৫] মর্মার্থ লিখ :

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য না

এবার কঠিন, কঠোর গদ্য আনো,
পদ-লালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা,
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে কবিতা গদ্যময় ;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

উত্তর : ক্ষুধায় অন্ন সংগ্রহ করিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদে যে ভীষণ সংগ্রাম শুরু হইয়াছে তাহার উপযোগী সাহিত্য আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কবিতার ললিত ঝঙ্কার আজ আর শোভা পাইবে না। যে আরাম ও বিলাসে জীবন অনায়াস ছন্দে বহিয়া যায়, সে আরাম ও বিলাস করিবার উপযুক্ত অবকাশ নাই। তাই সূক্ষ্ম সুকুমার কবিতাকে আজ ছুটি দিতে হইবে। আজ বরণ করিতে হইবে কঠিন ও কর্কশ গদ্যকে, যাহা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনকে এবং তাহার সঙ্গে তাহার সংগ্রামকে প্রকাশ করিয়া দিতে পারে। আজ মানুষের কাছে বাস্তব প্রয়োজন রূঢ় নির্মমতায় উপস্থিত হইয়াছে। তাই পূর্ণিমার চাঁদের লাবণ্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করিবার কাল ইহা নহে। আজ ক্ষুধার তাড়নায় পূর্ণিমার চাঁদকেও ঝলসানো রুটি বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ক্ষুধার রাজ্যে কবিতাতে গদ্যের কর্কশ অথচ তীক্ষ্ণ প্রকাশভঙ্গীই প্রয়োজন।

[৬] **ভাবার্থ লিখ :**

চাহিনা সুখে থাকিতে হে—
হেরো কত দীনজন কাঁদিছে॥
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে
জীবন সন্ধ্যা নিমেষে টুটিছে,
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন
শরমে চাহে থাকিতে হে॥
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ,
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয় বেদন করিতে মোচন

কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে।

আশার অম�ৃত ডালি দাও প্রাণে,
আশীর্বাদ করো আতুর সন্তানে—
পথহারা জনে ডাকি গৃহপানে
চরণে হবে রাখিতে হে ॥

প্রেম দাও শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
অশ্রু আকুল আঁখিতে হে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

উত্তর ঃ চারিদিকে যখন বেদনা ও বঞ্চনা, শোক ও হাহাকার শোনা যাইতেছে—তখন ভগবানের নিকট সুখের ললিত বিশ্রামে থাকিবার প্রার্থনা জানাইবার প্রয়োজন নাই। যখন আর্ত দীনজনের ক্রন্দন আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে, কত বেদনাহত জীবন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে তখনই সুখের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। এই আশাহীন, উৎসাহহীন, আতুর ব্যক্তিদের অন্তরে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও আশার অমৃত দীপটি জ্বালিয়া দিতে হইবে ; এই অন্ধ পথহারাদের সত্যকার পথ দেখাইতে হইবে। ইহাই শোককাতর প্রাণে নূতন আশা সঞ্চারিত করিয়া দিবে। ইহাতেই বঞ্চিত জনেরা নূতনভাবে ঈশ্বর প্রেমের মহিমা জানিতে পারিয়া আত্মার অপচয়কারী এই বেদনাকে পরাহত করিতে পারিবে।

[৭] **ভাবার্থ লিখ :**

পরের মুখে শেখা বুলি পাখীর মত কেন বলিস ?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস ?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুক্ বাজে হলি, গৌরব কি বাড়ল তাতে ?
আপনারে যে ভেঙ্গেচুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে,
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন, মনটা তার কদিন বাঁচে ?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপনার মাঝে ডুবে যারে,
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি, আর কোথায়ও পাবি নারে।

উত্তর ঃ অন্ধ অনুকরণবৃত্তি দ্বারা মানুষ কখনও বড় হইতে পারে না। মানুষ জন্ম হইতে বিধাতার নিকট হইতে আপন অভিনবত্ব লইয়া পৃথিবীতে আসে। তাহার সেই নিজস্ব সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশেই মানুষ হয় মহান। কিন্তু আপন সত্তার স্বাভাবিক বিকাশ-ধারাকে পিষ্ট করিয়া কেবলমাত্র পরের জিনিসকে আত্মসাৎ করিলেই বড় হওয়া যায় না। পরের ভাষা, পরের ভঙ্গী কখনও আপনার হইয়া উঠিতে পারে না—তাহা মানুষকে কখনও চিরন্তনত্ব দান করে না। জীবনের এই বিপুল অপচয় ও অবমাননাকে পরিহার করিতে গেলে মানুষকে পরানুকরণবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত করিতে হইবে।

[৮] মর্মার্থ লিখ ঃ

ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে। যাহার প্রাণ আছে তাহার প্রাণের যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সে-ই মরিতে কৃপণতা করে। যে মরিতে জানে, সুখের অধিকার তাহারই। যে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে-লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে, বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের নিকট নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না। তাহাকে উচ্ছিষ্ট মাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর, মৃত্যুর আহ্বান শুনিবামাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়ি-জুড়ি এবং তকমা-চাপরাশের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাস-বিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে—যদি স্বেচ্ছায় তাহাকে বরণ করি তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

উত্তর ঃ সুখের কাঙাল হইয়া যাহারা জীবনকে ও বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায় তাহারা সুখ পায় না। কারণ সুখ ও আনন্দ অত সহজলভ্য নয়। বৃহত্তর জীবনের আচরণের মধ্য দিয়া যে অকুতোভয় বীর্যবান মানসিকতার সৃষ্টি হয় তাহাই সুখলাভের উপযুক্ত ভূমি। সুখকে প্রাণপণে চাহিলেই সুখ পাওয়া যায় না। বিলাস-বিভ্রমের চাকচিক্যে

আনন্দলাভ করিবার চেষ্টা বৃথা। যে বলিষ্ঠ পৌরুষ ত্যাগের কঠোরতাকে অনায়াসে স্বীকার করিয়া হইতে পারে, যে উন্নত মন ভোগাকাঙ্ক্ষার দীনতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছে, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বরণ করিতে ভয়ে কম্পিত হয় না—সে-ই সুখ ও আনন্দের প্রকৃত সন্ধান পায়। সুখ ভীরুর লভ্য নয়—ইহা বীর্যবানের লভ্য

[৯] ভাবার্থ লিখ:

"বুদ্ধদেবের সময়ে যদি সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকত তাহলে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেত। তাঁর চেহারা, চালচলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটখাট ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগ-তাপ-ক্লান্তি-ভ্রান্তি সব আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখতুম। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক বলে গণ্য করা যায় তাহলে একটা মস্ত ভুল করি। সে ভুল হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের—ইংরাজীতে যাকে বলে পারস্‌পেকটিভ। যে-জনতাকে আমরা সর্বসাধারণ বলি, সে কেবল ক্ষণকালের জন্য মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। অথচ এমন-সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার করো থাকেন। যে গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেই হল অসাধারণ মানুষ। তাকে ডাঙায় তুলে মাছকোটার মত কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ করতে থাকেন তখন দামী জিনিসের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেছে। সাধারণ সত্য মস্ত হস্তীর মতো এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দখল করলে সেটা কি সহ্য করা যাবে!"

উত্তর: পৃথিবীতে যাঁহারা কোন-না-কোন গুণে অসাধারণ বলিয়া পরিচিত হন, তাঁহাদের অসাধারণত্বের সেই মহত্ত্বটুকু সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদের আচার-আচরণের মধ্যে আমরা সাধারণত্ব খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এই অসাধারণ ব্যক্তিদের সহিত অতি সাধারণ ব্যক্তিদের কোন পার্থক্য থাকে না। তাঁহাদের আকৃতি-অবয়ব, রীতি-নীতি, ব্যক্তিগত অভ্যাস, দৈনন্দিন জীবনের

পরিপ্রেক্ষিত, এ সমস্তই তাঁহাদের মধ্যে আবিষ্কার করা অসম্ভব। কিন্তু তাহা ছাড়াও তাঁহাদের জীবনাদর্শ ও চরিত্র মাহাত্ম্যের মধ্যে এমন একটি মহৎ মর্যাদা থাকে, এমন একটি অত্যুন্নত মহিমা থাকে, যাহার জন্ত তাঁহারা অসাধারণ বলিয়া পূজিত হন। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যেই তাঁহারা সমুজ্জ্বল—ইহাকে বাদ দিয়া সাধারণ সত্যের মাপকাঠিতে তাঁহাদিগকে মাপিতে গেলে তাঁহাদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ধরা যাইবে না।

[১০] **মর্মার্থ লিখ :**

"মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ—সকলেরই এক-একটি বহ্নি আছে। সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে। কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। আবার সংসার কাচময়—কাচ না থাকিলে সংসার এতদিন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিদ্ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানস প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত তবে কয়জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞানবহ্নির আবরণ কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, মানবহ্নিতে নিত্য সহস্র-পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাকে আমরা কাব্য বলি। মহাভারতে মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন—জগতে অতুল কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নি-জাত দাহের গীত প্যারাডাইস লস্ট্। ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্টপল্, ভোগবহ্নির পতঙ্গ এণ্টনি ক্লিওপেট্রা। রূপবহ্নির রোমিও জুলিয়েত, স্নেহবহ্নিতে ওথেলো। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহবহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহ-জন্ত রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কী, আমরা জানি না। তবুও সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না তো কী?" [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

উত্তর : আগুন দেখিলে পতঙ্গ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহাতে সে পুড়িয়া মরে তবু তাহাই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা। মানুষের জীবনেও সেইরূপ নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা উন্মাদনা জাগায় এবং উন্মাদনায় ব্যাকুল হইয়া মানুষ অন্ধ-আবেগে ছুটিয়া চলে তাহার সেই ব্যাকুল তৃষ্ণাকে মিটাইবার জন্ত। ইহার পরিণাম হয়তো মৃত্যু। কিন্তু তবুও সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর পরিণামকে বরণ করিয়া লইতে মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। অনেক সময়েই

তাহার আশা সফল হয় না। নানা বাধাবিঘ্ন সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে তাহার কাম্যবস্তু হইতে দূরে সরাইয়া লয়। তখন সে বহু শতকোটি সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্যে প্রাত্যহিক জীবনের গড্ডলিকা স্রোতে মিশিয়া যায়। কিন্তু মানুষ যখন সেই কামনা-বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরে তখন যে অসাধারণত্বের সৃষ্টি হয় তাহাকে লইয়াই জগতের কাব্য-কবিতা রচিত হয়। অবশ্য সকল মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা একরূপ নহে। কেহ ভোগ-বহ্নি, কেহ স্নেহ-বহ্নি, কেহ জ্ঞান-বহ্নি, কেহ প্রেম-বহ্নিতে ঝাঁপ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু এই আবেগ-উন্মাদনার স্বরূপ কি কেহ তাহা জানে না—শুধু জানে মানুষ ইহার দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটিয়া চলে।

[১১] ভাবার্থ লিখ :

"দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক—তাহা দৃঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তাহার অনেকটা অলীক। 'গোলে হরিবোল' ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে, গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া পড়ে। দলের আন্দোলনে অনেক সময় তুচ্ছ উপলক্ষে ভক্তির ঝড় উঠিতে পারে—তাহার সাময়িক প্রবলতা যতই হোক-না-কেন ঝড় জিনিসটা কখনোই স্থায়ী নহে। সংসারে এমন কতবার কতশত দলের দেবতার অকস্মাৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং জয়ঢাক বাজিতে বাজিতে অতলস্পর্শ বিস্মৃতির মধ্যে তাঁহাদের বিসর্জন হইয়াছে। পাথরের মূর্তি গড়িয়া জবরদস্তি করিয়া কি কাহাকেও মনে রাখা যায়? ওয়েস্ট্‌মিনস্টার অ্যাবিতে কি এমন অনেকের নাম খোদাই হয় নাই, ইতিহাসে যাঁহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষুদ্র ও ম্লান হইয়া আসিতেছে? এই সকল ক্ষণকালের দেবতাগণকে দলীয় উৎসাহে চিরকালের আসনে বসাইবার চেষ্টা করা, না দেবতার পক্ষে ভালো, না দেবতার পক্ষে শুভকর। দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধ-বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি, কিন্তু ভক্তির পক্ষে সংযত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অনুকূল, কারণ তাহা অকৃত্রিমতা ও ধ্রুবতা চাহে। উন্মত্ততায় তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।

উত্তর : দলগত প্রবল উত্তেজনায় দলীয় নেতাকে চিরকালের স্থায়ী আসন দান করার একটা উন্মত্ততা জাগিতে পারে—কিন্তু চরিত্রপূজার তাহাই

প্রকৃষ্টতম পন্থা নহে। কিছু কিছু লোক আছেন যাঁহারা চরিত্র-মাহাত্ম্যে সর্বসাধারণের সম্মুখে এমন একটি উদার আদর্শ তুলিয়া ধরেন যে, যুগে যুগে লোকে তাঁহাদের মাহাত্ম্যকে নিজেদের অন্তরে অনুভব করিবার চেষ্টা করে। পৃথিবীতে ইহারা যথার্থই পূজনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যে ভক্তি করি তাহা উন্মত্ততায় পর্যবসিত হওয়া উচিত নহে। অসংযত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য চিরকালীন সম্ভ্রমকে ক্ষুণ্ণ করে—উহা একান্তভাবে সাময়িক ও ক্ষণিক ব্যাপার। অনেক সময় দলগত দৃষ্টিতে পড়িয়া কোন দলনেতাকে যদি চিরকালীন মর্যাদা দিবার চেষ্টা করা হয় তাহাতে সাময়িক একটি বিরাট বিক্ষেপ সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু তাহা কখনও স্থায়ী হয় না। ইতিহাসের পাতায় কাহাদের নাম কখন বিলুপ্ত হইয়া যায় বলিতে পারা যায় না। সুতরাং সত্যকার মহত্ত্ব যেখানে নাই সেখানে দলগত স্বার্থে উন্মাদনা জাগাইয়া দলীয় নেতাকে মহৎ মর্যাদা দিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মঙ্গলজনক নয়। ভক্তির শান্ত-সমাহিত রূপটিই বরণীয়—উন্মত্ততা ভক্তির বিকৃতি মাত্র।

[১২] ভাবার্থ লিখ:

"উপকরণের বিরলতা নিয়ে অসঙ্গত ক্ষোভের সঙ্গে অসন্তোষ প্রকাশের মধ্যেও চরিত্র-দৌর্বল্য প্রকাশ পায়। আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো। অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পে। অনায়াসে প্রয়োজনের যোগান দেওয়ার দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের ক্ষতি করা। সহজেই তারা যে এত কিছু চায় তা নয়, তারা আত্মতৃপ্ত। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপরে চাপিয়ে তাদেরকে সম্ভব নেশাগ্রস্ত করে তুলি। গোড়া থেকেই শিক্ষার প্রয়োজন এই কথা ভেবে যে, কত অল্প নিয়ে চলতে পারে। শরীর মনের শক্তির সম্যক্‌রূপে চর্চা সেখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানেই মানুষের সৃষ্টি উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট্‌ যে আপনার রাজ্য আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে মেয়েদের হাতে অতি-লালিত ছেলেরা মনুষ্যোচিত সেই আত্মপ্রবর্তনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্তদের শক্ত হাতের চাপে

অন্যদের ইচ্ছার নমুনায় রূপ নেবার জন্য অত্যন্ত কাদময়ভাবে প্রস্তুত। তাই আপিসের নিম্নতম বিভাগে আমরা আদর্শ কর্মচারী।

উত্তর: আমাদের দেশে ছেলেরা যে বলিষ্ঠ-আত্মপ্রত্যয় লইয়া জীবন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বকীয় জীবনধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না তাহার অন্যতম প্রধান কারণ শিশুকাল হইতে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গভীর ত্রুটি। আমরা শিশুদের অতিরিক্ত যত্নে এমনভাবে মানুষ করিতে চেষ্টা করি যাহাতে তাহার মধ্যে নিজের প্রয়োজনের বোধই সৃষ্টি হয় না। ফলে স্বাভাবিকভাবে যে উদ্যম জাগে তাহাও তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। তাহারা বুঝিবার আগে অনায়াসে পাইতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং অপরের রুচিকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করাই একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করিয়া বড় হয়। প্রকৃতির রাজ্যে অনুকরণবৃত্তির কোন স্থান নাই। সেখানে সমস্ত মানুষই স্বরাট্‌। যে মানুষ আপন আত্ম-প্রতিষ্ঠার চর্চা করিবার অভ্যাস বা শিক্ষা কোনটিই লাভ করে নাই সে কোনদিনই আপন বৈশিষ্ট্যকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে না। জীবনযুদ্ধে সৃষ্টিকর্তৃত্ব না পাইলে আত্মকর্তৃত্ব পাইবার উপায় নাই। অথচ এই হতভাগ্যের দল উদ্যম করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া অপর কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট গড্ডলিকা-প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ততার জাবর কাটিতে থাকে। ইহা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটির কথাই প্রমাণ করিয়া দেয়।

[১৩] ভাবার্থ লিখ:

"কলা সম্বন্ধে রাস্কিনের মত খুব প্রশস্ত এবং উদার। তাহাতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই, কলা সম্ভোগ হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চাহেন না। ধনী-নির্ধন সকলেই তাহাতে আমন্ত্রিত। কেবল তাহাই নহে, পরম ভক্ত ভাগবতকার যেমন বলেন—"ধর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি ভগবানে ভক্তি উৎপাদন না করে তবে তাহা শ্রম এব হি কেবলং"। রাস্কিনও সেইরূপ বলেন—"যে জীবনে পরিশ্রম নাই, সে জীবন যেন একটি গুরুতর অপরাধ; এবং যে পরিশ্রমে কলার আনন্দ নাই, তহা পশুত্ব।" তাঁহার সমুদয় শিক্ষার মধ্যে এই একটি কথা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত—মানব চরিত্রের উন্নতি সাধনে কলাবিদ্যা শ্রেষ্ঠ সহায়। কারণ এই জগতে যাহাতে যাহা কিছু আছে—অসীম বাহ্য প্রকৃতির বিরাট ব্যাপার হইতে সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্যন্ত

এবং অনন্ত দুরবগাহ মানব-হৃদয়ের সুখদুঃখের গভীর আলোড়ন হইতে সামান্ত পর্যন্ত—সকলই কলাবিদ্যার বিষয়ীভূত হইতে পারে।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

উত্তর : কলা সমন্ধে রাস্কিনের মত কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার দ্বারা আচ্ছন্ন নহে। তিনি কলাকে জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক রূপে দেখিয়াছেন ; এমনকি কলা-বোধহীন জীবনকে তিনি পশুত্বের তুল্য বলিয়াছেন। কলার আনন্দ উপভোগে কোন সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাধা-নিষেধ থাকা উচিত নহে। মানব-জীবনের উন্নতির সঙ্গে কলার আনন্দের নিগূঢ় যোগ বিদ্যমান। আর এই কলার ব্যাপ্তিও অসাধারণ। মানব জীবনের এমন কোন অনুভূতি নাই যাহা কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

[১৪] মর্মার্থ লিখ :

"শত সহস্র বৎসরের মহারণ্য অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগ-যুগান্তের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষারকিরীটকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মত। চারিদিকের জগৎ নূতন থাকে, আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলেছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারিদিকের বিরাট প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশঃ বিকৃত ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্ব-জগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন—সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত হয়ে থাকে—অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বেরিয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারিদিকে সমস্তই সহজ। কেবল সেই মানুষই সহজ নয়।"

উত্তর: বিশ্বপ্রকৃতি চিরনবীন। তাহার কারণ প্রকৃতির মধ্যে সহজ স্বাভাবিক জীবনছন্দ কোথাও ব্যাহত হয় না। প্রকৃতির ভিতর যে প্রাণশক্তি কাজ করে তাহার আবরণ রূপ সকলের সহিত অনায়াসে মিশিয়া যাইতে পারে। আকাশের উদার আলো-বাতাস আর মাটির মধ্যে এমন এক অকৃত্রিম মিতালি যে, সেখানে প্রাণ উন্মুক্ত চলমানতাতেই চিরনবীনতা বজায় রাখে। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে মানুষ যদিও আসিয়াছে অনেক পরে, তবুও মানুষ তাহার নবীনত্ব হারাইয়া ফেলিয়া যেন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাই মানুষ কেবলই নিজেকে আড়াল করিতে থাকে। সে অপর সকল হইতে ক্রমশঃ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে চায় এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের অভ্রভেদী চূড়া তাহাকে চলমান বিশ্বসত্তা হইতে বিশিষ্ট করিয়া দেয়। এইভাবে প্রাণের উৎস স্রোত হইতে বিযুক্ত হইয়া মানুষ ক্রমশঃ জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে। তাহার জটিলতা তাহাকে সহজভাবে মিশিয়া যাইতে দেয় না। মানুষের মধ্যে বিকৃতি হইতেই এই অকাল বার্ধক্যের জীর্ণতা।

[১৫] মর্মার্থ লিখ:

"পৃথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে, সেখানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে। সেখানে নানা দিক থেকে নানা জাতির সমাবেশ হওয়াতে একটি মহামিলন ঘটেছে। গ্রীস, রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল, তাই তা একঘরে হয়ে ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকেনি। ভারতবর্ষের সভ্যতাতেও তেমনি আর্য, দ্রাবিড়, পারসিক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হয়েছিল। আমাদের এই সমন্বয়কে মানতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারাই সবচেয়ে স্বতন্ত্র; তারা নূতন লোকদের স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয়নি। বর্ণ, ভাষা প্রভৃতির বৈষম্য যখনই দেখেছে তখনই তা দোষের বলে বিষবাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

আজকের দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা নয়; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকের দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোন

জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয় সাধন হয়নি বলেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে। অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না—সে এতবড় অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে।"

উত্তর : মানুষের সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই সত্য দেখিতে পাই যে, যেখানে মানুষ আপনাকে অন্য সমস্ত মানুষ হইতে আড়াল করিয়া রাখে নাই, সেখানে মানুষের সভ্যতা অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। গ্রীস, রোম, প্রাচীন ভারতবর্ষ সর্বত্রই, যেখানে বিশ্ব-মানবতার অকুণ্ঠ মেলামেশা ঘটিয়াছে সেখানেই সভ্যতার বিরাট উন্নতি দেখা গিয়াছে। বর্বর জাতিরাই আপন স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উন্মাদ প্রয়াস করিয়াছে। আজ আমাদের মানব-সভ্যতার এই মৌলিক দিকটি ভুলিলে চলিবে না। জাতিগত, বর্ণগত, ভাষাগত সমস্ত কৃত্রিম ভেদ ও বন্ধন ভাঙিয়া বিশ্বমানবতার মিলনক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়—সে মানুষ। আজ পৃথিবীর বুকে এই মহাসত্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই বলিয়াই মানুষে মানুষে এত বিরোধ ও হানাহানি। তাই আজ মানব-সভ্যতাবিরোধীদের এত অনাচার অনায়াসে সঙ্ঘটিত হইয়া চলিয়াছে।

[১৬] **মর্মার্থ লিখ :**

"কার্পণ্য কুঞ্চিত করে—
তিন-সন্ধ্যা কাঁচ্চা-পোয়া-ছটাকের রূপ
একদিন ভুলাও উৎসব।
দিনেকের তরে
ভারে-ভারে মণে-মণে মাঠের সম্পদ
বহিয়া আনো মোর ঘরে।
অনর্জন অসঞ্চয় ঋণ
এক পাত্রে গণি

এক রাত্রি কারো মোরে ধনী—
ঋণোজ্জ্বল পূর্ণ-চাঁদে পূর্ণিমা-রজনী সম।
মিথ্যা করি ভাগ্যলিপি, লখিয়া বিধাতা,
বারেক করহ মোরে দাতা।
লয়ে তুচ্ছ অকাঞ্চন কাচে
প্রাণ যদি এতকাল বাঁচে,
কাঞ্চনে করহ আজ কাচ,
কুবেরের কনক-মন্দিরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে উড়ে লাগুক ছোঁয়াচ
হাঘরিয়া উড়নচণ্ডীর।"

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

উত্তর : বর্তমান বঞ্চনাময় জীবনের সংকীর্ণতা, দীনতা ও তুচ্ছতায় পীড়িত কবি ক্ষণেকের তরে মুক্তিলাভ করিতে চাহিয়াছেন। 'শুধু দিন-যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' কবিকে মানুষের স্বাভাবিক মর্যাদা পাইতে দেয় নাই। দৈনিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দেনাপাওনার হিসাবে কবির অন্তরের আনন্দকে ব্যাহত করিয়া দিয়াছে। আজ তিনি একদিনের উৎসবকে জীবনে আহ্বান জানাইয়াছেন। একদিনের জন্য হইলেও এই উৎসব তাঁহাকে প্রাচুর্যের আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ দিবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ হিসাব, মিথ্যা কোলাহল হইতে মুক্ত হইয়া প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্যের আসরে তাঁহাকে লইয়া যাইবে। কবি যেন বিধাতা-নির্দিষ্ট এই বুভুক্ষিত জীবন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এক বেহিসাবী আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইবেন। তাঁহার জীবনে কাচ ভিন্ন কাঞ্চন জোটে নাই। তাই যদি একদিনের জন্যও কুবেরের মন্দিরে ও লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে হাত দিতে পারেন তাহা হইলে দৈন্য-পীড়িত তুচ্ছ হিসাবের অঙ্কের কাণাগলিতে মৃতপ্রায় জীবনের স্বাদ বদলাইয়া লইবার জন্য অনায়াসে অজস্র অপব্যয় করিবেন। আনন্দের মদিরায় রিক্ত জীবনকে ভুলিতে গিয়া তিনি কাঞ্চন ও কাচকে সমান করিয়া দিবেন।

[১৭] ভাবার্থ সম্প্রসারণ কর :

সাধু যবে স্বর্গে গেল, চিত্রগুপ্তে ডাকি
কহিলেন—আনো মোর পুণ্যের হিসাব।
চিত্রগুপ্ত খাতাখানি সম্মুখেতে রাখি
দেখিতে লাগিল তার মুখের কী ভাব।
সাধু কহে চমকিয়া—মহা ভুল এ কী
প্রথমের পাতাগুলো ভরিয়াছে আঁকে,
শেষের পাতায় এসে সব শূন্য দেখি।
যতদিন ডুবেছিনু সংসারের পাঁকে
ততদিন এত পুণ্য কোথা হতে আসে।
শুনি কথা চিত্রগুপ্ত মনে মনে হাসে।
সাধু মহা রেগে বলে—যৌবনের পাতে
এত পুণ্য কেন লেখ দেবপূজা খাতে?
চিত্রগুপ্ত হেসে বলে—বড়ো শক্ত বুঝা।
যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা। [ক. বি. ১৯৬২]

উঃ। সংসার-ধর্ম পালনই জীবনের বড় ধর্ম। সংসার হইতে পালাইয়া গিয়া সাধু সাজিয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। সংসার হইতে পলায়নের অর্থ কর্তব্য তথা জীবনের কাছ হইতে পলায়ন। তাই সাধক কবির কণ্ঠে গাহিয়াছেন, "সংসারধর্ম বড় ধর্ম মা, তাই পারি না ছেড়ে যেতে।" সংসারে আবদ্ধ থাকার অর্থই সংসারের আর সকলের জন্য নিজের কর্তব্য পালন করা। সংসারে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি—প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের রহিয়াছে কর্তব্য। ইহা সেই জন্মদাতা বিধাতারই নির্দেশ। সন্তানকে যে মাতা গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, ভূমিষ্ঠ হইবার পর যে সন্তান পিতা-মাতার নিরলস সেবা-যত্নে বড় হইয়াছে, সেই সন্তানের পবিত্র কর্তব্য পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ এবং সকল প্রকার সুখ-দুঃখের দায়িত্ব নেওয়া। এইভাবেই সংসারে প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের রহিয়াছে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংসারের প্রতি ভালবাসা, আপনজনের প্রতি মায়াই মানুষকে সংসার ধর্মে উদ্বুদ্ধ করে। যাহারা মনে করে এই মায়ার সংসারে থাকিয়া মন-প্রাণ দিয়া ভগবানের পূজা করা যায় না এবং

ধর্ম-পালন হয় না, তাহারা ভুল করে। ভগবানের আরাধনার নাম করিয়া যাহারা সংসার হইতে পলায়ন করে তাহারা ভীরু, কাপুরুষ। ভগবান ধার্মিকের খাতায় তাহাদের নাম লেখেন না। সংসারে মানুষ যতদিন আবদ্ধ থাকে; আর সকলের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অংশীদার হয় ততদিনই সে জীবধর্মে ধার্মিক। সংসার হইতে পলায়ন করিলেই ধর্মের পথ হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটে।

[১৮] ভাবার্থ সম্প্রসারণ কর :

তৃষিত গর্দভ গেল সরোবর তীরে,
'ছি ছি কালো জল!'—বলি চলে এল ফিরে।
কহে জল, জল কালো জানে সব গাধা,
যে জন অধিক জানে বলে জল সাদা॥ [ক. বি. ১৯৬৫]

উঃ। গর্দভের স্বাভাবিক পরিচয় তাহার মূর্খতাতেই। তাই গর্দভ বর্ণহীন জলকে সাদা কাল বলিয়া ভেদ করে। জলের সাদা রং যে জলের বিশুদ্ধির অভাব হইতেই আসিতে পারে ইহা মূর্খ গর্দভের বুদ্ধির অগম্য। এমনি করিয়াই মূর্খ অসীমকে সীমার বন্ধনে রূপের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলে। ধর্ম মানব-সমাজের বিকাশের সহায়। কিন্তু অজ্ঞানতা ইহাকে ভেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ধর্মের উদ্দেশ্যকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার ফলে সমাজের বিকাশ ধারাকেই সে রুদ্ধ করিয়া ফেলে। ঈশ্বর বিশ্বলোকের সর্বনিয়ন্তা—সর্বকারণ। তাঁহাকেও মানুষ তাহার অজ্ঞানতায় কালী, কৃষ্ণ, ভগবান, গড, আল্লা, প্রভৃতি নামের বন্ধনে বাঁধিয়া ভেদাচারের মধ্যে তাঁহার নামে কালিমা লেপন করিতে চেষ্টা করে।

জলের বর্ণ কালো বলিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া অজ্ঞানতার পরিচয় দিলে জলের কিছুই ক্ষতি হয় না। গর্দভের তাহাতে বিনাশের কারণ দেখা দেয়। মানুষ এমনি ভাবে তৃষ্ণার্ত গাধার মতো যাহা অখণ্ড, যাহা অসীম তাহাকে সীমার মধ্যে খণ্ডিত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে। তাহার এই অজ্ঞানতা তাহার নিজেরই ধ্বংসের কারণ হইতেছে। যাহা অখণ্ড, যাহা অসীম তাহার ইহাতে কিছুই আসে যায় না। সত্যের অকলঙ্ক অসীমতাকে খণ্ডিত করিতে যাইয়া মানুষের নিজের ধ্বংসের পথই প্রশস্ত হয়।

[১৯] ভাবার্থ লিখ :

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে যে

ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহৎ কাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপন সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রামরাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। [ক. বি. ১৯৬৫]

উঃ। যুদ্ধ, দিগ্বিজয়, শত্রুনাশ প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য মহাকাব্যের মতো রামায়ণেও আছে। কিন্তু রামায়ণের মহত্ব পারিবারিক সম্পর্কের উন্নীত রূপের চরম বিকাশে ও প্রতিষ্ঠায়। মাতাপিতায় পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামীর সহিত স্ত্রীর যে স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি ও নীতিধর্মের বন্ধন, তাহাকেই রামায়ণ উজ্জ্বলতা দান করিয়াছে। রাম ও সীতার দাম্পত্যবন্ধনের দৃঢ়তা ও প্রেমের গভীরতা প্রতিষ্ঠার জন্যই এই কাব্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ আসিয়াছে, যুদ্ধের জন্য নহে। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যস্থিত মাধুর্য ও সৌন্দর্য, বশ্যতা ও আত্মত্যাগ, দৃঢ়তা ও গভীরতা, সেবা ও সহানুভূতি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা দিয়া রামায়ণ পৃথিবীর অন্যান্য মহাকাব্য হইতে বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

[২০] ১৫ ছত্রের মধ্যে ভাবার্থ সম্প্রসারণ কর:

আম্র কহে, একদিন হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই;
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি—
মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি। [ক. বি. ১৯৬৬]

উঃ। মানুষ নিজের প্রয়োজনেই প্রকৃতির ফল-ফুল, গাছপালা, পশু-পক্ষীকে আপনার ঘরে স্থান দিয়াছে। মানুষের প্রয়োজনের শেষ নাই। তার ক্ষুধা,

তৃষ্ণা, তার সৌন্দর্য উপভোগ এবং জীবনের আরও নানাদিকে প্রয়োজন মানুষকে চালিত করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সব কিছুই মানুষের প্রয়োজনে লাগে নাই। সে প্রকৃতি হইতে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বাছিয়া লইয়া অপ্রয়োজনীয়কে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। তাই মানুষের রুচি ও প্রয়োজনভেদে প্রকৃতির সম্পদে আসিয়াছে মূল্যভেদ। মানুষ যখন খাদ্য হিসাবে আমকে বাছিয়া লইল, তখন হইতেই মানুষের কাছে আমের কদর বাড়িয়া গেল। অখাদ্য হিসাবে অরণ্যেই রহিয়া গেল মাকাল। এইভাবে প্রকৃতি রাজ্যের সাম্য ঘুচিয়া গেল। মানুষ তাহার সম্ভোগের মূল্যে প্রকৃতিতে সকল ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সাম্য ঘুচাইয়া দিয়াছে। প্রকৃতিতে মানুষ তাহার ভোগের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রকৃতির মধ্যে যে মূল ভাবসত্য, সেই সাম্যবোধের বিনাশ ঘটাইয়াছে। এখানেই প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। মানুষ তাহার ভোগ-বাসনার দাসত্বের তাগিদে নিজের সমাজে সাম্য লোপ করিয়াছে। তাই প্রকৃতির সাম্যনীতি তাহার নিকট মূল্যহীন। কিন্তু ভোগমূল্যে যে অবহেলিত সেই সর্বদা চেষ্টা করে পূর্বের সাম্যনীতিকে ফিরিয়া পাইতে। অবহেলিত ও অপমানিত প্রকৃতি তাই মানব-সমাজের অসাম্যের নীতির বিরোধিতা করে।

[২১] ভাবার্থ লিখ :

মানুষের মন যেটাকে টানিয়া রাখিতে চায়, যাহাতে সুখের অনুভব করে——সুখ বল, তৃপ্তি বল, আরাম বল, আনন্দ বল, এই রকম একটা অনুভব যাহার সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়—তাহাই সুন্দর।....এই সৌন্দর্যের খানিকটা স্থূল, খানিকটা সূক্ষ্ম। মধুর রস, মধুর গন্ধ, মধুর শব্দ, মধুর স্পর্শ ও মধুর দর্শনে সঙ্গে সঙ্গে যে তৃপ্তি জন্মে, মনুষ্যমাত্রই তাহা প্রায় সমভাবে সমপরিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ; এই সকল মধুর তৃপ্তিকে স্থূলের মধ্যে ফেলা যায়।....ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য আছে, তাহাকে সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দেশ করা চলে। মানুষ ভিন্ন ইতর জীবের এই সৌন্দর্যভোগের শক্তি আছে কি না, সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এই সৌন্দর্যের উপভোগ করিতে পারে বলিয়া মানুষ উন্নত জীব। মানুষের মধ্যেও সকলে সমভাবে বা সমান মাত্রায় ইহার উপভোগে অধিকারী নহে। দৈনন্দিন জীবিকানির্বাহের জন্য ইহার অধিক উপযোগিতা আছে, তাহা বলা চলে না। এই সূক্ষ্মসৌন্দর্য উপভোগের প্রবৃত্তি বা শক্তি কবি-নামক মনুষ্যে বিশেষরূপ

পরিস্ফুট। সাংসারিক বা বৈষয়িক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি-নামক মনুষ্যের যেরূপ অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহাকে জীবিকার্জনের প্রতিকূল বলিয়াই বরং বোধ হয়। ইংরেজীতে যাহাকে আর্ট বলে, বাংলায় যাহাকে ললিতকলা বলা যাইতে পারে, এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সৃষ্টি ও প্রকাশই তাহার অবলম্বন ও বিষয়।

[ক. বি. ১৯৬৬]

উঃ। সৌন্দর্য মানুষের মনকে আকর্ষণ করে। সৌন্দর্যের আকর্ষণেই মানুষ তৃপ্তি পায়, মনে আসে একটা সুখের অনুভূতি, একটা আনন্দের অনুভূতি। সৌন্দর্যের দুই শ্রেণী—স্থূল সৌন্দর্য ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য। স্থূল সৌন্দর্যের আকর্ষণ তথা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদির ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির ক্ষেত্রে সকল মানুষই সমান। স্থূল সৌন্দর্য-সম্ভোগে বোধ হয় জীবও মানুষের সমকক্ষ। সূক্ষ্মসৌন্দর্য তথা আর্টের উপভোগেরই জন্য মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের মধ্যে কবি-শিল্পিগণের দক্ষতা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যসম্ভোগে সর্বাধিক। কিন্তু সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের ব্যবহারিক প্রয়োজন নাই বলিলেই চলে। জীবিকার্জনের পক্ষে ইহা অনুকূল ত নয়ই, বরং প্রতিকূল।

[২২] ১০ ছত্রের মধ্যে ভাবার্থ প্রকাশ কর :

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ;
হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয়—
তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর এ কি চপলতা ?
কেন হাস্য-পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে।
দিয়েছি উত্তর তাঁরে—ওগো পককেশ,
আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ।
যে আনন্দে, যে আনন্দ-চিরবেদনায়
ধ্বনিত মানব-প্রাণ, আমার বীণায়
দিয়েছেন তারি সুর,—সে তাঁহারি দান,
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান। [ক. বি. ১৯৬৬]

উঃ। গান মানুষকে জগৎ-সংসার ভুলাইয়া দেয়। গানের মধ্য দিয়াই মানুষ তাহার পার্থিব সকল দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়া অপার্থিব দেবলোকে বিচরণ করে। গান শুনিয়া যে আনন্দ না পায় তাহার কাছে গানের কোন মূল্য নাই।

গান মাত্রকেই সে ভাবে চপলতা, হাস্য-পরিহাস, প্রেমের ন্যাকামি। তাহার জীবনের হিসাব-নিকাশ শুধু পার্থিব লেন-দেন লইয়া এবং ঈশ্বরকেও সে এই-ভাবেই জানিতে চাহে। ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ এবং গানের মধ্যেই বিশ্বের বিচিত্র আনন্দ ধরা দেয়। গানের ভিতর দিয়া মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা বলা হয়; তাহাতেই ধরা দেন ঈশ্বর। মানুষের প্রাণের সুরই তাহার কণ্ঠে গানের সুরে রূপ নেয়। গানের মধ্য দিয়াই প্রাণ ধায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। বিচিত্র রূপে রসে-ঈশ্বরের প্রকাশ, বিচিত্র সুর-ছন্দে ঈশ্বরের প্রকাশ। মানব প্রাণের বিচিত্র আনন্দের প্রকাশ গানে। আবার গান ঈশ্বরেরই দান। তাই গানের দ্বারাই সেই পরম সাধ্যের সাধনা করিতে হয়।

[২৩] ভাবসত্য লিখ:

আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ নয়। আমরা দেশকে আপনি জয় করি নি। দেশে অনেক জড় পদার্থ আছে, আপনার আমরা তাদেরই প্রতিবেশী। দেশ যেমন এইসব বস্তুপিণ্ডের নয়, দেশ তেমনি আমাদেরও নয়। এই জড়ত্ব—একেই বলে মোহ। যে মোহাভিভূত সেই তো চিরপ্রবাসী। সে জানে না সে কোথায় আছে। সে জানে না তার সত্যসম্বন্ধ কার সঙ্গে। বাইরের সহায়তার দ্বারা নিজের সত্যবস্তু কখনোই পাওয়া যায় না। আমাদের দেশ কেউ আমাকে দিতে পারে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনই আপন বলে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী যে স্বদেশে ফিরেছি তার লক্ষণ এই যে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ বলেই জানি। পাশেই প্রত্যক্ষ মরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চড়ে দেশাত্মবোধের বাগ্‌বিস্তার করছি, এতো বড়ো অবাস্তব অপদার্থতা আর কিছু হতেই পারে না।

[ক. বি. ১৯৬৭]

উঃ। দেহ-মন-প্রাণ-ধন-মান সকল দিয়া দেশকে ভালবাসিয়া দেশকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। দেশবাসীকে লইয়াই দেশ। মঞ্চে বক্তৃতা নহে, দেশবাসীর সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাকার করাই দেশপ্রেম। এই প্রকার দেশপ্রেম না থাকিলে দেশে জন্মাইয়া ও বসবাস করিয়াও পরবাসী

থাকিতে হয়। প্রাণহীন বলিয়া দেশের জড়বস্তুর দেশের প্রতি ভালবাসা থাকে না। দেশের প্রতি ভালবাসার অভাবে মানুষও দেশের জড়বস্তুর সমান। দেশপ্রেমশূন্য রাজত্বের মোহপাশে বদ্ধ মানুষ আপন স্বদেশে প্রবাসী।

[২৪] ভাবসত্য ব্যক্ত কর:

'তোরে সবে নিন্দা করে গুণহীন ফুল।'
শুনিয়া নীরবে হাসি কহিল শিমুল,
'যতক্ষণ নিন্দা করে, আমি চুপে চুপে
ফুটে উঠি আপনার পরিপূর্ণ রূপে।'

[ক. বি. ১৯৬৭]

উঃ। সুন্দর আপনাতে আপনিই সুন্দর। প্রকৃত সৌন্দর্য কখনো পরমুখাপেক্ষী নয়। সুন্দরের বিকাশের একটা নিজস্ব রীতি বা ধারা আছে, আছে তাহার একটি পরিণাম। নিজস্ব রীতিধারাকে অবলম্বন করিয়া পরিণামকে বরণ করাই সৌন্দর্য-ধর্ম। বিলাসীর বাগানের যে পুষ্পস্তবক, বিলাসীর সম্ভোগোপ-করণ হিসাবেই সেখানে তাহার উপস্থিতি। তাহার বিকাশধারাও বিলাসীর প্রয়োজনের পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত। কৃত্রিম জল ও সার তাহার পুষ্টি ঘটায়। আবার তাহার বিকাশমাত্র সৌন্দর্য বিলাসী সম্ভোগ ব্যাকুলতায় পরিণাম বরণের পূর্বেই সম্ভোগের দৃষ্টিতে ও স্পর্শে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে। পরিপূর্ণ ও স্বাভাবিক পরিণাম তাহার ভাগ্যে ঘটে না। তাই সত্য সৌন্দর্যও সেখানে থাকে অনুপস্থিত।

সুন্দরকে আমরা প্রয়োজনের সামগ্রীতে পরিণত করিয়াছি। স্বভাবের পরিপূর্ণতার প্রকাশই সৌন্দর্য। প্রকৃতি ও শিল্প—উভয়ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। কিন্তু প্রাত্যহিক বিচারে-সংস্কারে ভোগের ব্যাকুলতায় ও আকাঙ্ক্ষায় প্রয়োজন সিদ্ধির সীমায় বদ্ধ হইয়া আমরা ইহা ভুলিয়াছি। তাই প্রকৃত সৌন্দর্যের স্পর্শ হইতে আমরা বঞ্চিত।

[২৫] ভাবসত্য লিখ:

ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে আলোকে

পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে।
শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?

[ক. বি. ১৯৬৭

উঃ। সত্য সর্বদা বিচিত্র রূপে বিকাশমান। সদা বিকাশমান সত্যেরই দেহে নূতন-পুরাতন, জীবন-মৃত্যু নিত্য নব নব রূপে দেখা দেয়। জ্ঞানের রাজ্যে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, মানবসমাজ একদিন যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, তার পরদিন তাহাকেই পুরাতন ও অসত্য বলিয়া ত্যাগ করিতেছে। ইহাতে দুঃখ বা আনন্দের কিছুই নাই। পুরাতন জ্ঞানের উপর ভর দিয়া জ্ঞানের রাজ্যে নূতন সত্য জন্ম লাভ করিতেছে। তাই যাহা পুরাতন তাহা আপাত দৃষ্টিতে মৃত মনে হইলেও সেই পুরাতনই নূতনের জন্মদাতা। মানবের জীবন-মৃত্যু সম্পর্কেও ঐ একই কথা। ফলবান ওষধির মৃত্যু হয়। কিন্তু ফসলের মধ্যে ভাবী-জীবনের সম্ভাবনাকে ইহা রাখিয়া যায়। ওষধির মতই ভাবের বা যুগসত্যের অথবা জীব-জীবনের সার্থকতাই যেন তাহার মৃত্যুতে। সত্য বিনাশহীন। বিকাশই তাহার ধর্ম। এই বিকাশের শেষ কোথা তাহা কেহ জানে না। 'আমি যা বলছি, তাই সত্য'—এমন কথা বলা মূর্খতা। সত্যের বিকাশধারা অসীম। তাই সে সীমার মধ্যে বদ্ধ নয়।
